Four classics / Eric Maria Remarque
Four novelets of Remarque. Translated by Utpal Bhattacharjee
& Souren Dutta

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : অশোক রায়

এ পি পি. ১১৭ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৯ হইতে অশোক রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও এ পি প্রেস, ১১৭ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৯ হইতে মুদ্রিত।

ফোর ক্লাসিকস

ভূমিকা

এরিখ মারিয়া রেমার্ক এর জন্ম জার্মানিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর জীবনটা সংগ্রামের জীবন-যুদ্ধের পাশাপাশি মহাযুদ্ধ। মাত্র আঠার বছর বয়সে, স্কুলের গন্ডি তখন পেরোননি তিনি, ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখনি স্কুলকে সেলাম জানিয়ে তাঁকে ছুটে যেতে হয় রণক্ষেত্রে সৈনিকের পোষাকে। স্থান ফ্রান্সের ফ্রন্টলাইন, সময় টানা চার বছর। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বন্দুকের নলের সামনে নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতা নিয়েই সেই যুদ্ধে যাওয়া তার। যুদ্ধশেষে ১৯১৮ সালে ফ্ল্যান্ডার্সে কামান গর্জন স্তব্ধ হতেই রেমার্ক দেখলেন তার পরিচিত বন্ধু বান্ধব কেউই তখন আর জীবিত নেই, সবাই মৃত। নেহাত তিনি দৈববলে রক্ষা পেয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি তখন একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। ওদিকে স্বদেশে তাঁর মায়েরও মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকা কাটানোর জন্য রেমার্ক তখন এক গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারির চাকরি নেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নিজের এবং বন্ধুদের অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান তাঁর উপন্যাস " অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্টে "। এই উপন্যাসটি বিশ্বের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়। এই সংকলনে এটি পরিবেশিত। রেমার্ক তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ' দি রোড ব্যাক '-এ প্রথম উপন্যাসেরই জের টেনে আনেন এবং আগের মতোই সাফল্য লাভ করেন। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস "থ্রী কমরেডস" আলোচ্য সংকলনে স্থান পেয়েছে। বিশ্বের বেশ কয়েকজন সমালোচকদের মুখে তাঁর এই তৃতীয় উপন্যাসটি " অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট" এর চেয়েও বেশী জনপ্রিয় এবং সমাদৃত হয়েছে। এর পর তিনি একটার পর একটা উপন্যাস লিখে যান। যেমন 'ফ্লটসাম', 'আর্চ অফ ট্রায়াম্ফ, 'নাইট ইন লিসবন', 'হেভেন্স হ্যাভ নো ম্যার্সি' ইত্যাদি। তবে তাঁর গোড়ার দিকের উপন্যাসের মতো 'দি ব্ল্যাক অবলিস্ক' উপন্যাসটি কম জনপ্রিয় নয়। এই উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মানির দুঃখ, যন্ত্রনা ও বেদনাক্লিস্ট সমাজজীবনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটি এতোই হৃদয়গ্রাহী যে, পড়তে গিয়ে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হবেন। এদিক দিয়ে রেমার্ক সফল বলতেই হয়। এই উপন্যাসটি এই অমনিবাসে পরিবেশিত। আর এই অমনিবাসে পরিবেশিত চতুর্থ উপন্যাসটি হলো 'এ টাইম টু লাভ অ্যান্ড এ টাইম টু ডাই'—এখানে দেখানো হয়েছে প্রেম মৃত্যু ভালবাসার ছবি। অবশ্যই রেমার্কের সাফল্যের আর এক অন্যতম সফল উপন্যাস।

হিটলারের জমানায় সেই যে রেমার্ক জার্মানি ছেড়ে চলে যান, তারপর আর দেশে ফিরে আসেননি। তারপর যাযাবরের জীবন কাটাতে থাকেন তিনি বিশ্বের এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে। আর সেই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। সাফল্যের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শেষ ধাপে গিয়ে উপনীত হন তিনি।

এ টাইম টু লাভ অ্যাণ্ড এ টাইম টু ডাই

□ এক □

রাশিয়াতে মৃত্যুর গন্ধ আফ্রিকার চাইতে আলাদা। আফ্রিকাতেও ইংরেজদের প্রবল গোলাবর্ষণের পর মৃতদেহগুলো অকবরস্থ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে, কিন্তু সূর্য সেখানে দ্রুত কাজ করে। রাত্রে বাতাসে ভেসে আসে কেমন মিষ্টি, দম আটকানো, ভারী গন্ধ—যেন মৃতদেহগুলো গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়ে ভূতের মত, অচেনা তারাদের মিটি মিটি আলোর নিচে তাদের শেষ যুদ্ধটা লড়ে নেয়, একেকজন আলাদা আলাদা হয়ে, আশাহীন নীরবতার মধ্যে। কিন্তু পরদিন থেকেই শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যেতে থাকে দেহগুলো। তখন গায়ের সৈনিকের জামাপ্যাণ্টগুলো ঢলঢলে হয়ে যায়। উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর, প্রখর সূর্যের তাপ আর উষ্ণ বাতাসের মধ্যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া মৃত্যু। রাশিয়াতে কিন্তু চটচটে আঠালো পচনধরা মৃত্যু।

কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে। বরফ গলছে। বিধ্বস্ত গ্রামটা মাসখানেক আগেও তিনগজ বরফের নিচে ছিল। এখন আস্তে আস্তে পোড়া, ভাঙ্গা বাড়িগুলো জেগে উঠছে। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহগুলো। অনেকদিনের পুরোনো মরা সব। নভেম্বর, ডিসেম্বর আর জানুয়ারী মাসের। এখন এপ্রিল মাস। গ্রামের পেছন দিকের ছোট পাহাড়টাতে এত বরফ জমেনি। সেখানকার শক্ত মাটিতে কবর খুঁড়ে কেবল জার্মান সৈনিকদেরই কবর দেওয়া হয়েছে। আর রাশিয়ানদের মৃতদেহগুলো আস্তাবলের সামনের খোলা মাঠেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। পচছে দেহগুলো। মাঝে মাঝে বরফ পড়ে ঢেকেও যাচ্ছে। আসলে জার্মান বাহিনী তো পিছু হটছে। রাশিয়ানরা এগিয়ে আসছে। তারাই জাতভাইদের কবর দিয়ে দেবে।

'আর একটা দেহ দেখা যাচ্ছে', সোয়ের বলল।

'কোথায় ?' ইমারমান জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে, গির্জাটার সামনে। খুঁড়ে বার করব নাকি ?'

'কি দরকার। বরফ পড়ে আপনিই ঢেকে যাবে।

'হুঁ।' সোয়ের ফের বলল, 'আজ খাবার কি পাওয়া যাবে জান নাকি ?'

'বাঁধাকপি, শুয়োরের মাংস আর আলু। মাংসের অবশ্য গন্ধটাই শুধু থাকবে।'

সোয়ের প্যাণ্টের বোতাম খুলে মুততে লাগল। 'শালা পাবলিকের মত রাস্তায় মুতছি।'

ইমারমান খসখস করে তলপেট চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'সত্যি সত্যি পাবলিক ছলে কেয়ারই করতাম না কোথায় মুতছি।'

'আমিও না।' সোয়ের বলল, 'কিন্তু মনে হচ্ছে সারাজীবনই সৈনিক থাকতে হবে।'

'তাই। নায়ক হলেই কবরে যেতে হবে। শুধু ফুয়েরারের খাস সেনারা সাজানো বাথরুমে পেচ্ছাব করবে।'

'ওরাও তো পালাচ্ছে আমাদের মতো।' ইমারমান হেসে বলল। 'যাকগে। সাবধানে কথা বল। ষ্টেনব্রেনার শুনলে ফের জেলে পাঠিয়ে দেবে।'

'তোমাকে তো পাঠিয়ে ছিল একবার। হাসপাতালে?' সোয়ের বলল।

'না। জেলে প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট বলে। ছেড়ে দিল কেন জানো? আমি ভাল মেকানিক বলে।'

সোয়ের কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

ইমারমান ফের হেসে ফেলল। 'ভয় পেওনা। আমি গুপ্তচর নই। তাহলে এস, এস, বাহিনীর লোকেরা আমাকে ছাড়ত না।'

সোয়ের তাড়াতাড়ি বলল, 'যেতে যাই চল। এরপর গেলে ডিশ ধোয়া জল খেতে হবে।'

হাতটা ক্রমশঃই যেন বাড়ছে। শুধুই বরফের স্তর গলে যাচ্ছে বলে নয়, মনে হচ্ছে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে, যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্নের মত; অথবা পক্ষাঘাত রুগীর মত হাত তুলে সাহায্য ভিক্ষা করছে।

কোম্পানি কম্যাণ্ডার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ওটা কি?'

'কোন রাশান ফ্যাসান হবে আর কি, স্যার।'

রায়ে ভাল করে দেখল। হাতের বিবর্ণ হয়ে আসা জামাটা দেখল। 'লোকটা রাশিয়ান নয়।' সে বলল।

সার্জেণ্ট মুয়েক কোম্পানি কম্যাণ্ডারটাকে সহ্য করতে পারে না। সে রাগে বুট জোড়ার মধ্যেই পা দুটোকে ঘষতে লাগল।

'বার করো লোকটাকে।' রায়ে বলল।

'আচ্ছা স্যার।'

মুয়েক মনে মনে গাল দিয়েই বলল, মরা যেন নতুন দেখছে! শালা! ঘরের মধ্যে উনুন জেবলে বসে আরাম করছে তো। আমরা এদিকে শীতে মরছি। রাগের চোটে সবাইকে চেচিয়ে ডেকে উঠল সে, 'সোয়ের! ইমারমান! শাবল নিয়ে এসো। আর কে আছে? গ্রেবার, হার্শল্যাণ্ড, বেসিং, ষ্টেনব্রেনার। ওই যে মরাটাকে খুঁড়ে তোল! দেখ, জার্মান সৈনিক কিনা। বাজি ধরছি জার্মান নয়।'

ষ্টেনব্রেনার হেলতে দুলতে এসে বলল, 'বাজি ? কত টাকা ?'

মুয়েক একটা ঢোক গিলে বলল, 'তিন রুবেল !'

দূর দূর, পাঁচের কমে বাজি ধরিনা আমি।'

'ঠিক আছে। পাঁচই সই। মাল খোলো আগে।'

ষ্টেনব্রেনার হাসল। 'সে তো ফেলবোই। আর কি চাই, মুয়েক ?'

ষ্টেনব্রেনারকেও পছন্দ করে না মুয়েক। কিন্তু ভয় করে! সতর্ক থাকে। উনিশ বছরের তাজা ছেলে। সবাই জানে যে ছেলেটা হিটলারের খাস যুববাহিনী, এস, এস, থেকে এসেছে। খবর আদান প্রদান করে। গেষ্টাপো বাহিনীর গুপ্তচর। মুয়েক পকেট থেকে একটা চেরিকাঠের সিগারেট কেস বার করে একটা সিগারেট দিল তাকে।

পাশ থেকে ইমারমান বলে উঠল, 'ফুয়েরার হিটলার ধূমপান করেন না, ষ্টেনব্রেনার!'

'চোপ বে শালা।'

'বে তো গাঁড়ে, জারজের বাচ্চা।'

ষ্টেনব্রেনার আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'খুব মজায় আছিস না? সব ভুলে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে ?

'আমি কিছুই ভুলি না। তুই কি বলতে চাইছিস আমি জানি। কিন্তু প্যাঁচ কষবি না। এখানে চারজন সাক্ষী আছে, আমি শুধু বলেছি, ফুয়েরার ধূমপান করেন না।'

'বকবক থামাতো।' মুয়েক ধমকে উঠল, 'যা খোঁড় গে। কমাণ্ডারের হুকুম।'

'তা ডিউটির সময় ধূমপান চালু হলো কবে ?' ইমারমান জিজ্ঞেস করল তবুও।

'এখন ডিউটি করছিনা। ফ্যাচ ফ্যাচ থামিয়ে কাজ কর। হার্শল্যাণ্ড, তুমি যাও।'

হার্শল্যাণ্ড এগিয়ে আসতে স্টেনব্রেনার দাঁত বার করে হেসে বলল, 'বড় কাজ পেয়ে গেছিস, আইজ্যাক। মরা খুঁড়ে বার করা। তোর ইহুদি রক্তের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।'

'আমি তিন ভাগ আর্য।' হার্শল্যাণ্ড বলল।

'সে তো তুই বলছিস। তা একভাগ ইহুদিতো বটে। মহান ফুয়েরারের দয়ায় আসল জার্মানদের পাশাপাশি লড়তে পারছিস। যা ওই রাশিয়ান গুণ্ডাটাকে তোল। পচা গন্ধে কমাণ্ডারের ঘুম হচ্ছে না।'

'এটা রাশিয়ানের মৃতদেহ না।' গ্রেবার বলে উঠল। সে দেহটার ওপর থেকে বরফ অনেকখানি সরিয়ে দিয়েছে তখন। ভিজে ইউনিফর্মটা দেখাই যাচ্ছে স্পষ্ট।

'রাশিয়ান নয় ?' ষ্টেনব্রেনার এগিয়ে গেল, 'হুঁ, তাই তো। জার্মান সৈন্যের

পোশাক।' ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'মুয়েক! রাশিয়ান নয়। আমি বাজী জিতে গেছি।'

মুয়েক ভারী পা ফেলে এগিয়ে এলো। দেখল। 'গত সপ্তাহ ধরে শুধু রাশিয়ানদের মরা পেয়েছি। এ নিশ্চয়ই গত ডিসেম্বরের যুদ্ধে মারা গেছে। যে জন্যে বরফের এত নীচে চলে গেছিলো।'

'অক্টোবরেও হতে পারে। গ্রেবার বলল, 'আমাদের রেজিমেন্ট তো তখনই এখানে এসেছিল।'

'ননসেন্স! তাদের কেউ এখানে পড়ে থাকার কথা নয়।'

থেকে যেতেও পারে। রাশিয়ানদের সঙ্গে এখানে রাত্রে যুদ্ধ হয়েছিল আমাদের! তারপর রাশিয়ানরা পিছু হটতে আমরাও তাড়া করে চলে যাই এখান থেকে তখনই···

'তা সত্যি।' সোয়ের বলল।

'ননসেন্স! আমাদের সাহায্য করতে পরে যারা এসেছিল, তারা নিশ্চয়ই যত মৃতদেহ দেখেছে কবর দিয়ে গেছে।'

'অতটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অক্টোবরে খুব বরফ পড়ছিল। আমাদের বাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে গেছে।'

'আর এখন আমরা ফের পিছু হটছি, অ্যাঁ?'

'এখন আমরা এখানে এসেছি আবার।'

ইমারমান আড়ালে খোঁচা মারতে গ্রেবার বলে উঠল, 'আমরা হয়তো আসলে এগিয়েই যাচ্ছি।'

ইমারমান ষ্টেনব্রেনারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক বছর ধরে, যুদ্ধের কৌশল হিসাবে আমাদের লক্ষ্যপথ কমিয়ে আনছি। সবাই তা জানে।'

হাতের আঙুলে একটা আংটি দেখা যাচ্ছে।' হার্শল্যান্ড বলে উঠল।

মুয়েক ঝুঁকে পড়ে দেখল। 'তাই তো! দামী বিয়ের আংটি মনে হচ্ছে!'

'এই দেখো! আমাদের রেজিমেন্টের পদকচিহ্ন।' হার্শল্যান্ড বলল।

'তাহলে নিশ্চিতভাবে লোকটা রাশিয়ান নয়?' ষ্টেনব্রেনার মুয়েকের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'না, রাশিয়ান নয়।' মুয়েক ব্যাঙের গলায় বলে উঠল।

'পাঁচ রুবল। আহা, দশ রুবল ধরলে হতো। নাও, মাল কেনো।'

'আমার কাছে নেই।'

'তবে কি জার্মান ব্যাংকে আছে? বাহানা করো না। মাল ছাড়ো।'

মুয়েক কটমট করে ষ্টেনব্রেনারের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে থলি বার করে টাকা কটা দিয়ে নিজের মনেই গালাগাল দিয়ে উঠল, 'আজকে সব কাজেই গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। চুলোয় যা শালা।'

ষ্টেনব্রেনার টাকা কটা পকেটে রাখল। গ্রেবার ঝুঁকে পড়ে হার্শল্যান্ডের সঙ্গে

মিলে মৃতদেহটা আরও একটু বার করল। 'আরে! মনে হচ্ছে রাইকে!'

'কী?'

'এ তো লেফটেন্যান্ট রাইকে। এই তো পদক চিহ্নগুলো। এই তো, ডান হাতের তর্জনীটা নেই।'

'ননসেন্স! রাইকে আহত হওয়ায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাইতো শুনেছি।'

'আমি বলছি রাইকে।'

'মুখটা পরিষ্কার করে দাও!' মুয়েক চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান! মাথায় চাপ দিও না।'

'দিলেও কিছু টের পাবে না, বেচারা!' ইমারমান বলল।

'চোপরাও! জার্মানি অফিসার মরে পড়ে আছে, আর তুমি শালা কম্যুনিস্টের বাচ্চা চেঁচাচ্ছো আনন্দে।'

মৃতদেহ পরিষ্কার করে তোলা হলো ওপরে। 'চিনতে পারছি না।' মুয়েক বলল।

'রাইকেই হবে। আর কোন জার্মান অফিসার তো এখানে মরেনি।' গ্রেবার বলল।

'তোমরা অপেক্ষা করো এখানে। আমি রিপোর্ট দিয়ে আসি। মুয়েক চলে গেল।

রায়ে এল। দেখল। বলল, 'কফিন বানানো অসম্ভব। কাঠ নেই ' ক্যানভাসে মুড়ে ফেল দেহটা। কবর খোঁড়ো। একটা ক্রশ তৈরী রাখো। তারপর বলল, 'সার্জেন্ট মুয়েক। চারজন বন্দী গেরিলা সৈনিককে এখানে আজ পাঠানো হয়েছে। কাল ভোরেই ওদের গুলি করে মারতে হবে। তেমনই আদেশ এসেছে। কোন চার জন গুলি করবে, ঠিক করো। তুমি না পারলে মাষ্টার সার্জেন্ট বলে দেবেন কোন চারজন গুলি করবে।

'ঠিক আছে, স্যার।'

'আমি রাজি আছি।' স্টেনব্রেনার বলল।

'ভাল কথা।' রায়ে বলে চলে গেল।

একগাদা গালাগাল দিল মুয়েক রায়েকে লক্ষ্য করে। খুবই নিচু স্বরে। তারপর বলল, 'রায়কে কেমন মনে হয়?'

স্টেনব্রেনার জবাব দিল, 'উনি আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার, তাই না?'

'তা তো বটেই। আর—?'

'আর আবার কি?'

'নাহ! কিছু না।' মুয়েক বক্রস্বরে বলে উঠল।

'গভীর হয়েছে ?' সব চেয়ে বুড়ো রাশিয়ানটা জিজ্ঞেস করল।

লোকটার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। একমুখ নোংরা সাদা দাড়ি। ঘন নীল বর্ণ দুটো চোখ ভাঙ্গা জার্মান বলছিল।

'চোপ, ব্যাটা বলশেভিক। কথা বলতে বললে বলবি', ষ্টেনব্রেনার জবাব দিল। তার চোখ তখন ঘুরে ঘুরে মেয়ে গেরিলাটার দিকে দেখছিল। বেশ শক্ত সমর্থ যুবতী।

'আরও গভীর', গ্রেবার বলল। সে ষ্টেনব্রেনার আর সোয়েরের সঙ্গে বন্দিদের দেখাশোনা করছিল।

'আমাদের জন্য বুঝি ? রাশিয়ানটা ফের জিজ্ঞেস করল।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেই হাতের উল্টো পিঠ গিয়ে বুড়োটার মুখে ঝাড়লো ষ্টেনব্রেনার, 'বলেছিনা বুড়ো ঠাকুর্দা, চুপ করে থাক। এখানে কি চলছে এখন ? গাঁয়ে মেলা বসেছে ?'

'না, এই কবরটা তোমার জন্যে নয়', গ্রেবার বলল।

রাশিয়ানটা নড়ল না একটুও। স্থির দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল ষ্টেনব্রেনারের দিকে। তাকালো ষ্টেনব্রেনারও। আর ওর মুখটা বদলে গেল। রাশিয়ানটা এবার বোধহয় তাকে আক্রমণ করবে। তেমনই মনে হল তার। তক্ষুনি বুড়ো রাশিয়ানটাকে মেরে দিলে কেউ কিছুই বলতনা। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মারতে হয়েছে, ব্যস। কিন্তু ষ্টেনব্রেনারের কাছে ব্যাপারটা তেমন নয় গ্রেবার জানে। অদ্ভূত একটা সবজান্তাভাব এবং যখন কাউকে খুন করছে, সেটাও আইনমাফিক হওয়া চাই। এই রকম দুটো মনোভাবই ষ্টেনব্রেনারের ক্ষেত্রে কাজ করে গ্রেবার কতবার দেখেছে।

রাশিয়ানটা নড়েনি। তার নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে দাড়ি ভিজিয়ে দিয়েছে। গ্রেবার ভাবল যে বুড়ো রাশিয়ানটা কি এই অবস্থায় তৎক্ষনাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও ষ্টেনব্রেনারের মুখে একঘা কষাবে, নাকি অন্তত আরও কয়েক ঘন্টা, রাতটুকু বেঁচে থাকার জন্যে চুপচাপ সব সয়ে যাবে। গ্রেবার জানে না।

শাবলটা তুলে নিল রাশিয়ানটা। ষ্টেনব্রেনার একপা পিছিয়ে গেল। কিন্তু রাশিয়ানটা ফের গর্ত খুঁড়তে লাগল। ষ্টেনব্রেনার হাসল। 'গর্তটার মধ্যে শুয়ে পড়তে দেখি।' সে আদেশ দিল। রাশিয়ানটা শাবলটা এক পাশে রেখে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। গর্তের মধ্যে। 'যথেষ্ট বড় হয়েছে তো গর্তটা।' গ্রেবারকে জিজ্ঞেস ষ্টেনব্রেনার।

'হ্যাঁ। রাইকে তত লম্বা নয়।'

রাশিয়ানটা সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আকাশের নীল আর তার চোখ দুটোর নীল যেন একাকার হয়ে গেছে। পেঁজা তুলোর মত বরফের কটা টুকরো তার মুখে শরীরে পড়েছে। ষ্টেনব্রেনার চেয়ে রইল খানিকক্ষন। তারপর

বলল, 'উঠে এসো।'

রাশিয়ানটা হাতে ভর দিয়ে উঠে এলো। ভিজে মাটির কয়েকটা চাবড়া তার কোটটাতে লেগে আছে। 'তাহলে, ষ্টেনব্রেনার মেয়েমানুষটার দিকে তাকালো। 'এবার তোরা নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়। বেশী গভীর করার দরকার নেই। আগামী গ্রীষ্মে তোদের দেহগুলো শেয়ালে ছিঁড়ে খেলেও কিছু যাবে আসবে না।'

ভোর হয়ে গেছে তখন। দিগন্তে বিবর্ণ, লাল একটা ফিতে জেগে উঠেছে। বরফের চাঁইগুলো ফাটছে; রাতের বেলা ফের বরফ পড়েছিল তো। খোলা কবর গুলোর গর্তে ঘোর কালো আঁধার। সোয়ের রাগের গলায় বলে উঠল, 'হারামির দল। আমাদের ঘাড়েই সব চাপিয়ে দেয় কেন? আমরা কেন এসব কাজ করতে যাবো?' গোয়েন্দারা কি করছে? ওরাই তো এসব ব্যাপারে বেশ দক্ষ। আমাদের ওপরে চাপায় কেন? এই নিয়ে তিনবার হল। আমরা হাজার হলেও সম্মানিত সৈনিক।'

গ্রেবার রাইফেলটাকে আলগা হাতে ধরে বলল, 'ওরা সব পেছনে অন্য কাজে ব্যস্ত।'

'বুঝলাম। ওরা পেছনেই থাকে। কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে আসে না। ষ্টেনব্রেনার আগে ওই এস, ডি, দের দলে ছিল না?'

'আমার ধারনা কনসেনট্রেশান বা বন্দিদের ক্যাম্পে ছিল সে। ব্লক ওয়ার্ডেন বা ঐ রকমই কিছু।'

অন্যরা একে একে এল। ষ্টেনব্রেনারকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে। 'শোন সব', সে বলল, 'দলের মধ্যে একটা গাই গরু আছে। ওর ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'তোমার জন্যে মানে?' সোয়ের জিজ্ঞেস করল, 'এখন তো আর সময় নেই বাপু যে তুমি মেয়েটাকে অন্তসত্ত্বা করে দেবে। অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার।'

'বকবক থামাও।' সোয়ের তামাক চিবোতে চিবোতে বলল, 'যদি ও মেয়েটাকে নিজেই গুলি করে মারতে চায়, তো ভাল কথা। এ জন্যে আমি অন্তত আপত্তি করছি না।'

'আমিও না।' গ্রেবার বলল।

অন্যেরা কেউ কিছু বলল না। ষ্টেনব্রেনার বলল, 'খামোখা কয়েকটা দামী গুলি নষ্ট করার কোন মানে হয় না। বরং ফাঁসি দিয়ে মারা উচিত। যেমন সর্বত্র হয়।'

'কোথায়?' সোয়ের চারপাশে তাকালো, 'কোন গাছ টাছ দেখছ নাকি আশে পাশে? না আমরা একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করে নেবো? কিন্তু কি দিয়ে করবো?'

'যা বলেছ,' গ্রেবার মন্তব্য করল।

চারজন রাশিয়ানকে নিয়ে মুয়েক উপস্থিত হল। দুজন সৈনিক সামনে, দুজন পেছনে। প্রথমে বৃদ্ধ রাশিয়ান। তারপর যুবতী মেয়েটা! তারপর আরও দুজন বাচ্চা রাশিয়ান। বলার আগেই চারজন গিয়ে কবরটার পাশে লাইন করে দাড়াল। যুবতী প্রথমে তাকিয়ে দেখে নিল। তার পরনে লাল উলেনের স্কার্ট।

এক নম্বর প্ল্যাটুন বা পদাতিক বাহিনী থেকে আসা লেফটেন্যাণ্ট ম্যালের কোম্পানি কমাণ্ডারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি রায়ের পক্ষে দণ্ডদানের প্রতিনিধি। ব্যাপারটা হাস্যকর। কিন্তু নিয়ম কানুনের নড়চড় হবার জো নেই। সবাই জানে যে ওই চারজন রাশিয়ান গেরিলা সৈনিক হতেও পারে বা নাও হতে পারে, বিচারের একটা প্রহসন করেই তাদের দণ্ডভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযোগটা কী? না, তাদের কাছে অস্ত্র পাওয়া গেছে। তাই তাদের নিয়ম মাফিক গুলি করে মারা হবে একজন বড় অফিসারের উপস্থিতিতে। যেন তাতে ওদের চারজনের ভারী বয়েই গেল।

'গাইগরুটাকে আমি', ফিসফিস করে ষ্টেনব্রেনার বলল।

গ্রেবার মেয়েটার দিকে তাকালো। চুপচাপ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যুবতী বেশ স্বাস্থ্যবতী। বাচ্চা-কাচ্চার মাও হতে পারে। ম্যালের যে কি পড়ছিলেন, সে বোঝেনি। সে কেবল জানে যে তার শিরায় শিরায় যে জীবনের স্পন্দন, তা আর কয়েক মিনিট বাদেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। তবু ভোরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সে দাঁড়িয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রেবার দেখল মুয়েক ম্যালেরের কানে কানে কী বলছে।

ম্যালের মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'পরে করলে চলত না?'

'আগে করাই ভাল, স্যার। সহজ।'

'ঠিক আছে। কর, তোমার যেমন খুশী!'

মুয়েক এগিয়ে গেল। 'ওকে বলো জুতো জোড়া খুলে রাখতে।' বৃদ্ধ রাশিয়ান, যে অল্প জার্মান ভাষা জানে, তাকে বলল সে যুবক রাশিয়ানটার দিকে দেখিয়ে। বৃদ্ধ নিচুস্বরে কি বলল ছেলেটাকে, বোধহয় বুঝতে পারলো না সে। অধৈর্য স্বরে মুয়েক চেঁচিয়ে উঠল, 'তাড়াতাড়ি! জুতো, জুতো জোড়া খুলে দে পা থেকে।' বৃদ্ধ রাশিয়ানটা আবার কথাগুলো ছেলেটাকে বলতেই তাড়াতাড়ি করে ছেলেটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পা থেকে জুতোটা টেনে হেঁচড়ে খুলতে লাগল। 'এমন করছে কেন ছেলেটা?' গ্রেবার ভাবল। তাড়াতাড়ি মরতে চাইছে বুঝি। নিঃশব্দে জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে মুয়েকের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। বেশ ভাল জুতো জোড়া। মুয়েক দেখল। হাত দিয়ে দেখালো কোথায় রাখতে হবে। ছেলেটা এগিয়ে এসে রেখে দিয়ে ফের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। এখন তার দু'পায়ে নোংরা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখা গেল। ফাঁকা গোড়ালি দুটো ঠাণ্ডা বরফের ওপর। দাঁড়াতে

পারছে না বেচারা।

মুয়েক এবার অন্য ক'জনার দিকে দেখল। দেখল যে মেয়েটার হাতে সুন্দর একজোড়া গরম ফারের দস্তানা পরা আছে। তৎক্ষণাৎ হুকুম করল সেগুলো খুলে জুতো জোড়ার পাশে রেখে দিতে। পরনের লাল স্কার্টটার দিকেও দেখল। খুবই দামী জিনিস। স্টেনব্রেনার দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসল। কিন্তু মুয়েক সেটা আর খুলতে বলল না। কি জানি, রায়ে হয়তো বা জানালা দিয়ে সব দেখছে। তাছাড়া, মেয়েদের স্কার্ট দিয়ে হবেই বা কি। সে পিছিয়ে এল।

মেয়েটা গড়গড় করে রাশিয়ান ভাষায় একগাদা কথা বলে গেল। 'জিজ্ঞেস করো তো মেয়েটা কি চাইছে?' লেফটেন্যান্ট ম্যুলের জানতে চাইলেন। তার মুখটা বিবর্ণ। এই প্রথমবার তিনি এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

মুয়েক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধ রাশিয়ান জবাবে বলল, 'কিছু চায় না মেয়েটা। সে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।'

'কী?' চেঁচালেন ম্যুলের কিছু না বুঝেই।

'অভিশাপ দিচ্ছে তোমাকে মেয়েটা', রাশিয়ান বৃদ্ধও চেঁচিয়ে বলতে লাগল। অভিশাপ দিচ্ছে তোমাকে, সমস্ত জার্মানদের, যারা রাশিয়ার পবিত্র ভূমির ওপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।' মেয়েটা তোমাদের ছেলেপুলের অভিশাপ দিচ্ছে। বলছে যে একদিন তার সন্তানরাও তোমাদের সন্তানদের এমনি করে গুলি করে মারবে যেমন আজ তোমরা তাকে গুলি করে মারছো।'

'কি আস্পর্ধা। মুয়েক যুবতীর দিকে তাকালো।

'মেয়েটার দুটো ছেলে আছে।' বৃদ্ধ রাশিয়ান বলছিল, 'আর আমার তিন ছেলে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, মুয়েক।' ম্যুলের কিছুটা বিচলিত। 'আমরা কেউ পুরুত ঠাকুর নই। অ্যাটেনশান। এভরিবডি।'

সৈনিকরা রাইফেল হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রেবার হাতের দস্তানা খুলে ফেলেছে। ঠাণ্ডা লোহাতে তার মনে হল যেন বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা খসে পড়ে যাবে। পাশেই দাঁড়িয়েছে হার্শল্যান্ড। গ্রেবার একেবারে বাঁ-দিকের রাশিয়ান-টিকে তাক করল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেম সেই মেয়েটার কথা। প্রথমবার গুলি না লাগাতে মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, অন্ততঃ দু-এক মিনিটের জন্যে প্রাণ ভিক্ষে দেওয়ার। যাকগে, সেসব আর এখন মনে করতে চায় না সে।

'লক্ষ্য স্থির করো।' আদেশ হল।

গ্রেবার দেখল যে হার্শল্যান্ড মাথার দিকে তাক করেছে। সে চাপা স্বরে তাকে বলল, 'মুয়েক দেখছে। বুকের দিকে তাক করো।' হার্শল্যান্ড নলটা নিচু করে ধরল।

'ফায়ার !' হুকুম হলো।

রাশিয়ানটা যেন গ্রেবারের দিকে ছুটে আসতে চাইল। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। তারপর ঘুরে কবরের মধ্যে পড়ে গেল। বুড়ো রাশিয়ানটা অর্ধেক কবরের দিকে অর্ধেক বাইরের দিকে যেন দুলতে লাগল। পা দুটো ওপর দিকে তুলে উল্টে পড়ল। বাকী দুজন সেখানেই ঢলে পড়ল বটে, একজন শেষ মুহূর্তে দু'হাত তুলে যেন মুখটা বাঁচাতে চাইছিল। কারুরই হাত বা চোখ বাঁধা হয়নি। সবাই ভুলে গেছিল আর কি।

যুবতী সামনের দিকে পড়ল। মরেনি তখনও। হাতে ভর দিয়ে উঠে মুখ তুলে সৈন্যদলের দিকে তাকালো। ষ্টেনব্রেনারের মুখে খুশীর আভা। অন্য কেউ আর গুলি করেনি মেয়েটাকে। মেয়েটার পেটে গুলি লেগেছে। ষ্টেনব্রেনারের তাক একেবারে নির্ভুল।

বৃদ্ধ রাশিয়ানটা গর্তের মধ্য থেকে কি একটা যেন ছুঁড়তে চাইল। তারপর স্থির হয়ে গেল। শুধু মেয়েটো তখনও ওপরে হাঁটু মুড়ে পড়ে আছে। আর মুখটা তুলে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে যেন ফুঁসছে আহত সাপের মতো। বুড়ো রাশিয়ানটা মরে গেছে। মেয়েটা কিসব বলছে বোঝার আর কোন উপায় নেই। মুয়েক তখন এবমুখ বিরক্তি নিয়ে পাশ থেকে এগিয়ে এল। মেয়েটা অনবরত কিসব বলে যেতে যেতে শেষ মুহূর্তে রিভলবারটা দেখতে পেলো। হঠাৎ ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে এসে মুয়েকের হাত কামড়ে ধরল। মুয়েক যন্ত্রণায় একটা কাঁচা খিস্তি করে অন্য হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেয়েটার মুখে ঘুষি মারল। কামড়টা আলগা হয়ে যেতেই রিভলবারের নলটা মেয়েটার ঘাড়ে ঠেকিয়ে গুলি করল।

'কি বাজে তাক করেছিল, অ্যাঁ', 'ম্যুয়ের গর্জে উঠলেন, 'রাইফেল তাক করতেও এখনও শেখোনি ?'

'হার্শল্যান্ড গুলি করেছিল, স্যার !' ষ্টেনব্রেনার নালিশ করল।

'মোটেও হার্শল্যান্ড নয়, 'গ্রেবার বলে উঠল।

'চোপরাও !' মুয়েক চেঁচিয়ে উঠল, 'যখন বলতে বলব, তখন বলবে।'

ম্যুলেরের দিকে তাকাল সে। তাকে খুবই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। স্থির দাঁড়িয়ে ছিল সে। মুয়েক অন্য রাশিয়ানগুলোর দিকে তাকাল। তারপর একজনের কানের পেছনে রিভলবারের নলটা ঠেকিয়ে গুলি করল। অল্পবয়সী দুজনের একজন ছিল সে। মাথাটা তার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। মুয়েক রিভলবারটা খাপে রেখে হাতের দিকে তাকাল। মেয়েটা যা কামড় বসিয়েছিল! পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিল সে।

'একটু আয়োডিন লাগিয়ে দাও', ম্যুলের বলল। 'দাবাখানাটা কোথায় ?'

'তিন নম্বর বাড়িতে, ডানদিকে স্যার।'

'যাও, এক্ষুণি চলে যাও।'

মুয়েক চলে গেল। মুলারের মত রাশিয়ানদের দিকে তাকালেন। যুবতী মেয়েটা উপুর হয়ে ভিজে মাটির ওপর পড়ে আছে। 'গর্তে ফেলে দাও। তারপর চাপা দিয়ে দাও।' হঠাৎ তিনি ভীষণ রেগে গিয়ে বলে উঠলেন। রাগ যে কেন হলো, তা অবশ্য বুঝতে পারলেন না।

□ দুই □

সে রাত্রে পদাতিক বাহিনীর গোলা বর্ষণে দিগন্তের আকাশ ঘন ঘন আলোকিত হয়ে উঠছিল, কাঁপছিল। রাশিয়ানরা এগোচ্ছে। বারে বারে পাল্টাতে হচ্ছে সীমানা। রাশিয়ানরা গত ক'মাস ধরে ক্রমাগত আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে আসছে। জার্মান বাহিনীও পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

গ্রেবারের ঘুম ভেঙে গেল। চাপা গুমগুম আওয়াজটা হচ্ছেই। পাশ ফিরে ফের ঘুমোতে চাইল। কিন্তু বৃথা। চট করে উঠে জুতো জোড়া পরে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আকাশে অগুণিত নক্ষত্র। পরিষ্কার রাত্রি। ঠাণ্ডাও তেমন নেই। ডানপাশের জঙ্গলের ওপাশ থেকে গোলাগুলি বিস্ফোরনের আওয়াজ আসছে। হঠাৎ হঠাৎ আকাশের বুকে জ্বলে উঠছে প্যারাস্যুট। জ্বলতে জ্বলতে পড়ছে চারদিক আলো করে যেন এক একটা জেলিমাছ। সার্চলাইটের তীক্ষ্ন রশ্মিগুলো বোমারু বিমানের খোঁজে আকাশের বুক চিরে চিরে ফেলছে। তবুও গ্রেবারের মনে হলো, তারাভরা আকাশের নীচে এমন নির্মল রাতই শত্রুঘাটিতে হানা দেবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

'ছুটি পাওয়া লোকদের পক্ষে চমৎকার রাতটা, কি বল?' পাশ থেকে কথাগুলো কে একজন বলে উঠতেই চমকে মুখ ফেরালো গ্রেবার। ইমারমান। সান্ত্রীর পোশাকে, রাইফেল হাতে। সেনা বাহিনীকে যদিও সীমান্ত ছেড়ে অনেক ভেতর দিকে নিয়ে আসা হয়েছে, তবে আশে পাশে গেরিলারা থাকতেই পারে। তাই পাহারার ব্যবস্থা।

প্রায় শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ইমারমান বলল, 'এত আগেই যে উঠে এলে গ্রেবার? তোমার পালা আসতে তো এখন আধ ঘণ্টা দেরী আছে। যাও, ঘুমোও গে। সময় মত ডেকে দেবো আমি।'

'আর ঘুম হবে না!'

কেন ? ছুটির আনন্দে ?' ইমারমান হালকা স্বরে বলল। 'তবে, এটা বলবই হয় এ সময় ছুটি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

'ভাগ্য ফাগ্য নয় রে ভাই, খুঁটির জোর। তবে ছুটি তো আমি পাইনি অনেকদিন। এবারও যে শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেবে না, তা কে বলতে পারে। আগেও তিন তিন বার এমন হয়েছে।'

'হুঁ। অসম্ভব নয় মোটেও। তোমার ছুটি পাওনা আছে কতদিন ?'

'আরে, সে অনেক ক'মাস। প্রত্যেক বারই তো একটা না একটা ছুতো করে বাতিল করে দিয়েছে। শেষ বার তো ক্ষতস্থানটা এমন চাপিয়ে উঠল যে তাই নিয়ে বাড়ি যাওয়া উচিত হবে না বলে ছেড়ে দিলাম।'

'তোমার তো মনটা শক্ত আছে। আমার কিছু নেই। শুধু বীরের মৃত্যু কপালে আছে, তাই। কামানের খাদ্য, তারপর আমার হাড়ের সার দিয়ে রাইসের উর্বর মাটি আরও হাজার বছর ধরে।'

গ্রেবার চট করে একবার এদিক ওদিক দেখে নিল। ইমারমান হেসে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই! নাক ডাকাচ্ছে সব। ষ্টেনব্রেনার ব্যাটাও।'

'না, তো ভাবছি না।' খানিকটা রাগের স্বরেই বলল সে। কারণ ভয় সে তো পাচ্ছিলই।

'একা তুমি নও, গ্রেবার', ইমারমান হেসে বলল, 'হাড়ে হাড়ে ভয় ঢুকে গেছে এখন আমাদের সবার। গুপ্তচরদের যা বাড় বাড়ন্ত হয়েছে, ভয় পাবার কথাই।'

'সবই যদি জানো, বোঝো তো, ওই ষ্টেনব্রেনারকে এড়িয়ে গেলেই হয়।' বিরক্তির স্বরে বলল গ্রেবার।

'দূর। ও শালাকে কে পাত্তা দেয়। আমার চেয়ে ও তোমার ক্ষতি বেশী করতে পারে। আমি ওর পরোয়া করি না। বেশী বেশী লেজ নাড়লে কর্তাদের বিষ নজরে পড়তে হয়। প্রাক্তন পার্টি সদস্যদের জন্যে এটা পুরোনো নিয়ম। সন্দেহ যাতে না হয়। মানো কি না ?'

গ্রেবার হাত ঘষে বলল, 'বড় ঠাণ্ডা।' রাজনীতির আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে চায় না সে। যে ভাবেই হোক ছুটি তার চাই ওটা বেঁচে যাবে তেমন কিছু করতে রাজী নয় সে। হিটলারের রাজত্বে নিরাপত্তা বলতে কারো কোথাও কিছু নেই। কাজেই মুখ বন্ধ করে রাখাই ভাল।

'শেষ কবে বাড়ি গেছেন ?

'বছর দুই আগে।'

'তাহলে তো এত সব পাল্টে গেছে যে ধারনাই করতে পারবে না।' ইমারমান বলল।

'পাল্টে গেছে কি রকম ?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'নিজের চোখেই দেখবে।'

ভয়ের তীক্ষ্ণ ছুরিটা পেটের মধ্যে বসে গেল। অনুভব করল গ্রেবার। মাঝে মাঝেই এমন অবশ্য হয়। বিনা কারণেই হয়। দীর্ঘদিনের অনিশ্চিত জীবন, আতঙ্কের জীবন যাপনে এমন অনুভূতি হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।—'তা তুমি জানলে কি করে? তুমি তো ছুটি নাওনি কখনও?'

'না। কিন্তু আমি জানি। এখানে তুমি যতটুকু কাজ করো শৃঙ্খলা শিবিরে তার চেয়ে অনেক বেশী শুনতে পাওয়া যায়।

গ্রেবার উঠে দাঁড়াল। কেন যে মরতে এখানে এল। একটু একা থাকতে চায় সে। নির্জনে বসে চিন্তা করতে চায়। এখানে নয়। বাড়িতে, যুদ্ধের আবহাওয়ার বাইরে থেকে।—পালা বদলের সময় হলো। আমি যাই। সোয়েরকে জাগিয়ে দিই।

সারারাত ধরে কামানের গর্জন চলল। দিগন্তের আকাশ লালে লাল। এক চল্লিশ সনে ফুয়েরার ঘোষনা শোনা গেছিলো যে উল্কার গতিতে আমরা এগোচ্ছি। বেয়াল্লিশের শীতের আগেও তাই। কিন্তু সহসা মস্কো আর লেনিনগ্রাদের কামানের শব্দে ফুয়েরারের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। যেন যাদুর খেলা। ইউরোপের আকাশ জুড়ে রাশিয়ার কামানের গোলা। গুজব রটে গেল যে পেছনের জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত; আগের দল বিচ্ছিন্ন। জার্মান সেনারা পালাচ্ছে। বিজয় তখন দূর অস্ত। কায়রোতে পেঁছিবার আগেই যেমন জার্মানদের আফ্রিকা থেকে পালাতে হয়েছিল, এখানেও তাই ঘটল।

গ্রামের পথে ঘুরে চলল গ্রেবার। ছাড়া ছাড়া তুষার পড়ছে। বাড়ি ঘর টিলা, জঙ্গল সব কেমন রহস্যময়। বাতাসে আতঙ্ক। বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল অজানা ভয়ে। মনে পড়ল চল্লিশ সনের ফ্রান্স অভিযানের কথা। হুড় হুড় করে ঢুকে যাচ্ছে ফ্যাসিস্ট বাহিনী। কোনই প্রতিরোধ নেই। পাগল স্তুকাসের উল্লাস অলি গতিতে ধ্বনিত হচ্ছে। মুমূর্ষ জনতার দল, ছেলে বুড়ো বুড়ি শিশু যে যেমন ভাবে পারে পালাচ্ছে। একসময় আলোকিত, ঝলমলে রূপসী প্যারিসের পথও খুলে গেল উন্মত্ত জার্মান বাহিনীর জন্যে। তখন তো যন্ত্রনায় বুকের ভেতরটা এমন কুঁকড়ে ওঠেনি। যুদ্ধবাজদের সঙ্গে জার্মানী যে তখন এক সুতোয় বাঁধা। সবই তখন স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।

তারপর আফ্রিকা। দুর্বার গতিতে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। ট্যাঙ্কের ঘড় ঘড়। তারপর একসময় পিছিয়ে আসা। বিদেশের ভূমি। মধ্যে ভূমধ্যসাগর। পার হয়ে ফ্রান্স। তারপর জার্মানীতে ফেরা। তখন তো এতসব কথা মনে হয়নি। যত শক্তি মানই হোক, সর্বত্রই সে জিতবে, তাতো হয় না।

তারপর এই রাশিয়া। রাশিয়া এবং পরাজয় এবং পলায়ন। মাঝে সমুদ্র নেই,

তাই সোজা জার্মানী। আফ্রিকার মতো নয় এখানে গোটা বাহিনীকেই ফিরে যেতে হচ্ছে। এমনই হয়। যখন জেতার পালা চলে, তখন সব স্বাভাবিক মনে হয়। তখন এর অমানুসিক দিকটা নজরেই পড়ে না। অথচ একটা অন্ধকারের ছায়া তো ঘিরে থাকেই। এমনভাবে কি সে আগে কখনও ভেবেছে? সন্দেহের কাঁটা খরখর করে বেঁধেনি? বিরক্তি আর হতাশার মুহূর্তগুলোকে বারবার দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়নি?

সোয়েরের কাশির শব্দ শুনতে পেয়ে খসে পড়া ঘরগুলো এগিয়ে যেতে দেখা হল তার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরনের শব্দ হলো। দূরের আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেল। 'এটা কি রাশিয়ানদের গোলা?' গ্রেবার জিজ্ঞেস করল।

সোয়ের বলল, না। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা ওই জায়গাটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে আরকি!'

'অর্থাৎ, আরও পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল সোয়ের, 'একটা আস্ত বাড়ি আর দেখলাম না। তুমি তো দেশে যাচ্ছো! দেখতে পাবে।'

'হ্যাঁ। ঈশ্বরের কৃপা। গ্রেবার বলল।

সোয়ের জ্বলন্ত শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগল, একেক সময় মনে হয়, যে ভাবে আমরা রাশিয়াকে ধ্বংস করছি, একদিন সীমান্ত পার হয়ে ওরা যদি আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে, তখন? ভেবেছ কখনও, কি হবে?'

'না।'

'আমি ভেবেছি। আমাদের একটা খামারবাড়ি ছিল পূর্ব এশিয়াতে। ১৪সনে রাশিয়ানরা যখন এলো, আমরা সবাই সেখানে চলে গেছিলাম! আমার তখন মাত্র দশ বছর বয়েস।'

'সীমান্ত থেকে অনেক দূরে এখনও! গ্রেবার বলল।

'আরে তাতে কি? প্রথম দিকে আমরা কেমন বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়েছিলাম, মনে আছেই?'

'না। আমি তো তখন আফ্রিকায়।'

সোয়ের আবার দক্ষিনের আকাশে তাকালো। আগুনের দেয়াল উঠছে তো উঠছেই প্রবল বিস্ফোরনের সঙ্গে। আমরা কি করছি একবার দেখো! এখন ভাবো একবার যে রাশিয়ানরাও একই রকম করছে আমাদের দেশে। কতটুকু বাঁচবে?'

'এখনকার চেয়ে বেশী কিছু নয়।'

'ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছি। এভাবে আমরা যদি পিছু হটতে থাকি তো তাই ঘটবো।'

'আগে সীমান্ত অব্দি আসুক তো। তুমি ফুয়েরারের বক্তৃতা শুনেছ? গোপন অস্ত্র এলে গোপনেই সুযোগ বুঝে ফের আক্রমন করবো।'

'কচু করবে! ওসব ছাগল মার্কা কথায় কে বিশ্বাস করে? তাহলে হড়বড় করে প্রথমেই এতোটা এগোলাম কেন? আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে: সীমান্তে গিয়েই সন্ধির প্রস্তাব করব আমরা।'

'সেকি। কেন?'

'তুমি কেমন বোকচন্দর হে? যাতে আমরা ওদের যা অবস্থা করেছি, ওরাও তা না করে! এটা বুঝতে পারছ না?'

'তা বুঝেছি। কিন্তু ওরা যদি শান্তি প্রস্তাবে রাজী না হয়?'

'কেন হবে না? অস্বীকার করতে পারবে না রাশিয়া! আমাদের প্রস্তাব মানতেই হবে। আসল কথা, শান্তি। যুদ্ধ থাকবে। আমরাও বেঁচে যাব।'

'আমরা আত্মসমর্পন করলে ওরা শান্তি চাইতেও পারে। তখন গোটা জার্মানী ক্যাম্প করে বসে পড়বে, তোমার খামার বাড়িটাও যাবে।

সোয়ের কতক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমরা আত্মসমর্পন করলে দেখবে যে ওরা কিছু আর ধ্বংস করবে না। তারপর একসময় তো জার্মানী ছেড়ে চলে যাবেই ওরা। তখনই আমাদের জিত হবে সত্যিকারের।'

গ্রেবার আর কিছু বলল না। বরং নিজেকেই মনে মনে তিরস্কার করল: কেন যে এতকথা খামোখা বললাম। এরকম বিপজ্জনক পরিবেশে এসব কথা বলা বোকামি আর কোন বলল না সে।

উল্টোপথে এগিয়ে চললো গ্রেবার। গির্জাটার দিকে নজর পড়ল। চূড়াটা নিশ্চিহ্ন। বুলেটের বৃষ্টিতে অসংখ্য ছিদ্র সারাটা দেয়াল জুড়ে। পোকায় কাটা আলপাকার কোটের মত দেখাচ্ছে। হা-হা করছে দরজার খোলা মুখটা। ওখানেই লেফটেন্যান্ট রাইকের দেহটা রাখা হয়েছে। সে ছাড়াও পরে উদ্ধার করা আরও দুটো মৃতদেহ রয়েছে। একজনের তো চোখ মুখই নেই। পেটটাও খোদল করে দিয়েছে শেয়াল বা ইঁদুরে। সনাক্ত করা যায়নি স্বভাবতই। তবে তিনজনকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় কাল সকালে কবর দেওয়া হবে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গ্রেবার ফিরে চলল।

মাঝে মধ্যে অনেক দূরের কোন গ্রাম থেকেই বুঝি কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। তা ছাড়া চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। আলো নেই, সবই যেন অপরিবর্ধিত লাগছে। চারপাশে মৃত্যুর করাল ছায়াটা ঘন হয়ে আসছে। প্রথম দিকে নতুন বাহিনী গড়তে হচ্ছে। পুরনো সাঙাৎদের কেউ নেইই বলতে গেলে। কেবল ফোর্থ কোম্পানীর ফ্রাজেনবুর্গ ছাড়া। বাকিরা মরেছে, নয় হাসপাতালে পচছে। অনেকে

বদলি হয়েছে বা পঙ্গু হয়ে রেহাই পেয়ে গেছে।

পায়ের শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখল সোয়ের আসছে। 'কি সোয়ের, খবর কি?'

'তেমন কিছু না। কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে যেন শুনতে পেলাম একটু আগে গীর্জার সামনের মাঠে।'

'হবে ওই ইঁদুর বা শেয়ালগুলো। মড়ার গন্ধে চারপাশে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে।'

সোয়ের ভয় পেয়েছিল খুব। এবার শান্ত হলো। কবরের উঁচু জমির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ভেলল, 'তবু ভাল, কবরের মাটিতো পেলো শেষ পর্যন্ত।

গ্রেবার একটু অবাক হয়েই সোয়েরের দিকে তাকালো। সোয়ের পুরোনো ঝানু সৈনিক। ভাবালুতা ওর মধ্যে থাকার কথাই নয়। তবে রাতের অন্ধকারের বোধহয় বৈশিষ্ট্যটাই এই। দিনের কঠোর রূঢ় মানুষটারও মনের কোমল দিকটা উদ্ভাসিত করে তোলে। এই দীর্ঘশ্বাস বুঝি তারই ফল। অপরকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবার সময় তো বোঝা যায় না যে নিজের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটলে কেমন লাগতো। যাক ওসব আর এখন ভেবে কি হবে।'

ঠিক বলেছ, গ্রেবার। আমরা দুজনে তো আর এই যুদ্ধটা বাধাইনি, কাজেই দায়ী তো আমরা নই। আমাদের কেবল কর্তব্য পালন করে যাওয়া, তাইনা?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।' গ্রেবার দূরের গভীর অন্ধকারের দিকে ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল।

□ তিন □

প্রবল গোলা বর্ষণের সঙ্গে ধুলো ঝড় গোটা আকাশটাকে ঘোলা করে দিয়েছে। এদিক ওদিক বসে থাকা কাকগুলো আর ওড়বার চেষ্টা করেনা। বসে বসেই তার-স্বরে চেঁচায়। গোলার আওয়াজের চেয়ে চিৎকারের শব্দও তাদের কম নয়। ওদিকে তিনজনেরই দেহগুলো কবরের মধ্যে নামানো হয়েছে। রাইকের দেহটা গির্জা থেকে আনার সময় বিচ্ছিন্ন সবুট পা'টা একদিকে গড়িয়ে গেছিলো। ঠিক করে দেয়নি কেউ।

কবরগুলো বুজিয়ে দেবার পর আলগা মাটি কিছু থেকে যেতে মুয়েক লেফটেন্যাণ্ট ম্যুলেরকে বলল, 'মাটিগুলো পিটে দেবো, স্যার। নেকড়ে বা শেয়ালে খুঁড়ে বার করতে পারবে না?'

ম্যুলের বলল, 'কি দরকার। তা তোমার প্রাণ চায় করো। ক্রশগুলো বরং

ভাল করে গেড়ে দিও।' বলে সে অন্য সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেতে বললেন। সোয়ের, ইমারমান আর গ্রেবার শুধু মাটি সমান করার জন্য থেকে গেলো।

'যা নরম মাটি, ক্রশগুলো ক'দিন থাকবে কে জানে।' সোয়ের বলল, 'মনে হচ্ছে দিন তিনেক বড় জোর।'

ইমারমান টিপ্পনী কাটল, 'রাইকে তোমার কানে কানে বলে গেল বুঝি?'

'চোপ বাঁদর। তুই কি জানিস রে, ওর সম্বন্ধে? পীড়ন-শিবিরে খুব পীড়িত ছিল বুঝি ওর সঙ্গে তোর?'

ইমারমান ঘরে গেল হঠাৎ। 'তুই কি জানিসরে ওখানকার কথা। তোর চেয়ে ঢের ভাল লোকেরা ওখানে ছিল, বুঝলি।'

বেগতিক দেখে গ্রেবার বলে উঠল, 'ওসব এঁড়ে কথা না বলে ক্রশগুলো বসাও তো, বাপধনেরা।'

ইমারমান মুখ ঘুরিয়ে ফিক করে হেসে বলল, 'আহারে। বাড়ির জন্যে মনটা বেচারার আঁকুপাকু করছে।'

'সে জন্যেই তো তুই হিংসেয় মরছিস।' সোয়ের খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

'ওরে বাঁদর, আমার ছুটি পাওনা নেই, তা জানিস না।'

থক করে একদলা থুতু ফেলল সোয়ের।

ইমারমান মুখ কুঁচকে বলল, 'ছুটিতে গেলেও ফিরে আসতুম হয়তো আমি একাই। অন্যরা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করত।'

'কে জানে, আসতো কিনা। মনের কথা তো সহজে জানা যায়না।' সোয়ের বলতে ছাড়ল না।'

ওদের ঝগড়া থামতেই গ্রেবার একটা ক্রশ এনে পুঁতে দিল। সোয়ের তার ওপর বেলচার ঘা মেরে আরও গেঁথে দিল ক্রশটা। 'শালা, তিনদিনও টেঁকে কিনা দেখো।'

ইমারমান সুযোগ ছাড়লো না। বলল, 'ওই পাথরের ক্রশ একটা তুলে এনে পুঁতে দিলে ভাল হয় না। তাতে শ্রমটাও সার্থক হবে, মৃতের আত্মাও শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।'

সোয়ের অবাক হয়ে বলল, 'ওই রাশিয়ান ক্রশটা?'

'হ্যাঁ, তাতে কি? ভগবান আবার রাশিয়ান জার্মান হয় নাকি?'

'হয় না বুঝি? তবে কি তিনি তোমার মত বিশ্বপথিক ট্যামনা হলো?'

'হলে ভালই হতো।'

'তোমরা প্রাণ ভরে তর্ক করো, আমি চললাম।' গ্রেবার বেলচা তুলে নিল।

ইমারমান হেসে ফেলল। 'বেচারার সত্যিই বাড়ির জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

বাহিনীর সবাই মাটির তলার ঘরটাতে আশ্রয় নিয়েছে। বেশ বড় ঘড়টা। মোজেক করা মেঝে। বড়লোকের সম্পত্তি ছিল নিশ্চয়ই। চারজন একদিকে স্কাড মেলছে। দুজন এক কোনে ঘুমুচ্ছে নাক ডেকে। সোয়ের মেঝেতে উবু হয়ে বসে চিঠি লিখছে।

ব্রস্ত পায়ে ষ্টেনব্রেনার ঢুকল।' আজকের শেষ খবরটা শুনেছ কেউ?'

'না। রেডিও খারাপ।'

'ওহ্। রেডিওটা একটু ঠিক রাখতে পারো না।'

'আহরে, বড় আঁটা দেখছি।' ইমারমান ঘেংড়ে উঠল, 'তুমিই ঠিক করে নাওনা। যার চার্জে ছিল সে তো দু' হপ্তা আগেই অক্কা পেয়েছে।'

'হয়েছে কি রেডিওটার?'

'ব্যাটারি নেই।' বেরনিং বলল।

'ব্যাটারি নেই?'

'আজ্ঞে তাই।' ইমারমান ফের দাঁত চিবিয়ে বলল, 'এক কাজ কর না, তোমার নাকের ফুটো দিয়ে তার ঢুকিয়ে তোমার মগজে তো ঘিলু নেই, বিদ্যুৎ আছে। রেডিওটা দিব্যি চলতে আরম্ভ করবে।'

ষ্টেনব্রেনার থমকে গিয়ে তাকিয়ে দেখে বলল, 'বড্ড তেলানি বেড়েছে। দাওয়াই দিতে হবে।

'যা না, আগেও লাগানি ভাঙ্গানি করছিস আমার নামে, আবার করগে যা।' ইমারমান মুচকি হেসে বলল, তবে জেনে রাখো, খোকা. আমার মত মেকানিক আর মেশিন চালানোতে দক্ষ কেউ নেই এখানে। সেটা তোমার কর্তারা ভালই জানে, বুঝলে। তোমার মত সদ্য মায়ের মাই খাওয়া দুগ্ধ পোষা শিশুর চেয়ে আমার প্রয়োজনটা এখানে অনেক বেশী। বলি, বয়সটা কত হল, বাছা তোমার? কুড়ি হয়েছে, না উনিশ? এর মধ্যেই খোসামোদ করার বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছ তো। ইহুদিদের ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিলো। ছ্যা, ছ্যা, কি জঘন্য প্রজন্ম। বড় হবার আগেই তো পুরো জন্তু হয়ে যাবি রে তোরা। অথচ তোদের বয়সে আমরা মেয়েদের নিয়ে মশগুল থাকতাম।'

'হুঁ, তাতো বুঝতেই পারছি।'

'তুই আমার চ্যাট বুঝতে পারছিস্। তুই তখন জন্মাসনি, বুঝলি।'

এই সময় মুয়েক এসে উপস্থিত। 'কি ব্যাপার, চেল্লামেল্লি কিসের এতো?'

সবাই চুপ। বেশ জমছিল। দিলে শালা সব ভেস্তে।

বেরনিং ধীর স্বরে বলল, এমনি গল্পসল্প হচ্ছিল।'

ষ্টেনব্রেনারের দিকে তাকালো মুয়েক অবিশ্বাসের চোখে।

'শেষ খবরের ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম।'

ম্যুয়েক বিশ্বাস করল না ? গর্জে উঠল, 'গ্যুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। সবাই শোন। সামরিক নির্দেশ এটা, মনে রেখো ! অ্যাটেনশান !'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাই উঠে দাঁড়াল।

ষ্টেনব্রেনার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমেরিকাতে সব কারখানায় ধর্মঘট। মন্দা লেগেছে ইস্পাত শিল্পে···যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বানানোর কাজ বন্ধ···বিমানের কারখানাতে সাবোটাজ হয়েছে···সবাই শান্তি চাই বলে মিছিল বের করছে···শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে···'

ম্যুয়েক লম্বা শ্বাস ফেলল। ওপর থেকে গ্যুড়ো বরফ পড়ল ঝুর ঝুর করে। ষ্টেনব্রেনার বলতে লাগল ঃ

'···আমার কথা যে আমাদের ডুবো জাহাজগুলো আমেরিকার সমুদ্র উপকুল প্রায় ঘিরে ফেলেছে··· সৈন্য বোঝাই দুটো জাহাজ আর অস্ত্র বোঝাই তিনটে বিমানকে ঘায়েল করে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের অপরাজেয় সেনারা জাহাজ চলাচল রুখে দিয়েছে। ওদিকে ইংল্যান্ড না যেতে পেয়ে বুঝবে। গোপন অস্ত্রের পরীক্ষা আমাদের সফল হয়েছে। অব্যর্থ রণ কৌশলে আমরা অপ্রতিহত ভাবে এগিয়ে চলেছি। এখন আমাদের বোমারু বিমানগুলো না থেমে আমেরিকাতে গোলাবর্ষণ করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারছে। আটলান্টিক সাগরের উপকুলে আমাদের ঘাঁটি এখন দুর্ভেদ্য। শত্রু আক্রমন করলে তাদের হাটিয়ে দিতে পারবো সমুদ্রের গভীরে। হেইল হিটলার।'

'হেইল হিটলার।' কোন মতে কয়েকজন প্রতিধ্বনি করল মাত্র।

ম্যুয়েক চলে গেল।

ইমারমান হঠাৎ বলে উঠল, 'মহামান্য পার্টি মেম্বারকে রাশিয়ার খবর জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?'

'কেন শুনি ?' ষ্টেনব্রেনারের স্বরে রাগ।

'আমরা এখন রাশিয়াতে তো। জানলে কারো কাজে লাগতেও পারে। ওই গ্রেবার ছুটিতে যাচ্ছে। ওর উপকার হতে পারে।'

ষ্টেনব্রেনার কি ভাবল। ইমারমানটা হারামজাদা। তবু সতর্ক হয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগল ঃ 'এখানকার রনাঙ্গন ছোট হয়ে আসছে। ক্ষয় ক্ষতিতে রাশিয়ার এখন দেউলে অবস্থা। আমাদের বাহিনী সাজানো হচ্ছে। নতুন অস্ত্র সম্ভার এলেই ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ব।···এর চেয়ে বেশী আর কিছু বেতারে বলা যায় না। তাতে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই বছরেই যে আমরা তাদের পরাস্ত করব, তাতে কোন সন্দেহ নেই।' কথা গুলো বলেই চলে গেল ষ্টেনব্রেনার।

'শুয়োরের বাচ্চা!' ঘুমন্ত দুজনের একজন যে কখন জেগে গিয়েও ঘাপটি

মেরে পড়েছিল, কেউ জানতে পারেন। সবাই তাকিয়ে দেখল সে আবার পাশ ফিরে শ্বতে শ্বতে বলছে, 'শালা খানকির বাচ্চা, কাঁচা ঘ্বমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে।'

আবার তাস খেলা চলতে লাগল প্বরোদমে।

আহত সৈন্যদের নিয়ে একটা গাড়ি এল বিকেলে। কয়েকজনকে সেই গাড়িতেই সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যারা রইল তারা সব চুপচাপ। ক্ষিদে তেষ্টায় নেতিয়ে পড়েছে। কয়েকজনের জর্বরী অস্ত্রোপাচার দরকার। তাদের ওই জারের আমলের গির্জাতে নিয়ে আসা হল। ছাদটা নেই গির্জার। তব্ যথেষ্ট আলোর জন্যে ভাঙ্গা জানালা কপাটগ্বলো খ্বলে দেওয়া হলো। ডাক্তার নিজেই ক্লান্ত। সহকারী কয়েকজন আছে অবশ্য। দেয়ালের গায়ে মেরী আর যীশ্বর ম্বর্তি। যীশ্বর দিকে দ্ব'হাত বাড়ানো মেরীর হাত দ্বটোই ভেঙ্গে গেছে। যীশ্বর তো একটা পা-ই নেই। বড় কেটলীতে জল ফুটছে। একটা কুকুর কোথ্‌থেকে এসে হাজির। যত তাড়ায় ততই ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ায়।

গ্রেবার আর ফ্রজেনব্বর্গ, ফোর্থ কোম্পানীর কম্যাণ্ডার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

কুকুরটাকে দেখে গ্রেবার বলে উঠল, 'কোথেকে এলো এটা। জঙ্গলে থেকে নাকি। ফ্রজেনব্বর্গ বলল, 'না, জাতের কুকুর মনে হচ্ছে। বোধহয় আহতদের কাউকে অন্বসরণ করে এসেছে।'

গ্রেবার বলল, 'মান্বষ খেকো মনে হচ্ছে।'

'আমারাও তো এখন মান্বষ খোকাই বলা যায়। কী জীবন আমরা যাপন করছি গত দশ বছর ধরে। এই নরকের মধ্যে থেকে আমরা কি আর মান্বষ আছি! হয়ে যাইনি নরখাদক। আমরা জাতিশ্রেষ্ঠ আর্যজাতি আজ কাদের বসিয়ে দিয়েছি সিংহাসনে। যত সব শোষকের দল। আর তাদেরই ক্রীতদাস হয়ে আমরা যত রকমের জ্বয়াচুরী, ভণ্ডামি সব মেনে নিচ্ছি। বিনিময়ে কি এই জীবনই আমাদের পাওনা? এবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবার সময় এসে গেছে, গ্রেবার।

গ্রেবারের নিজের মনেও তো শতবার এসব প্রশ্ন জেগেছে। কিন্ত্ব উত্তর কে দেবে। ফ্রাজেনব্বর্গকে গ্রেবার আগে থেকেই চেনে একই শহরের অধিবাসী হিসেবে। বয়সে তার চেয়ে বড়ই সে। বিশ্বাসীও। নিজেয় মনের কথার প্রতিধ্বনি শ্বনে গ্রেবার অবাক হয়েও প্রশ্ন করল, 'সব জেনেও কেন এলে এই নরকে ফ্রজেনব্বর্গ?'

'না এলে গ্বলি করে মারতো, নয় তো বন্দি শিবিরে পচে যেতাম।'

'তোমার বয়সের কথা বলে তো এড়িয়ে যেতে পারতে?'

উনচল্লিশ সনে পারলেও এখন পারতাম না। এখন তো আমার চেয়ে বেশী বয়সীদেরও জোর করে পাঠানো হচ্ছে। তবে আসল কথা কি জানো, গদীতে যে যে হারামজাদারাই থাকুক, আমি জন্মভূমির এই বিপদে পালিয়ে বেঁচে থাকতে

চাইনি, চাইত না, তাই।'

গ্রেবার বুঝল। তার আর বলার কিছু নেই।

দিগন্তে তখন গোধূলীর রাঙা রঙ ধরেছে।

ফ্রজেনবুর্গ তাকালো গ্রেবারের দিকে। ম্লান হেসে বলল, এর্ণ্সট। হেরে গেছি আমরা এই যুদ্ধে। খামোখা আমরা এখানে লড়াই করছি—অর্থহীন। রাশিয়া আর সন্ধির কথাও বলবে না আমাদের সঙ্গে! সীমা অতিক্রম করে গেছি আমরা সেই হূন অ্যাটিলা বা মোঙ্গল জেঙ্গিজখানের মত অমানবিক ব্যবহার করেছি ওদের সঙ্গে। মানুষদের দাবী বা যুক্তি, সব আমরা তছনছ করেছি। আমরা অতি···

'আমরা না, ফ্রজেনবুর্গ, ওই এস, এস সৈন্যরা এরজন্যে দায়ী।' বলতে পেরে যেন হালকা হলো গ্রেবারের মনটা। ওর সঙ্গে যতটা মন খুলে বলা যায় ইমারমান, সোয়ের বা হার্শল্যাণ্ডের সঙ্গে তো তেমন বলা যায় না! অবশ্য এসব কথা সে মনে মনেই ভাবে সবসময়। এখানে প্রকাশ করা মানেই বিপদ ডেকে আনা। তবে ফ্রজেনবুর্গের কাছ থেকে তেমন বিপদের আশংকা নেই।

'ঠিকই বলেছ।' ফ্রজেনবুর্গ বলে উঠল, 'ওই এস এস গেষ্টাপো বদমাইশগুলোর জন্যে এমনও আমাদের যুদ্ধের ভান করে যেতে হচ্ছে। ওই শালা খুনে বজ্জাতগুলো যাতে লোভের গদী আঁকড়ে বসে থাকতে পারে, সেজন্যে আমরা অযথা প্রান দিচ্ছি। অথচ আসল কথাটা হলো যে যুদ্ধে আমরা অনেক আগেই পরাস্ত হয়ে গেছি।'

চরাচর জুড়ে অন্ধকার নামছে।গির্জার জানলা দরজা গুলো বন্ধ করে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যাতে বাইরের আলো না আসে। গ্রেবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরল ফ্রজেনবুর্গের সামনে।

'তুমি খাও। আমার অনেক আছে।' ফ্রজেনবুর্গ বলল।

'জানি। তবু একটা নাও আমার কাছ থেকে।' ফ্রজেনবুর্গ নিল। দুজনে সিগারেট ধরিয়ে টানল। বড় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গ্রেবারের মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। বিদেশী জিনিসটা বেশ ভাল।

'ছুটিতে যাচ্ছ কবে?' ফ্রজেনবুর্গ জিজ্ঞেস করল।

'জানিনা। কাগজপত্র কিছুই আসেনি। আর সত্যি বলতে কি, আমি আর এখন কিছু ভাবছিই না। সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে! এখন লজ্জা বোধই শুধু হয়।'

'যা বলেছ। আর এই লজ্জা তোমার একার নয়। আমাদের এই জঘন্য বর্বরতায় লজ্জিত আমরা সকলেই। প্রচারের ধুন্ধুমারে আমাদের এমন করে দিয়েছে যে অন্যকোন ভাল কথা আমরা আর শুনতেও পাইনা। ভাবতেও পারিনা কিছু সুস্থভাবে। যাক, তুমিতো পোলমালকে চেনো, তাই না?'

'অবশ্যই। উনি আমাদের ধর্মশাস্ত্র আর ইতিহাস পড়াতেন। আমার শিক্ষক।'

'ছুটিতে গিয়ে পারলে একবার দেখা করো। আমার কথা বলো। আমার তরফে প্রীতি শুভেচ্ছা জানিও। আশা করি এখনও বেঁচে আছেন তিনি।'

'উনি সৈনিক তো নন। বয়সও বেশী হবার কথা নয়। তাহলে বেঁচে থাকবেন না কেন? নিশ্চয়ই ও'কে তোমার কথা বলব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফ্রজেনবুর্গ। তারপর একটা উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'আমি এবার যাই, এর্ন্স্ট। আর হয়তো দেখা হবে না আমাদের।'

'তা বলছ কেন! আমার তো মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটি। ফিরে এসে নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

'হয়তো তাই।' ফ্রজেনবুর্গ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'এবার চলি। তোমার শরীরের দিকে খেয়াল রেখো, এর্ন্স্ট। বিদায়।'

'বিদায়।'

ফ্রজেনবুর্গ চলে গেল। ওদের বাহিনী পাশের গ্রামে একটা ভাঙ্গাবাড়ির নিচের কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে। গ্রেবার তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না ফ্রজেনবুর্গের ছায়া শরীরটা একেবারে মিলিয়ে যায়। তারপর গীর্জার দিকে তাকাল। সামান্য আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য দূর থেকে বা ওপর থেকে তা বোঝা যাবে না। নিজের ডেরার দিকে এগোলো গ্রেবার। গত অক্টোবরের যুদ্ধে মৃত আরও তিনটে দেহ গলা বরফের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আজ বিকেলে যে ক'জন মরেছে, তাদের দেহগুলোও পাশেই রাখা হয়েছে। ডান দিকে ঘুরেই হঠাৎ চমকে উঠল সে! জ্বলজ্বলে পান্নার মতো দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। হা-হা করে তাড়া দিল সে। জন্তুটা তখনকার মত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

□ চার □

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল সবার। থর থর করে কাঁপছে ঘরটা। কান পাতলো সবাই। দেওয়ালের চুন বালি খসে পড়ছে ঝরঝর করে। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট বা বিমান বিধ্বংসী কামানগুলোর একটানা কট্‌কট্‌ আওয়াজ। একজন রঙরুট ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরিয়ে এসো সবাই।'

'সাবধান! আলো জ্বালবে না কেউ।'

আবার একটা বিস্ফোরণ। মাটির নিচের ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। হুড়মুড় করে কি একটা ভেঙে পড়ল যেন অন্ধকারে। ওপরের ছাদের একাংশ ফেটে গেছে। ভোরের আলোর রেখা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

বাইরে থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'হুঁশিয়ার সব, হুঁশিয়ার।'

'কেউ চাপা পড়ল নাকি ?'

'না, না, পলেস্তারা খসে পড়েছে ওপর থেকে।'

দরজার সামনে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। আগের গলাটা ফের শোনা গেল ঃ 'ভেতরেই বসে থাকো। বাইরে এসে বোমার টুকরোয় ঘায়েল হওয়ার চেয়ে ওখানেই ভাল।'

তার কথা কানে নিল না অনেকে। শেষে মাটির নিচেই না সমাধি হয়ে যায়। অবশ্য ভাগ্যের জোর থাকলে সৈনিক বেঁচে যায়।

'আমাদের বিমানগুলো কি করছে। শত্রু বিমানগুলোকে তাড়া করছে না কেন ?' কে একজন বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'ইংলণ্ডে হাওয়া খাচ্ছে।'

'এই চোপ।' মুয়েক গর্জে উঠল।

ইমারমান বলে উঠল, 'না, না, স্তালিনগ্রাদে ফূর্তি করতে গেছে।'

'চুপ করে থাকতে পারো না।'

ষ্টেনব্রেনার বলল, 'ওইতো আমাদের বিমান।'

সকলেই কান পাতলো। গুমগুম শব্দ ছাপিয়ে মেশিনগানের আওয়াজ হতে লাগল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরনের আওয়াজ হলো। তিনবার। একেবারে কাছে। বিদ্যুতের মতো একটা আলোর ঝাপটা ঘরের অন্ধকারকে হালকা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা দিয়ে কি যে হোল যেন গোটা পৃথিবীটাই আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোথায় একটা দেওয়ালই বুঝি ধ্বসে পড়ল। বাইরে থেকে ভেসে এল আর্তনাদ। মুহূর্তের মধ্যে গ্রেবার বুকে হেঁটে ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে এল। গা থেকে ধুলো বালি ঝাড়তে ঝাড়তে সামনে তাকিয়ে সে যেন বোবা হয়ে গেল। শুধু গির্জাটা ছাড়া আর সব নিশ্চিহ্ন। বিধ্বংস পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই বোধহয়। না। ঢোকার পথটার কাছে কারা যেন নড়ছে। চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। মুয়েক দৌড়ে আসছে। তার কপাল থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে। একটা পাথর ছিটকে এসে লেগেছিল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল সে, 'সকলে বেরিয়ে এসো। কিন্তু বেরিয়ে আসবে কি করে। কে কে যে চাপা পড়েছে ওই নিচের ঘরে কে জানে। জবাব বা কে দেবে।...

কিছুই দেখা যাচ্ছেনা ভেতরে। মোটা মোটা লোহার বিমগুলো সব দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তারপর বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো তো বাধা হয়ে আছেই। দূরে থেকে চাপা বিস্ফোরনের আওয়াজ আসছে। মাথার ওপর ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা ঘোলাটে আকাশের এক টুকরো দেখা যাচ্ছে। গ্রেবার এই সব ভাঙ্গাচোড়ার মধ্য দিয়ে উবু হয়ে খানিকটা ঢুকে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল। একজনের গোঙানি

শুনে হাত বাড়িয়ে দিতে কার হাতে গিয়ে পড়ল। নড়ছে হাতটা। দেহটাকে ছুঁতে চাইল গ্রেবার। কাতড়ে উঠল লোকটা তার হাত ধরে টানতেই। সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ পাতাল ফাটানো বিস্ফোরনের শব্দে যেন বধির হয়ে গেল গ্রেবার। তবু হাতড়ে হাতড়ে এস সময় মুখটা খুঁজে পেতেই বলে উঠল, 'একজনকে পেয়েছি। আমাকে কেউ সাহায্য করো।'

ক্রমে ষ্টেনব্রেনার, সোয়ের এগিয়ে এল। কিন্তু বিশাল লোহার বিম সরানো সম্ভবই নয়। তবে হাল ছাড়ল না। শাবল আনল। এবার হার্শল্যাণ্ড হাত লাগাল। ইঁট পাথর সব সরিয়ে অবশেষে উদ্ধার করা গেল লোকটাকে। সকলে চিনলো। লেমারস। চশমাটা এক ফুট দূরেই অক্ষত পাওয়া গেল। কিন্তু লেমারস বেঁচে নেই।

গ্রেবার স্লাইডারের সঙ্গে পাহারাদারিতে বেরিয়ে পড়ল। গির্জার এক অংশ ধূলিস্যাৎ। কম্যাণ্ডার রাই বেঁচে আছে তো। আছে। উদ্ধারের কাজকর্ম দেখছে দাঁড়িয়ে। আহতদের বার করা হয়েছে। মারাও গেছে কয়েকজন। বাকিদের ক্যানভাস আর কম্বলের ওপর রাখা হয়েছে। বোমার আঘাতে বড় বড় গর্ত হয়েছে। সামান্য কুয়াশা পড়ছে। দুজনে গর্তগুলো এড়িয়ে এগিয়ে চলল। কবর তো খোঁড়াই ছিল পাহাড়ের পাশে। স্লাইডার বলল, 'এখানেই সবাইকে কবর দিয়ে দিলে হয়।'

'অত মাটি কোথায় পাবে চাপা দেবার ?' গ্রেবার বলল, 'অনেক বড় গর্ত যে।'

'চারপাশ থেকে মাটি টেনে নিলেই হবে।'

'তা কি হবে ? অনেক গভীর গর্ত যে। তার চেয়ে নতুন কবর কবর খুঁড়ে নেওয়া সোজা।'

দুজনে এগিয়ে চলল। স্লাইডার হঠাৎ দাঁড়িয়ে প:ড়ে শুনল সীমানার দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ। জ্বলন্ত একটা প্যারাস্যুট নেমে আসছে আকাশের বুক চিরে উল্কার মতো। 'ভারী কামানের শব্দ। অর্থাৎ, সীমানার দিকে যাবার জন্যে তৈরী থাকতে হবে আমাদের।'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'তোমার ছুটির কি হলো ?'

'হয়ে গেছে।'

ছুটি যে মঞ্জুর হবে ভাবতে পারেনি গ্রেবার। বাড়িতেও কোন খবর পাঠাতে পারেনি। শেষ ছুটি পেয়েছিল বছর দুই আগে। নিজেরই এখন বিশ্বাস হয় না। যুগ যুগ ধরে যেন এই যুদ্ধক্ষেত্রেই তার কেটে গেছে, যাচ্ছে। তবে, ইদানীং আর ততটা খারাপ লাগে না তার। বুকটার মধ্যে কেবল খালি খালি লাগে।

'কোন দিকে যাবে তুমি !' স্লাইডার জানতে চাইল।

'একদিকে গেলেই হয়।' জবাব দিল গ্রেবার।

'বেশ। তুমি ডাইনে যাও, আমি বাঁয়ে যাই।'

'তা যাও। কিন্তু দু'হপ্তা আগের কথা মনে আছেতো? এমনি কুয়াশার রাতে রাশিয়ানরা হঠাৎ আক্রমন করে আমাদের বেয়াল্লিশ জনকে মেরে গেছল। আজও সেই রকম ঘন কুয়াশার রাত। সাবধান থেকো।'

নিজের ভাবনায় মশগুল হাঁটতে হাঁটতে চলেছে গ্রেবার। আচমকা দু'বার গুলির শব্দে মুহূর্তে পজিশন নিয়ে নিল সে। আবার একটা গুলির শব্দ। চাপা আর্তনাদ। রাইফেল বাগিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল সে। কে তার নাম ধরে ডাকল হঠাৎ। একপাশে সরে সতর্ক হয়ে সে বলল, 'কে?'

'আমি ষ্টেনব্রেনার। শালা হারামীদের কেউ স্লাইডারের মাথায় গুলি করেছে।' কখন যে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে রাশিয়ান গেরিলাগুলো এগিয়ে এসেছে বোঝেওনি কেউ। স্লাইডারকে পেয়ে তার মাথাটা চুরচুর করে দিয়েছে গুলিতে। 'এই ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে হারামীগুলোকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কম্যাণ্ডার রাই আদেশ দিয়েছেন এবার দুজন করে রাতে পাহারাদারি করবে কাছাকাছি থেকে।

'সে তো ভাল কথাই। বলতে বলতে মনটা খারাপ হয়ে গেল গ্রেবারের। সে যদি বাঁদিকে আসতো তো এতক্ষণে তাব দেহটাই নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকত। বরাত জোরে সৈনিকের বাঁচা। চাপা স্বরে স্টেনব্রেনার বলল, 'গ্রামটাতে একবার পাক দিয়ে আসি চলো। শালাদের পেলে···

কামানের শব্দে, মেশিনগানের শব্দে পারিপার্শ্বিক একটা অপার্থিব স্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করছে। দুজনে মিলে যথাসাধ্য খুঁজেও কিছুই হদিশ করতে পারলো না।

রাশিয়ানরা আক্রমন শুরু করে দিয়েছে। আমরা যে এখানে কি ভেরেণ্ডা ভাজছি ঈশ্বরই জানেন।'

গ্রেবার একবার ভাবল যে বলে মহামান্য ফুয়েরার তোমার চেয়ে অনেক বেশী জানে হে ছোকরা। কিন্তু কিছু বলল না।

এভাবে আক্রমণ হতে থাকলে আমাদের সৈন্যবলে কুলোবে না। তখন তোমার নিশ্চয়ই অফিসারের পদে প্রমোশন হয়ে যাবে।'

'আবার ট্যাংকের তলায় পিষে গিয়ে পরপারের টিকিটও পেয়ে যেতে পারি।'

'এই। তোমরা না কেবল খারাপ দিকটাই ভেবে নাও। সকলেই কিন্তু মরে যায় না।'

'তা তো বটেই। তাহলে তো যুদ্ধই হয়না।'

পাহারার পালা চুকিয়ে তারা নিচের কুঠুরিতে চলে এলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে একফালি। ষ্টেনব্রেনার শুয়ে পড়েছে কম্বলের ওপর সটান হয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল গ্রেবার, ছেলেটার বয়স কুড়ি হবে কিনা সন্দেহ।

এর মধ্যেই কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। হত্যাই। যুদ্ধক্ষেত্রে তো নয়, সীমানা থেকে দূরে নির্জন বন্দি শিবিরের নিরস্ত্র, অসহায় মানুষদের হত্যা করেছে। আর তার জন্যে কি অহংকার ছোকরার।

গ্রেবার ঘুমোতে চাইল। ঘুম এল না। কামানের একটানা গমগম্ শব্দই শুনতে লাগল শুধু। তাকিয়ে দেখল ষ্টেনব্রেনার ঘুমিয়ে পড়েছে মুখখানা তবুও কি অদ্ভুত শিশুর মত কোমল, সরল।'

অভিশাপের মত সকাল এলো মেঘে ছাওয়া আকাশ জুড়ে। সীমান্তে চরম অবস্থা। ট্যাংক নামানো হয়েছে। সেনাবাহিনীকে পেছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কয়েকটা শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করা হয়েছে। যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আহত সেনাদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এবার ওদের বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

কম্যাণ্ডার রাই গ্রেবারকে ডেকে পাঠালেন বেলা দশটার সময়। ঘর পাল্টে গেছে তার। দুটো ঘর মাটির নিচে। একটাতে থাকা, অন্যটা অফিস। গির্জারই সামনে। একটা তিন পেয়ে চেয়ার আর টেবিল। আসবাব বলতে এই। ভাঙ্গা ফায়ার প্লেসে দুটো কম্বল পাতা হয়েছে। হু হু বাতাস বড় ঠাণ্ডা ঘরটাতে ষ্টোভটা জ্বলছে। গরম জল হচ্ছে কেটলিতে।

'ঐ যে ছুটি বাবু, এসো।' একটা কলাই করা মগে চামচ খুঁটতে খুঁটতে রাই বললেন, 'তোমার ছুটি মঞ্জুর। কি, অবাক লাগছে, না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

আমি অবাক হয়েছি। আবার সুখীও হয়েছি। যাও, অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো রওনা দাও। একটা ফিরতি অ্যাম্বুলেন্স ঘুরতে পারো কিনা দেখো। মোট কথা প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে পড়ো। নইলে শেষে যদি বাতিল হয়ে যায়। অনেক ছুটি তোমার পাওনা। তোমার নিজের অর্জিত ছুটি এটা শুভেচ্ছা রইল। যাও।

পাশেই অফিস ঘর। কাগজপত্র গ্রেবারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সমেদে বলে উঠল, 'বরাত জোর মশাই আপনার। নইলে এ সময় কেউ ছুটি পায়। বেশ তো করেননি, যান, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন।'

প্রায় ছুটে নিজেদের ঘরে চলে এলো গ্রেবার। নেবার মত বিষেশ কিছু নেই। তবু সব বেঁধে নিল। কুড়িয়ে পাওয়া কারুকাজ করা যীশুর মূর্তিটা নিতে ভুলল না অবশ্য। মাকে দেবে।

এই সময় হার্শল্যাণ্ড এলো। হাতে ভাঁজ করা কাগজ। ধ্বক করে উঠল গ্রেবারের বুকটা। ছুটি বাতিল হয়ে গেলো নাকি। না, তা নয়। হার্শল্যাণ্ড সসংকোচে বলল, 'ছুটিতে যাচ্ছো, আমার একটা উপকার করবে?'

'নিশ্চয়ই। কি বলো ?' গ্রেবার বলল।

'এই চিঠিটা আমার বাড়িতে পেঁছে দিও। তুমি নিজে গিয়ে দিলেই ভাল হয়।'

'কেন বলতো ?'

একটু ইতস্ততঃ করে হার্শল্যাণ্ড বলল, 'মা আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, আমরা ইহুদী বলল···আমারই সহযোদ্ধা বন্ধু নিজে গেলে মা আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। এটুকু কষ্ট করো ভাই আমার জন্যে। আর এই দু'প্যাকেট সিগারেট রেখে দাও আমি খাই না। তোমার কাজে লাগবে। আর হ্যাঁ, এখনকার আসল অবস্থার কথা কিছু বলো না। শুধু বলবে যে আমরা। খুব ভাল আছি।'

'বেশ। তাই বলব।'

ধন্যবাদ দিয়ে হার্শল্যাণ্ড চলে গেল।

ফিরতি অ্যাম্বুলেন্স চালকের পাশে একটু জায়গা পেল গ্রেবার। আহত আর মারাত্মক জখম সৈনিকে ভর্তি অ্যাম্বুলেন্সটা। যেতে যেতে দেখল ওদের সৈন্যদের গির্জার সামনে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল গ্রেবারের। মনে হলো যেন অপরাধীর মত পালিয়ে যাচ্ছে। হু হুঃ করে মাঠের মাঝখান দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা ছুটে চলেছে। কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে যাবার পর দেখা গেল অন্য আর একটা অ্যাম্বুলেন্স রাস্তার ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে। সামনের একটা চাল বরফে বসে গেছে।

'দেখে শুনে কেন যে চালান না, বুঝি না।'

ইতিমধ্যে গ্রেবার নেমে এসেছে। ওদের দুজন জখম সৈনিক মারা গেছে। সে জায়গায় দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সের তিনজন আহতকে তুলে নিল ওরা। অন্য আহতরা চেঁচামিচি করতে লাগল। এই খোলা ময়দানে শুধু তো বোমার ভয় নয়, শীতেই জমে যাবার কথা। তবুও পরের ষ্টেশন থেকে এক্ষনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে কোন মতে আহতদের সান্ত্বনা দিয়ে গ্রেবারদের অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল।

ড্রাইভারটা কবে মাস দুয়েক আগে এমন অবস্থায় পড়েছিল। দুজন মরে কাঠ হয়ে গেছিল। রাশিয়ার এই শীতে রাতে হেঁটে যেতে যেতে কজন মরেছে···এই সব কত কি বলছিল, ভাল করে শুনছিল না গ্রেবার। সে কেবল নিজের কথাই ভাবছিল। সে একটু নিরিবিলি, নির্জনতা চেয়েছিল। কিন্তু এতো বন্ধু সহযোদ্ধাদের সাক্ষাৎ নরকে পচতে দিয়ে সে নিজের প্রান বাঁচিয়ে পালাচ্ছে। পালাচ্ছে এই নরকের আবিলতা, ফেলে আস্য জীবনের সেই অবিশ্বাস্য আলো আর সুখের জগতে। বুকের মধ্যে তার একটা যন্ত্রনা মোচড় দিয়ে উঠল। হঠাৎ একটা গর্তে পড়ে গাড়িটা লাফিয়ে উঠতেই ঘোর কেটে গেল গ্রেবারের। একটা সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে হল তার।

হার্শল্যাণ্ডের দেওয়া একটা প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটা

বাড়িয়ে ধরল ড্রাইভারের দিকে।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল।' ধন্যবাদ! আমার সিগারেট চলে না। তার চেয়ে কাঁচা তামাকই চিবুতে অনেক ভাল লাগে আমার।'

□ পাঁচ □

রেলের একটা শাখা লাইন এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। খাঁ খাঁ নির্জন একটা মাঠের মধ্যে ছোট্ট ষ্টেশনটি। ভাঙ্গাচোরা ঘরটাকেও রঙ করে আড়াল করা হয়েছে যাতে দূরে থেকে বা আকাশের বিমান থেকে বোঝা না যায়। পাশেই একটা সামরিক ব্যারাক বাড়িও রয়েছে। মেন লাইন থেকে এই ছোট লাইনটাকে টেনে আনা হয়েছে। রাশিয়ান বন্দিদের অবশ্য অন্য একটা তাবুর মধ্যে রাখা হয়েছিল। চলতে ফিরতে পারে যারা তারা রুক্ষ কাঠের বেঞ্চে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। আহতদের অন্যত্র রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ছুটি পাওয়া ক'জন সৈনিক আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়, পাছে ফের ছুটি বাতিল করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। কাছেই বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধহয় বিমানঘাঁটি আছে কাছাকাছি কোথাও। একটু পরেই একঝাঁক বিমান মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল উড়ন্ত বকের সারির মত, নাকি শিকারের খোঁজে দুরন্ত ঈগলের মত। গ্রেবার হাফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

'কাগজ পত্তর দেখাও।' হঠাৎ গলার আওয়াজে চমকে উঠে তাকালো গ্রেবার। দুজন মিলিটারি পুলিশ। হাতে রাইফেল, পালিশ করা বুট, ঝকঝকে পোশাক। এখনও যুদ্ধের আঁচ গায়ে লাগেনি আর কি। সুখে আছে শালারা। শিগগীরই বুঝবে। মনে মনে গাল দিতে দিতে সে এবং অন্যান্য কয়েকজন কাগজপত্র বার করে দিল। দেখে শুনে আবার ফেরৎ দিয়ে একজন বলে উঠল, 'কি সব চেহারা হয়েছে। ছ্যা, ছ্যা। বাড়ি যাবি কি এরকম কাদা মাখা শুওরের চেহারা নিয়ে। যা, যা, খাওয়া দাওরা কর। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নে।' বলে ফিরে খানিক দূর যেতেই একজন নন-কমিশনড সৈনিক মুখ ভেংচে বলে উঠল, 'শালা গুপ্তচর কুত্তাগুলো জ্ঞান দিচ্ছে। এই শালারাই আমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পনেরো ষোলজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে স্তালিনগ্রাদে।'

'ওই তো একমাত্র কর্ম ওদের। তা আপনি কি স্তালিনগ্রাদে ছিলেন নাকি?'

'আরে দূর! থাকলে আজ আমাকে এখানে দেখা যেতো না। ওখান থেকে কেউ বেরিয়ে আসার কথা ভাবতেই পারেনা।'

'যাকগে, আমার কথা শোন।' একজন সৈনিক ভীড়ের মধ্যে থেকে বলল, 'ওসব

কথাবার্তা এখন না বলাই ভাল।

সবাই খাবারের লাইনে দাঁড়াল যার যার পাত্র হাতে। ঘণ্টাখানেক পর মাংস, আলু শাক-সবজির টুকরো মেশানো একপাত্র স্যুপ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে পেটের এক কোণাও ভরবে না। যাকগে, গরম আছে, এটাই যথেষ্ট। বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতে বানানো আলু পেঁয়াজের পুর দেওয়া ভ্যানিলা সসেজ দিয়ে মজা করে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল অপেক্ষা করে করে। আরও আহত সৈন্য আসছে। কাগজপত্রও ফের দু'দফা পরীক্ষা হলো। তিনজন আহত মারা যেতে তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো। বেশ খানিকটা রাতের দিকে ট্রেন এলো অবশেষে। আকাশ ঝকঝক করছে পরিস্কার। নিচে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলো জ্বালারার প্রশ্নই ওঠে না। ট্রেনের কামরাগুলো প্রায় ভর্তি। তখনই কে একজন এগিয়ে এসে যারা ছুটিতে যাচ্ছে তাদের একটা আলাদা কামরায় তুলে দিল। ঠেলাঠেলি হচ্ছে জায়গা দখলের জন্য। গ্রেবার তাড়াহুড়ো না করে কামরার মাঝখানের সীটে জায়গা করে নিল। জানালার ধারে বসার বিপদ আছে। বোমার স্প্রীন্টার বা গুলি এসে তাদের গায়েই আগে লাগবে। কিন্তু ট্রেন তো ছাড়ে না। যেন নিশ্চিন্ত অজগরের মত খেয়েদেয়ে ঘুম দিয়েছে। সবারই মধ্যে চাপা উত্তেজনা। চোখগুলো তাদের জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে। মাঝে মাঝে একেকবার ধাক্কা দেয় ট্রেনটা। ফের থেমে যায়। না ছাড়া পর্যন্ত কারোরই যেন স্বস্তি নেই। তা অবশেষে চলতে আরম্ভ করল ট্রেনটা। মুখ ফিরিয়ে দেখল গ্রেবার অপসৃয়মান ব্যারাকের সামনে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকা সৈনিকদের দিকে। এই মুহূর্তে তারাও হয়তো ভাবছে যে এমনভাবে তারা কি কোনদিন আর ফিরে যেতে পারবে। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল গ্রেবারের। সে তো পালিয়ে যাচ্ছে আশাভরা এক জীবনের দিকে। নতুন এক জীবনের দিকে। কিন্তু, তাই কি?'

ভোর হয়ে গেছে। বরফও পড়ছে অঝোরে। ছোট একটা ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোন নিশ্চিহ্ন শহরের সীমানা মনে হচ্ছে। রুটি আর কফি দেওয়া হচ্ছে। গ্রেবার রুটি না নিয়েই কফি মগ হাতে নিজের সীটে এসে পড়ল। ইতিমধ্যে যারা মারা গেছে, তাদের দেহগুলো নামানো হলো। হঠাৎ মুখে মুখে রটে গেল যে, আহতদের নামিয়ে এখানকার ব্যারাক হাসপাতাল আটকে রাখা হচ্ছে। শুনেই ক'জন গিয়ে পেচ্ছাবখানায় ঢুকে পড়ল। ওদিক দিয়ে নেমে গেল কয়েকজন। দরজাও আটকানো হলো। কিন্তু তাতে কি আর বাধা দেওয়া যায়।

একজন অল্পবয়সী সৈনিক, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, রক্তে ভিজে চরচর করছে তখনও, কেঁদে ফেলল, 'আমি নামব না। এর আগে দু'বার আমাকে কিন্তু হাসপাতাল থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার আমি বাড়িতে যাবই। কিছুতেই নামব না।'

কিন্তু তাই বললে কি আর ফিল্ড সার্জেন শোনে। লোকটা অবশ্য ভাল। বেশ বুঝিয়ে যুবক সৈনিককে বললেন তিনি, 'তোমার ব্যাণ্ডেজটা না পালটালে রক্ত স্রাব হয়ে মরে যাবে তুমি। কেন বুঝতে পারছো না? চলো।'

অবশেষে তরুন সৈনিক হার মানা স্বরে বলল, 'আমাকে আবার ট্রেনে ফিরে আসতে দেবেন তো।'

'প্রানপন চেষ্টা করব। ভয় পেওনা।'

ম্লান মুখে নেমে গেল ছেলেটা।

এরমধ্যে একজন পুলিশ পেচ্ছাপখানার বন্ধ দরজায় ঘা দিল। 'কে ভেতরে আছিস। বেরিয়ে আয়। নইলে মরবি।'

কাঁচুমাচু মুখে একজন আহত সৈনিক বেরিয়ে এল। 'পেটটা খারাপ, স্যার।'

'মারবো গাঁড়ে লাথি, পেট ভাল হয়ে যাবে, শালা। চল।'

কিন্তু সার্জেন বললেন, 'আর কেউ নেই তো?'

এম, পি, টা বলল, 'না, স্যার।'

'তবে চল।'

তারা চলে যেতেই পেচ্ছাবখানার ভেতর থেকে একজন সৈনিক ঘামে ভেজা মুখ আর শরীর নিয়ে টুকু করে ট্রেনের কামরায় উঠেই নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল, 'ওই বাঁচলাম। এতক্ষণ ছেলেটার জন্যে প্রার্থনা করছিল। একি। ছেলে টাকে দেখছিনা তো?

'ধরে নিয়ে গেছে।' একজন বলল।

'ইস্ বেচারা। বাড়ি ফেরার জন্যে কি ভাবে না ভগবানকে ডাকছিল। এখন ওর জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি। আমার নিজেকে তো জার্মানীতে পেঁছতেই হবে। আহত বলে হাসপাতালে পড়ে থাকলে তো চলবে না। বাড়িতে আমার বউ ক্যানসারে ভুগছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স। ভাবুন একবার। অথচ আমি তার পাশে নেই।'

সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। এত ঘটছে এসব ব্যাপার যে কারও মনে আর কোন তাপ উত্তাপ সৃষ্ট হয় না এসব দুঃখের কথা শুনলেও।

প্রায় একঘন্টা পরে ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করল। পেছনের দরজা দিয়ে যে সৈনিকটা নেমে গেছল, সে আর ফিরে এল না। ধরে নিয়ে গেছে বোধ হয়।

ট্রেন তখন চলছে। দুপুর বেলা মিলিটারি পোষাক পরা এক ব্যক্তি উঠে কামরার সবাইর উদ্দেশ্যে বলল, 'কেউ খেউরি করতে চান নাকি?'

'সেকি। এই চলন্ত ট্রেনে?' কামরার একজন বলে উঠল।

'তাতে কি? এই তো অফিসারদের কামিয়ে আসছি। কোন অসুবিধে হবে না। আমার কাছে ফ্রান্সের সুগন্ধী সাবান আছে। কামিয়ে দেবো টেরও পাবেন না।' নাপিত প্রবর বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

'কত দিতে হবে?' একজন প্রশ্ন করল।

'পঞ্চাশ কেনিগ বা আধা ডয়েশ মার্ক'। এমন কিছুই বেশী নয় নিশ্চয়ই।'

'ভাল কথা। নিন, শুরু করুন আমাকে দিয়ে।' বসে পড়ল একজন।

নিখুঁত কাজ নাপিত প্রবরের। একটা কাগজের ব্যাগের মধ্যে কাটা চুল ইত্যাদি ভরে রাখতে লাগল সে। ট্রেনের কামরায় ময়লা পড়তে দিল না। একে একে তিনজনের পর চার নম্বরে গ্রেবার বসল। কামাতে কামাতে গ্রেবার তিনজনের ঝকঝকে চেহারার দিকে দেখছিল সে। তাকেও এখন তেমনই ঝকঝকে লাগবে। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল তার। একটা ফুরফুরে অনুভূতি। বুঝি বা বাড়িতেই ফিরে এসেছে সে।

জার্মানীর সীমান্তে এসে দাঁড়াল। শেষ বিকেলের আলোয় উজ্জ্বল বড় স্টেশনে আসতেই প্রায় খালি হয়ে গেল কামরাগুলো। সবাইকে বাথরুমে যাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। কার্বলিক সাবানের চড়া গন্ধে মম করছে। বেশ গরম বাথরুমের ভেতরটা। ন্যাংটো হয়ে প্রানভরে স্নান করল গ্রেবার। অনেকেরই দেহে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু যুদ্ধের কথা নেই কারো মুখে। সবাই খুশীর জোয়ারে ভাসছে যেন।

বার্নারট্ নামে একজন সৈনিক বসেছিল গ্রেবারের পাশে। বসে বসে জামা কাপড় কম্বল থেকে উকুন বেছে বার করে করে দু'হাতের নখে টিপে মারছিল। কথাবার্তা চলছিল। তবে যুদ্ধের নয়। খাদ্য খাবারের আর নারীর সম্বন্ধে।

'আমার বউটা বাচ্চার মা হয়েছে', বার্নারট বলছিল, 'আমিই বছর দু'বছর বাড়ি নেই, বাচ্চার বয়সও চার মাস, অথচ বউ লিখেছে যে আমারই নাকি বাচ্চাটা। বুঝে দেখো। অবশ্য মা আসল কথাটা লিখেছে। কোন এক রাশিয়ান শালা নাকি বাচ্চাটার বাপ।'

শুনে টেকো মাথা, মোটাসোটা বয়স্ক সৈনিক একজন নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'যুদ্ধের সময় এমন ঘটনা কত হয়।'

'বউয়ের নরম পাছায় লাথি মেরে ভাগিয়ে দে'না। আমি হলে তো তাই করতাম। শালা ড্যামনামি।'

আরেকজন নরম স্বরে প্রশ্ন করল, 'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে। আবার লিখেছে, আমার মতই দেখতে।'

'তবে তো ঠিকই আছে। রাশিয়ান হলেই বা। আমরাও আর্য, ওরাও আর্য, রেখে দিন। কাজে লাগবে।'

'আপনার নিজের হলে পারতেন? খুব তো জ্ঞান দিচ্ছেন।' বার্ণরট জবাব দিল।

'এই যে বাছা।' কে একজন দূর থেকে টিটকিরি দিল, 'তবে কি একটা শুদ্দো ষাঁড়কে দিয়ে পাল খাওয়ালে আপনার বউয়ের ইজ্জত রক্ষা হতো?'

গ্রেবার শঙ্কিত হয়ে ভাবল, এবার এখানেই বুঝি যুদ্ধ লেগে যায়। কিন্তু তা হলো না। বার্ণারিট ম্লান মুখে মাথা নাড়ল।' অপেক্ষা করতে পারবে তো আমার জন্যে।'

তখন টেকো, বয়স্ক সৈনিকটা ফের বলল, সান্ত্বনা দেবার স্বরেই বলল, 'সব মেয়েইতো আর কুটকুটুনির জ্বালা সহ্য করতে পারেনা। তুমি বছরের পর বছর বাড়ি ফিরবে না, আর একটা যুবতী মেয়ে পা গুটিয়ে হাত চাপা দিয়ে আব্রু রক্ষা করবে, তা তো হয়না।'

'আপনি কি বিয়ে করেছেন?'

'না ভাই। ওই অপকম্মোটা আমার করা হয়নি।'

ঠিক তখনই ছ্যাচড়া চেহারার একজন সৈনিক ছোট ছোট চোখ দুটো ঘুরিয়ে টেকো লোকটারই উদ্দেশ্যে বলল, 'রাশিয়ানদের আর্য বলাটা আপনার ভুল। ওরা আসলে বলশেভিক বর্বর।'

'আজ্ঞে না, ওরাও আর্য।' টেকো সৈনিক বলে উঠল, 'তবে হ্যাঁ, বলতে পারো যে আমাদের মত সেরা আর্য নয়,। নিচু জাতের আর্য। যেমন জাপানীরা তো বর্বরই ছিলো। এখন অবস্থা পাল্টেছে। তাই বলা যায় যে ওরা হলদে জাতের আর্য। শুদ্ধ ভাষায় পীত-আর্য।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে যে যার পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিয়েছে। কারও সার্জেন্টের পোশাক, কারও ল্যান্স-কর্পোরাল বা সাধারন সৈনিক, বিমানবাহিনীর কেউ কেউ, আবার আর্দালীও আছে সামরিক দপ্তরের। সবাই জড়ো হয়েছে একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের ভাষণ শোনার জন্যে। ছুটিতে যাওয়া সৈনিকদের জন্যে বিশেষ ভাষণ দিচ্ছেন তিনি। তিনি সকলকে সাবধান করে বলে দিচ্ছিলেন যে, কেউ যেন যুদ্ধ সম্পর্কে, সীমান্ত পরিস্থিতি বা যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কথা নিয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে। আমরা রাশিয়ার অবস্থা কাহিল করে দিয়েছি। আবার নতুন আক্রমনের প্রস্তুতি চলছে। এ অবস্থায় কোন রকম উল্টো পাল্টা কথা যদি কারও মুখ থেকে প্রচার হয়ে যায় তো দেশেরই বিপদ হবে। আমদের গেস্টাপো বাহিনী সতর্ক দৃষ্টি রাখছে, রাখবে। দোষী বলে ধরা পড়লেই তার মৃত্যুদণ্ড। মনে রাখবেন। আমাদের মহান ফুয়েরার দীর্ঘজীবি হোন।' একটু থেমে তিনি সকলের মুখের দিকে দেখলেন। তার পেছনেই বেদীটার দেয়ালে ফুয়েরারের বিরাট ছবি টাঙানো। তিনি আবার বলতে লাগলেন :

'শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মহান ফুয়েরার তার প্রিয়তম প্রতিটি সৈনিকের জন্যে সর্বদাই ভাবেন। তাই তিনি ছুটিতে আসা প্রতিজনের জন্যে তার প্রীতি-উপহার পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা যে প্রত্যেকে এই খাবারের প্যাকেটগুলো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খাবেন যাতে বাড়ির লোকেরা বোঝে

যে, সেনা বাহিনীতে তাদের আত্মজনের কোন রকম অযত্ন অবহেলা হয়না। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি বাড়িতে পেঁছিবার আগে এই প্যাকেট খুলবেন না বা চেষ্টাও করবেন না। পথে কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষা করে দেখা হবে। হাইল হিটলার।'

সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রেবার ভাবছিল বুঝি এবার জাতীয় সঙ্গীত হবে। তা নয়। একটা আদেশ শোনা গেল ঃ

'ছুটিতে যারা মূল রাইনল্যাণ্ডে যেতে চান তারা তিন পা এগিয়ে এসে দাঁড়ান।'

কয়েকজন সারি থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

শীর্ণ চেহারার সৈনিক একজনকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কোন শহরে যাবেন?'

সৈনিক জবাব দিল, 'কোলন।'

'আহা, শুনুন। রাইনল্যাণ্ডে এখন যাওয়া নিষেধ। আপনি অন্য কোন শহরে যেতে চান কি?'

'এই দেখ, কোলনে আমার বাড়ি, ছেলে মেয়ে বউ পরিবার সবই সেখানে, আর আমি মরতে অন্য শহরে যাব কেন?' সৈনিকটি অবাক স্বরে বলল।

'পাগলামো করবেন না। প্রশ্ন করা নিষেধ জানেন না? রাইনল্যাণ্ডে যাওয়া এখন নিষেধ। যাইহোক, সরে দাঁড়ান। অন্যদের দিকে তাকিয়ে অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি কেউ অ্যালজাস বা হ্যামবুর্গে যেতে চান?'

কেউ উত্তর দিল না।

তিনি সারিবদ্ধ সৈনিকদের মুখগুলো পর্যায়ক্রমে দেখে বললেন ঃ 'রাইনল্যাণ্ডে যারা যাবেন, এখানে অপেক্ষা করুন। বাকিরা সকলে যেতে পারেন। আর হ্যাঁ— যাবার আগে খাবারের প্যাকেটগুলো অবশ্যই মনে করে নিয়ে যাবেন।'

আবার ষ্টেশনে এল এরা। কিছু পরে রাইনল্যাণ্ডের সৈনিক ক'জনও এল। তাদের ম্লান বিষণ্ন মুখগুলো দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। টেকো মাথা বয়স্ক সৈনিকটি ফের এগিয়ে এল। রোগা সৈনিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তারপর। রাইন-ল্যাণ্ডে তো যাওয়া হচ্ছে না। এখন কোথায় যাবেন?'

ভাবছি রোজেনবুর্গে যাব। সেখানে আমার এক বোন থাকে। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা কি হবে জানিনা। কোলনে যদি নাই থাকতে পারে তো বউ কি ছেলেপুলে নিয়ে বোনের কাছে যাবে। বোনের সঙ্গে তো আমার বউয়ের একেবারেই পট খায় না। কি যে হয়েছে ওদের তাও তো বুঝতে পারছি না।'

আশ্বাস দিল টেকোমাথা, 'অত ভেঙ্গে পড়লে চলে ভাই। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আর একটা তার করে দাও কোলনে। তা না হলে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে তো দেখাই হবে না হয়তো।'

'তার করবো। না, না, মেলা ঝামেলা তাতে। খামখা কতগুলো টাকাও যাবে।

আমার এখন সমস্যা কোলনে বাড়িঘর ফেলে আমি কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবো, হ্যাঁ।

গ্রেবারের শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। এমন একটা অজানা আশংকাই মনের ভেতরও বহুদিন ঘরে চলছিল তার। ঠিক বুঝতে পারছিল না। আজ এই মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। হতাশা ক্লিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হল তার। তারও যে কামনা নিভৃত গৃহের কোনে একটু শান্তি, ভালবাসা, আপনজনদের উষ্ণ সান্নিধ্য একটু বা, তার জন্যই তো এত দীর্ঘপথ পার হয়ে, এত কষ্ট সয়ে এত দূরে আপনজনদের টানে কদিনের জন্য আসা। মনটাতো এজন্যই উন্মুখ প্রতীক্ষার প্রতিটি পল গুনছে। অথচ এমন বুকের মধ্যেটা কেন ভারী ভারী হয়ে উঠছে তার।

ট্রেন চলছে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দুর্বার গতিতে। লাইন আর চাকার সংঘর্ষে ঘটার ঘট ঘটাং ঘট শব্দের তোলপাড় তার বুকের মধ্যেও থেকে থেকে বলে উঠছে, যেন ঠাট্টা করছে, 'ছুটি চাই, ছুটি নাই, ছুটি চাই, ছুটি নাই…।'

□ ছয় □

রাত পোহাতেই দৃশ্যাবলী একেবারে পাল্টে গেল। ভোরের পাতলা কুয়াশা ভেদ করে সোনা মাখা রোদ্দুর ওঠে এল। এমন জানালার ধারে কাঁচে মুখ লাগিয়ে বসে আছো গ্রেবার। সরষে গাছের ক্ষেতে বাতাসে দোল খেয়ে যাচ্ছে। কোথাও ধ্বংসের আভাসও নেই। ট্রেঞ্চ নেই, গোলা গুলির ক্ষতচিহ্নও নেই। ওই তো গ্রামের গির্জার চূড়ায় ভোরের রোদ এসে পড়েছে। রাস্তাগুলো ঝকঝকে পরিস্কার। লোকজন রেস্তরাঁতে একত্রিত হয়েছে। বাড়ির মেয়ে গিন্নিরা ঘর কন্নার কাজে ব্যস্ত। ওই যে বাচ্চারা খেলা করছে। আহ্। কতদিন এইসব নিস্পাপ শিশুদের দেখেনি সে। এইসব দেখার জন্যই তো এতকাল তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করত।

'একেবারে অন্যরকম দৃশ্য, কি বলেন ?' পাশে বসা সৈনিক বলে উঠল।

'যা বলেছেন। একেবারে অন্যরকম।' গ্রেবার জবাব দিল। 'আচ্ছা, আজ কি বার ?'

'বৃহস্পতিবার।

'তাই হবে। বারের হিসেবটা মনে থাকেনা আমার কিছুতেই।'

এরমধ্যেই কয়েকজন ব্যাগ থেকে রুটি বার করে খেতে আরম্ভ করেছে। গ্রেবার পরবর্তী স্টেশনে কফির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কফি আর রুটি খাবে। মনে হতেই নিজেদের রান্নাঘরটা যেন চোখের ওপর ভেসে উঠল। মায়ের বানানো

কফি আর মাখন রুটি ভাজ করা টেবিল ক্লথের ওপর সাজানো। ক্যানারি পাখীটা দাঁড়ে বসে ডাকছে। বসে বসে সে কত কি ভাবত। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবে। সে সব সত্যিইও হল এক সময়। কিন্তু না হলেই যেন ছিল ভাল। স্বপ্নের সে সব দেশ বাস্তবে দেখার পর আজতো আর আগের সেই স্বপ্নের সঙ্গে কোনই মিল নেই।

মাঝে মাঝে মেয়েরা রঙীন রুমাল মাথায় বেঁধে কাজ করছে। বার্নারট্ জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নাড়ল। কেউ ফিরেও তাকাল না। 'অদ্ভুত তো।' হাত সরিয়ে নিয়ে বার্নারট্ বলে উঠল। টোকা মাথা সৈনিকটা মুচকি হেসে ঠাট্টার স্বরে বলল, 'কিছুই অদ্ভুত নয়।'

রোগাটে চেহারার সৈনিক এবার মন্তব্য করল, 'আমাদের কোলণের মেয়েরা এমন ব্যবহার করত না।'

'নিশ্চয় করতো, টেকো মাথা বলে উঠল, 'কারণ দেশজুড়ে সর্বত্র পোলিশ বা রাশিয়ান মেয়েদের বন্দি করে এনে ক্ষেতে খামারে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বুঝেছেন।'

ট্রেনটা হঠাৎ একটা সুরঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে চোখ চলে না। তার মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া। যদিও ট্রেণের বদ্ধ অন্ধকারে কাটাতে অভ্যস্ত সব সৈনিকই। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, তাই অস্থিরতা বাড়ছে। এই ফালতু নরক যন্ত্রনা যেন আর সহ্য হচ্ছে না।

টুকটাক কথাবার্তা চলছিল। রোগা সৈনিকটা বলল, রেজেনবুর্গ পুরোনো শহর তাই না।'

'তা জানে না। আপনি বরং বার্লিনটা একবার ঘুরে আসুন না।' কে যেন বলল।

'না, না, মশায়। অত টাকা পাবো কোথায়। তা ছাড়া, কোলন ফেলে অন্য কোথাও যেতে চাই না আমি।'

ঘটাং ঘট শব্দ তুলে ট্রেনটা চালু হল। 'ওফ্। বাঁচালি বাবা।' কেউ বলে উঠল।

ট্রেনটা অন্ধকার সুরঙ্গ ছেড়ে বেরোতেই বিকেলের সিটে রোদে ভরা চারপাশ হেসে উঠল যেন। দু'ধারের দৃশ্য এবার গ্রেবারের মানসলোকে পরিচিতির ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। বিভিন্ন ষ্টেশনের নামগুলোও মনের তারে অনুরনন তুলল। কতশত স্মৃতি যে জেগে উঠেছে মনের পর্দায়। চারপাশের প্রকৃতির সুগন্ধে মন ভরে উঠছে। এবার তার গন্তব্য ষ্টেশন এসে পড়বে গ্রেবার তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ট্রেন এসে থামল একটা ষ্টেশনে। নেমে গেল অনেকেই। গ্রেবার ষ্টেশনের নামটা পড়বার চেষ্টা করছিল মুখ বাড়িয়ে। কিন্তু লেখাটেখা নজরে পড়ল না।

কোলনবাসি সৈনিকটা বলল, 'নেমে আসুন। ট্রেন তো আর যাবে না মনে হচ্ছে।'

'সেকি। শহরের মাঝখানে ছিল যে স্টেশনটা।'

এই সময় স্টেশন মাষ্টারের চিৎকার শোনা গেল ঃ 'ভেদে'ন এর যাত্রীরা এখানেই নেমে যান, ভেদে'ন।'

তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নেমে এল গ্রেবার। সোজা ষ্টেশন মাষ্টারকেই এসে জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেন কি শহরের ষ্টেশনে যাচ্ছে না।'

সেকথার জবাব না দিয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'ভেদি'ন যেতে চান তো? ওই প্ল্যাটফর্মে'র পেছন দিকে নেমে যান রাস্তায়। বাস দাঁড়ানো আছে।' বলেই ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

গ্রেবার অবাক হলেও কথা না বাড়িয়ে একটা বাসের কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'এটা কি ভেদে'ন যাবে।'

'যাবে। উঠে পড়ুন।'

'ট্রেন কি শহরে যাচ্ছে না?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'না। ঢুকতে পারছেনা শহরে।' নির্লি'প্ত জবাব এল।

উঠে বসল বাসে গ্রেবার। একটু পরে বাস ছাড়ল। চেয়ে দেখল সে উল্টোদিকের সিটে কজন মিলিটারি অফিসার এবং এস, এস পুলিশ দুজন বসে আছে। সাধারণ যাত্রীও আছে কিছু। মায়ের কোলে একটা বাচ্চা হুটোপাটি করছে। মসৃন পীচ ঢালা পথ ধরে বাস চলেছে। অল্পসময় পরই বাস থেমে গেল। 'নেমে যান সবাই। বাস আর যাবে না।'

'সে কি। এলাম কোথায়?' গ্রেবার উঠল।

বাস থেকে নেমে এক ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রেবার তাকেই প্রশ্নটা করল। ভদ্রলোকের কপালে গভীর ক্ষতের দাগ। কয়েকটা দাঁতও নেই সামনের। তিনি মুখ ফিরিয়ে গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা রামসেষ্ট্রাস। আপনি কোথায় যাবেন?'

'হেকেনষ্ট্রাস। আঠারো নম্বর।'

'পুরোনো শহরে, তাই না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ', গ্রেবার বলল, 'লুইজেনষ্ট্রাসের পাশে। ক্যাথেরিনেনকার্শ থেকেও দেখা যায়।'

'বাঃ সবই তো দেখছি জানেন। সোজা চলে যান। চিনে যেতে অসুবিধে হবে না আপনার। আচ্ছা, চলি।'

'ধন্যবাদ।' গ্রেবার কোন মতে বলল।

গ্রেবার রামশুষ্ট্রাস দিয়েই এগোল। আশে পাশের বাড়িগুলো অন্ধকারের মধ্যে

ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে নিশ্চয়ই আলো জ্বলছে। তবে বাইরে তার ছিটে ফোটাও আসার জো নেই। তাহলেই পুলিশ ফাইন করে দেবে। বিমান আক্রমন ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা। পথেও সে জন্যেই ঠুলি পরা আলো। কত চেনা জায়গা গ্রেবারের। অথচ এমন মনে হচ্ছে যেন সে কোন দিন জীবনে এখানে আসেনি। গ্রেবারের পা দুটো ঘোড়ার তেজে পীচের ওপর খটাখট নাল লাগানো বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে লাগল। বাড়ি এসে পরেছে এই ভাবনাটাই তাকে তাড়া করে নিয়ে চলল যেন। চলতে চলতেই নাকে এসে ধোঁয়া বারুদের গন্ধ ঢুকল। মুহূর্তে সচকিত হয়ে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

যতই এগোচ্ছে গ্রেবার ততই যেন গন্ধটা ধেয়ে আসছে। কোন একটা বিশেষ দিক থেকেই নয়। চারদিক থেকেই যেন আসছে গন্ধটা। দু'ভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তাটার মুখে এসে প্রথম ভাঙ্গাবাড়ি চোখে পড়ল। হাকেনষ্ট্রাস এখনও পঁচিশ মিনিটের পথ। সে এগিয়ে চলল দ্রুত পায়ে। ক্রমে ওর চোখের ওপর ফুটে উঠতে লাগল যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী চেহারাটা। রেহাই পায়নি এখানেও। প্রতি বাড়িরই কোন না কোন রকম ক্ষতি হয়েছেই। অক্ষত নেই কোনটাও। গাঢ় অন্ধকার রাত। চারদিকে ধ্বংসের এই চেহারা। এর মধ্য দিয়ে কান্না যেন এগিয়ে আসছে দেখে থমকে দাঁড়াল গ্রেবার। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'হ্যালো। কারা ওখানে?'

কোন জবাব এল না। কোন বাড়ির সিমেন্ট বালির আস্তর খসে পড়ল বুঝি। হাঁপরের মত শব্দ তুলে নিজেরই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল সে নিজেই। তারপর দৌড়তে আরম্ভ করল। কেন দৌড়চ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, সে খেয়ালই রইল না তার। সমস্ত রাস্তাটার দু'পাশে কি সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়িগুলো ছিল। সুন্দর রঙ করা, নানা রকম আঁকা ছবিতে দেয়াল গুলো, সেই গথিক ধাঁচের বাড়িগুলো ছিল সৌন্দর্যের আকর। ছিল। এখন আর নেই। পুরোনো শহরে পা দিয়েই এই মর্মান্তিক ধ্বংসের চেহারার সামনে সে মূক হয়ে গেল ক্ষনেকের জন্যে। পরক্ষনেই সচকিত হয়ে উঠল। তাদের বাড়ির কাছে একটা তামার কারখানা ছিল। শত্রু বিমানের লক্ষ্য সেটাই ছিল নিশ্চয়। তার ফলেই এই ধ্বংস। মনে হতেই ভয়ে ভাবনার কাতর ছুটছিল গ্রেবার।

হাঁপাতে হাঁপাতে যখন থামল, তখন চারপাশে ধ্বংসের তাণ্ডবের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে তার শৈশব কৈশোরের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু, সে যে এমন আর কিছু চিনতেই পারছে না। কোথায় গেল সেই পথ, অলিগলি। সব যে একাকার হয়ে গেছে। একজন বৃদ্ধাকে তরতর করে আসতে দেখে সে বলে উঠল 'এই যে ঠাকুমা! হাকেনষ্ট্রাস কোন দিকে বলুন তো?'

গ্রেবারের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হড়বড় করে বুড়ি বলল' ওই তো বাছা,

দো মুখো রাস্তার ডান দিকে গেলেই পেয়ে যাবে।' বুড়ি চলে গেল।

গ্রেবারও এগোল।

ডানদিকে ঘুরতেই আগে চোখে পড়ল বড় বড় গাছগুলোর আধপোড়া ভগ্নাবশেষ। কত কালের সব গাছপালা। এখনও যেন আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কাথ্‌রিনেনকার্শ গির্জাটার চূড়া এখান থেকেই স্পষ্ট চোখে পড়ত। চিহ্নও নেই এখন। ভগ্ন, বিধ্বস্ত মনে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সে। বুঝতে তার কিছুই বাকি রইল না। এগোতে লাগল সে। কিছু দূর গিয়েই দাঁড়াতে হল তাকে। ব্যস্ত লোকেরা ছুটোছুটি করছে। স্ট্রেচারে করে বোধ হয় আহতদেরই বয়ে নিয়ে যাওয়া দেখল সে। ঘন অন্ধকারে খানিকটা জায়গা জুড়ে লালচে আভা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওপর দিকে। তামার কারখানাটা জ্বলছে তখনও। তবে আগুন কমে এসেছে। জল ছেটানো হচ্ছে পাম্পের সরু নল দিয়ে। দমকলগুলো খুবই ব্যস্ত। কারা যেন মাটি খুঁড়ছে। স্ট্রেচার গুলোতে তাহলে সব মৃতদেহ। কি ঘন ধোঁয়া। জলের তোড়েও কমছেনা। তখন, তখন সে খুঁজে পেলো হাকেনষ্ট্রাস পথটাকে।

□ সাত □

একটা দোমড়ানো ল্যাম্পপোষ্টে ঝোলানো প্লেট থেকে নামটাকে পড়তে পারলো। বিশাল একটা গর্তের ওপর ঝুঁকে রয়েছে পোষ্টটা। ওই তো আঠারো নম্বর বাড়ি। বাহ্। একমাত্র তাদের বাড়িটাই অক্ষত রয়ে গেছে। থাকতেই হবে। দৌড়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই আর্তনাদ করে দাড়িয়ে পড়ল সে। সামনের দেয়ালটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে কিছুই নেই। একটা ভাঙ্গাচোরা পিয়ানো মাথার উপর বেঁকানো লোহার বিমে ঝুলছে। তার রীতগুলো যেন দাঁত বার করে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত ভেংচাচ্ছে তাকে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি? দেয়ালটা যে মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। যান, পালান।'

'কেন? এটা কি আঠারো নম্বর বাড়ি নয়?'

'দূর মশাই আঠারো নম্বরই আর নেই এখানে। দশ দিনে ছ'বার বিমান আক্রমণ। আর কিছু থাকে।'

হঠাৎ কি হল গ্রেবারের, লোকটার কোটের কলার মুঠো করে চেপে ধরল সে, 'বল, কোথায় গেল আঠারো নম্বর বাড়িটা?'

'ছেড়ে দিন বলছি। আমি এখানকার এয়ার রেড ওয়ার্ডেন। পুলিশ ডাকলে বিপদে পড়বেন। জেলে আটকে রাখবে।'

'পুলিশের বাবাও আমাকে আটকাতে পারবে না, দাঁত চেপে বলল গ্রেবার, আমি সীমান্তে ফেরৎ সৈনিক।' কলারটা অবশ্য ছেড়ে দিল সে।

ওয়ার্ডেন হেসে উঠল হো হো করে। দারুন বলেছেন মাইরি, সীমান্ত-ফেরৎ সৈনিক। আরে মশাই, যেখানে এখন আছেন, সেটা কি সীমান্তের বাইরে, অ্যাঁ?'

এবার গরম স্বরে গ্রেবার বলল, 'দেখুন। আঠারো নম্বর বাড়িতে আমার মা বাবা আছেন। আমি সেটাই খুঁজছি।'

'বৃথা। হাকেনষ্ট্রাসে কেউ থাকে না এখন। আমি ওয়ার্ডেন। এবং এখানকারই বাসিন্দা ওই উল্টো দিকের বাড়িটা দেখুন। ভগ্ন স্তূপ তার নিচে আমার স্ত্রী পড়ে আছে। উদ্ধারকারী দলের সময় নেই। তারা আরও বড় কাজে অন্যত্র ব্যস্ত। আমাদের ধীর সৈনিক মশাই, আপনি এইসব দুঃখের কথা কিছু বুঝবেন? তার চেয়ে যান, ওই যে খোঁড়াখুঁড়ি করছে লোকগুলো, ওখানেই ছিল আঠারো নম্বর বাড়ি। যান, গিয়ে দেখুন গে।'

গ্রেবারের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। পা দুটো ভারী। সেকি দুঃস্বপ্ন দেখছে। এটা তো রাশিয়া নয়। এ তার নিজের জার্মানী। জার্মানী তো থাকবে অক্ষত, অটুট। গ্রেবার কোন মতে এগিয়ে গেল। একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা আঠারো নম্বর বাড়ি?'

লোকটা একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল, 'এই ভাগ এখান থেকে।'

'এই চুপ। শুনতে দে।' ওভারশিয়ার চেঁচিয়ে বলেই পাইপের মুখে কান পেতে কি যেন শুনতে লাগল। অনেক দূর থেকে বোধহয় অ্যাম্বুলেন্স আর দমকলের ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। ওভারশিয়ার মুখ তুলে বলল, 'গোঙানি আর নিঃশ্বাসের শব্দ আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে। বেঁচেই আছে মনে হয়।'

আগের লোকটা বলল, 'ওপাশ দিয়ে আর একটা পাইপ পুঁতে দাও। তবু কিছুটা তাজা বাতাস পাবে।'

গ্রেবার তার ঝোলা ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি একজন সৈনিক। আমার শরীরে বলও আছে। আমি যদি সাহায্য করি আপনাদের, আপত্তি নেইতো?'

'তাহলে তো ভালই হয়। উলমান! একে একটা বাড়তি শাবল দাওতো।'

প্রথম যাকে উদ্ধার করা হলো তার দুটো পা-ই থেতলে গেছে। বেঁচে আছে। জ্ঞানও আছে। গ্রেবার সাগ্রহে দেখল। চিনতে পারলো। বুকের ভেতরটা দুর-দুর করছে তার।

পরের বার উঠল একেবারে চেপ্টে যাওয়া দুটো মৃতদেহ। কাঁচা চুল দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেবার। তার বাবা মা দু'জনেরই পাকা চুল। চাঁদ উঠেছে।

ততটা অন্ধকার আর নেই। গ্রেবারের একটা হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে।

'আরে, ওই ব্যাগটা আপনার না? ওই দেখুন, একটা লোক নিয়ে পালাচ্ছে।'

ফিরে দেখেই গ্রেবার ছুট দিল। একটা ভাঙ্গা বাড়ির স্তূপ বেয়ে উঠছে লোকটা। তার হাতে ব্যাগটা। অনায়াসেই ধরে ফেলল গ্রেবার তাকে। ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে মারতে গিয়ে থমকে গেল। হাড্ডিসার এক বৃদ্ধ। কেমন অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছে গ্রেবার। শত দুঃখেও হাসি পেল গ্রেবারের। কিছু না বলে রাস্তায় নেমে এল সে। ঠিক তখনই একটা জিপ ঘ্যাচ করে থেমে গেল তার পেছনে। 'কি হচ্ছে এখানে? কে তুমি?' দুজন এস এস পুলিশ তাকে ঘিরে ধরেছে।'

'আমি ওখানে, আমার মা বাবার খোঁজে এসে খোঁড়াখুড়িতে সাহায্য করছি। জিজ্ঞেস করবেন চলুন।'

'তোমার পরিচয়পত্র কিছু থাকলে দেখাও।' গর্জে উঠল একজন পুলিশ।

রাগে গ্রেবারের চোখ দুটোও মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। তবু হাঙ্গামা এড়াতে ব্যাগ খুলে ছুটির কাগজপত্র এগিয়ে দিল।

'হুঁ, আঠারো নম্বর হাকেনষ্ট্র্যাস। আপনি যেখানে খোঁড়াখুড়ি করছেন, সেটা বাইশ নম্বর। আঠারো নম্বর ওইটা।' বলে পিয়ানোওয়ালা বাড়িটার পাশেরটাকে নির্দেশ করল। কাগজপত্রগুলো ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'রাত্তিরে চেষ্টা করে কোন লাভ হবেনা। রাতটা বরং রেডক্রশের তাবুতে থেকে কাল সকালে আপনার মা বাবার খোঁজ করবেন। বলা যায় না, বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন।'

গ্রেবার বলল, 'আচ্ছা, এটা কি নিষিদ্ধ অঞ্চল। ওয়ার্ডেন যে বলল।'

'আরে দূর দূর! ওটা হাফ পাগল মশাই।'

পুলিশ দুজন চলে গেল।

দরজাটা খুঁজছিল গ্রেবার। একধারের ভাঙ্গা ইঁট পাটকেলের স্তূপ যা পরিষ্কার হয়েছে, তাতে ভেতরে ঢোকার মতো ফাঁক ফোকর কিছু নেই। পাশের বাড়ির দেয়ালটা এসে ভেঙ্গে পড়েছে তাদের ফুল বাগানের ওপর। কি যেন একটা নড়ে উঠল! ওঃ বেড়াল। ঢিল মারতেই পালালো। তেড়ে গেল খানিকটা গ্রেবার। তখনই দেখল গাছে বাঁধা দোলনাটা। পেছনে সেই লেবু গাছটা। ছেলেবেলার সব স্মৃতি মুহূর্তে তার মাথার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠল যেন। রাত্রির এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে সবই ইন্দ্রজালের মত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

চাপা পড়ে গেছে পেছন দিককার দরজাটাও। গ্রেবার ভেতরে ঢোকার সুবিধা করতে না পেরে একটা লোহার বিমে ঘা দিল। কান পাতলো। একটা চাপা গোঙানি শোনা যাচ্ছে যেন। ভ্রম নয়তো। দৌড়ে সিঁড়ির ওপর গিয়ে ফের কান পাতলো। বিড়ালটা সরে গেল। তখন মনে হলো বাবা মা চাপা পড়ে আছে। অসহায়ভাবে হাত মেলে দিয়ে কাতর আর্তনাদ করছে। সে কি ভুল শুনছে। নিচে

নেমে দেঁাড়ল। উদ্ধারকারীদের অনুরোধ করতে হবে। হাত-পা কাঁপছে তার। শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'এই যে ভাই! ভুল করছেন। এটা নয়, আঠারো নম্বর ওই বাড়িটা। দয়া করে একবার এদিকে আসুন।'

'কোথায় যাবো? ওটা অনেক দিনের পুরনো বাড়ি মশাই। তাছাড়া, এখানে দু'একজন বেঁচে আছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা মরুক আপনি তাই চান নাকি?' ওভারশিয়ার বলল।

'না, না, তা নয়। তবে ওখানেও আমার মা বাবা এখনও হয়তো···আসুন না দয়া করে একবার।' গ্রেবার মিনতি জানালো।

'অযথা তর্ক করে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।' ওভারশিয়ার বিরক্তির স্বরে বলে উঠল, 'ওখানে আর কেউ জীবিত নেই। থাকলে আমরা জানতে পারতাম।' ওভারশিয়ার নিজের কাজে লেগে গেল।

গ্রেবার পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একা একা তো সে কিছুই করতে পারবে না। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল তার।···মাগো, তুমি কোথায়! তুমি কি রোটেনবুর্গে চলে গেছো মা? নিশ্চয় গেছো, আর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছো। আর আমি তোমার আর্নষ্ট। অসহায় হয়ে ধ্বংস স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে! ধ্বংস তো সে কম দেখেনি। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ধ্বংসের চেহারা সে আর কখনও দেখেনি। কি সুন্দর জ্যোৎস্নায় ভরে আছে চারদিক। সাড়া শব্দ নেই কোথাও। কোথা থেকে বিড়ালটা এসে ওর পায়ে গা ঘষলো কয়েকবার। গ্রেবার টেরও পেলো না।

□ আট □

সকালের রোদ মুখে পড়তে তার ঘুম ভাঙ্গল। ভাঙ্গা সিঁড়িটার গায়ে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজেনি। লোকাল অফিস নিশ্চয় খোলেনি। পাশের ভাঙ্গা বাথটাবে খানিকটা পরিস্কার জল দেখে অবাক হলো সে। বৃষ্টি তো হয়নি। তবে বুঝি দমকলের জল। যা হোক। জলে নিজের মুখের ছায়া দেখে চমকে উঠল। ব্যাগ থেকে সাবান বার করে ময়লা হাত দুটো ধুয়ে নিল। ক্ষত থেকে একটু রক্ত পড়ল। ধোয়ার পর শুকিয়ে গেল। ক্ষিদে অনুভব করল। ফ্লাস্কে ভালো কফি রয়েছে খানিকটা। রুটিও আছে। বার করে তাই চিবুতে লাগল। কোথা থেকে বিড়ালটা এসে ম্যাও ডেকে তাকালো। এক টুকরো রুটি ছিড়ে দিলে সে। বিড়াল টুকরোটা নিয়ে সরে বসল। খেতে লাগল।

লোকাল অফিসে আহত নিহতদের তালিকায় গ্রেবার মা বাবার নাম খংজে গেলোনা। অফিসার মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে সে বলল, 'ভালই তো। তাহলে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

'সেকি। তাহলে কোথায় খংজে পাবো?'

একজন অফিসার পেছন থেকে বলে উঠল, 'হের গ্রেবার। নিরুদ্দেশ হলে কি আর খংজে পাওয়া যায়। দেখুন তালাশ করে যদি পান। রেজেষ্ট্রি অফিসে যান।'

গ্রেবার চুপ করে তাকিয়েই রইল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে পুরো সকালটাই ব্যর্থ হয়ে গেলো।

রেজিষ্ট্রি অফিসেও কোন হদিশ পাওয়া গেল না। একজন সৈনিক গ্রেবারের হাত ধরে নিয়ে এল। 'কাকে খংজছেন মশাই?'

'বাবা মাকে খংজছি আমার।'

'আর আমি খংজছি স্ত্রীকে। অবাক করে দেবো বলে আগে জানাইনি।'

আমারও তাই। আগে দুতিনবার ছুটি পেয়েও আসতে পারিনি। এবার যখন পেলাম তখন চিঠি লেখার সময় নেই। মা বাবা তাই জানেও না যে আমি আসছি।' গ্রেবার বলল।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে হিটলারপ্লাত্সে এল। সৈনিক প্রশ্ন করল, 'তা কি করবেন এখন ভেবেছেন?'

'ভেবে অবাক হচ্ছি যে এত লোক থেকে উবে গেল কি করে?'

'হ্যাঁ। যাদুর খেলা যেন। পাঁচদিন ধরে বউকে খংজছি। ভ্যানিশ হয় গেছে যেন।'

বলছিলাম যে গ্রামগুলো একবার খংজে দেখলে হয় না। সেগুলো তো অনেকটা নিরাপদ।' গ্রেবার বলল।

'দূর মশাই। কটা গ্রাম খংজবেন? তদ্দিনে বুড়ো হয়ে যাবেন। তার আগেই অবশ্য ছুটিও খতম হয়ে যাবে। তার চেয়ে আসুন এক কাজ করা যাক। আমি আপনার মা বাবার খোঁজ নেবো যেখানে আমি যাবো। আপনি আমার স্ত্রীর খোঁজ নেবেন যেখানে যেখানে যাবেন? ঠিক তো? আমার নাম লিখুন।' সৈনিক বলল, 'বোটশের। আর আমার স্ত্রীর নাম আলমা, আলমা বোটশের।'

গ্রেবার নাম দুটো টুকে নিয়ে নিজের মা বাবার নাম দুটো একটা চিরকুটে লিখে লোকটার হাতে দিল।'

চিরকুটের নাম দুটো দেখে পকেটে রেখে বলল সৈনিকটি, 'আমাদের এরপর কোথায় দেখা হচ্ছে?'

গ্রেবার মাথা নেড়ে বলল, 'ওই তো ভাবছি তখন থেকে।'

সৈনিক বলল, অত ভাবাভাবির দরকার নেই। ছুটি পাওয়া অভাগা সৈন্যদের

জন্য অস্থায়ী শিবির খুলেছে। সোজা কম্যাণ্ডান্টের অফিসে চলে যান। একটা অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিন। শুনুন। আটচল্লিশ নম্বর তাঁবুর অনুমতিপত্র চাইবেন। ওটা অসুস্থদের জন্য। ঝামেলা কম। খাওয়া দাওয়া ভাল। আমিও আছি ওখানেই। যান, দেরী করবেন না।' বোটশের নামে দৈনিক পকেট থেকে সিগারেট বার করে গ্রেবারকে একটা দিয়ে, নিজেও একটা ধরালো।

'কোথায় আমাদের আবার দেখা হবে তাহলে?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'এই খানে হলেই ভাল।' বোটশের বলল, 'কয়েকটা হাসপাতালে খবর নেবো আজ। সন্ধ্যার পর দেখা করা যাক। ধরুন, ন'টার সময়?'

ঠিক আছে। তাই। আগে এনে অপেক্ষা করবেন। আমিও করব।'

'আচ্ছা, তাই!'

গার্টনষ্ট্রাসের প্রথম বাড়ি দুটোই ভাঙ্গা। কেউ থাকা সম্ভব নয়। তবে তিন নম্বর বাড়িটা অক্ষতই আছে। সীগলার পরিবারের বাড়ি। মিঃ সীগলার তো বাবার বন্ধুই ছিলেন। সিঁড়ি নিয়ে ওপরে উঠে কলিংবেল বাজাতে ভেতরে শব্দ হলো। গ্রেবার অবাক। তবে নিশ্চয়ই কেউ আছে।

খানিকপর একজন খুবই শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধা দরজা একটু ফাঁক করে তাকালেন। 'আপনি ফ্রাউ সীগলার তাই না?' আমি আনর্ষ্ট গ্রেবার। চিনতে পারছেন না বুঝি!

'চিনেছি বই কি। ভেতরে এসো বাবা।'

ভেতর থেকে ভারী স্বরে প্রশ্ন হল, 'কে?'

'পল গ্রেবারের ছেলে, আনর্ষ্ট। যাও, ভেতরে গিয়ে বসো বাবা।'

বৃদ্ধ সীগলার এলেন। একমাথা সাদা চুল। মুখে একটুকরো বিষণ্ণ হাসি। 'তোমাকে দেখতে পাবো তা ভাবতেও পারিনি, আনর্ষ্ট। নিশ্চয়ই সীমান্ত থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ। এখন বাবা মার খোঁজ করছি। রাশিয়াতে থাকতেই শুনেছিলাম যে আমাদের শহরে বোমা পড়েছে। কিন্তু এমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছে, তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি। বাবা মার খবর কিছু জানেন? লোকাল অফিসগুলোও তো কিছুই বলতে পারছি না।' গ্রেবারের গলার স্বর উদ্বিগ্নই শোনালো।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা সীগলার এককাপ কফি আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। ইচ্ছে না করলেও বাধ্য হয়ে খেতে হল গ্রেবারকে।

বৃদ্ধ সীগলার বললেন, 'তোমার মা বাবার সঙ্গে পাঁচ ছ' মাস আগে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর আর ওদের খবর জানিনা। তখন তো ওরা ভালই ছিলেন।'

'এখন কোথায় খোঁজ পাবো, বলুন তো?' অসহায় শোনালো গ্রেবারের কণ্ঠস্বর।

'বিশ্বাস করো, সত্যিই কিছু জানি না আমরা, আর্নস্ট।'

'না, না অবিশ্বাস করব কেন?' গ্রেবার ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, বিরত করলাম আপনাদের। মাপ করবেন।'

'আহা, কি যে বলে, ফ্রাউ সিগলার মধুর হেসে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে। তা আছো কোথায় এখন?'

'ঠিক করিনি কিছু। তাবুতে চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'আমাদের তো বাড়তি ঘর নেই। না হলে বলতাম।'

'তাতে কি হয়েছে। আজ চলি তাহলে।'

'এসো। ভাল থেকো বাবা।'

বৃদ্ধা সীগলার দরজা অবধি এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গ্রেবার বুঝতেই পারল যে বুড়োবুড়ি কিছু গোপন করে গেল। বোটশার ঠিকই বলেছিল। জানলেও কেউ কিছুই বলবেনা ভয়ে। আর এই ভয়ের সুরু আজ থেকে নয়, সেই তেত্রিশ সন থেকে মানুষের বুকে দলার মত জমতে জমতে এখন অনেক বড় হয়ে গলা বন্ধ করে দিয়েছে।

ফ্রাউ লুসির সঙ্গে দেখা করে বেশ হতাশই হলো গ্রেবার। বিরাট হলঘরটা, মালপত্তর বিছানায় যেন স্তূপাকৃতি হয়ে রয়েছে। একদিকের দেয়ালে বেশ বড় একটা অয়েল পেন্টিং রয়েছে ফুয়েরারের। কয়েকটা স্বস্তিকা চিহ্নিত পতাকাও আছে। কজন মহিলা আর বাচ্চা বাচ্চা মিলে হই চই করে একেবারে নরক বানিয়ে রেখেছে। ফ্রাউ লুসিও কেমন জবুথবু, থলথলে হয়ে গেছেন। খোলা চোখে কিছুক্ষন গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, মরে গেছে, আর্নস্ট।'

গ্রেবার চমকে উঠল, 'কি করে জানলেন? স্বচক্ষে দেখেছেন আপনি?'

'তাহলে এত নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'চারদিকের অবস্থা দেখেও তুমি কিছু বুঝতে পারছ না? লেনা মারা গেছে। অগাস্টও। তুমি তো দুজনকেই চিনতে। লেনাকেও শেষ দেখা দেখতে দেয়নি ওরা আমাকে, কাছেও যেতে দেয়নি, আর্নস্ট।' বলতে বলতেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন উনি। 'এমন অন্যায় কেন করল ওরা আমার সঙ্গে? তুমি তো সৈনিক, তুমি জানো নিশ্চয়ই?'

কান্না একদম বরদাস্ত করতে পারে না গ্রেবার। ওর বুকের মধ্যেও উথাল পাতাল শুরু হলো। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তখনই বাইরের দরজার আড়াল থেকে হের লুসির হাতছানি দিয়ে ডাকা চোখে পড়ল। এগিয়ে ঘরের

বাইরে চলে এলো সে। হের লুসিও একেবারে বুড়িয়ে গেছে। মাথায় টাক! কণ্ঠাটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পাকানো দড়ির মত হয়েছে চেহারাটা গ্রেবারের কাঁধে একটা হাত রেখে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, ছোট দুটো যাবার পর ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে। তুমি কিছু মনে করো না যেন, আর্ণস্ট। ওর ধারণা সবাই শেষ···আসলে, গত ছ'মাস ধরে অবস্থাটা কি শোচনীয় পর্যায় চলে গেছে···কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, ভয়ে মুখ বন্ধ সবার। তবে, আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মা নিরাপদেই কোথাও আছেন। মাসখানেকেও হয়নি, ওই বিমান আক্রমনের আগেই তো দেখা হয়েছিল।'

গ্রেবারের চোখ দুটো আশায় চকচক করে উঠল। 'তখন কেমন দেখেছিলেন?

'শরীরের কথা বলছো? কেন, ভালোই তো দেখেছিলাম।' হের লুসি বললেন একটু যেন দ্বিধার স্বরে।

গ্রেবার লজ্জা পেল। বেঁচে থাকাটাই যেখানে বড় কথা, সেখানে একমাস আগের শারীরিক হালচাল জানতে চাওয়াটাই অবাস্তব। সে ক্ষমা চেয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না, হের লুসি। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। দুঃখিত।'

'খুবই স্বাভাবিক, বাবা! গোটা পৃথিবীটাই যখন দুঃখের সাগরে ডুবে গেছে, তখন নতুন করে আর দুঃখিত হবার কিছু নেই।'

গ্রেবার বেরিয়ে এল। ক্লাব বাড়িটাকে প্রথমে যতটা নিস্প্রভ, নিস্প্রান মনে হয়েছিল, এখন আর সে ভাবটা নেই। অনুভব করল সে মনে মনে, জীবন বোধহয় এখনও কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে। ওই তো কুকুর ছানা দুটো রাস্তায় খেলা করছে। নাথার ওপর জীবন্ত নীলাকাশ। রোদ্দুরের প্রভায় ঝলমলে গাছের পাতা গুলো এখনও সজীব!

☐ নয় ☐

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সে সময় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। যা অন্ধকার, নম্বর দেখার প্রশ্ন ওঠে না। তবু বলে উঠল, 'কে আছেন? এটা কি বাইশ নম্বর মেরিনস্ট্রাসে?'

'হ্যাঁ, কি চাই?' পায়ে বুট, এস, এস, লর্দিপরা একজন বেরিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে দেখে গেব্রার বুঝলো যে ওয়ার্ডেন গোছের কেউ। হাতে যখন রাইফেল নেই। 'কাকে দরকার আপনার?'

'হের ক্রুজে, স্বাস্থ্য দপ্তরের উপদেষ্টা।'

লোকটার চোখে মুখে বিস্ময়। ক্রুজেকে কি দরকার?'

'সেটা ওকেই বলব।' বিরক্ত গ্রেবার কথা না বাড়িয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। সারাদিন খোঁজা খুঁজির পর এত ক্লান্ত লাগছে। দু'একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বটে। তারা কেউ কিছু বলতে পারেনি বা চায়নি বলতে। গেষ্টাপোর ভয়ে সবার মুখ বন্ধ। সোজা তেতলায় উঠে এল সে। বারান্দাটা অন্ধকার। ডাক্তার ক্রুজের মুখটা স্পষ্ট করে এখন মনে করতে পারল না সে। তবে মা চিকিৎসার জন্যে অনেকবার এসেছে। হতে পারে যে কদিন আগেও এসেছে। সেক্ষেত্রে ঠিকানাটা ডাক্তার ক্রুজে জানেন।

বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের এক মহিলা, বেশ লম্বা, এসে দাঁড়ালেন। গ্রেবার ঠিক চিনতে পারলো না। বলল, ডাক্তার ক্রুজে আছেন কি ?'

মহিলা কোন জবাব না দিয়ে গ্রেবারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগলেন। সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবার রাস্তাও দিলেন না। আপনি কি চিকিৎসা করাতে এসেছেন ?'

'না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে এসেছি। আপনি কি ফ্রাউ ক্রুজে ?'

'না। তিনি মারা গেছেন।'

গ্রেবার অবাক হয়ে মহিলার কঠিন, নিষ্প্রান চোখমুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় অনেক ঘৃন্য প্রবঞ্চনা দেখেছে সে। এখন হঠাৎ রাগের তালটা বুকের মধ্যে থেকে উঠে এল।' দেখুন, এখানকার ব্যাপার আমি কিছু জানিনা, জানতেও চাই না। ডাক্তার ক্রুজের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'তিনি থাকেন না এখানে' মহিলার স্বরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কিন্তু দরজায় তো নেম প্লেট রয়েছে।'

'ভুলে তোলা হয়নি আর কি।'

'আশ্চর্য। রাগে গ্রেবার যেন উত্তাল হয়ে উঠল। হিংস্র প্রানীর মতো তার সৈনিক চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হয়তো আঘাতই করে বসতো সে মহিলাকে, ঠিক সেই সময় পাশের দরজাটা খুলে গেল। গ্রেবার দেখল দরজার ফ্রেমের মধ্যে আলোকিত একটি অনিন্দ্য সুন্দর মুখ। পরক্ষণে কি মিষ্টি স্বরে বলে উঠল, 'আমাকে কেউ খুঁজছেন নাকি ?'

'মহিলকে কিছু বলতে না দিয়েই গ্রেবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ডাক্তার ক্রুজে বা তার আত্মীয় কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'বলুন। আমি এলিজাবেথ ক্রুজে।'

এই সময় মহিলা গম্ভীর স্বরে, বলল বড় আলোটা নিভিয়ে ছোট আলোটা জেৱলে নাও।' বলেই ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গ্রেবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। তরুনী এগিয়ে এল সামনে। উনিশ কুড়ি বছরের তন্বী তরুনী। ছিপছিপে দেহের বাঁধুনি যে কি মনোমুগ্ধকর।

টানা দ্‌টি ভুর্‌। কুচকুচে কালো চোখের মনিদ্‌টি কি চঞ্চল। প্‌ষ্ট দ্‌টি কাঁধ বেয়ে নেমে গেছে ঘাড় ছাপিয়ে নিচে ঢেউ খেলানো গ্‌চ্ছ গ্‌চ্ছ কেশরাশি। গ্রেবারের নাকে একটা হালকা প্রসাধনের গন্ধও এসে লাগল। কিছ্‌ই বলতে পারছিল না গ্রেবার। কেবল দেখছিল।

'বাবা এখন আর চিকিৎসা করেন না তো।' তর্‌নী মিষ্টি স্বরে বলল।

'আমি তো চিকিৎসার জন্যে আসিনি, একটা খবর নিতে এসেছি।' গ্রেবার বলল।

তর্‌নীর দ্‌টি চোখে সতর্কতা নেমে এল। ঘাড় ঘ্‌রিয়ে দেখল যে মহিলাটি এখনও আছেন কিনা। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ভেতরে আস্‌ন।'

গ্রেবার তর্‌নীকে অন্‌সরণ করে আলোকিত ঘরের ভেতর এল।

'আমি আপনাকে চিনি।' তর্‌নী হঠাৎ ঘরে দাঁড়িয়ে বলল।

গ্রেবার তেমনই ম্‌গ্ধ দ্‌ষ্টিতে সেই কালো দ্‌টি অতল গভীর চোখ দ্‌টির দিকে তাকিয়েই রইল। হৃদয় গহীনে তার কি যে মধ্‌র অন্‌ভূতি জাগল।

'আপনি তো এখানকার হাইস্কুলেই পড়তেন, তাই না?' তর্‌নী আবার বলল।

অবাক গ্রেবারের চোখে ম্‌খে অফুরান বিস্ময়। গহীন কালো দ্‌টি বড় বড় চোখ, কালো কেশের ঢলে দ্‌রন্ত বন্যা··মনে পড়ে গেল গ্রেবারের। আনন্দে, বিস্ময়ে বলে উঠল, এলিজাবেথ। সত্যি চিনতে পারিনি তোমাকে। সাত আট বছর আগে শেষ দেখা। আর এখন সে তুমি কত বড় হয়ে গেছো।'

'সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?' হেসে বলল এলিজাবেথ।

'আর কত বদলেও যে গেছো।'

'তুমিও তো কত বদলে গেছো।' চিব্‌কে টোলফেলে হাসল এলিজাবেথ।

গ্রেবার ওর ম্‌খের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর ঘরের চারপাশে দেখে নিয়ে হেসে বলল, 'বেশ জেনারেলের মতো রাজকীয় ভাবে আছো মনে হয়?'

'রাজকীয় ভাবে? এলিজাবেথ কর্‌ণ চোখ তুলে ম্লান হেসে বলল, 'ঘ্‌ন্য বন্দির মতো এখানে আছি, ব্‌ঝলে?'

গ্রেবার বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি? তোমার বাবা···?'

'দাঁড়াও, এক মিনিট।। এলিজাবেথ উঠে গিয়ে গ্রামোফোনে 'সৈনিক বীর চলছে এগিয়ে' রেকর্ডটা আস্তে করে চালিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, 'নাও! এবার বলো?'

'এ আবার কী?' শহর শ্‌দ্ধ্‌ লোক পাগল হয়ে গেল না কি, মনে মনে বলে উঠল গ্রেবার। তারপরই বলল, 'ওটা বন্ধ করে দাও তো। যথেষ্ট এগিয়েছি, আর না এগোলেও চলবে আমাদের। তুমি নিজেকে বন্দি বললে কেন ব্‌ঝলাম না।'

'ওই মহিলাকে দেখেও ব্‌ঝতে পারলে না। গ্‌প্তচর, ব্‌ঝলে! দরজায় কান

পেতে কথা শুনছিল আমাদের। তাই রেকর্ডটা চাপিয়ে দিলাম। যাকগে, বাবার কথা কি যেন বলছিলে ?'

'আমি শুধু ওকে…'

তাকে নামিয়ে দিয়ে এলিজাবেথ বলল, 'আগে বলতো কতটুকু কি তুমি জান বাবার সম্পর্কে ?'

'আমি আবার কি জানব। ব্যাপার কি ? কিছু হয়েছে নাকি ওর ?'

'সত্যিই তুমি কিছু জাননা, শোননি ?'

'আরে, আমিতো শুধু মার ঠিকানাটা জানতে এসেছিলাম। কি শুনবো আমি ?'

'তাই।' এলিজাবেথের মুখটা নিরাশার আঁধারে ছেয়ে গেল। গ্রেবার বিভ্রান্ত। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। এলিজাবেথ মাথা নিচু করে নখ খুঁটছে। 'বিশ্বাস করো, এলি…'

'কিছু বলতে হবেনা। বুঝেছি।' এলিজাবেথ বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে বাবার কিছু খবর পাবো।'

'আমার কাছ থেকে তোমার বাবার খবর ? খুলে বলতো কি ব্যাপার ?'

'বাবা এখন বন্দি শিবিরে।'

'কেন বন্দি শিবিরে কেন ?'

'তিনি নাকি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কি বলেছেন। মাসখানেক আগের কথা। তুমি যখন তাই বাবাকে খুঁজতে এলে, ভাবলাম বাবার কিছু খবরই বোধহয় আনলে।'

'আমি কিন্তু…'

'তোমাকে বলতে হবে না, আর্নস্ট, বুঝেছি। গোপন খবর এনেছ ভেবেই তোমাকে তখন সাবধান করে দিতে চেয়েছি।'

কতবার যে শুনলাম আজ এই শব্দটা, সাবধান! হুঁহ! রেকর্ডটা বন্ধ করে দাও না। অসহ্য লাগছে।'

'তা দিচ্ছি থামিয়ে।' এলিজাবেথ সংকোচের স্বরে বলল, 'তোমার কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ না থাকাই ভাল, আর্নস্ট।'

হঠাৎ ভীষণ রেগে গেল সে। 'কেন বলতো ? আমি কি গুপ্তচর ?'

'তা নয়, অর্নস্ট। বুঝতে চেষ্টা করো।' এগিয়ে গিয়ে রেকর্ডটা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমান আক্রমনের কর্কশ ধ্বনিসংকেত ভেসে এলো।

এলিজাবেথ স্বর নিচু করে বলল, 'আবার সাইরেন।'

বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ বলল, 'আলো নেভাও তাড়াতাড়ি।'

'গ্রেবার এক লাফে উঠে গিয়ে দরজা খুলেই খিঁচিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে কি ?'

কিন্তু ততক্ষণে মহিলা সরে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল গ্রেবার, 'শয়তান মাগী! এটা এখানে এসে জুটেছে কেন ?'

'আমার ওপর নজর রাখতে, আবার কেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ।' এলিজাবেথ বলল।

'তা তুমি এই নরকে পড়ে আছ কেন? চলে যেতে পারোনা অন্য কোথাও। সময় তো বয়ে যায়নি।'

'তবু যেতে চাইনা কারন পালাতে চাই না বলেই।' আলো নিভিয়ে দিয়ে এলিজাবেথ রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে দিল, সাইরেনের শব্দ আরও জোরে আছড়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

এলিজাবেথের দুচোখে জলের রেখা অন্ধকারে চকচক করে উঠল। গ্রেবারের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একটা প্রচণ্ড ক্রোধ উত্তাল হয়ে এই পৃথিবীটার ওপরই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কিছু তছনছ করে দিতে চাইল। জানালা দিয়ে বাইরের আর্ত কোলাহল ভেসে এল। গ্রেবার গর্জে উঠল চাপা স্বরে, 'তুমি যে এখানে এভাবে পড়ে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। অন্য কোথাও চলে যাওয়াটাই তোমার উচিত।'

'এখন শেল্টারে চল তো।' বলে এলিজাবেথ গ্রেবারকে দুহাতে ধাক্কা দিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। গ্রেবার একটু অবাক হয়েও বলে উঠল, 'দাঁড়াও! আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে!'

বাইরে তখন আর্ত হাহাকারের মত মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি। বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় করে ওঠে। একটা চেতনা আচ্ছন্নকারি শীতল প্রবাহ বয়ে যায় শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে। যেন পৃথিবীর আদি ও অন্তিম আর্তনাদ, কোনদিন থামবে না, মুক্তিও পাবে না মানুষ।

হঠাৎ এলিজাবেথের মুখে টর্চের আলো পড়ল। কে যেন বলল, 'আমাদের সঙ্গে চলে এসো।' এলিজাবেথ উত্তর দিল, 'না। আপনারা যান।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গ্রেবার জিজ্ঞেস করল, 'চোরকুঠরিটা কোথায় জান নাকি?'

'হ্যাঁ, কাছেই, কার্লপ্লেৎসে।'

জনতার ঢল নেমেছে যেন রাস্তায়। কে কাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়চ্ছে, গ্রাহ্যও করছে না। ওয়ার্ডেন আর কত সামলাবে। এলিজাবেথ বলল, 'এদিকে সরে এসো! সবাই ঢুকে যাক। পরে যাব আমরা।

'ভয় করছে না তো তোমার? গ্রেবার জিজ্ঞেস করল।

'তা তো করছেই। তবে ওপরে থেকে যতটা না করছে, নিচে গেলে তার চেয়ে বেশি করবে।

এই সময় বেচারা ওয়ার্ডেন ভাঙ্গা গলায় বলল, 'এবার আপনারা যান। সাবধানে নামবেন সিঁড়ি দিয়ে।'

কুঠরিটা নিচুতেই, । কিন্তু বেশ মজবুত । গ্যালারির মতো । মাঝখান দিয়ে পথ । জিরো পাওয়ারের কয়েকটা বাতি জ্বলছে । লোকজন সব সঙ্গে খাবার দাবার, স্যুটকেস, বিছানা, কম্বল সঙ্গে এনেছে । ভাঁজ করা চেয়ারও দেখা গেল অনেকের কাছে । যেন নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে হতভাগ্য মানুষের দল । নিজের দেশ জার্মানীতে শেল্টারে এই প্রথম ঢুকল গ্রেবার । কি বিচিত্র ! মৃত পাণ্ডুর মানুষের মুখের মিছিল যেন । এলিজাবেথও ব্যতিক্রম নয় । কান পেতে শুনছে প্রতিটি শব্দ । কেবল শিশুগুলোর মুখে তেমন কোন ভীতির চিহ্ন নেই । দেখতে দেখতে গ্রেবার কেমন অসুস্থ বোধ করল । আসন্ন একটা বিপদের গন্ধ যেন তার নাকে এসে ধাক্কা দিল ।

ভেতরের গুমোট ভাবটা হঠাৎ বাইরের এক ঝটকা টাটকা বাতাসে কেটে গেল । সবাই এবার হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতে চাইল । আসন্ন বিপদটা বোধ হয় কেটেই গেল । এক বৃদ্ধ বলে উঠল,' ওরা বুঝি চলেই গেল ।'

অন্য কে একজন বলে উঠল, 'ফের চলে আসবে । ব্যাটারা ইচ্ছে করেই ভান করে পালাবার । লোকজন নিশ্চিন্ত হয়ে যেই বাইরে বেরোয়, তখনই ফের ঝাঁপিয়ে বোমাবর্ষন করতে থাকে ।'

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর ওরা সবাই বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল ।

'ওহ । মাটির নীচের ওই কবরখানা আমার দম বন্ধ করে দেয় । আবার যে কখনও এসে নীলাকাশের নিচে দাঁড়াবো, তা ভাবতে পারি না ।' এলিজাবেথ বলল ।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে । গ্রেবার বলল, 'বাড়ি ফিরবে তো ?'

'তাছাড়া আর কোথায় যাবো । রাস্তায় তো আর ঘুরে বেড়ানো যাবো না ।'

'তুমি অন্য কোথাও তো যেতে পারো ?'

ঠাট্টার স্বরে এলিজাবেথ বলল, 'তোমার ঘরে ?'

'আরে, আমার তো কোন ঘরই নেই ।' ক্লান্তি, অবসাদে শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে গ্রেবারের । হাঁটু দুটো দুর্বল । চলতে চাইছে না আর ।

'কোথাও যেতে পারিনা আমি। তাতে বাবার বিপদ বাড়বে ।' চাপা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে এলিজাবেথ বলল, 'আমার অবস্থাটা তুমি বুঝবে না ।'

গ্রেবার হাসল মনে মনে। আজ আর কেউ কাউকে আমরা বুঝি না চাইও না বুঝতে । চুলোয় যাক । আমার কি মাথাব্যথা । এতক্ষণে তার বাবা মা হয়তো তাকে খুঁজছে হাকেনষ্ট্রাসে । কেমন একটা বিতৃষ্ণা জাগল তার । সেটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি এগোও এলিজাবেথ । আমিও যাই । জরুরী কাজ আছে । গুডনাইট ।'

বোটশার টাউন হলের সামনেই দাঁড়িয়েছিল । ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্নায় সামনের

সিংহ মূর্তি'টাকে কেমন ভূতুড়ে ছায়ার মতো লাগছিল। দূরে গ্রেবারকে দেখেই বলে উঠল, 'খবরটবর আছে নাকি ?'

'না। তোমার কি খবর ?' গ্রেবার উত্তর দিল।

'কিছু না। হাসপাতালগুলো ঘোরাই সার হল। যাদু, বুঝলে। ওই যে বলেছিলাম। কেউই কিছু জানে না তো বলবে কি ? চল তো, গলাটা ভিজিয়ে নিই কোথাও বসে।'

হিটলারপ্রাত্সের দিকে এগোল দুজনে। রাত্রির নির্জনতা ভাঙ্গছে শুধু ওদের পায়ের ভারী বুটের শব্দ। বোটশার নীরস স্বরে বলল, 'আর একটা ছুটির দিন মাঠে মারা গেল। এমনি করেই সবটা যাবে।'

বোটশারের পরিচিত ছোট রেস্তরাঁর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। খদ্দের নেই আর। জানালার ধারের একটা টেবিলে বসল টিমটিমে বাতি জ্বলছে। জানলাটা ঢাকা কালো কাপড়ে মেটোসোটা বিশাল চেহারার মহিলা মালকিন দু' গ্লাস বিয়ার এনে রাখল টেবিলের ওপর। গ্রেবার বেরিয়ে দেখল পাতলা গাউন পরা, ভেখরে কিছুই পরেনি। নধর পাছা দোলাতে দোলাতে চলে গেল।

'আমি এখানে বসে বিয়ার খাচ্ছি, আর বউটা যে আমার কোথায়, একা নাকি কে জানে ধুশ্শালা। এত খারাপ লাগছে।'

'আমি ভাবছি বাবা মার কথা। সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন শুনলেও শান্তি পেতাম।' গ্রেবার বলে উঠল।

'বাবা-মা। ওদের আর কি দরকার আমাদের জীবনে। সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সুখের কথা। কিন্তু বউ, ভাবো একবার। ওহ্!'

আরও দু'গ্লাস বিয়ার চাইল বোটশার। তারপর ঝোলা থেকে রাতের খাবার মত কিছুটা বার করে টেবিলে রাখল। বিয়ার দিতে এসে মুটকি মালকিনের চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেল। 'ও বাবা, এ যে দেখছি রাজকীয় খাবার ?'

'রাজকীয় কি, বাছা, সম্রাটের খাদ্য বলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখিয়ে, বুঝলে ? ঝোলায় এখনও মাংস, সসেজ, চিনি ভর্তি'। বলতে বলতে বড় এক গ্লাস মুখে পুরে দিয়ে একচুমুক বিয়ার খেয়ে নিল। গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসল। 'তোমার কি ভাবনা। খেয়ে দেয়ে বাইরে থেকে একটা মেয়ে জুটিয়ে নিলেই রাতের মতো নিশ্চিন্ত।'

মহিলা মালকিন তার কথার ধরন দেখে চলে গেল।

গ্রেবার বলল এবার, 'তোমার তো তাহলে হাতের সীমানাতেই রয়েছে।'

'আরে দূর। ময়দার বস্তার চাপে দম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বলে শুঁটকি চেহারার মাগীগুলোকেও সহ্য করতে পারি না আমি। মেয়েরা হবে বেশ টাপুর টুপুর স্বাস্থ্যবতী। সে যদি আমার বউকে দেখতে তো বুঝতে। পালকের গদী। বুঝলে।'

গ্রেবার হাসল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'একি! চললে নাকি?'

'হ্যাঁ। কম্যাণ্ডাণ্ট অফিস থেকে তাবুতে থাকবার অনুমতি দিয়েছে।'

'খুব ভাল। শোন। আটচল্লিশ নম্বরে সোজা চলে যাও।'

'তুমি যাবে না?'

বোটশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না। তুমি যাও। আমি একটু বসি।'

গ্রেবার ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। শহরের শেষ প্রান্তে তাবুগুলো। চারিদিক নিঃস্তব্ধ, নিঝুম। গ্রেবারের মনে হলো হাকেনষ্ট্রাসে তাদের বাড়িটার মতো তার আগের জীবনটাও বুঝি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার যেন সে সেই যুদ্ধ সীমান্তে ফিরে এসেছে। এখানে অবশ্য গোলা-গুলি কামান রাইফেল নেই। কিন্তু একই রকম বিপজ্জনক।

□ দশ □

দিন তিনেক পরের কথা। আটচল্লিশ নম্বর তাবু। একটা টেবিলে চারজন তাস খেলছে। খেতে বা ঘুমুতে তিনজন যদিবা নড়াচড়া করছে, কিন্তু রুমেল নামে চতুর্থজন তাসেই যেন বুঁদ হয়ে আছে। আসলে তিন দিন আগে এসেই স্ত্রী আর মেয়েকে কবরস্থ করতে হয়েছে তাকে। স্ত্রীকে তো মুখ দেখে চেনা যায়নি, কেবল উরুতে একটা বিশেষ জন্ম চিহ্ন দেখে সনাক্ত করতে পেরেছিল। সেই থেকেই চুপ করে তাস খেলে যাচ্ছে। গ্রেবার চিঠি লিখছে জানালার পাশে বসে। বোটশার নাকি এবুর্গ গেছে। পরে হার্ষ্ট-এও যাবে। রোটারের একটা পা জখম। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা জানালার ওপর রেখে বলল, 'গ্রেবার! চিঠি লিখে কিছু হবে না। তার চেয়ে যাও, একপাক ঘুরে এসো।'

রঙরুটদের বোমা ছোঁড়া শেখানো হচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখে আপন মনেই হেসে উঠল গ্রেবার। উঠে জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে তাবু থেকে বেরুতেই 'আনর্ষ্ট' ডাক শুনে ফিরে তাকালো।

সুন্দর ছিপছিপে চেহারার একজন এস এ কম্যাণ্ডার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসছে। হালকা, বাদামী চোখ দুটো দেখে মনে পড়ে গেল গ্রেবারের। বলে উঠল, 'ব্যাডিং, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ বন্ধু, আলফ্রান্স ব্যাডিং। ছুটিতে আছো নিশ্চয়ই। রাশিয়া সীমান্ত ফেরৎ বন্ধুর দেখা পাওয়া এখন ভাগ্যের ব্যাপার। তোমার সম্মানে তাই

একটু পান করা যাক। তবে এখানে নয়, বাড়িতে। চল।'

গ্রেবারের মনে পড়ল যে উঁচু ক্লাশে তারা দুজন বছর দুয়েক একসঙ্গে পড়েছিল বটে। তবে তেমন ঘনিষ্টতা তো ছিলনা। তাই ভুলেই গেছিল প্রায়। কিন্তু এ ছোকরা তো অনেক উন্নতি করেছে দেখছি। এস এ কম্যাণ্ডার। ঝকঝকে উর্দি, চকচকে জুতো। তাই প্রথমটা এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, 'কিন্তু আলফ্রান্স, আমার হাতে যে সময় নেই।'

'ওসব অজুহাত শুনছি না। পুরোনো দিনের সম্মানে একটু পান করব দুই বন্ধু। চল।'

গ্রেবারের হঠাৎ মনে হলো যে, বাবা-মাকে খুঁজে বার করতে আলফ্রান্স সত্যিকার সাহায্য করতে পারে। ওপর মহলে নিশ্চয়ই ওর যাতায়াত আছে। একটা না একটা পথ তো বলে দিতে পারবেই। বলল, 'বেশ। চল যাই।'

বাড়িটা শহরতলীর একপ্রান্তে। বেশ নির্জন এলাকা। ছোট একতলা বাড়ি। সাদা রঙ করা। বসার ঘরটা বেশ বড় আর সুন্দর করে সাজানো। হরিণ, শুওর আর ভালুকের তিনটে চামড়া সহ মাথা তিনদিকের দেয়ালে ঝুলছে। কয়েকটা আঁকা ছবিও রয়েছে। সোফাসেটিতে সাজানো ঘর। 'তুমি শিকার করো, জানতাম না তো।' গ্রেবার বলল।

'আরে দূর! তুমিও যেমন। সব কেনা। বন্দুক আমি ছুঁয়েও দেখিনি কোন দিন। যাকগে। আমার রুবেন সুন্দরীকে কেমন দেখছো! ওই যে পিয়ানোটার ওপর?'

এবার দেখল গ্রেবার। আঁকা ছবিই বটে। তীব্র উন্মাদক যুবতীর নগ্ন দেহ। স্বচ্ছ এক সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ সোনালী চুল পিঠ বেয়ে পড়েছে, আর সূর্যের আলোতে তার সুডৌল নিতম্ব আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে। বোটশের দেখলে পাগল হয়ে যেতো। 'দারুণ!' গ্রেবার বলে উঠল। রুবেনের ছবি তো!'

তাহলে আমার রুচির তারিফ করছো তো? যাকগে। এবার বলো, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?

আলফ্রান্সের কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে গ্রেবার বলল, 'বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছি না। বহু চেষ্টা করলাম।'

'শহরে না থাকলে খুঁজে বার করা কঠিন, আর্নেষ্ট। চারদিকে যা বিশৃঙ্খল অবস্থা। দু'একদিন সময় দাও। দেখি চেষ্টা করে। তা তুমি তাবুতে পড়ে আছ কেন? আমার এখানে এসে থাক না।'

'তুমি একা থাকো বুঝি?'

'অবশ্যই। বিয়ে করেছি ভাবছ নাকি? অত বোকা নই আমি। কত মেয়ে আমার চারপাশে। এই তো সেদিন একটা মেয়ে এসে সোজা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। তা বিছানায় কাটাল ঘণ্টা খানেক। তারপর বলে কি, না আমার স্বামীকে বন্দি শিবির থেকে বার করে এনে দাও।'

'তোমার সে ক্ষমতা আছে না কি?' গ্রেবার অবাক হয়ে তাকালো।

আলফ্রান্স হাসল।' কাউকে বন্দিশিবিরে ঢোকাতে পারি অনায়াসে। কিন্তু বের করে আনা অত সহজ নয়। কথা দিইনি। দেখা যাক। তা তুমি কি ভাবছ বল?'

'আর কয়েকটা দিন দেখি, আলফ্রান্স। সবাইকে তো তাবুর ঠিকানাই দিয়েছি। যদি খবর আসে কোন।'

'ঠিক আছে, তোমার যা খুশী। কালকে কিন্তু তুমি অবশ্যই আসছে। আর, হ্যাঁ। হাসপাতালগুলোতে তোমার মা-বাবার খবর নিয়েছিলে তো?'

'তা নিয়েছি।'

'তাহলে কবরখানাগুলোতে খবর নাও। যদিও তেমন কিছু আশা করিনা। তবে দেখতে তো দোষ নেই। কাল কিন্তু তুমি আসছ। জমিয়ে গল্প করা যাবে।'

'তাহলে আজ চলি।' গ্রেবার উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও। এক বোতল আরমোইনাক নিয়ে যও। দারুণ জিনিস।

'আজকেই তো বেশ খেলাম। আবার কেন?' গ্রেবার মৃদু প্রতিবাদ করল।

'আরে, তোমার সঙ্কোচের কারন নেই। অনেক আছে আমার। নাও। আগামী কাল কিন্তু অবশ্যই আসছ?'

গেবার ফের হাকেনষ্ট্রাসে এল। আলকন্সের কথা ভাবতে লাগল। এই প্রথম কেউ তাকে সাহায্য করতে চাইল। অসঙ্কোচে তার বাড়িতে থাকতেও বলল। একজন এস, কম্যান্ডার, যে জীবনে বন্দুক স্পর্শ করেনি। অথচ, কত নিরপরাধ মানুষকে অবহেলে বন্দিশিবিরের অন্ধকূপে ঠেলে দিয়েছে। পকেটের বোতলটা বেশ ভারি লাগছে।

তখন বিকেলের সোনালী আলো মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যে নেমে আসছে। গাছের পাতাগুলো কি আশ্চর্য সবুজ। আকাশের বুকে কে যে সোনা গেলে ঢেলে দিয়েছে। বাড়ির ভাঙ্গা স্তূপের সামনে এসে দাঁড়াল গেবার। ভাঙ্গা দরজার পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে দেখল তার টাঙিয়ে যাওয়া চিঠিটা তেমনই আছে। অনুরোধে সাড়া দেয়নি কেউ। আশ্চর্য, বাবা মার কোন খবর নেই। চারদিকে তাকাল সে। সিঁড়ি ধারের ভাঙ্গা চেয়ারটা নেই। সে জায়গায় কি যেন পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা ছেঁড়াখোঁড়া খাতা। ফেলে দিল ছুঁড়ে। দুটো ইঁটের মাঝখানে একটা বই পেলো। তুলে নিয়ে দেখল। মলাট নেই। মুছে যাওয়া কালিতে অস্পষ্ট নামটা পড়তে পারল গেবার। তারই নাম। তার স্কুলের সময়কার ইতিহাস বই। ভেতরের পাতাগুলোর ধারে তার লেখাও রয়েছে। তার সব

অস্তিত্ব যেন কিসের উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বইটা পাশে রেখে বসে পড়ল সে। তারপর পকেট থেকে আরমোইনাকের বোতলটা বার করে গলায় ঢেলে দিল কিছুটা। ভগ্নমনে তারপর রাস্তায় নেমে এল সে।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল সে কার্লপ্লাতসের দিকে। আচমকা কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

'এই, কে রে হাঁদা। দেখে বলতে পারিস না।' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল গ্রেবার।' কে, লুডউইগ নাকি?'

'আরে আর্নস্ট? কিছু মনে করো না ছুটিতে নিশ্চয়ই? আমার তো শেষ। তাই দৌড়চ্ছি। গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

গ্রেবার বলল, 'আমার সবে চারদিন হল। তা তুমি ছুটি কেমন কাটালে?'

'আর বলো না ভাই। মা বাবার সঙ্গে থাকা এক ঝকমারি। সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে রাখবে। সবাই কে ডেকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমি যেন একটা সঙ। তারপর এসেছি যখন তখন এক দফা কান্না। আর এমন যাবার সময়ও আরেকদফা কান্না! তোমাকে বলছি গেবার, মা বাবার বেশী কাছাকাছি ঘেঁষণা। তাহলে কষ্ট পাবে।'

গেবার ম্লান হেসে বলল, 'আমার তো সেই সৌভাগ্য হলই না, লুডউইস।'

'বেঁচে গেছে। আচ্ছা চলি আর্নস্ট। তাড়া আছেই আমার।'

'এসো। দেখে যেও।' গেবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিভ্রান্ত গ্রেবার বুঝতে পারলো না এখন কি করবে। সারা শহরটাকে অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে। তাবুতে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় খুঁজবে সে এখন মা-বাবাকে এই অতল অন্ধকার পৃথিবীতে। ভাঙ্গা বাড়িগুলোর স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল সে, এই জন্যেই কি সীমান্তের বিভীষিকা থেকে ক'দিনের জন্য মুক্ত হয়ে সংসারে, আপনজনদের সান্নিধ্যে একটু হারে মন জুড়োতে এসেছিল? একটু শান্তি পেতে চেয়েছিল? হায় বুঝতেও পারেনি যে তার সেই শান্তির নীড় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে করাল মৃত্যুর মতো সমুদ্রের তান্ডব উচ্ছ্বাসে। আর কুৎসিৎ যুদ্ধটা এখন এসে পড়েছে ঘরের সীমান্তে, মানুষের বুকের মধ্যে, তাদের শিরা-উপশিরাতে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে!

সামনে একটা সিনেমা হল দেখে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল গ্রেবার। এই মৃত্যুর শহরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এখানে অন্তত: ঘণ্টাদুয়েক সময় চুপচাপ বসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

□ এগার □

কবরখানায় গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল গ্রেবার। বোমার আঘাত মরা মানুষদেরও রেহাই দেয়নি। চারিদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। গির্জার ধারে অস্থায়ী একটা ছাউনিতে একজন ওভারশিয়ার আর দুজন সৈনিক কাজ করছে। গ্রেবারের কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ওভারশিয়ার, 'আমাদের বলে শিরে সংক্রান্তি, উনি এলেন মা-বাবার খোঁজে। আমরা যেন হাত গুনে বসে আছি।'

'নামের তো একটা তালিকা আছে আপনাদের ?' শান্ত স্বরেই বলল গ্রেবার।

খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলো ওভারশিয়ার, 'তালিকা ? যান, ওপাশে, গির্জায় গিয়ে দেখুন অবস্থাটা। এক্কেবার বোমা পড়ছে আর শ'য়ে শ'য়ে মরা আসছে। তিনশো, পাঁচশো, সাতশো। আবার কখন বোমা পড়বে কে জানে। তালিকা! হেহ্।'

গ্রেবার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে তিনটে সিগারেট সামনের টেবিলে রাখল। 'খান, ভাল রাশিয়ান সিগারেট। বাবার জন্যেই এনেছিলাম।' গ্রেবার নিজেও একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা পকেটে ভরে ফেলল।

ওভারশিয়ার একগাল হেসে সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাঃ! খাসা সিগারেট। এক কাজ করুন। নামটাম লিখে দিন কাগজে। এদের একজন গিয়ে অফিস থেকে তালিকাটা দেখে আসুক। আপনি ততক্ষণ গির্জাতে গিয়ে মৃতদের একবার দেখে আসুন। ওগুলোর নামের তালিকা তৈরী হয়নি এখনও।'

গির্জার ভেতরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গ্রেবার। কম মৃতদেহ তো জীবনে সে দেখেনি, কিন্তু এ দৃশ্য তো কল্পনাও করা যায় না। শত শত মৃতদেহ একসঙ্গে পড়ে আছে। কফিনে, স্ট্রেচারে, কম্বলে বা সাদা কাপড়ে ঢাকা রয়েছে অল্প সংখ্যকই। বাকি সব অনাবৃত। একে একে সব দেখল গ্রেবার। আরও অনেকে দেখছে। কয়েকজন, যারা সন্ধান পেলো, হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

গ্রেবার বেরিয়ে এল।

'পেলেন খুঁজে ?' ওভারশিয়ার জানতে চাইল।

মাথা নেড়ে গ্রেবার বলল, 'না।'

'আপনাদের, সৈনিকদের লোহার অন্তঃকরণ, তাই অমন দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন। সবাই পারে না! এখানে তো তবু আমরা চেষ্টা করছি। অন্যত্র তো

একসঙ্গে গণকবর দেওয়া হচ্ছে।

তখন সেই স্লিপ নিয়ে যাওয়া লোকটা ফিরে এলো। 'না, এই নামের কোন লোক তালিকাতে নেই।'

গ্রেবার বেরিয়ে এল বাইরে। হঠাৎ শরীরটা কেমন পাক দিয়ে উঠল।

ব্যাডিংয়ের বাড়িতে যখন সে পেঁছলো তখনও সন্ধ্যে হতে বেশ দেরী আছে। ছোট্ট বাগানটা বেশ সাজানো। পাথরের একটা নগ্ন নারী মূর্তিও রয়েছে বার্চ গাছে ঘেরা। কোথা থেকে একটা পাখীর মিঠে শিষ ভেসে আসছে।

দরজায় টোকা দিতে পরিচারিকা ফ্রাউ ক্লাইনার্ত দরজা খুলে বলল, 'আপনি হের গ্রেবার তো? কম্যাণ্ডার একটা জরুরী পার্টি মিটিংএ গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছেন। একটু দাঁড়ান। বলে ভেতরে গিয়ে চিঠি আর কাগজে মোড়া একটা বোতল নিয়ে এল। 'এই নিন।' গ্রেবার চিঠিটা পড়ল। 'তোমার বাবা-মাকে খুঁজতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করো না। কারণ, এই শহরে তারা মরেননি বা আহতও হননি। খুব সম্ভব ওদের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি খোঁজ রাখছি। ইতিমধ্যে আমার রাশিয়া ফেরৎ বন্ধুর রাতের ফুর্তির জন্য ভদকার বোতলটা রেখে গেলাম। আনন্দ করো।'

ভদকার বোতলটা পকেটে রেখে দিল সে। ফ্রাউ ক্লাইনার্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে, কাল আসব বলে ফিরে চলল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল সে। মানুষ কি বিচিত্র! এস এ কম্যাণ্ডার আলফ্রান্স কারও প্রতি এমন আন্তরিক ভালবাসা দেখাতে পারে। অথচ কত শত নিরীহ, নির্দোষ লোককেই না সে অবহেলে বন্দি শিবিরে পাঠিয়েছে, পাঠাবে। আবার ভাবতে গিয়ে হাসি পেলো। 'রাতের ফুর্তি?' কার সঙ্গে, কিসের ফুর্তি তার? তখনই হঠাৎ এলিজাবেথের কথা মনে পড়ে গেল তার। তাইতো। ওর সঙ্গে তো কিছুটা সময় অনায়াসে কাটিয়ে আসা যায়।

প্রথমবার দজ্জাল মেয়েছেলেটি তাকে হাটিয়ে দিল এলিজাবেথ নেই বলে। ঘণ্টা-খানেক ঘুরে টুরে ফের সে এলো। তখন এলিজাবেথ স্বয়ং দরজা খুলে দিতে অবাক হয়ে গ্রেবার বলল, 'তোমাকে পাবো ভাবিনি। ওই দজ্জাল মহিলাটি কোথায় গেল?'

এলিজাবেথ হেসে বলল, 'কি একটা নারী সম্মেলনে গেছে। তুমি ভেতরে এসো। বলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। আগে আগে যাচ্ছে এলিজাবেথ। কালো রঙের খাটো গাউন আর কালো সোয়েটার পরা এলিজাবেথের চওড়া কাঁধ, সরু কোমর তার চোখে রঙ ধরালো। মাথার চুল কাঁধের পেছনে লাল উলের ফিতে দিয়ে বাঁধা। চমৎকার!

ঘরে ঢুকেও মুগ্ধ হল গ্রেবার। চমৎকার সাজানো গোছানো। এলিজাবেথকেও আজ প্রথম দেখার দিন থেকে অনেক বেশী সুন্দর আর প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে।

ভদকার বোতলটা বার করে গ্রেবার বলল, 'দেখ, আমার এস এ কম্যাণ্ডার বন্ধুর

দেওয়া। দুটো গ্লাস নিয়ে এসো।'

দেরাজ থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে ধুয়ে টেবিলের ওপর রাখল এলিজাবেথ।

গ্রেবার বোতলে দু'বায় ঝাঁকুনি দিতে ছিপিটা খুলে গেল। গ্রেবার দুটো গ্লাস ভর্তি করে এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে দিল একটা।

এলিজাবেথ গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'কতদিন পর আবার আমাদের দেখা হলো, তাইনা?'

'হ্যাঁ, শতবর্ষ পরে। শিশু ছিলাম তখন আমরা, আমাদের পৃথিবীতে ছিল না কোন যুদ্ধ!'

'তাহলে এখন?'

'এখন তো আমরা বয়োবৃদ্ধ প্রাচীন মানুষ, অভিজ্ঞতার, প্রত্যয়হীনতার বোঝায় নুব্জ্য, ক্লান্ত, বিষন্ন মানুষ।'

এলিজাবেথের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। 'ভাবতে পারিনা সত্যিই। মনে হয় আজকাল যে এমনভাবে আরও কিছুদিন কাটাতে হলে, শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যেতে না হয়।'

'হ্যাঁ, সহ্যের সীমা তো থাকেই। সবার ক্ষেত্রেই।' গ্রেবার বলল।

'এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে সহ্যের নমুনা দেখাই একটু।' এলিজাবেথের পিছু পিছু ফ্রাউ লিজারের ঘরে এসে দাঁড়াল দুজনে। গ্রেবার প্রশ্ন করার আগেই এলিজাবেথ বলল, 'তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। আমার ঘরও তো উনি হুটহাট তল্লাসী করেন। আজ চাবি দিয়ে যেতে ভুলে গেছেন বলে তোমাকে দেখাবার সুযোগটা নিলাম।'

দেখল গ্রেবার। দেয়ালে টাঙানো বিরাট রঙিন ছবি হিটলারের। ফুলের মালা, ওক গাছের পাতা দিয়ে সাজানো। টেবিলে হিটলারের লেখা আত্মজীবনের একখণ্ড। দু'ধারে রুপোর বাতিদান। আরো দুটো ছোট ছবি, বার্চগাছের বনে শিকারী কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছেন; অন্যটাতে সাদা ধপধপে পোশাক পরা একটা বাচ্চা মেয়ে তাকে একগুচ্ছ ফুল উপহার দিচ্ছে। শয়তান, অসৎ ব্যক্তির প্রতি নারীর এমন অন্ধ অনুরোধের নিদর্শন অনেক দেখেছে গ্রেবার। ফিরে তাকিয়ে সে দেখল কি এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় এলিজাবেথের দুচোখ জলে ভরে উঠেছে।

এই মৃত্যুর মিছিল, এমন উন্মুক্ত ধবংসের স্রোতাকে কেউ সহ্য করতে পারে?'

এলিজাবেথের এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে গ্রেবার। সে একটুক্ষণ পর প্রশ্ন করল: 'ফ্রাউ লিজাই তোমার বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

'কি করে বলব বলো, তার আগে থেকেই তো তিনি এখানে ডেরা পেতেছিলেন নিজের বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে। আর বাবার নাম তো সন্দেহের তালিকায় ছিলই। তিনি পার্টির বক্তৃতা শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। বলতেন, জার্মানী কিছুতেই এযুদ্ধে

জিততে পারবে না।'

'হ্যাঁ, এখনতো অনেকেই একথা বিশ্বাস করে।' গ্রেবার বলল।

এলিজাবেথ বলল, 'বাবার পর তোমার মুখেই এমন স্পষ্ট কথা শুনলাম। আর তো কেউ বলে না। জানো আর্নেস্ট, আজকাল নিজেকে একটা আহত, রক্তাক্ত পাখীর মত মনে হয় যার বাকি জীবনটাও বদ্ধ খাঁচার মধ্যে থেকেই ক্রমশ পচে যাবে।'

গ্রেবার যন্ত্রণাটা অনুভব করল এলিজাবেথের। বলল, 'তোমাকেও তো একদিন বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দিতে পারে ডাইনী লিজার। তাহলে তোমার এখানে পড়ে থাকার পক্ষে কোন যুক্তি তো নেই।'

'জানি আর্নেস্ট। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, হয়তো আমার একটা অন্ধ বিশ্বাসই বলতে পারো, বাবা ঠিক একদিন ফিরে আসবেন। তখন যদি আমি না থাকি তবে তো আর কখনই খুঁজে পাবো না বাবাকে, চির জন্মের মত হারাতে হবে বাবাকে।'

নিচে থেকে অনেক মেয়ের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। এলিজাবেথ বলল, 'চলো, ফ্রাউ লিজার আসার আগে বেরিয়ে যাই। নির্জনে দুজনে মিলে একটু হাঁটি চলো।'

অন্ধকার পথঘাট। লোকজন নেই। দুজনে মারীনষ্ট্রাস ধরে নদীর দিকে এগোল। চারিদিকে মৃত্যুর মত অটল নীরবতা। কোন দিকে সজীবতার কোন লক্ষণ নেই। কেবল যেন ওরা দুজনই পৃথিবীর দুই আদিম মানব-মানবীর মত এক অবাস্তব স্থানের অবাস্তব পথ ধরে চলেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ওদের বাস্তবে ফিরিয়ে আনছে আকাশের গায়ে এক চিলতে চাঁদ। ম্যাড়মেড়ে জ্যোৎস্নায় আশেপাশের ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর জানালার কাঁচের ওপর গুণ চিহ্নের মত কাগজ সাঁটা চোখে পড়ছে। ভগ্নস্তূপগুলোকে বিশাল বিশাল দানবের মত মনে হচ্ছে।

আরও খানিকটা দুজনে এগোবার পর কানে একটা ঠুং ঠাং শব্দ পেলো গ্রেবার। কে যেন কাপের মধ্যে চামচ দিয়ে কিছু নাড়ছে। গ্রেবার বলে উঠল, 'দু'একজন তাহলে এখনও সজাগ আছে?'

'বোধহয় কফি বানাচ্ছে। আজই রেশনে দেওয়া হয়েছে তো। বোমা-কফি।'

'বোমা-কফি মানে?'

এলিজাবেথ হেসে উঠল, 'যতবার বোমা পড়ে, তারপরই বাড়তি কিছু কফি দেওয়া হয় রেশনে। চিনিও দেয় কখনও কখনও।'

'ও, তাই!' গ্রেবারও হেসে বলল, 'আমাদের সৈনিকদেরও ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা মরার ভয়ে গোলাবাজির মধ্যে টিকে থাকলে পর, কতকটা কড়া মদ, একশ' বা দুশো গ্রাম কফি আর প্যাকেট খানেক সিগারেট দেওয়া হয়।'

এলিজাবেথ আর কি বলবে। হাঁটতে লাগল চুপচাপ। খানিক গিয়ে গ্রেবার বলে

উঠল, 'চমৎকার রাত্রিটা আজ। তুমি তো আবার রেস্তোরা বা বারে যেতে চাইছ না। তো চল, আমার তাব্রে দিকে যাই। একটা মদের বোতল নিয়ে আসি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তারপর কোথাও ফাঁকাতে বসে নিঃশ্বাস ফেলা যাবে।'

'বেশ, চলো।' এলিজাবেথ বলল।

তাবুর সামনের বড় মাঠটার সীমায় এসে গ্রেবার বলল, 'তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা করো। আমি বোতলটা নিয়ে এখনই আসছি।'

জোর তাস খেলা চলেছে তাঁবুতে। কেবল রোটার বই পড়ছে। গ্রেবার নিজের বিছানার কাছে গিয়ে ব্যাগটা বার করতে করতে প্রশ্ন করল, 'বোটশার কোথায় গেল?'

'কে জানে।' একজন জবাব দিল। সকালে সাইকেলটা ভেঙ্গেছে। এখন হেঁটে হেঁটে ঘুরছে কোথাও। তবে নতুন খবর নেই তোমাকে জানাতে বলে গেছে।'

গ্রেবার ব্যাডিং এর দেওয়া অর্ধেক খালি আরমোইনাকের বোতল আর সেই সঙ্গে কোইন্যাক আর জেনিভার বোতলগুলো পেলো, কিন্তু ভদকার বোতলটা নেই। 'যাঃ! ভদকার বোতলটা গেল কোথায়?'

'কোথায় আবার, পেটে। কম্যুনিষ্ট দেশ থেকে ফিরেও পুঁজিবাদীদের মত আচরন কেন তোমার? ওটা কি আমাদের সবাইকে ভাগ করে দেওয়া উচিত ছিল না? বল? তবে তোমাকে ধন্যবাদ! আহা, কি স্বাদিষ্ট ভদকা!'

গ্রেবার হেসে ফেলল। দুটো কাগজের গ্লাস আর আরমোইনাকের বোতলটা নিয়ে জেনিভার বোতলটা রোটারকে দিয়ে বলল, 'ধরুন, হল্যান্ডের খাঁটি মাল। আপনি যেন এবার পুজিবাদী হয়ে যাবেন না। সবাই যেন একটু একটু পায়।'

রোটার বিছানার তলা থেকে ছিপি খোলায় স্ক্রু বার করে গ্রেবারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'বুঝতে পারছি আজ তুমি কোন মেয়ের কুমারীত্ব ঘোচাবেই। তা এটা রেখে দাও। নইলে উত্তেজনার মুহূর্তে হাত ফাত কেটে ফেলবে।'

গ্রেবার হেসে বলল, 'দরকার নেই। খোলাই আছে।'

ফেল্ডম্যান ওপাশ থেকে বলল, 'টাকা পয়সা লাগে তো নিয়ে যাও। আমার কোন কাজে লাগবে না। বোটার বলল, 'যুদ্ধ তো চলবেই। কিন্তু তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। আর বীর সৈনিকরা সহজেই মরে। কাজেই উপভোগ করে নাও যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত। যাও! দেরী করো না।'

যাবার সময় আড়চোখে দেখল সে রুমেলের সামনে জেতা টাকার স্তুপ, অথচ কারো মুখে কোন ভাবান্তর নেই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে শুধু।

সামনে নদীর জলে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। দুজনে বসে আছে টিলার ওপর গাছে ঘেরা বেঞ্চিটাতে। শহরটা বেশ দেখাচ্ছে এখান থেকে। 'কি চমৎকার রাত্রি আজ।' এলিজাবেথ বলল।

গ্লাস দুটো ভরে একটা তুলে ধরে গ্রেবার বলল, 'ধরো, পান করো, আর দুঃখ

দুঃখ সব ভুলে যাও।' গেব্রার গ্রাসে চুমুক দিল। বুকের ভেতর থেকে একটা ভাষাহীন উষ্ণ যন্ত্রণা জেগে উঠল তার। বুকটা নিঃশেষে খালি হয়ে গেল যেন।

এলিজাবেথ তখনই বলল, 'এ দুঃখ যে জীবনে আর ভুলে যাবার মত নয়, আর্নেস্ট। চারিদিকে শুধুই আঁধার। ওই নদীর ওপারে দেখ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'তাকিও না, আর কিছু ভেবোও না।' গেব্রার বলল।

'বেশ, আর কোন কথা নয়।' এলিজাবেথ বেঞ্চিতে অধো শোয়া হয়ে বুঝি ঘুমের রাজ্যেই তলিয়ে গেল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে নিস্তব্ধতাও বাড়ছে। আকাশে চলছে মেঘ আর জ্যোৎস্নার আলো আঁধারি খেলা। কতক্ষণ, কতযুগ যে কেটে গেল।

হঠাৎ সজাগ হয়ে গেব্রার বলে উঠল, 'কি ভাবছ অতো ?'

'অ্যাঁ!' সজাগ হয়ে উঠল এলিজাবেথ। 'আহ, কি ঘুম, কত যুগ যেন এমন নিশ্ছিদ্র শান্তিতে ঘুমোইনি।' হাই তুলে সে ফের বলল, 'রাক্ষুসে আঁধারের ভয় কাটাতে সামান্য হলেও আলো জেলে ঘুমোই আর ভয়ে ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠি।'

গেব্রার কিন্তু ঘুমোয়নি। সে এলিজাবেথের ভারাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেবলই আবোল তাবোল ভেবে গেছে। অনেক দিন পর বা বলা যায় জীবনে এই প্রথমবার এমন একটা প্রশান্ত রাত সে উপভোগ করল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'চলো যাই। অনেক রাত হয়েছে।'

নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। চলতে চলতে সখেদে বলে উঠল এলিজাবেথ, 'আলোর জন্ম দিলাম আমরা, অথচ, আজ আমরাই ফের গুহামানবের যুগে ফিরে যেতে চাইছি। কি পরিহাস।'

'হ্যাঁ, ইওরোপের সব দেশেই, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, বলকান, স্পেন এবং আফ্রিকা জুড়ে আজ এই অন্ধকারের বিস্তৃত সমুদ্র। কেবল ছোট্ট সুইজারল্যান্ড ছাড়া।'

'হ্যাঁ, অন্ধ পশুত্বের দিকে যাত্রা করেছি আমরা।' কেঁদে ফেলল এলিজাবেথ।

গেব্রার তাকে কাছে টেনে নিয়ে দু'হাতে এলিজাবেথের অনিন্দ্য সুন্দর মুখটা তুলে ধরে বলল, 'কেঁদো না, কেঁদো না। আমারও কি কষ্ট হয় না। আমি কি কাঁদছি ?' বলে ওর চোখ মুছে দিল। 'কাল আমরা অন্য জায়গায়, কোন আলোকিত জায়গায় বসে পান করব। আমি খুঁজে বার করব। চিন্তা করোনা।'

দুঃখের মধ্যেও হেসে বলল এলিজাবেথ, 'কোন ঝলমলে সুন্দরীর সঙ্গে তোমার সময় কাটানো উচিত ছিল, আর্নেস্ট।'

গম্ভীর স্বরে গেব্রার বলল, 'না। তেমন কাউকেই আজকাল সইতে পারি না আমি।'

'আমাকেও না ?' আবার একটু খোঁচা দিল এলিজাবেথ।

'তোমাকে পেয়েই তো মনে হচ্ছে যে আমি বেঁচে আছি। ভেবে দেখো তোমার আমার মধ্যে তো কোনো রকম ছলচাতুরী বা গোপনীয়তা নেই।'

'সত্যিই বলছ?' এলিজাবেথ যে বিশ্বাস করেও করতে পারছিল না।

'সত্যিই বলছি, এলিজাবেথ।' বলে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে চুমু খেলো গ্রেবার। তারপর তার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'কাল আমার সঙ্গে কোন রেস্তরাঁতে যাবে তো? গল্প করব, পান করব। আর ভুলে যাবো, যতটুকু সময়ের জন্যেই হোক, জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। বল যাবে?'

'যাবো আর্নস্ট। নিশ্চয়ই যাবো। তুমি আটটার সময় এসো।'

বাড়ির কাছে এসে গেছিলো। এলিজাবেথ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

গ্রেবার চুপচাপ অপেক্ষা করল ক'মুহূর্ত। তারপর ফিরল। মদের খালি বোতলটা ছুঁড়ে দিল ভগ্নস্তূপের দিকে। আরেকটা ছুটির দিন শেষ হয়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবল সে তাবুর দিকে যেতে যেতে।

□ বারো □

'কি করব বলো। দোকান দারনিকে নিয়েই অগত্যা শুলাম।' বোটশার বলল, একজন কাউকে তো চাই। নইলে ছুটিতে আসার মানে কী?'

'তা বলে ওই হস্তিনীর মতো আধবুড়িটাকে নিয়ে। তোমাকে গিলে ফেলতো হে।'

'আজ্ঞে না। অত সোজা নয়।' বোটশার জবাব দিল। সাইকেল দুর্ঘটনায় আঘাত পাওয়া পা-টা ঠাণ্ডা জলে ভেজানো। হাতে কফির মগ। 'কিন্তু মুশকিলটা কি হলো জানো? ঘুমের মধ্যে তাকে বউ ভেবে 'আলমা' বলে ডেকে ফেলেছি। অথচ মেয়েটার নাম লুইজি।'

'তারপর? ঠেঙানি দিলে তো?'

'আরে, আমি তো তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু অমন বাজখাঁই মেয়েটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। ভাবো একবার?'

'তা ওইরকম একটা মহিলাকে ঠকাচ্ছো তুমি?'

'আরে, না, না। সে জন্যেই তো এখন ভাঙা পা নিয়েই ফের বউকে খুঁজতে যাচ্ছি।' বোটশার জবাব দিল।

এবার গ্রেবারকে পাকড়াও করল ফেল্ডম্যান। 'এই যে চাঁদ, কাল সারারাত কোথায়

ফুর্তি করলে শুনি।'

'কি আবার করব?'

'আহারে, কিছু না করলে সমস্ত দুপুরটা মরা হয়ে ঘুমোলে কি এমনি।'

'জানিনা। কেমন যেন একটা ক্লান্তির পাহাড় আমার ওপর চেপেছে।'

এবার রোটার ধরল গেব্রারকে।' তা আজ রাত্তিরে কোন স্বর্গে কাটাবে ভেবেছ বল দিকি?'

'সেটাই তো ভাবছি', গেব্রার বলল, 'আচ্ছা, ভাল খাবার টাবার পাওয়া যাবে কোথায় বলতে পারেন?'

'একা না কেউ আরও সঙ্গে থাকবে?'

'থাকবে আর একজন।'

'তাহলে জার্মেনিয়াতে যাও। সেখানেই তোমার মনের মত সব পাবে। তবে একটা মুশকিল আছে। রেস্তোরাঁতে কেবল অফিসারদেরই ঢোকার অধিকার। তবে তোমারও শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো! অফিসারদের মতই। ভাল কথা, তোমার তো এতদিনে অফিসার হয়ে যাবার কথা। হলে না কেন?'

'হয়েছিলাম একবার কর্পোরাল। তা একজন লেফটেন্যাণ্টকে ধরে প্যাঁদাবার পর আমার পদটা কেড়ে নেওয়া হয়। আমার ভাগ্য ভাল যে জেলে পাঠায়নি আমাকে। তারপর আর কোন প্রমোশানও হয়নি। আর হবেও না। যাকগে। আমার পোশাক যা নোংরা হয়েছে। আপনার গলাবন্ধ কোটটা ধার দিন না।'

'শুধু কোট কেন। তোমাকে আমি কর্পোরালের পোশাকও দিয়ে দিচ্ছি। বেশ মানাবে তোমাকে। তবে শোন! সঙ্গে যদি মেয়ে থাকে তোমার, তাহলে জার্মেনিয়ার প্রধান যে পরিচারক তাকে আগে হাত করে বলবে যে জি, এইচ, কন সুমের যোহানিসবের্জের কসবের্গ ১৯৩৭-এর একটা বোতল দিতে। ওই মদ খেলে মরা মানুষ উঠে বসে।'

বাঃ! এমন একটা জিনিসই তো আমি খুঁজছিলাম। গেব্রার খুশী হলো।

গেব্রার কাঠের পোলটার ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জল বয়ে আসার কুলকুল শব্দ শুনল তার শৈশবের নদীটার। বাদাম গাছের নিচে বেঞ্চিটা এখনও আছে। কত স্বপ্ন দেখেছে সে ওই বেঞ্চিতে বসে। সব মিথ্যে হয়ে গেল। সে এগিয়ে গেল। বড় বাড়িটার কপাট খোলা। ও ঠেলে ভেতরে ঢুকল। কেউ নেই ভেতরে। শিক্ষক পোলমালের কথা মনে পড়ে গেল তার। ফিরে আসছে যখন তখন দেখল দারোয়ানটাকে। চিনতেও পারলো। তেমনই আছে। তবে মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে।

'আপনি কাউকে খুঁজছেন?' বুড়ো দারোয়ান জিজ্ঞেস করল।

'হের পোলমাল এখানে স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। চেনো তাঁকে? কোথায় আছেন

তিনি এখন ?'

তার সরাসরি প্রশ্নে বুড়ো দারোয়ান সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। তার চোখে মুখে ভয়।

ভয় পেওনা, গ্রেবার আশ্বস্ত করল তাকে, 'তোমার কথা শুনবার মতো কেউ নেই এখানে। বলো।'

'শুনেছিলাম যে উনি দু'নম্বর এয়ানপ্লাত্‌সে থাকেন। এখনও সেখানেই আছেন কিনা জানিনা। আচ্ছা, আপনি কি প্রাক্তন ছাত্র নাকি ?'

'হ্যাঁ, একসময় তো ছিলামই।' গ্রেবার হেসে ফিরে চলল।

দরজার কড়া নাড়তেই সেই লিজার মহিলার আবির্ভাব। তাকে দেখে মুখ বেজার হয়ে গেল গেত্রবারের। পরক্ষনেই অবশ্য পাশের দরজা খুলে এলিজাবেথ বেরিয়ে এল। তখন মহিলা একপাশে সরে গেল।

ঘরে আসতে এলিজাবেথ দরজা বন্ধ করে দিল। গেত্রবার কিন্তু এলিজাবেথের পোষাক দেখে ক্ষুন্ন হলো। 'তুমি কি আজকের রাতটার কথা ভুলে গেছো নাকি। এর চেয়ে ভাল পোষাক নেই তোমার ? যে রেস্তরাতে যাবো, সেখানে লেফটেন্যাণ্টদের নিচের কোন অফিসারকে ঢুকতে দেবে কিনা জানিনা। সে ক্ষেত্রে তোমার পোশাক অনেকখানি গুরুত্ব পাবে।' সামনে গতকালের ভদকার বোতলটা দেখে তুলে নিয়ে দুটো গ্লাসে ঢালল সে।' এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও। তারপর পোশাক পাল্টে এসো। আমি ততক্ষণ নিচে অপেক্ষা করছি।'

গেত্রবার যা ভেবেছিল তার চেয়েও কমসময়ে এলিজাবেথ নিচে নেমে এল। গেত্রবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো এলিজাবেথের দিকে। হালকা গোলাপী রঙের ফ্রকে চমৎকার মানিয়েছে এলিজাবেথ। একেবারে তন্বী, রূপসী। মুখের ভাবও যেন পাল্টে গেছে। চুলগুলো টানটান করে বাঁধা পেছন দিকে। দু'চোখে তার চপল চাপা হাসি।'

গেত্রবারের মুগ্ধ দৃষ্টি অভিবাদন করল যেন এলিজাবেথকে। 'হাসছ কেন, এলি ?'

'ডাইনীটা এমন চোখ বড়বড় করে দেখছিল যে আমার হাসি পেয়ে গেল।'

জার্মেনিয়া হোটেলটা বেশ মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশ থেকে ভাঙ্গা চোরা সব ময়লা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দারোয়ানটা দেখছিল বুলবুল করে সে কিছু বলার আগেই গেত্রবার উচু স্বরে প্রশ্ন করল, 'বার কোন দিকে ?'

'হলটার শেষে ডান দিকে, স্যার। অসুবিধে হলে হেড ওয়েটার ফ্রিত্‌সকে জিজ্ঞেস করবেন, স্যার।'

উল্টোদিক থেকে একজন মেজর আর দুজন ক্যাপ্টেনকে আসতে দেখে গেত্রবার

সৈনিকের মতোই অভিবাদন জানাল। তারাও মাথা নেড়ে চলে গেলেন। সামরিক নিয়ম, বুঝলে তো?'

'বুঝেছি।' এলিজাবেথ বলল, 'এখানে তো গণ্ডা গণ্ডা অফিসার দেখছি।'

'হ্যাঁ। সামরিক দপ্তরও কয়েকটা আছে এখানে শুনেছি।'

'তোমাকে যদি চিনে ফেলে তখন কি হবে?'

'কি আর হবে। আমাদের মতো সীমান্ত যোদ্ধাদের এখন অনেক কদর। তবে হয়তো দিন পনেরো কারাবাস হবে। ভালই হবে। একরকমের ছুটিতো পাওয়া যাবে।' গেত্রবার হাসল।

প্রধান পরিচারক ফ্রিতসকে সামনেই পাওয়া যেতে গেত্রবার তার হাতে দুটো নোট গুঁজে দিল। একটা চওড়া থামের আড়ালে তাদের দুজনকে বসিয়ে ফ্রিতস্ বলল, 'এখানেই সুবিধাজনক আপনাদের পক্ষে।'

ফ্রিত্স চলে যেতে হাঁসের মতো লম্বা গলাওয়ালা বৃদ্ধ এক পরিচারক খাবারের তালিকা নিয়ে ওদের কাছে এল। কি খাবেন, স্যার দেখুন।'

এক ঝলক তালিকাটা দেখে বুড়োর হাতে ফেরৎ দিয়ে গেত্রবার বলল, 'আমাদের যা চাই, এতে তা নেই। এক কাজ করো। জি, এইচ ফল মুসের ভাঁড়ার থেকে এক বোতল রোহানসবেজ' কসবেগে'র ১৯৩৭ নিয়ে এসো। খুব ঠাণ্ডা না হয়, দেখো।'

আসল রসিক বুঝে এবার বৃদ্ধ পরিচারক উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বেলজিয়াম বাছুরের জিভ আছে, টাটকা। সঙ্গে সুগন্ধী পুদিনার চাটনী আর স্যালাড।'

'খুব ভাল, 'গেত্রবার বলল, 'কিছু শুকনো চাট কস্বেগে'র জন্যে বুঝেছ?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।' বেশ সম্ভ্রমের স্বরে পরিচারক বলল, 'যদি চান তো বুনো স্ট্রাসবুগ' হাঁসের দুটো রোষ্টও নিয়ে আসি। এই রান্নায় আমাদের জুড়ি নেই?'

'তা জানি আমি। সেই সঙ্গে খানিকটা ডাচ পণির হলে আরও জমবে। কসবেগে'র স্বাদই পালটে যাবে। কি বল?'

'যথাথ' বলেছেন, স্যার।' বৃদ্ধ পরিচারক চলে গেল। খুশী মনে।

অবাক চোখে গেত্রবারের মুখের দিকেই তাকিয়েছিল এলিজাবেথ। বৃদ্ধ পরিচারক চলে যেতেই সে প্রশ্ন করল, 'এত সব তুমি কি ভাবে জানলে, আন'ষ্ট?'

গেত্রবার রহস্য করে হাসল।' মজাটা কি জান? আজ সকালের আগে আমি এসব কিছুই জানতাম না। এক সৈনিক বন্ধু রোটারের কাছে আজ সকালে সব জেনেছি। খুব ভাল লোকটা।'

'তাই বলো, 'হাসতে হাসতে বলল এলিজাবেথ, 'ওই বুড়ো ওয়েটার নিশ্চয়ই তোমাকে বড় দরের অফিসার ভেবে নিয়েছে; তেমনি আমিও ভাবছিলাম যে আমার আন'ষ্ট সত্যিই কোন বড় অফিসার নাকি? আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছে।'

'তুমি যে এতটা ভেবে নিয়েছ, এতেই আমার ভাল লাগছে।' মুগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখছিল গেরার এলিজাবেথকে। 'এই গোলাপী ফ্রকটাতে মানিয়েছে কিন্তু তোমাকে।

'আমার মায়ের এটা, জানো। গতকালই কেটে কুটে আমার মত করে নিয়েছি।'

'কাটাকুটি সেলাই ফোঁড়াই তোমার আসে নাকি? জানতাম না তো।'

'জানতাম না ঠিকই। কিন্তু এখন রোজই আট ঘণ্টা করে সৈনিকদের পোশাক তৈরী করতে হয়।'

'ও বুঝেছি। বাধ্যতামূলক কর্ম প্রকল্প, তাই না?'

'তাই। বাবার কথা ভেবেই কাজটা আমাকে করতে হয়।' বিষণ্ণ স্বরে এলিজাবেথ বলল।

এই সময় বৃদ্ধ পরিচারক বড় ট্রে করে খাবার দাবার নিয়ে এলো। বেশ যত্ন করে টেবিলে সাজিয়ে দিল সে। মদের বোতল আর দুটো হালকা সুন্দর গ্লাস রাখল এমন ভাবে যেন কোন দুষ্প্রাপ্য অমূল্য বস্তু। মশলার সুগন্ধে বাতাস সো সো করতে লাগল।

'উরিব্বাস। সত্যি সত্যিই রাজকীয় খানা দেখছি।' বিস্ময় ভরা স্বরে এলিজাবেথ বলে উঠল।

'রাজকীয় নয়, এলিজাবেথ, এ হলো আমার অশান্ত জীবনে শান্তির মত মহার্ঘ বস্তুকে ফিরে পাওয়া। ওহ্। কত যুগ ধরে যে ভাল রান্না করা খাবার চোখেও পড়েনি। কেবলই খেয়েছি বাজে কড়া মদ আর বস্তা পচা টিনের খাবার। হেজে মজে গেছে যেন আমার জিভ আর মুখ। আজ এই উৎকৃষ্ট মদিরা আর রাজার খানা খেয়ে সেই দুঃখ কিছুটা অন্তত লাঘব করতে তো পারবো।'

সাবধানে দুটো গেলাসে মদ ঢালল গেরার। কোন কথা নয়। নিঃশব্দে তারিয়ে তারিয়ে পান করতে লাগল। গেবার তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া কিছু এই মুহূর্তে ফিরে পেলো কিনা, তা ঠিক বুঝলো না। তবে অনুভব করল যে এতদিন মৃত্যুর বড় কাছাকাছি বাস করবার পর আজ এই নিভৃতে উত্তম মদিরা হাতে বসে যেন সুদূর জীবন থেকে ভেসে আসা কোন এক অলৌকিক সুরমূর্ছনা তাকে রূপ কথার মৃত রাজকন্যার মতো জীয়ণ কাঠির স্পর্শে সজীব করে তুলছে, এক মৃত্যুহীন জীবনের শরিক করে তুলছে, সে জীবনে নেই আর কোন আবিলতার চিহ্নটুকুও।

'বেঁচে যে আছি, এই অনুভূতিটাই যেন হারিয়ে গেছে আমার, এলিজাবেথ।' গেরার বলল খানিকটা উদাস স্বরে।

এলিজাবেথও বিষণ্ণ হেসে বলল, 'আমার আবার বেশী বেশী মনে পড়ে। অথচ কোন কাজেই লাগছিনা, দেখো।'

বৃদ্ধ ওয়েটারটা আবার ফিরে এসে বলল, 'কেমন লাগছে, স্যার? একেবারে শরতের ভোরের রোদ্দুরে জাঁক দিয়ে তৈরী, স্যার। এই রাইন ল্যাণ্ডে একে বলে মৃত সঞ্জীবনী সুরা। প্রথম গ্লাসেই বুঝেছেন তো?'

'গ্লাস কি ? প্রথম চুমুক বলো। পেটে তো নয় চলে যায় সোজা মগজে আর চোখে। রঙই পাল্টে যায় পৃথিবীটার।' গেব্রার সায় দিল।

বুড়ো একেবারে ডগোমগো, যেন কতদিন পর প্রকৃত রসিকের সন্ধান পেয়েছে। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে নীচু স্বরে বলল, 'দেখুন না ওপাশে। দুজন ক্যাপ্টেন এই মদই নিয়েছে। অথচ ঢক্ ঢক্ করে গিলছে চাষাদের মতো।' বলেই হাত কচলাতে কচ্‌লাতে অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল।

গেব্রার সেদিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর মুখ ফিরিয়ে এলিজাবেথের দিকে চেয়ে বলল, 'কি, কেমন লাগছে সঞ্জীবনী সুরা ?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ বলল, 'কিছু মনে করোনা, আর্নস্ট। আমার কেমন মনে হচ্ছে জেল পালানো কয়েদীর মতো, একটু পরেই যাকে ধরে ফের জেলে পুরে দেওয়া হবে।'

গেব্রার হঠাৎ চুপ করে গেলো। নিষ্ঠুর সত্য। তাতে সন্দেহ নেই। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে জীবনের পাতা থেকে সহজে তো মুছে ফেলা যাবে না বটেই।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। এলিজাবেথই ডেকে উঠল হঠাৎ, 'আর্নস্ট।'

'বল, এলিজাবেথ।'

'তোমার মনে কি ব্যাথা দিলাম ?'

'না, এলিজাবেথ। তুমি তো ঠিকই বলেছ। আমি ভাবছি যে বিশাল এই জীবনের তুলনায় এই একটা সপ্তাহের সাতটা দিন কতই না তুচ্ছ, তবুও কি অপূর্ব আশ্চর্য হয়ে যাবার মতো বৈচিত্রে ভরা। তাই না ?'

এবার হেসে বলল এলিজাবেথ, খেলাম তো পেট পুরে, মন ভরে। রাজকীয় খানার তো রাজকীয় বিল হবে। দিতে পারবে তো, আর্নস্ট ?'

'বলছ কি এলিজাবেথ। আমার কাছে গত দু'বছরের বেতন অটুট পড়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি ফুরোয় ততই ভাল। এই সংক্ষিপ্ত জীবন আমার 'হপ্তা দু'হপ্তা বইতো নয়। এইসময়ের পক্ষে পর্যাপ্ত।' গেব্রার হাসল।

এলিজাবেথদের বাড়ির সামনে দুজনে এসে দাঁড়াল। বাতাস থেমে গেছে। তাই ফের কুয়াশা নামছে চারপাশ ঘিরে। কবে ফিরতে হবে তোমাকে, আর্নস্ট।' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

'আর পনেরো দিন পরই।' গেব্রার বলল।

'সময় তো হয়ে এলো তাহলে।'

'হ্যাঁ। তাই। আজই যেন আমার প্রথম ছুটির দিনটা উপভোগ করলাম। এর জন্য বুড়ো ওয়েটার, রোটার, তোমার এই জমকালো গোলাপী পোশাক আর ওই বিশেষ মদিরা কসবেগের্র কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এলিজাবেথ কথা না বলে মুগ্ধতা মাখা চোখে গ্রেবারের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। দেখল গ্রেবার, এলিজাবেথের চুলে কুয়াশা জড়াচ্ছে, আকাশ রঙের গাল সিক্ত হয়ে উঠছে। আর এই ঘোর নির্জনতা, একটা মুক্তির স্বাদ, এই স্থানে বুকের মধ্যে যে প্রেমের উত্তেজনার উচ্চতা ভরে উঠছে, এ সব ছেড়ে রসকসহীন, নিরানন্দ ব্যারাকে ফিরে যেতে মন চাইছিল না তার।

তখনই একটা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উটল দুজনে। 'কি মশাই, চোখের মাথা খেয়ে বসে আছেন নাকি?'

এক পলক তাকিয়েই বুঝল গ্রেবার। অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। যুদ্ধের বাজারে ফের কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব লোক ভারি অহংকারি হয়। সকলের কাছ থেকেই স্যালুট চায়। সে কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা টর্চ জেবলে দেখল একবার।' হুঁ কর্পোরালের পোশাক দেখছি। তা সীমান্ত ছেড়ে এখানে কেন?' বলে এলিজাবেথের মুখেও টর্চ ফেলে একবার দেখে নিল। 'বেশ বেশ। এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি যান!' বলে চলে গেল লোকটা।

এলিজাবেথ একটু ভয় পেয়ে গেছল। গ্রেবার তাকে বুকের উষ্ণতায় নিয়ে এল। আপত্তি করল না এলিজাবেথ। গ্রেবার তার চুলে, চিবুকে, দুচোখের পাতায় আলতো ঠোঁট ছোঁয়ালো। গ্রেবারের বুকের বধ্যে থেকে প্রেমের উষ্ণ প্রস্রবন উথলে উঠল। চুমোতে চুমোতে ভরিয়ে দিল, প্রশ্ন করে করে তুলল এলিজাবেথকে।

তারপর একসময় এলিজাবেথ মুখ তুলে বলল, 'কালকে কোথায় যাবো আমরা ''

'কেন?' জার্মেনিয়াতেই যাবো?'

'আবার ওখানে?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। আমার একান্ত বাসনা এই দিনগুলোর কথা তোমার মনে গেঁথে থাকুক চিরদিনের জন্য, আমি সীমান্তে ফিরে যাবার পরেও। আবার তো এমন দিন ফিরে নাও পেতে পারি, কাল আটটাতেই আসব ফের। কি, যাবে তো?

'নিশ্চয়ই যাবো, আনর্ষ্ট।' এলিজাবেথ বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

গ্রেবার হাঁটতে হাটতে ফের হাকেনষ্ট্রাসে এল। আঠারো নম্বরের কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে লেখা নোটিশের কাগজটার দিকে তাকালো। কুয়াশা ভেদ করে আবছা জ্যোৎস্নাতে কেমন অদ্ভূত দেখাচ্ছে জায়গাটা। চাপা দেওয়া পাথর দুটো নড়ানো হয়েছে মনে হলো তার। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল কাগজটা। পকেট থেকে টর্চটা বার করে জেবলে দেখল। মোটা সোটা অক্ষরে কেউ লিখেছে, 'বড় ডাকঘরের পনেরো নম্বর জানালাতে খোঁজ করুন।'

যাঃ। কাল সকাল আটটার আগে তো পোষ্ট অফিস খুলবে না। অতএব ততক্ষণ কিছু জানাও যাবে না। হঠাৎ একটা উত্তেজনায় মাথাটা তার গরম হয়ে উঠল। কপালের পাশের শিরা দুটো ফুলে উঠল। অথচ কোন উপায় নেই।

কাগজটা ভাঁজ করে সাবধানে পকেটে রেখে দিল। বলা যায় না। হয়তো পোর্ষ্টা ফিসে কাজে লেগে যেতে পারে।

চারপাশ যেন কবরের অতল নিস্তব্ধতায় ডুবে গেছে। ফিরে ব্যারাকের দিকে হাঁটতে লাগল সে। মাথার মধ্যে কেবলই এলোমেলো চিন্তার ভীড়। কিছুই নির্দিষ্ট করে ভাবতে পারছে না যেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তার শরীরটা যেন পলকা পাটকাঠির মত হালকা বলে মনে হচ্ছে। সে পা ফেলে এগোচ্ছে যেন মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে। সেখান থেকে রূঢ় বাস্তবে আবার ফিরে আসার মতো সাহসই যেন সে আর পাচ্ছে না।

□ তের □

ডাকঘরে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হলো গ্রেবারকে। ভিরে গিজগিজ করছে চারপাশটা। বাড়িটারতো বোমের আঘাতে ভগ্নদশা। কোনমতে কাজ চালাচ্ছে কর্মীরা।

পনেরো নম্বর জানালায় যেতে গ্রেবারের পরিচয় পত্র দেখে, কাগজে সই করিয়ে নিয়ে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল। হতাশই হয়ে গেল গ্রেবার। মায়ের পাঠানো সীমান্তের ঠিকানায়, সেটাই ফেরৎ এসেছে। এখানে তো আগের নম্বর আঠারো হাকেনষ্টাসই লেখা আছে। বর্তমান ঠিকানাটা তো নেই। কর্মীটিকে জিজ্ঞেস করতে অসন্তোষের স্বরে সে বললো দোতলায় চিঠিপত্র বিলি বিভাগে খোঁজ নিতে। দোতলার মহিলা কর্মী বলল যে বিট পিওন বেরিয়ে গেছে, বেলা চারটের আগে তার দেখা পাওয়া যাবে না। তবে তার কাছেও কারও বর্তমান ঠিকানা পাওয়া সম্ভব নয়।

যুক্তিটা মেনে নিতে হলো গ্রেবারকে। নিচে এসে মোড়কের গায়ে তারিখ দেখে বুঝল তিন সপ্তাহ আগে পাঠানো হয়েছিল। খুলে দেখল, 'একটা শুকনো কেক, পশমের মোজা এক জোড়া, সিগারেটের প্যাকেট একটা, আর চিঠি। নতুন খবর চিঠিতে কিছুই নেই। এত বড় বিমান আক্রমন যে ঘটে গেছে, তারও উল্লেখ নেই। হতাশ হয়ে সে ভাবল যে ব্যাণ্ডিং-এর সঙ্গে আর একবার দেখা করা দরকার।

এতটা অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না গ্রেবার। ব্যাণ্ডিং-এর সঙ্গে তার এক বন্ধু ছিল। দুজনে বসে পান করছিল। বন্ধুটার অবস্থা অবশ্য কাহিল। রীতিমত মাতাল হয়ে সোফাতে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাণ্ডিং বলল, 'আমার বন্ধু, হাইনে। মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। আর রাশিয়া থেকে ছুটি পেয়ে এসেছে আর্নষ্ট। বেচারাদের বাড়িটা বোমার আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। কেউ মরেনি অবশ্য। কিন্তু হাইনের

দুঃখ পিয়ানোটার জন্য। যাকগে। তুমি কি নেবে বলো, আর্নস্ট? ভদকা?'

'না, আমাকে ক্যামেল বা ভদকা দাও। তার আগে বল, কোন খবর আছে কিনা?

'কোন খবর নেই, আর্নস্ট। আমার মনে হচ্ছে ওরা বোধহয় ভেতরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। এখনও জেলা সদরে রিপোর্ট করেনি। আর যানবাহনের উন্নতি নাহলে খুঁজে বার করা মুশকিল। মন খারাপ করো না। ওরা নিশ্চয়ই ভাল আছে। ঠিক সময়ে খবর দেবো। তাহলে ভদকাই খাও!'

'হ্যাঁ, ভদকা খুব ভাল। আমরা তো শালাদের গলায় জোর করে ভদকা ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতাম। ওহ্ বাচ্চাগুলো যা দাপাদাপি করত না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো।' মাতালের গলায় টেনে টেনে বলল হাইনে।

গ্রেবার নিচু স্বরে ব্যান্ডিংকে জিজ্ঞেস করল, 'কিসব বলছে তোমার বন্ধু?'

'ও শালা, রাশিয়াতে এস ডি ছিল তো। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কম্যান্ডার। ও শালারা সব পারে।' নাও ঢালো।

গ্রেবার দৃষ্টি বেঁকিয়ে হাইনের দিকে তাকালো। এস এস-দের বাহিনী সে শুনেছে। এই শয়তানগুলোই নানা অজুহাতে জার্মানদের নিঃস্ব করে দিয়েছে, কত মানুষকে যে গোপনে হত্যা করেছে বা কারাগারের অন্ধকারে চির নির্বাসন দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বন্দিশিবির, গ্যাসচেম্বারের নরক তো এদেরই আবিষ্কার। গেবারের বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

খানিকক্ষণ পর। গেবার আর ব্যান্ডিং বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। কোথা থেকে যেন একটা দোয়েল পাখির মিষ্টি স্বর ভেসে আসছে। হাইনে তখন বাথরুমে সোঁ সোঁ করে বমি করছে। 'হাইনে ব্যাটা পাগল।' ব্যান্ডিং হঠাৎ বলল।

'হ্যাঁ, যারা নিজেদের বাঁচাতে পারে তাদের কাছে!' গেবার বলল।

'আর্নস্ট! শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বত্রিশ সালে ও যখন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এল, যেন সদ্য চিতেয় তোলা মানুষটা বেঁচে উঠে অন্য মানুষ হয়ে গেল। কম্যুনিস্ট জানলে তার আর রক্ষা নেই। যমের মত ভয় করে এখন ওকে কম্যুনিস্টরা।'

সেই সময় হাইনে দরজায় এসে উপস্থিত। 'এই ভীষণ দেরী হয়ে গেল, আলফন্স, আমি চললাম। গুডবাই।'

নজরের বাইরে যেতে ব্যান্ডিং বলে উঠল, 'এই লোকগুলো একেবারে বিশ্বাস-ঘাতক। ওদের যে খাতির করি তা শুধু ওদের খপ্পড়ে পড়ে যাতে চিরতরে জেলের ভেতর না যেতে হয়।

গেবার মনে মনে কথাটা মানল, তবু বলতে ছাড়ল না। কিন্তু আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই, হের বারসিনটার তো বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। তাকে তুমি

বন্দিশিবিরে ঢুকিয়েছ কেন ?'

'ওটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, আনর্স্ট। তা তুমি জানলে কি করে ?'

'আমি জানি আলফন্স্। ভাবি যে আমাদের জীবনে এই সব অন্যান্য বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্যে দায়ী কে ?'

'গ্রেবার! তুমি নিজে কিছু করলে তবেই তো দায়ীত্বের প্রশ্ন ওঠে। বলতে পারো যে আজকের পরিস্থিতিই এ জন্যে দায়ী।' ব্যাণ্ডিং বলল।

'কিন্তু বন্দিদের নির্মমভাবে গুলি করে মারবার আগে তো তাদেরই দায়ী করি, সব দোষটাই চাপিয়ে দেই তাদের ঘাড়ে। কেন ?'

'বন্দিদের ব্যাপারটা অন্যরকম। এটাকে ব্যতিক্রমও বলতে পারো।'

'এখন তো সব কিছুই ব্যতিক্রম। আমরা বোমাবর্ষন করলে সেটা হয় রন কৌশল আর শত্রুপক্ষ আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করলে সেটা হয় জঘন্য অপরাধ।'

গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ব্যাণ্ডিং, 'আজকের রাজনীতি তো এটাই গেব্রার, জার্মানদের স্বার্থেই আমরা তা মেনে নিয়েছি। তাই না।'

ব্যাণ্ডিং এর সঙ্গে আর বাক্য ব্যয় না করে গেব্রার বেরিয়ে এল। হন হন করে রাস্তা ধরে এগোতে লাগল সে। একটা দুই মুখো রাস্তার মোড়ে এসে সামনে শত খানেক গজ দূরে হাইনেকে দেখতে পেলো সে চড়া রোদ্দুর। একেবারে নির্জন। মানুষ জনের চিহ্ন নেই। প্রতিশোধ নিতে চাইলে, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হয়না। বালি মাটির ওপর দিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে নিয়ে পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে অথবা গলা টিপে ধরলেই শেষ। ওই তো ল্যাকপ্যাকে চেহারা। গুলি করলে লোক জানাজানির ঝুঁকি নিতে হবে। তবে ব্যাণ্ডিং নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। হাইনের মতো লোককে হত্যা করে প্রতিহিংসা মেটাবার লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়। কত অসহায় মানুষকে যে নির্দ্ধিধায় খুন করে ফেলেছে এই হাইনে আর তার জঘন্য সঙ্গীরা। জাতের নামে ইহুদীদের কি অমানুসিক ভাবে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মারছে, আরও কত মারবে। কে নেবে এই জঘন্য অপরাধের প্রতিশোধ। বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করছে গেব্রারের উত্তেজনায়। গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। আর ওই ল্যাকপ্যাকে হাইনেটাও যেন দৌড়চ্ছে। কিছু অনুমান করতে পেরে গেল নাকি ? হঠাৎ দেখল সে একটা যুবতী মেয়ে রঙীন ছিটের ব্লাউজ আর ফ্রক পরা, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে এদিকেই আসছে। গ্রেবার চলার গতি কমিয়ে দিল। মেয়েটার বেশ চওড়া কাঁধ, পুষ্ট দুটি উদ্ধত বুক, মাজা বাদামী রঙের মুখটা মন্দ নয়, মাথার কোকড়ানো চুলের মাঝখানে সিঁথি। বেশ প্রানপ্রাচুর্ণে ভরা উচ্ছল যুবতী' গ্রেবার তারিফ করল মনে মনে। এই ধ্বংসের পরিস্থিতির মধ্যে এমন হাসি মুখে থাকা কম কথা নয়।

পাশ দিয়ে যাবার সময় 'সুপ্রভাত হের' বলে অভিবাদন জানিয়ে গেল যুবতী।

গ্রেবারও মাথা হেলিয়ে প্রত্যাভিবাদন জানাল। যুবতী চলে যেতেই সামনে তাকিয়ে হাইনেকেও আর দেখতে পেলো না সে। ছুটে গেলে অবশ্য ধরে ফেলা যেতেই পারে। কিন্তু কেমন যেন আর উৎসাহ পেলো না ভেতর থেকে। আসলে হঠাৎ করে মনের মধ্যে এমন একটা হঠকারি ইচ্ছা যে তা জেগে উঠবে, এমনটা সে ভাবতেও পারেনি। কারণ হাইনেকে খুন করলে সেও রেহাই পেতো না। ধরা পড়ে যেতই এবং সেটা তার পক্ষে খুব সুখের হতো না।

মোড় ঘুরতে একটা পত্রিকার স্টল দেখে সে দাঁড়াল। একটা খবরের কাগজ কিনল। এই প্রথম দিন প্রথমবার কাগজ দেখছে সে এখানে আসার পর। যদিও সেন্সর করা সমর বিভাগের মত ছাপা কাগজ। তবু একটা অনুমান করতে চেষ্টা করল সে। তাদের সৈন্যবাহিনী আরও একশ' কিলোমিটার আছে, কে জানে। এখানে তো তার কোন চিহ্নও নেই। তবে একটা অন্ধকার গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে ভেসে আসছে তারই মত সব প্রতারিত সঙ্গী সাক্ষীদের ব্যর্থ প্রয়াসের হাহাকার, আকাশ বাতাস কলুষিত করে তুলছে।

হাঁটতে হাঁটতে এয়ানপ্লাতসে চলে এল। বোমার তাণ্ডবে একটা দিক শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকের কিছুটা আছে বটে এখনও। খুঁজতে খুঁজতে সে দু'নম্বর বাড়িটা পেয়ে গেল। কিন্তু বাড়িটার চেহারা দেখে দমে গেল সে। সামনের দিক আর ওপর দিকটা ধ্বংসের স্তূপ হয়ে আছে। পেছন দিকটায় কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা। তবু সে পাশের সরু পথটা ধরে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ইতস্তত করে কড়া নাড়ল। খানিকক্ষণ পর দরজার পাল্লা একটু ফাঁক হলো।

'কে, কি চাই ?'

'আচ্ছা, হের পোলমান কি আছেন ?'

'আপনি কে ? কি দরকার তার সঙ্গে ?'

'আমি আর্ন্স্ট গ্রেবার। তারই প্রাক্তন ছাত্র। একটু দেখা করতে চাই।'

এইবার বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। 'তা আমার কাছে আর এসেছ কেন, বাপু ? আমি তো শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা আমি জানি ?'

'জানো ? তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানো যে কতক নিয়ম না মানার অপরাধে আমাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এমন কি কোন ছাত্রকে আর পড়াবার ক্ষমতাও নেই আমার ?'

'সবই আমি জানি, স্যার। আমিও এখন আর ছাত্র নই, সৈনিক। রাশিয়া সীমান্ত থেকে কদিনের ছুটিতে এসেছি। ফ্রজেনবুর্গ আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে। সেই সূত্রেই আপনার কাছে এসেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ, 'ফ্রজেনবুর্গ'। বেঁচে আছে তাহলে এখনও?'

গ্রেবার বিষন্ন হাসলো। 'অন্তত দিন দশেক আগে তো ছিল।'

বৃদ্ধ এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'ভেতরে চলে এসো। আমি তো তোমাকে পুলিশের লোক বলে ভেবেছিলাম।'

কি আর বলবে গ্রেবার। সে তো জানে যে অবস্থাটা আজ এমনই বটে।

'ভেতরে এসো', বৃদ্ধ বললেন, 'বসো। এবার তোমাকে চিনতে পারলাম। আজকাল তো আর বেরোই না বাইরে। প্রয়োজনও হয় না। চোখেও কেমন সব ঘোলা ঘোলা দেখি। বিজলী বাতি তো আর নেই। এখন অন্ধকার ঘরে বসেই দিন কাটে।'

গ্রেবার দেখছিল ঘরটা তেলের বাতির সামান্য আলোতে। চারপাশের তাকে সারি সারি বই। তার মাঝে এই জ্ঞানী শিক্ষক। তার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ সন্দেহ নেই।

বৃদ্ধ বুঝলেন গ্রেবারের মনোভাব। বললেন, 'কোন মতে বই কটা টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। এর মধ্যেই বেঁচে আছি। তা তুমি কি কেবল ফ্রজেনবুর্গের খবর দিতেই এসেছ। আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, মূলত ফ্রজেনবুর্গের অনুরোধেই এসেছি। আমার একমাত্র ঘনিষ্ট বন্ধু। তবে, আপনার অনুমানও ঠিক। আমি আমার না জানা অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে পাবো, সেই আশাও আমাকে আপনার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে।'

'কি প্রশ্ন? আমাকে একটু বুঝিয়ে বল তো?'

'আমি বুঝতে চাই, জানতে চাই। জানতে চাই যে এই যে জঘন্য অপরাধ আর অন্যায়ের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে আমি জড়িত তা আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? আমার কি করা উচিত এই অবস্থায়?'

বৃদ্ধ পোলমান মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যেই এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ একটা বই হাতে তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। যেন তিনি গ্রেবারের অস্তিত্বটাই ভুলে গেছেন। তারপর হঠাৎ থেমে গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি জানো, কি প্রশ্ন তুমি করেছ?'

'জানি।'

'কত তুচ্ছ কারনে আজকাল গুলি করে মারা হচ্ছে লোকদের, জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, তাও জানি।'

চেয়ারে এসে বসলেন পোলমান। 'যুদ্ধের কথা বলতে চাইছ, আর্ন্স্ট?'

'শুধু যুদ্ধ নয়। এই বর্বরতা, অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচারিতা, এই সব বন্দি শিবির শান্তিশিবির, ক্রীতদাসশিবিরে যে নির্বিচারে গনহত্যা চলেছে, এই যুদ্ধেরই তো সব পরিনাম। কেন? কি জন্যে। কার জন্যে?—এ সবই আমি

জানতে বুঝতে চাই। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি যে এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। তবুও সরকার নামে কিছু লোকের জন্য লোভের ক্ষমতার আসনে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্যে, তাদের হয়ে আমরা লড়ছি, প্রাণ দিচ্ছি কেন?'

বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না বৃদ্ধ পোলমান। তারপর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন, 'সীমান্তে যদি তুমি ফিরে না যাও, তাহলে তার পরিণাম জানোতো আর্নস্ট?'

'জানি বইকি। গুলি করে মারবে। লুকিয়েও বাঁচব না। বরং আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বাড়ির সবাইকে, মা-বাবাকেও রেহাই দেবে না।'

'আর্নস্ট! কিশোর ছেলেদের মন ঠিক মত তৈরী হবার আগেই, বিষাক্ত করে দিচ্ছে ওরা। তার পরিনামে যে দুঃখ, বেদনা, হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম, এ সবই আমি লক্ষ্য করেছি, আর্নস্ট। আমার প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণা এখন এইসব ভাবনা। অথচ প্রতিকারও তো আমার সাধ্যের মধ্যে নেই। তোমারও নেই। এখন এ দেশের এটাই ভবিতব্য। আমি আর তোমাকে কি বলব বল?' বলতে বলতে বেদনায় নীল হয়ে গেল বৃদ্ধ পোলমানের মুখ।

আর তখনই মনে হলো গ্রেবারের যে এই অশীতিপর বৃদ্ধ, যিনি নিজেকে একেবারে লুকিয়ে নিয়ে এই ভাঙ্গা বাড়ির চারদেওয়ালের মধ্যে নির্বাসন দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন, তাকে আমি আরও যন্ত্রণা দিচ্ছি না তো? লজ্জিত স্বরে সে বলে উঠল, 'মাপ করবেন হের পোলমান, প্রশ্ন আমি করেছি নিজে দিশা খুঁজে পাচ্ছিনা বলে; কিন্তু জোর করে আপনার উত্তর আদায় করে আপনাকে বিপদে ফেলবো, সে উদ্দেশ্য আমার ছিলনা, নেই। বলে সে উঠে দাঁড়াল। 'আজ আমি যাই তাহলে।'

'এসো। ফ্রজেনবুর্গকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিও।' তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'এড়িয়ে যেতে চাই না বলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। মনে দুঃখ রেখো না। তুমি তো জানো, বোঝো সবই। তবে একটা কথা বলি: 'কখনও নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিও না। তোমার জায়গায় আমি হলেও প্রতিবাদ করতাম।'

গেব্রার হাসল। তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলো।

□ চোদ্দ □

'আজ খুব ভালো ভিনেগ্লিৎজেল হয়েছে আমাদের।' হাড়গিলের মত বুড়ো পরিচারক তাদের দিকে খুশিভরা চোখে তাকালো।'

'ভাল কথা', গ্রেবার হেসে বলল, 'আজ তোমার পছন্দই আমাদেরও পছন্দ। তুমি যা আমাদের খাওয়াবে, তাই খাবো।'

'সেই আগের মদই, স্যার ?'

'তাও দিতে পারো, কিংবা যদি তোমার নিজের বিশেষ কিছু তার চেয়েও ভাল জানা থাকে তো তাও দিতে পারো। মোট কথা আমরা আমাদের সব কিছু তোমার ওপরই দিয়ে দিলাম।'

বুড়ো পরিচারক খুব খুশী হয়ে চলে গেল।

গ্রেবার এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে দেখল। আগের দিনের মত মুখোমুখিই বসেছে দুজনে। এলিজাবেথের তন্বী শরীরে এটে বসা পোশাক, চুল ঢাকা টুপী, হঠাৎ চোখ পড়লে সদা কিশোর বালক বলে মনে হয়। তার দুচোখেও আনন্দের দ্যুতি আজ। সে বলে উটল, 'আন'ষ্ট, আজ তুমি পোশাক পাল্টাওনি কেন ?'

'জায়গাই পেলাম না পাল্টাবার। গ্রেবার বলল, 'আসলে একবার ভেবেছিলাম যে ব্যান্ডিং-এর বাড়ি গিয়ে একটু সাজগোজ করে নেবো। কিন্তু বৃদ্ধ পোলমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আর ইচ্ছেই করল না সেদিকে যেতে।

এই সময় পরিচারক এসে বলল, 'কসবেগ'ই নিয়ে এলাম স্যার আপনাদের জন্যে। এর মর্ম আপনারাই সত্যিকারের বোঝেন।' বোতলটা সে টেবিলের ওপর রেখেছে কি না রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ ওঁয়া ওঁয়া চিৎকারে শরীরের রক্ত চলাচল থেমে গেল যেন সকলের। আর সেই সঙ্গে রেস্তরাঁর মধ্যেকার চাপা কথাবার্তার শব্দে সাইরেনের সেই শব্দ যেন হারিয়ে গেল।

গ্রেবার পরিচারকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন শেল্টার নেই এখানে ?'

'আছে স্যার, এই হোটেলেরই নিচে। কিন্তু সেটা তো, ইয়ে মানে, সব পদস্থ অফিসারদের জন্যে। মানে, বুঝতেই তো পারছেন, স্যার···

'আরে তাতে কি! একটা গ্লাস আনতো দেখি। এলিজাবেথের গ্লাসটা তো পড়ে ভেঙ্গে গেল।' ওয়েটার চলে যেতে নিজের গ্লাসটাই মদে ভর্তি করে এলিজাবেথের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও এক চুমুকে।

'সেকি ? শেল্টারে যাব না আমরা ?

'যাবো, যাবো। সবে তো প্রথম সংকেত হলো। দেরী আছে এখনও। হতেও তো পারে যে গতবারের মত এবারও কিছু হলো না

ওয়েটার বুড়ো গ্লাস এনে দিতে দিতে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। ঠিকই বলেছেন।'

গ্রেবার গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে এক ঢোকে খেয়ে নিল। 'অত ভেবো না। খাও। সময় আছে এখনও। আমাদের বোতলটাই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। খেয়ে নাও, ভয় দূর হয়ে যাবে।'

'দেখ, আমার হাত কিরকম কাঁপছে।'

'না না, তা নয়। কাঁপছে তোমার বুকের ভেতরের প্রাণটা। কিন্তু এই কাঁপা বুকেও তো সাহসের কোন অভাব নেই আমাদের। নইলে এত শান্ত হয়ে বসে আছি কি করে এলিজাবেথ?'

'ঠিক বলেছ। ভর্তি কর গ্লাসটা।'

গ্রেবার হেসে বলল, 'এই তো চাই। নাও।'

বুড়ো ওয়েটার বলল, 'আমার এগারো বছরের মেয়েটা বড্ড অসুস্থ, স্যার। বউটাও ভুগছে যক্ষ্মায়। আমাদের নিচের থাকবার কোঠাটাও তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। অথচ ওদের কাছে যে এ সময় থাকব তার উপায় নেই। এখানেই থাকতে হবে আমাকে।'

গ্রেবার পাশের খালি টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে মদ ঢেলে নিয়ে পরিচারকের দিকে তুলে ধরে বলল, 'নাও আমাদের সঙ্গে একটু খাও।'

'খাবো স্যার। তবে এখানে আপনার সামনে নয়। নিয়মও নেই।' বলে একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, 'আপনি খুব ভাল স্যার। শিগগীরই আপনার প্রমোশন হোক, আপনি কর্পোরাল হোন, এই কামনা করি।' বলেই গ্লাসভর্তি মদ নিয়ে হাড়গিলে বুড়ো পরিচারক চলে গেল।

এলিজাবেথ বিস্ময়ে আঁতকে উঠল। ও ব্যাটা জানল কি করে?'

'আরে, ওদের চোখ শকুনের মতো। দূর থেকেই চিনে ফেলতে পারে। গতকাল তো ফ্রিৎসও চিনে ফেলেছিল। দুটো নোট গুঁজে দিলাম না ওর হাতে।'

'কিন্তু শেল্টারে অফিসাররা যদি চিনে ফেলে তোমাকে?'

'পারবে না। ওরা এখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। অন্যের দিকে দেখবে তেমন সময় ওদের নেই।' 'থাক ওসব কথা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেছে? এসো। গ্রেবার এলিজাবেথের কাঁধে হাত রেখে টানল নিজের দিকে ভয় ভয় ভাবটা এখন নিশ্চয়ই আর নেই, কি বল?'

রেস্তরাঁর সঙ্গেই তৈরী করেছে শেল্টারটা। রীতিমত সাজানো গোছানো। মেঝেতে গালচে চারদিকে শোফা, টেবিল চেয়ার। দেয়ালের তাকে মদের বোতল, গ্লাস, সবই মজুত। আপন মনেই হাসল গ্রেবার। আভিজাত্যের কি অহংকার!

বোমার আঘাতে মরবার সময়ও মদ খেতে খেতে, এবং নারী দেহের উষ্ণ ওমে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। ভিড়ের ধাক্কায় গ্রেবার আর এলিজাবেথ তখন অনেকটা ভেতরেই চলে এসেছে। ওয়েটাররা এরই মধ্যে মদ পরিবেশন করছে আর্মি অফিসার দের। এবং অতিসুন্দরী, পিঠখোলা, সাদা পোশাক, মনিমুক্তোর ঝকঝকে গহনা পরা, এক যুবতীকে দেখল গ্রেবার। তার সঙ্গের লেফটেন্যাণ্ট পুরুষটা অতিশয় মজাকার। ওপাশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল, যেন যুবতীরই পরিনামরূপ এক বৃদ্ধাকে। খুব সাজগোজ করা। তার সঙ্গে যথারীতি কজন অফিসার। আমাদের বোতলটা নিয়ে এলে হতো।' গ্রেবার ফিস্‌ফিস্‌ করে এলিজাবেথকে বলল।

'না না, এ সময়ে আমার গলা দিয়ে ওসব নামবে না। তুমি কি করে ভাবছ?'

না, ভাবছে না, অন্ততঃ নিজের জন্যে ভাবছে না গ্রেবার। কারণ সে তো জানে এই সব ছেলে মানুষীর পরিনাম। এ শুধু অভিনয় করে নিজের এবং অপরের চোখে ধুলো দেবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। দ্বিতীয়বার সাইরেন যেন আরও করুণ চিৎকারে ওঁয়া ওঁরা করে বাজতেই কোথা থেকে কে বলে উঠল, 'দ্বিতীয়বার। মানে এইবার আক্রমন।'

এলিজাবেথ গ্রেবারের বুকের কাছে মুখ নিয়ে বললে 'ভীষণ ভয় লাগছে, আর্নষ্ট।'

আরও নিবিড় করে এলিজাবেথকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তার পিঠে নির্ভয়ের হাত বোলাতে লাগাল। কথা বলল না। কারন, সেও জানে যে এক্ষুনি যা ঘটতে যাচ্ছে, তাতে কার যে কি হবে, কে কোথায় থাকবে, কে জানে। ঠিক তখনই পরপর তিনবার বিস্ফোরন ঘটল। গোটা শেল্টার ঘরটা কেঁপে উঠল। ক্র্যাক্‌ ক্র্যাক্‌ শব্দে চারপাশের দেয়ালগুলোই ফেটে গেল' আলোটা খুব কমে গেল, যেন নাটকের ডিমারের চাকাটা কেউ আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে আলো কমিয়ে দিল। আর শুরু হয়ে গেল চিৎকার চেঁচামেচি। সবচেয়ে ভয় পেয়ে গেছে সেই সুন্দরী যুবতী। পাগলের মতো কোথাও পালাতে চেষ্টা করছে। আর কজন মিলে তাকে ঘরে রাখবারও চেষ্টা করছে। আবার একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এবার একেবারে মাথার ওপর। শেল্টার ঘরটাকে যেন এক ক্ষমতাশালী দৈত্য দু'হাতে তুলে নিয়ে একেবারে পাতাল থেকে আকাশের মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

তখনই ওপাশের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে কে যেন টর্চের আলো ফেলে নামছে। আর তাই দেখে যুবতী আতঙ্কে, আগুন। আগুন। কে আছে, আমাকে বাঁচাও।' বলে যেন মরণ আর্তনাদ করতে লাগল। আলো পড়তেই দেখা গেল যুবতীর উর্ধাঙ্গের পোশাক স্খলিত হয়ে কোমরের কাছে নেমে গেছে। তার দু'চোখে

মরণ আতঙ্ক। যেন শ্বেত পাথরের তৈরী দুটি সুডৌল, নিটোল স্তন থিরথির করে নাচছে। দু'পাশ থেকে দুজন লোক তাকে ধরে আছে। আর সে কামড়া কামড়ি করে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। গ্রেবারের নাকে মাংস পোড়া গন্ধের একটা ঝাপটা এসে আঘাত করল। বাইরে থেকে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট্ কামানের শব্দ ভেসে আসছে। আর কোন বিস্ফোরণের শব্দ নেই। আবার আলো হাতে কে যেন নেমে আসছে।

তাই দেখে যুবতী আবার চিৎকার করে উঠল, 'আগুন। আগুন। বাঁচাও আমাকে।'

কে একজন ধমক দিয়ে উঠল, 'আগুন নয়, টর্চের আলো।'

টর্চ ধারি এবার বলে উঠল, 'আমি ফ্রিৎস্, হেড ওয়েটার। ওপরের খাবার ঘরটা চুরমার হয়ে গেছে তাই নিচটা দেখতে এলাম।'

'বেশ করেছ', একজন বলল, 'এখন একজন ডাক্তার চাই। অ্যাম্বুলেন্স হলেই ভাল হতো।

'অসম্ভব। এমন অ্যাম্বুলেন্স কোথায়? আর এখানে কেউ ডাক্তার আছে বলে তো মনে হয়না। অল ক্লীয়ারের সংকেত না হলে কিছুই হবে না।'

ওদিকের দেয়ালের কাছে টর্চ পড়তেই দেখা গেল সেই বৃদ্ধা কুণ্ডলী পাকিয়ে নিথর পড়ে আছে। তার পাকা, সাদা চুল রক্তের ধারায় ভিজে গেছে। পাশেই এক মেজর বসে আছেন। তিনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন, 'সবাই চুপ করো। চেঁচামেচি করোনা।'

গ্রেবার এলিজাবেথের দৃষ্টি আড়াল করে বলল, 'না, দেখোনা, এলি। বিমান আক্রমনে এমন ঘটতেই পারে, সব জায়গায়। আমি ভাবছি যে এবার গ্রামে নিয়ে যাবো তোমাকে। অন্তত অনেকটা নিরাপত্তা সেখানে পাবে তুমি।'

এই সময় কে একজন একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে এল। বৃদ্ধাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গেল।

'ব্যাপারটা কি হলো বল তো?' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল গ্রেবারকে।

'বোধ হয় দেয়াংল ছিটকে পড়ে মাথা ঠুকে গেছে, কাঁচভাঙ্গা টুকরো ছিটকে এসে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে থাকগে, চলো আমরা যাই এবার।'

বাইরে এসে একটা ছোকরা ওয়েটার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সেই বৃদ্ধ ওয়েটার, যে মদ পরিবেশন করে. তাকে তো দেখছিনা। বোধহয় নিচে তার কুঠরীতে আছে, একটু ডেকে দেবে! মদের দামটা তখন দেওয়া হয়নি।'

'আপনি কার কথা বলছেন, স্যার? কার্ল না অটো? ছোকরা ওয়েটার প্রশ্ন করল।

'ওই যে লম্বা, হাড়গিলের মতো চেহারা?'

ওয়েটার ছেলেটার চোখে জল টলটল করে উঠল, 'নেই স্যার। এবার চলে গেল। ওপরেই ওর ডিউটি ছিল। বিস্ফোরনের ধাক্কায় ঝাড় লণ্ঠনটা সোজা ওর মাথায় এসে পড়ল। ব্যাস, শেষ।'

গ্রেবারের বুকের মধ্যে যন্ত্রনার তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। 'আঃ।' শব্দটা স্বতঃই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

ওয়েটার ছেলেটা বুঝল। মৃদুস্বরে বলল, 'মদের দামটা ইচ্ছে হলে আমার কাছেও দিতে পারেন।' বলে পকেট থেকে দামের তালিকা বার করে বলল, 'কোন মদ, স্যার?'

'য়োহানিসবেজে'র কস্‌বের্গ।' গ্রেবার বকল।

'তাহলে চারমার্ক আর চল্লিশ কেনিগ্‌ সার্ভি'স চার্জ' স্যার।'

টাকাটা দিতে দিতেই গ্রেবার বুঝলো যে এই ওয়েটার ছোকরারই পকেটে থেকে যাবে এটা। তা যাক। তার নিজের বিবেক তো পরিষ্কার থাকবে। ঘুরে সে এলিজাবেথকে বলল, 'চলো দেখি, তোমাদের বাড়িটার কি দশা হয়েছে।'

এলিজাবেথ হাসল। এগোতে লাগল দুজনে।

রাস্তা পেরিয়ে পার্কে'র বেঞ্চিতে এসে বসল দুজনে। ভাঙ্গা শেল্টারটা হাঁ করে গিলতে আসছে যেন। গ্রেবার ওভারকোটটা খুলতে যেতেই টুং টাং শব্দ হল। 'আরে, এ আবার কি?' যেন সে খুবই অবাক হয়েছে এমনভাবে বলল।

এলিজাবেথ হেসে বলল, 'যে মদের বোতল চারটে তুমি তাক থেকে হাতিয়ে নিয়ে এলে, সেগুলোই ঠুকে গিয়ে শব্দ হল। এই আর কি? আচ্ছা, তুমি এক বোতল মদের দাম দিয়ে চারটে বোতল হাতিয়ে নিয়ে এলে যে বড়?'

গ্রেবারও হেসে ফেলল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'দেখ ওই বাইবেলের দশটি উপদেশ সৈনিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বেশীর ভাগ বোতলই তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমি না নিলে অন্য কেউ নিতো। সে যাক গে। আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে, এখন এই কইনাক বা শ্যাম্পেনের সদব্যবহার করা যাক। কি তোমার বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে। খাবে কিছু।'

'এখন কিছুই আমার গলা দিয়ে নামবে না। তবে পান করা যেতে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি যে তুমি লোকটা কেমন? আমি যা এখন দেখছি তাই, না অন্যরকম?'

গ্রেবার হেসে বলল, 'আমরা সবাই একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। বুঝেছ?'

'তাই বটে।' এলিজাবেথ পান করতে করতে একসময় গ্রেবারের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর সজাগ হতে দেখল বোমার ধোঁয়া টোয়া সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না উঠেছে ফুটফুটে। দূরের গাছটাতে অজস্র ফুল ফুটেছে। সে উঠল। এগিয়ে গেল। খানিক পর একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এল

হাতে করে। 'কি সুন্দর ফুল দেখো।'

'হ্যাঁ। বসন্ত ঋতু তো এখন।' গেবার মুগ্ধ চোখে এলিজাবেথকে যেন নতুন ভাবে আবিস্কার করল।

এলিজাবেথও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গেবারের পাশে এসে বসল।

গেবার তাকে দুহাতের আলিঙ্গনে বন্ধ করল। ধীরে ধীরে দুটি দেহ মিলে গেল এক হয়ে। গেবার অনুভব করল এলিজাবেথের শরীরের মধ্যে তার শরীরটা হারিয়ে গেছে, নিবিড় আনন্দে দুজনে দুজনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

□ পনেরো □

আটচল্লিশ নম্বর ঘরে আজকে হই চই লেগে গেছে। ডিমে-মাথাটাই চেঁচাচ্ছে বড্ড বেশী। সীমান্তে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে, সেই রাগেই যেন ফুঁসছে ডিমে মাথাটা। আরও দুজনও যাচ্ছে। কিন্তু এটারই যেন গায়ের জ্বালা বেশী। রোটারের দিকে তাকিয়ে সে ঘেংড়ে উঠল, 'বাঃ। পা ভেঙ্গে পড়ে আচ্ছেন, খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন, দিব্যি মজাতেই আছেন। আর আমি শালা পরিবারের একমাত্র কর্তা হয়েও, আমাকেই যেতে হচ্ছে। চমৎকার ব্যবস্থা।'

ওপাশ থেকে ফেল্ডমান ভেংচে উঠল, 'যাবিনা তো কি? তোরা তো ওয়াল এ গ্রুপের। বোটারও যদি হতো তো ওকেও যেতে হতো। তুই গেলে তখন আরাম করে মজা লুঠতাম এখানে।'

'চুপ কর। বেশী বকিসনি। কাজে ফাঁকি দিয়ে মজা লুটবো, সে বান্দা আমি নই। আমি সংসারের একমাত্র কর্তা বলেই অন্যায়টা আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

'তোর অন্যায়ের নিকুচি করি, বাকি দুজন যারা যাচ্ছে, তাদের একজন ধমকে উঠল, 'দাগমারা সৈন্যদের কাছে আবার ন্যায় অন্যায় কি বে? ডাক পড়েছে, যেতে হবে, ব্যাস। চল্ চল!' বলে তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে হেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'কিছু মনে করো না ভায়েরা, সবই তো বোঝো। তোমরা ভাল থেকো সবাই।—বিদায়।

রোটার হাসল।' কার মেজাজ যে কখন কি কারনে বিগড়ে যায়, বোঝে কার সাধ্য। ষাকগে। তা তোমার আর কদিন অছে ছুটি। গেবারের দিকে ফিরে-প্রশ্ন করলেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেবার বলল, 'আর এগারো দিন।'

'বাঃ। সে তো অনেক দিন।'

'গতকাল পর্যন্ত তাই মনে হয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে, কই, ফুরিয়েই তো গেল।'

'আজ বাড়ি খালি। ফ্রাউ লিজার তার বাচ্চাটাকে নিয়ে গাঁয়ে গেছে কিসব চাঁদা ফাঁদা তুলতে। ফিরতে ফিরতে কাল রাত্রি হয়ে যাবে।' এলিজাবেথ মুচকি হেসে বলল।

'যাক, বেঁচে গেল। নইলে আজ ধরে ঠিক প্যাঁদাতাম', গ্রেবারও হেসে ফেলল, 'তা কালকে তোমাকে কিছু বলেছে নাকি, বাঁদরিটা?'

'বলেনি। তবে হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমাকে একটা বদ চরিত্রের মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।' ম্লান হেসে বলল এলিজাবেথ।

'সেকি! কেন, কেন?'

'ওই যে, কদিন ধরে তুমি আমার পেছনে লেগে রয়েছো। আমাকে নিয়ে বেরোচ্ছ। তাতেই দুয়ে দুয়ে চার করে নিয়েছে।'

'নিক গে। তাতে রয়েই গেল আমাদের। মোদ্দা কথা, আজ সন্ধ্যে আর কালকের সারাদিন আমাদের নির্ঝঞ্ঝাট মিলন। ভাল কথা, তোমার কাজের জায়গায় যেতে হবে না কাল।'

'না। শনিবার অর্ধেক, রোববার পুরো ছুটি।'

'খুব ভাল কথা। কালকে দিনের আলোতে প্রানভরে দেখবো তোমাকে। একদিন তো সে সুযোগ হয়নি।' গ্রেবার উৎফুল্ল স্বরে বলল।

'হ্যাঁ, কালকে দিনের আলোতে আমার আর্নস্টকে দেখবো, এতো আমারও আকাঙ্ক্ষা। সে যাক। আজ রাত্রে কি করব বলো?'

'চলো না, জার্মেনিয়াতেই যাই।'

'যেতে হয় তুমি যাও। আমি আর ও পথ মাড়াচ্ছিনা।'

'তাহলে আজ এ বাড়িতেই আসর বসাই। কয়েকটা বোতল তো ভরাই আছে। আর চলতো, তোমার কিচেনটা দেখি। তোমাকে আজ রান্না করে খাওয়াব।'

'থাক।' এলিজাবেথ কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বলল, 'তুমি চুপ করে বসো। আমিই তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো। তার আগে কি আছে একবার দেখে নিই।'

'তাই চলো। আমিও তোমার সঙ্গে কিচেনে যাই।'

'কিচেনে এসে কিন্তু দুজনেই হতাশ হলো। মাত্র এক পীস্ রুটি, সামান্য একটু মাখন, গোটা দুয়েক ডিম, আর পচা আপেল কয়েকটা।'

এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি বলল, 'কুপন ছাড়া তো কিছু পাওয়া যায় না।'

'তোমার রেশন কুপন তোমার কাছেই রেখে দাও। পরে কাজে লাগবে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। শত্রুদের মাল ছিনিয়ে আনার মত আলফন্স ব্যান্ডিং

এর কাছ থেকে কিছু মাল হাতিয়ে নেওয়া যায় কিনা। বুঝলে, ব্যাটা এস, এস, অফিসার! প্রয়োজনের বেশী মাল পায় ওরা। সে আমাকে কেন যেন নিমতন্ন করেছে। গেলে তো খেতামই। সেই ভাগটাই পাই কিনা দেখি। তুমি বসো। আমার আধ ঘণ্টার বেশী লাগাবেনা ঘুরে আসতে।'

'এই যে আর্নস্ট, এসে গেছো। চলে এসো একদম ভিতরে।' আলফন্স আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো দরজার গোড়াতেই। আজ আমার জন্মদিন। তাই কজন বন্ধুকে ডেকেছি। দুজন গেস্টাপো অফিসারও এসেছে। চলো না, আলাপ করিয়ে দিই।'

আজ থাক, আলফন্স। তুমি ডেকেছ। তাই একবার দেখা করতে এলাম। আসলে আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। ইচ্ছে থাকলেও থাকার উপায় নেই।'

'বুঝেছি। সেই চিরন্তন নারীর আহবান। তা হোক। কাটিয়ে দাও আজকের মতো। তোমাকে আজ আমি ছাড়ছিনা। একটা অজুহাত দেখিয়ে দিও। বলবে যে গেস্টাপো দপ্তরে ডেকেছিল, তাই উপায় ছিলনা।'

'না, আলফন্স! কোন উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে। আগে যদি জানতাম যে আজ তোমার জন্মদিন, তাহলে চেষ্টা করতাম। এখন আর উপায় নেই। আসলে, আমি তোমার কাছে আজ কিছু খাবার দাবার পাওয়ার আশায় এসেছিলাম। যদি পারো তো কিছু খাবার দাও আমাকে। আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।'

'না, তুমি দেখছি একেবারে নাছোড়বান্দা। আরে, একবার উঁকি মেরে দেখো ঘরে কি দুটো ডাঁশা মেয়ে রয়েছে। যে কোনটাকে বা দুটো নিয়েই তুমি আজ শুতে পারো। আমার আপত্তি নেই।'

'আমার আপত্তি আছে, আলফন্স, অন্য মেয়েতে আজ আমার রুচি নেই।'

'নাঃ। তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। এসো, যত খুশী খাবার নিয়ে যাও।'

প্রয়োজনেরও বেশী খাবার, গোটা কয়েক মদের বোতল, এমন কি দু'প্যাকেট সিগারেটও দিয়ে দিল ব্যান্ডিং। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এল গ্রেবার।'

'রান্নাঘরে এসব রাখা চলবে না, আর্নস্ট। ফ্রাউ লিজার দেখে ফেললে আমাকে একেবারে কালোবাজারি বলে ধরিয়ে দেবে'' এলিজাবেথ হেসে বলল।

'তাই তো, মুশকিল হলো। এক কাজ করা যাক! দু'দিন তো খেয়ে নিই প্রান ভরে। তারপর যা বাঁচবে না হয় ওই ঢেমনিটাকে দিয়ে দেবে।' আর্নস্ট যেন সহজ সমাধান করে দিল।

'তোমার মাথা খারাপ। ফ্রাউ লিজার নিজের রেশনেই চালিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

এসব দিতে গেলে উল্টো ফল হবে। ঘরের মধ্যেই অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'ঠিক বলেছ।' আর্নেস্ট বলল, 'পরে যা হবে দেখা যাবে। এখন টেবিলে সব সাজিয়ে নিয়ে বসি। খেতে থাকি। আর পরের কথা পরে। এসো।'

ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়েছিল বিছানায়। গ্রেবার সারা দেহ দিয়ে, মন দিয়ে এলিজাবেথের শরীরের উত্তেজনায় অনুভব করছিল। আলো জ্বালা হয়নি। জানালাগুলো খোলা। কাঁচের ওপর গুন চিহ্নের মত করে কালো কাগজ সেঁটে দিয়েছিল এলিজাবেথ। রাস্তা থেকে গাড়ির আওয়াজ, ভারি বুটের শব্দ সব থেমে গেছে। রেডিও বাজছে কোথায় নিচু ভল্যুমে। একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। কে যেন খক খক করে কাশলো কয়েকবার। 'সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ল এবার।' এলিজাবেথ বলল। চাঁদ ওঠবার সময় হলো।' এলিজাবেথ আর্নেস্টের বাধন ছাড়িয়ে জানালায় এসে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর অভুক্ত, ছড়ানো খাবারগুলোর দিকে একবার তাকালো। 'রাস্তায় কতগুলো লোক খোঁড়াখুড়ি করছে কেন, বলতো?'

আর্নেস্ট আলস্যভরা স্বরে বলল, 'বোধহয় ইলেকট্রিক লাইন ঠিক করছে। এক কাজ করো। শ্যাম্পেনের বোতলটা দাও।'

'আবার এখন মদ খাবে?' এলিজাবেথ বলল।

'আরে শ্যাম্পেন ছাড়া কি জমে এমন মধুর রাতে! এসব আমার প্যারিস থেকে কেনা।'

'বল কি? তুমি প্যারিসেও ছিলে? কদিন ছিলে?'

'ছিলাম দিন পনেরো। যুদ্ধের শুরুর দিকে। তখন আমার উঠতি বয়েস। তাড়াতাড়ি যুদ্ধটা জিতে নেবো। তারপর প্যারিসের খোলা পথে রঙীন সামিয়ানার নিচে কোন রেস্তরাতে বসে পান টান করব সে মজাই আলাদা।'

'আর ফরাসীরা যে তোমাদের ঘেন্না করবে, তা ভাবনি, না? কত ক্ষতি করেছ ওদের। ওরা কি অত সহজে ভুলে যাবে ভেবেছ?

'হ্যাঁ, তা যা বলেছ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রেবার বলল, 'দেশগুলোর বুকে যে নারকীয় ক্ষতির সৃষ্টি হয়ে গেল, তার দাগ ভর্তি হয়ে মুছে যেতে কত যে লেগে যাবে।'

'আমরা অন্য কোন দেশে তো যেতে পারি যেখানে কোন ক্ষতি হয়নি?'

'তেমন দেশ প্রায় নেই বললেই চলে।' গ্রেবার বলল। 'যাও গ্লাস ভর্তি কর ফের।'

দুটো গ্লাস আবার ভর্তি করে গিয়ে এলিজাবেথ বলল, 'আর কোন দেশে বুঝি ছিলে?'

'কেন, আফ্রিকাতে ছিলাম। অনেক দিন।'

'কত কিছু দেখেছ, তুমি, তাই না ?'

'তা বলতে পারো। তবে ছোট বেলায় যেমন ভেবেছিলাম, তেমন কিছু নয়।'

'আনন্দ! আর কোন দেশে ছিলে ?' এলিজাবেথ আবার জিজ্ঞেস করল।

'ছিলাম হাল্যান্ডে।' বলতে গিয়ে কেমন কেঁপে গেল গ্রেবারের গলার স্বর।

'যুদ্ধ শেষ হলে আমরা না হয় সেখানেই যাবো।' এলিজাবেথ খুশীর স্বরে বলল, 'পানসিতে চেপে হ্রদে ঘুরে বেড়াবো। কোকো খাবো আর সেই সঙ্গে রুটি আর সাদা পনির।'

'না না, এলিজাবেথ, সে দেশে আমরা যেতে পারবো না আর···'বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে গেল গ্রেবারের গলার স্বর, 'কি করে মুখ দেখাব ওদের ? আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। সারা দেশটা জ্বলে পুড়ে খাক, একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে। ওদেশের মানুষদের জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলেছি, কত যে হাজার হাজার লোক মেরে ফেলেছি আমরা। না, এলিজাবেথ, ওরা কোনদিন আমাদের ক্ষমা করবে না।'

এলিজাবেথ স্তব্ধ হয়ে ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অকস্মাৎ হাতের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলো মেঝেতে। কেঁদে ফেলল হু হু করে। 'কোথাও যাবার জায়গা নেই আমাদের। আমরা, এখানেই বন্দি হয়ে পচে গলে মরবো। আর স্বপ্ন দেখবো বোকার মত।'

গ্রেবার হঠাৎ সচকিত হলো। এলিজাবেথকে এভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখে বিচলিতও হলো। আস্তে করে উঠে, সাবধানে পা ফেলে জানালার কাছে গিয়ে বন্ধ করে দিল। 'তুমি নড়ো না। তাহলে কাঁচে পা কেটে যেতে পারে। আলোটা জ্বালাই আগে আমি।'

আলো জ্বালতেই নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে গেল এলিজাবেথের মুখ। কখন যে নাইট গাউনটা স্থলিত হয়ে কোমরের কাছে গুটিয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে নিটোল, পুষ্ট শঙ্খের মত ধবধবে দুটি স্তন, অনাবৃত হয়ে পড়েছে গভীর, বর্তুল নাভীর নিচে পর্যন্ত, খেয়ালই করেনি সে। 'এই এদিকে তাকিও না। আমি গাউনটা ঠিক করে নিই।'

গ্রেবার হেসে ফেলল। 'আহা, কি এমন হয়েছে! বেশতো সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'আহা, লজ্জা করেনা বুঝি আমার! আমি তো এর আগে কখনও কোন পুরুষের কাছে নিজেকে এভাবে মেলে ধরিনি।'

'তাতো জানি। তুমি যেন ঠিক আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলে। আর আমিও ···সত্যি বলছি এলিজাবেথ, তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে পাবো, কখনও তা ভাবিনি। মনে হচ্ছে, এখান থেকে অন্য কোথাও তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে, কি

সুন্দরই না মানাতো তোমাকে। একথা আমার সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনই মনে হয়েছে। অথচ, কেমন একটা অসহায়তা চারপাশ থেকে আমাদের চেপে ধরেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর তাই আমরা প্রতি মুহূর্তে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছি। তুমিও, আমিও। এ একরকম ভালই। না কি বল?' এলিজাবেথ বলল।

'যা বলেছ, ভালই। এর চেয়ে ভালতে আপাতত আমাদের দরকার নেই। গ্রেবার বলল।

এলিজাবেথ আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে খুলে দিল। 'কি সুন্দর জোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে দ্যাখো, আর্নস্ট!'

গ্রেবার এসে পেছন দিক থেকে এলিজাবেথের শরীর মিলিয়ে দাঁড়াল। 'আজ বোধহয় পূর্ণিমা। চাঁদের চারপাশে কেমন গোল হয়ে একটা রক্তিম বৃত্ত পড়েছে দেখেছ? যেন আমাদের আজকের দুঃখ-যন্ত্রণায় প্রতীকের মতো। এসো!' বলে এলিজাবেথকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলো খাটের ধারে। নিচু হয়ে একটা কইনাকের বোতল তুলে নিল। বোতল থেকেই দুজনে পান করল কিছুটা। এক চিলতে জ্যোৎস্না যেন গলানো মোমের মতো বিছানায় এসে পড়েছে। ওরা দুজনে পাশাপাশি শুলো। এলিজাবেথ গ্রেবারের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা আর্নস্ট, এই মুহূর্তে আমরা সুখী না অসুখী?'

চাঁদের স্বর্নাভ জ্যোৎস্নায় এখন ঘরটা ভরে উঠেছে। নিবিড় করে এলিজাবেথকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গ্রেবার বলে উঠল, 'সুখী না অসুখী, তা তো জানি না এলিজাবেথ। তবে বাস্তব সত্যটা হল যে আমরা এখনও মরিনি। ভীষণ ভাবে বেঁচে আছি আমরা।'

□ ষোল □

পরদিন ভোরে আবার তাদের বাড়িতে, আঠারো নম্বরে কি ভেবে গ্রেবার যেন এলো। হয়তো হতাশার মধ্যেও কোন আশা। এসে কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। চারিদিক বেশ পরিস্কার করা হয়েছে দেখল সে। এমনিতেও তো একটা ভগ্নস্তূপ হয়ে রয়েছে। তবু সিড়ি, যাতায়াতের সরু পথটা বেশ তকতকে দেখাচ্ছে। সামরিক বিভাগ থেকে করল নাকি। ভাবতে ভাবতে একটু ভেতর দিকে দেখতে গেছে সে, তখনই একটা সতর্ক গলার আওয়াজ হলো: 'এই কে ওখানে? বেরোও, শিগগীর

বেরোও ?'

গ্রেবার বাইরে আসতেই দেখল ছেঁড়াখোঁড়া পোষাকের ওপর ততোধিক ছেঁড়া একটা সৈনিক কোট পড়া, এক বগলে ক্রাচ নিয়ে একটা লোক ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকে দেখছে। 'এই যে, কি মনে করে ?'

'আমি তো এখানেই থাকি। আপনি কে ?' গ্রেবার জবাব দিল।

'আহা মামার বাড়ি! আমি এখানে থাকি! চুরির মতলবে ঢুকেছ, তাই না ?'

'আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন ?' গ্রেবার শান্ত স্বরেই বলল, 'আমাদের বাড়ি এটা। আমার বাবা-মা থাকতেন। যুদ্ধের আগে আমিও ছিলাম। বুঝেছেন ?'

'না, বুঝিনি', ভেংচে উঠল লোকটা। 'প্রমাণ কি যে এটা তোমাদের বাড়ি ?'

'ব্যাপারটা কি অটো ?' কে যেন ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল খোঁড়া লোকটাকে।

মুখ ফেরাতে বেশ দশাসই চেহারার একটি লোককে গাঁইতিটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে আসতে দেখল গেবার। তার পেছনে আবার একজন বয়স্কা মহিলা, সঙ্গে একটা বাচ্চা।

তাদের দেখে খোঁড়া লোকটার যেন সাহস বেড়ে গেল। 'আরে ব্যাটা চুরির মতলবে ঢুকেছিল, ধরে ফেলতে বলে কিনা বাড়িটা ওদের।'

গাইতি হাতে লোকটা তড়পে উঠল, 'এক, দুই, তিন গুনবো। এর মধ্যে যদি সটকে না পড়তো মাথাটা কুমড়োর মত ফাঁক করে দেবো। এক...' বলেই গাইতিটা তুলে ধরা মাত্রই চোখের পলকে গেবার এক ঝটকা মেরে গাঁইতিটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর লোকটা চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। লোকটার নাক দিয়ে তখন রক্ত পড়ছে বেশ।

এবার বয়স্কা মহিলা বেশ ভয় পেয়ে এগিয়ে এসে গেবারকে বলল, 'তুমি রাগ করোনা, বাছা, আমরা কোন মতে এখানে একটু ঠাঁই করে নিয়েছি তো।'

'আমি মোটেও রাগ করিনি! এটা আমাদেরই বাড়ি ছিল। বাবা-মাও এখানে ছিলেন। বোমা পড়ার পর কোথায় গেছেন তা তো জানিনা। তাই দেখতে এসেছিলাম। এখানে চুরি করতে আসব কেন ? চুরি করার মত এখানে আছেই বা কি ?'

'বাবা, যাদের সব গিয়ে ভাঙ্গা চোরা কিছু আছে, তাই তাদের কাছে অনেক।'

গেবার শান্ত স্বরে বলল, 'আমি একজন সৈনিক। ছুটিতে আছি ক'দিন। এখানে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছিলাম, আপনাদের নজরে পড়েনি ?'

'ও, ওই চিঠিটা আপনার বুঝি ?' এইবার খোঁড়া লোকটা বন্ধুত্বের স্বরে বলে উঠল, 'বুঝতে পারিনি তাই। কিছু মনে করবেন না। পুলিশের কাছে আমরা সন্দেহভাজন। গোপনে আশ্রয় নিয়েছি এখানে, তাই।'

গেবার অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে আপনারা নিজেরা এই ভাঙ্গা স্তূপ খুঁড়ে সব পরিস্কার করেছেন ? কোন মৃতদেহ পাননি ?'

'না তো। নিশ্চিত ভাবে বলছি যে এখানে কোন মৃতদেহ ছিল না বা নেই।' খোঁড়া জবাব দিল।

'ব্যস! এটুকু জানতেই আমি এখানে এসেছিলাম।' গ্রেবার বলল।

'তার জন্যে এই রক্তপাত ঘটানোর কি খুব প্রয়োজন ছিল?' চিৎপাত হয়ে পড়া লোকটা উঠে বসে জামায় হাতায় নাকের রক্ত মুছতে মুছতে হাসবার চেষ্টা করে বলল।

'আর এটুকু জানতে এসে আমার মাথাটাই দু'ফাঁক হতে যাচ্ছিল?' গ্রেবারও হালকা স্বরে বলল। তারপর চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আর একবার চারপাশে দেখল। কোন্ মতে মাথা গোঁজার জন্য কয়েকটা প্রাণী একত্র হয়েছে। জীবন কখনও থেমে থাকেনা। ওই তো ওপাশে বাচ্চাটা টলমল পায়ে একটা বিড়ালকে ধরবার চেষ্টা করছে। মৃত্যুকে আপাতত ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকা অবোধ একটা শিশু। কিন্তু আগামী জীবনের প্রতীক।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তার সামনে ওই ছেলেটা কে? ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখ। চোখের নিচে কালি পড়েছে। নাকটা হয়ে উঠেছে প্রধান। সব মিলিয়ে যেন একটা মরার মাথা। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল তার। বেশ খানিকটা সময় লাগল বুঝতে যে দোকানের বড় আয়নাতে তার নিজেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। নিজের মৃত্যু পাণ্ডুর মুখের দিকে নিজেই সে শিউরে উঠছে। মনটা কি এক বিষন্নতায় যে ভরে গেলো। তখনই কে যেন তাকে ডাকল। ঘুরে তাকালো সে। ক্রাচে ভর দিয়ে কে আসছে প্রথমটা বুঝতে পারলোনা। তারপর চিনতে পারলো, মুতসিগ। 'আরে কাল'। তুমি যে এখানে?''

'মাস ছ'য়েক হলো তো এখানেই আছি, 'মুতসিগ বলল। তারপর গ্রেবায়ের বিষন্ন মুখের দিকে তাকাল।' খুব অবাক হয়ে গেছো, আর্নেষ্ট, তাই না?'

একদা সহপাঠীকে এই অবস্থায় দেখে কি বলবে ভেবে পেলো না গ্রেবার। মুতসিগই ফের বলল, 'তোমার ছুটি নিশ্চয়ই আরও কয়েকদিন আছে? তাহলে এখানকার হাসপাতালে সার্জিক্যাল বিভাগে চলে এসো একদিন। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। বার্গমানের সঙ্গেও দেখা হবে। বেচারার দুটো হাতই কেটে বাদ দিতে হয়েছে।' বলতে বলতে মুতসিগের গলার স্বরে যেন গলিত দুঃখ ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। 'সিবেত' মারা গেছে জানোনা বোধহয়? মাস দেড়েক আগে। আর লিনের আর ল্যাংগেল, দুজনেই একসঙ্গে চলে গেছে। ব্রুইনিং তো উম্মাদই হয়ে গেছে। আর বার্গমানের কাছে শুনলাম যে হলমানও নাকি মারা গেছে। যাক এসব কথা বলে তোমার দুঃখ আর বাড়াবো না। তুমি কিন্তু তোমার নিজের

শরীরটার যত্ন নিও, আর্নেস্ট। বড় কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে। আর অবশ্যই সময় করে একদিন আমাদের ওখানে এসো কিন্তু, ভুলো না।'

'না, না, কার্ল'। অবশ্যই যাবো একদিন। গ্রেবার আন্তরিক স্বরে কথা কটা বলে তাকিয়ে রইল মুতসিগের খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাওয়া দেহটার দিকে। ভাবতে ভাবতে কত দূরে বাল্যকালে চলে গেল সে ক্ষনেকের জন্যে। মুতসিগ তখন প্রতিবছর স্কুল স্পোর্টসে দৌড়ে প্রথম হতো? দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রেবার আবার হাটতে আরম্ভ করল। মনে মনে বলল, মুতসিগ। তোমাদের অন্তত সীমান্তে গিয়ে অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে বরণ করতে হবে না। এটা যে কত বড় শান্তি, তা যদি জানতে।

গ্রেবার বাড়ির ভেতর পা দিতেই এলিজাবেথ একটা পাতলা গাউনে শরীর ঢেকে, মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। বেশ তাজা দেখাচ্ছে তাকে। গেব্রারকে দেখে হেসে সে বলল, 'কদিন পর আজ সাবান ঘষে গরম জলে স্নান করলাম।'

'বেশ করেছ। শরীরের যত্ন নিতে হবে বইকি।' এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। মা বাবার তো খোঁজ নেই। সীমান্তেও তাকে আবার ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার ফেরা হবে কিনা, হলেও কতদিন বা বছর পরে, কে জানে। তাহলে এখানে তো তার কোন বাঁধনই থাকবে না। অথচ, এই এলিজাবেথ কি তাকে ভাল বেসেছে? ভাবনাটা মাথায় আসতেই সে বলে উঠল, 'এসো, আমরা বিয়ে করে ফেলি, এলিজাবেথ।'

'বিয়ে?' চমকে উঠেও খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল এলিজাবেথ, 'হঠাৎ বিয়ের কথা মনে হলো কেন তোমার।' আমাদের ভাল করার কেউ নেই, পৃথিবীতে একা হয়ে গেছি আমরা, সে জন্যে বলছ?'

নিজের যন্ত্রনার কথা, নিজের ভাবনার কথাগুলো, কিছুতেই যেন বুঝিয়ে বলতে পারলোনা গ্রেবার। শেষে মরিয়া হয়ে বলল, 'এতে তোমার অনেক সুবিধে, ভেবে দেখো। সৈনিকের স্ত্রী হলে সরকার সব দায়িত্ব নেয়। তখন ফ্রাউ লিজারের মতো কেউ সর্বক্ষণ তোমার ওপর নজরও রাখবে না। মানে, নানা দিক থেকেই তোমার সুবিধা হবে।'

'দূর। এসব কি কোন যুক্তি হলো। তাছাড়া, বিয়ের ব্যাপারে ডাক্তারি পরীক্ষা থেকে শুরু করে আরও কত যে ঝামেলা।'

'আরে না। সৈনিকদের বেলা অত ঝামেলা পোয়াতে হয় না, বুঝলে। তাছাড়া, আমরা দুজনেই অসহায়। সেটা তো কমে যাবে।'

'কমবে না, আর্নেস্ট। বাড়বে। না আর্নেস্ট ওসব চিন্তা ছাড়ো। যেমন এখন আছি, তাই যথেষ্ট।'

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন খালি হয়ে গেল গ্রেবারের। একটা অক্ষম রাগ হিস্‌হিস্‌ করে ফনা তুলল। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। 'মদের বোতল ফোতল আছে কিছু?' হঠাৎ অস্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল গ্রেবার।

এলিজাবেথ এক পলক গ্রেবারের মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ নীচু করে নিয়ে বলল, 'আছে একটা বোতল, কি যেন। নিয়ে আসছি রান্নাঘর থেকে।'

বোতলটা গ্রেবারের হাতে দিয়ে এলিজাবেথ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘলা করে আছে। হয়তো এখনই বৃষ্টি নামবে। মনটা তারও এই মুহূর্তে কেন যেন ভার ভার। মুখের মেঘলা ভেঙ্গে বাদল ধারা নেমেছে তার দুচোখ থেকেও।

গ্রেবার ঢক ঢক করে বোতল থেকে গলায় ঢেলে দিল খানিকটা মদ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালো। ধীরে ধীরে এগিয়ে সে এলিজাবেথের পেছনে দাড়াল। টের পেলো এলিজাবেথ। বলল, 'দেখেছ, আকাশের ছিরিটা দেখেছ? আমাদের প্রথম রোববারটাই মাটি হলো।'

গ্রেবার বলল, 'ভালই হয়েছে। ফ্রাউ লিজারের রক্তচক্ষু তোমাকে পাহারা দিচ্ছে না যখন তখন তো আমরা বাড়িতে থেকেই আজকের দিনটা উপভোগ করতে পারি? কি বল?' বলে এলিজাবেথের কাঁধে হাত দিয়ে নিজের দিকে ফেরাতেই গ্রেবার দেখল তার চোখে জল। নিজের ব্যস্ত আগ্রহে হয়তো আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে এলিজাবেথকে। তাই তৎক্ষনাৎ বলে উঠল, 'কেঁদো না, এলিজাবেথ। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আজকের দিনটাকে এসো দুজনে মিলে মধুর করে তুলি। মন খারাপ করে থেকো না।''

'না, না, আর্নষ্ট। আমার মন খারাপ নয়। তুমি কাছে আছো, এতেই আমার আনন্দ।'

গ্রেবার নিবিড় করে এলিজাবেথকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। এলিজাবেথও বাধা দিল না।

ব্যান্ডিং এর দেওয়া খাবার আর মদ খেয়ে সারাদিন ওরা দুজনে দুজনকে আরও গভীর ভাবে উপভোগ করল। বিকেলের দিকে বৃষ্টি নামল। শ্লথ শরীরে গ্রেবারকে আদ্যপান্ত জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল এলিজাবেথ। বৃষ্টির শব্দ শুনে বলে উঠল, 'ভালই হয়েছে। ফ্রাউ আর আজকে ফিরতে পারবে না। এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যে তোমারও আর তাবুতে ফিরে যাবার দরকার নেই।' তারপর হঠাৎ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, 'আর্নষ্ট। তোমার হঠাৎ আমাকে বিয়ে করার কথা মনে হলো কেন? তুমি আমার সব কথা কি জানো?'

'জানি বইকি। কতদিন, কত যুগ ধরে যে জানি। জানো, ছুটি পাবো, বাড়ি যাবো, মা বাবার সঙ্গে তো দেখা হবেই, দেখা হবে তার সঙ্গেও, যাকে আমি এতকাল ধরে আমার বুকের গভীরে লালন করেছি, ভেসে গেছি তাকে নিয়ে স্বপ্নের ভেলায়,

ভালবাসার, প্রেমের সেই জগতে। এসব কথা আমি মুখ ফুটে কাউকেই তো বলতে পারিনি। হয়তো তোমাকেও পারতাম না বলতে। আজ এই বর্ষা রাতের নিবিড় অন্ধকারই হয়তো আমাকে উৎসাহ দিয়ে থাকবে তাই বলে ফেললাম তোমাকে।'

'এজন্যেই কি বিয়ে করে আপন করে নিতে না পারলে, সত্যিকারের ভালবাসা জন্মায় না।'

'আর কিছুদিন পরেই যদি ফুরৎ হয়ে যায় ভালবাসা, তখন তো বাঁধন ছিড়ে পালাবে।'

'এলিজাবেথ। একথা মনেও স্থান দিওনা। অন্তত আমাকে নিয়ে না।'

এলিজাবেথ আর কোন কথা বলল না। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আর্নষ্টের হাতে ছেড়ে দিল। গেত্রাবারও তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে গভীর আশ্লেষে অনুভব করতে করতে বৃষ্টির ঝিম ঝিম নাচের শব্দ শুনতে লাগল। কত কথা যে তার কিছুই আর বলা হলো না।

□ সতেরো □

বাথটবে মুঠো খানেক বাথ সল্ট মিশিয়ে তৃপ্তিভরে স্নান করল গেত্রাবার। সত্যি, ব্যান্ডিং, বেশ আনন্দে আছে। তাদের অস্থায়ী নিবাসে স্নানের এমন বিলাসিতা করবার কোন সুযোগই নেই। যাক। আপাততঃ সৈনিকের পোশাক ছেড়ে ফেলে ব্যান্ডিং এর দেওয়া হালকা পোশাক পরেও মনে হচ্ছে যেন কিছুই পড়েনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিল না যেন। নিহিত কিশোর আর্নষ্ট গেত্রাবার যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাড়িয়েছে।

পেছন থেকে দুহাতে দুটো কইনাকের গেলাস হাতে ধরে হেসে উঠল ব্যান্ডিং। 'তাহলে আর্নষ্ট, বিয়ে করছো? আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম তোমাদের দুজনকে। তা তুমি তোমার হবু স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না আমার?'

'না। আপাততঃ না।'

গেত্রাবারের সোজাসুজি না বলে দেওয়ায় একটু আহতই হল যেন ব্যান্ডিং। তবে বুঝতে দিল না। দরকার টরকার হলে আমাকে অবশ্যই জানিও, আর্নষ্ট।'

কাগজপত্র নিয়ে যদি কোনরকম অসুবিধের পড়ো আর কি?'

'আরে আমি সৈনিক। যুদ্ধের সময় বিয়ে করতে আবার কাগজপত্র কি?'

'না, তবু বলছি যে কোন কারনে কোন অসুবিধা হলে অসংকোচে জানিও আমাকে। গেষ্টাপো কয়েকজন আমার বিশিষ্ট বন্ধু আছে তো! বলে দেখো।'

'যুদ্ধের সময় একজন সৈনিক বিয়ে করছে। তাতে গেষ্টাপোদের কি ?'

'তুমি সৈনিক তো, তাই কিছু জাননা। গেষ্টাপোরা সব ব্যাপারেই এখন মাথা ঘামায়। তুমি কম্যুনিষ্ট না কোন ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করছ, তা তারা দেখবে না ? তবে সবই নিয়মমাফিক তত্ত্বতালশ। এই আর কি। তা সাহায্যের দরকার হলে, বলো আমাকে।'

মনে মনে ত্রস্ত হয়ে উঠল গ্রেবার। খোঁজ নিলেই তো জেনে ফেলবে যে এলিজাবেথের বাবা এখন বন্দিশিবিরে। নাঃ। এতটা না বললেই হতো আলফান্সকে। যাকগে। তবু এলিজাবেথের কথা বলেনি। এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। বরং ব্যান্ডিংকে ঠান্ডা করতে একটা সাহায্য চাওয়া যাক। মনে মনে একটা মতলব ভাঁজল সে। বলল, 'সাহায্য যখন করতেই চাইছ তো পাউন্ড দুয়েক চিনি দাওতো, দুটো প্যাকেটে আলাদা করে। একজনকে উপহার দিতে চাই।'

'সে তুমি নাও না। চিনির অভাব কি ?' বলে হাসল। 'এসো তবে, পুরো বোতলটা শেষ করা যাক। তোমার ভাবি বধুর উদ্দেশ্যে। চিয়ার্স'।'

গ্রেবারও চিয়ার্স' বলে তাকালো। এই মুহূর্তে আলফন্সের মুখটাকে একেবারে যিশুর মতো সহজ, নিষ্পাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আড়ালে যে একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা রয়েছে, সেটুকুও তার অগোচর রইল না। ঠিক ষ্টেন ব্রেনারের মতো। সে এবার হালকা স্বরে বলল, 'আপাতত তোমাকে বলার মত কিছু নেই। তবে তুমি তো জানতেই পারবে কোন না কোনদিন। 'চিয়ার্স'' 'আবার বলল সে।

ফ্রাউ লিজার তো গেব্রারের ভব্য সব্য পোশাক দেখে প্রথমটা চিনতেই পারলো না। তারপর মুখে হাসি এনে বলল, 'তাই, আপনি। কিন্তু ফ্রয়লিন ক্রুজে তো এখন নেই বাড়িতে।'

'তা জানি।' গেব্রার বলল, 'তার জন্য এই প্যাকেটটা এনেছিলাম। এই এক পাউন্ড চিনি। বাকী একপাউন্ড কি করব ভাবছি।' তারপর দ্রুত স্বরে বলল, আপনি রেখে দিননা। আপনার তো ছোট ছেলে রয়েছে। কাজে লেগে যাবে।'

মুহূর্তে ফ্রাউ লিজারের মুখটা কঠিন হলো। 'আমরা কালোবাজারি মাল ব্যবহার করিনা। মাননীয় ফুয়েরার যা দেন, তাতেই চালিয়ে নিতে অভ্যস্ত আমরা।'

'আরে ছি, ছি, কি যে বলেন। কালোবাজারি জিনিষ আমি পাবো কোথায় ? আর নেবোই বা কেন। এটা তো ছুটিতে আসা প্রিয় সৈনিকদের জন্য ফুয়েরারের দেওয়া উপহার। কিন্তু আমার পরিবারের কাউকেই তো খুঁজে পাইনি। তাই আপনাকে নিতে বললাম।'

এবার ফ্রাউ লিজারের মুখ উজ্জল হল। 'ও, আপনি রাশিয়া সীমান্ত থেকে এসেছেন বুঝি ? আমার স্বামীও সেখানে আছেন মূল বাহিনীতে। তবে কোথায়

তা ঠিক জানিনা।'

গেবার মনে মনে তার মুণ্ডুপাত করে ভেংচে উঠল। 'জানলেই যেন কত বলতিস।' মুখে অবশ্য কিছুই প্রকাশ পেলোনা। বলল, 'আমি তো যুদ্ধের শুরু থেকেই রাশিয়াতে আছি। এবার দু'বছর পর ছুটি পেলাম।'

'তাই বলুন।' ফ্রাউ লিজার এক গাল হেসে বলল, আমার ছেলেটা মিষ্টি ভালবাসে। ওর জন্যেই নিলাম না হয়।'

গেবার মনে মনে ভাবল, হারামজাদিটা কিছু আবার টের না পেয়ে যায়। তাহলেই সব ভণ্ডুল করে দেবে। প্রকাশ্যে প্যাকেটদুটো দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি তাহলে আজ চলি। হেইল হিটলার।'

ফ্রাউ লিজারও যন্ত্রের মতো তাকিয়ে থেকে বলল, 'হেইল হিটলার।'

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রাউ লিজারের কথাই ভাবছিল গেবার। আর মনে মনে তার ঘেন্না হচ্ছিল। এই ধরনের জঘন্য লোকেই আজ সমাজটা ছেয়ে গেছে। সব হিটলার ভক্ত হারামীর দল। সবটাই অবশ্য লোক দেখানো। আসল উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি। নইলে হিটলারের প্রতি ভক্তি না ছাই। এই পরিবেশে আবার কতকগুলো বাজে লোকের কাছে এলিজাবেথকে পাঠালাম। শেষে কোন বিপদ না ঘটে, কিছুতেই ভরসা করা যায় না। আমিও তো সৈন্যবিভাগে নাম লিখিয়েছিলাম পরিবারে যাতে নিরাপত্তা থাকে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তো তা হয়নি। তাহলে এলিজাবেথের বাবাকে বন্দিশিবিরে যেতে হল কেন?' তাইতো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গেবারের। হার্শল্যাণ্ডের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার তো। বেচারা অনেক করে বলে দিয়েছে। কাগজপত্র ঘেঁটে ঠিকানাটা বার করল সে। তারপর এগিয়ে চলল।

বাড়িটা তেতলা। ছোট আকারের। ঘণ্টা বাজাতেই শুকিয়ে যাওয়া চেহারার এক প্রৌঢ়া রমনী দরজা ফাঁক করে তাকালো।

'আমি ফ্রাউ হার্শল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনি?' গেবার প্রশ্ন করল।

'বলুন, কি বলতে চান।'

'আপনিই তাহলে ফ্রাউ হার্শল্যাণ্ড। আমি আপনার ছেলের বন্ধু, আর্নষ্ট গেবার। একই বাহিনীতে আছি আমরা। হার্শল্যাণ্ড আমাকে বলেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এই সপ্তাহ দুয়েক আগেও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। আমি এখন ছুটিতে আছি, তাই।

'ভেতরে এসে বসো, বাবা। তুমি কিছু খাবে?' প্রৌঢ়া যেন তার উচ্ছ্বাসে তেমন গা মাখলো না।

গেবারের হঠাৎ খুব পিপাসা পেলো। বলল, 'এক গ্লাস জল খেতে পারি।'

'আমি নিয়ে আসছি, তুমি বসো।' প্রৌঢ়া চলে গেল ভেতরে।

গ্রেবার খুবই অবাক হলো। এমন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আচরনের কোন হদিশ খুঁজে পেলো না। যে ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে, তার খবর জানতে পারলে যতটা উল্লসিত হওয়ার কথা, তার কিছুইতো প্রৌঢ়ার চোখে মুখে প্রকাশ পেলো না। ভাবতে ভাবতে উঠে সে ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখতে লাগলো। কোন নাম করা শিল্পীরই আঁকা নিশ্চয়ই। ফুলে ছাওয়া গাছ। তার নিচে জলের পাত্র নিয়ে এক সুন্দরী কিশোরী। বসতে গিয়ে টেবিলের কাছে পায়ে বাধা পেলো। ঢাকনাটা ঈষৎ উঠিয়ে বাচ্চার কচি হাত নজরে পড়ল। মনে মনে হাসল সে। ভয় পেয়ে লুকিয়েছে। যাক।

এই সময় ফ্রাউ হার্শল্যাণ্ড ফিরে এলেন। একটা ট্রে-তে লাল ওয়াইন বা মদ, আর দু'টুকরো রুটি। দেখেই গ্রেবার বলল, 'আহা, এসব আবার আনতে গেলেন কেন? এক গ্লাস জল হলেই তো হতো।'

'তা হোক, খেয়ে ফ্যালো। তুমি তো আমার ছেলের মত।' প্রৌঢ়া বলল।

অগত্যা গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার ছেলে ভালই আছে দেখে এসেছি। ছিলামও আমরা নিরাপদেই। ক'দিন পরেই তো সীমান্তে ফিরে যাব আমি। আপনার যদি কিছু জানাবার থাকে, বা কিছু পাঠাবার থাকে তো আমার কাছে দিতে পারেন। আমি পেঁছে দেবো।

প্রৌঢ়া কোন কথা না বলে কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গ্রেবারের দিকে। কেবল মাথা নেড়ে 'না' করলেন।

গ্রেবার সত্যিই একাধারে বিস্মিত এবং বিরক্তও হলো। এ কেমন মা যে ছেলের খবর শুনেও এমন নিরাসক্ত, উত্তাপহীন। তারপর কি মনে হতে বলল, 'আমি সৈনিকের পোশাক পরিনি বলে কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে? তাহলে আমার কাগজপত্র দেখতে পারেন আপনি। আমি যথার্থই হার্শল্যাণ্ডের বন্ধু।'

প্রৌঢ়া কতক্ষণ গ্রেবারের চোখের দিকে বেদনাসিক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নীচু করে বললেন, 'সে মারা গেছে।'

'কি বললেন? মারা গেছে? অসম্ভব! ক'দিন আগেই তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম!'

'পরশু দিন খবর এসেছে।' ভাঙ্গাচোরা শব্দে কোন মতে উচ্চারণ করলেন প্রৌঢ়া। 'তুমি এখন যাও, বাবা। আমাকে একটু একা থাকতে দাও!'

গ্রেবার একেবারে বোবা হয়ে গেল। একবার হার্শল্যাণ্ডের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। যেন একটা অন্ধকার চারপাশ থেকে চেপে ধরতে আসছে তাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কখন যে সে বেরিয়ে এল। রাস্তায় পা দিয়ে এলিজাবেথের কথা মনে পড়ল। মনটা আরও বিষণ্ন হয়ে গেল তার।

বেশ উদ্বিগ্ন মনেই অপেক্ষা করছিল গ্রেবার। কারখানাতে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। কত কর্মি মেয়ে-পুরুষ চলে গেল, কিন্তু এলিজাবেথের দেখা নেই। নাকি সে খেয়াল করেনি কোন ফাঁকে এলিজাবেথ চলে গেছে। ঠিক তখনই, 'আরে ব্বাঃ! চেনাই যাচ্ছে না যে, অ্যাঁ?' সঙ্গে সঙ্গে কলকল করে হাসির ঝর্ণাধারা।

চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েই হেসে ফেলল গ্রেবারও: দুষ্টু মেয়ে! কখন এসে দাঁড়িয়েছ? টেরও পাইনি! যাকগে, কাজ কতদূর হলো, আগে তাই বলো?'

'কদ্দুর আবার কি? যেখানে যতদূর আবেদন নিবেদন করার ছিল সবই করা হয়েছে।' এলিজাবেথ বলল হাসিমুখে, 'এই পোশাকে তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে না!'

'থামো তো! সুন্দর না ছাই! সারাটা দিন আজকে আমার কি আশংকায় কেটেছে জানো ' গেষ্টাপোরা নাকি এইসব বিয়ে টিয়ের ব্যাপারেও তত্ত্বতালাশ করে, খোঁজ, অনুসন্ধান করে। আমিতো ভেবেছিলাম তোমাকে বুঝি আর দেখতেই পাবো না, কোনদিন।'

'ওঃ, বাবার কথা তোমার মনে পড়েছিল বুঝি? আমাকেও সেই অজুহাতে চালান করে দিতে পারে, তাই ভাবছিলে?' এলিজাবেথ সহজ স্বরে বলে উঠল। 'সে আশংকা যে একেবারে নেই, সেটাও তো নিশ্চিত করে বলা যায় না।'

'তবু ঝুকি আমাদের নিতে হবে, এই বলছ তো? ভয় করছে না তোমার?' গ্রেবার তাকাল।

হাসল এলিজাবেথ। 'না, আনর্ষ্ট। নতুন করে আর ভয় পাবার কি আছে বল?'

আমার কিন্তু ভয় করে, এলিজাবেথ।' গ্রেবার গম্ভীর স্বরে বলল, 'বোধহয়, কাউকে নিবিড় করে ভালবাসলেই এমন নতুন নতুন ভয় বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে।'

কলকল করে উদ্ভাসিত হাসিতে যেন ভেঙ্গে পড়ল এলিজাবেথ।

'তুমি হাসছ!'

'হাসির কথা বললে এমনিতেই হাসি চলে আসে।' এলিজাবেথ হেসেই বলল।

এলিজাবেথের খুশীতে উপচে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে যেন এক নতুন এলিজাবেথকে আবিস্কার করল গ্রেবার। নিজেকেও যেন নতুন করে চিনল। এক সময় ভীতু ভাবটা ছিল এলিজাবেথের মধ্যেই বেশী। আর এখন সে নিজেই হয়ে গেছে ভয়ের শিকার। মনে মনে লজ্জিত বোধ করল সে।

ওরা এতক্ষণে হিটলারপ্লাতস পেরিয়ে গির্জার মুখোমুখি হয়ে এগোচ্ছে। দূর দিগন্তের আকাশ অস্তসূর্যের আলোতে রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে। 'বাঃ চমৎকার!' গ্রেবার বলে উঠল।

এলিজাবেথ আরও ঘন হয়ে এল গ্রেবারের শরীরের সান্নিধ্যে। সত্যি। আকাশে

কে যেন মুঠো মুঠো লাল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। বসন্তকাল এসে গেছে, জানো?'

এলিজাবেথের শরীরের ঘ্রান নিতে নিতে গ্রেবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি তো যেন অনেক দূরের সেই ভয়ানক শত্রু পরিবৃত এলাকা থেকে বসন্তের এই নও বাহার উৎসবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি।'

'অদ্ভূত।' এলিজাবেথ বলল, 'এই বোমা বিধ্বস্ত রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এমন ভাবটাই খুব অবাস্তব। তবে বসন্ত তো তার নিজের গুনেই শতরূপে সুন্দর। তবু মনে হচ্ছে যেন আমি ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি।'

□ আঠার □

বোটশার অবশেষে তার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছে। যে ছিল রীতিমত স্বাস্থ্যবতী, সে নাকি এখন একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তা যাক। পাওয়া তো গেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে তার ছুটিও শেষ হয়ে মাত্র আর তিন দিনে ঠেকেছে।

গ্রেবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় থাকবে কিছু ঠিক করেছ?'

'না। ভাবছি দুটো রাত এদিক সেদিক কোথাও কাটিয়ে দেবো তারপর আমি সীমান্তে আর ও ফিরে যাবে ওর তাঁবুতে।' বলে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রোটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বললেন, 'আহা, বেচারা।'

গ্রেবার যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, 'সীমান্তের অবস্থা ভাল খারাপ যাই হোক, তাতে আমার কি? আমি তো ছুটিতে আছি।'

তথ্য দপ্তরের সামরিক কর্মচারী মুচকি হেসে বলল, 'অত জোর দিয়ে বলবেন না মশাই। তাহলে আজকেই আসা জরুরী নোটিশটা আপনাকে ধরিয়ে দেবো।'

'মানে?' গ্রেবার বিস্মিত হলো।

'মানে, সব ছুটি বাতিল বিশেষ কারন ছাড়া। রঙরুটদের এখনই পাঠাতে হবে। বুঝেছেন।'

'বিশেষ কারণ বললেন। তো সেগুলো কি কি!'

'এই যেমন ধরুন না কোন গুরুতর অসুস্থতা, বা পরিবারে কারো মৃত্যু ঘটেছে, এইসব আর কি। তা আপনার এমন কারণ থাকলে আপনি চুপটি করে কোথাও লুকিয়ে পড়ুন। তাঁবুতে ভুলেও যাবেন না ছুটি শেষ না হওয়া অবধি। পরে নতুন ঠিকানা না জানানোর জন্য কৈফিয়ৎ চাইলে একটা কিছু বলে দেবেন। তাতেই হবে।'

সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে টেবিলের ওপর রেখে গ্রেবার প্রশ্ন করল :
'আচ্ছা, বিয়েটা কি কোন কারণ হতে পারে না ? পরিচয় পত্র ছাড়া সেজন্যে অন্য কাগজপত্তর কি দেখাতে হবে ?

'বিয়ে করছেন যখন, তখন পরিচয়পত্রই যথেষ্ট। আপনারা সীমান্ত সৈনিক তো। অন্য কিছু লাগবে না। তা আপনার এই নোংরা পোশাকে বিয়ে করতে যাবেন। এটা পাল্টান, এখনই যান পোশাক বিভাগে। ভাল সিগারেট এক প্যাকেট নিয়ে যান। নইলে সার্জেন্ট মেজরের মন গলবে না।'

'আচ্ছা, আরেকটা কথা। মেয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন কাগজপত্র কিছু দেখাতে হবে কিনা বলতে পারেন !'

'সঠিক কিছু বলতে পারবোনা। কিন্তু, ইয়ে, মেয়েটা ইহুদী টিহুদি নয়তো ?'

'আরে না, না।'

'তাহলে তো লাগবে না বলেই আমার ধারনা। তবে অসুবিধে হলে চলে আসবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

পোশাক বিভাগের সারজেন্টকে কিন্তু এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েও ভোলান গেল না। তাকে উপরন্তু একটা কইনাকের বোতলও দিতে হলো। তবে তিনি ভাল পোশাকটা বার করে দিলেন। তবু গ্রেবার দেখল প্যাণ্টের মধ্যে একটা দাগ। এবং সেটা রক্তেরই দাগ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সার্জেন্টকে সেটা দেখাতে বলল, 'না, না, রক্ত ফক্ত নয়, জলপাই তেলের দাগ ওটা। একটু বেঞ্জিন ঘষে দিলেই উঠে যাবে।'

অগত্যা। মেনে নিতে হলো গ্রেবারকে। তবে পুরোনো পোশাকটা ফেরত দিতে হলো না, এটাই যা লাভ। সে সোজা হাসপাতালে মুতসিগের সঙ্গে দেখা করতে চলে এল।'

'আরে, আর্নস্ট যে আমি ভাবিইনি যে তুমি আসবে। স্টকমানও রয়েছে। তোমার আফ্রিকার দোসর।' মুতসিগ গেবারকে অভ্যর্থনা জানালো।

স্টকমান তাস খেলছিল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'গেবার। ভাল আছ তো ? এখন তো ছুটিতে, তাই না ? আফ্রিকা থেকে ফেরার পর এই প্রথম দেখা।'

'হ্যাঁ। আমাকে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।' গেবার বলল।

'তোমার ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। আমি ছাড়া সবাই যুদ্ধ বন্দি হয়ে যায় ফেরার পথে, জানো তো।'

স্টকমানের ডান হাতটা নেই। হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে যতজন আছে সবারই কোন না কোন অঙ্গ খোয়া গেছেই।

'খেলতে খেলতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে।' স্টকমানকে লক্ষ্য করে বলে উঠল একজন খেলুড়ে।

গ্রেবার তাকালো। পা দুটো তার উরুর ওপর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উরু বলতে কিছু নেই বা ছিল না। অপারেশন করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও লাল কাঁচা ঘায়ের মত দেখাচ্ছে।'

মুতসিগ নিচু স্বরে বলল, 'আনর্স্টের কথায় কিছু মনে করো না। একে তো নিজের শরীরটা গেছেই, তার ওপর কদিন আগে ওর মা এসে বলল যে,বউটা নাকি রাত্তিরে বাড়ি থাকে না। অন্য পুরুষদের সঙ্গে নোংরামো করছে ইত্যাদি।'

গ্রেবার এই সব পঙ্গুদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সকলেই এখনও যুবক। কিন্তু হাত নেই বা পা নেই। পঙ্গু হয়ে গেছে বাকী জীবনের মতো। গ্রেবার হঠাৎ উঠে দাড়াল। 'চললাম কাল' সময় পেলে আবার আসব।' বলে বেরিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অপরাহ্নের রোদের তেজ কম হয়ে এসেছে। এলিজাবেথের কথা মনে পড়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা।

সোজা মাষ্টার মশাই পোলমানের বাড়িতে চলে এলো গ্রেবার। 'আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি, মাষ্টার মশাই। বেশী বিরক্ত করব না আপনাকে।'

বৃদ্ধ শিক্ষক পোলমান নিজেই দরজা খুলেছিলেন। গ্রেবারের কথা শুনে বললেন, 'আগে ভেতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয়না।'

ভেতরে এসে নিজে বসে গ্রেবারকেও বসতে বলে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ কি বলতে চাইছিলে যেন তুমি?'

'বলছিলাম যে আপনার কি শুধু এই একটাই ঘর?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'কেন, তোমার কি প্রয়োজন বল তো?'

'আপনি রাজী হবেন কিনা জানিনা।' কয়েকদিনের জন্যে একজনকে লুকিয়ে আশ্রয় দিতে হবে আপনাকে। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তেমন কেউ নয়। কেবল একটু সতর্কতার জন্য এটা করতে চাই। আসলে হয়তো সবটাই আমার অহেতুক ভয়। তবু নিশ্চিত হতে চাইছি, এই আর কি।'

পোলমান চুপ করে কিছুক্ষন ভাবলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তা তুমি আমার কাছেই এলে কেন?'

'আমি যে আর অন্য কাউকে চিনিনা, মাষ্টারমশাই।'

'হুঁ। তা কার জন্যে বলতো?'

'একটি মেয়ে, আমার ভাবি স্ত্রী। মুশকিল হচ্ছে, ও যদিও নির্দোষ, কারখানায় কাজও করে। কিন্তু ওর বাবাকে বন্দি শিবিরে আটকে রেখেছে। তাই আমার মনে হচ্ছে যদি ওকেও গ্রেপ্তার করে আটক করে।'

'এই দুঃসময়ে সবই সম্ভব, আনর্স্ট। সতর্ক হতে চেয়ে তুমি ভালই ভেবেছ। তোমার যখন ভাবি স্ত্রী বলছ তো কোন কথা নেই। নিয়ে এসো। যদি চাও তো এই ঘরটাও ব্যবহার করতে পারো।'

গেব্রার খুশীতে ভরপুর হয়ে বলল, 'আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো।'

'কোন প্রয়োজন নেই, আর্নস্ট। আমি আর কতটুকু করতে পারি। কত যে কবি, শিল্পী আর সাহিত্যিকদের বন্দিশিবিরে আটকে রেখেছে জানোয়ারের দল, তাদের জন্যে তো কিছুই করতে পারছি না। এক এক সময় নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয়। যাক। তুমি বিয়ে করছ, এটাই আনন্দের কথা। নিয়ে এসো তাকে তুমি। আর এই ছবির বইটা নাও। আমার সামান্য উপহার। দেখলে আনন্দ পাবে।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাষ্টারমশাই। আজ তাহলে আসি।'

'কল্যান হোক। এসো।' আর শোন! যা বলছিলাম, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো। ওইটুকু নিয়েই আমিও বেঁচে আছি।'

□ উনিশ □

'আপনার কাগজপত্র? এক মিনিট, দেখছি।' বলে বয়স্ক কেরানীটি কাঠের পার্টিশান দেওয়া পাশের ঘরে চলে গেল।

কেরানীটিকে চলে যেতে দেখে গেব্রার নিচু স্বরে দ্রুত বলল, 'তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। কে জানে, বুড়ো ভামটা কাউকে খবর দিতে গেল কিনা। আমি মাথার টুপী খুলে ইশারা দিলেই তুমি সোজা পোলমানের বাড়িতে চলে যাবে। কোন দ্বিধা করবে না। সাবধানের মার নেই। যাও, বাইরে অপেক্ষা করো।'

গেব্রার অপেক্ষা করতে লাগল।

কেরানী বৃদ্ধ ফিরে এল, 'আপনারা কবে বিয়ে করতে চান?'

'যত শিগগীর হয়। আমার ছুটিতো ফুরিয়ে এসেছে, তাই।' গেব্রার বলল।

'আপনারা এখনই ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারেন। কাগজপত্র সবই ঠিক ঠাক আছে। মানে, এই রকম জরুরী অবস্থায় কোন সৈনিকের বিয়েতে কোনরকম গাফিলতি করিনা আমরা। তা ফ্রয়লিন ক্রুজে কোথায় গেলেন?'

'একটু বাইরে গেছে। ডেকে নিয়ে আসছি। কাগজপত্র তাহলে ঠিকই আছে বলছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। ফ্রয়লিনকে নিয়ে আসুন ডেকে।'

প্রথমটা লোকজনের ভিড়ে নজরে পড়ল না গ্রেবারের। ভাবল, পোলমানের কাছে চলে যায়নি তো? তখনই নজরে পড়ল বারান্দার শেষ প্রান্তের থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

'ওহ্ ভাগ্যিস তুমি চলে যাওনি। খুঁজেই পাচ্ছিলাম না তোমাকে। চল, চল। সব ঠিক হয়ে গেছে। কাগজপত্র সব তৈরী। এসো।'

কেরানীবাবুটি তৈরীই ছিলো। এলিজাবেথের হাতে কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি তো স্বাস্থ্য দপ্তরের উপদেষ্টা ডাক্তার ক্রুজের মেয়ে। তাই না?'

এলিজাবেথ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবাকে আমি চিনি, মানে, চিনতাম!'

'ও। আপনি বাবার কোন খবর টবর জানেন নাকি?' এলিজাবেথ প্রশ্ন করল।

'সম্প্রতি কিছু জানা নেই। কেন, ওর খবরটবর আপনি কিছু পান না।'

বলতে গিয়ে কান্নার বেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল এলিজাবেথের। চোখে জল ভরে এলো।'

বৃদ্ধ করনিক সমবেদনার স্বরে বলল, 'কেঁদে মন খারাপ করবেন না। কথা দিচ্ছি, এবার আমি খোঁজ নেবো। জানাবো আপনাকে। বিয়েটা তোমার ইচ্ছে হলে আজই করে ফেলতে পারো।'

'সে তো ভাল কথা।' গ্রেবার খুশীর স্বরে বলে উঠল।

এলিজাবেথ চোখ মুছে গ্রেবারের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'বেশ বেলা দুটোর পর!

'বেশ, বেশ।' কেরানী প্রবর বলল, 'তাহলে বেলা দুটোর সময় বড় স্কুল বাড়িটাতে দুজনে চলে আসুন। রেজিষ্ট্রি অফিসটা সেখানেই। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা আমি করে রাখব। ঠিক আছে?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হালকা শরীরে বেরিয়ে এল দুজনে।' তুমি দেরী করিয়ে দিলে। এখনই তো হয়ে যেতে পারতো।' গ্রেবার খানিকটা ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল।

'ইস্, কচি ছেলের আনন্দে আর তর সইছে না। জান, এ সময় মেয়েদের কত রকম ভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। তার জন্যে সময় লাগে, বুঝেছ খোকা?'

গ্রেবার চোখ গোল গোল করে বলল, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই। বুঝেছ খোকাসোনা।'

গ্রেবার একে একে করনীয় কাজগুলো সব করে গেল। প্রথমেই একজন দর্জি'র দোকানে প্যাণ্টটা দিল দাগটা তুলে ভাল করে ইস্ত্রি করে দেবার জন্য। দর্জি বলল আধঘণ্টা পরে আসতে। সেই ফাঁকে একজন মহিলা নাপতেনীর দোকানে গিয়ে চুলটা কেটে নিল। স্বাস্থ্যবতী নাপতেনী বেশ যত্ন করেই গ্রেবারের চুল কেটে সাবান দিয়ে শ্যাম্পু করে দিল।

সেখান থেকে বেরিয়ে ফের দর্জি'র দোকান থেকে প্যাণ্টটা নিয়ে নিল। সুন্দর ইস্ত্রি করেছে।

সেখান থেকে সোজা চলে এলো ফুলের দোকানে। 'বিয়ের জন্যে ফুল চাই

কিছু।' গ্রেবার বলল।

'বেশ তো। লিলি ফুল রয়েছে। নিন।' মেয়ে দোকানদারটি বলল।

'না, না। গোলাপ ফুল নেই আপনাদের?'

'গোলাপ? এ সময়ে কোথাও গোলাপ ফুল পাবেন না আপনি।'

তখনই গ্রেবারের দৃষ্টি পড়ল স্বস্তিক চিহ্নের আকারে ফুল দিয়ে সাজানো তোড়াটা। সে বলল, 'ওটাই আমাকে দিন।'

মেয়েটি খুব যত্ন করে খবরের কাগজ দিয়ে জুড়ে দিল সেটা।

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেবার। রাস্তায় পা দিতেই মনে হলো আশপাশের লোকজন বুঝি তারদিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। খানিকটা সংকুচিত হয়েই সে হাঁটতে লাগল। কিন্তু কাগজটা খুলে যেতে চাইছে। সে তোড়াটাকে বগলদাবা করে নিতে গেল। তখন ছবিটা তার চোখে পড়ল। ট্রাইবুনাল জাতীয় কোর্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা লোক কি বলার জন্য হাঁ করে আছে। চারজন লোকের মৃত্যু দণ্ড হয়েছে, যেহেতু তারা জার্মানদের যুদ্ধ জয়ে বিশ্বাস করে না। গিলোটিন তো নিষিদ্ধ, যদিও সেটা অনেক আরাম দায়ক, তাই কুড়ুল দিয়ে ওই চারজনের মুণ্ডচ্ছেদন করা হয়েছে। নরক, নরক করে তুলেছে দেশটাকে। দুমড়ে মুচড়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্দমায়।

রেজিষ্ট্রার বা নিবন্ধকের দপ্তরে ভিড় তেমন নেই। দেওয়ালে হিটলারের ছবি। ঈগল পাখীর ওপর একটা স্বস্তিক চিহ্ন।

মাঝবয়সী এক সৈনিক, সঙ্গে একজন মহিলা নিয়ে আগেই এসেছেন। সৈনিক ভদ্রলোককে উত্তেজিত বলে মনে হলো। জরুরীকালীন সময়ে আবার সাক্ষীর কি দরকার?'

রেজিষ্ট্রারও বিরক্ত গলায় বলে উঠলেন, 'জরুরী হোক কি স্বাভাবিক সময় হোক, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না, হবে না। ব্যস।'

বয়স্ক সৈনিক এবার প্রত্যাশার দৃষ্টিতে গ্রেবারের দিকে তাকালো, 'আপনি আর আপনার বান্ধবী তো সাক্ষী হতে পারেন আমাদের। হবেন?'

গ্রেবার সাগ্রহে বলল, 'নিশ্চয়ই। আরে, আমিও তো ভুলে গেছি সাক্ষী আনতে। আসলে ভাবিইনি। যাক। এবার আপনারা দুজন আমাদের সাক্ষী হতে পারবেন।

কিন্তু ফ্যাচাং বাধালেন রেজিষ্ট্রার মশাই। বয়স্ক সৈনিক এবং তার বান্ধবীকে মহান ফুয়েরারের নামে বিয়ে দেবার পর গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের তো আরেকজন সাক্ষী লাগবে। কারণ এরা দুজন এখন এক হয়ে গেছেন। সাক্ষী হতে হবে দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি।'

মুশকিলে পড়ে গেথ গ্রেবার। এদিক ওদিক তাকাতে দেখলো একজন সুন্দর দেখতে যুবক ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সে এবার এগিয়ে এসে বলল, 'আমি সাক্ষী হলে হবে তো?'

রেজিষ্ট্রার ভুরু কুঁচকে বিরক্তির স্বরে বললেন, 'সাক্ষী হতে গেলে পরিচয় জ্ঞাপক কাগজপত্র দেখাতে হয়। সে সব আছে?'

'আছে বইকি।' বলে যুবক প্যাকেট থেকে পরিচয় পত্রটা বার করে অবহেলায় টেবিলের ওপর ফেলে দিল।'

রেজিষ্ট্রারও পরিচয় পত্র অবজ্ঞা ভরে তুলে নিয়ে এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হেইল হিটলার। গ্রুপ লিডার।'

'হেইল হিটলার। কোথায় সই করতে হবে বলুন?'

'এই যে, এখানে!' রেজিষ্ট্রার দেখিয়ে দিল।

সই করার পর মাঝবয়সী যুবক বললেন, 'এই সব সামান্য ব্যাপারে সৈনিকদের কখনও হয়রান করবেন না।'

'ক্ষমা করবেন, হের গ্রুপ লিডার।' রেজিষ্ট্রার কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন।

গ্রেবার এতক্ষণ বিস্ময় ভরে সব লক্ষ্য করছিল। কাজ মিটে যাবার পর সে সইটা ভাল করে দেখল। ওদের দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম এস, এস গ্রুপ লিডার হিটডেরাণ্ট। ইঞ্জিনীয়ার ক্লোতস্ তার প্রথম সাক্ষী।

বাইরে এসে গ্রেবার জিজ্ঞেস করল ক্লোত্‌সকে: 'আপনার ছুটি কদিন আছে আর?'

'আগামী কালই ফিরে যাচ্ছি। বলা তো যায় না। আমার কিছু হয়ে গেলে মারীর অন্ততঃ একটা নিশ্চিন্ততা থাকবে।'

'নিশ্চয়ই। আমাকেও তো কদিন পরেই যেতে হবে।'

পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দুজোড়া সদ্য বিবাহিত দম্পতি যে যার পথে চলে গেল। এলিজাবেথ আর গ্রেবার শহর থেকে খানিকটা দূরে এক বনের মধ্যে চলে এল।

পাখীদের কলকাকলী বসন্তের সবুজ গাছ গাছালি আর রুপালী সূর্যের আলোতে স্নান করতে করতে ওরা দুজন বুঝি ফিরে গেল সেই ছোট বেলার দিন গুলোতে। ওরা পরস্পর বলতে লাগলো যে যুদ্ধ থামলে ওরা কোথায় বেড়াতে যাবে। সুইজারল্যাণ্ড না ইতালির সুইজারল্যাণ্ড বলে কথিত লোকার্নোতে, যেখানে সম্প্রতি পীস কনফারেন্স হয়ে গেল?

'যুদ্ধেরই বা কি দরকার ছিল বল তো? এলিজাবেথ প্রশ্ন করল।

এ প্রশ্নের উত্তর খুব গোলমেলে। গ্রেবার এলিজাবেথকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। ঘুম নামল ওদের চোখে।

ওদের চেতনা ফিরল মেঘের গর্জনে। চেয়ে দেখল কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি নামল বলে। বলতে বলতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ওরা ছুটে বন থেকে বেরিয়ে একটা পরিত্যক্ত টিনের গ্যারেজে আশ্রয় নিল। টানা আধঘণ্টা বৃষ্টির পর আকাশটা ধরে গেল। বেরিয়ে হাটতে লাগল।

একটা দ্বিমুখী রাস্তার কাছে পার্কের পাশে পাইপ বসানোর কাজ চলছে। এলিজাবেথ কর্মিদের পোশাক দেখেই বুঝল যে সবাই বন্দিশিবিরের লোক। দেখেই এগিয়ে গেল এলিজাবেথ।

'এই, এই, কোথায় যাচ্ছো ওদিকে?' চিৎকার করে বলে একজন এস, এস, প্রহরী তেড়ে এল এলিজাবেথের দিকে। এলিজাবেথ তখন বন্দিদের মুখ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এলিজাবেথের মনোভাব বুঝতে পারলো গ্রেবার। কিন্তু গোলমাল যে বাধবে, তাও বুঝলো। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এস, এস অফিসারের সামনে দাঁড়াল। 'বলল, গতকাল একটা ব্রোচ, মুক্তাবসানো ব্রোচ হারিয়ে গেছে, তাই খুঁজছি।'

'ব্রোচ খুঁজছেন? আস্পর্ধা তো কম নয়। দেখি আপনার কাগজপত্র।'

গ্রেবার পকেট থেকে কাগজপত্র বার করতে করতে বলল, 'এস, এস গ্রুপ লিডার ছিল ডেরানট আমার বন্ধু। আজই আমাদের বিয়েতে উনি সাক্ষী দিয়েছেন। দেখুন না?'

ততক্ষণে অন্য একজন অফিসারও এসে পড়েছে। সেও উঁকি মেরে দেখল। দেখেই দুজনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল, গলার স্বর নরম হয়ে গেল। 'আপনাদের শুভ বিবাহের অবসরে আন্তরিক অভিনন্দন। হেইল হিটলার।'

সামরিক কায়দায় গ্রেবারও প্রত্যভিবাদন জানালো: 'হেইল হিটলার।'

ইতিমধ্যে সবাইকে দেখে এলিজাবেথ ফিরে এসেছে। এস, এস অফিসার বলল, 'আমরা আপনার হারানো ব্রোচের সন্ধান করব। কিন্তু যদি খুঁজে পাই আপনাদের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

গ্রেবার তাড়াতাড়ি বলল, হিলডেব্রান্টের কাছে দিয়ে দেবেন। তাহলেই আমরা পেয়ে যাবো।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ।'

দুজনে পালিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এলিজাবেথ মুচকি হেসে বলল, 'কি মিথ্যুক।

গ্রেবার হাসল।, অনেক ঠেকে এসব রপ্ত করতে হয়েছে। বুঝলে। এখন কোথায় যাওয়া যায় বলতো। ব্যাম্ডিং এর বাড়িতে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে—

'তার কি দরকার।' এলিজাবেথ বলল, তোমার ছুটির বাকি কটা দিন আমাদের

বাড়িতেই কাটিয়ে দিতে পারবে স্বচ্ছন্দে।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু খাবার দাবার?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'প্রচুর মজুত রয়েছে। সে জন্যে ভাবনা নেই।' এলিজাবেথ বলল।

'আরও একটা বিপদ আছে।' গ্রেবার হেসে বলল, 'তোমার পাহারাদারনী ওই খচ্চর লিজার মেয়েটা যদি বাগড়া দেয়, তখন?'

এলিজাবেথ হেসে বলল, 'ওই মহিলা আর কিছুই বলবেন না, দেখো সেদিনতো চিনি দিতে এসে তোমারি খুবই প্রশংসা করছিলেন।'

'বল কি? সত্যি?'

'ঠিক তাই।'

চিনি কথাটা একেবারেই মনে ছিল না গ্রেবারের। সবটাই অভিজ্ঞতা। তাই অমন নিপুনভাবে ধাপ্পা দিতে পেরেছিল। মনে মনেই হাসল সে।

□ কুড়ি □

ঠিক দুপুর বেলা। লানচ খাওয়ার সময়। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভীড়। ঠিক তখনই আরম্ভ হলো বিমান আক্রমন। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। মেঘে ছেয়ে রয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে আড়াল থেকে শত্রু বিমান ঢুকে পড়ে আক্রমন চালিয়েছে। গ্রেবারের মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা এলিজাবেথ। ওকে ওদের কারখানা থেকে যে করেই হোক বার করে আনতে হবে। মনে হওয়া মাত্রই সে ছুট দিল। সে তো জানে যে বাড়ি ঘরদোরের চাইতে কল কারখানাগুলোই প্রধান লক্ষ্য হয়। পারলে সে গুলোকে আগে ধ্বংস করে ফেলে। এতক্ষনে কি যে ঘটিয়েছে কে জানে? এখন কারখানা পর্যন্ত পেঁছিতে পারলে হয়। সে দৌড়তে লাগল।

একজন এয়ার রেড ওয়ার্ডেন আটকাল তাকে। 'ব্যাপারটা কি? অনবরত বোমা পড়ছে আর আপনি খোলা রাস্তায় দৌড়চ্ছেন। যান, শীগগির শেল্টারে চলে যান।'

'ধন্যবাদ।' দৌড়তে দৌড়তেই গ্রেবার বলল, 'আমিও এয়ার রেড ওয়ার্ডেন। আপনি আপনার কাজ করুন। অন্য লোকদের সরান।'

রাস্তাটা পার হতেই একটা প্রচণ্ড শব্দ। গ্রেবারের চোখের সামনে একটা বিশাল বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠেই আবার ঝরে পড়তে লাগল। দু'হাতে কান চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে উবু হয়ে ঘুরে দু'পা এগোতেই আর একটা

বোমার ধাক্কায় দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল সে। মুহূর্তের জন্যে তার মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল যেন। মাথায় একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে এগোতে গিয়ে দেখল চারপাশ ঘিরে আগুনের লেলিহান শিখা। কয়েক পা পেছিয়ে এল সে। ভাঙ্গা বাড়িটার সামনের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে আসছে আগুনের সঙ্গে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সে ঘুরে গেল। ওপরে ওঠার সিঁড়িটার সামান্য অংশই ঠেকেছে। নীচে দৃষ্টি পড়তেই সে যেন জমে পাথর হয়ে গেল। কি ভয়ংকর হৃদয় বিদারক দৃশ্য। একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ পড়ে আছে। গলার ক্ষত থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তখন। সুডৌল স্তন দুটো স্তব্ধ, নিথর। পরনের ফ্রকটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। একটা হাত উল্টে মুচড়ে গেছে। অন্য হাতটা মুঠো করা। নগ্ন, নিটোল দুটি উরুর কাছে একটা বিড়ালছানা মড়ে পড়ে আছে। উদ্ধত কান্না টাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেই কারখানার দিকে দৌড়ল সে।

কিন্তু রাইফেলধারী দারোয়ান গ্রেবারকে কারখানায় ঢুকতে দিল না। 'যান, যান, এখানে এখন দাঁড়াবেন না। পার্কের পাশের শেল্টারটায় চলে যান।' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ল। কারখানার পেছন দিকটার খানিকটা অংশ ধ্বসে পড়ল। 'দেখলেন তো। বাইরে থাকলে মারা পড়বেন। এবার যান।' দারোয়ানটা ফের বলল।

গ্রেবার এবারে প্রায় ধমকে উঠল, দেখ বাপু। আমি সীমান্ত ফেরৎ সৈনিক। এসব বোমা টোমার ব্যাপার তোমার চাইতে আমি ভালই বুঝি। এখন বল যে কারখানার ওভার কোট বিভাগটা কোন দিকে। আস্ত আছে না গেছে? যেহেতু আমার স্ত্রী কাজ করে, আমার এটা জানা দরকার।'

এবারে দারোয়ান নরম স্বরে বলল, 'ওভারকোট বিভাগের কিছু হয়নি। আর সব কর্মীই মাটির নিচের শেল্টারে ভাল আছে। আমি খানিকক্ষণ আগেই খবর নিয়েছি। আপনার স্ত্রীও নিশ্চয়ই ভাল আছেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

নিশ্চিন্ততার আশ্বাস নিয়েই ফিরল গ্রেবার। সমস্ত শহরটাই যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। বড় বড় বাড়িগুলোর প্রায় সবই ধূলিস্যাত। বাতাসে পেট্রল, চামড়ার আর কাপড়ের বিশ্রি পোড়া গন্ধ। সামনের একটা ভাঙ্গা বাড়ির ভেতর থেকে স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ এনে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বোঝাই করা হচ্ছে। গ্রেবার এগিয়ে গেল। একটা ভাঙ্গা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে শিউরে উঠল সে। এটা কি? কসাইখানা? না, তার চেয়েও সাংঘাতিক! কসাইখানাতে তবু জন্তুগুলোকে মেরে সুশৃংখল ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর এখানে? ঘরময় রক্তের নদী। তার মধ্যে কোথাও একটা ঠ্যাং, কোথাও একটা কচি হাত, একটা পোড়া কাঠের মত মৃতদেহ পুরুষ না নারী বোঝার উপায় নেই। হাত-পা বিহীন একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে আছে যেন ঘুমোচ্ছে, একটা যুবতীর সোনালী চুলওয়ালা মাথাটা চুরমার হয়ে

গেছে! ভয়! বিভীষিকা! গুস্তাভ নামে উদ্ধার বাহিনীর লোকটার সঙ্গে হাত লাগিয়ে মৃতদেহ এবং তাদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলো ষ্ট্রেচারে তুলে তুলে ঘোড়ার গাড়িটাতে উঠিয়ে দিল সে। তারপর আবার সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিল সে। আজ এই একই অবস্থা, একই দৃশ্য হয়তো দেখা যাবে ইউরোপের সর্বত্র। পোল্যান্ড, হল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, আফ্রিকা, রাশিয়া, সর্বত্রই মানুষের আর্ত কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এই ভয়ংকর ক্ষতের ঘা সারতে কত যুগ যে কেটে যাবে, কোন মানুষ কি তা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে!

পাশাপাশি তিনটে বাড়ি। তুলনায় এলিজাবেথদের বাড়িটাতে তেমন ক্ষতি হয়নি। শুধু ওপরতলার দরজা জানালাগুলো পুড়ে গেছে। আর ছাদের ওপর তখনও জ্বলছে আগুন।

দারোয়ানটা বলল, 'দমকলে খবর দিয়েছি। কিন্তু এখনও আসেনি।'

আশে পাশের বাড়ির ভেতর থেকে জিনিসপত্তর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব নিচে ফেলছে লোকেরা। বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়ে সব আশ্রয় নেবে কে জানে। সে দারোয়ানকে বলল, 'আমিও ওপরে যাই। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র বাঁচানো যায় কিনা দেখি।'

দারোয়ান বলল, 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান। যেভাবে আগুন জ্বলছে ছাদের ওপর, তাতে যে কোন মুহূর্তে বাড়িটা ধ্বসে পড়তে পারে।'

টপাটপ সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে গেল সে। বারান্দায় একগাদা জিনিসপত্র ডাঁই করা রয়েছে। সে এলিজাবেথের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের মধ্যে চোখ বোলাতে বোলাতে কতক্ষণ বসে রইল সে। নিলে তো অনেক কিছুই নিতে হয়। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। খাটের নীচ থেকে সুটকেসটা বার করে তারমধ্যে এলিজাবেথেরই সব জিনিসপত্র, পোশাক ইত্যাদি এবং এলিজাবেথের বাবার ছবিটাও নিয়ে নিল। তখন নজরে পড়ল তার সামরিক ঝোলাটা। সেটা নিতে গিয়ে ঠুং ঠাং শব্দ করে তার লোহার শিরস্ত্রানটা পড়ে গেল। এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে একটা লাথি মেরে সেটাকে ফের খাটের নিচে পাঠিয়ে দিল।

দমকল বাহিনী এখনও এল না। অথচ ছাদের আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছেই। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে নিশ্চিত। জিনিসপত্র নামিয়ে এনে যে যার মত পথেই বসে পড়েছে। ফ্রাউ লিজার বসে আছেন। তার কোলে তার বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রেবার তার ঝোলা, বিছানাপত্র আর খাবারের একটা প্যাকেট রেখে ওপরে গেল সুটকেসটা নিয়ে আসতে। এসে দেখে খাবারের প্যাকেটটা হাওয়া। এদিক ওদিক তাকাতে দেখল একটা পরিবার বেশ আরাম করে একমনে খাচ্ছে। প্যাকেটের মোড়কটা টেবিলের নিচেই পড়ে আছে। বিরক্তিতে তেতো হয়ে গেল তার মনটা। কি হাভাতেরে বাবা।

তখনই এলিজাবেথকে আসতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে এলিজাবেথ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমাকে দেখব আমি ভাবিইনি।'

গ্রেবার ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তোমার খোঁজে তোমার কারখানায় গিয়েছিলাম আমি।'

'আর আমি ওদিকে ভাবছি যে যদি তোমার কিছু হয়ে গিয়ে থাকে। সত্যি, এত খারাপ লাগছিল আমার।'

'বসো, এখানে একটু বসো।' গ্রেবার বলল।

'আমার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এত তেষ্টা পেয়েছে।'

'জল খাবে? এই নাও।' বলে গ্রেবার সামনের টেবিলের ওপর রাখা জল ভর্তি গ্লাসটা তুলে নিয়ে এলিজাবেথের হাতে দিল।

অমনি বাচ্চা ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, 'একি আমাদের জলের গ্লাসটা নিচ্ছ কেন?'

ছেলেটার মা প্রথমে খেয়াল না করলেও এবার বলে উঠল, 'জিজ্ঞেস করে নেবেন তো একবার।'

প্রচণ্ড জোরে ধমক দিল গ্রেবার, 'একটা কথাও বলবেন না, চুপ করে বসে থাকুন। খাবারের প্যাকেটটা নেবার সময় আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

মহিলা আর কোন কথা বলল না।

এলিজাবেথ বলল, 'ওদের গ্লাস ওদের ফিরিয়ে দাও না।'

'দেবো। আগে জলটা খাও তুমি। এতটা পথ ছুটে এসেছ।'

'তা সত্যি। 'এলিজাবেথ ঢকঢক করে সমস্ত জলটা খেয়ে নিল।

'তোমার জিনিষপত্র আর আমার সামান্য যা কিছু, সবই নামিয়ে এনেছি আমি। দেখে নাও, এলিজাবেথ। শুধু ফার্নিচারগুলো রয়ে গেছে। বল তো নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করি। বিক্রি হয়ে যেতে পারে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কে কিনবে ওসব? দেখতে পাচ্ছ চারদিকের কি অবস্থা। তাছাড়া, আমার আর কোন মায়া নেই। টান নেই অতীতের প্রতি। আমি ভুলে যেতে চাই সব। আবার নতুন করে শুরু করতে চাই জীবনটাকে।'

হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে। গ্রেবার ঝোলা থেকে ওভারকোটটা বের করে এলিজাবেথের গায়ে পড়িয়ে দিল। ক্যানভাস সার্টটা খুলে জিনিষপত্রগুলো ওপর বিছিয়ে দিল।

'রাত্তিরের জন্য একটা আস্তানা তো খুঁজতে হবে। তুমি তো আবার ব্যাণ্ডিং-এর বাড়িতে যাবে না?'

'না, না।' এলিজাবেথ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল।

'হের পোলমানের বাড়িতে কিন্তু অসঙ্কোচে যেতে পারি আমরা। বলেও রেখেছি আমি। অবশ্য যদি এখনও থেকে থাকে বাড়িটা।'

'কি দরকার। আমাদের নীচের তলাটা তো এখনও অটুট আছে। আর একটু দেখি। তারপর না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তুমি দেখতো, পান করবার মত কিছু জোগাড় করতে পারো কিনা।'

'জোগাড় করতে হবে না। বইয়ের তাক থেকে একটা ভদকার বোতল পেয়েছি। বিছানার মধ্যেই আছে। তুমি একটু সরে বসো। বার করছি।'

'বাঃ, চমৎকার। এসো, তোমাকে একটা চুমু খাই।' এলিজাবেথ দুষ্টুমি করে বলল।

'এখন থাক ওটা। আগে লুকিয়ে খেয়ে ফেলো। কেউ দেখলে আবার ভাগ চাইবে।'

এক চুমুকে অনেকখানি খেয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ। 'সিগারেট কই?'

এই সময় ছাদটি ধ্বসে পড়ল হুড়মুড় করে। 'যাঃ আমার শেষ আস্তানাটাও গেল। হতাশ স্বরে বলে উঠল গ্রেবার।

'ঈশ্বর তো ন্যায় বিচারই করেন', পাশ থেকে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়, হাড়গিলে চেহারার লোক ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল। আপনার আর কি। দুদিন পর সীমান্তে গিয়ে আরামে খাবেন দাবেন আর রাইফেল নিয়ে নৃত্য করবেন। মরণ তো আমাদের। ঘর ছেড়ে পথে নামতে হলো। যাক গে, এক গেলাস ভদকা হয় তো দিন।'

গ্রেবার হেসে গ্লাসে ভদকা ঢালতে ঢালতে বলল, 'তা যা বলেছেন। থার্ড রাইখ আমাকে সেই কিশোর বয়সেই ঘরছাড়া যাযাবর করে, নাকে দড়ি দিয়ে দুনিয়া ঘোরাচ্ছে।'

এলিজাবেথ গ্রেবারকে নীচু স্বরে বলল, 'ওই দেখো, ফ্রাউ লিজারের গুপ্তচর বৃত্তির সব গোপন নথিপত্র যে টেবিলটার ড্রয়ারে থাকে, সেটা কেমন হু হু করে জ্বলছে দেখো। সব গেল ভদ্রমহিলার।'

গ্রেবারও ফিসফিস করে বলল, 'আমিই তো আসার সময় তোমার রান্নাঘরে রাখা কেরোসিনের বোতলটার সব তেল টেবিলটার ওপর ঢেলে দিয়ে এসেছিলাম।'

'সত্যি? তুমি খুব দুষ্টু।' এলিজাবেথ প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

'এখন চলো। কোথাও জায়গার খোঁজ করি। নইলে খোলা আকাশের নীচে পার্কের বেঞ্চে শুয়ে কাটাতে হবে যে। তার ওপর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো আরও সমস্যা বাড়বে।'

'চলো।' এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল। এখন তুমিই তো আমার কাণ্ডারি। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যেতে হবে। মজাটা দেখো। গতকালও ভাবা যায়নি যে আজই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একেবারে পথে বসতে হবে অদৃষ্টের কি খেলা।

ভাবতেও অবাক লাগে। তাই না?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। বেঁচে থাকার দাম বুঝি এভাবেই শোধ করতে হয়।' গ্রেবার শেষবারের মত চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে নিতে বলল।

বাড়ির দরজা বন্ধ। অনেক ডাকা ডাকি করেও হের পোলমানকে পাওয়া গেলনা। কি জানি, গেষ্টাপোরা এসে হানা দিয়েছিল কিনা। কিন্তু এখন কি করা যায়। তখনই পাশের বাগানের গাছপালার মধ্যে ভাঙ্গা বাড়িটার কথা মনে পড়ল গ্রেবারে। বাড়িরর পেছন দিকটা সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে। সামনের চওড়া বারান্দাটা অটুট আছে। এলিজাবেথকে নিয়ে সেখানেই চলে সে।

'তুমি বসো এখানে। দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।' বোঝাবুঝি সব নামিয়ে রেখে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল সে। ভাঙ্গাচোরার মধ্যে খুঁজে পেতে কয়েকটা লোহার শিক নিয়ে এল। বারান্দার ধারে মাটিতে পুঁতে, তার ওপর ক্যানভাস সীটটা চাঁদোয়ার মত করে টাঙিয়ে দিল। দুদিকে খানিকটা করে ঝুলিয়ে দেয়াল মত হলো। অন্যদিকে বারান্দার আড়াল রইল। সামনের দিকে বড় ওভার কোটটা ঝুলিয়ে দিতেই বেশ একটা ঘরের মত হয়ে গেল। 'ব্যাস। এবার দেখুন, ফ্রয়লিন, পছন্দ হলো কিনা?'

'দারুন। এতো রীতিমত আরামদায়ক ঘর।' এলিজাবেথ বলে উঠল।

গ্রেবার বিছানাটা খুলে পেতে দিল। ঝোলাটা আর সুটকেসটা মাথার দিকে রেখে দিল। 'যাক, একটা আস্তানা হলো। এবার আহারের ব্যবস্থা। তুমি লক্ষী মেয়ের মতো চুপটি করে বসে থাকো। সব ব্যবস্থা করছি আমি।'

চটপট করে খাবার টিনগুলো আর স্টোভটা বার করে নিল গ্রেবার। সামরিক সসপ্যানটা বার করে তাতে টিনের কৌটো কেটে বের করে মটরশুঁটি দুজনের মত ঢেলে নিল। সসেজ একটা তখনও ছিল। এই যথেষ্ট। ষ্টোভ জ্বালল সে।

এলিজাবেথ বলল, 'আমি চুপচাপ বসে থাকব, তা হয় না। আমাকে একটা কাজ দাও।'

'বেশ। তাহলে এই মগটা নিয়ে যাও। দেখ রাস্তার কোনের দিকে একটা চাপা কল দেখে এলাম। জল ওঠে কিনা দেখ। এক মগ নিয়ে এসো। কফি আছে, চিনিও আছে। একেবারে রাজকীয় আহার হবে তাহলে।'

আহার পর্ব মিটতে বেশী সময় লাগল না। দুজনেই ক্ষুধার্ত ছিল। ক্লান্তও বটে।

পেট ভরতেই এলিজাবেথ আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, 'আমায় বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আর্নষ্ট।'

'বেশ তো ঘুমোও। বিছানাতো তৈরী।' গ্রেবার বলল।

জুতো মোজা খুলে এলিজাবেথ চিৎপাত হয়ে শুয়ে বলে উঠল, 'আমরা যেন

ঠিক যাযাবর দম্পতির মতো। প্রাচীন যুগের সরাইখানাতে রাত কাটাচ্ছে। তাই না আর্নেস্ট ?'

গ্রেবার হাসল। 'তোমাকে ঘরছাড়া করলাম। নিশ্চয় তোমার খুব খারাপ লাগছে।'

'দূর, কি যে বল। বরং ওই জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। তোমারই হয়তো খারাপ লাগছে এই পরিবেশে এসে।'

গ্রেবার হেসে বলল, 'এর চেয়েও জঘন্য পরিবেশে রাতের পর রাত কাটিয়েছি আমি, বুঝেছ।' বলে কম্বলটা এলিজাবেথের গায়ের ওপর দিয়ে গ্রেবারও শুয়ে পড়ল তার পাশে। ঘনিষ্ঠ স্বরে ডাকল সে: 'এলিজাবেথ।'

'উঃ' বলে গ্রেবারের গলা দুহাতে জড়িয়ে বুকে মুখ গুঁজে ধীরে ধীরে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল সে। গ্রেবারের চোখে কিন্তু তখনও ঘুম নেই। গত কদিনের ঘটনাগুলো একে একে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। তার মনে পড়ল, সীমান্তের সেই রাতগুলোর কথা। তার সঙ্গী সাথীরা বলতো তাদের স্বপ্নের কথা, অসম্ভব সব ইচ্ছার কথা। আজকের সেই রাতটাও বুঝি তেমনি এক অসম্ভব ইচ্ছা পূরনের বাস্তব স্বপ্ন: মাথার ওপর একটা ছাদ, একটা নরম উষ্ণ বিছানা, আর ভালবাসার নারীকে বুকের মধ্যে নিয়ে নিঃশব্দ রাতের অভিসার।

□ একুশ □

ঘুম ভেঙ্গে গেল গ্রেবারের। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। গায়ের কম্বলটা এক পাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পোলমান ফিরেছেন কি ? নাকি চোর টোর। অবশ্য গেষ্টাপোগুলোও হতে পারে। এরকম সময়েই তো আসে হারামজাদারা। পোলমানকে সতর্ক করে দিতে হবে তাহলে।

দুটো আবছা ছায়ামূর্তি বারান্দার সীমা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেখেই গ্রেবার লাফ দিয়ে উঠে তাদের পেছু নিল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে হোঁচট খেতেই শব্দ হল। একটা ছায়া মূর্তি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, 'কে, কে ওখানে ?'

গলা শুনে পোলমানকে চিনতে পেরে জবাব দিল, 'হের পোলমান আমি, আমি আর্নেস্ট গ্রেবার।'

'সে কি। এত রাতে এখানে। ব্যাপার কি ?'

'না, তেমন কিছু নয়', ঈষৎ সঙ্কোচের স্বরে গ্রেবার বলল, 'বোমার ঘায়ে বাড়িটা ধ্বসে গেছে তো, তাই কোথায় আর যাবো ভাবতে ভাবতে এখানে এসেছিলাম আমরা

যদি দু'একটা রাত্তির আপনি থাকতে দেন…'

'আমরা মানে ? ফের পোলমান প্রশ্ন করলেন।

'আমার স্ত্রী আর আমি। কদিন আগে বিয়ে করলাম কিনা।'

মাথার চুলের মধ্য দিয়ে আঙ্গুল চালাতে চালাতে হের পোলমান কি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'এসো।'

ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললেন পোলমান। 'তোমার স্ত্রী কোথায় ?'

'বাইরে বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। ক্যানভাস দিয়ে ঘিরে নিয়েছি একটু। বিছানাও আছে।'

'বেশ। একটা কথা তুমি বুঝতেই পারছ যে এখানে তোমাদের খুঁজে পাওয়া গেলে সমূহ বিপদ হতে পারে। আমার জন্যেই। কারন সন্দেহের তালিকায় নাম আছে আমার। তোমার স্ত্রী এসব কথা জানে তো ?'

গ্রেবার মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

পোলমানের সঙ্গে আসা লোকটা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এবার পোলমান পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি জোসেফ, আর এই হল আর্নস্ট গ্রেবার। এটুকুই জেনে রাখো। এর বেশী আর কিছু বলছি না।'

না বললেও বুঝেছিল গ্রেবার। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলও। লোকটা ইহুদী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেশ রোগাটে, পাকানো চেহারা। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। বেশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ! জোসেফের হাসির উত্তরে সেও হাসল।

পোলমান আবার বললেন, 'আমি এড়িয়ে যাচ্ছি বলে ভাবছ না তো আর্নস্ট ?'

'না, না, তা নয়। নিজের জন্যেও আমি ভাবছি না। কারণ, কদিন পরই তো সীমান্তে ফিরতে হবে আমাকে। আমি এখন এলিজাবেথের জন্যই চিন্তিত। ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।'

এবার জোসেফ নামে লোকটি কথা বলে উঠল। ভরাট কণ্ঠস্বর। বলবার ঢঙে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। অনায়াসে সম্ভ্রম জাগায়। সে বলল, 'আজ রাতটা যেমন আছেন তেমনই থাকুন। তাতে ঝুঁকি কম। আগামীকাল কাথরিনেনবার্গে গিয়ে খোঁজ নেবেন। ওপর দিকে গির্জার কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বটে, তবে মাটির নীচের ঘরগুলো অটুট আছে। দু'চারদিন ওখানে থেকে অন্যত্র ঘর খুঁজে নিতে পারবেন।'

'সেটাই ভাল হবে, আর্নস্ট। জোসেফ এসব খবর আমার চেয়ে বেশীই রাখে।' হের পোলমান যেন স্বস্তি পেলেন।

বুঝতে পারলো গ্রেবার। বৃদ্ধ মানুষটার প্রতি একটু অনুকম্পাও বোধ করল। 'বেশ, তাই করব। আপনাকে বিরত করার জন্য দুঃখিত হের পোলমান।'

'ও কিছু না, শোন। ভোরে চলে এসো। কিছু প্রয়োজন হলে অসংকোচে বলো। প্রথমে আস্তে টোকা দেবে দু'বার, তারপর দু'বার জোরে টোকা দেবে। তাহলেই দরজা খুলবে। বুঝেছ?'

ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এল গ্রেবার। এলিজাবেথ ঘুমোচ্ছে অঘোরে। মুখ নামিয়ে তার গালে হাল্কা চুম্বন করল গ্রেবার।

ভোর ছটায় ঘুম ভাঙল এলিজাবেথের। উঠে বসল সে। 'আহ্। কি সুন্দর ঘুমোলাম। আমরা কোথায় বল তো?'

'কেন, এয়ানপ্লাতসে?' গ্রেবার উত্তর দিল।

আড়মোড়া ভাঙল এলিজাবেথ। 'বাঃ বেশ। তো আজ রাত্তিরের ঘুমটা কোথায় হবে মশাই?'

'সারা দিনটাই তো পড়ে রয়েছে। আস্তানা একটা ঠিক খুঁজে পেতে বার করে নেবো।'

'আমি মুখ ধুয়ে আসছি। কফি আছে তো?' এলিজাবেথ মুখ ধুতে গেল।

গ্রেবার ষ্টোভ ধরিয়ে জল গরম বসালো। ভোরের সোনালী আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাখীর দল ডাকছে নানা সুরে। আশ্চর্য! এই বোমা বিধ্বস্ত শহরে এখনও এত পাখী আছে!

এলিজারেথ ফিরল। ব্যাগ থেকে ছোট আয়না চিরুনী বার করে নিজেকে গুছিয়ে নিল একটু।

গ্রেবার বলল, 'তোমার রেশন কুপনগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে। টিফিনের সময় বেরিয়ে কয়েকটা সংগ্রহ করে নিও।' এলিজাবেথ বলল।

'তার মানে? তুমি আজ কারখানায় যাবে নাকি? বোমা টোমা পড়লে তো জানতেও পারবো না কিছু। না, তোমার আজ যাওয়া চলবে না।' গ্রেবার গম্ভীর স্বরে বলল।

'এই দেখো, বাবুর রাগ হলো। জানি, তোমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। একটা দিন তোমার সঙ্গেই থাকা আমার উচিত। কিন্তু ওরা যদি বুঝতে পারে আমি মিথ্যে বলে কামাই করেছি, তাহলে সোজা বন্দি শিবিরে পাঠিয়ে দেবে। অত সাহস আমার নেই, আর্ণ্সট। তুমি কিছু ভেবো না। কারখানায় গার্ড আছে, ডাক্তার আছে। বোমা পড়লেও চিন্তার কিছু নেই। এলিজাবেথ জুতো মোজা পরে, কফি খেয়ে তৈরী হয়ে নিল। গ্রেবারের গালে চুমু খেয়ে বলল, 'বিকেলে কোথায় দেখা হবে আমাদের?'

'আমি যদি তোমার কারখানার কাছে থাকি?'

'যদি কোন কারনে না পারো আসতে।'

'তাহলে সোজা কাথরিনেন কার্শে গিয়ে খোঁজ করবে।' গ্রেবার বলল।

'আর দু'একটা জায়গা বলো। কখন কি হবে বলা তো যায়না।'

'পোলমানের বাড়িতে খোঁজ করতে বলতাম। কিন্তু সেটা আর নিরাপদ নয়। তুমি বরং ব্যাণ্ডিং-এর বাড়িতে খোঁজ নিও। বাড়িটা তো তুমি চেনো। সেটাই বেশী নিরাপদ। আমি আজ দেখা করব ওর সঙ্গে। কিছু খাববার তো জোগাড় করতেই হবে।'

'বেশ। তবে তাই করব। চললাম, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।' এলিজাবেথ চলে গেল।

পোলমান এলেন আটটার সময়। 'কিছু রুটি নিয়ে এলাম। যদি তোমাদের লাগে।'

গ্রেবার বলল, 'না, দরকার নেই। রুটি আমাদের অনেক কাছে। আমার এই জিনিসপত্তরগুলো আপনার ঘরে রেখে যেতে চাই। অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়।'

'কোন অসুবিধা নেই। তুমি নিশ্চয় জিনিসগুলো রেখে যেতে পারো।' পোলমান বললেন। তবে দিনের বেলা ফিরলে আমাকে নাও পেতে পারো। সেক্ষেত্রে যেমন দুটো করে টোকা দিয়ে বলেছি, আসে আর জোরে, তেমনি দিলেই জোসেফ দরজা খুলে দেবে।

গ্রেবার একটা মাংসের টিন পোলমানের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা জোসেফকে দেবেন। এতে মাংস আছে।'

'সেকি। তোমাদের দুজনের তো এটা কাজে লাগবে।'

'আমাদের আরো আছে। আসলে, আমি অনুভব করি যে জোসেফের মত লোকদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। যুদ্ধ শেষ হলে আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হবে তো। কারা করবে?'

'ঠিকই বলেছ। কেবল তো জার্মানী নয় পৃথিবীর অনেক দেশকেই আবার নতুন করে আরম্ভ করে হবে। নইলে ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না মানুষকে।' হের পোলমান প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বললেন।

'হ্যাঁ. এইসব অত্যাচারি- স্বেচ্ছাচারিদের রক্তের ঋণ তো শোধ করতেই হবে।'

পোলমান অবাক হয়ে তার এই তরুন ছাত্রসম আর্নষ্ট গ্রেবারের দিকে তাকালেন। তরুণ প্রজম্মের সবাই তাহলে নষ্ট হয়ে যায়নি।

একটা বাড়িরই ক্ষতি হয়েছে এ এলাকায়। ব্যাণ্ডিং-এর বাড়িটাও একটা দিক চুরমার হয়ে গেছে। এটা খুব অবাক কাণ্ডই বটে। এমনটা গ্রেবার ভাবতে পারেনি। ঝলমলে রোদ উঠেছে। গাছের শাখা প্রশাখা বাতাসের দোলায় দুলছে। পাতা

গ্লো শিরশির শব্দে পাখীদের কিঁচির মিচিরের সঙ্গে তাল দিচ্ছে যেন। কিন্তু গ্রেবার এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। সামনের দরজাটাই তো দুমড়ে মুচড়ে গেছে ভেঙ্গে। একি কাণ্ড। সে পাশ দিয়ে পেছন দিকে গেল। কে যেন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'ফ্রাউ ক্লাইনার্ত'।' গ্রেবার সসঙ্কোচে ডাকল। তিনচারবার ডাকার পর কান্নায় ফুলে ওঠা চোখ, বিশৃঙ্খল মাথার চুল, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে দেখা দিল ফ্রাউ ক্লাইনার্ত।

'কি হয়েছে? অ্যাঁ! আলফন্স কোথায়?'

'উনি উনি আর নেই, মারা গেছেন, হের গ্রেবার।' বলে আবার দু'হাতে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

'মারা গেছে মানে? কি করে?' গ্রেবার হতবাক।

'সাইরেন বাজার সময় উনি ওপরে ষ্টোররুমে ছিলেন।'

'কেন? আছে সিদেল প্লাত্‌সেই তো শেলটার ছিল। গেল না কেন?'

'ভেবেছিলেন বোধহয় কিছু হবে না। ইয়ে…মানে…সঙ্গে মহিলা ছিলেন তো একজন।'

ওই দুপুর বেলা?' গ্রেবার যেন মানতে পারছিল না।

'হ্যাঁ, তাই। গতরাত থেকেই ছিলেন। খুবই সুন্দরী মহিলা। উনি তো আবার সুন্দরী মেয়েদের ছাড়া ফিরেও দেখবেন না। সবে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। তখনই তো বোমা পড়তে শুরু করল।

'মহিলাটি? তিনিও কি…?'

'হ্যাঁ, তিনিও মারা গেছেন, ফ্রাউ ক্লাইনার্ত বলতে লাগলেন, 'ইয়ে…দুজনেই তখন একেবারে নগ্নদেহে ছিলেন, মানে, সেভাবেই ওদের উদ্ধার করা হয়। আমার তো করবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ হয় এই ভেবে যে উনি খুবই তাড়াতাড়ি, বড়ই অল্প বয়সে চলে গেলেন।'

'নব্বই বছর বয়সে গেলেও একই কথা মনে হতে পারতো। কার কখন সময় আসে কেউ কি বলতে পারে। তা ওর মৃতদেহটা কই?'

'কফিনে রাখা আছে। পরশুদিন সকাল ন'টার কবরে নিয়ে যাবে ওর অফিসার বন্ধুরা।'

'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব, সে সময় থাকতে। 'গ্রেবার বলল।

ফ্রাউ ক্লাইনার্ত খুশী হলো। বলল, হের কমাণ্ডার আপনাকে খুবই পছন্দ করতেন। উনি বলতেন যে আপনি একজন যথার্থ সৈনিক, ওর ছেলেবেলাকার স্কুলের বন্ধু। আপনি ওর কবরের দিন এলে ওর মৃত আত্মা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবেন।'

'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। কফিনটা কোথায়? দেখে যাই একবার।'

'কফিনে শোওয়ানো আলফন্সের দেহটার দিকে তাকিয়ে গ্রেবার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল। খারাপ তো অবশ্যই লাগছিল। কিন্তু যাকে বলে দুঃখ বা বেদনা বোধ, তা কিন্তু হচ্ছিল না। সেকি আলফন্সও কুখ্যাত এস, এস, কমান্ডারদেরই একজন ছিল বলে? হয়তো তাই। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে।

'হের গ্রেবার।' ডাকল ফ্রাউ ক্লাইনার্ত'।' এই জিনিসগুলো আপনার জন্যে আমি সরিয়ে রেখেছি। উনি বেঁচে থাকলেও সবই আপনাকে দিতেন খুশী মনে। আর আমি নিজেও চাই না যে ওর অন্য সব অফিসার সঙ্গীরা এতসব টিনের খাবার বা মদের বোতল জমা হয়ে রয়েছে দেখতে পাক।'

'সেকি? আপনি কি নিজের জন্যে কিছু না রেখে সবই আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন?'

'না, হের গ্রেবার। আমার জন্যে অনেক আছে। কিন্তু মদ তো আমি খাই না। তাই ওগুলো সব নিয়ে যান।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু একবারে এত সব নেবো কি করে?' গ্রেবার বলল।

'একবারে না হয়, দু'চারবারে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নিয়ে যান। সংকোচ করবেন না কোন। আমি দেশের জন্য উৎসর্গিত সৈনিক। এ সবে একমাত্র আপনারই অধিকার।'

মনে মনে খানিকটা উৎফুল্লই বোধ করল গ্রেবার। শুধু আমার নয়, এলিজাবেথ, পোলমান বা জোসেফেরও এসবে সমান অধিকার আছে। আমি এগুলো না নিলে খুবই বোকামো করব।' তখন হঠাৎই মনে হল যে কি ভাগ্যি গতকাল ব্যান্ডিং এর এই বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি। তাহলে আজ তাকে এবং হয়তো এলিজাবেথকেও আজ কফিনে থাকতে হতো।

টোকা দেবার আগেই দরজা খুলে দিল জোসেফ। গ্রেবার বিস্মিত হলো।

জোসেফ বলল, 'চাবির ফুটোতে চোখ লাগিয়ে বসেছিলাম তো। আপনাকে দেখে দরজা খুললাম।'

গ্রেবার মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর জিনিসগুলো একে একে রাখল। বলল, 'সকালে কাথারিনেন কার্শে' গির্জাতে গিয়েছিলাম। পাদ্রী আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করবেন বললেন।'

'পাদ্রী কি যুবক বয়সী ছিল?'

'না, না, খুবই বৃদ্ধ লোক। কেন বলুন তো।' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'ওই বৃদ্ধ পাদ্রীর একটা ছেলে আছে। সাক্ষাৎ শয়তান। আমার ধারণা, বেটা গেষ্টাপোদেরই একজন চর। খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন আপনি। বৃদ্ধ খুবই ভাল। আমাকে এক সপ্তাহ গির্জাতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

'আমার এই এস, এস কমান্ডার বন্ধুটি কিন্তু অন্য ধরনের যে আমাকে এই খাবার

গুলো দিয়েছে। বেচারা অবশ্য গতকালের বম্বিং-এ মারা গেছে।'

জোসেক তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'এস, এস কম্যাণ্ডার, তা আবার অন্য ধরনের। সবাই হায়নার দল, বুঝলেন।'

'না, আমার এই বন্ধু তেমন ছিল না। ব্যতিক্রম তো থাকেই। খুনী হয়ে তো জন্ম হয় না কারও। অবস্থার চাপে সে খুনী হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার এই কম্যাণ্ডার বন্ধু জীবনে কখনও রাইফেল ধরেনি।'

'তার প্রয়োজনও হয় না। হিংস্র শ্বাপদ কখনও মানুষ হয় না।' জোসেফ বলল।

'আপনার ভেতরটা ঘৃনাতে ভরে গেছে বুঝতে পারছি। গ্রেবার বলল।

'মোটেও না। ঘৃণা হয় তখনই যখন ভালবাসা যায়। সেখানে ঘৃণা আসবে কোথ্থেকে। জোসেফ জবাব দিল।

'আপনার স্বজন পরিজন কেউ নেই?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, ছিল। বাবা-মা, স্ত্রী, ভাই, দুইবোন আর একটি বাচ্চা। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বাচ্চাটারই। বন্দিশিবিরে পিটিয়ে মেরেছে দুজনকে; আর বাকিদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুধু আমিই যা পালাতে পেরেছিলাম।'

চুপ করে রইল গ্রেবার। কি বলবে ভেবেই পেলো না। তারপর একসময় বলল, 'আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে খুশী হবো।'

হাসল জোসেফ, 'কি আর করবেন আপনি। আমি তো একা। ধরা পড়লে মৃত্যু। নয়তো রয়ে গেলাম।' তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আপনাকে তো যুদ্ধ সীমান্তে ফিরে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, যেতে হবে। শয়তানগুলো তো এখনও কিছু কাল রাজত্ব করবে। আপনার মত নির্দোষ মানুষদের যেমন শিকার করবে, তেমনি আমি না গেলে আমাকে গুলি করে মারবে। আর লুকিয়ে যদি থাকি তো বাবা মা স্ত্রী, সবাই গুলি করে নয় তো বন্দিশিবিরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে মারবে। ওদের কাছে মানবিকতা, সহানুভূতির কোন দামই নেই। আপনি হয়তো আমাকেও ওদের মতো...'

বাধা দিয়ে জোসেফ বলল, 'না, আপনাদের বা পোলমানদের মত লোকেরা, যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাইয়েছেন, তাদেরকে ঘৃণা করার প্রশ্নই ওঠে না। কোন মানুষ কি একা একা বাঁচতে পারে? আমি পারতাম? না, চলার পথে আপনাদের মতো মানুষের দেখা পেয়েছি বলেই তো এখনও বেঁচে আছি। যাক, আপনি নিজে যেন অযথা চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। বিপদের সময় সবার আগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই বড় কথা। সে জন্যেই আপনার আনা এই টিনের খাবারগুলোর খুবই প্রয়োজন আছে।'

গেব্রার বলল, 'তাহলে আমার পুরোনো পোশাকটা আর পরিচয় পত্রটা রেখে দিন। দরকার পড়লে কাজে লাগিয়ে দিতে পারবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব যে হারিয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে।'

'ব্যাপারটা তা নয়। আমি একজন রুমানিয়ান নাগরিক হতে যাচ্ছি। আমি দেখতেও অনেকটা রুমানিয়ানদের মতই। আয়রণ ফ্রণ্টের সভ্য হিসাবে আমাকে পার্টি'র মধ্যে কাজ করতে হবে। পোলমানই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার মাথা ভীষণ সাফ।'

ভীষণ চমকে গেল ভেতরে ভেতরে গেব্রার। বাইরে থেকে পোলমানকে দেখে এসব কিছুই বোঝা যায় না। মানুষ সত্যিই রহস্যময়।

'আপনার জিনিসপত্র কি এখন নিয়ে যাবেন?' জোসেফ জানতে চাইল।

'আপনি কি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছেন নাকি? আরেক ক্ষেপ জিনিসপত্র তো আনতে হবে।' গেব্রার বলল।

'কিন্তু আমাকে যে এখনই বেরোতে হবে।' জোসেফ একটু অসহিষ্ণু স্বরেই বলল।

'আর মিনিট দশেক থাকুন। মদের বোতলগুলো আর ভাল বিদেশী সিগারেটের বেশ কয়েকটি প্যাকেট রয়ে গেছে। সেগুলি নিয়ে আসি।' গেব্রার অনুরোধ করল।

'ভাল বিদেশী সিগারেট বলছেন?' মুহূর্তে জোসেফের মুখের ভাবই পালটে গেল। 'ওঃ কত দিন যে ভাল সিগারেট খাইনি। খাবারের চাইতেও এখন আমার ভাল সিগারেট পেলে চলে যাবে। যান, নিয়ে আসুন। সিগারেটের খাতিরে আমি নিশ্চয়ই আর কিছুক্ষণ সানন্দে অপেক্ষা করে থাকব। যান। তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন।'

□ বাইশ □

কাথরিলেনবার্গে'র গির্জার সামনে গৃহহীন, সর্বস্বান্ত মানুষের লাইন লেগে গেছে। গেব্রারও বসে আছে পেছন দিকে। একজন ঘোড়ামুখি রমণী আর লিক-লিকে চেহারার যুবতী কত কথাই যে বকবক করে বলে চলেছে। গেব্রার কোন আশার আলো দেখতে পেলো না। কিছুক্ষণ পরে এক পাদ্রী এলেন। তিনি নাম ধাম লিখে একটা করে নম্বর দিয়ে জিনিসপত্রগুলোতে ক্লিপ আটকে দিতে লাগলেন। গেব্রারের কাছে এসে বললেন যে এত লোককে নীচের ঘরগুলোতে জায়গা দেওয়া

সম্ভব নয়। গেবার নিজেই ঘুরে দেখল সেলারগুলো। এগুলো সেই পুরনো দিনের নির্যাতন কক্ষের মতই, যেখানে বিধর্মী বা ডাইনী বলে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হতো। বন্দি শিবিরগুলো বোধহয় এগুলোর আদলেই তৈরী করা হয়েছে। হতাশ হয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বিকেল পাঁচটা বেজেছে তখন। সারাদিন ঘুরেও একটা আস্তানা জোগাড় হয়নি। ক্লান্ত, বিষণ্ণ মনে সে আদলেরষ্ট্রাসের পথটা ধরে হাঁটছিল। এই এলাকায় ধ্বংসের চেহারাটা আরও মারাত্মক। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। একটা ছোট দোতলা বাড়ি, বাগান সমেত একেবারে অক্ষত রয়ে গেল কি করে? এযে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতো। সে এগিয়ে গেল। একটা বোর্ডে 'পান্থনিবাস' লেখা রয়েছে। ভেতরে ঢুকে গেল সে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তখন ওপর থেকে সিঁড়ি ধরে একজন বয়স্কা রমণী নামলেন। গেবারকে 'শুভসন্ধ্যা' বলে অভিবাদন করলেন।

সেও পাল্টা 'শুভসন্ধ্যা' জানিয়ে ভাবল যে আজ সন্ধ্যাটা এখানে, এই মধুর পরিবেশে এলিজাবেথকে নিয়ে ভালই কাটবে। সে বলল, 'রাতে কিছু খাবার পাওয়া যাবে এখানে?'

রমণী মৃদু হেসে বললেন, 'এখন সেসব বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কারণ খাবার দাবার তো বিশেষ কিছু নেই।'

'সে জন্যে ভাববেন না', গেবার বলল, 'আমাদের, আমার আর আমার স্ত্রীর রেশন কুপন আছে। তাছাড়া, টিনের খাবারও না হয় নিয়ে আসব।'

রমণী হাসলেন। 'বেশ তো। আমার কাছে সামান্য মটর শুঁটির—।'

বাধা দিয়ে গেবার বলে উঠল, 'ভালই হবে। কতদিন যে মটর শুঁটির স্যুপ খাওয়া হয়নি। আমরা তাহলে আটটার সময় আসব।

'যখন খুশী আসুন। মটর শুঁটি প্রস্তুত থাকবে।' রমণী আবার স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন।

বিদায় জানিয়ে লাকেচষ্ট্রাসের দিকে এগোল গেবার। যদি চিঠিপত্র কিছু এসে থাকে। আশ্চর্য। সত্যিই এসেছে। তার লেখা নোটিশটার পাশে পিন দিয়ে গাঁথা। মায়ের হাতের লেখা দেখেই চিনল সে। দুরু দুরু বুকে চিঠিটা খুলল সে। তার ছুটিতে আসার দিন কয়েক আগে লেখা। বোমা পড়ার কথা কিছু নেই। বোধহয় সীমান্তে যাবে বলেই। মা খুব সাবধানী। লিখেছে, 'কাল ভোরে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের জানিনা। তুমি কোন চিন্তা করো না, বাবা। আমরা ভালই আছি।' ব্যাস! তবু মা-বাবা বেঁচে আছে, এইটুকু জানতেই তার বুকের ওপর থেকে চেপে বসা বোঝাটা যেন নেমে গেল। একটা

আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে চিঠিটা পকেটে রাখল সে। তারপর এলিজাবেথের কারখানার দিকে চলল সে। আপাততঃ মা-বাবার কথা এলিজাবেথকে জানাবে না বলেই ঠিক করল সে।

কারখানার মুখেই দেখা পেলো সে এলিজাবেথের।

'পরশু থেকে তিনদিন ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি, আর্নস্ট। তোমার ছুটির শেষ তিনদিন যাতে একসঙ্গেই কাটাতে পারি। আমাকে অবশ্য পরে পুষিয়ে দিতে হবে। তা দেখা যাবে।' বলতে বলতে এলিজাবেথের দুচোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল।

আবেগে এলিজাবেথকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে উঠল, 'ওই তিনটে দিনই আমাদের সারাজীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে। কেঁদো না এলিজাবেথ।' ওরা এগিয়ে যেতে লাগল। তখন শেষ সূর্যের সোনালী আলো ভাঙ্গাচোরা বাড়িগুলোর গায়ে রঙের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে।

'আজ রাতে কোথায় থাকবো, আর্নস্ট?'

'গির্জাতেই যেতে হবে। তবে তার আগে তোমাকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। চলো।'

দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল এলিজাবেথ। 'এ যে গল্প কথার মত মনে হচ্ছে, আর্নস্ট।'

কুকুরটা দৌড়ে এসে ওদের গা শুঁকলো। তারপর স্বয়ং কর্ত্রী নেমে এসে ওদের হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। 'আসুন। আমি ফ্রাউ ভিত্তে। পেছনের বাগানে টেবিল পেতেছি। চলুন।'

এলিজাবেথ বলল, 'তার আগে একটু হাত মুখ ধুতে চাই আমি।'

'নিশ্চয়ই।' ফ্রাউ ভিত্তে বললেন। এলিজাবেথ আর তাকে এখন তাজা ফুলের মতো মনে হচ্ছে। একটা সুন্দর সুগন্ধী সাবানের সুবাস এসে লাগল গ্রেবারের নাকে। সে তৃপ্তি ভরা স্বরে বলে উঠল, 'আঃ এমন শান্ত সুন্দর পরিবেশে যদি জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যেতো।'

ফ্রাউ ভিত্তে আসতে গ্রেবার কয়েকটা কুপন তার হাতে দিল। ফ্রাউ বললেন, 'এতগুলো দিচ্ছেন কেন? চিনির জন্যে কয়েকটা হলেই যথেষ্ট। তা আপনারা ইচ্ছে করলে পান করতে পারেন। বিয়ার আছে।'

'তাই নাকি? গ্রেবার উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'নিয়ে আসুন। এমন পরিবেশে বিয়ারই আদর্শ পানীয়।'

ফ্রাউ ভিত্তে পাত্র ভর্তি করে নিয়ে এলেন ডালের সঙ্গে মটরশুঁটির ঘন সুপ আর বোলনের সসেজ। অতি উত্তম খাবার। চমৎকার ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতলও এল। দুটো গ্লাসে বিয়ার ঢেলে নিল গ্রেবার। একটা তীব্র আলোর ঝলক আকাশের বুকে

চিরে একোন ওকোন ঘুরে গেল। বোমারু বিমান খুঁজছে। ওরা নিশ্চিন্তে যেতে লাগল।

ফ্রাউ ভিত্তে আবার পনির আর স্যালাড নিয়ে এলেন। পেট ভরে খান। এইতো আপনাদের খাওয়ার বয়স। আমি কফি নিয়ে আসছি।'

ফ্রাউ চলে যেতে এলিজাবেথ বলে উঠল, 'আমি এবার সুখের চোটে মরে যাবো, আনেস্ট।'

'ও কথাও উচ্চারণ করোনা। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবো।'

'টাকা পাবে কোথায়? এলিজাবেথ হাসল!

'ভূতে জোগাবে, দেখে নিও।' গ্রেবার হাসতে হাসতে বলল।

পান্থনিবাস থেকে ওরা যখন বেরোল, তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। চারিদিক জনশূন্য। ওরা গির্জায় এসে পেঁছিতে একজন তরুন যাজক বলল, এত দেরী করে এসেছেন। এখন তো ভেতরে কোন জায়গাই নেই।'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখল। এ সেই বৃদ্ধ যাজকের ছেলে নিশ্চয়ই জোসেফ যার কথা বলেছিল। মুখের মিলও আছে। আমরা না হয় ভেতরের বাগানে ঘুমোবো।' গ্রেবার বলল।

'আপনারা কি বিবাহিত? কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।' তরুন যাজক বলল।

সার্টিফিকেটটা বার করে দেখাল গ্রেবার। দেখে টেখে যাজক তরুন বলল, অল্পদিনই হয়েছে। কিন্তু গির্জাতে বিয়ে না হলে তা সিদ্ধ হয় না।'

গ্রেবার রেগে গেল। 'দেখুন, আমরা ক্লান্ত। আমার স্ত্রীকে সারাদিন প্রচুর খাটতে হয়। বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা শুতে চললাম। আপনার ক্ষমতা থাকে আমাদের বার করে দিন। তবে জেনে রাখুন, কাজটা খুব সহজ হবে না।'

গোলমাল শুনে বৃদ্ধ যাজক এগিয়ে এলেন। তরুন যাজক তাঁকে সব বলল। তিনি শুনে বললেন, 'আজ রাতটার মত থাকতে দাও এদের। তারপর আমি দেখছি। তারপর গ্রেবারকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বললেন, 'আপনি কাল সাতনম্বর ডমুফে রাত ন'টার সময় দেখা করবেন। প্যাষ্টর বীডেনডাইকের সঙ্গে দেখা করবেন, বলবেন। একটা না একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেবে।'

তরুন যাজকের নির্দেশে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে বাগানে নেমে এল। কাতার দিয়ে লোক শুয়ে আছে। তাদের বিচিত্র শব্দের নাসিকা গর্জনে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে বাগানটাতে। বারান্দা আর বাগানের সীমায় ঘাসের ওপরই ক্যানভাস শীট আর কম্বল পেতে দুটো বিছানা করে ফেলল গ্রেবার। ঝোলা আর সুটকেশ এক পাশে রেখে জুতোও খুলে ফেলল সে। তারপর সহাস্যে আহবান জানাল, আসুন দেবী, শয্যা প্রস্তুত।'

এইসময় হঠাৎ মহিলাকণ্ঠের চিৎকার রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিল : 'না, না, ওহ্-হ্…'এই চুপ।' পুরুষকণ্ঠ ধমক দিল। মহিলা আবার চেঁচিয়ে উঠল, ওহ, না, না…পুরুষকণ্ঠ এবার চাপা গর্জন করে উঠল, 'চুপ কর ছেনাল মাগী।' ব্যাস। সব চুপ হয়ে গেল।

গ্রেবার ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'এই জন্যই অন্যেরা বলে আমরা প্রভুর জাত। এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও আমরা আদেশ নির্দেশ পালন করে যাই। যাকগে। এসো, আমরা শুয়ে পরি।'

দুজনে পাশা পাশি শুয়ে পড়ল। দুজনের শরীরেই অসীম ক্লান্তি। কিন্তু সারা সন্ধ্যার সুখের মুহূর্তগুলো, একসঙ্গে পাশ্হনিবাসে খাওয়া পান করা, মনে পড়ে যাচ্ছে। ঘুম আসছে না।

গ্রেবার মাথা তুলে ডাকল, 'এই! ঘুমোওনি তো? আমার কাছে এসো না?'

এলিজাবেথকে ঈষৎ সঙ্কুচিত স্বরে বলল, 'না, আমার ভয় করছে। যদি কেউ জানতে পারে!'

'ধুত্তোর জানাজানি। নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করি না আমি। এসো।' বলে এলিজাবেথকে বুকের মধ্যে টেনে নিল গ্রেবার। তারপর এক সময় সুখের গাঢ় নিদ্রায় দুজনেই তলিয়ে গেল।'

□ তেইশ □

খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল গ্রেবারের। চারিদিকে পাখীদের কিচির মিচির। সূর্য উঠতে খানিক দেরী আছে তখনও। সকালের প্রাথমিক কাজগুলো এখনই সেরে নিতে হবে নইলে পরে ভীড় হয়ে যাবে। আগে জল দরকার। মগটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতেই কলটা দেখতে পেলো। মুখটুখ ধুয়ে এক মগ জল নিয়ে চলে এল সে। ঝোলা থেকে ষ্টোভ বার করে জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিল। খানিক দূরে একটা লোক হা করে ঘুমোচ্ছে। একটা পা কাঠের। সেটা খুলে পাশে রাখা। এলিজাবেথও উঠে পড়ল। বিছানাপত্র গুটিয়ে নিল। গ্রেবার বলল, 'কল ফাকা আছে। এই বেলা কাজগুলো সেরে নাও।' এলিজাবেথ চলে গেল।

পাউরুটি কেটে মাখন মাখিয়ে নিল গ্রেবার। কফিও তৈরী। এলিজাবেথ এসে বড় করে ঘ্রান নিয়ে বলল, 'বাঃ! সুন্দর গন্ধ! বিনকফি, তাই না? নিশ্চয়ই ব্যাণ্ডিং-এর বাড়ি থেকে আনা?'

'সে কথা আর বলতে।' গ্রেবার হেসে বলল, 'দেখছ না, কেমন সৈনিকদের মত

সদ্ব্যবহার করছি।'

'প্রাতঃরাশ তো বেশ ভালই হল।' এলিজাবেথ বলল, 'কিন্তু আজকের রাতটা আবার কোথায় তোমার বুকে মাথা রেখে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো বল তো?'

'সে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো ঠিক, দেখো।' গ্রেবার আশ্বাস দিল, 'আমি যদি তোমার কারখানাতে বিকেলে না যাই, তা হলে তুমি সোজা ফ্রাউ ভিক্তের পান্থনিবাসে চলে যাবে। সেখানে না হলে অগত্যা এখানে আসবে।

এলিজাবেথ ঘড়ি দেখে বলল, 'ঠিক আছে। জিনিসপত্র জমা দিতে তো তোমার সময় লাগবে। আমার সময় হয়ে গেছে। আমি কারখানায় যাচ্ছি।' এলিজাবেথ চলে গেল।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে জমা দেবার জন্য কয়েক পা এগিয়েছে গ্রেবার, তখনই পেছন থেকে কে ডাকল,

'এই যে, ও মশাই, শুনছেন?'

গ্রেবার ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই খোঁড়া লোকটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে এসে এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরে বলল, 'একটু কফি দিন না। কি সুন্দর গন্ধ পেলাম তখন। বড্ড লোভ, মানে, বহুদিন খাইনি তো। যেন স্বাদটাই ভুলে গেছলাম।'

লোকটার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা দ্রব হয়ে গেল গ্রেবারের। 'আহা, তো তখনই এলেন না কেন? দিব্যি ভাগাভাগি করে খেতে পারতাম।'

'না, মানে, একটু সংকোচ হল আর কি। আপনারা যদি আবার ভিকিরি টিকিরি ভেবে বসেন।'

গ্রেবার ম্লান হাসল। তারপর ঝোলার মধ্যে থেকে কফির টিনটা বার করে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নিন, এটা রেখে দিন।'

'আরে না, না। আমার অল্প একটু হলেই হবে। এই কাগজে ঢেলে দিন না একটু।'

'এতে অল্পই আছে। আপনি নিন। আমার কোন অসুবিধা নেই।'

সোজা এলিজাবেথদের ভাঙ্গা বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াতেই ছোকরা মত দারোয়ানটা এসে বলল, 'এই নিন আপনার একটা চিঠি।'

'আমার চিঠি এখানে আসবে কোথ্থেকে?' গ্রেবার অবাক হলো।

'আপনার স্ত্রীর মানেই তো আপনার, তাই না? কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছে। নিন, ধরুন।'

গ্রেবার হাত পেতে নিল। গেষ্টাপো দপ্তর থেকে এসেছে এলিজাবেথ ক্রুজের নামে। বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল গ্রেবারের। খামের মুখটা ছেঁড়া। নিশ্চয়ই দারোয়ান ছোকরা পড়েছে খুলে। যাক খুলে দেখল, সরকারী নির্দ্দেশে

আজ সকাল এগারোটায় এলিজাবেথকে দেখা করতে বলা হয়েছে দপ্তরে। ভয়ে হাত পা সিঁটিয়ে যেতে চাইল গ্রেবারের। গেষ্টাপোর দপ্তর মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দপ্তর। তবু বাইরে স্বাভাবিক থেকে দারোয়ানটাকে মিষ্টি স্বরে বলল, 'একটা ঘরের খোঁজ জানা আছে। ভাড়া যা লাগে দেবো। আমার স্ত্রীর জন্যে বলছি।

'আচ্ছা, খোঁজ পেলে জানাবো।' ছোকরা দারোয়ানটা জবাব দিল।

গ্রেবারও আর সেখানে দাঁড়ালো না। দ্রুত পায়ে ফের কাথরেনিন কার্শে চলে এলো। এখন কি করা যায়। সেটাই বুঝতে পারছেনা সে। এই সময় কে যেন তার নাম ধরে ডাকল, 'আর্নষ্ট।'

চমকে ফিরে তাকাতেই দেখল জোসেফ। গলার স্বর জানা না থাকলে গ্রেবারও চিনতে পারতো না। কালো, লম্বা, সৈনিকদের ওভারকোট পরা। জোসেফ ইশারা করে গির্জার ভেতর এগিয়ে গেল। একেবারে বেদীর কাছে গিয়ে দুজনে হাঁটু গেড়ে পাশাপাশি বসল। তখন জোফেস মৃদু স্বরে বলল, 'পোলমান ধরা পড়ে গেছেন। আজ ভোরে, গেস্টাপোদের হাতে।'

'তাহলে পোলমানও ধরা পড়ে গেলেন।' গ্রেবারের যেন কষ্ট হলো কথাগুলো বলতে!

'কেন? আপনি কি অন্য কারো কথা ভাবছিলেন নাকি?'

'আমার স্ত্রীর নামে একটা সরকারি নির্দেশ এসেছে গেষ্টাপো দপ্তর থেকে। আজ এগারোটায় দেখা করতে বলেছে।'

'চিঠিটা দেখতে পারি?'

জোসেফের হাতে চিঠিটা দিয়ে গ্রেবার প্রশ্ন করল, 'ধরা পড়লেন কি ভাবে পোলমান?'

'তাতো জানিনা। আমি ছিলাম না। ফিরে আসবার সময় পাথরটাকে যথা স্থানে না দেখে সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই কোন ফাঁকে পোলমান পা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন পাথরটা। ওটাই আমাদের গোপন সংকেত ছিল তো। কিছুক্ষণ পর দেখলাম তাঁর সব বইপত্র ভ্যানে তোলা হচ্ছে।'

'অভিযোগ করার মত কাগজপত্র কিছু পায়নি তো?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'না, না। সেসব আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এমন কি টিনের খাবারগুলো শুদ্ধু।'

'আমি তো ভেবেছিলাম যে পোলমানের পরামর্শ নেবো এই চিঠিটার ব্যাপারে। আপনি কি বলেন?'

'পালাতে বলি।' জোসেফ জবাব দিল।

'এক্ষেত্রে পালানোটা কি ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে? গ্রেপ্তার করতে চাইলে তো যখন তখন এলিজাবেথকে গ্রেপ্তার করতে পারতো।'

'হুঁ। আপনার স্ত্রী ইহুদী নন তো ?'

'না, না। তা ছাড়া ওতো সামরিক পোশাক বিভাগের একজন শ্রমিক কর্মি'।'

'তাহলে তো দুশ্চিন্তার কিছু নেই মনে হয়। কিন্তু অনুমান করতে পারেন কিছু ? কেন ডেকেছে ?'

এলিজাবেথের বাবা বন্দিশিবিরে। একজন মহিলা গেষ্টাপো গুপ্তচর ওদের বাড়িতেই থেকে ওকে চোখে চোখে রাখে। আমার মনে হয়, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিছু রিপোর্ট করে থাকতে পারেন মহিলা।'

'খুবই সম্ভব। তাহলে আপনি নিজেই যান। সতর্ক থাকবেন। আমার ধারনা কোন যথার্থ সৈনিকের প্রতি কোনরকম অসভ্য আচরন করতে চাইবে না ওরা। তবু যদি আপনার স্ত্রীকে লুকিয়ে রাখবার প্রয়োজন হয়, একটা গোপন ঠিকানা আপনাকে জানিয়ে দেবো। তার আগে আপনি ঘুরে আসুন। আপনি বিকেলবেলা প্যাষ্টর বীডেনডাইকের স্বীকারোক্তি মঞ্চটার সামনে যে 'অনুপস্থিত' লেখা বোর্ডটা ঝোলানো আছে, সেখানে আমার দেখা পাবেন। যান, ঘুরে আসুন।'

গ্রেবার উঠে পড়ল। বাইরে আসতেই সূর্যের কড়া আলোতে এতক্ষণ আধো আঁধারে থাকা চোখ দুটোয় ধন্দ লেগে গেল। যেন গেষ্টাপোর অত্যাচার শুরু হয়ে গেল এখান থেকেই। চারপাশে জীবনের সজীব চেহারা। তবু যেন সে কিছুতেই চিনতে পারছে না। ওই যে বাচ্চাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাত ধরে তরুণী মা ; কিংবা বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে যে বুড়ো, এসবই যেন অপার্থিব। তার পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে একটা কালো ভয় গুটিশুটি মেরে এগিয়ে আসছে।

গেষ্টাপো দপ্তরে পেঁছে গ্রেবার একজন এস এস কে সমনটা দেখাতে সে নিচের ঘরে যেতে বলল। জনা তিনেক এস এস গুলতানি করছে। কেউ তাল ঠুকছে, কেউ হেঁড়ে গলায় সুর ভাজছে। গ্রেবারকে দেখেও দেখছে না। দাঁড়িয়েই রইল সে সমনটা হাতে নিয়ে। এই সময় একজন চশমা পরা অফিসারকে ঢুকতে দেখে তিন জনই চটপট উঠে দাঁড়াল। গ্রেবার তো দরজার কাছেই ছিল। তাকে দেখে বলে উঠল, 'এখানে কি দরকার আপনার ? আপনাদের তো সামরিক দপ্তরে যাবার কথা।'

গ্রেবার কোন কথা না বলে সমনটা দেখাতে, পড়ে নিয়ে অফিসার বলল, 'তা এটা তো ফ্রয়লিন ক্রুজের, আপনার তো নয় ?'

'আজ্ঞে, উনি আমার স্ত্রী। সামরিক পোষাক বিভাগে কাজ করেন। আমি তাই ভাবলাম যে, আমি নিজেই না হয় একবার এসে জেনে যাই ব্যাপারটা কি। আমাদের বিয়ে হয়েছে কয়েক দিন আগে। এই যে বিয়ের সার্টিফিকেট, দেখুন।'

অফিসার ভাল করে গ্রেবারের আপাদমস্তকও একবার দেখে নিল। তারপর

সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ। আপনি তাহলে নিচের বাহাত্তর নম্বর ঘরে চলে যান।'

গ্রেবারের মনটা আশংকায় দুলে উঠল। গেষ্টাপো দপ্তরে মাটির তলার ঘরগুলোর কুখ্যাতি তার অজানা নয়। ভীষণ দমে গেল তার মনটা। তবু নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল যেন নিজে থেকেই সে ঠাণ্ডা কবরের বদ্ধ অতলে নেমে যাচ্ছে। এবার দম বন্ধ হয়ে অচিরেই মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেবে।

বিরাট একটা হলঘর বাহাত্তর নম্বরটা। চারপাশে ফাইলের পাহাড়। কাঠের পার্টিশন দেওয়া মাঝে মাঝে। একজন যুবক এস এস অফিসারকে দেখে সে সব বলল। অফিসার সব কাগজপত্র আর সমনটা পরীক্ষা করে বলল, 'আপনার স্ত্রীর পক্ষে আপনি সই করতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দুটো ফর্ম বার করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে অফিসার বলল, 'নিন। এখানে সই করে দিন। নিচে এলিজাবেথ ক্রুজের স্বামী বলে লিখে বিয়ের তারিখ, রেজিষ্ট্রি অফিসের ঠিকানা, সব লিখে দেবেন। আর দ্বিতীয় ফর্মটা রেখে দিন আপনার কাছে।'

সই করবার আগে ফর্মটা একবার পড়ে দেখা উচিত বলে মনে হল গ্রেবারের। অফিসার তখন দেয়ালের সঙ্গে তাকের ওপর কি যেন খুঁজছিল। না পেয়ে এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হোল্টমান, ক্রুজের প্যাকেটটা কোথায় রাখলে আবার। তালগোল পাকানো স্বভাবটা আর তোমার গেল না।'

গ্রেবার দেখে শুনে ধীরে ধীরে সই করল। পড়ল সই করার আগে। নিরাপত্তা আইনে আটক বর্ণহার্ট ক্রুজের অস্থি-ভস্ম প্রাপ্তি স্বীকার। আর দু'নম্বর ফর্মটা হলো ডাক্তারী পরীক্ষার ফল,—বার্ণহার্ট ক্রুজে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মনে মনে হাসল সে।

খানিক পর অফিসার এগিয়ে এলো পার্টিশনের আড়াল থেকে। 'এই নিন, অস্থি-ভস্ম।' কাগজ দিয়ে মোড়া ও রবার স্ট্রিং দিয়ে আটকানো একটা চুরুটের সুদৃশ বাক্স। লালকোট পরা চুরুট মুখে একজন ভারতীয়ের ছবির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। অফিসার সেটা গ্রেবারের সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'আপনি একজন সৈনিক, কাজেই আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই যে বর্তমান সময়ে কোন রকম মৃত্যু সংবাদই আমরা প্রকাশ্যে জানাই না। সম্পূর্ণভাবে নীরব থাকাটাই এখন সব চেয়ে বড় কথা। সেজন্যেই আমরা হের ক্রুজেরের মৃত্যু সংবাদ খোলাখুলি জানাইনি। আপনাদের তরফেও নৈঃশব্দ একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়, মনে রাখবেন।'

গ্রেবার একবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে এল। কোন কথাই বলার চেষ্টা করল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মনে

মনে স্থির করে নিল যে এখন এ ব্যাপারে এলিজাবেথকে কিছুই জানাবে না। সেটা উচিতও হবে না। পরে সময় সুযোগ বুঝে জানালেই হবে। নইলে ও ভাবতে পারে যে ওর বাবাকে নাৎসীরা হত্যা করেছে। এবং তা যে করেছে এ ব্যাপারে গ্রেবারের মনে কোন সন্দেহ নেই। বাইরে এসে শ্লথ গতিতে হাঁটতে লাগল সে ক্যাথারিনেন কার্শে'র দিকেই।

রাস্তায় লোকজন চলছে এখন বেশ। আসবার সময় যেমন প্রাণহীন মনে হচ্ছিল, এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। অথচ একটা মানুষ চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডাক্তার ক্রুজেকে তো সে ছোটবেলা থেকেই জানে। সেই লোকটা আর নেই। মুছে গেছে। পৃথিবীটা কিন্তু চলছে তেমনই। একটা নীরব যন্ত্রণা সে অনুভব করল নিজের মধ্যে। যদিও তেমন ভাবে তো ডাক্তার ক্রুজের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। তবু এ মুহূর্তে যন্ত্রনা তো মিথ্যে নয়। তাঁরই আত্মজা যে এখন তার প্রাণের দোসর। অঙ্গীকারে বদ্ধ আমৃত্যু সঙ্গিণী।

গির্জার ভেতরে এসে সে সচকিত হল। কি এক আচ্ছন্নতার মত নিজের ভাবনায় ডুবে থেকে এতটা পথ চলে এসেছে বুঝতেই পারেনি। এইবার প্যাস্টর বীডেন ডাইকের স্বীকারোক্তি মঞ্চটার কাছে এসে 'অনুপস্থিত লেখা বোর্ড'টা না দেখে সে নীল পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। জোসেফ বসে আছে, যেন বাঘের মত ওত্ পেতে। শিকার দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন। চোখ দুটো জ্বলছে। গেবারকে দেখে অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে গেল। বলল, 'খবর কি ?'

গেবার ভেতরে ঢুকে ভস্ম বোঝাই প্যাকেটটা দেখালো। 'ডাক্তার ক্রুজের অস্থিভস্ম।'

'ও, আচ্ছা। এজন্যেই ডেকেছিল তাহলে ?'

গেবার মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'পোলমানের খবর কিছু পেলেন আর !'

'না। কোন খবর নেই।' জোসেফ জবাব দিল।

একটুক্ষন নীরব থাকার পর গ্রেবার বলল, 'এগুলো নিয়ে এখন কি করা যায় বলুন তো ?'

'কি! ভস্ম? মাটিতে পুঁতে দিন।' জোসেফ বলল।

'মাটিতে মানে বাগানে বলছেন ?'

'হ্যাঁ। ওখানে তো একটা কবরখানা আছেই।'

কেমন একটা অসহায়তা ঘিরে ধরল গেবারকে। তৎক্ষনাৎ মনে পড়ে গেল গ্রেবারের ফ্রান্সের কথা। বিজয় তোড়নের নীচে সার সার অজানা, অচেনা সৈনিকদের কবরগুলোর কথা ; যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলোর কথা। চারপাশে ফুলের গাছ ভরা। সকালের স্নিগ্ধ সোনালী রোদ এসে পড়েছে কবরগুলোর ওপর। রঙিন পাখা মেলে

উড়ে বেড়াচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রজাপতি। মনে পড়তেই ফের বুকের ভেতরটা তার টনটন করে উঠল। দুচোখ ভরে এল জলে।

জোসেফ বুঝল। ঘনিষ্ট বন্ধুর মত তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু স্বরে বলল, 'অত উতলা হবেন না। আসুন। আমি থাকব আপনার পাশে।'

ঘর ছেড়ে চওড়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালো দুজনে। আপনি এগোন। আমি চট করে বাইরের পথটা একবার দেখে এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

গ্রেবার বাগানে এল। বেয়নেটের ডগা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত করে নিল। ভস্মের বাক্সটার গায়ে যত্ন করে লিখল। বর্ণহাট ক্রুজের অস্থিভস্ম, যিনি বন্দি-শিবিরে মারা গেছেন বা তাঁকে হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে।' তারপর বাক্সটা গর্তে রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিল। দুটো গাছের ডাল ভেঙ্গে ওপরে একটা ক্রুশও লাগিয়ে দিল। ওপরে কিছু লিখল না ইচ্ছে করেই। ক্যাথলিকদের কবরখানা এটা। আর ডাক্তার ক্রুজে প্রোটেষ্ট্যান্ট। কাজেই দেখে ফেললে গোলমাল হতে পারে। নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এল সে।

'আজ ঘুমোবো কোথায় আমরা আর্নষ্ট? আবার এই গির্জাতে নাকি?' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

'না গো। একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে। ফ্রাউ ভিত্তের সঙ্গে দেখা করে ছিলাম। বাড়ির দোতলায় একটা বাড়তি ঘর আছে। দেখেছি, পছন্দও হয়েছে আমার। মালপত্তর রেখে এসেছি। আমি চলে যাবার পরও তুমি ওখানে থাকতে পারবে। সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে তো?'

* 'হ্যাঁ আনর্ষ্ট। কাল থেকে তিনদিন আর আমি কাজে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি যা বললে তা কি সত্যি? তাহলে আজই আমাদের মধু যামিনীর সত্যিকারের সুরু। ওহ্ আমার যা আনন্দ হচ্ছে। আজ রাতে তাহলে ঘুম নেই। সারারাত শুধু গল্প করব আমরা। একেবারে সেই তারাদের ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত বাগানের উন্মুক্ত বাতাসে বসে থাকব দুজনে। কিন্তু সব চেয়ে আগে আর একটা কাজ। একটা টুপী কিনতে হবে আমাকে।'

'আরে, টুপী দিয়ে কি হবে?' গ্রেবার অবাক হল।

'আজকের এমন দিনে সেটাই রীতি গো। তুমি কিছুটি জানো না, খোকা আমার।' বলে ঠোঁট চেপে রহস্যময় হাসি হাসলো এলিজাবেথ।

'তোমার কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে এবার আমিও একটা কিনে ফেলি।'

'আজ্ঞে না, তোমার না কিনলেও চলবে।' কৃত্রিম ধমক দিল এলিজাবেথ।

গ্রেবার হেসে ফেলল। 'বেশ বাবা, ঠিক আছে। আমি কিন্তু টুপীর দোকান

টোকান চিনিনা।'

'তোমাকে চিনতে হবে না। আমি চিনি।'

'কাপড়ের কুপন আছে তো তোমার কাছে?'

'সব আছে। তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। এখন চল তো?'

শো কেসের কাঁচের অর্ধেকটাই ভেঙ্গে গেছে। বাকি অর্ধেকটা ঝুলছে। দোকানের মহিলা হেসে ওদের স্বাগত জানালো। তারপর এলিজাবেথকে সঙ্গে করে ভেতরের দিকে চলে গেল। ভেতরটা বেশ আলোকিত। মহিলা আর এলিজাবেথের মধ্যে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে গ্রেবার, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না কিছু স্বভাবতই। মহিলা ভেতরের আলমারি থেকে গাদা খানেক বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ষ্টাইলের টুপী বার করে এলিজাবেথের সামনে রাখল। এলিজাবেথ একের পর এক টুপী মাথায় দিয়ে দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কোন থেকে নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখছিল। আর গ্রেবার যেন এই প্রথমবার এলিজাবেথকে দেখল স্থান কাল থেকে নিযুক্ত, নিজেকে নিয়ে মশগুল, কিন্তু ভালবাসার নম্রতায় মহান; আবার আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, জেদী শিকারীর মতো যে যুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তে একের পর এক অস্ত্রগুলো যেন পরীক্ষা করে নিচ্ছে। দুজনের কথার শব্দ কানে আসছে তার ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো, কিন্তু স্পষ্ট করে বোঝাই যাচ্ছে না। গ্রেবার চেয়ারে বসে রইল একইভাবে।

খানিক পর এলিজাবেথ এল। একটা সামান্য সোনালী টুপী মাথাতে ঠিক মানানসই হয়ে যায়।

□ চব্বিশ □

তারাভরা আকাশটা জানালার ফ্রেমটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। পাশ দিয়ে ঝুলছে আঙ্গুরলতা। গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর বাতাসের মৃদুমন্দ দোলায় ঝুলছে।

'আমি কিন্তু সত্যিই কাঁদছি না, আর্নেস্ট, বিশ্বাস করতে পারো। আর যদিবা একটু আধটু কেঁদেও থাকি, তার জন্যে তোমার কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না যে এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর কি ভয়ানক তোলপাড় করছে। আর সেটা আমার নিজের জন্যে নয়, শুধু তোমার জন্যে,—তোমার হিত অহিতের কথা ভেবে। এ আমার সুখের অশ্রু, দুঃখ নয়।'

গ্রেবারের বুকের সঙ্গে মিশে সুখের তাপ নিচ্ছিল এলিজাবেথ। বিছানাটা বেশ বড়। আখরোট কাঠের তৈরী কারুকাজ করা পুরোনো কিন্তু মজবুত খাট। ঘরের এক কোনে তেমনই পুরোনো ড্রেসিং টেবল একটা। আরেকটা টেবিল জানালার সামনে পাতা। দুদিকে দুটো চেয়ার। বিপরীতে একটা বড় দেয়াল আয়নাতে ঝিক ঝিক করছে জোৎস্নার আলো।

'তুমি জাননা আর্নেস্ট, কি অশান্তির মধ্যে দিয়ে গত কিছুদিন কেটেছে আমার। কত চেষ্টা করেছি নিজেকে একটু শান্ত করতে। কিছুতেই পারিনি। আজ এতদিন পর সত্যিই যেন আমার প্রানে শান্তির স্পর্শ পেলাম।'

'আমারই ভুল। মনে হচ্ছে এই শহর থেকে অনেক দূরের কোন গ্রামে তোমাকে নিয়ে গেলে ভাল করতাম।'

'তুমি সীমান্তে চলে গেলে গ্রামেই থাকি বা শহরে, আমার পক্ষে একই, আর্নেস্ট।'

'কিন্তু গ্রামগুলোতে তো এখনও তেমন হামলা হয়নি।'

'বোমাবাজির বর্ষন তো একদিন এখানেও থেমে যাবো, আর্নেস্ট। মানছি যে এই শহরটার এখন আর প্রান নেই কিন্তু কারখানার কাজ ছেড়ে আমার তো পালিয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই। আর সত্যি বলতে কি, ও নিয়ে আমি চিন্তাও করছি না। বরং এমন একটা শান্ত, নিরিবিলি ঘর পেয়ে আমি খুব খুশী। আমি এখানেই তোমার সঙ্গ সুখের স্মৃতি নিয়ে, যতদিন না তুমি ফিরে আসো, সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবো। অযথা ভেবে তুমি কষ্ট পেওনা।'

'কষ্ট যে হয়, এলিজাবেথ। সে জন্যেই তো ভাবনা আসে।' এলিজাবেথের নিবিড় কেশরাশির মধ্যে দিয়ে আঙ্গুল চালাতে চালাতে গ্রেবার বলতে থাকে, 'পরস্পরের সান্নিধ্যেই তো সুখ, নইলে সুখের তো কোন বাঁধা ধরা স্থান নেই।'

'হয়তো তুমিই ঠিক বলেছ। তবু বিস্ময় লাগে যখন মানে হয় যে এতগুলো বছরের পর যখন সুখ যদি বা এলো জীবনে, তাও শেষ হয়ে যাবে ক্ষনিকের পরশ দিয়ে। কি আশ্চর্য ভঙ্গুর আর ক্ষণস্থায়ী এই সুখ।'

এলিজাবেথের নিঃশব্দ আর্তির অনুরনন গ্রেবার তার নিজের অন্তরে অনুভব করতে পারলো এবার। এই পেয়েও হারাবার যন্ত্রনা যে তার বুকের মধ্যেও রক্ত ক্ষরণ করে যাচ্ছে নীরবে। তবু সে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজেকে সংযত রাখলো। ধীর, শান্ত স্বরে বলল, 'আমরা তো মানুষ, জানোয়ারদের মতো আত্ম সুখেই মগ্ন হয়ে থাকতে তো আমরা পারিনা। সে জন্যেই আমরা যন্ত্রনায় এত কাতর হই। কারণ আমরা তো জানি যে আমাদের এই সীমাহীন দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী আমাদের এই বিষাক্ত সমাজ, তার কার্য লোভ, আর হিংসাবৃত্তি। যে ভাবেই হোক, তাদের এই জঘন্য মনোবৃত্তির বিনাশ ঘটাতে হবে তো আমাদেরই।'

'হ্যাঁ আর্নেস্ট, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের জীবনটাকে আবার গোড়া থেকে

শুরু করতে হবে।'

'এই তো আমার এলিজাবেথের যোগ্য কথা।' বলে গভীর আশ্লেষে এলিজাবেথকে বেঁধে চুমু দিল গ্রেবার। পরিপূর্ণভাবে সাড়া দিল এলিজাবেথও।

সুখের মুহূর্তগুলো উধাও হয়ে যেতে লাগল। দুজনেরই মুখে কথা নেই। ঘুমও বুঝি নেই। গ্রেবার জানলা দিয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এলিজাবেথ দেখতে পেলো গ্রেবারের চোখের মনি দুটো কি এক আভায় জ্বল জ্বলে দূর আকাশের তারাদের মতই। সে বলে উঠল, 'কি হলো? ঘুম পাচ্ছে না?

'নাঃ। ঘুমিয়ে আর লাভ কি। এই তো বেশ আছি।'

'কিন্তু, কালকে তো আর ঘুমোবার অবকাশ পাবো কিনা কে জানে?'

'না পেলে না পাবো। ট্রেনেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যাবো দুটো দিন।'

'কিন্তু এমন সুখের বিছানা তো আর পাবে না।'

'হ্যাঁ তা বটে আবার নীল অম্বরের নীচে ঘাসের সবুজ গালিচা হবে আমার সুখের শয্যা।'

'আহা, কি মজার কথাই যেন না বলছ।' অভিমানে মুখ ভার হয়ে গেল এলিজাবেথের।

'আরে, রাগ করছ কেন? গরমকালে কিন্তু বেশ লাগে। তবে শীতের সময় রাশিয়াকে সহ্য করা যায় না, সত্যিই।'

'কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে আরও একটা শীত তোমাকে সেখানেই কাটাতে হবে?'

'সে সম্ভাবনা খুব কম, বুঝলে। যেভাবে আমাদের পেছু হটতে হচ্ছে, তাতে তো আমার মনে হচ্ছে যে শীত পড়বার আগেই আমাদের হয়তো পোল্যাণ্ড এমন কি খোদ জার্মানীতেই এসে পেঁছিতে হবে। আর তখন ঠাণ্ডা পড়ে গেলেই বা কি? তোমার উষ্ণতা দিয়ে ঢেকে রাখবে আমাকে।'

এতক্ষণ ধরে এত কথার পর আসল কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারছিল না এলিজাবেথ।...'তুমি যে কবে আবার সীমান্ত থেকে সজীব, সশরীরে ফিরে আসবে, এই চিন্তাটাই আমার বুকের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করে করে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে, এই উলঙ্গ সত্যের পাঁচিলটা যে আমাদের দুজনের মাঝে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর্নেস্ট এটা তোমাকে কি করেই বা বলি। এ বড় নির্মম যন্ত্রণা আর্নেস্ট। তুমি কি তা বুঝতে পারো?'

ভাবছে অবশ্য আর্নেস্ট গ্রেবারও। মনে হচ্ছে, আজ এই ক্ষণে, জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত নারীকে বুকের মধ্যে নিয়ে, আঙ্গুরলতায় শোভিত এই বাড়ির নির্জনে, স্পর্শতে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নায় লুকোচুরির খেলাব অন্তরাল থেকে যেন কি এক রহস্যময় বার্তা ভেসে আসছে, যার সমাধান করা এখনই তার পক্ষে অসম্ভব।

ঠিক তখনই বুক কাঁপানো সুরে ওঁয়া ওঁয়া করে বিমান আক্রমনের কর্কশ সংকেত ধ্বনি আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তুলল।

'আমরা যদি এই ঘরেই থেকে যাই তো কেমন হয়?' গ্রেবার বলল, 'আবার ধরাচুড়ো পরে সেই শেলটারের খাঁচায় যেতে মন চাইছে না।'

এলিজাবেথ বলল, 'আমারও ইচ্ছে করছে না নড়তে, এখান থেকে কোথাও যেতে।'

গ্রেবার উঠে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। যেন জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। বিমান আক্রমনের পক্ষে আদর্শ রাত সন্দেহ নেই। নিচে থেকে ফ্রাউ ভিত্তে ওদের দুজনকে কি যেন বললেন। গ্রেবার শুনল, 'শেল্টার লিবনিৎস্ট্রাসে…' তারপর ঘরে ঢুকে গেলেন। তিনিও শেল্টারে যাবার আগ্রহ দেখালেন না। গ্রেবার মোটেও অবাক হলো না। এই বাড়িটা টিকে আছে, আজও টিকে যাবে। বাইরের রণোমত্ততা একে আজও ছুঁতে পারবে না। মুখ ফিরিয়ে এলিজাবেথকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'ফ্রাউ ভিত্তে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন না, বুঝলে।'

'হ্যা। তুমি আমার কাছে এসো।' এলিজাবেথ ডাকল।

গ্রেবার ভাল করে দেখল এবার। এলিজাবেথ বিছানায় উঠে বসেছে। ওর পুষ্ট দুই কাঁধ থেকে যেন জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে, আর যেখানে এসে বর্তুল আকার নিয়েছে ওর দুটি দৃঢ় উন্নত স্তনে, এই ক্ষণে মনে হচ্ছে যেন তাদের আকৃতি আরও বেড়েছে অন্যদিনের চেয়ে। আধ-আধাঁরে মুখটা তার স্পষ্ট নয়, কিন্তু চোখ বেন জ্বল জ্বল করছে। দু'হাতে পেছনে ভর দিয়ে বসেছে, এলিজাবেথকে যেন মনে হচ্ছে কোন দূর দেশ থেকে এসেছে এক মোহময়ী রহস্যময়ী, যেখানে এসে এই পৃথিবীর সীমা শেষ হয়ে গেছে।

'আজ আর কিছু হবে না, তুমি দেখে নিও!' গ্রেবার বলল। কেন তার এমন ধারণা জন্মাল, সে জানে না। তবে আজকের এই জ্যোৎস্নার প্লাবন, এই বাগান ও তার আঙুর গাছ, এলিজাবেথের দুটি পুষ্ট কাঁধ অপেক্ষায় অধীর, আর এই নিস্তব্ধতা, সবটুকু মিলিয়েই হয় তো এই বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে।

গ্রেবার এগিয়ে গিয়ে ঝুকে পড়ল এলিজাবেথের দিকে। দু'হাত দিয়ে গ্রেবারের গলা জড়িয়ে ধরল এলিজাবেথ, 'যা কিছুই হোক না, তাতে কিছু আসে যায় না', বলল এলিজাবেথ। গ্রেবার এক হাত নামিয়ে দেহের আবরণগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। তার নগ্ন দেহটা সটান মেলে দিল বিছানার ওপর; তার বিস্তৃত কোমর থেকে ক্ষীণ কটিদেশ মিশেই আবার পেটের বিস্তৃতিতে আগ্রহী নিতম্বের বিশালতায় থেমেছে। মাংসল, পুষ্ট উরুদুটির উর্ধাংশ নিম্ন তলপেটের ত্রিভুজে এক থোক অন্ধকায়ে এসে মিশে গেছে। এই শরীর এখন আর কোন শান্ত মেয়ের শরীর নয়, বরং উদ্দীপিত, আগ্রহে অধীর এক পরিপূর্ন যুবতী নারীর শরীর।

দু'হাতে এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের উষ্ণ কম্পন অনুভব করল

গ্রেবার। আরও নিবিড় আশ্লেষে গ্রেবারের শরীরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে লাগল এলিজাবেথ। আর গ্রেবার অনুভব করল যেন সহস্রবাহু দিয়ে তাকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে কেউ আর ক্রমশঃ তার শরীরটাকে গভীর থেকে আরও গভীরতর করে খুঁড়ে চলেছে। তাদের দুটি শরীরের মাঝে এক চুলও স্থান নেই, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তাদের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে নিবিড় হয়ে জুড়ে গেছে, এটা আর সেই প্রথম দিনের মতো উচ্ছল উন্মত্ততা নয়, ধীরে ধীরে উষ্ণ থেকে আরও উষ্ণতার দিকে যাত্রা, দুটি শরীর এক হয়ে গিয়ে ক্রমশই এক মহামিলনের অনুভব, যখন এই পৃথিবীর বাস্তব অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে ধুয়ে মুছে যায়, সমস্ত সীমারেখা বিলীন হয়ে যায় দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে; আত্মহারা আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায় দুটি হৃদয়।

কতদূর থেকে যেন আস্তে আস্তে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এল গ্রেবার। মাথা তুলে তাকালো। শুনতে চেষ্টা করল কান পেতে কিছু। কোথাও কোন শব্দ নেই। বিমানেরও না, কামানেরও না। আশ্চর্য!

এলিজাবেথ আড়মোড়া ভাঙ্গল। গ্রেবার বলল, 'আক্রমন বোধহয় হয়নি।''

'নিশ্চয় হয়েছিল।' ঘুম জড়ানো স্বরে এলিজাবেথ বলল। 'আরও একটু শুয়ে থাকিনা আমরা।'

গ্রেবার পাশ ফিরে শুলো? নিঃশ্বাসের তালে এলিজাবেথের নগ্ন বুক দুটো ওঠানামা করছে। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে! তখনই উঠে বসল এলিজাবেথ। মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এই, আমার খিদে পাচ্ছে যে।'

'কোন ভাবনা নেই। ব্যাণ্ডিং-এর বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছি। জানো, আলফ্রান্সের কথা ভেবে এখন আমার একটু খারাপই লাগছে। বেচারার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি।'

'সে লোকটাও তো কত জনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। সব কাটাকুটি হয়ে গেল।' এলিজাবেথ উঠে বসল। তার আনগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল গ্রেবার। তারপর দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে একটা এগিয়ে দিল এলিজাবেথের দিকে। এলিজাবেথ এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে দিল। 'কি সুন্দর জ্যোৎস্না! তাইনা?'

রুটি, মাংস, ফলের রস পেট পুরে খেলো দুজনে। তারপর আরও দু'গেলাস মদ নিয়ে মৃদু মৃদু চুমুক দিতে লাগল। খানিক নিস্তব্ধতার পর এলিজাবেথ বলল, 'কি, মন খারাপ লাগছে, আর্নষ্ট?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। যদিও তোমাকে আপন করে পাওয়ার পর মন খারাপ হওয়ার কারন নেই। তবুও কালই তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবতেও বুকের ভেতরটা

খালি হয়ে যাচ্ছে। তবুও, তুমি কষ্ট পাবে, এই কথা ভাবলে মনটা আরও বিষন্ন বোধ করে। এখন মনে হয়, কেন যে তোমাকে এমন করে নিজের সঙ্গে বাঁধলাম। মুক্ত পাখীকে খাঁচায় বন্দী করলাম। তার চেয়ে আগের মতই না হয় আমার এই রিক্ত, নিঃস্ব, প্রেম ভালবাসাহীন জীবনটাকে সীমান্তের যুদ্ধে গিয়ে শেষ করে দিতাম।'

'এমন করে ভেবোনা, আর্নষ্ট।' গভীর ভালোবাসার স্বরে এলিজাবেথ বলল, 'সত্যিকথা, আমার বুকের মধ্যে আজ যে কষ্ট অনুভব করছি, তা থেকে হয়তো মুক্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু জীবনটাতো আমারও ছন্নছাড়া হয়ে যেতো। অথচ আজ এখানে থেকে সারাক্ষণ আমি তোমার কথা ভাববো, প্রভু, মঙ্গলময় যীশুর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করবো, অপেক্ষায় থাকব আবার কবে আমাদের দুজনের মিলন হবে; প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকব তোমার। তুমিও সীমান্তের প্রতিটিক্ষণ আমার কথা ভাববে, বেঁচে থাকবে শুধু আমারই জন্যে। ফিরে আসবে একদিন বিজয়ী বীরের মতো, এই আনন্দেরও তো কোন তুলনা নেই, আর্নষ্ট।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্রেবারের মুখ, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এলিজাবেথ।'

এলিজাবেথ আবার গ্রেবারকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। গ্রেবার সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করল এলিজাবেথের উষ্ণ নরম শরীরের উত্তাপ। সব চাওয়া, সব পাওয়া, প্রেম-ভালবাসা, জীবন-মৃত্যু, সব মুছে গিয়ে নেমে এল প্রশান্ত, স্নিগ্ধ এক শান্তির বাতাস। দুজনকে আবার মিলিয়ে দিল চির অমরত্বের বন্ধনে।

তখন বিকেল। বাগানে বসে ছিল ওরা। এলিজাবেথের দৃষ্টি ছিল ফ্রাউ ভিক্তের পোযা বিড়ালটার দিকে। বিড়ালটা বোধহয় আজ কালের মধ্যেই বাচ্চা দেবে। হঠাৎ এলিজাবেথ বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে আমার পেটেও বাচ্চা এসেছে।'

'সেকি? এত তাড়াতাড়ি তো আমি ভাবিনি। তোমাকে তো তেমন করে আদরই করা হলো না!' গ্রেবার হাসল।

'সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেই তো এখনও সুনিশ্চিত নই?'

'তাই বল। আমার এই কুৎসিৎ যুদ্ধের পরিবেশে একটা নতুন জন্মের কথা ভাবতেই কেমন লাগছে। এই রকম একটা শ্বাসরুদ্ধকর বিষাক্ত পরিবেশে একটা নির্দোষ শিশুতো ভালভাবে বাঁচতেই পারবে না।'

'তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছো আর্নষ্ট। যুদ্ধের পরিবেশে বড় হতে হতেই তো ক্রমশঃ বুঝতে পারবে যে কেমন করে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকটা অসৎ মানুষ কি করে এত বড় যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়, সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করে দেয়। তখনই সে ভাববে এক নতুন পৃথিবীর কথা।'

'সে জন্যেই তুমি সন্তান চাও, এলিজাবেথ? কিন্তু সেও তো হতে পারে সেই অসৎ মানুষদেরই একজন?'

'না, গ্রেবার না। সে তো কোন সাধারণ শিশু হবে না। সে হবে তোমার সন্তান। আমি তাকে শিক্ষিত করে তুলব তোমার আমার আদর্শে, সে হবে একান্তভাবেই আমাদের সন্তান।'

গ্রেবার মুগ্ধ স্বরে বলে উঠল, 'এলিজাবেথ।'

'না। আর কোন কথা নয়। যাই, ফ্রাউ ভিত্তে তোমার খাবার কি ব্যবস্থা করেছেন দেখি। আমিও কটা জিনিষ করে তোমাকে গুছিয়ে দেবো যাতে ট্রেনে দুদিন তোমার অনায়াসে চলে যায়।'

এলিজাবেথ চলে গেল।

গ্রেবার বসে রইল বাগানেই। বেলা পড়ে আসছে। রৌদ্ররাঙা আকশ। এই দিনটাও তাহলে চলে গেল! কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছে সে গতকালই রওয়ানা হয়ে গেছে। বাড়তি একটা দিন রয়ে গেল এলিজাবেথের কাছে। এবং সেটাও এখন শেষ। খানিকক্ষনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। মা-বাবার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। এলিজাবেথকেও আর দেখানো হল না। এখন এ বাড়িতেই সে থাকবে। ফ্রাউ ভিত্তে তাতে খুব খুশী। অনেকটা স্বস্তি বোধ করছে সে নিজেও। উঠে দাঁড়াল সে। শেষ বারের মত নিজের জিনিষপত্রগুলো একবার দেখে নিল।

একটু পরে এলিজাবেথ এল খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে। সব গোছগাছ করে নিল। সময় এখনও যথেষ্ট আছে। ছ'টার সময় ট্রেন ছাড়ার কথা। এলিজাবেথ ষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু মানা করল গ্রেবার। প্রথমবার মা জোর করে ষ্টেশনে গেছিলো আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে। তারপর কান্নাকাটি করে সে এক বিষম অবস্থা। সে জন্যেই তোমাকে ষ্টেশনে যেতে আমি বারণ করছি। ওখানে সে রকম একটা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হোক, তা আমি চাই না! সেখানে মিলিটারি পোষাক পরে আরও শত জনের মাঝে আমি সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি কেঁদে কেঁদে আমাকে বিদায় জানাবে এই দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার বিশ্রী লাগছে। এখানে এখন আমরা যেমন স্বাভাবিক আছি, তেমন ভাবেই চলে যাই আমি। তুমি এক কাজ কর। কিছু টাকা রয়ে গেছে আমার কাছে, রেখে দাও। একটা ভাল দেখে পোশাক তোমার জন্যে কিনে নিও।' বলে গ্রেবার টেনে নিল এলিজাবেথকে নিজের বুকের মধ্যে। গভীর আবেগে চুম্বন করল ওর ডালিম-রাঙা ঠোঁট।

এলিজাবেথ সাগ্রহে গ্রহন করে আবেগ ঘন স্বরে বলল, 'নতুন পোশাকটা কিনে রেখে দেবো আমি আনস্ট। তুমি যেদিন আবার ফিরবে, ওই পোশাক পরে তোমাকে [illegible] আমি।

গ্রেবার বোঁচকা বুঁচকি তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। একবারের জন্যেও পেছু তাকালো না আর। এলিজাবেথের শরীরের ঘ্রান তখনও তার নাকে লেগে রয়েছে। তাই উপভোগ করতে করতে এগিয়ে গেল সে।

সোজা ব্রাম্‌সষ্ট্রাসে চলে এল গ্রেবার। এখান থেকে হেঁটে সে শহরে গেছিলো। ষ্টেশনে যাবার বাস দাঁড়িয়েই আছে। উঠে বসবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই ছেড়ে দিল। রেল ষ্টেশনটি আর আগের জায়গায় নেই। দূরে সরিয়ে নিয়ে গাছ, লতা-পাতা দিয়ে ক্যামুফ্লাজ করা হয়েছে যাতে বিমান থেকে ঘর বাড়ি বলে বোঝা না যায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশ কামরাই মিলিটারীদের জন্য সংরক্ষিত। প্রত্যেক কামরায় সামনে একজন করে অফিসার সৈনিকদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখে ছেড়ে দিচ্ছে। গ্রেবারের একদিন দেরী হয়েছে দেখেও কোন মন্তব্য করল না অফিসার। কামরায় উঠে জানলার ধারের একটা সীটে বসে পড়ল সে।

এই সময় স্বস্তিকা-চিহ্নিত পোশাক পরে দুজন যুবতী একটা হাত গাড়ি টানতে টানতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

একজন সৈনিক জানলা দিয়ে দেখে বলল, 'কফির ড্রাম দেখছি।'

আরেকজন বলল, 'ওসব রঙরুটদের মন ভোলাবার জন্য। আমাদের নয়। বেচারা সব। মুখ থেকে মায়ের দুধের গন্ধ এখনও যায়নি। অথচ ওদের দিয়েই যুদ্ধ করে জেতবার আশা আমাদের। কটা যে বেঁচে ফিরবে ঈশ্বরই জানেন।'

ইতিমধ্যে একজন রোগা যুবতী বউ বাচ্চা কোলে জানালার নীচে এসে দাঁড়াল। 'হাইনরিশ, তোমার শরীরের দিকে খেয়াল রেখো।' কামরার মধ্যে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাইনরিশ নামে সৈনিকটি বলল, 'নেবো মারী। তুমি কিন্তু বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রেখো।'

তার যুবতী বউ বাচ্চা কোলে ট্রেনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলছে, 'রাখব। তুমিও নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

অন্যান্য কামরার সামনেও একই অবস্থা। গ্রেবার শেষ বারের মত তাকাল প্ল্যাটফর্মের দিকে। আর তখনই হঠাৎ গ্রেবারের দৃষ্টি পড়ল এলিজাবেথের ওপর। একটা খুঁটির আড়ালে ছিল বলে গ্রেবার এতক্ষণ খেয়াল করতে পারেনি। ট্রেনের গতি বেড়েছে তখন। সে লাফ দিয়ে উঠে হাইনরিশকে টেনে কামরার মধ্যে ঠেলে দিয়ে মুখ বাড়ালো। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলো সে এলিজাবেথকে। সুন্দর একটা ডল পুতুল যেন। সে প্রাণপনে হাত নাড়াতে লাগল। এতক্ষণে তার আফশোষ হলো। এলিজাবেথকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হতো। কত কথা যেন তার বলার ছিল। সেসব আর বলা হলো না হাত নাড়ানোটাই কি এলিজাবেথ দেখতে পেল? এত দূর থেকে? নিশ্চিত হতে পারলো না সে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে এসেছে ট্রেন।

তারপর ট্রেনটা একটা বাঁকের মুখে ঘুরে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম, ষ্টেশন। গ্রেবার তবু হাত নেড়েই চলল।

□ পঁচিশ □

দু'দিন পরে তাদের দলের খোঁজ পেলো গ্রেবার। তারপর কোম্পানী দপ্তরে গিয়ে তার ফেরার খবর দিল। সার্জেণ্ট মেজর নেই। একজন কেরানী বসে আছে। ছুটি নেবার সময় যে জায়গায় ছিলো গ্রামটা সেখান থেকে প্রায় সওয়া শ' কিলোমিটার পশ্চিম দিকে।

'হালচাল কেমন এখানকার ?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'আর হালচাল। ন্যাক্কারজনক। আপনার ছুটি কেমন কাটলো বলুন।' কেরানী জিজ্ঞেস করল।

'ওই অর্ধেক ভাল অর্ধেক খারাপ। এই আর কি। তা এখানে কিছু ঘটেছে নাকি ?'

'এসে যখন পড়েছেন সবই জানতে পারবেন ক্রমে।'

'বাকি সব লোকজন গেল কোথায় ?'

'ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, মরাগুলোকে কবরস্থ করছে। ফিরে আসবে দুপুরের আগে।'

'মরাটরার খবর আছে নাকি ?'

'সে তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ, আপনি ছুটিতে যাবার আগে কাদের জীবিত দেখেছিলেন, সে তো আপনিই ভাল জানবেন। তবে কিনা রঙরুট দিয়ে বাহিনী ভরা হয়েছিল। যুদ্ধের কিছুই জানে না, বোঝে না, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, এমন বাচ্চা সব। ওগুলোই পোকা মাকরের মতো মরছে আগে।' আর হ্যাঁ, একজন নতুন সার্জেণ্ট এসেছেন আমাদের, মেইনার্ট।'

গ্রেবার বেরিয়ে গ্রামের দিকে চলল। বেশির ভাগ গ্রামই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বরফ অবশ্য নেই আর এখন। কিন্তু রাস্তাগুলো হাঁটুসমান কাদায় ডুবে গেছে। পা বসে যাচ্ছে হাঁটতে গেলে। মাঝে মাঝে অবশ্য তক্তা পেতে দেওয়া হয়েছে। তাতে অসুবিধেই হয়েছে বেশী। একদিকে পা দিলে অন্যদিকটা উঠে যাচ্ছে। ব্যালান্স রাখা দায়। সূর্য মাথায় উঠে গেছে। তেজও খুব। গরমও লাগছে বেশ। সীমান্তের দিকে গোলাবাজি চলছেই, শুনতে পাচ্ছে সে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তাদের শিবিরটা খুঁজে পেয়ে গেল সে। মালপত্তরগুলো রেখে ফের বেরিয়ে এল। ট্রেঞ্চগুলো জলে ভর্তি। স্থানে স্থানে সিমেণ্ট লোহা দিয়ে গুপ্ত আশ্রয় তৈরী করা

হয়েছে। দেখতে লাগছে ঠিক কবরস্থানের মতো।

গ্রেবার ফিরল। পথে কম্যাণ্ডার রয়ের সঙ্গে দেখা হলো। চোখে রিমলেস চশমা। খুব খুশী হলো গ্রেবারকে দেখে। 'তুমি ভাগ্যবান গ্রেবার। তুমি যাবার পরই সব ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তা ছুটিতে তোমার অসুবিধে কিছু হয়নি তো?'

'না স্যার। ভালই কেটেছে।'

'বেশ, বেশ! এ জায়গাটা সুবিধের নয়। আপাতত আছি। তবে দু'এক-দিনের মধ্যে আমাদের সংরক্ষিত শিবিরে ফিরে যাবো। সেলাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। তুমি দেখেছ তো জায়গাটা?'

'এখনও সুযোগ পাইনি', গ্রেবার বলল।

'কেন, ট্রেনে আসার সময় লক্ষ্য করনি! চল্লিশ কিলোমিটার পেছন দিকে এখান থেকে।'

'আমি ভোরে পৌঁছেছিতো। রাতে ঘুমিয়েছিলাম বলে ঠিক লক্ষ্য করিনি।'

'তা বটে', বলে একটু ভাবলেন রয়। তারপর বললেন, 'তোমাদের লেফটেন্যাণ্ট মুয়েলার নিহত হয়েছেন, বুঝলে। তোমাদের নতুন লেফটেন্যাণ্ট এখন মাস।'

'হ্যাঁ স্যার।' সংক্ষেপে বলল গ্রেবার।

'সব কিছুরই ভাল দিক মন্দ দিক আছে। এই যে কাদা দেখছ, এ না শুকোলে রাশিয়ানরা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ঢুকতে পারবে না। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের সৈন্যদের একত্র করে নিতে পারবো। যাক, তুমি ফিরে আসতে আনন্দ হচ্ছে আমার। এবার তোমাদের ওখানকার খবর বলো।'

'ভাল নয়, স্যার। মুহুর্মুহু বিমান আক্রমন চলছেই। অন্য শহরগুলোর কথা তো বলতে পারবো না। তবে আমাদের শহরে দু'দিন পর পরই বিমান আক্রমন হয়েছে, হচ্ছে।'

'তাই তো, খুবই চিন্তার কথা।' রয় তাকালেন গ্রেবারের দিকে। যেন আরও কিছু শুনতে চান।

কিন্তু গ্রেবার আর কোন কথা বলল না।

দুপুর হতেই সৈনিকরা সব ফিরলো শিবিরে। ইমেরমান হেসে বলল, 'আ খোকা। বেঁচে আছ তাহলে? তা ফের এই ভাগাড়ে ফিরে এলে কেন, বাপ? পালালেই তো পারতে।'

'কোন চুলোতে?' গ্রেবারও হেসে বলল।

'সুইজারল্যাণ্ডে গো, জান না?'

'এহ্হে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো। প্রত্যেকদিনই দেখতাম একটা রেডক্রশ মার্কা ট্রেন পলাতকদের নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছে বটে। শুনেছি যে সীমান্তে নাকি

পলাতকদের স্বাগত জানাতে বিজয় তোড়ন করা হয়েছে। বন্ধু আর কাকে বলে। আরে হাঁদা, পালানো অত সহজ হলে গোটা জার্মানীতে কেউ থাকতো ?'

'সেটা একটা কথা বটে।' ইমেরমানও দমবার পাত্র নয়। বলল, 'ঝুঁকি তো নিতেই হয় বাছা। এইতো আমরা ক্রমাগত পিছু হটছি এখন। এটা পালানো নয় ? সুইজারল্যান্ডে পালানোর চেয়ে এটা কি কম বিপজ্জনক ?'

গ্রেবার যুক্তিটা অস্বীকার করতে না পেরে চুপ করে রইলো।

'যাক গে। মুয়েলার মারা গেছেন, জান তো ?' ইমেরমান বলল।

'হ্যাঁ, একটু আগে শুনলাম কম্যান্ডার রয়ের কাছে।'

'মুরেক মরেছে পেটে গুলি খেয়ে। বেরনিংও গেছে। বেচারার একটা পা-ই উড়ে গেছিলো। আর মেইশেক এবং শ্রয়ডার হাসপাতালে পড়ে আছে।'

মনে মনে একটা প্রস্তুতি ছিলই গ্রেবারের এই রকম সব খবরের জন্যে। তবে এরই মধ্যে বেরনিং-এর খবরটা ওর মনকে দমিয়ে দিল খানিকটা। তখনই মনে পড়ল আর একজনের কথা। সে বলে উঠল, 'আর হার্শল্যান্ড, তার খবর কি ?

'হার্শল্যান্ড ? কেন, আর আবার কি হলো ?'

'সে নাকি মারা গেছে শুনলাম ?' গ্রেবার প্রশ্ন করল।

'গাঁজাখুরি গপ্পো। ওইতো সশরীরে বসে আছে, দেখ না ?'

গ্রেবার তাকালো। সত্যিই তো। সে এগিয়ে গেলো। পাশে গিয়ে বলল, 'তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, হার্শল্যান্ড।'

'সত্যি বলছ ?' হার্শল্যান্ডের মুখটা আনন্দে চকচক করে উঠল, 'মনে করে দেখা করেছ তাহলে ? ভেবেছিলাম তুমি হয়তো ভুলেই যাবে ?'

'কথা দিলে তা রাখবার প্রানপন চেষ্টা করি আমি। আমার সম্বন্ধে এমন ভাবলে কেন জানিনা।'

'কিছু মনে করে বলিনি গ্রেবার। ভেবেছি যে নানান অবস্থার ফেরে হয়তো তোমার মনে থাকবে না। যাক, মাকে কেমন দেখলে বলো ? আমি যে ভাল আছি তা নিশ্চয়ই বলেছ ?'

'বলেছিলাম। কিন্তু আমি যাবার আগেই তিনি তোমার মৃত্যুর খবর পেয়ে গেছিলেন, হার্শল্যান্ড।'

'সে কি ? অসম্ভব! আমি তো মাকে প্রতিসপ্তাহে চিঠি লিখি।'

'উনি নিজের মুখে আমাকে বলেছেন যে সেনা দপ্তর থেকেই তোমার মৃত্যু সংবাদের চিঠি পেয়েছেন। আর তোমার সব চিঠি নাকি আগে লেখা।'

'তাজ্জব ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না গ্রেবার।'

'দেখো, আমাদের এই বাহিনীতে দুজন হার্শল্যান্ড নেই। তাহলে অবশ্যই কেউ ইচ্ছে করে এ খবরটা পাঠিয়েছে। কেমন করে এটা সম্ভব হলো, অনুমান করতে

পারো কিছু ?'

'তা বোধহয় পারি। এমন জঘন্য কাজ ষ্টেনব্রেনার ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।'

'কিন্তু ওই জারজের বাচ্চাটা কেন এমন কাজ করবে ?'

'একটা মজা। আমাকে একটা শিক্ষা শিক্ষা দেওয়া। আমার শরীরে ইহুদী রক্ত কিনা।'

'চল আমার সঙ্গে অফিসে। এক্ষুণি গিয়ে বলব খবর সংশোধন করে টেলিগ্রাম পাঠানো হোক। নইলে কম্যাণ্ডার রয়ের কাছে যাব আমরা। ষ্টেনব্রেনারের নামে অভিযোগ করব। চল।'

'না, না।' রীতিমত ভয় পেয়ে গেল হাশ'ল্যাণ্ড, 'আমি স্টেনব্রেনারের নামে অভিযোগ করলে আরও দুর্ভোগ হবে আমার। না, গ্রেবার না। তুমি কি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না ?

'পারছি হাশ'ল্যাণ্ড', গ্রেবার রোষভরা স্বরে বলল, 'এসব তো আর চিরকাল ধরে চলতে পারে না, চলবেও না।'

দুপুরে খেয়ে দেয়ে ষ্টেনব্রেনারের সঙ্গে দেখা করল গ্রেবার। রোদে পুড়ে ব্যাটার চেহারাটার খোলতাই হয়েছে বেশ। চোখে মুখে সেই বদমাইশি হাসিটাও ঠিকই আছে। গ্রেবারকে দেখেই সহাস্যে বলল, 'এই যে চাঁদ, বেশ ফুর্তি'ফার্তা করে এলে তো বাড়িতে ?'

গ্রেবার কোন জবাব না দিয়ে চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল। ষ্টেনব্রেনার তেমনি হাসতে হাসতেই বলল, 'বল, খবরাখবর সব বল ওখানকার ?'

'বলা বারণ যে।' গ্রেবার জবাব দিল।

'সেকি ? তার মানে ?'

আসবার সময় সীমান্তে দুজন এস এস ক্যাপ্টেন আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যেন কোন মতেই শহরের খবরাখবর কাউকে না বলি। সেটা হবে আমাদের যুদ্ধপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো অপরাধ। আর তার শাস্তি যে কি, তা তো তুমি ভালই জানো ?'

ষ্টেনব্রেনার ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে বলল, 'আরে, আমি নিজেই তো একজন এস এস অফিসার। আমার কাছে বলতে তোমার বাধা কি ?'

'অত বোকা আমাকে ভেবে নিচ্ছো কেন, ষ্টেনব্রেনার ?'

ষ্টেনব্রেনার এবার গম্ভীর স্বরে বলল, 'অর্থাৎ বলতে চাইছ যে অনেক কিছুই তোমার বলার আছে ?'

'আমি তোমাকে কিছু বলতে চাইলে আমি একটা গাধা। সাবোটাজ করে শাস্তি ঘাড়ে নেবোনা যে তা তো জানোই।'

এবার ষ্টেনব্রেনার প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো। মুচকি হেসে বললো, 'বিয়ে করেছো তো?'

'সে খবরও জেনে গেছো?'

'আমি জানিনা এমন কিছু আছে নাকি!'

'বুঝেছি। অফিসের কাগজপত্র সব দেখেছ আর কি?'

ষ্টেনব্রেনার কোন উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এবার ছুটিতে গিয়ে আমিও বিয়ে করব।'

'তাই নাকি? তা পাত্রী নির্বাচন হয়ে গেছে?'

'নিশ্চয়ই। এস এস কম্যাণ্ডারের মেয়ে, আমাদের শহরেই।'

'খুবই স্বাভাবিক।'

বক্রোক্তিটা ধরতে পারলো না ষ্টেনব্রেনার। রক্তের মিলনটা হবে চমৎকার, আমরা নার্দিক-ফ্রিজীয় আর মেয়েদের হচ্ছে রাইনিশ স্যাক্সন, যাকে বলে পবিত্র আর্যরক্তের আদর্শ মিলন। আমরা জাতিগত সুযোগ সুবিধা তো পাবোই, আমাদের সন্তানেরাও পাবে বিশেষ শিক্ষার অধিকার। পাঁচ বছরের মধ্যে আমার স্ত্রী জার্মান নারী সহবাহাহিনীতে আদর্শ মা হিসেবে আদৃত হবেই। এর মধ্যে যদি আমাদের যমজ বা তিনটি সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে স্বয়ং ফুয়েরার হবেন তাদের ধর্মপিতা, দু-তিন বছরের মধ্যেই। তখন আমার কি দারুণ একটা মহৎ জীবনের নিশ্চিন্ততা আসবে, একবার মানসচক্ষে দেখবার চেষ্টা করো!'

'দিব্বি দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'রক্তের বিশুদ্ধতা মানেই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। ওই সব ইতর ইহুদীগুলোকে উৎখাৎ করে খাঁটি জার্মান রক্তের মানুষ বাড়াতে হবে। নতুন জাতির নতুন নেতৃত্ব চাই।'

'তাহলে অনেক ইহুদীকেই তুমি উৎখাত করেছ, তাই না?'

ষ্টেনব্রেনার হাসল। আমার চরিত্রের রেকর্ড বা কার্যকলাপের নথীপত্র দেখলে এমন প্রশ্ন করতে না। সেও একটা সময় গেছে আমার। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে গোপনীয়তার স্বরে বলল, 'আমি বদলীর দরখাস্ত করেছি, এস এস ডিভিশনে। সেখানেই কাজের সুযোগ বেশী। কথায় কথায় কোর্ট মার্শাল হয় না এক-আধটা রাশিয়ান মারলে। বরং দল বেঁধে ছেঁটে দেওয়া হয়। বেশী দিনের কথা নয়। তিনশ' পোলিশ আর রাশিয়ান বিশ্বাসঘাতকদের এক বিকেলে গুলিতে খতম। দু'জন অফিসারকে এই কৃতিত্বের জন্য বিশেষ সম্মানজনক সার্ভিস ক্রস বা পদক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আর এখানে যাও বা কজন গেরিলাকে বন্দি করা হলো, সেগুলো গুটি রোগাক্রান্ত, আর তার জন্য কোন কৃতিত্বও দেওয়া হলো না।

রাশিয়ার লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখল গ্রেবার। আর এই ষ্টেনব্রেনার লোকটার কথা ভাবল। নাৎসী পার্টির সার্থক ফসল। একেবারে যন্ত্র-দানব। মন

বা মানসিকতা বলে কিছু নেই। 'তুমিই বোধহয় হার্শল্যান্ডের মায়ের কাছে তার মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়েছিলে, তাই না?'

'কে বললে তোমাকে?'

'আমি জানি, জেনেছি।'

'তুমি ঘোড়ার ডিম জানো।'

'তা যাই বলো, রসিকতাটা করেছো চমৎকার।'

ষ্টেনব্রেনার হাসল। 'তোমারও তাই মনে হয়েছে তো? তাহলে একবার ভাবো, খবরটা পেয়ে ওর মায়ের মুখের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল। আমার তো কচু। হার্শল্যান্ড আমার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আর পারলেই বা কি? এই ডামাডোলের সময় এমন এক আধটা ভুল তো হতেই পারে।'

'তোমার সাহস আছে, মানতেই হবে।' গ্রেবার বলল।

'আরে, এতে আবার সাহসের কি দেখলে। সামান্য একটু রসিকতা বই তো নয়।'

'ভুল করছ, ষ্টেনব্রেনার। রসিকতা নয় এটা, বেশ সাহসের কাজ। কেননা, অন্যের মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করলে তার নিজেরই মরণটা এগিয়ে আসে তাড়াতাড়ি, একথা সবাই জানে।'

'দূর, দূর! বাজে কুসংস্কার। তুমি এসব বিশ্বাস করো নাকি?'

'সকলেই বিশ্বাস করে। এটা প্রাচীন জার্মান প্রবাদ।'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ষ্টেনাব্রনার।

'আমি দুজনের কথা জানি, যারা এই রকম রসিকতা করবার পরই কয়েকদিনের মধ্যে অতি বীভৎস ভাবে মারা গেছিলো। একজনের অণ্ডকোষে গুলি লেগে তাকে ধ্বজভঙ্গ করে দিয়েছিল। তোমারও তেমন ঘটে কিনা দেখো।'

'যত সব বোকা বোকা কথা,' বলেই ষ্টেনব্রেনার কঠোর দৃষ্টিতে গ্রেবারের দিকে তাকিয়ে যেতে উদ্যত হলো। সে যে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে, মুখ দেখেই বুঝল গ্রেবার। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ষ্টেনব্রেনার। 'ব্যাটা যমজ ছেলের স্বপ্ন দেখছে। শালা হারামীর বাচ্চা।'

সীমান্তের দিক থেকে তখনও কামানের চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে। একটা কাকের ঝাঁক কা কা করে উড়ে গেল। হঠাৎ গ্রেবারের মনে হলো সে যেন কোনদিন ছুটিতে যায়নি। এখানেই রয়ে গেছে। ছিল।

রাত্রে ডিউটি দেবার দায়িত্ব গ্রেবারের ওপরই পড়লো। সমস্ত গ্রামটা নিঃশব্দতার অতলে তলিয়ে গেছে যেন। এত নিস্তব্ধ যে গা ছমছম করে সারাক্ষণ। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতাও খান খান হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে কামানের বিকট শব্দে। তখনই চার-

পাশের ধ্বংসস্তূপগুলো হঠাৎ আলোর ঝলকে ঝলসে উঠে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত হাঁ করে গিলতে আসে যেন।

ভারী বুট টেনে টেনে কাদার মধ্যেই এপাশ ওপাশ করে পাহারা দিতে দিতে একটা তীব্র যন্ত্রনা গ্রেবারের বুকের মধ্য থেকে যেন পাক দিয়ে উঠে এল। বুঝেও যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না সে। অথচ যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বুকের মধ্যে চেপে বসেছে। হঠাৎ সে দাড়িয়ে পড়ল চুপচাপ। বুঝতে চাইল যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায়, কেন। সে কি পেয়েও হারানোর যন্ত্রণা।

সে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল। সহসা তার মনে হল যেন অতীতের সঙ্গে তার যোগাযোগটা বুঝি চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কত কিছুই যেন পাওয়ার ছিল। সব কোথায় হারিয়ে গেল। এখন কেবল বুক জুড়ে বিরাজ করছে খাঁ খাঁ শূন্যতা। তবুও এই নাম গোত্র হীন যন্ত্রণাটাকে সে তাড়িয়ে দিতে চাইল না। যেন একে তাড়াতে চাইলেই ভালবাসার মুখটাও চিরতরে হারিয়ে যাবে। সেই মুখ, আশ্চর্য কোমলতা আর ভালবাসার পূর্ণতার আপ্লুত একটি মুখ। কিন্তু সহসা ছবিটা পাল্টে গেল। অশ্রু ভারাক্রান্ত দুটি চোখ তুলে, করুণ যন্ত্রণায় তাকিয়ে থাকা সেই মুখ, আলুথালু চুলে থামের আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকা সেই মুখ, একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গিয়েও আবার ভেসে উঠল। কি যেন বলতে চাইছে সেই মুখ, সেই চোখ দুটি। গ্রেবার অস্থির হয়ে উঠল। এমন হচ্ছে কেন? এত বেশী বেশী করে আজ এই মুহূর্তে তাকে মনে পড়ছে কেন? এলিজাবেথ! এলিজাবেথ! তোমার কি হয়েছে - তুমি ভালো আছো তো। কোন ভয় নেই। আমি তো তোমার আশে পাশেই আছি সর্বক্ষণ। কিছু ভেবোনা। ভাল থেকো। আমিও ভাল আছি।

'এই সাঙাৎ! চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবছো অতো?'

সোয়েরের ডকে বাস্তবে ফিরে এলো গ্রেবার। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে তার। তবু আচ্ছন্নতা পুরোটা বোধহয় কেটে যায়নি তার। সোয়েরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি তো অনেক দিন বিবাহিত, তাই না?'

'হুঁ, তা বছর পনেরো তো বটেই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

'আচ্ছা, প্রথম দিকে, নতুন বিয়ের পর, তোমার মনের ভাব কেমন ছিল?'

'ওরে বাবা! সে সব কথা কি এখনও মনে আছে নাকি?'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হতো না, কোথাও যেন একটা নোঙরের সঙ্গে তুমি বাঁধা আছো। শত কাজের মধ্যেও বারে বারে কি মনে হতো না যে তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে, যেখানে বসে আছে একজন তোমারই প্রতিক্ষায়!'

'তা তো হতোই। এখনও হয়। বিশেষ করে যখন নতুন ফসল বুনবার সময় হয়। সময় মত চাষ না করতে…

চাষবাসের কথা নয় সোয়ের, তোমার স্ত্রীর কথা বলছি আমি।' গ্রেবার হঠাৎ মাত্রাহীন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

সোয়ের বেশ অবাকই হলো প্রথমটা। তারপর সামলে নিয়ে ব্যাঙের স্বরে বলল, 'বললাম তো, বউ আর চাষবাস পরস্পরের পরিপূরক। ইমেরমানকে জিজ্ঞেস করো! সে বলতে পারবে যত সব মেয়ে বউদের কথা।'

'শালা শুয়োর।' গ্রেবার খিস্তি করে উঠল, 'ওই শালা কম্যুনিষ্টরা ভাবে সবাই বুঝি একরকম। পৃথিবীতে আর কোনরকম কোন কিছু নেই।'

সোয়ের মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

□ ছাব্বিশ □

এখন আর পরস্পরকে কেউ চিনতেও পারছে না। হেলমেট বা মাথার লোহার টুপী দেখে আন্দাজ করে নিচ্ছে, অথবা গলার স্বর কিংবা ভাষা শুনে তবে বুঝতে পারছে নিজেদের দলের সৈন্য কিনা। টেঞ্চগুলোর আর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এমন কি বাঙ্কারগুলো পর্যন্ত গোলা বর্ষনের চোটে ফুটিফাটা হয়ে গেছে। ফলে ক্রমাগত এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে এক একটা আড়াল খুঁজে নিতে হচ্ছে। মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে গোলা বর্ষণের কান ফাটানো শব্দ, আর রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকার বিস্ফোরণের ক্ষণিক আলোতে শুধু দেখা যাচ্ছে ছিটকে উঠছে তাল তাল কাদার ফুলঝুরি। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে যে আকাশটা যেন অনেকখানি নিচে নেমে এসে তারাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে পৃথিবীর ওপর। আর সেগুলো তুমুল হট্টরোল তুলে ফেটে পড়ছে, ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা সৃষ্টি করছে।

সার্চলাইটের তীব্র রেখা বুলেটের মত গিয়ে আকাশের চারপাশে বিদ্ধ হচ্ছে। বোমারু বিমান তার আওতায় এলেই নিচ থেকে বিমান-ধ্বংসী কামানগুলো থেকে গোলা ছুটে গিয়ে কখনও কখনও এক একটাকে ঘায়েল করে দিচ্ছে। আর জ্বলন্ত বিমানটি রাশিরাশি কালো ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন উদ্গীরণ করতে করতে আছড়ে পড়ছে কাদা মাটির মধ্যে। শেষ মুহূর্তে ওইসব বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া শত্রু সৈনিকরা মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে প্যারাশুটে করে নামবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশীর ভাগই ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলিতে শূন্যেই ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

আজ নিয়ে বারো দিন। একটানা যুদ্ধ চলছে। প্রথম দিকে দিন তিনেক তো সীমান্ত ঠিকই ছিল। ছোট ছোট বাঙ্কারগুলোর গোলাবারুদ সব অক্ষতই ছিল।

কিন্তু এই অবরোধ ভেঙ্গে যেতে বেশী দেরী হল না। সীমান্ত ছারখার করে দিয়ে দুরন্ত বেগে এগিয়ে এল রাশিয়ান সাঁজোয়া বাহিনী। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে বেশ কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকেও ফের যেন আত্মরক্ষা করবার তাগিদেই ফিরে চলে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল বেশ কয়েকটা ট্যাংক তখনও জ্বলছে। একটা বড় আকারের ট্যাংকতো একেবারে উল্টে গিয়ে পড়ে আছে বিশাল জন্তুর মতো। এখন প্রধান কাজ রাস্তা তৈরী আর টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা। সামরিক বিভাগের শ্রমিকদের একরকম জোর করেই পাঠানো হলো কাজে। কিন্তু খোলা মাঠ? কোন অবরোধ নেই। আত্মরক্ষারও কোন উপায় নেই। ফলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অর্ধেক শ্রমিক সাবাড় হয়ে গেল। এর মধ্যেই বোমারু বিমানের ঝাঁক একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে এসে যতগুলো ছোট ছোট বাংকার ছিল, সবকটা ধ্বংস করে দিল। দেয়ালগুলো কেবল একটু আড়াল হয়ে রইল বটে, তাও হপ্তা খানেকের বেশী নয়। তারপর দিন রাত থেকেই প্রচণ্ড আক্রমন শুরু করল রাশিয়ানরা, আর সেই সঙ্গে শুরু হলো অঝোর বৃষ্টি। থামার কোন লক্ষণই নেই। কলকল করে জলের স্রোত বইতে লাগল! বুঝি বা মহা প্লাবনই শুরু হলো। নিজেদের সৈনিক বন্ধুদেরই চেনা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার তাগিদে, ঘন কাদা জলের মধ্য দিয়ে সাপের মতো বুকে হেঁটে বা ক্রশ করে করে ওদের সবাইকে এগোতে হচ্ছে। দুটো বাড়িতে ওদের পুরো বাহিনী এখন আশ্রয় নিয়েছে। একটা বাড়ির দায়িত্বে আছে কম্যাণ্ডার রয়, আরেকটাতে লেফটেন্যাণ্ট মাস। কয়েকটা বেসিনগান আর জনাকয়েক বোমা ছোঁড়ায় অভিজ্ঞ সৈনিক মাত্র রয়েছে। অবরোধ বলতে এটুকুই। খুবই করুণ অবস্থা জার্মান বাহিনীর।

এবং তিন তিনটে দিন বাড়ির মধ্যে এভাবেই চলে গেল। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো সামরিক সম্ভার কিছুই আর এখন নেই বলতে গেলে। এই অবস্থায় রাশিয়ানরা যদি এগিয়ে আসতো তাহলেই কেল্লা ফতে করে দিতে পারতো। কিন্তু কেন যেন যেন আক্রমন করল না। দুটো জার্মান বিমান পরদিন বিকেলে কিছু গোলা এবং অস্ত্রশস্ত্র, আর সেই সঙ্গে খাবার দাবারও কিছু ফেলে দিয়ে গেল। তারপর সিমেণ্ট, বালি, লোহার সরঞ্জামও এলো ঢালাইয়ের জন্যে। সারা রাত জেগে রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলল। কিন্তু অকস্মাৎ শেষ রাত্রে প্রচণ্ড আক্রমন শুরু হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে গেল জার্মান বাহিনী! সাঁজোয়া বাহিনী এলে শব্দ পাওয়া যেতোই। কোন রকম প্রস্তুতির আভাসও পাওয়া যায়নি। অথচ অবরোধ সীমানার মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূর থেকে আধো-আঁধারিতে যেন মাটির মধ্য থেকে তেড়ে ফুঁড়ে উঠে একের পর এক হ্যাণ্ড গ্রেনেড বা হাত বোমা গুলো ছুঁড়ে মারতে লাগল।

হঠাৎ বিস্ফোরনের চকিত চোখ ধাঁধানো আলোতে গ্রেবার তার পাশের এক সৈনিকের দিকে তাকালো। মুখটা হাঁ করে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

মাথায় অবশ্য হেলমেটটা আছে। গ্রেবার মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়েই বাচ্চা রঙরুটটার মুঠো থেকে হাতবোমাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল শত্রু সৈন্যের দিকে। প্রচণ্ড শব্দে আকাশ-মাটি কেঁপে উঠল। 'বোকা হাঁদা কোথাকার! এইভাবে কেউ পিনটা খোলে?' প্রচণ্ডভাবে ধমকে উঠল গ্রেবার। 'এই দ্যাখো, এই রকম করে পিনটা কেবল আলগা করে দেবে, কক্ষনো টেনে বার করে ফেলবে না। তারপরেই ছুঁড়ে দেবে।'

গ্রেবারের কথা শেষ হতে না হতেই একটা রাশিয়ান গ্রেনেড সোজা ওদের দিকে উড়ে এল। বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল তার। আসন্ন মৃত্যুর নির্মম চেহারাটা ভেসে উঠল মুহূর্তে। পলক ফেলার আগেই সে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিয়ে একপাক খেয়ে ঘুরে কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। পরক্ষণের বিস্ফোরণের ধাক্কায় তার দেহটাকে কাদার মধ্যে কে যেন ঠেসে ধরল। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হলো মেদিনী কাঁপিয়ে। কোনমতে কাদা থেকে উঠে সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'একটা গ্রেনেড দাও। তাড়াতাড়ি।' কিন্তু কোথায় কে? উত্তর না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল বাচ্চা রঙরুটটার কোন পাত্তাই নেই আশেপাশে।

কিন্তু এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। পালাতেই হবে। অতি সাবধানে গর্ত থেকে বেরিয়ে বন্য জন্তুর মতো চুপচাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পেছন দিকে এল করে করে সরে গেল সে জায়গা থেকে। একটা প্যারাস্যুট জ্বলছে। তার আলোতে দেখতে পেলো রঙরুটটার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। মনে হচ্ছে যে একেবারে বেচারার গায়ের ওপর এসে পড়েছিল গ্রেনেডটা। হ্যাঁ, তার ওপরেও পড়তে পারতো বোমাটা কিন্তু সে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। মনটা ভারি বিষণ্ণ হয়ে গেল তার।

ঝড়ের বেগে মেশিনগানের গুলি চলছে দুপক্ষ থেকেই। এখন মাথা তুললেই শেষ। আরেকটা গর্তের সোজাসুজি মাথাটা রেখে চুপচাপ পড়ে রইলো গ্রেবার। এখানে থাকা এখন অবশ্যই বিপজ্জনক। অবরোধের অন্যধারে যে করেই হোক পেঁছতেই হবে। কিন্তু চোখে যে সব ঝাপসা দেখছে সে। তারমধ্যে যন্ত্রনায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এবার কি তাহলে সেই শেষ ক্ষণ এগিয়ে এল! তখনই মনের চোখের পর্দায় ভেসে উঠল একটা নিটোল মুখ। টানা টানা দুটি চোখের কোলে প্রতীক্ষার অধিরতা। মনটা বড্ড দমে গেল। তবু ওর জন্যেই তো তাকে বেঁচে থাকতে হবে, বাঁচতেই হবে।

বুকে হেঁটে হেঁটেই গর্তের পর গর্ত পার হয়ে এগিয়ে চলল সে। একটা গর্তে দেখল তাদেরই দুজন সৈনিক মরে পড়ে আছে। একটু থেমে গেল গ্রেবার। খানিক দূর থেকে শিষের মত শব্দ করে একটা রাশিয়ান গ্রেনেড কোথায় গিয়ে পড়ল শুনতে পেলো সে। মাথা তোলার উপায় নেই যে দেখবে! কিন্তু ওরা আক্রমন চালাচ্ছে এবার দুদিক থেকে। তাদের পক্ষ থেকে অনবরত আগুন ছুটিয়ে চলেছে কয়েকটা

মেশিনগান। হাতবোমার শব্দ এখন আর ততটা শোনা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তাদের পক্ষের মেশিনগানের আওয়াজে কান যেন বধির হয়ে যেতে লাগল। গ্রেবার তবু এগোতে লাগলো। রাশিয়ানরা যে ফের ফিরে আসবেই, তাতে সন্দেহ নেই তার মনে। এই সময় আবার ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হলো। খানিক পর মেশিনগানের শব্দ থামতেই ভারি কামানের গোলার শব্দে ভয়ংকর ভাবে কেঁপে উঠল মাটি, আকাশ। তাদের আশ্রয় নেবার বাড়িটার একটা বড় চাঁই শূন্যে লাফিয়ে উঠেই একদিকে ছিটকে পড়ে গেল। একটা বিষন্ন সকাল এলো রক্তাক্ত মেঘপুঞ্জ ফুঁড়ে।

সকালের রোদ উঠবার আগেই গ্রেবার পালিয়ে যেতে পারলো নিজেদের এলাকাতে। পথে দুজন রঙরুট আর সোয়েরের সঙ্গে দেখা হলো। নাক দিকে দরদর করে রক্ত পড়ছে সোয়েরের। রঙরুট একজনের তো পেটটা ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে। তার ওপর বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। পেটটা যে বাঁধবে, তেমন কিছুও নেই কারো কাছে। আর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবার সময়ও এখন নয়। এখন তাড়াতাড়ি মরে গেলেই রেহাই পেয়ে যায় বেচারা। দ্বিতীয়জনেরও একটা পা জখম হয়েছে মারাত্মকভাবে। খানিক দূরে একটা ট্যাংক জ্বলছে। মাঝখান থেকেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে একেবারে। তার পাশে পড়ে আছে একজন মরা সৈনিক। মুখটা পুড়ে, ঝলসে একেবারে কালো হয়ে গেছে। তার মধ্য থেকে সাদা দাঁতের সারি যেন দুনিয়াটাকে ভেংচাচ্ছে।

বাঁ দিকের বাংকারের আড়াল থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এসে বলল, 'সবাই বাংকারের ধারে গিয়ে দাঁড়াও।' গ্রেবারকে লক্ষ্য করে বলল, 'বাকি সব গেল কোথায় ?'

'তা তো বলতে পারবো না।'

'মারা গেল ক'জন তাও জাননা ?'

'না।'

সোয়ের প্রশ্ন করল, 'ওষুধ পত্র কিছু আছে কি আমাদের ?

'কি জানি থাকতেও পারে।' বলে অফিসার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল।

'আমরা ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ফিরে আসব এখনই।' গ্রেবার নাড়িভুঁড়ি বেরোনো রঙরুট সৈনিকটাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তোমাকে বয়ে নিতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। আর ব্যাণ্ডেজ না বেঁধে তো যাওয়াও যাবে না।'

বিষন্ন করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু ছেলেমানুষ রঙরুট সৈনিকটি। কথা বলবে কি, সামান্য নড়তেই যন্ত্রনায় কেবল একবার কেঁপে উঠল তার শুকনো ঠোঁট দুটো। গ্রেবার মুখ ফিরিয়ে পা ভাঙ্গা রঙরুটটিকে ধরে বললো, 'আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে চেষ্টা কর। চলো।'

বোমার আঘাতে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। সেগুলো এড়িয়ে সাবধানে রঙরুট

ছেলেটাকে নিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। বেশ দেরীই হয়ে গেল ঘাটিতে পেঁছতে। ছেলেটাকে নামাতেই সে চেঁচিয়ে উঠল যন্ত্রনায়। গ্রেবার তবুও তাকে একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে পাশে রাখল যাতে সহজেই দৃষ্টি পড়ে। দুটো রাশিয়ান সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে পাশেই। নিজেদের সৈন্যের কয়েকটা মৃতদেহের সঙ্গে কয়েকটা রাশিয়ান সৈন্যের মৃতদেহকেও তুলে আনা হয়েছিল।

কম্যাণ্ডার রয় বেশ আঘাত পেয়েছেন। বাঁ হাতে বড়সড় ব্যাণ্ডেজ। ওদিকে ক্যানভাস শিটের ওপর তিনজন আহত সৈনিক শুয়ে আছে। আরও ঘণ্টাখানেকের পর একটা জার্মান বিমান উড়ে এসে কিছু পরিমান ওষুধের প্যাকেট ফেলে দিয়ে গেল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য। অর্ধেকই গিয়ে পড়ল রাশিয়ানদের নাগালের মধ্যে। অনেক হ্যাপা করে তরে বাকি অর্ধেক উদ্ধার করা গেল।

ধুকতে ধুকতে এসে পেঁছল সাতজন সৈনিক। সর্বাঙ্গে তাদের কাদা মাখা। বুঝিবা কবর ভেদ করে উঠে এসেছে ভূত সব। একটা ভাঙ্গা বাঙ্কারের ভেতর থেকে কয়েকটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। লেফটেন্যাণ্ট মাস আর নেই। সার্জেণ্ট মেজর রেইনেকের ওপর এখন যুদ্ধ চালাবার ভার পড়েছে। অস্ত্রশস্ত্র প্রায় নিঃশেষ। গোটা কয়েক হালকা মেষিনগান আর দুটো ভারে মেশিনগান চালু আছে মাত্র।

মৃতদেহ উদ্ধারকারীদের একঠা দল সামান্য কিছু গোলা বারুদ আর টিনের খাবার নিয়ে এলো। একটা স্ট্রেচারও সঙ্গে এনেছে তারা। সঙ্গের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটাতে আহতদের একে একে তুলে নিল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! শ'খানেক গজ গেছে কি না গেছে গাড়িট, অমনি একটা কামানের গোলা এসে পড়ল। গাড়িটাকে দেখা গেল ছিটকে বেশ খানিকটা ওপরে উঠেই মাটিতে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বৃষ্টিটা একটু কমে এল দুপুরের পর। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য দেখা দিল। কেমন একটা গুমোট গরমে সবাই হাঁসফাঁস করতে লাগল। কম্যাণ্ডার রয় ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই নামিয়ে নিলেন দৃষ্টি। 'এবার ওরা বোধহয় হালকা ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমন করতে এগিয়ে আসবে। যাকগে ছাই। ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানগুলোকে এখনই প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে দাও।'

আবার শুরু হলো যুদ্ধ। বিকেলের দিকে জাঙ্কার বিমান এলো খাবারের প্যাকেট সাপ্লাই দিতে। জাঙ্কারটাকে ঘিরে জার্মান বোমারু বিমান মেসারমিৎস রয়েছে কয়েকটা। ঘিরে নিয়ে আসছে জাঙ্কারটাকে। তার মধ্যেই দুটো ঘায়েল হয়ে গেল রাশিয়ান গোলায়। খুবই দ্রুতগামী বিমান এই জার্মান মেসারমিৎস গুলো। কিন্তু হলে হবে কি? অনেক বেশী সংখ্যক রাশিরান বোমারু বিমান আকাশে ঘুরছে। খাবার দাবার কোনমতে নামিয়ে দিয়ে জার্মানদের পেছু হটে

যেতেই হলো।

পরদিন সকাল থেকেই দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠল। চারপাশে ছড়ানো এতগুলো মৃতদেহ কেই বা সরাবে বা সৎকার করবে। লেফটেন্যান্ট রেইনেক সবাইকে যখন একত্রিত করলেন, দেখা গেল সাকুল্যে বেয়াল্লিশ জন বেঁচে আছে। বাদবাকী সকলেই মরেছে, নয়তো আহত হয়েছে। এবং তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সওয়া শ' বা একশ' পঁচিশ জনের মতো।

রাইফেলটার নলের মধ্যে কাদা ঢুকে গেছে। দুপুরের খাওয়ার পর গ্রেবার সেটা পরিষ্কার করতে করতে কত কি যে ভাবছিল। তবে ভাবনার কোন ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল না। বর্তমানও না অতীতও না। সেও যেন একটা যন্ত্র-মানুষ হয়ে গেছে। যন্ত্রের মতোই সব কিছু করে চলেছে। একটা সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। আবার জাগলো। তারপর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামের মুখোমুখি হতে তৈরী হয়ে নিল।

রাত শেষ হতে না হতে ট্যাঙ্ক নিয়ে রাশিয়ানরা ফের আক্রমন শুরু করল। রাতের অন্ধকারে অবশ্যই তারা অর্ধচন্দ্রাকারে কামান, মেসিনগান ইত্যাদি নিয়ে ব্যূহ রচনা করে তৈরী হয়েই ছিল। টেলি যোগাযোগ ঠিক করবার যত চেষ্টা করেছে গ্রেবারেদের বাহিনী ততই রাশিয়ানরা সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। জার্মানদের গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থা এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনী যেন তা টের পেয়েই পরের পর আক্রমন করে চলেছে। জার্মানদের বাঙ্কারটি এখন আর কোন আড়াল নয়। দুটো গোলাতেই খতম হয়ে গেছে। কেবল একপাশের দেওয়ালটা নড়বড়ে হয়ে দুলছে, যেন ঝড়ের মুখে অসহায় জাহাজ।

কাঁধে একটা ক্ষত হয়েছিল গ্রেবারের। বাঁধবার অবকাশ আর হয়নি। যন্ত্রনা হচ্ছেই। কইনাকের বোতলটা পেছন পকেট থেকে বার করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল সে। যন্ত্রনা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় এখন। মুহুর্মুহু গোলা ছুটে আসছে। আর একটা গোলা এসে পড়তেই বাঙ্কারটার গোড়াতেই একটা ফাটল ধরে গেল। এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যেন ছোট পানসিটা ঢেউয়ের মুখে উঠেই এবার অতলে তলিয়ে যাবে। তখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। যদিও জার্মান বাহিনীর ক'জন যে যার মত পজিশন নিয়ে সতর্কই আছে। এর মধ্যেও ভাবনা চিন্তার বিরাম নেই গ্রেবারের। একেকবার তার নিজের মনেই সন্দেহ জাগছে যে সেকি সত্যিই ছুটিতে গিয়েছিল? একটা শহরে ছিল এই কদিন আগেও, যেখানে তার এলিজাবেথ ছিল, এখনও নিশ্চয়ই আছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরনের শব্দে হঠাৎ তার ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেল। বাস্তবে ফিরে এল সে, অলস স্বপ্ন দেখার কোনই সুযোগ নেই এখানে। এতটুকু অসতর্কতা মানেই অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যুটা এখানে

ঘোর বাস্তব, স্বপ্ন নয়।

রাশিয়ানরা লাইট ট্যাংকগুলো নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। সেগুলোর আড়ালে তাদের পদাতিক বাহিনীর দলও এগোচ্ছে। ট্যাংকগুলোকে ছেড়ে দিয়ে জার্মানরা পদাতিক বাহিনীর ওপর হামলা চালালো। মেশিনগান চলছে দু'পক্ষ থেকেই সমান বেগে। তারপর যেইমাত্র ট্যাংকগুলো কামানের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল, অমনি গোলা চালালো জার্মান বাহিনীর গোলন্দাজরা। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান ট্যাংকগুলো থেকেও সগর্জনে গোলা ছুটে আসতে লাগল। হয়তো আচমকা কোন গর্তে পড়ে দুটো ট্যাংক অকেজো হয়ে গেল রাশিয়ানদের। কিন্তু অন্যগুলো সমান তালে এগিয়ে আসতে লাগল। আত্মরক্ষার কথা যেন ভুলেই গেল রাশিয়ানরা। হুড়মুড় করে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জার্মান বাহিনীর ওপর। একেবারে দুর্ভেদ্য রাশিয়ানদের ট্যাংকবাহিনী। মেশিনগানের গুলি তাদের আটকাতে পারছে না! আটকানো যায় যদি ট্যাংকের ছোট ছোট ফুটোর মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ট্যাংকগুলো যেভাবে কায়দা করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে, তাতে নিশানা ঠিক করে তাদের বাধা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দুটো ট্যাংক তো মরিয়া হয়ে গোলা বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছে প্রচণ্ড গতিতে। হঠাৎ আর একটা গোলা এসে পড়ল বাংকারটার গায়ে! মুহূর্তের মধ্যে শেষ দেওয়ালটাও আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

রেইনেক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কয়েকটা গ্রেনেড দাও আমাকে।' তারপর গ্রেনেড-গুলোকে তারের সঙ্গে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন ছুটন্ত ট্যাংকগুলোর দিকে। বুকে হেঁটেই এগোচ্ছেন উনি। দুরন্ত সাহসের কাজ। গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরে ট্যাংক দুটো উড়িয়ে দেবার জন্যই সাক্ষাৎ মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাই দেখে কম্যাণ্ডার রয় ভারি মেশিনগান দিয়ে ট্যাংকদুটোকে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। লেফটেন্যাণ্ট রেইনেককে বাঁচাবার জন্যই। ভারি মেশিনগান গর্জে উঠল। রেইনেকের মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টিধারার মতো গুলি চললো।

দানবের মতো ট্যাংকদুটোর গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। চিৎকার করে সাবাশ দিলেন রয়। "বাঃ দারুন!" ইমেরমানের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'সত্যি তোমার তুলনা নেই ইমেরমান! নিপুন লক্ষ্যভেদ তোমার।' যথার্থই ইমেরমান তখন যেন সত্যিই কম্যুনিস্টদের কচুকাটা করে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে। মেশিনগানের মুখটা যেই মাত্র দ্বিতীয় ট্যাংকটাকে লক্ষ্য করে ঘুরছে, অমনি সেটা পাক খেয়ে চলে গেল গুলির নিশানার বাইরে।

'আবার ফিরে আসবে ব্যাটারা। কিন্তু আপাততঃ ছ'টা ট্যাংককে ধ্বংস করা গেছে, এটা কম লাভ নয়।' কম্যাণ্ডার রয় এবার ঘুরে অর্ডার দিলেন, 'ওদের

পদাতিক বাহিনীকে এবার আক্রমন কর।'

এবার একটু দম নেবার অবকাশ পেলো ইমেরমান। 'কিন্তু রেইনেক কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না।'

তার প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না। রেইনেক আর ফিরেও এলেন না।

গোটা বিকেল জুড়ে লড়াই চললো। অবরোধ বলতে এখন আর কিছু নেই। সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলছে অনেকটা ধীর লয়ে। যদিও অবিরাম। গোলা বারুদ গুলির আর বিশেষ সঞ্চয় নেই। বুঝে শুনে খরচ করতে হচ্ছে। সৈন্যদের অবস্থাও কাহিল। ক্লান্তির চরম সীমায় পেঁছে গেছে সবাই। যাহোক। টিনের খাবার মজুত ছিল। তাই একে একে খেলো সবাই। গোলার আঘাতে যে গর্ত-গুলো হয়েছিল, সেই গর্তে জমেছিল বৃষ্টির জল। সেই জলই খেতে হলো সবাইকে। ওদিকে হার্শল্যান্ডের বাঁ হাতে একটা গুলি লেগে বেশ জখম হয়ে গেছে বেচারা।

বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যের তেজ মাথা গরম করে দিচ্ছে। বিশাল আকাশটা যেন সব শুদ্ধ মাথার ওপর এসে ঝুঁকে পড়েছে। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। বাংকারের চারপাশে আহত নিহত মানুষের রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মরা দেহ গুলো তো পচে ফুলে উঠেছে সব। সন্ধ্যে নামতে না নামতেই ফের জোর আক্রমন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে হঠাৎই সব থেমে গেল। কেমন যেন একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা নেমে এলো চারিদিকে। সবাই অবশ্য নবতর আক্রমনের জন্য তৈরী হয়েই আছে। কিন্তু দু'ঘণ্টার মত কেটে গেল। ফিরে আক্রমন হলো না। কেমন একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। অসহনীয়। গোলা বারুদের তুমুল শব্দে অভ্যস্ত কানের ওপর এখন এই নীরবতার বোঝা যেন আরও আতঙ্ককর হয়ে উঠেছে।

রাশিয়ানরা ফের আক্রমন শুরু করল। এদের কাছে তখন মাত্রই দুটি মেশিন-গান সম্বল। আত্মরক্ষা করতে লাগল ওরা কোন মতে। কিন্তু ক্রমেই ওদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগলো। অবরোধ ভেঙ্গে রাশিয়ানরা এগোতেই লাগল। শেষ অবরোধটাও বুঝি এবার ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ মেশিনগানের একটা গুলি এসে আচমকা সোয়েরের মাথাটাকে চুরমার করে দিয়ে গেল। ঢলে পড়ল সোয়ের। শেষ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। ওদিকে গুঁড়ি মেরে মেরে পেছিয়ে আসছিল হার্শল্যান্ড। হঠাৎ তার দেহটা একটা ঝটকা খেয়ে ওপর দিকে উঠে আছড়ে পরে স্থির হয়ে গেল। গ্রেবার অতিকষ্টে তাকে টেনে নিয়ে এসে দেখল গুলিতে গুলিতে ঝাঝরা হয়ে গেছে তার বুকের খাঁচাটা। রক্তে ভিজে গেছে তার পকেটে রাখা কাগজপত্রগুলো। যাক এ একরকম ভালই হলো, মনে মনে ভাবল গ্রেবার, নতুন করে ওর মাকে আর সন্তানের মৃত্যু সংবাদ জানাবার দরকার পড়বে না।

নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে পেছু হটে আসতে বাধ্য হলো গ্রেবাররা শেষ রাতের দিকে। আদেশ পেঁছবার আগেই দু'জন খতম হয়ে গেছে। মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিল ১

তিনজন। তুলে নিয়ে যাবার সময় তাদের একজনও শেষ হয়ে গেল। তখন বাহিনীটাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। সবাইকেই অবশ্য পেছিয়ে আসতে হলো কয়েক কিলোমিটার। আবার বাহিনীর সবাইকে একত্র করা হলো। মাত্র তিরিশজন টিকে আছে। রঙরুটদের এনে পরদিন বাহিনীতে ফের পুরে দিতে একশ' কুড়ি জনই দাঁড়াল। ফ্রজেনবুর্গ আহত হয়েছে শুনে গ্রেবার অস্থায়ী একটা তাবুর ফিল্ড হাসপাতালে দেখতে এলো। বেচারার বাঁ পা-টা ভালোমতোই জখম হয়েছে দেখা গেল।

'যত শালা হাতুড়ে ডাক্তারের দল, কাটাকুটি ছাড়া আর কোন চিকিৎসার জ্ঞান নেই, বলে কিনা পা'টাকে কেটে বাদ দিতে হবে। আমি অবশ্য শহরের হাসপাতালে যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করেছি। বড়, অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়ে নিই আগে। তারপর যা হয় হবে।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল ফ্রজেনবুর্গ গ্রেবারকে দেখে। তার মুখে অবশ্য চেষ্টাকৃত একটা তেতো হাসি। কাঠের খুঁটির সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা খাটিয়াতে পড়ে আছে সে। কম্যান্ডারের পোশাকটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। মাথার কাছে তাঁবুর ছোট জানালাটা খোলা। দেখা যাচ্ছে এক টুকরো সবুজ মাঠ যতদূর দৃষ্টি যায়। মাঝে মাঝে হলদে-সাদা বুনো ফুলের ঝোপ হয়ে রয়েছে। অন্যদিকেও একটা ছোট জানালা। তার নীচে আর দুটো খাটিয়া। গ্রেবার ভেতর বাইরে দেখছিল।

ফ্রজেনবুর্গ প্রশ্ন করলো, 'রয়ের খবর কি, গ্রেবার?'

'গুলি খেয়েছেন হাতে। চোটটা বেশ ভালই।'

'হাসপাতালে গেছে নাকি?'

'না, না, বাহিনীতেই আছেন।'

'এটাই তো স্বাভাবিক, বুঝলে', ফ্রজেনবুর্গের মুখে একটা বিষন্ন হাসির রেখা, 'এমন অনেকেই আছে, জানো, যারা আর ফিরতে চায় না। আমার তো ধারণা যে রয়ও ফিরবে না।'

'কেন? এমন ধারণা হলো কেন?'

'আহা, কোন আশা ভরসা তো এখন কিছু নেই। বিশ্বাস একবার হারিয়ে ফেললে ফেরানো মুশকিল।'

'গ্রেবার খানিকটা অবাক হয়েই ফ্রজেনবুর্গের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর প্রশ্ন করলো, 'আর তোমার কি ইচ্ছা?'

'ঠিক বলতে পারছি না এই মুহূর্তে। আমার প্রথম চিন্তা এখন এই পা নিয়ে, একটা ব্যবস্থা তো করতে হবেই। তারপর ভেবে দেখবো।' বলতে বলতে দূর মাঠের দিকে তাকালো। তখনই এক ঝাপটা উষ্ণ বাতাস তাবুর ভেতর ঢুকে নাচতে লাগলো। ফ্রজেনবুর্গের শুকনো মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো, 'দেখো, কি আশ্চর্য!

এক সময় যখন ঠাণ্ডায় বরফ জমে জমে পাহাড়ের মতো হয়ে যেতো দিনের পর দিন, তখন মনে হতো এই হারামজাদা শীত বোধহয় আর কমবে না। একটু উষ্ণ হাওয়ার জন্য প্রাণ আকুপাকু করতো। আর যখন সত্যি সত্যিই আজ গরমকাল এসে গেল, তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা ?'

'থাক ওসব কথা', ফ্রজেনবুর্গ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তোমার বাড়ির খবর টবর কি বলো ?'

গ্রেবারেও বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো : 'কি করে বলব। কিছুই যে জানি না। ছুটিতে যাবার আগে পর্যন্ত বাড়ির খবরে একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন যেন আসল বাস্তব থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি। সবাই যেন কেমন অচেনা ঠেকছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আবার ফিরে এসে যেন বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে। কিছুতেই আর একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারছি না।'

'যে পরিস্থিতিতে পড়েছ, সেখান থেকে বাস্তবকে চিনতে পারা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।'

কিন্তু প্রথম প্রথম তো মনে হতো যে আসল ব্যাপারটাকে আমি ঠিকই খুঁজে নিতে পারবো। এমন কি দৃষ্টি থেকে ফেরার পরও তো ভেবেছি যে কিছুতেই আর অহেতুক মানুষ খুনের মধ্যে যাবনা।'

যন্ত্রনার একটা ধাক্কায় ফ্রজেনবুর্গের মুখটা বিকৃত দেখাল ক্ষনেকের জন্য। 'কত জনই তো এসব কথা ভেবেছে, ভাবে।'

গ্রেবার উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি ?'

ফ্রজেনবুর্গ উড়িয়ে দেবার স্বরে বলল, 'কিছু না, কিছু না, বাদ দাও। মরফিন তো ভরেই দিয়েছে শরীরে। শীগগিরই এই যন্ত্রনা কমে যাবে। একটু পরেই নেমে আসবে ঘুম। তার আগে যতক্ষণ হুঁশ আছে, একটু ভাবনা চিন্তা অন্তত করে নিই।'

'কিন্তু তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা করেছো ?'

'অ্যাম্বুলেন্স আসবে। কালই এসে যাবে হয়তো।'

'তাহলে তো আর আমাদের বেশ কিছুদিনের জন্য দেখা সাক্ষাৎ হবে না।'

ফ্রজেনবুর্গ তিক্ত হেসে বললো, 'হবে, হবে। তুমি দেখে নিও। ব্যাটারা ঠিক জোড়াতালি দিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েই এখানে ফের ঠেলে পাঠিয়ে দেবে।'

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। মনে মনে তো দুজনেই জানে যে কথাগুলো মোটেও সত্যি নয়।

গ্রেবার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'এরপর কি করবে না করবে কিছু ভেবেছ কি ?'

'দেখো, সেটা তো আমার ওপর নির্ভর করছে না। কারণ অপরেরা যে কি

করবে আমাকে নিয়ে তাইই তো আমার জানা নেই। আগে তো সেই ব্যাপারটা দেখতে হবে আমাকে। আমি কি কোন দিন ভেবেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত আমার এই দশা হবে? আমার কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে আমি শত্রুদের হাতে বন্দি হয়ে যাবো কিন্তু হলো কি? পুরোটা নয়, অর্ধেকটা ধরা পড়ে গেলাম। এখন তো নিজেই ভাবতে পারছিনা আমি যে কতটা দাম দিতে হবে আমাকে এরজন্যে। কি আছে ভবিতব্যের গর্ভে আমার জন্যে।' বলতে বলতে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল ফ্রজেনবুর্গ। খানিক থেমে আবার বলতে লাগল সে, 'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার আর্নষ্ট, এখন আমার সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি। পা'টা আমার হয়তো কেটে বাদ দিয়েই দেবে, আমি খোঁড়া হয়ে কোন মতে বাকি জীবনটার বোঝা বয়ে যাব—নাহ্। তার আগে প্রান ভরে একটু ঘুম চাই আমার, আর্নষ্ট, আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

'বেশ, তুমি ঘুমোও। আমি তাহলে চলি, লুডমিগ।' বলে ফ্রজেনবুর্গের হাতে হাত মেলানো গ্রেবার।

'ফ্রজেনবুর্গ গভীর মমতার স্বরে বলল, সব সময় সতর্ক হয়ে থেকো, আর্নষ্ট, দৃষ্টি রেখো নিজের ভালমন্দের দিকে।'

'তুমিও শরীরের যত্ন নিও, লুডোভিগ। কখনও হতাশা হয়ে পড়োনা যেন।

ঘুম নেমে আসছে ফ্রজেনবুর্গের দুচোখে। তবু চোখ খোলা রেখে অতি ম্লান হাসি মুখে টেনে এনে বলতে লাগল সে, 'আমাদের জীবনটাই তো আকস্মিকতায় ভরা আর্নষ্ট। তাই না? আমি এখন সেই আকস্মিকতার ধারায় বহে চলেছি। যখন সুস্থ ছিলাম, তখন ভাবনা চিন্তা বইতো অন্য খাতে। সেটাও যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি তা কি কেউ আমরা বুঝতে পারতাম। পারলে তো এই যুদ্ধের বিরুদ্ধেই আমরা তখন লড়ে যেতে পারতাম। আমাদের তো সেই শক্তির অভাব ছিল না। তাহলে?'

গ্রেবার সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে যেন একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠল মুহূর্তে। এইটাই তো তার সারাজীবনের একমাত্র প্রশ্ন যার উত্তর সে খুঁজে বেরিয়েছে পাগলের মতো, অথচ কোন দিশা পায়নি, মনে পড়ল সেই বৃদ্ধ হের পোলমানের কথা। হায়! না জানি এখন সেই শান্ত, ধীর স্থিতধী বৃদ্ধ কোন এক বন্দিশিবিরের অন্ধকারে বসে শেষের কটা দিন গুনে গুনে কাটাচ্ছেন। মনটা ভীষণভাবে দমে গেল গ্রেবারের। কিন্তু এখন ফ্রজেনবুর্গের শেষ কথা কটা দিন গুনে গুনে বুকের ভেতরের চাপা আগুনটা সহসা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ফের ফ্রজেনবুর্গের মুখের দিকে তাকালো। যেন নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'খুব অবাক হয়ে গেছ, আর্নষ্ট। তাই না? কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি বলছি

আনষ্ট এখনও সময় যায়নি। এখনও অবকাশ আছে, যদি আমরা হৃদয় মন দিকে চেষ্টা করি তো এমন দুর্ঘটনার অভিশাপ যাতে আবার আমাদের ওপর এসে না পড়ে তার পথরোধ করে দিতে পারি। আমি তো নিশ্চিত যে যদি দরকার হয় তো আমার শক্ত বাহুর মুঠোতে তুলে নেবো রাইফেল, ধ্বংস করে দেবো সেই সব অনাচারীদের শক্তির স্তম্ভগুলো।' বলতে বলতে উত্তেজনার আধিক্যে চোখ বুজে পেছন দিকে হেলিয়ে দিল তার মাথাটা ফ্রজেনবুর্গ। বুঝিবা নিদ্রা এসে ফ্রজেনবুর্গকে শান্ত করে দিল। গ্রেবার আপলকে কতক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তারপর নিঃশব্দ ধীর পায়ে আস্তে আস্তে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। চলতে লাগল তার নিজের এলাকার দিকে।

তখন শেষ সূর্যের আলোতে রাঙা হয়ে গেছে পশ্চিমের সীমাহীন নীল আকাশ। ওদিকে, পূর্বদিকের আকাশটা তখন থরথর করে কাঁপছে কামানের গুরু গম্ভীর গর্জনে। বৃষ্টি আর হয়নি। মাঠের কাদায় টান ধরেছে। অজস্র বুনো ফুলে ছেয়ে গেছে মাঠের এই এলাকাটা। সে যেন এই পৃথিবী নয়, কোন এক অজানা রহস্যময় গ্রহে এসে পড়েছে, যেখান থেকে বাস্তব পৃথিবীটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কোন যোগাযোগই যেন নেই আর তার সঙ্গে। মাঝরাতে হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠার পর যখন তার মনে হতো কোন এক অচেনা, অজানা জগতে সে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতো কান্নার একটা ঝোঁক, একটা নিঃসঙ্গতার তীব্র বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেলতো তাকে। এ মুহূর্তে সেই অনুভবটাকে সে যেন চিনতে পারল। কোথাও যে একটা আশার প্রদীপ জ্বলছে, একথা ভেবে নিজেকে সে আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু তবুও সেই প্রদীপ শিখাকে একটু স্পর্শ করার জন্য যতবার সে এগিয়ে গেছে তবু কাছের পর্বত শিখাটা যেন আরও দূরে সরে গিয়ে তাকে উপহাস করেছে। যদিও হাল ছেড়ে দেয়নি সে। নিজেকে বুঝিয়েছে যে এটাতো কেবল তার নিজের জীবনের সুখ দুঃখের প্রশ্ন নয়। এই যে শুকনো কাদার মধ্য দিয়ে শিকড় চালিয়ে বুনো ফুলের দল নিজেদের প্রস্ফুটিত করে তুলেছে, তেমনি আশহীন, ভরসাহীন জীবনের বুক্ষে বুক্ষে একদিন তারাও ফুটিয়ে তুলবে ফুলের ঝর্ণাধারা।

এই তো তার পকেটের মধ্যেই রয়েছে ভালবাসার উষ্ণতা মাখানো এলিজাবেথের চিঠি। তবে কেন চিরদিনের মতো সব হারানোর ব্যথায় অযথা নিজেকে কষ্ট দেওয়া। এলিজাবেথ যে বেঁচে আছে তার প্রমানই তো তার এই চিঠি। এর চেয়ে বেশী আর কি চাই। মনে পড়ল জোসেফের কথা গুলো। এখন যেন আরও স্পষ্ট হলো সব তার কাছে। সে বলেছিল যে অস্তিত্ব বিপন্ন হলে, কেন হলো সে বিচারে না গিয়ে সর্বাগ্রে নিজেকে বাঁচানোটাই আসল প্রয়োজন। হ্যাঁ, তাকে বাঁচতে হবে। তবেই না সম্ভব হবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ফ্রজেনবুর্গ ঠিকই বলেছে।

তার গ্রামের ঘাঁটিটার দিকে এগিয়ে চলল সে। পরিত্যক্ত, ছন্নছাড়া একটি জায়গা। সবকটি গ্রামই এমন অবস্থায় পেঁছেচে যে, কোন দিন যে সেগুলো আবার গড়ে উঠবে, সে সম্ভাবনাই যেন নেই। সাদা ধ্বংসপ্রাপ্তপ্রায় বাড়িটাকে ঘিরে বার্চ গাছের সারি। একটা বাগান বোধহয় ছিল; ফুল ফুটেছে কটা গাছে। নোংরা ডোবাটার ধারে একটা পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটা শুকনো ফোয়ারা। এখন আর কেউ এখানে বেড়াতে আসে না। দু'জন সৈনিক ছোকরা অবশ্যই রঙরুট, চেরীগাছের নিচে বোধহয় কাঁচা চেরি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

☐ সাতাশ ☐

'নির্ঘাৎ গেরিলা', ষ্টেনব্রেনার জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বলল রাশিয়ানগুলোর দিকে তাকিয়ে। গ্রামের মোড়টাতে দাঁড়িয়েছিল ওরা। দুজন পুরুষ আর দুজন মেয়ে। একটি মেয়ে যুবতী। মুখটা গোল ছাঁদের। হনুর হাড় দুটো একটু উঁচু। সেদিন সকালেই পাহারারত প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে।

'দেখে কিন্তু গেরিলা বলে মনে হয় না।' গ্রেবার বলল।

'আমি বলছি গেরিলা। তোমার কেন মনে হচ্ছে না শুনি?'

'কারণ, গেরিলাদের মতো দেখতে নয়। গরীব চাষী বলেই তো মনে হচ্ছে আমার।'

ষ্টেনব্রেনার হেসে উঠল ' দেখেই যদি বোঝা যেতো সব তো পৃথিবীতে ক্রিমিনাল বলে কেউ থাকতো না।'

'তা তো বটেই, মনে মনে বলল গ্রেবার', তুমি নিজেই তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। সে দেখলো রয় আসছেন। 'এদের নিয়ে কি করবো আমরা?' কোম্পানী কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করল।

'ওদের এখানে ধরা হয়েছে', সার্জেণ্ট মেজর বলল, 'ওদের আটকে রেখে আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঈশ্বর জানেন, আমাদের নিজেদেরই সমস্যার অন্ত নেই। আমরা এদেরকে রেজিমেণ্টে পাঠিয়ে দিই না কেন?'

রয় কোন উত্তরের আশা করেননি। রেজিমেণ্টের নিজেদেরই থাকবার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। তাহলে কোনো না কোন সময় কেউ একজনকে পাঠিয়ে দিয়ে আদেশটা জানিয়ে দিতে পারতো। 'গ্রামের প্রান্তে একটা বাগানবাড়ি রয়েছে', ষ্টেনব্রেনার বলল, 'একটা ঘর আছে লোহার দরজাওয়ালা, তালা দেবার ব্যবস্থাও

আছে।'

রয় তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। ষ্টেনব্রেনারের মনের ভাবনাটা কি তা তিনি জানেন। এই পাষণ্ডটার ওপর ভার দিলে রাশিয়ান বন্দিদের পালাবার সুযোগ করে দেবার নামে গুলি করে মারবে এই হারামজাদাটা। গ্রামের বাইরে কাজটা তার পক্ষে আরও সহজ হয়ে উঠবে।

রয় ফিরে তাকালেন। 'গ্রেবার।' তিনি বললেন, 'এই বন্দিদের দায়ীত্ব তোমার হাতে দিলাম। জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দেবে ষ্টেনব্রেনার। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নেবে যে ঘরটা আদৌ নিরাপদ কিনা। তোমার থেকে একজনকে পাহারায় রেখে দেবে। তারপর আমার কাছে রিপোর্ট দেবে। তোমার ওপর দায়ীত্ব দিলাম। একমাত্র তোমারই সব দায়ীত্ব মনে থাকে যেন।' তিনি জোর দিয়ে বলে চলে গেলেন।

একজন বন্দি খোঁড়াচ্ছিল। বয়স্ক মহিলার পায়ের শিরা অত্যাধিক ফুলে উঠেছে। যুবতীর পায়ে জুতো নেই। গ্রামের প্রান্তে এসেই ষ্টেনব্রেনার যুবক বন্দিটার কোমরে খোঁচা দিয়ে বলে উঠল, 'এই ব্যাটা। যা, তুই, দৌড়ো, দৌড়ে পালা!'

যুবক বন্দিটা চমকে ফিরে তাকালো। ষ্টেনব্রেনার ফুঁসে উঠে অঙ্গভঙ্গী করে বুঝিয়ে বলে উঠল, 'যা, দৌড়ো, দৌড়ে পালা! তোকে ছেড়ে দিলাম। মুক্ত করে দিলাম '

বয়স্ক বন্দিটা রাশিয়ান ভাষায় তাকে কিছু বললো। যুবক দৌড়বার চেষ্টাও করল না। 'ছোটনারে গাধার বাচ্চাটা, ছোট!' বলেই বুট দিয়ে তার হাঁটুর নীচে একটা ঠোক্কর মারলো।

'থামো তো', গ্রেবার ধমকে উঠল, 'কম্যাণ্ডার রয়ের আদেশটা তুমি শোননি নাকি?'

'আরে ওসব আদেশ ফাদেশ রাখো। ওই ব্যাটা দুটোকে আমরা ছুটে পালাতে দিই না।' গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল ষ্টেনব্রেনার, 'তারপর গজ দশেক যেই যাবে অমনি গুলি করে মারব। তারপর মেয়ে দুটোকে আটকে রাখবো ঘরে। তারপর রাত্রির হলে যুবতীটাকে বার করে এনে, বুঝলে না?'

'এদের আশা তুমি ছেড়ে দাও। তারপর ফোটো এখান থেকে। ভাগো? আমি এখানে সর্বেসর্বা মনে রেখো।'

ষ্টেনব্রেনার যুবতীর পুষ্ট পায়ের গোছটার দিকে তাকালো। মেয়েটার পরনে খাটো ফ্রক। পা দুটো তার বেশ মাংসল, তামাটে রঙের। 'ওদের বাপু মেরেই ফেলবে', সে বলে উঠল, 'হয় আমরাই মারবো, নয় তো সিকিউরিটির লোকেরা। তার আগে যুবতীটাকে নিয়ে একটু ফুর্ত্তি করে নিই না কেন? তুমি তো এখন কত কথাই বলবে তা জানি। সদ্য সদ্য ছুটি কাটিয়ে মজা করে এসেছো তো!'

'চুপ করে থাকো, আর নিজের হোনেওয়ালী ছুঁড়িটার কথা বরং ভাবো, বুঝলে! কোন এস এস কম্যাণ্ডারের ডবকা কন্যাটির কথা যেন বলছিলে! গ্রেবার রসিয়ে বলল, 'রয় তো তোমাকে শুধু ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলেছে। ব্যাস্। তার বেশী কিছু নয়।'

চুপচাপ হেঁটে চলল সবাই। খানিক পর একটা সাদা বাড়ি নজরে পড়লো। 'ওই যে, ওখানে।' ষ্টেনরেনার গুমোট স্বরে বললো বাড়িটার দিকে দেখিয়ে। পাথরে গাথা বেশ শক্ত বাড়িটা। লোহার শিক দিয়ে তৈরী দরজাটা বেশ শক্ত পোক্ত। বাইরে থেকে তালা লাগালে বেশ নিরাপদ। গ্রেবার বাড়িটাকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিল। দোকান ঘর বা গ্যারেজের মতো মনে হচ্ছে ঘরটা। সিমেণ্টের পাকা মেঝে। কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া বন্দিদের পক্ষে পালানো অসম্ভব। আর তাদের শরীর তালাশ করে কোন রকম অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানও মেলেনি।

দরজা খুলে বন্দিদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে। দুজন রঙরুট রাইফেল হাতে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল। গ্রেবার দরজায় তালা লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিল। সব ঠিক আছে।

চমৎকার। একেবারে খাঁচায় বাঁদরদের মতো লাগছে। 'কিরে বাঁদর, কলা, কলা খাবি নাকিরে হুক্কুর দল।'

গ্রেবার মুখ ফিরিয়ে রঙ রুট দুজনের দিকে তাকালো ঃ তোমরা এখানে পাহারায় থাকো। এটা তোমাদের দায়িত্ব। দেখবে বেন কোন হাঙ্গামা না ঘটে। পরে তোমাদের বদলি লোক আসবে। সে রাশিয়ান বন্দিদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ জার্মান জান নাকি?'

বন্দিরা কেউ জবাব দিলনা। পরে দেখবো তোমাদের জন্যে কিছু খড় পাওয়া যায় কিনা। চলে এসো ষ্টেনরেনার।' সে ডাকল।

ষ্টেনরেনার আর সহ্য করতে পারলো না। ব্যঙ্গের স্বরে বলল, 'এক কাজ কর না, ওদের জন্যে পালকের বিছানার ব্যবস্থা করো না।'

তুমি এখন মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে। বুঝেছো।' রঙরুটদের উদ্দেশ্যে ফের গ্রেবার বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার থেকো, সব সময় নজরে রাখবে বন্দিদের।'

গ্রেবার ফিরে এলো। তারপর কম্যাণ্ডার রয়কে রিপোর্ট দিল। বললো, ঘরটা বেশ মজবুত আর নিরাপদও বটে। অন্ততঃ বন্দিদের নিজেদের উদ্যোগে পালানো অসম্ভব। রয় শুনে বললেন, 'ভাল কথা। আপাততঃ তোমার দায়ীত্বেই রইল ওরা। দরকার হলে আরও দুজন রঙরুটকে সঙ্গে নিয়ে নাও। তারপর, আমার তো মনে হয় সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমরাও সহজেই দায়ীত্ব মুক্ত হতে

পারবো। মানে, ওদের জাতভাইরা এসেই ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে। কি বল?'

'হ্যাঁ, স্যার! আমারও তাই ধারণা! আপাততঃ আমি একাই সামাল দিতে পারবো।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। আপাততঃ এর বেশী তোমাকে আর কিছু বলার নেই।' কম্যাণ্ডার রয় চলে গেলেন। গ্রেবার লক্ষ্য করল কেমন যেন একটা দুর্বলতা রয়কে চেপে ধরেছে। একটু অস্থির বলেও মনে হল তাকে। যেন একটা অজানা আশঙ্কায় তিনি আতঙ্কিত।

গ্রেবার নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিল। তার প্ল্যাটুনে আর কয়েকজনই মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইমেরমান হেসে বলল, 'তোমাকে দেখছি কারারক্ষী বানিয়ে দিল শেষ পর্যন্ত, হ্যাঁ।'

'ওই সব রঙরুটদের এই শেষ সময়ে যুদ্ধের কলা কৌশল শেখানোর চাইতে এটা বরং ভালই হলো। অন্ততঃ ওখানে ঘুমোতে তো পারবো নিশ্চিন্তে।'

'উঁহু। বেশী সময় সেখানেও পাবে না। সীমান্তে কি ঘটছে না ঘটছে তার কোন খবর রাখো?'

'সব ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

ঠিক তাই! এখন শুধু পেছিয়ে আসার জন্যে যুদ্ধ চলছে, চালাতে হচ্ছে। রাশিয়ানরা সর্বত্র সমস্ত রকম অবরোধ ভেঙে এগিয়ে আসছে। গতকয়েক ঘণ্টায় ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসেছে ওরা, সমস্ত প্রতিরোধের বেড়া ভেঙ্গে ফেলেছে। আর এখানে তো দেখ, একেবারে সমতল মাঠ। আড়াল নিয়ে দাঁড়াবার কোন জায়গায়ই নেই। এবার আমাদের অনেক অনেক দূরে পেছিয়ে আসা ছাড়া গত্যান্তর নেই।'

'অনেক দূর মানে? কতদূর বলছ। জার্মান সীমান্ত পর্যন্ত?'

'তুমিও কি তাই ভাবছ নাকি?'

'না।'

'আমিও না।' কিন্তু আমাদের পক্ষে থেকে কে এমন আছে যে বাধা দিতে পারবে? নিশ্চয়ই সাধারণ সৈনিকের দল তা পারবে না? তারা দায়ীত্ব নিতেও চাইবেনা!' ইমেরমান দুষ্টুমীর হাসি হাসল। গত মহাযুদ্ধের সময় ওরা তবু সব সময়ই একটা না একটা অস্থায়ী সরকার গড়ে তুলতে পেরেছিল নিজেদেরই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। তার মানে, কোন মতে ঘাড় সিধে রেখে বেচারি মুখের দল সন্ধি চুক্তি করে ফেলতো আর তার পরই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পড়তে হতো। কিন্তু আজকাল আর তেমন কিছু ঘটেনা। এখন একেবারে গোটা গোটা সরকার, এবং পুরোটারই পরাজয়। দ্বিতীয় পক্ষ বলতে এমন কেউ নেই যে যুদ্ধের

মীমাংসা করতে এগিয়ে আসবে।'

'শুধু তুমি ছাড়া, কি বল?' তিক্ত স্বরে বলে উঠল গ্রেবার। 'অনেক অনেকবার এসব কথা তুমি আমাকে বলেছ। অর্থাৎ, আর একটা স্বেচ্ছাচারি সরকার, তাই না? সেই একই প্রক্রিয়া একই ছেদো যুক্তি। যাকগে, আমি ঘুমোতে চললাম। আমি আমার জীবনে যা ভাবতে চাই, তা হলো আমার নিজের পছন্দ মত কাজ, যা আমার ইচ্ছে তাই করা। কিন্তু মুশকিল কি জানো, ডান দিকে, বাঁ দিকে, দুদিকেই তো আমাদের পবিত্র নেতাদের অবস্থান, তাই তাদের কাজকর্ম গুলো সব খুনী অপরাধীদর চাইতেও জঘন্যতম নোংরা।'

হঠাৎ তার নিজের ওপরই ভয়ানক রাগ হলো এতক্ষন এই বাজে লোক ইমের-মানের সঙ্গে কথা বলল দেখে। ষ্টেনব্রেনারের সঙ্গে যেমন তেমন এই হারামজাদাটাও মানুষ নামের অযোগ্য। সে তাব ঝোলাটা তুলে নিয়ে অস্থায়ী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে ওর প্রাপ্য খাবার বীন স্যুপ নিলো, রুটি নিলো, রাতের খাবার জন্য পুরো সসেজের রেশনটাও সংগ্রহ করে নিলো, যাতে আবার গ্রাম থেকে এখানে ফিরে আসতে না হয়।

বিকেলটা আজ অদ্ভুত রকমের থমথমে আর নির্জন, খড় জোগাড় করে এনে দেবার পর রঙরুট দুজন চলে গেছে। রৌদ্রেব তেজও অনেক কমে এসেছে। দিগন্তে কামানের আওয়াজ পরের পর হয়েই চলেছে, কিন্তু তাতে এই গ্রামের শান্তি বিব্রত হচ্ছে না মোটেই। বেশ নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ। পরিত্যক্ত বাগান বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল গ্রেবার। বার্চ গাছ দিয়ে ঘেরা। যদিও মাঝে মাঝে কামানের গোলা পড়ে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে! তবুও চারপাশটা আবার সবুজে ভরে উঠেছে। বিশেষ করে পথের দিকে আবার ফুলের গাছগুলোতে ফুল ফুটে চারদিকটা বেশ দেখাচ্ছে।

বাগানের ভেতর পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা গোল বেদী রয়েছে। এখানে বসে গ্রেবার অনায়াসে বন্দিদের ঘরটার দিকে নজর রাখতে পারবে। কয়েকটা বইও খুঁজে পেয়ে গেল সে। চামড়া দিয়ে বাঁধানো, সোনালী অক্ষরে তার ওপর বইয়ের নাম লেখকের নাম। বৃষ্টি আর বরফ পড়ে পড়ে সেগুলোর এমন দুরবস্থা হয়েছে যে মাত্র একটা বইই কোন মতে পড়ার যোগ্য রয়ে গেছে। কিন্তু এই বইটা পড়ার নয়, দেখার। বোধহয় লেখকের বা শিল্পীর কল্পনার চোখে দেখা রোমান্টিক সব নক্সার ছবি, যেমন ধাতু পাতের ওপর শিল্পীরা নক্সা করেন তেমনি সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। পাশে লেখা কিছু আছে। ফরাসী ভাষায়। ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে পাতা ওলটাতে লাগল সে। ক্রমশঃ ছবিগুলো যেন তাকে মুগ্ধতার একটা অপার্থিব জগতে নিয়ে গেল। কেমন যেন একটা সুপ্ত যন্ত্রনা বোধের সঙ্গে আশাহীন, অপূর্ণ আশঙ্কা মিলে মিশে তার মানসিক জগতে একটা তুমুল

আলোড়ন তুলল। বইটা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল সে বটে, কিন্তু তার মানসিক অস্থিরতা তবুও খুব একটা প্রশমিত হলো না।

গ্রেবার বার্চ গাছে ঘেরা ভাঙ্গাচোরা পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ডোবার ধারে চলে এল। চারপাশের জঞ্জাল আর জল ভরা ডোবাটার মাঝখানে একটা মূর্তি বাঁশি বাজাচ্ছে। আসলে একটা ফোয়ারার মুখ। মুখটা ভেঙ্গে গেছে। তবুও দেশ জোড়া বিপ্লব, কম্যুনিজম বা যুদ্ধের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও এটা রয়ে গেছে। গ্রেবারের তো তখন জন্মও হয়নি। সে তো জন্মেছে গনযুদ্ধের মধ্যে; বড় হয়েছে বিখ্যাত সেই ইনফ্রেশন আর যুদ্ধ পরবর্তী অস্থির সময়ের সঙ্গে এবং নতুন চেতনার উন্মেষ হয়েছে তার নতুন করে লাগা এই মহাযুদ্ধের টালমাটাল সময়ে। সে পুকুরের ধারে খানিক ঘুরে টুরে বন্দিদের ঘরটার কাছে চলে এল। লোহার দরজাটার দিকে তাকাল। এটা পরে তৈরী হয়েছে নিশ্চয়ই। আর মালিক যে ছিল সে হয়তো এখানেই মরে গিয়ে জুড়িয়েছে।

বুড়িটা ঘুমোচ্ছে। যুবতী জড়ো সড়ো হয়ে বসে আছে কোনের দিকে। পুরুষ দুজন দাঁড়িয়ে দেখছে বাইরের দিকে। গ্রেবারের দিকে। যুবতী অবশ্য তার দিকে তাকায়নি। গ্রেবার মুখ ঘুরিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘগুলো দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীদের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছে বার্চ গাছের শাখা প্রশাখাগুলো। একটা নীল রঙের প্রজাপতি এই ফুলের গাছ থেকে ঐ ফুল গাছের উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। খানিক পর দ্বিতীয় আরেকটা প্রজাপতি এসে তার সঙ্গে জুটে গেল। দুটো প্রজাপতি নিজেদের মধ্যে খেলা করতে লাগল; একটা অন্যটার দিকে ধাওয়া করতে লাগল তারপর দুটো প্রজাপতির মিলন হলো। দুজনে একসঙ্গে হয়ে বাতাসের দোলায় ভাসতে ভাসতে উষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীচে দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল।

গ্রেবার তাকিয়ে দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা একজন রঙরুট বন্দিদের খাবার নিয়ে এল। দুপুরে বাঁধা মটর শুটির স্যুপের মধ্যে জল ঢেলে আরও পাতলা করা হয়েছে। বন্দিদের খাওয়া হলে সে বাসনগুলো নিয়ে চলে এল। গ্রেবারের জন্যে রেশন, সিগারেটও নিয়ে এসেছিল। বরাদ্দের চেয়ে সিগারেট অনেক বেশী। গ্রেবার সচকিত হলো। লক্ষণ মোটেও ভাল নয়। ভাল খাবার এবং বেশী সিগারেট দেওয়ার অর্থ সামনে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

'আজ রাতে আমাদের দু'ঘণ্টার অতিরিক্ত ডিউটি দেওয়া হয়েছে, রঙরুট ছেলেটা বলল। সে গ্রেবারের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকালো। যুদ্ধের কলা কৌশল, মানে হাতাহাতি লড়াই, গ্রেনেড নিক্ষেপ করা এবং বেয়নেট নিয়ে আক্রমনের কৌশল, এই সব শেখানো হবে।

'হ্যাঁ, কোম্পানী কম্যাণ্ডার তো জানেন যে তিনি করছেন বা করবেন। তিনি

তো শুধু তোমাদের জন্যই এতসব করছেন না।'

রঙরুট ছেলেটা মাথা নেড়ে স্বীকার করলো। তারপর সে রাশিয়ান বন্দিদের দিকে তাকালো যেন চিড়িয়াখানার জন্তুদের দেখছে। 'ওরা কিন্তু জন্তু নয়, মানুষ, বুঝলে?' গ্রেবার বলল।

'হ্যাঁ, রাশিয়ান।'

'ঠিক কথা, রাশিয়ান। এবার রাইফেলটা বাগিয়ে ধরো। আগে মেয়ে দুটোকে এক এক করে বার করতে হবে।'

গ্রেবার লোহার দরজায় মুখ রেখে বলল, 'প্রত্যেকে কোনের দিকে সরে যাও। প্রথমে বৃদ্ধা মহিলা বাইরে আসবেন। তারপর প্রয়োজন হলে সবাই একের পর এক বাইরে যেতে পারবে।'

বয়স্ক রাশিয়ান অন্য সঙ্গীদের কি বলল। সবাই রাজী হলো? রঙরুট ছেলেটা রাইফেল উঁচিয়ে ধরে তাক করে রইল। তারপর প্রথমে বৃদ্ধাকে বেরিয়ে আসতে বলল। বৃদ্ধাতো বেরিয়েই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। গ্রেবার বয়স্ক রাশিয়ানটার উদ্দেশ্যে বলল, 'একে বলো যে কোনো ভয় নেই। গুলি করে মারা হবে না।' বয়স্ক রাশিয়ান বুঝিয়ে বলতে বুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে এগিয়ে চলল। পেছন দিকে দুটো দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা ফিরে এল কাজ সেরে। তারপর তরুনী এবং পরে পুরুষ দুজনও একে একে বাইরের কাজ সেরে ফিরতে গ্রেবার ফের তালা লাগিয়ে দিল।

'দারুন উত্তেজক ব্যাপারটা, তাই না?' রঙরুট ছেলেটার চোখদুটো চকচক করছে উৎসাহে।

রাইফেলটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে গ্রেবার বলল, 'যাও, এবার তুমি চলে যেতে পারো।'

সৈনিক ছোকরাটা যতক্ষণ না আঁধারে মিলিয়ে গেল, গ্রেবার একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বয়স্ক বন্দিটা সহ প্রত্যেককে একটা করে সিগারেট দিয়ে তারপর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে শিকের মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে বসে বন্দিরা সিগারেট টানছে সুখে। তাদের মুখে এখন খুশী খুশী ভাব। যুবতীকে দেখে হঠাৎ গ্রেবারের এলিজাবেথের কথা মনে পড়ে গেল। বুকের মধ্যে যন্ত্রনার একটা মোচর দিয়ে নিল যেন।

বয়স্ক রাশিয়ানটা ইতিমধ্যে গরাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জার্মানে বলে উঠল, 'তুমি···ভাল, ভাল লোক···'

গ্রেবার ম্লান হেসে বলে উঠল, 'ননসেন্স।'

বয়স্ক বন্দিটা আবার বলল, 'আমাদের ছেড়ে দাও না কেন···আর তুমিও আমাদের

সঙ্গে চলো…চলো না ?' তারপর পলকের জন্যে ভেতর দিকে যুবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যুদ্ধে হার…জার্মানদের জন্যে, কিন্তু তুমি ভাল।…আমাদের সঙ্গে চলো… ওই যে মানুষটা, তোমাকে লুকিয়ে রাখবে, ভাল জায়গায় লুকিয়ে রাখবে, কেউ জানতে পারবে না…তুমিও বাঁচো, আমাদেরও বাঁচতে দাও।' শেষের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলল।

গ্রেবার মাথা নাড়ল। ওটা কোন সমাধান নয়, সে মনে মনে ভাবল, না, তা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য উপায়টাই বা কোথায় ?—বাঁচো—মরবে কেন, আমাদেরও বাঁচতে দাও। আমরা তো শুধু বন্দি হয়েছি', ফিসফিস করে বলছিল রাশিয়ানটা, 'তুমিও বেঁচে থাকবে, আমরা বাঁচিয়ে রাখব তোমাকে—আমাদের সঙ্গেই তুমি খুব ভাল থাকবে—দেখতেই তো পাচ্ছো যে আমরা একেবারে নির্দোষ। জার্মানীর জন্যে যুদ্ধ, শেষে হার—।'

বলাটা খুব সহজ। এতে কোন কাজ হয় না। গ্রেবার সরে এল গরাদের সামনে থেকে। রাতের অন্ধকারে এমন সব কথা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব। হতে পারে এরা সবাই নির্দোষ। কিছুই জানে না। কোনরকম অস্ত্রশস্ত্রও ওদের তল্লাশী করে মেলেনি। এবং মোটেও গেরিলা যোদ্ধাদের মত দেখতে নয় এরা। ছেড়ে যদি দিতেই পারি এদের তাহলে তো জীবনে একটা কাজের মতো কাজ করতে পেরেছি বলে গর্বই হবে। নিরপরাধ কটা মানুষকে বাঁচাতে পারা তো আনন্দেরই ব্যাপার। তাই এদের সঙ্গে চলে যাওয়া যায় না। যে অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছি সব সময়, আবার ঘুরে গিয়ে সেই অবস্থার মধ্যে পড়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গ্রেবার এইসব ভাবতে ভাবতে আবার বাগানের রাস্তায় এল। ক্রমে ফোয়ারাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সারি সারি বার্চ গাছগুলো আকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার ফিরল সে। গরাদের ভেতর এখনও একটা সিগারেটের মুখ মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে টানের সঙ্গে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রেবার। বাকি সিগারেট কটা এবং কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠিও বয়স্ক বন্দিটার হাতে গুঁজে দিল, 'তোমাদের রাত্রের জন্য রেখে দাও।'

'তুমি খুব ভাল…যুবক…যুদ্ধে হার তোমাদের…বাঁচো…জীবন খুব মহৎ, জানে…বাঁচিয়ে রাখবো তোমাকে…আমরা…বয়স্ক বন্দিটার গলার স্বর বেশ কোমল, গভীর। কিন্তু হঠাৎ গ্রেবারের কানে 'জীবন' শব্দটা খট করে বাজল। কত অনায়াসে উচ্চারণ করলো বন্দিটা 'জীবন' শব্দটা। যেন কতই না সস্তা। যেমন 'মাখন' শব্দটা কালোবাজারীদের দল সহজ করে বলে; 'ভালবাসা' শব্দটা যেমন বেশ্যারা অনায়াসে উচ্চারণ করে; অথচ সবটাই কৃত্রিম এবং মিথ্যে; 'জীবন' শব্দটাও এখন ঠিক সেই রকম শোনালো তার কানে, যেন এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলেই

জীবনটাকে বিকিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল গ্রেবারের। চিৎকার করে উঠল সে : 'চুপ করে থাকো। নইলে রিপোর্ট করে দেবো আমি। তখন আর তোমাদের বেঁচে থাকতে হবেনা। বুঝেছ!'

গ্রেবার ফের টহল দিতে শুরু করলো। সীমান্তের দিক থেকে প্রচণ্ড কামানের শব্দে যেন সারা পৃথিবীটাই কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রথম তারাটা আকাশের গায়ে ফুটে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ নিজেকে তার ভীষণ একাকী মনে হলো। এর চেয়ে বরং ভাল ছিল কোনো শেল্টারে পূতিগন্ধ পরিবেশে সহ-যোদ্ধাদের নাকডাকা শুনতে শুনতে বসে থাকা। এই মুহূর্তে মনে হলো তার সহ-যোদ্ধারা যেন সবাই তাকে একেবারে ভুলে গেছে, আর তার কথা না ভেবেই কি যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে।

বেশ খানিকক্ষণ পর টালি ছাওয়া ছাতাটার নিচের একটা বেঞ্চে সে সটান শুয়ে পড়ল। এখান থেকে গরাদখানা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। লোহার দরজাটা যা ভারি তাতে ওটা ভেঙ্গে পালালো ওই চার বন্দির পক্ষে সম্ভব নয়, এবং ওরা সে চেষ্টাও করবে না, গ্রেবার তা ভালই জানে। তবুও তো সাবধানের মার নেই। নজর সরালো না সে।

এক একটা মুহূর্ত পার হচ্ছে আর সীমান্তের যুদ্ধটা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কান পাতাই দায়। তখনই আকাশে বিমানের উপস্থিতির শব্দ শুনল সে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান-বিধ্বংসী কামানের কটকট্ কটকট্ একটানা শব্দ। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে কোথাও বিষ্ফোরণ ঘটল। গ্রেবার সতর্ক কান খাড়া করে শুনতে লাগল। মধ্যরাতের পর যেন আরও সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল পরিস্থিতি। এবারে ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমন শুরু হয়েছে তা শব্দ শুনেই বুঝতে পারলো গ্রেবার। একদিকে মাথার ওপরের আকাশ তুমুল কজ্রনিনাদে ফেটে ফেটে যাচ্ছে, অন্যদিকে পায়ের নিচের মেদিনী কেঁপে উঠছে থরথর করে। বুঝিবা এখনই একটা চরম ওলট পালট হয়ে যাবে। গ্রেবারের শরীরের রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল আরও। অথচ শিরদাঁড়া বয়ে হিমেল স্রোতের আনাগোনাও টের পেতে লাগল সে। একটা আগুন আর বরফের মিলিত ঘূর্নি'র মধ্যে পড়ে গিয়ে গ্রেবারের দেহটা যেন নাকানি চোবানি খেতে লাগল। তখনই তার মনে হলো যে ওই বন্দিদের জন্যই বুঝি এখন এই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ওদের মুক্তি দিলে হয়তো এই আক্রমন ঘটতো না। ওদের মুক্তির ওপরই যেন নির্ভর করছে এখন যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল। পকেটে হাত দিতে গরাদখানার ভারী চাবিটা সে অনুভব করল। সে যেন দিব্য চোখে মুক্ত বন্দিদের আনন্দে উল্লাসিত মুখগুলো দেখতে পেলো! এই রকম চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখন যে ভোরের গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল, টেরই পেলো না।

ছাই ছাই রঙের ভোরের আলোতে গ্রেবারের ঘুম ভাঙ্গলো। কামানের গর্জন যেন একেবারে মাথার ওপরে নেমে এসেছে, এমনই মনে হলো তার। যেন বাগানটার কাছে এসে পড়েছে একেবারে। মুখ ফিরিয়ে দেখল গরাদখানাটা অটুটই আছে। বন্দি ক'জন ভেতরেই আছে। ঘোরাফেরা করছে। সেই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল গেটের দিক থেকে দৌড়ে ছুটে আসছে ষ্টেনব্রেনার।

'আমরা পেছু হটে যাচ্ছি।' দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল ষ্টেনব্রেনার।' রাশিয়ানরা আমাদের ঘাঁটির দখল নিয়ে নিয়েছে। গ্রামে গিয়ে সবাইকে একসঙ্গে হতে হবে। শীগগির চলো।' বলতে বলতে কাছে এসে গেল সে। 'বন্দিদের পাট এখানেই চুকিয়ে দাও!'

গ্রেবারের বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল, 'কেন, কোন আদেশ আছে নাকি?'

'আদেশ! আদেশ আবার কি? আমাদের ঘাঁটির অবস্থা দেখলে তুমি পাগল হয়ে যেতে। কোন আদেশের কথা আর জিজ্ঞেসও করতে না। তুমি কি এখান থেকে কিছুই শুনতে পাওনি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'তাহলে খামাখো জিজ্ঞেস করবার মানে কি? আদেশের ভরসায় এখন আমাদের বসে থাকবার সময় নয়। সারাটা রাস্তা এদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে এসো, গরাদের বাইরে থেকেই এদের শেষ করে দিই।'

'না, তা হবে না। গ্রেবার ষ্টেনব্রেনারের মুখের দিকে তাকালো। নীল চোখ দুটো ওর সকালের রোদে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন। উত্তেজনায় ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চিবুকের চামড়ায় কি এক ক্রুরতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডান হাতে চেপে ধরেছে কোমরের রিভলবারের বাটটা।

'অতো ভাবাভাবির এতে কি আছে বলতো গ্রেবার? জলের মতো সহজ ব্যাপারটা।'

'দেখো, এদের দায়ীত্ব আমার। তোমার কাছে যদি কোন আদেশপত্র না থাকে তো তুমি এখান থেকে সোজা ফিরে যাও।'

ষ্টেনব্রেনার হেসে ফেলল। 'বেশ তো, তোমারই যখন দায়ীত্ব, তুমিই সব মিটিয়ে দাও না।'

'না।' গ্রেবার চেঁচিয়ে বলে উঠল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তো বন্দিদের কিছু আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবোনা। কাজেই এদের ব্যবস্থাটা আমাদের একজন সে করতেই হবে। তা তোমার দুর্বল স্নায়ুতে যদিনা কুলোয়, তো তুমি এগিয়ে যাও। আমি দুমিনিটের মধ্যেই তোমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হবো গিয়ে। যাও।'

'না।' গ্রেবার ভয়ংকর জোরে চেঁচিয়ে উঠল।' এদের তুমি কিছুতেই গুলি

করে মারতে পারবে না।'

'পারবো না, বলছো? অ্যাঁ!' ষ্টেনব্রেনার চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কটা বলল। তারপর সোজা গ্রেবারের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি কি জানো, তুমি কি বলছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, খুব জানি।' শিষের মত তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল গ্রেবার!

'ও, জানো তাহলে? তাহলে এটাও জেনে রাখো…'

গ্রেবার তাকিয়ে দেখল ষ্টেনব্রেনারের মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর ভাবে বদলে গেছে। ভুরুদুটো কুঁচকে চোখ দুটোর ওপর নেমে এসেছে। নীল দুটো চোখের মনি যেন আগুন হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে। একটা পাশবিক জিঘাংসায় মানুষটাই যেন পাল্টে গেছে। কোমরের খাপের বোতামটা খুলে রিভলব্যারটা টেনে বার করতে আরম্ভ করেছে! মনে মনে সংকল্প করে গ্রেবার তৈরী হয়েই ছিল। চোখের পলকে রাইফেল তুলেই সে গুলি করলো। একেবারে সামনা সামনি গুলিটা খেয়েই তার দেহটা বোঁ করে এক পাক ঘুরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। একটা মরণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে গ্রেবারের দিকে তাকালো সে। হাত থেকে রিভলবারটা ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

গ্রেবার তার স্থির দেহটার দিকে একবার তাকালো। একটা কামানের গোলা শব্দ করে মাথার ওপর দিয়ে বাগানটা পেরিয়ে গিয়ে কোথায় পড়ল। সজাগ হয়ে গেলো গ্রেবার। গরাদখানার দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে চাবিটা বার দরজাটা খুলে দিল!' যাও।' সে বলে উঠল।

রাশিয়ান বন্দিরা তার মুখের দিকে তাকালো। তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। গ্রেবার হাত থেকে রাইফেলটা ফেলে দিল। 'যাও! যাও! পালাও।' অধৈর্য্য স্বরে সে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার খালি হাতও দেখালো।

খুব সন্তপনে' যুবক বন্দিটা বাইরে পা বাড়ালো। গ্রেবার অন্য দিকে ফিরে গেল। সে হেঁটে যেখানে ষ্টেনব্রেনারের মৃত দেহটা পড়ে আছে চলে এল! 'খুনী, কসাই।' সে বলল। বলল বটে, কি কার উদ্দেশ্যে বলল সেটা যেন বোধগম্য হলোনা। ষ্টেনব্রেনারের দিকে ফের তাকালো সে। তার মনে কোন বিকার নেই।' খুনীর দল।' আবার সে বলল। এবং ষ্টেনব্রেনারকেই নয় বোধহয় শুধু, নিজেকেও বলল, আর বলল আরও অগুনতি খুনীদের লক্ষ্য করেই।

তারপর হঠাৎই তার নানান ভাবনার সুতোগুলো একের সংগে আরেকটা জট পাকিয়ে যেতে লাগল। যেন একটা পাথরকে তো ঠেলে গড়িয়েই দেওয়া হয়েছে। ভাবনাগুলোর সেই বেগে ওর দিকেই দ্রুত ছুটে আসতে লাগল। আগে থেকেই যেন সব স্থির হয়ে ছিলো। অথচ সেগুলো তার সত্তার গভীরে কোন অনুরণনই

তুললোনা। হঠাৎ সে অনুভব করল যেন শরীরে তার কোন ভার বোধই নেই। সে বুঝেছিল যে একটা কিছু এই মুহূর্তে তার করা উচিৎ। কিন্তু সব চেয়ে আগে স্থির করতে হবে যে সে আর পালিয়ে যাবার চিন্তা করবে না। তার মাথার মধ্যেটা যেন পাক খেয়ে খেয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যাচ্ছে। সে খুব সাবধানে পথটা ধরে এগোতে লাগল। একটা বড় কিছু, অনেক বড় আর মহৎ কিছু যেন তাকে করতেই হবে, করে যেতেই হবে। আরও স্পষ্ট, পরিষ্কার করে তাকে সব জানতে হবে। কিন্তু সে যেন আর তার বুকের মধ্যেকার উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কা সামলাতে পারছেনা, কিছুতেই পারছেনা এখনও। কিন্তু উদ্দিষ্ট পথটা যেন এখনও বহু বহু দূরে, আর সেটা এমনই নতুন এবং এতই স্পষ্ট যে একটা না পাবার তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাকে প্রচণ্ড ভাবে এসে বিদ্ধ করছে।

তখনই সে রাশিয়ানদের দেখতে পেলো। তারা উন্মত বেগে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে আসছে দল বেঁধে। সামান্য ঝুঁকে পড়ে রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। সবার আগে রয়েছে কয়েকজন মেয়ে সৈনিকও। তাদের মধ্যে একজন ঘুরে তাকিয়েই গ্রেবারকে দেখতে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ানটার হাতে রাইফেলটা উঠে এল। সে রাইফেলটা তুলে ধরে লক্ষ্য স্থির করল। গ্রেবার রাইফেলের নলের কালো গর্তটা দেখতে পেলো পরিস্কারভাবে। ফুটোটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। গ্রেবার চাইছিলো তাদের লক্ষ্য করে কিছু বলতে, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে যেন কিছু একটা সে বলতে চাইছিল তাদের। কতকিছুই যে তার বলবার আছে, বলতে চাইছিল সে সবকিছু দ্রুতভাবে একসঙ্গে সব, চিৎকার করে—

কি আশ্চর্য। গুলির আঘাতটা সে অনুভবই করতে পারলো না। সে কেবল দেখতে পেলো তার চোখের সামনে ঘাসেদের শীষ, এক গুচ্ছ সবুজ ঘাস তার একেবারে চোখের সঙ্গে লেগে যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে; তাও পায়ে দলে যাওয়া কাল লাল শেকর বেরিয়ে এসেছে মাটি থেকে উৎপাট হয়ে, অথচ তবুও কি নরম কোমল, সেই শীর্ণ ঘাসের সরু দল গুলোর ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠা, যা সে কতবার নিজের চোখে দেখেছে। কবে যেন? কখন যেন দেখেছে? মনে করতে পারলো না গ্রেবার এই মুহূর্তে। এবার শুধু দেখল তা মগ্ন চৈতন্যের মধ্য দিয়ে কেমন স্থির শান্ত ভঙ্গীতে মাটির বুক থেকে মাথা তুলে একটা ঘাসের শীষ কাঁপতে কাঁপতে দূর দিগন্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে ক্রমশ বড় হতে হতে ঢেকে ফেলল সমস্ত আকাশটাকেই। তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা দুটি বুঁজে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো।

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট

□ এক □

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁচ মাইল পিছনে আমরা তখন অবসররত। গতকালই আমাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। পেট আমাদের ভর্তি এখন গোমাংস আর সীম কড়াইশুটিতে। যুদ্ধ শেষ, আমরা সন্তুষ্ট। এছাড়া প্রতিটি সৈনিককে সান্ধ্য-আহারের জন্য দেওয়া হয়েছে ভোজন-পাত্র ভর্তি খাবার। এরকম সৌভাগ্য আমাদের হয়নি অনেকদিন। ওদিকে লাল চুলের পাচক খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে আমাদের। ট্যাডেন আর মুলার এগিয়ে দিয়েছে দুটি হাত ধোবার বেসিন, কানায় কানায় ভর্তি খাবার, ভবিষ্যতের সঞ্চয়। ট্যাডেনের কাছে এটা গোগ্রাসে গেলার জন্যে, আর এটা মুলারের দূরদর্শিতা।

এখনো আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ধূমপানের ডবল রেশন। দশটা সিগার, কুড়িটা সিগারেট বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতিটি সৈনিকের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি এতো সব আমাদের পাওনা নয়। প্রুসিয়ানরা এতো উদার নয়।

চোদ্দ দিন আগে রণক্ষেত্রে ছুটে যেতে হয়েছিল আমাদের আহত সৈনিকদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে। শুরুতে আমাদের সেক্টরটা ছিলো শান্ত। তাই পুরো এক কোম্পানি, অর্থাৎ দেড়শো জন সৈনিকের রেশনের ফরমাস দেন কোয়ার্টারমাষ্টার। কিন্তু শেষ দিন ইংরেজরা অবিরাম বোমাবর্ষন চালায়, যার ফলে আমাদের জীবিতের সংখ্যা কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় মাত্র আশিতে।

ভালো ঘুমের একটা আস্তানা পাওয়ার জনো গতকাল রাত্রে একটু পিছু হটতে হয়েছিল আমাদের। একটু ঘুমোতে পারলে যুদ্ধ আদৌ খারাপ নয়, ঠিকই বলেছে কাজিনস্কি। আমাদের পরে কেউ ছিলো না তখন। আর এক নাগাড়ে চোদ্দ দিন—বড় দীর্ঘ সময়।

তখন দুপুর, সবাই যে যার ভোজনপাত্র হাতে নিয়ে রসুইখানার সামনে গিয়ে ভীড় জমালো। লম্বা লাইনের একেবারে মাথায় দাঁড়িয়েছিল ক্ষুধার্ত কৃশকায় আলবার্ট ক্রপ, আমাদের মধ্যে ওর চিন্তাধারাই সব থেকে বেশী পরিষ্কার, ও একজন ল্যান্স কর্পোরাল; মুলার, এখনো তার স্কুলের বইপত্তর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে; মুখ ভর্তি দাড়ি লীর-এর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অফিসারদের ব্রথেলের মেয়েদের কাছে ওর যাতায়াতের বিশেষ ছাড়পত্র আছে। আর চতুর্থজন আমি নিজে, পল বাউমার। আমাদের চারজনেরই বয়েস উনিশ।

আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে বিশীর্ণ চেহারার ট্যাডেন হলো লক স্মিথ,

আমাদেরই বয়সী, দারুণ খাইয়ে, আমাদের সমবয়সী হেই ওয়েস্থাজ-এর কাজ হলো জ্বালানী সংগ্রহ করা, সে একজন চাষী, সব সময় চিন্তা তার চাষাবাদের এবং স্ত্রীর ; আর সব শেষে নাম করতে হয় স্ট্যানিসলজ কাজিনস্কি, আমাদের গ্রুপের নেতা সে, কঠোর, চতুর, দারুণ পরিশ্রমী, বয়স প্রায় চল্লিশ, নীল চোখ, ধনুকের মতো বাঁকা দুটো কাঁধ।

রসুইখানার সামনে সারিবদ্ধ লাইনের একেবারে পুরোভাগে দাঁড়ানো আমাদের দলের সবাই অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম পাচক আমাদের পাত্তা না দেওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্দেশ্য করে কাজনস্কি বলে উঠলো, 'সুপ কিচেনের দরজা খুলে দাও হেনরিক। সবাই দেখুক রান্না বান্না হচ্ছে।'

ঘুম ঘুম চোখে তাকালো সে : 'প্রথমে তোমাদের সবাইকে এখানে এসে হাজির হতে হবে।' দেঁতো হাসি হাসলো ট্যাডেন : 'এইতো আমরা সবাই হাজির।'

তবু কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো না সার্জেন্ট কুক। 'সে তো তোমারাই কেবল, কিন্তু অন্যেরা কোথায় ?'

'ওরা আজ আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। হয় তারা এখন সাজঘরে কিংবা মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পাচককে তখনো কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখালো, এই সব যুক্তিতে বিশ্বাসী নয় সে। বিচলিত হয়ে বললো সে, 'এদিকে আমি যে দেড়শো জনের রান্নার ব্যবস্থা করে রেখেছি—'

তার বুকের পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বললো ক্রপ, 'তাহলে অন্তত একবারের জন্যেও আমরা প্রচুর খাবার পাচ্ছি। এসো, শুরু করা যাক।'

হঠাৎ চোখ ছাট করে হাসি মুখে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো ট্যাডেন, 'ওহে, তার মানে দেড়শোজনের জন্য তুমি রুটি, সসেজ, টোবাকো, সব কিছুই পেয়েছো ?'

'হ্যাঁ, সব কিছুই।'

'তার মানে এ সবই আমাদের জন্যে এখন ?' চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো ট্যাডেনের।

'তা সম্ভব নয়। দেড়শোজনের সব খাবার মাত্র আশিজনকে দেওয়া যায় না।'

আমরা তখন দারুণ উত্তেজিত হয়ে তাকে ঘিরে ধরি। 'দেবে না ?' গর্জে উঠলো মুলার। 'ঠিক আছে, কি করে দিতে হয় আমরা তোমাকে দেখাচ্ছি।'

কাজিনস্কিও তখন রীতিমতো উত্তেজিত। 'একবারের জন্যেও তোমার একটু সদয় হওয়া উচিত। আরে বাবা, তুমি তো আর আশিজনের জন্যে রান্না করোনি, তুমি করেছো সেকেণ্ড কোম্পানির সৈনিকদের জন্য। ভালো কথা। তাহলে ওগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। আমরা সবাই সেকেণ্ড কোম্পানির সৈন্য।'

আমরা তখন পাচককে দারুন ভাবে উত্যক্ত করে তুলতে থাকি। তার প্রতি

কেউই দয়া দেখাতে চায় না, কারণ দোষ তারই, প্রায়ই সে আমাদের দেরীতে ঠান্ডা খাবার দিয়ে থাকে। হয়তো ব্যাপারটা আরো খাবারের দিকে গড়াতে পারতো, যদি না আমাদের কোম্পানির লেফটেন্যান্ট সেই সময় হঠাৎ সেখানে এসে হাজির না হতেন। গোলমালের খবরটা আগেই তাঁর কানে পেঁছে গিয়েছিল। আমাদের দিকে তাকালেন লেফটেন্যান্ট। আরো অনেক কিছুই তিনি জানেন। কারণ তিনি যে একজন নন কমিশনড অফিসার হিসেবে এসেছেন আমাদের কোম্পানিতে। খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে পাচককে বললেন তিনি, 'আমাকে পুরো এক প্লেট খাবার দাও। আর এদের মধ্যে আমাদের কোম্পানির পুরো রেশন ভাগ করে দাও।'

পাচক জিম্বার হেনরিক বিহবল দৃষ্টিতে তাকায়। আর ট্যাডেন তখন আনন্দে দিশেহারা হয়ে তার পাশে ভূতের নৃত্য করতে থাকে।

'আরে, এর জন্যে তোমার থেকে তো আর খরচ করতে হচ্ছে না। যে কেউ ভাবতে পারে, কোয়ার্টার মাস্টারের স্টোর তাদেরই। বুড়ো ভাম সব খাবার নিয়ে এসো এখনি। আর তুমি আমাদের ভুল বুঝো না।'

'দেখো, তোমরা সবাই ফাঁসিকাঠে ঝুলবে।' বলে থুতু ছিটলো সে। ওর এই এক স্বভাব। কোনো কিছু তার হাতছাড়া হয়ে গেলে তার মাথার ঠিক থাকে না, তখন এমনি উল্টো পাল্টা যতো সব কাজ করে বসে।

আজ দিনটা অতি রমনীয় অতি চমৎকার। প্রায় সবাই কিছু না কিছু চিঠি পেয়েছে। ব্যারাকের পেছনে ঘুরে ফিরলাম আমরা প্রাতকৃত্য সারার জন্য। জায়গাটা তৃণভূমিতে আচ্ছাদিত। ডান দিকে মাত্র একটিই বড় আকারের কমন শৌচাগার। নবাগত মানে যারা সবে মাত্র ঢুকেছে, যারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে নতুন চাকরী পেয়ে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আমরা আরো একটু ভালো ব্যবস্থা চাই, একটু আরামদায়ক শৌচাগার, ভীড় কম।

আমরা একটা গন্ডির মধ্যে ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে একটা জায়গায় গিয়ে বসলাম। দু'ঘন্টার আগে সেখান থেকে উঠছি না।

ব্যারাকে আমাদের নিয়োগের সময় সর্বসাধারনের শৌচাগার ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের কি যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল, সে কথা মনে আছে আমার আজও। কোনো দরজা ছিলো না, ট্রেনের কামরায় বসে থাকার মতো সারিবদ্ধ ভাবে বসে থেকে প্রাতঃকৃত্য সারতে হতো এক সাথে কুড়িজনকে সারিবদ্ধ হয়ে বসে যাতে করে এক নজরে তারা আমাদের দেখতে পায়। কারণ সব সময়েই চোখে চোখে রাখতে হয় সৈনিকদের।

ক্রপ জানতে চাইলো, 'কেমরিককে তোমরা কেউ দেখেছো?'

'ওপরে সেন্ট জোসেফের কাছে,' খবরটা আমিই দিলাম তাকে।

আর একটু খুলে বললো মুলার, তার উরুতে নাকি চোট লেগেছে ; চোটটা ভালোই বলতে হয়।

আমরা ঠিক করলাম, আজ দুপুরে দেখতে যাবো ওকে। একটা চিঠি টেনে বার করলো ব্রুক তার পকেট থেকে। 'তোমাদের সবাইকে ক্যানটোরেক তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

আমরা হেসে উঠলাম। মুলার তার সিগারেটের অবশিষ্ট পোড়া অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'আমার খুব ইচ্ছে হয় এক এক সময় উনি যদি এখানে থাকতেন।'

ক্যানটোরেক ছিলেন আমাদের স্কুলমাষ্টার। ছোট খাটো চেহারার দৃঢ়চেতা মানুষ, ইঁদুরের মতো ছুঁচলো মুখ। 'ক্লস্টারবাগে'র আতঙ্ক' কর্পোরাল হাইমেল ষ্টোসের মতো একই সাইজের তিনি। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্টের মূলে হলো এই সব নিচু তলার মানুষগুলো। এদের আমি উৎসাহী শুধু নয়, অতি উৎসাহী বলবো, ওপরতলার মানুষের মতো কোনো পাপোষ করতে চায় না এরা। তাই আমি ছোট ছোট কোম্পানির কমরেডদের এড়িয়ে চলি সাবধানে। বড্ড বেশী কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি তারা।

ড্রিলের সময় ক্যানটোরেকের বক্তৃতা যেন শেষ হতে চাইতো না। এখনো তাঁর কথাগুলো আমার কানে বাজছে যেন : 'কমরেড, তোমরা মিলিটারিতে যোগ দেবে না? এই সব শিক্ষকরা মনে হয় সব সময় তাঁদের ওয়েস্টকোটের পকেটে তাঁদের মনোভাব বহন করতেন, এবং দুলকি চালে বার করে দিতেন আমাদের কাছে। কিন্তু তখন এই সব ব্যাপারে আমরা কোনো চিন্তা ভাবনাই করতাম না। অবশ্য আমাদের মধ্যে একজন এ সব লাইনের ধার ধারতো না। সে হলো জোসেফ বেহম, গোলগাল মোটাসোটা চেহারা ঘরকুনো ছেলে। তবে সে চাইতো, তাকে অনুরোধ করা হোক, তা নয় হলে গনভোটে তাকে নির্বাসন দেওয়া হতো। তাছাড়া তখন বেশীর ভাগ অভিভাবকদের মুখে সব সময় একটা ছোট হলেও যার ব্যাপ্তি অনেক এমন একটা শব্দ ব্যবহার করতেন, 'কাপুরুষ। তাই জোসেফের মত পরিবর্তনও এটা একটা কারণ।'

কাজিনস্কির মতে এই তাঁদের লালন পালন করার প্রতিফল। এটা তাদের বোকা বানিয়ে তুলেছিল। আর ক্যাট যা বলে ছিল, সে কথাও চিন্তা করেছিল সে। আশ্চর্য বলতে হয়, বেহমের জীবনেই প্রথম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল। শত্রুপক্ষের আক্রমনের সময় তার চোখে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। আর আমরা তখন ওকে মৃত্যুর পথে ছেড়ে রেখে চলে আসি। আমরা ওকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারিনি, কারন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ফিরে আসতে হয়েছিল আমাদের তখন। অপরাহ্নে

হঠাৎ ওর গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা, আর সেই সঙ্গে ওকে সেই জনশূন্য স্থানে হামাগুড়ি দিতে দেখলাম। আচমকা আঘাত পেয়ে কেবল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ও। ওর চোখের দৃষ্টিশক্তি বলতে কিছুই ছিলো না তখন, যন্ত্রনায় ও তখন পাগল। স্বভাবতই এর জন্যে ক্যানটোরেককে আমরা দোষ দিতে পারি না যুদ্ধে আহত প্রতিটি পঙ্গু সৈনিককে যদি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে পৃথিবীর অবস্থা কি দাঁড়াবে? হাজার হাজার ক্যানটোরেকের ধারণা, তাঁরা দেশের জন্যে যা ভালো করার করছেন, যার জন্যে তাঁদের কোনো মূল্যই দিতে হয় না। আর সেই কারণেই তাঁরা আজ আমাদের এতো নিচে নামিয়ে এসেছেন।

আমাদের মতো আঠারো বছরের ছেলেদের জন্য তাঁদের মধ্যস্থতা করা উচিত, বয়সের সন্ধিঃক্ষণে কাজের জন্যে, কর্তব্যের জন্যে, সংস্কৃতির জন্যে, প্রগতির জন্যে ভবিষ্যতের জন্যে পথ দেখানো উচিত তাঁদের। আমরা প্রায়ই তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে থাকি কিন্তু আমরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি তাঁদের। তাঁদের অভিভাবকত্ব, যে ভাবে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে আমাদের সবার মনে। কিন্তু আমাদের দেখা প্রথম মৃত্যুটা আমাদের সেই বিশ্বাসটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে। এখন আমাদের চিনতে হবে, তাঁদের থেকে আমাদের প্রজন্মকে বেশী বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা আমাদের বড় বড় বুলি আওড়ে আর ছলচাতুরি দিয়ে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম বোমাবর্ষন চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছে, আর আর পৃথিবী সম্পর্কে তাঁরা আমাদের যা শিখিয়েছেন, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

ওঁরা যখন যুদ্ধের স্বপক্ষে পাতার পর পাতা লিখে যান। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বক্তৃতা দেন, আমরা তখন দেখি আমাদের সহযোদ্ধাদের আহত হতে, মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে। ওঁরা যখন আমাদের শেখান, প্রত্যেকের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা উচিত, তার আগেই আমরা জেনে গেছি, যুদ্ধে আত্মবলিদানই সব থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সবের জন্যে আমরা বিদ্রোহী হয়ে উঠিনি, পরিত্যাগ করে যাইনি, কোনো কাপুরুষতার কাজও করিনি। তাঁদের মতোই আমরাও আমাদের দেশকে ভালোবেসেছি। সাহসের সঙ্গে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি রণক্ষেত্র। তবে কোনটা আসল, কোন্‌টা নকল, আর কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, আমরা তা চিহ্নিত করতে পারি। আর হঠাৎই আমরা দেখতে পেয়েছি, তাঁদের পৃথিবীর অবশিষ্ট বলতে কিছু নেই। সেই মুহূর্তে নিজেদেরকে ভয়ংকর একা বলে মনে হলো, আর একা থাকার একটা বড় সুবিধে হলো যে, আমরা তখন জগতের ভালো মন্দ সব কিছু দেখতে পাই, আমাদের উত্তরসূরীর কোন্‌টা ভালো, আর কোন্‌টাই বা মন্দ দেখতে পাই তখন।

কেমরিকের কাছে যাওয়ার আগে ওর জিনিষগুলো প্যাক করে নিলাম, ফেরার পথে ওর দরকার লাগতে পারে।

একটা বড় ঘরে শুয়েছিল কেমরিক। আমাদের দেখে হাসলো সে, ক্ষীণ হাসি, আর ওর সেই হাসির মধ্যে আনন্দের অভিব্যক্তি অতি সামান্যই ছিলো। সেই সঙ্গে ওর মধ্যে একটা অসহায় অনুযোগের ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম ওর চোখে মুখে। ওর যখন জ্ঞান ছিলো না, তখন কে যেন ওর হাতের ঘড়িটা চুরি করে নিয়ে থাকবে।

সংবাদটা শুনে মাথা নাড়লো মুলার। 'আমি তোমাদের সব সময় বলি না, ভালো দামী ঘড়ি কখনো পরা উচিত নয়।'

ঠোঁট পাতলা মুলারটা একটু যেন রূঢ় প্রকৃতির মানুষ, এক্ষেত্রে ওর একটু সংযত হয়ে কথা বলা উচিত ছিলো। কারণ এ অবস্থায় কেমরিককে যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে যে, এই জায়গা থেকে সুস্থ হয়ে ও আর কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই ওর ঘড়িটা পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে তফাত কিছু নেই। আর সেটা পেলেও ওর আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

'কেমন লাগছে ফ্রান্স ?' জানতে চাইলো ক্রপ।

কেমরিকের মাথা নুইয়ে পড়লো যন্ত্রনায়। কোনো রকমে বললো ও, 'খুব একটা খারাপ নয় .....কিন্তু পায়ে এতো যন্ত্রনা—'

চাদরে ঢাকা ওর পায়ের দিকে তাকালাম আমরা। ওর একটা পা তারের বাস্কেটের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আর্দালিরা আমাদের যা বলেছিল, মুলার বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর পায়ে লাথি মেরে ইঙ্গিতে নিষেধ করলাম, কেমরিক যে ওর একটা পা খুইয়ে বসে আছে, এ খবরটা ওকে না দেওয়ার জন্য। ওর একটা পা এ্যাম্পিউট করা হয়েছে। ওর মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা ফুটে উঠেছে, ওর এই পরিবর্তনের মানে আমি বুঝি। ও এখন জেনে গেছে, মৃত্যু ওর দেহে বাসা বেঁধেছে আর সেই মৃত্যুর কর্তৃত্বের ছাপ পড়েছে ওর চোখের কোনে। এখানে আমাদের কমরেড কেমরিক পড়ে আছে, যে কিনা খানিক আগেও আমাদের সঙ্গে ঘোড়ার মাংস খেয়েছিল তৃপ্তি সহকারে। এখনো এই যে ও বেঁচে আছে, এই বেঁচে থাকাটার স্থায়ীত্ব যে কতক্ষণ, কেউ বলতে পারে না। ওর জীবন এখন অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট। কতকটা ফটোগ্রাফিক প্লেটের মতো, যা থেকে দুটি ছবি নেওয়া হয়েছে। এমন কি ওর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আমরা যখন চলে আসি, তখনকার কথা ভাবছিলাম আমি। গোলগাল মোটা সোটা চেহারার মেট্রন, ওর মা ওকে স্টেশনে নিয়ে আসেন। এক নাগাড়ে কেঁদে যাচ্ছিলেন তিনি। অস্বস্তিতে পড়লো কেমরিক। তারপর তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে আমার হাত দুটি ধরে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন, আমি যেন ফ্রাঞ্জ-এর দেখাশোনা করি। কেমরিকের মুখটা তখন শিশুর মতো অসহায় দেখাচ্ছিল।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একজন আর একজনের দেখাশোনা কি করেই বা করতে পারে।

'খুব শীগগীর বাড়ি ফিরে যাচ্ছো তুমি,' বললো ক্রপ, 'এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে তোমাদের অন্তত তিন থেকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে।'

মাথা নাড়লো কেমরিক। আমি কিন্তু ওর হাত দুটোর দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছিলাম না, মোমের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর হাত দুটো, নোখগুলো বিষাক্ত কালচে নীলের মতো দেখাচ্ছিল। ক্রপ যতোই ওকে ভরসা দিক না কেন, আমি তো জানি, ওর আয়ু খুব বেশী নয়।

ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো মুলার, 'ফ্রাঞ্জ, তোমার জিনিষগুলো আমরা সঙ্গে এসেছি।'

হাতের ইশারায় বললো কেমরিক, 'ওগুলো বিছানার নিচে রেখে দাও।' মুলার ওর নির্দেশ মতো কাজ করলো।

তারপর একজোড়া জুতো নিয়ে আবার হাজির হলো সে। নরম চামড়ার ইংলিশ বুট। জুতোটা ওর খুব পছন্দ। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলো মুলার, 'ফ্রাঞ্জ, তুমি কি তাহলে এই জুতো জোড়া তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

আমাদের তিনজনের ভাবনা একই; ও যদি একান্ত ভালোও হয়ে ওঠে, মাত্র এক পাটি জুতো ব্যবহার করতে পারবে ও। তাই একজোড়া জুতো ওর কোনো কাজেই লাগবে না। কিন্তু এখন ওর যা অবস্থা, ওর মৃত্যু হলে আর্দালিরা ওর সব জিনিষপত্র তারা হাতিয়ে নেবে সঙ্গে সঙ্গে।

'তা তুমি কি ওই জুতোজোড়া আমাদের কাছে রেখে দিতে পারো না?' মুলার তার কথার পুনারাবৃত্তি করলো। 'বেশ, যদি নাও পারো, আমরা বদলা বদলি করে নিতেও তো পারি, পারি না?'

কিন্তু তবু কেমরিক ওর সিদ্ধান্তে অটল। শেষ পর্যন্ত ওর জুতোজোড়া বিছানার নিচে রেখে দেওয়া হলো। তারপর সামান্য দু'একটা কথা বলে আমরা বিদায় নিলাম ওর কাছ থেকে।

'বিদায় ফ্রাঞ্জ, বিদায়।

আমি আর মুলার পরদিন সকালে আবার আসবো বলে ওকে কথা দিয়ে এলাম। মুলার তখন ভাবছিল, তার সাধের বুটজোড়াটা ঠিক জায়গায় থাকবে তো তখন!

বাইরে বেরিয়ে এসে আর্দালিকে বললাম, 'যন্ত্রনায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে কেমরিক, এক ডোজ মরফিয়া দিও ওকে।'

সরাসরি আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বললো সে, 'প্রত্যেককে যদি মরফিয়া দিতে হয়, তাহলে তো পুরো এক টব মরফিয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'তার মানে কেবল মাত্র অফিসারদের মদত করবে তোমরা? ক্রুদ্ধস্বরে বললো ক্রপ।

তাড়াতাড়ি ওকে বাধা দিয়ে আর্দালিকে একটা সিগারেট দিলাম আমি। সিগারেটটা গ্রহণ করলো সে। আমি তখন থাকতে না পেরে বললাম, 'এবার তাহলে ওকে মরফিয়া দেবার ব্যবস্থা করবে তো?'

বিরক্ত হলো সে। 'এই সহজ কথাটা যদি বুঝতে না পারেন তো জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

এবার আরো কয়েকটা সিগারেট তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'দয়া করে আমাদের একটু অনুগ্রহ করো…'

'ঠিক আছে, তাই হবে', বললো আর্দালি।

মুলার সেই বুটজোড়ার কথা যেন ভুলতে পারছিল না। সেই প্রসঙ্গে ফিরে এলো সে আবার। 'ওই জুতোজোড়া আমার পায়ের উপযুক্ত। আর এই জুতোজোড়ায় ক্রমাগত ফোসকা পড়ে যায়। তুমি কি মনে করো আগামীকাল ড্রিলের পরেও বেঁচে থাকবে ও? আজ রাতে যদি ও মারা যায়, আমরা জানি বুটজোড়াটা কোথায়—'

কোনো কথা না বলে অনেকক্ষণ ধরে আমরা হেঁটে চললাম। ক্রপকে এখন অসম্ভব শান্ত দেখাচ্ছিল। কেমরিকের ব্যাপারে লাল সংকেত পেয়ে গেছে সে।

'আচ্ছা, ক্যানটোরেক তোমাকে কি লিখেছেন? মুলার জিজ্ঞেস করলো তাকে।

হাসলো সে। 'লোহার মতো শক্ত সমর্থ যৌবন আমাদের।'

'হ্যাঁ, ওঁরা এই ভাবেই চিন্তা করে থাকেন, ওঁর মতে হাজার হাজার ক্যানটোরেকের চিন্তাধারা এই রকমই। শক্ত সমর্থ যৌবন। আমাদের বয়স এখন কারোরই কুড়ি বছরের বেশী নয়। কিন্তু যৌবন? সে তো কবেই পেরিয়ে এসেছি আমরা। যুদ্ধ আমাদের শেষ করে দিয়েছে, যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে গেছি যেন।

□ দুই □

এখন ভাবতে অবাক লাগে আমার লেখার টেবিলের ড্রয়ারে একটা নাটক, আর একগুচ্ছ কবিতা পড়ে আছে। কত সন্ধ্যাই না কেটেছে সেগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে। আমরা সবাই এক ধরণের কাজে লিপ্ত থাকতাম তখন—কিন্তু সে সব এখন এতো অসত্য বলে আমার মনে হয় যে, আমি আর উপলব্ধি করতে পারি না। যে মুহূর্তে আমরা এখানে এসেছি, তখন থেকেই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়টার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এর একটা ব্যাখ্যা খোঁজার জন্যে আমরা প্রায়ই সেই ফেলে আসা মধুময় দিনগুলোর ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকি, কিন্তু সফল হই না

কখনো। কেবলি মনে হয়, কোথায় হারিয়ে গেছে যেন সেই সোনালী দিনগুলো, ছেলেবেলার সেই ভালোলাগা দিনগুলো আর নেই। ক্রপ, মুলার, লীর আর আমার মতো কুড়ি বছরের তরতাজা যুবকদের কাছে সব কিছুই সবিশেষ অস্পষ্ট, ক্যানটোরেকের ভাষায় আমরা যারা 'শক্ত সমর্থ যুবক।' বয়স্কদের সবার অতীত জীবনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। তাদের স্ত্রী, পুত্র আছে, তারা ভালো ভালো পেশায় নিয়োজিত, আগ্রহ আছে তাদের, তাদের ভবিষ্যত এতোই প্রবল যে, যুদ্ধ তাদের কোনো ভাবেই নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আর আমাদের মতো যুবকদের আছে কেবল অভিভাবকরা, আর সম্ভবত একটি করে বান্ধবী—তাও খুব বেশী নয়, কারণ আমাদের ওপর অভিভাবকাদর প্রভাব এতোই বেশী যে, আমাদের ওপর মেয়েরা ঠিক মতো দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

হয়তো ক্যানটোরেক বললেন, জীবনের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। পরবর্তী পদক্ষেপের পথ খোলা নেই আমাদের সামনে। যুদ্ধের স্রোতে ভেসে চলেছি আমরা এক অনিশ্চিত জবিনের দিকে। অথচ অন্যদের কাছে, বয়স্কদের কাছে মনে হবে, এই যুদ্ধ শুধুই তাদের জীবনে একটা ক্ষণিকের বাধা বা বিঘ্ন মাত্র। এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না তারা। কিন্তু আমরা? আমরা জানি না, যুদ্ধ আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে? আমরা কেবল জানি, আমাদের কোন এক ভাগ্যের পরিহাসে আমরা যেন এক বাতিল, পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হয়ে গেছি। সে যাইহোক আমরা তাতে একটুও দুঃখিত নই।

কেমরিকের বুটজোড়া পেলে যদিও মুলার খুবই খুশি হবে, কিন্তু আর পাঁচ জনের মতো ওর অভাববোধটা সহ্য করতে পারবে না সে। তবে সব কিছুই পরিস্কার ভাবে নিতে চায় সে। সেই বুটজোড়া কেমরিকের কাছে অপ্রয়োজনীয়, অথচ সেটা বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারবে মুলার। কেমরিক মারা যাবে, আর সেই জুতোজোড়া কে পাবে, সে নিয়ে এমনি চিন্তা করাটা অবাস্তব জেনেও বলতে হয়, কেনই বা মুলার সফল হবে না এক্ষেত্রে? হাসপাতালের আর্দালির থেকে তার অধিকারই বেশী। কেমরিক যখন মারা যাবে, তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। সুতরাং এখন থেকেই নজর রেখে চলেছে মুলার।

অন্য সব দিকগুলো বিবেচনা করতে আমরা ভুলে গেছি, কারণ সেগুলো কৃত্রিম। আমাদের কাছে কেবল ঘটনাগুলোই সত্য ও জরুরী বলে মনে হয়েছে। আর ভালো একজোড়া জুতো বড়ই দুষ্প্রাপ্য।

আমরা কুড়িজন যুবক, সেই প্রথম দাঁড়িয়ে গর্ববোধ করে যখন আমরা ব্যারাকে ডিষ্ট্রিক্ট কম্যান্ডারের কাছে আমাদের নাম লেখাতে যাই, তখন আমাদের

ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। আর সেই অল্প বয়সে অনভিজ্ঞ আমরা আমাদের ভবিষ্যত কি পেশা হবে, জানবোই বা কি করে? আমাদের সামনে সেই বয়সে তখন কেবল যুদ্ধে যাওয়ার একটা রোমাণ্টিক মানসিকতা গড়ে ওঠা ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। সেনাবিভাগে দশ সপ্তাহের ট্রেনিং নিতে হয় আমাদের, স্কুলে দশটা বছর কাটানোর থেকে এই ট্রেনিং পিরিয়ড অনেক বেশী প্রভাব ফেলে আমাদের জীবনে। আমরা তখন বেশ ভালো ভাবেই জেনে গেছি, একটা মিলিটারি বোতামের উজ্জ্বলতা চার খণ্ডের স্কোপেনহরের থেকেও অনেও বেশী আকর্ষণীয়। এই ব্যবধানটা বুঝতে গিয়ে প্রথমে প্রচণ্ড বিস্ময় জাগে আমাদের মনে, তারপর তীব্র বিরোধিতা, এবং সব শেষে একটা ঔদাসিন্য ভাব জেগে ওঠে। তারপরেই আমরা উপলব্ধি করি, যাইহোক না কেন, এক্ষেত্রে মনের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু আসল সম্পর্ক ভালো ভালো পোশাক, বুট জুতো; বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু আসল লক্ষ্য রীতি নীতির দিকে স্বাধীনতা নয়, ড্রিল ও ব্যায়ামের মাধ্যমে চরিত্র ও দেহের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখা বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছে ও উৎসাহের জন্যেই আমরা সৈনিক হতে পেরেছি, কিন্তু তারা আমাদের বার করে দেবার জন্যে সব রকম চেষ্টা করে গেছে। তিন সপ্তাহ পরে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমাদের ওপর প্রভুত্ব করার যে ক্ষমতা আমাদের অভিভাবকদের, আমাদের শিক্ষকদের ছিলো, তার থেকেও বেশী কতৃত্ব রয়েছে পরিপাটি করে চুল আচড়ানো একজন পোষ্টম্যানের। আমাদের তারুন্যের সজাগ দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখলাম পিতৃভূমি সম্পর্কে আমাদের শিক্ষকদের মহৎ ধারণা এখানে ব্যক্তিত্বের আত্মোৎসর্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন অধঃস্তন কর্মচারীর সম্পর্কে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকবে না—উর্ধতন কতৃপক্ষে স্যালুট জানানো, প্যারেড মার্চ করা, আপমান বোধ করলেও মুখ বুজে থাকা ইত্যাদি। আমাদের অনুমান, আমাদের কাজ খুবই কঠিন হবে আমাদের কেবল বুঝতে হবে যে, দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করে বীর হওয়া, যেন আমরা সার্কাসের গর্দভ। কিন্তু খুব শীগ্‌গীরই আমরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, এর মধ্যে কিছু জিনিষ যে প্রয়োজনীয় সে শিক্ষা আমরা পেয়ে গেলাম আর বাকী সব লোক দেখানো শুধু। সে ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্যে সৈনিকদের নাক যথেষ্ট উঁচু।

সেনা বিভাগে তিন চার ধরণের প্লেটুন ছিলো, এদের মধ্যে ছিলো মাছধরা জেলে চাষী এবং শ্রমিক ভাইরা, খুব শীগ্‌গীর আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। কর্পোরাল হিমেলটোসের অধীনে নয় নম্বর প্লেটুনে গেলাম ক্রপ, মিলার, কেমরিক আর আমি। ক্যাম্পে কঠোর শাসক হিসেবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিলো, আর তার জন্যে গর্বিতও তিনি। ছোটখাটো চেহারায় শৃগালের মতো ধূর্ত চোখ। বারো

বছরের চাকরী জীবনে তাঁর শুরুটা হয়েছিল পেটিম্যান হিসেবে। ক্রপ, ট্যাডেন, ওয়েস্থাস আর আমাকে তাঁর বিশেষ অপছন্দ। আমার কোনো কাজেই তাঁর পছন্দ হয় না। যতো সব কঠিন কাজ দেওয়া হতো আমাদের। একবার তো ক্রপ আর আমাকে হাত ঝাঁটা আর ডাস্টপ্যান দিয়ে ব্যারাকস্কোয়ারের তুষার পরিস্কারের কাজ দেওয়া হয়। হঠাৎ সেই সময় একজন লেফটেনান্ট সেখানে এসে হাজির না হলে আমরা হয়তো বরফে জমে যেতাম। কিন্তু এর ফলে আমাদের প্রতি আরো বেশী ঘৃণা করতে শুরু করলেন হিমেলস্টোস। পরপর ছয় সপ্তাহ এক নাগাড়ে প্রতি রবিবার ছুটির দিন আমাকে ডিউটি দিতে হলো ওর নির্দেশে। পিঠে ভারী ঝোলা আর কাঁধে রাইফেল নিয়ে সদ্য লাঙল দেওয়া ভিজে মাঠে আমাকে প্র্যাক্টিস করতে হলো। আর মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছিলেন তিনি : 'আরো, আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।' এবং 'মাটিতে শুয়ে পড়ো।' কাদামাটিতে মাখামাখি হয়ে যতক্ষণ না আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি ততক্ষণ এই ভাবে জোর করে আমাকে দিয়ে প্র্যাক্টিস করানো হলো।

এক রোববার ক্রপ আর আমি টেনে হেঁচড়ে একটা শৌচাগারের ঝুড়ি নিয়ে আসছিলাম, সেই সময় বেশ সাজগোজ করে হিমেলস্টোস এসে দাঁড়ায় আমাদের সামনে, এবং জানতে চাইলো, কাজ আমাদের কেমন লাগছে। আমরা কোনো কথা না বলে তখন তাঁর পায়ের ওপর ঝুড়ির ময়লাগুলো উপুড় করে দিই। ক্ষেপে উঠলো সে, কিন্তু তাঁর রাগের সীমা তখন ছাড়িয়ে গেছে।

'তাঁর মানে ঠুনকো শব্দ ?' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

কিন্তু ক্রপেরও যথেষ্ট শাস্তি হয়ে গিয়েছিল তখন। 'প্রথমে তদন্ত হবে।' বললো সে, 'তারপর আমরা ওই নোংরাগুলো তুলবো।'

'মনে রেখো তুমি একজন নন কমিশনড অফিসারের সঙ্গে কথা বলছো।' রাগে উত্তেজনায় ফুঁসে উঠলেন হিমেলস্টোস। 'তুমি কি তোমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছো ?' দাঁড়াও, তোমাদের মজা দেখাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ করপোরাল দেখান তাই।' বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে সমানভাবে চিৎকার করে উঠলো ক্রপ।

'এই আস্তাকুরের জল তোমাদের খেতে হবে।' হুমকি দিলেন হিমেলস্টোস। কিন্তু তারপরেই আমাদের ওপর তাঁর সব কর্তৃত্ব শেষ। তারপর তিনি আর একবার লাঙল দেওয়া ভিজে মাঠে নিয়ে গিয়ে আমাদের ছুটিয়ে দিলেন, চিৎকার করে হুকুম করেছিলেন, 'যাও এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও…মাটিতে শুয়ে পরো…'। আমরা তাঁর হুকুম অমান্য করেছিলাম, তিনি তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি অবার হুকুম করে বসেন। কিন্তু আমাদের তখন চরব অবস্থা, ঘামতে শুরু করার আগেই তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তারপর তিনি আমাদের

ছেড়ে গেলেন, তখন আমাদের নিস্কৃতি পাওয়া তার হাত থেকে, শান্তি বিরাজ করতে থাকে আমাদের মধ্যে। তবে দেখা হলেই তিনি আমাদের শুয়োরের বাচ্চা বলে সম্বোধন করতে ছাড়তেন না কখনো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সামনা-সামনি হলে সমীহ করতে ছাড়তেন না।

আরো অনেক স্টাফ করপোরাল ছিলেন, বেশীর ভাগই ছিলেন চমৎকার মানুষ। তবে প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, প্রত্যেকেই আমাদের কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করতেন। আর সেটা তারা আদায় করে নিতেন কঠোর ভাবে। কঠোর পরিশ্রম করতে হতো আমাদের। এর ফলে আমাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। উলফ মারা যায় ফুসফুস বড় হয়ে যাওয়ার জন্যে। তবে এর ফলে আমরাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠি, আমরা সন্দেহবাতিক হয়ে পড়ি, ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠি আমরা। আর সেসব আমাদের পক্ষেই ভালো হলো, এতোদিন আমাদের মধ্যে এগুলোর বড় অভাব ছিলো। এ ধরণের ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা না নিয়ে আমরা যদি ট্রেঞ্চে যেতাম, অবশ্যই আমরা তাহলে পাগল হয়ে যেতাম। তাহলে এ সবের জন্যে কি আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম? কিন্তু এ সবের মধ্যে সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য ফল হলো, আমাদের মধ্যে কঠোর ও বাস্তব চেতনাবোধ জেগে উঠেছিল, যা পরবর্তীকালে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগমনে দারুণ ভাবে কাজ করেছিল, এবং সেই যুদ্ধ থেকে আমাদের মধ্যে কমরেডশিপের জন্ম নেয়।

কেমরিকের বিছানার পাশে বসেছিলাম আমি। ওর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে ক্রমশ। তখন আমাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। এদিকে একটা হসপিটাল ট্রেন পৌঁছে গেছে। যেসব আহত রোগীদের স্থানান্তর করার সম্ভাবনা আছে, তাদের নির্বাচন করা হচ্ছে। কেমরিকের বিছানার পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়ে ডাক্তার কিন্তু একবারের জন্যেও তাকালো না।

'পরের বার তোমার পালা আসবে ফ্রাঞ্জ', আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম।

কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে বালিশের ওপর নিজেই উঠে বসল ও। 'ওরা আমার একটা পা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।'

তাহলে দুঃসংবাদটা ও জেনে গেছে। মাথা নেড়ে আমি বললাম, 'তোমার যে কোন একটা পা কেটে গেছে তার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।' কোনো কথা বললো না ও। আমি তখন আবার কথার জের টেনে বললাম, 'ফ্রাঞ্জ, হয়তো তোমার দুটো পা ই কাটা যেতে পারতো। ওয়েগলার তার ডান হাতটা খুইয়েছে। সে আরো খারাপ। তাছাড়া তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।' আমার দিকে তাকালো ও। 'তুমি কি তাই মনে করো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো?' ফিরে আবার জানতে চাইলো ও।

'অবশ্যই ফ্রাঞ্জ। তোমার একবার অপারেশনটা হয়ে গেলেই—'

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললো ও, 'আমি কিন্তু সেরকম মনে করি না।'

'বাজে কথা বলো না ফ্রাঞ্জ, কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে। একটা পা কাটা গেছে তো কি হয়েছে? এখানে ওরা এর থেকেও অনেক বেদনাদায়ক কাজ করছে। ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ফ্রাঞ্জ তোমাকে এখন ভালোমন্দ সব খেতে হবে। এখন তোমার এ অবস্থায় খাওয়াটাই সব কিছু।'

মুখ ঘোরালো কেমরিক। একটু থেমে ধীরে ধীরে বললো ও, 'আমার তো অনেক কিছুই হওয়ার ইচ্ছে ছিলো বন্ধু—'

'সে সম্ভাবনা তো এখনো রয়ে গেছে', আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম। 'এখন কতো কৃত্রিম পা পাওয়া যায়। তুমি হয়তো জানো না, দেহের আরো কতো নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই না পাওয়া যায়। কৃত্রিম হাতের আঙুলগুলো তুমি চালনাও করতে পারো, এমন কি লিখতেও পারো।' একটু সময়ের জন্যে স্থির হয়ে শুয়ে থেকে ও আবার বললো, 'মুলারের জন্যে আমার ওই জুতোজোড়া তুমি নিয়ে যেতে পারো।'

ওকে উৎসাহ দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পেলাম না! ওর ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে, মুখের হাঁ বড় হয়ে উঠেছে, সাদা চকের মতো দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছে, দেহের মাংসপেশী শিথিল হয়ে আসছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠছে। ইতিমধ্যে ওর চোখ দুটো বুজে আসতে শুরু করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে বুঁজে যাবে।

এই প্রথম যে ওকে মৃত্যুর পথে সরে যেতে দেখলাম তা নয়। স্কুলে এর ঠিক উল্টো চিত্রই দেখেছি আমরা ওকে হরাইজেনটাল বারে দৈত্যের চেহারায়। এর জন্যে ক্যানটোরেকের কাছে ও ছিলো খুবই গর্বের। আমরা যেন এখন আর সৈনিক নই, বাচ্চা ছেলের থেকে ছেলেমানুষ হয়ে গেছি আমরা এখন। স্নান করার সময় ফ্রাঞ্জ কেমরিককে কি ছেলেমানুষই না দেখাতো। সেই সেদিনের সেই ছেলেমানুষটা এখন শুয়ে আছে মৃত্যু শয্যায়। কিন্তু কেন? সারা পৃথিবীর মানুষ ওর বিছানার পাস দিয়ে যেতে গিয়ে বলবে, 'ওই হলো ফ্রাঞ্জ কেমরিক, সাড়ে উনিশ বছর বয়স, মরতে চায়নি ও। ওকে মরতে দেবো না আমরা।'

আমার চিন্তাগুলো কেবল যেন তালগোল পাকিয়ে গেলো। কারবোলিক আর দেহের পচনের গন্ধ ফুসফুসের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো, দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

ওদিকে সূর্য ডোবার সঙ্গে দিনের শেষ আলোটুকুও উধাও হয়ে গেলো, কেমরিকের মুখের রঙ বদলালো। ঠোঁট দুটো সামান্যই নড়ছিল। আমি তার খুব কাছে গেলাম। ও তখন ফিসফিসিয়ে বললো, ঘড়িটা যদি আমার পাও, তাহলে সেটা

বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।'

আমি উত্তর দিলাম না। এখন তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। হাসপাতালের আর্দালিরা ওষুধের বোতল হাতে নিয়ে অবিরত যাতায়াত করছে। কেমরিকের বিছানার সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছে মুহূর্তের জন্য। আপাত দৃষ্টিতে তাকে দেখে মনে হবে যে, ওকে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। না, আসলে তা নয়, ওদের এখন একটাই উদ্দেশ্য কখন ওর বিছানাটা খালি করা যায়।

ফ্রাঞ্জের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর আয়ু দীর্ঘ করার জন্যে বললাম, 'সম্ভবত ক্লোস্টারবার্গে স্বাস্থ্য নিবাসে তোমাকে পাঠানো হবে। সেখানকার জানালা পথে তাকালে তুমি প্রকৃতিকে দেখতে পাবে, মুগ্ধ হবে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে। এই ভাবে আনন্দ উপভোগ করতে করতে একদিন তুমি সত্যি সত্যি ভালো হয়ে উঠে আমাদের সবাইকে চমকে দেবে। তুমি আবার পিয়ানো বাজাতে পারবে।'

ফ্রাঞ্জ ওর যন্ত্রনা কাতর মুখটা কোনো রকমে তুলে তাকালো আমার দিকে। তখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো ও, অতি ক্ষীণ ভাবে। ওর মুখ সিক্ত চোখের জলে। বোকার মতো কথা বলে কি ভুলই না আমি করেছি, এখন ভাবছি। 'কিন্তু ফ্রাঞ্জ,' সেই ভুল শোধরাতে আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে, আমার মুখটা ওর মুখে ঠেকিয়ে গাঢ় স্বরে বললাম, 'তুমি এখন একটু ঘুমবার চেষ্টা করবে?'

উত্তর দিলো না ও, শুধু কেঁদে চললো অঝোর ধারায় নিঃশব্দে। এই ভাবে কেটে গেলো একটা ঘণ্টা, আমিও ঠায় বসে রইলাম ওর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে যদি কিছু বলে ও শেষ মুহূর্তে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে একই ভাবে চোখের জল ফেলে গেলো? ওর মা, ওর ভায়েদের, ওর বোনেদের, কারোর কথাই জিজ্ঞেস করলো না কেমরিক! ও এখন এক নিঃসঙ্গ ওর উনিশ বছরের ছোট্ট জীবনের একমাত্র সাথী ও নিজেই শুধু। ও এখন কাঁদছে, কারণ এই ছোট জীবনটাকে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে ওকে অসময়ে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর এই যে হতাশা, আকুলতা এ দৃশ্য এই প্রথম আমি দেখলাম, অন্তত মৃত্যু জিনিষটা যে কি, এই বোধটুকু এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম। ফ্রাঞ্জ চলে যাচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে আমাদের সাহচার্য ছেড়ে ওর তো খুবই কষ্ট হওয়ার কথা, এদিকে ওর এই দুঃখ বেদনা দেখে আমিই আমার চোখের জল সামলাতে পারলাম না। ওর আসন্ন বিরহের বেদনা বিদুর হৃদয়েব সব জ্বালা যন্ত্রনা অশ্রু হয়ে গলে গলে পড়লো আবার দু'চোখের কোল বেয়ে। আর তখনি আমি জানতে পারলাম, মৃত্যু কতোই না নির্দয়, নিষ্ঠুর, উদাসীন।

এই সব কথা যখন ভাবছি তখনি হঠাৎ গোঙানি শোনা গেলো কেমরিকের এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো। আমি তখন এক লাফে বাইরে এসে চিৎকার করে উঠলাম: 'ডাক্তার কোথায়? কোথায় ডাক্তার?' এই

সময় সাদা এ্যাপ্রন পরিহিত একজন ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে তাঁর একটা হাত আমি জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তাড়াতাড়ি আসুন ডক্টর, ফ্রাঞ্জ কেমরিকের শ্বাস উঠেছে, ও মারা যাচ্ছে।'

তিনি আমার হাতের বন্ধন ছিন্ন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন আর্দালিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কে সেই রোগী ?'

উত্তরে বললো সে, 'ওই যে ২৬ নম্বর বেড, যার উরু থেকে পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছ।'

নাক সিঁটকালেন ডাক্তার। 'তা আজ আমি পাঁচজন রোগীর পা কেটে বাদ দিয়েছি, নির্দিষ্ট করে কাউকে মনে রাখবো কি করে ?' আমাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে আর্দালিকে বললো সে, 'বরং তুমি গিয়ে দেখো ওকে। প্রয়োজন মনে করলে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসতে পারো।

ডাক্তারের অমন নির্দয় ব্যবহারে আমি তখন রাগে ফুঁসছিলাম। আমার মনের কথা বোধহয় টের পেয়েছিলেন তিনি। তাই আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আজ সকাল পাঁচটা থেকে একটার পর একটা অপারেশন করে চলেছি। তুমি জানো, শুধু আজই ষোলোজনের মৃত্যু ঘটেছে, আর তোমারটা হয়তো সপ্তদশ হতে যাচ্ছো। আর আজ সর্বমোট কুড়িতে গড়াতে পারে—'

লোকটার চরম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা দেখে আমার তখন জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। এরা ডাক্তার নাকি জহ্লাদ ? মনে মনে ভাবলাম, এদের কাছ থেকে এর বেশী কিছু আর আশা করা যায় না।

কেমরিকের বিছানার পাশে এসে যখন দাঁড়ালাম আমরা তখন সব শেষ— আমাদের সব মায়া কাটিয়ে চলে গেছে কেমরিক তখন। মুখটা ওর চোখের জলে ভিজে ছিলো তখনো। চোখ দুটো অর্ধেক খোলা পুরনো পশুশৃঙ্গের বোতামের মতো হলদেটে। আর্দালি আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ওর জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো ?' আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

বলে চলে গেল সে। 'ওকে এখনি আমরা নিয়ে যাবো এখান থেকে। বিছানা খালি করতে হবে। বাইরে মেঝেতে আরো অনেক রোগী পড়ে রয়েছে।'

কেমরিকের জিনিষপত্র সংগ্রহ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার, ঠান্ডা বাতাস তীরের মতো বিঁধছে গায়ে। যতো জোরে সম্ভব বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। এই মুহূর্তে অনুভব করলাম, সান্ত্বনা দেওয়ায় মতো আমার পাশে যদি মেয়েরা থাকতো। হঠাৎ মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ উড়ে এলো কোথা থেকে যেন। আমি তখন জোরে জোরে পা চালালাম। সৈনিকরা আমার পাশ দিয়ে চলে যায় আমি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু তাদের ভাষা বুঝতে পারলাম না। তারা চলে গেলো দূরে। কিন্তু এই রাতটা

থাকবে, আমিও থাকবো।

ব্যারাকের ঘরের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল মুলার। আমি তার হাতে জুতোজোড়া তুলে দিলাম। ঘরে ঢুকে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে দেখলো সে, ভালোই ফিট করেছে।

□ তিন □

বাড়তি সেনাবাহিনী এসে পৌঁছেছে। মৃত সৈনিকদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু বয়স্ক সৈনিক আছে আর বাকী পঁচিশজন সদ্য সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তারা আন্যদের থেকে বছর দুয়েকের ছোট হবে। কনুই-এর ধাক্কা দিয়ে ক্রপ বললো, 'নাবালকগুলোকে দেখলে ?'

কাজিনস্কিও এসে যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। নবাগত সৈনিকদের গ্যাস মাস্ক আর কফি দেওয়া হয়েছিল তখন। তাদের মধ্যে গিয়ে কৈশোরোত্তীর্ণ একজন সৈনিককে ক্যাট জিজ্ঞেস করলো, 'অনেকদিন হলো ভালোমন্দ কিছু খেতে পাওনি, তাই না ?'

দাঁত বার করে হাসলো সে। 'সে আর বলতে! খাবার বলতে তো কেবল ওলকপি সর্বস্ব। প্রাতঃরাশে ওলকপির রুটি; মধ্যাহ্নভোজে ওই ওলকপির স্টু; রাতে নৈশভোজে ওলকপির কাটলেট আর ওলকপির স্যালাড।

'ওলকপির রুটি ?' বললো ক্যাট, 'তোমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হয় যে, ওলকপির রুটি পেয়েছো। আর কাঠের গুঁড়োর রুটি নতুন কিছু নয়। ওই অখাদ্য জিনিষও আমাদের খেতে হয়েছে পেটের জ্বালায়। ক্যাটের কথায় বেদনার সুর ধ্বনিত হলো।

কাজিনস্কি ছাড়া কোনো কাজই করতে পারি না আমরা। ষষ্ঠ রিপু তার খুবই সক্রিয়। সর্বত্র এরকম এক একজন মানুষ থাকে, কিন্তু প্রথমে কেউ তার প্রশংসা করতে চায় না। প্রত্যেক কোম্পানীতে এরকম লোক একজন কিম্বা দুজনও থাকে। আমি জানি কাজিনস্কি খুবই স্মার্ট। পেশায় সে মুচি। তবে আমার বিশ্বাস, তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ সব রকম পেশা সে ভালোই বোঝে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে ভালই হয়েছে, যেমন হয়েছে ক্রপ আর আমার মধ্যে, এমন কি হেই ওয়েস্থাসের সঙ্গেও। হেই অবশ্য ক্যাটের ডান হাত যাকে বলে, তার হুকুমেই ওয়েস্থাস চলে। অবশ্য এ ব্যাপারে তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা আছে।

যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একটা একেবারে অজানা জায়গায় আমরা

নামলাম। একটা ছোট অন্ধকার কারখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। বিছানা নয় বরং বাঙ্কই বলা যায়, সেটাই আমাদের রাত কাটানোর আস্তানা—কতকগুলো কাঠের বীম, তার ওপর তারের জাল। তারের জাল খুবই শক্ত, গায়ে ফোটে। সেটার ওপর পাতার জন্য আর কিছু ছিলো না। আমাদের ওয়াটারপ্রুফও খুব পাতলা। তাই আমরা আমাদের কম্বলগুলো ব্যবহার করি।

জায়গাটা ভালো করে দেখে নেওয়ার পর ওয়েস্থাসের উদ্দেশে ক্যাট বলে উঠলো, 'এসো আমার সঙ্গে।' বোমা ফাটানোর জন্যে তারা চলে গেলো। আধঘণ্টা পরে তারা আবার ফিরে এলো হাত ভর্তি খড় নিয়ে। ভয়ঙ্কর খিদে না থাকলে আমরা এখন ঘুমোতে পারি।

তারপর একজন আর্টিলারিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো ক্রপ, 'এখানে কোথাও ক্যান্টিন আছে?'

'এখানে মানে কি বলতে চাও তুমি?' বললো সে। এখানে ওসব কিছু নেই।

'তার মানে এখানে কি জনবসতি বলতে কিছু নেই?'

থুথু ছিটালো সে। 'হ্যাঁ আছে, খুবই অল্প। কিন্তু তারা রান্নাবাড়িতে ঝুলে থাকে, আর ভিক্ষে করে।'

'এটা খুবই খারাপ। তাহলে তো কাল সকালের রেশনের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করে থাকবে হবে।'

কিন্তু এই সময় দেখলাম মাথায় টুপি চাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাট।

'কোথায় যাচ্ছো ক্যাট?'

'এই জায়গাটা একটু ঘুরে বেরিয়ে দেখতে চাই। তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসলো আর্টিলারিম্যান। 'যাও বেরিয়ে এসো। তবে যা পাবে কষ্ট করে যেন এনো না সেগুলো।'

বিরক্ত হয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম অবশেষে। ক্রপ একটা সিগারেট দু'ভাগ করে অর্ধেকটা আমাকে দিলো, বাকি অর্ধাংশ লাইটার জেবলে ধরালো সে। তারপর কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে আমরা যখন বিছানায় শুতে যাবো, ঠিক সেই সময় দরজা খুলে যেতেই ক্যাটকে ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেখা গেলো। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছি: তার এক হাতে দু'দুটো রুটি আর অপর হাতে রক্তমাখা স্যান্ডব্যাগ ভর্তি ঘোড়ার মাংস।

ওদিকে আর্টিলারিম্যানের মুখ থেকে পাইপটা খসে পড়ে গেলো। সে তখন রুটির কথা ভাবছিল: সত্যিকারের রুটি তো? ওঃ ঈশ্বর, এ যে দেখছি এখনো গরম রয়েছে? কোথায় পেলে?

ক্যাট কোনো কৈফিয়ত দিলো না। রুটি যে সে পেয়েছে, এই যথেষ্ট, কোত্থেকে পেয়েছি, কি বৃত্তান্ত, তার হিসেব দেবার প্রয়োজন মনে করলো না সে। আমি

নিশ্চিত, সে যদি মরুভূমির মাঝখানে যেতো, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে রোষ্ট করা মাংস, খেজুর আর মদও আনতে পারতো।

'কিছু কাঠ কেটে আনার ব্যবস্থা করো', ঝড়ের গতিতে বললো সে ওয়েস্থাসকে।

একটু ইতস্তত করলো আর্টিলারিম্যান। সে তখন অবাক হয়ে ভাবছিল, ক্যাটের প্রশংসা করবো কিনা, আর তা করলে তার নিজের লাভও হতে পারে, গরম গরম ঘোড়ার মাংস আর রুটি। ঘরের মেঝেতেই আগুন জ্বালালো হেই। কারখানার খালি ঘরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। আমরা সবাই বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। ওদিকে আর্টিলারিম্যান যতোই লোলুপ দৃষ্টিতে রান্না মাংসের দিকে তাকাক না কেন, কাজিনস্কি এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, যেন সে তাকে দেখতেই পাচ্ছে না।

ক্যাট জানে ঘোড়ার মাংসের রোষ্ট কি করে করতে হয়। সরাসরি গরম প্যানে রাখলে একটু শক্ত হয়ে যায়। তাই একটু জলে সেদ্ধ করে নিতে হয়। আমরা যে যার ছুরি হাতে গোল হয়ে বসলাম, এবং পেট ভরে খেলাম সেদিন।

এই হলো ক্যাট কাজনস্কি। তার কাছে অসাধ্য বলতে কিছু নেই। সব কিছুই সে ঠিক খুঁজে বার করতে পারে।

রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমরা বসেছিলাম। আমার পাশে বসেছিলো ক্যাট? কথা বলতে চায় সে। আজ আমরা টানা এক ঘন্টা ধরে স্যালুট রত অবস্থায় ড্রিল করেছি শাস্তি হিসেবে, কারণ একজন মেজরকে যথেষ্ট স্মার্টের সঙ্গে স্যালুট জানায়নি ট্যাডেন। সেই ঘটনাটা মন থেকে ছেঁটে ফেলতে পারছিল না ক্যাট।

'আমি তোমাদের বলে রাখছি, এ যুদ্ধে আমরা হারছি, কারণ আমরা খুব ভালো স্যালুট জানাতে পারি, বললো সে।

তার কথায় ঠিক সায় দিতে পারলো না ক্রপ। দুজনেই জোর তর্ক লাগিয়ে দিলো। দুজনেই দুজনের স্বপক্ষে জোড়ালো যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলো। একই সময়ে আমাদের মাথার ওপরে বিমান যুদ্ধের ফলাফল জেনে বীয়ারের বোতলের ছিপি খুলে ফেলেছিল উৎসব করার জন্যে। কাজিনস্কিকে তার মতামত থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না, যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। গান গেয়ে উঠলো সে:

'একই কাজ একই বেতন হোক সবার,
দিন এসেছে গান গাওয়ার যুদ্ধ শেষের।'

অপর দিকে ক্রপ বড় ভাবুক। তার প্রস্তাব হলো, যুদ্ধ ঘোষণা করার দিন একটা জনপ্রিয় উৎসব করতে হবে, প্রবেশপত্র দিতে হবে, ষাঁড়ের লড়াইতে যেমন হয়। তারপর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দুই দেশের মন্ত্রীরা আর জেনারেলরা সাঁতারের পোশাক

পরে গদা হাতে এসে হাজির হবে আমাদের সামনে। সেই গদাযুদ্ধে যে অক্ষত থাকবে শেষ পর্যন্ত তার দেশই জয়ী বলে ঘোষিত হবে। আর সেটাই হবে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে অনেক সহজ ও সঠিক পন্থা, কারণ ভুল লোকেরা যুদ্ধ করে।. আর এই সহজ পন্থা অবলম্বন করলে এই সব ভুল লোকদের যুদ্ধে নামানোর হাত থেকে রেহাই পাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো। তবে প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তার বদলে চলে আসে ড্রিলের প্রসঙ্গ।

একটা ছবি আমার সামনে ফুটে উঠলো। ব্যারাক-ইয়ার্ডে এক জ্বলন্ত দুপুর। শরীর জ্বলছে। ব্যারাকগুলো যেন এক একটা মরুভূমি। সব কিছু ঘুমিয়ে আছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে যুদ্ধের দামামা। ব্যারাকের জানালাগুলোর সামনে এক নিঃসীম শূন্যতা আর অন্ধকারে ভরা। কয়েকটা জানালায় ভিজে ট্রাউজার ঝুলছে শুকোবার জন্যে। ঘরগুলো ঠান্ডা. যে কেউ তাকিয়ে থাকে সেদিকে দীর্ঘ সময় ধরে। এরই মধ্যে অনেকে তাদের ঘরের ছবি আঁকে—নির্ভাবনার জীবন, যুদ্ধ নয়, শান্তি, সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ, গাঢ় ঘুম, ধূমপান আর মনের মতো পোষাক।

জীবন্ত রঙ দিয়ে সেই ছবি আঁকে কাল্পনিক। তবু আমরা এই ছবির মধ্যে কিসের অভাব যেন দেখতে পাই—সেটা হলো, আমরা আর ফিরে যেতে পারবো না সেই মায়াবী, ছায়াঘন একটা নিশ্চিত নির্ভাবনার ঘরোয়া পরিবেশে। এর পর আমাদের ভাবনা আর এগোবার সাহস পায় না।

সেই প্রাতঃকালীন সময়ের নির্দেশ—'৯৮ রাইফেলের যন্ত্রপাতি কি কি?' দুপুরের শারীরিক চর্চা—'কণ্টকময় ফরোয়াড' মার্চ', লেফট-রাইট, লেফট-রাইট··· তারপর রান্নাঘরে আলুর খোসা ছাড়ানোর জন্যে রিপোর্ট করা।'

আমরা স্মৃতিচারণে মেতে উঠি হঠাৎ হেসে উঠে ক্রপ বললো, 'লোহনে বদল করতে হবে।' এ হলো আমাদের কর্পোরালের অতি প্রিয় খেলা। লোহন হচ্ছে রেলওয়ে জংসন। এর উদ্দেশ্য, যাতে আমাদের অনুগামীরা হারিয়ে না যায় সেখানে। ব্যারাকের ঘরে এই বদল করার অনুশীলন করে থাকে হিমেলষ্টোস। সেটা আমাদের শিখতে হয়েছিল লোহনে ব্রাঞ্চ-লাইনে পৌঁছনোর জন্যে, সাবওয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে। বিছানাগুলো সাবওয়ের প্রতীক। প্রত্যেককে তাদের বিছানার বাঁ-পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তারপরেই ভরাট গলায় হুকুম—'লোহনে বদল করতে হবে।' আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে প্রত্যেকে আমরা যে যার বিছানার বিপরীত দিকে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে যেতে থাকি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই অনুশীলন চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে জার্মান বিমান কামানবিদ্ধ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। ক্রপ তার বীয়ারের বোতল হারিয়ে ফেলেছে। বিরক্ত হয়ে সে তার ওয়ালেটের টাকা গুণতে থাকে।

'একজন পোষ্টম্যান হিসেবে হিমেলস্টোস যে একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, অ্যালবার্টের বিরক্তিভাবটা প্রশমিত হয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, 'কিন্তু একজন ড্রিল সার্জেণ্টের পক্ষে এতো হম্বিতম্বি করা সম্ভব হয় কি করে?

ক্রপ শুনেছে, ক্যাণ্টিনে এক ছিটেফোটা বীয়ারও অবশিষ্ট নেই। সে তার সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে বললো, 'শুধু হিমেলস্টোস নয়, তাদের প্রায় সবারই এই একই দশা। অতিরিক্ত বীয়ার পান করে তারা অন্য এক জগতের মানুষ হয়ে যায় তখন।'

'মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে,' দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়েই ছিলো ক্যাট, 'তবে এ ব্যাপারের মূল সূত্রটা অন্য কোথাও রয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক, তুমি যদি একটা কুকুরকে আলু খাওয়াতে অভ্যস্ত করো, আর তারপর তার সামনে একটা মাংসের টুকরো ধরো, সে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নেবে। এটাই তার স্বভাব। আর তুমি যদি কাউকে তার ব্যবহারের মদত দাও, সে-ও তাহলে তার সেই ব্যবহারটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে একই ভাবে। ব্যাপারটা তাহলে একই ধরণের বোঝা যাচ্ছে। মানুষ মাত্রই এক একটা পশু। সে কেবল তার পশু প্রবৃত্তির ওপর একটা ভদ্রতার প্রলেপ লাগিয়ে নেয়, যেমন করে রুটির ওপর মাখন মাখানো হয়। আমাদের সেনাবাহিনীর চরিত্রই এই ভাবে গঠিত। অন্যের ওপর একজনের সব সময় প্রভাব বিস্তার করতেই হবে। ঝামেলাটা হলো নেহাতই একজনের ওপর আর একজনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা। একজন নন কমিশনড অফিসার তার অধঃস্তন কর্মচারীদের ওপর, একজন লেফটেনাণ্ট একজন নন কমিশনড অফিসারের ওপর, একজন ক্যাপ্টেন একজন লেফটেনাণ্টের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে, যতক্ষণ না সে পাগল হয়ে যায়। কারণ তারা যখন তাদের ক্ষমতার কথা জেনে যায়, তখন কম বেশী তারা সেই অভ্যাসের দাস হয়ে যায়। আর এটা সম্ভব কেবল সেনা বিভাগেই, অসামরিক বিভাগে এরকম ঘটনা ঘটলে তুমুলকাণ্ড বেধে যেতো কর্মচারীদের মধ্যে।'

'অথচ এই সেনা অফিসাররাই দাবী করে থাকে, নিয়মানুবর্তিতা শেখার জন্যে,' মন্তব্য করলো ক্রপ।

'কথাটা খুবই সত্য।' গর্জে উঠলো ক্যাট। 'ওরা সব সময় তাই করে থাকে, তবু মুখ খারাপ করা উচিত নয়। কিন্তু তুমি যদি ব্ল্যাকস্মিথ কিংবা শ্রমিক কর্মচারীদের বোঝাতে যাও এ ব্যাপারে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জবাব দেবে, তারা কারখানা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, তারা জানে, তাদের যা পেশা, তারা জানে কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না? এটা স্রেফ হাস্যকর ব্যাপার। আমি তোমাদের বলে রাখছি, এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে টমির দল ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র, এ ওকে আঁচড়াচ্ছে।

কামড়াচ্ছে। যুদ্ধের নামে এর থেকে আর কি হাস্যকর হতে পারে বলো?'

কেউ প্রতিবাদ করে না। সবাই জানে, যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রিল বা কুচকাওয়াজ বন্ধ থাকে, তখন সৈনিকদের একমাত্র চিন্তা শত্রুপক্ষের ওপর কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘন ঘন স্যালুট জানানো, প্যারেড করা, এ সবই অবাস্তব। এ যেন লৌহ মানবের আইন, লোহার মতোই কঠিণ, যা ভাঙ্গা যায় না।

ট্যাডেন ছুটে এলো, তার মুখটা উজ্জ্বল, বুঝি বা একটু উত্তেজিতও বটে। খুশির মেজাজে তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'হিমেলস্টোস ফ্রণ্টে যাওয়ার পথে।'

হিমোলস্টোসের ওপর একটা বিশেষ আক্রোশ ছিলো ট্যাডেনের কারণ ব্যারাকে তাঁর ট্রেনিং মনপুতঃ নয় তার। এতো কঠোর নিয়মে চলতে হলে অতি সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যাওয়ার কথা শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সুস্থ ভাবে বাঁচতে চায় ট্যাডেন! আর তাই কি হিমেলস্টোসের ওপর তার এতো রাগ।

ইতিমধ্যে হেই এসে বসেছিল আমাদের পাশে। আমার দিকে চোখ পিটপিট করে একবার তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবতে বসলো সে। ফ্রণ্টে যাওয়ার আগের দিন আমরা আমাদের সৈনিক জীবনে আর একটা সুন্দর দিন কাটালাম। সম্প্রতি নতুন তৈরী একটা রেজিমেণ্টের জন্যে আমরা নির্বাচিত, কিন্তু প্রথমে আমদের যন্ত্রপাতির জন্যে গ্যারিমনে ফেরত পাঠানো হবে, অবশ্যই অতিরিক্ত সেনা বাহিনীর ডিপোতে নয় তবে অন্য আর একটা ব্যারাকে। আগামীকাল সকালে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা আমাদের। সন্ধ্যায় হিমেলস্টোসের সঙ্গে হিসেবপত্র নিকেশ করার জন্যে আমরা প্রস্তুত।

এটা করার জন্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা শপথ নিয়ে রেখেছি। আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে ক্রপ, তো ঠিক করেই রেখেছে যুদ্ধ শেষ হলে শান্তির সময়ে পোষ্টাল সার্ভিসে কাজ নেবে সে, যাতে করে হিমেলষ্টোসের বস হতে পারে, কারণ তার ধারণা, যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি অপর পোষ্টম্যানের পদেই ফিরে যাবেন। কি করে তাঁকে শায়েস্তা করবে, ফিবে আবার ভাবতে বসলো সে। আমরা সব সময়েই ভাবি, যুদ্ধশেষে তাঁর ওপর প্রতিশোধ আমরা নেবোই। আমরা সবাই ঠিক করে য়েখেছি, আমরা তাঁর সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলবো। তিনি আমাদের চিনতে না পারলে কি ক্ষতিই বা করতে পারেন তিনি আমাদের? আর যদি আমরা খুব ভোরে এখান থেকে চলে যাই?'

আমরা জানতাম প্রতিদিন সন্ধ্যায় কোন সরাইখানায় তিনি যান। ব্যারাকে ফিরে অন্ধকারে এমন পথ দিয়ে তিনি যান, যা সচারচর কেউ ব্যবহার করে না। পাথরের স্তূপের আড়ালে আমরা ওৎ পেতে রইলাম সেখানে। আমার সঙ্গে একটা বেড কভার ছিলো। রহস্যের আবর্তে পড়ে আমরা তখন থরথর করে কাঁপছিলাম।

এই আশায় যে, তিনি নিশ্চয়ই একা আসবেন। অবশেষে তাঁর পায়ের শব্দ আমরা চিনতে পারলাম, বহু পরিচিত সেই শব্দ, প্রতিদিন সকালে ব্যারাকে আমাদের ঘরের সামনে যে শব্দ আমরা শুনতে অভ্যস্ত; আর তারপরেই তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর 'উঠে পরো।'

আজ হিমেলস্টোসের মনটা যেন একটু উদার, গান গাইছিল সে। তার বেল্টের বাকলটা জ্বলজ্বল করছিল। এখানে আসতে গিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি।

ওদিকে আমরা তখন প্রস্তুত হাতে বেডকভার নিয়ে! পাথরের আড়াল থেকে বেডকভারটা ছুঁড়ে দিলাম তার মাথার ওপরে, আর এমন ভাবে চাদরটা তার আপাদমস্তক আঁটো করে জড়িয়ে ধরলাম যে, সে তার হাত তোলা দূরে থাক, এক চুল নড়াতেও পারলো না। গান তার থেমে গেলো। পর মুহূর্তেই হেই ওয়াস্থাস এসে হাজির হলো সেখানে, হাত বাড়িয়ে সে আমাদের সরিয়ে দিলো, যাতে করে সেই প্রথম হিমেলষ্টোসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। দারুন সন্তুষ্ট সে, সে তার পজিশন নিয়ে নেয়। সে তার হাত দুটো তুললো, মনে হলো হাত তো নয় যেন কয়লা তোলার কোঁদাল এক জোড়া। আর সেই হাত দুটো সে সাদা নেছকভারে মোড়া হিমিলস্টোসকে এমন ভাবে ঘুষি মারলো যেন ষাড় তাড়াচ্ছে।

তার ঘুষির চোটে পাঁচ গজ দূরে ছিটকে পড়লো হিমেলষ্টোস। সেই সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো সে। আমরা তৈরী হয়েই এসেছিলাম। হেই করলো কি হিমেলষ্টোসের মুখের ওপর বালিশ চেপে ধরলো শক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে হিমেলস্টোসের গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ওদিকে ট্যাডেন তখন তাকে পোষাকমুক্ত করে ফেলেছে তারপর চাবুক হাতে নিয়ে সে তার শেষ কাজটা সম্পন্ন করতে উঠে পড়ে লেগে গেলো।

সে এক চমৎকার ছবি। মাটির ওপর পড়ে রয়েছে। তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে হেই। তার চোখে চরম নিষ্ঠুর হাসি, আর রক্তপিপাসু মুখ। হিমেলস্টোসের মাথাটা তার দু'হাটুর মাঝখানে অতঃপর তার নিষ্ঠুরতা চরমে পেঁছে গেলো, বিরামবিহীন এলোপাথাড়ি ঘুষি চালালেন হেই তার চোখে মুখে। সব শেষে আমরা তার দেহটা টেনে হিঁচড়ে পথের এক পাশে ফেলে রাখলাম, আমাদের প্রতিশোধের খেলা শেষ।

তারপর খেলা শেষের খেলা শেষ করতে মেতে উঠলো হেই আর একবার হিমেলষ্টোসকে দাঁড় করিয়ে সে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্যে তার কানে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারতেই যেন সে শূন্যে আকাশের তারার নিচে স্থান পেলো।

শূন্যে একবার উত্থিত হয়েই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো হিমেলস্টোস। তাকে

আবার দাঁড় করালো হেই। এবং দ্বিতীয়বার ঘুষি মারলো তাকে, চমৎকার লক্ষ্য ছাড়া হাতে। হিমেলস্টোসের আর্ত চিৎকার অন্য কারোর কানে পেঁছনোর আগেই তারা দ্রুত প্রস্থান করলো সেখান থেকে।

আর একবার পেছন ফিরে তাকালো হেই। এবং অপার সন্তুষ্টির মধ্যে রীতিমতো রহস্য করে বললো সে, 'মিণ্ট রিভেঞ্জ।'

এতে হিমেলস্টোসেরও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সব সময়েই বলতো সে, আমরা যেন এ ওকে শিক্ষা দিই এবং নিজেই তার ফল ভক্ষণ করা উচিত। তার শিক্ষা পদ্ধতিতে আমরা এক একজন সফল ছাত্র। কোনোদিনও সে জানতে পারবে না, তার প্রতি এই উচিত শিক্ষা কে বা কারা করতে পারে। সে যাইহোক, তার লাভের মধ্যে কেবল একটা বেডকভার। তবে কয়েক ঘণ্টা পরে সে যখন ফিরে যাবে তখন সেটা আর দেখা যাবে না।

সেই সন্ধ্যার কাজকর্মে আমরা তৃপ্ত, ভীষণ তৃপ্ত, পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা হবে সুখের ও নিরাপদের। আর ওই বুড়ো ভামটা বেশ খুশি মনেই আমাদের চিহ্নিত করবে তরুন নায়ক হিসেবে।

□ চার □

অন্ধকার নামতেই মোটর লরি রাস্তায় নেমে পড়ে। আমরা লাফিয়ে উঠে পড়লাম একটা লরিতে। উষ্ণ সন্ধ্যায় শামিয়ানার মতো গোধূলির আলোর নিচে আজ আমরা একত্রিত, আমরা সবাই সবার বন্ধু এখন। এমন কি বদমেজাজী ট্যাডেনও আজ আমাকে একটা সিগারেট খেতে দিলো, আর নিজেই আমার সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে দিলো সে। আমরা ঘেষাঘেষি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। বসবার একটুও জায়গা ছিলো না। কিন্তু আমরা সেটা আশা করিনি। একবারের জন্যেও অন্তত মুলারকে আজ খুব খুশি দেখাচ্ছিল; সে তার নতুন বুটজুতো পরেছিল।

লরির ইঞ্জিন একবার গর্জে উঠেই চলতে শুরু করলো। রাস্তা অসমান, গর্তে ভরা, মাঝে মাঝেই লরি লাফিয়ে উঠতে থাকে। আলো জ্বালার সাহস ছিলো না, অন্ধকারেই চলতে হলো। যাইহোক, তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই।

এক সময় দূরে থেকে একটা প্রাচীর দেখা গেলো, রাস্তার ধারে একটা বাড়ির প্রাচীর। হঠাৎ আমি আমার নিজের কানে নিজেই খোঁচা দিলাম। আমি কি প্রতারিত? আবার আমি পরিষ্কার ভাবে রাজহংসীর কক্‌কক্‌ শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আর কাজনস্কি পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমরা এ ওকে

বুঝতে পারলাম। ক্যাট মাথা নেড়ে বললো, 'ফেরার পথে এর স্বাদ নেওয়া যাবে, ওদের সংখ্যা আমি জানি।'

অবশ্যই ক্যাট ওদের সংখ্যা কতো জানে। প্রতিটি রাজহংসীর পায়ের খবর সে পেয়ে যায় পনেরো মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে।

আর্টিলারি লাইনে লরিগুলো এসে পেঁছিলো এক সময়। বন্দুকের পোড়া বারুদ আর কুয়াশায় ভারী হয়ে উঠেছিল বাতাস। বন্দুকের আওয়াজে আমাদের লরিগুলো কাঁপছিল। যেন সব কিছুই ভূমিকম্পের আবর্তে পড়ে গেছে তখন। আমাদের মুখের ভাব বদলে গেছে, তখন মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। আমরা অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের সীমান্তে নেই, আমরা এখন সংরক্ষনের তালিকায়, তবু প্রতিটি মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়ে রয়েছে। এই ভেবে যে, এটাই যেন যুদ্ধক্ষেত্র, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে পারি আমরা। গুলি গোলার আওয়াজের প্রচণ্ডতা আমাদের কাছে পেঁছয় না, শব্দটা থিতিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই। কান পেতে শোনে ক্যাট। 'আজ রাতে বোমাবর্ষণ হতে পারে।'

আমরা সবাই কান পেতে শুনি। অশান্ত যুদ্ধক্ষেত্র। 'ইংরেজ সৈনিকরা গুলি চালাচ্ছে,' বললো ক্রপ। আমাদের কাছে খবর আছে, তারা ঠিক ঘড়ি ধরে দশটায় শুরু করে।

'তাদের কি ব্যাপার বলো তো?' বললো মুলার তার ঘড়ির দিকে চোখ রেখে, 'তাদের ঘড়ি কি আগে আগে চলছে?'

'আমি আবার বলছি, সম্ভাব্য বোমাবর্ষনের গন্ধ যেন আমি পাচ্ছি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ক্যাট।

পেছনে আমাদের খুব কাছেই তিন তিনবার গুলির আওয়াজ হলো। এবার কুয়াশা ভেদ করে পোড়া বারুদের ধোঁয়া ভেসে এলো। আমাদের সারা দেহে তখন কাঁপুনি। তবে তারই মাঝে আমরা খুশি হলাম জেনে যে, ভোরের দিকে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারবো। আমাদের মুখ দেখলে তখন মনে হবে না বিবর্ণ, ভীত বিহ্বল, তবে তাই বলে এই নয় যে, উজ্জ্বল বা ভাস্বরও নয়। তবু কোথায় যেন একটা পরিবর্তন লক্ষনীয়। আমাদের মনে হয় যে, রক্তে তখন আমাদের একটা চঞ্চল ভাব, ঘরে ফেরার তাগিদটা প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছিল, মুখে যা প্রকাশ করা যায় না, রক্তের সেই চঞ্চলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়, আর এটাই ঘটনা। আর ঘটনা হলো এই যে, এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে সেই চঞ্চলতা বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করিয়ে দেয়। যে মুহূর্তে প্রথম গুলির আওয়াজ হলো, এবং বাতাসে বারুদের গন্ধ ভেসে এলো, সেই সময় হঠাৎ আমাদের রক্তের প্রতিটি শিরা উপশিরা, আমাদের হাতে আমাদের চোখে একটা ভয়ংকর উত্তেজনার ছায়া পড়তে দেখা উপলব্ধির অধিকারী হয়ে যেতে হয়। আমরা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে

যেতে থাকি। সব সময় এরকমই হয়ে থাকে। আমরা স্রেফ সৈনিক, হয় খুশিতে ভরপুর কিংবা কখনো বা অনুজ্জ্বল। তারপর প্রথমে কামান দাগার মঞ্চ আর আমাদের প্রতিটি কথা নতুন করে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হতে থাকে।

ক্যাট যখন ঘরের সামনে বলে,—'আজ বোমাবর্ষণ হবে, তখন সেটা নেহাতই তার নিজস্ব মতামত। কিন্তু যদি সে এখানে ওই ধরণের কথা বলে, তখন তার সেই উক্তি চাঁদের আলোয় ধারালো বেয়নটের মতো ঝলসে ওঠার কথা, তার এই উক্তি আমাদের জাগিয়ে তোলারও কথা, এ কথার মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা আছে—' বোমাবর্ষণ হবে।' সম্ভবত এটাই তোমাদের জীবনের সব থেকে রহস্যপূর্ণ দিক, যা আমাদের কাঁপিয়ে তোলে, আমাদের মতো প্রহরীদের ওপর একটা বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়।

যুদ্ধক্ষেত্র আমার কাছে যেন একটা ঘূর্নিস্রোতের মতো। আকাশ, বাতাস আর ধরিত্রী বা মাটির কাছ থেকে সৈনিকরা যে সাহায্য পায়, মনে হয় ধরিত্রীর সাহায্যই সব থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য। বোমাবর্ষনের সময় সে যখন মাটির নিচে আশ্রয় নেয় এই ধরিত্রীই নীরবে তাকে আশ্রয় দেয় বোমার আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে।

এক ঘেয়ে কামানের গোলা বর্ষনের শব্দ শুনে আমরা ফিরে যাই আমাদের সেই হাজার হাজার বছর আগের যুগে। পশুর সেই সহজাত প্রবৃত্তি যা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, সেটাই তখন আমাদের চালিত করে, আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এটা সচেতন হওয়া নয়, এটা অনেক দ্রুততর, অনেক নিশ্চিত ভুলভ্রান্তি কম, সচেনতার থেকেও। কেউ এর ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোনো চিন্তা না করে কিংবা মনযোগ না দিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলো সে, বিক্ষিপ্ত ঝড় বয়ে গেলো তার ওপর দিয়ে, কিন্তু তার সৌভাগ্য যে, সেই ঝড় তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তবু সে মনে করতে পারে না, কামানের গোলার আওয়াজ সে শুনেছিল কিনা, কিংবা সেটার ভয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার কথাও চিন্তা করেনি সে। কিসের শক্তিতে, কিংবা কিসের প্রেরণায় কে জানে, রাশি রাশি শবের স্তূপে স্থান হওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল সে।

ভালো মেজাজের সৈনিকের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলি আমরা, তারপর এক সময় যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক যেখানে শুরু হয়েছে সেই সীমান্ত এলাকায় গিয়ে পেঁছলাম আমরা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে আমরা বলির পাঁঠায় পরিণত হয়ে গেলাম।

লরিগুলো ফিরে গেলো। ভোর হওয়ার আগে তারা আবার আসবে

আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

জায়গাটার ওপর কুয়াশা আর কামানের গোলাগুলির ধোঁয়ার একটা আবরণ পড়েছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় সৈনিকদের হেলমেটগুলো চিকচিক করে ওঠে। তাদের মাথা ও রাইফেলগুলো সাদা কুয়াশা ছাপিয়ে উ'কি মারছিল। তারপর এক জায়গায় কুয়াশা ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সৈনিকের অবয়ব, তাদের পরণের কোট, ট্রাউজার, এমন কি পায়ের বুটজোড়াগুলোও চোখে পড়ে। তারা তখন যেন এক একটা সম্মিলিত সৈনিকের স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ মার্চ করে সোজা এগিয়ে যায়, তখন তারা আর আলাদা আলাদা ভাবে দৃশ্যত নয়, যেন একটা স্তম্ভ, আদৌ লোক নয় তারা তখন।

বন্দুক এবং অস্ত্রশস্ত্রের ওয়াগান তাদের পাশাপাশি চলছিল রাস্তার ধার দিয়ে। চাঁদের আলোয় সারিবদ্ধ ঘোড়ার পিছন দিকটা চকচক করছিল। তাদের চলমান দৃশ্যটা চমৎকার দেখাচ্ছিল, তাদের চোখদুটো অসম্ভব জ্বলজ্বল করছিল। হেলমেট পরিহিত ঘোড়ার আরোহীদের অতীত দিনের নাইটদের মতো দেখাচ্ছিল। দৃশ্যটা অতি চমৎকার এবং আকর্ষণীয়।

মাঠের অবস্থা সঙ্গীন, ভাঙ্গা আর গর্ত চারিদিকে। সামনেই সতর্কবাণীর সাইনবোর্ড ঃ 'সামনের দিকে তাকও, বাঁ দিকে কামানের গোলার গভীর গর্ত। আর মনে রেখো, সামনেই ট্রেঞ্চ।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সতর্ক হলো, সাবধানে পা ফেলতে থাকলাম, আর হাতের লাঠিটা সামনের দিকে ফেলতে গিয়ে দেখে নিতে হলো সেটা আমাদের দেহ বহনযোগ্য কিনা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, সামনে একজন লোক এক বাণ্ডিল তার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার ওপর, রাগ হলো লোকটার ওপর।

রাস্তায় কামানের গোলায় বিধ্বস্ত কতবগুলো লরি দেখতে পেলাম। আর একটা নির্দেশ সম্বলিত সাইনবোর্ড ঃ 'সিগারেট আর পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে ফেলো।' আমরা তখন সীমান্তের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ইতিমধ্যে জায়গাটা কালো পিচের মতো অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট জঙ্গল পেরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের মুখোমুখি হতে হলো আমাদের।

আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে এক অনিশ্চিত লাল আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এয়ার-রেড। ফরাসী রকেট ছুটে আসছে।

'বোমাবর্ষণ', বললো ক্যাট।

ঘন ঘন কামাণের গর্জন। মেঘমুক্ত আকাশে বিমানের সার্চলাইটের আলোগুলো বিদ্যুৎচমকের মতো দেখাচ্ছিল। এক ঝাঁক বিমানের সার্চলাইটের আলোগুলো এক একটা প্রকাণ্ড রেখার মতো দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বোমারু বিমান থমকে দাড়িয়ে পড়লো, বুঝিবা একটু কেঁপে উঠল। ঠিক তারপরেই দ্বিতীয় বোমারু বিমানও

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্যে, একটা কালো পোকা তাদের মাঝখানে উড়ে আসে এবং বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করে। বিমানচালক একটু ইতস্তত করে, তার চোখের সামনে কালো স্লেটের মতো অন্ধকার, সে তখন অন্ধ হয়ে গেছে, পরমুহূর্তে আকাশ থেকে বিমান পতনের শব্দ শোনা যায়।

কয়েক ঘণ্টা অবিরাম বোমা বর্ষণের পর একটা শান্তির পরিবেশ ছড়িয়ে পড়লো রণক্ষেত্রে। কিন্তু তখনো লরিগুলো ফিরে আসতে আরো কিছু সময়ের অপেক্ষা। আমরা প্রায় সবাই তখন মাটিতে শুয়ে পড়েছি, অনেকের চোখে ঘুম নেমেছিল। আমিও চেষ্টা করলাম দু'চোখের পাতা এক করার জন্যে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে ঘুম আসা দুষ্কর। আমরা জানি সমুদ্র থেকে খুব বেশী দূরে নেই আমরা, কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুণ প্রায়শই ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল আমাদের। তবু তারই মধ্যে এক সময় নিদ্রাদেবী আমার চোখে ভর করলেন একটু সময়ের জন্যে। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই খেয়াল করতে পারলাম না, আমি তখন কোথায়। অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি তারা ভরা আকাশ, শান্ত আকাশের শান্তি ভঙ্গকারী রকেটগুলো, সব কিছু স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তখন। এমন কি একবার মনে হলো, আমি বোধহয় কোনো বাগানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন সকাল না সন্ধ্যা, তাও জানি না। স্তিমিত চাঁদের আলোর নীচে আমি তখন শুয়ে আছি। অদূরে ফিসফিস শব্দ কানে ভেসে আসছিল। তারপরেই কান্নার আওয়াজ। আচ্ছা আমি কি নিজেই কাঁদছি। আমি যে কাঁদছি, সেই অনুভূতিটাও বুঝিবা হারিয়ে বসে আছি যুদ্ধে বিভীষিকায়, প্রাণ হারাবার আশঙ্কায়। চোখের ওপর হাত রাখলাম, যদি হাতে লাগে চোখের জল। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন আমার। আমি কি ঠাণ্ডায় জমে গেছি? হাত-পা অবশ হয়ে আছে। সারা দেহ যেন বরফের মতো মসৃণ। পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে আমার সময় লাগলো মাত্র এক সেকেণ্ড, আর তারপরেই অস্পষ্ট অন্ধকারে কাজনস্কির ততোধিক অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলাম। বয়স্ক সে, তবু ভয়ে যুদ্ধের আতঙ্কে এই কয়েক ঘণ্টায় তার বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে হলো। শান্ত ভাবে বসে বসে পাইপ টানছিল সে। 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না? ওটা একটা বিপজ্জনক অবতরণ। যাইহোক, ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওটা অবতরণ করেছে।'

আমি উঠে বসলাম। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো। তবে ক্যাট যে এখানে আছে, তাতেই ভালো। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বললে সে: অতো বিপজ্জনক না হলে, এর মধ্যে বাজী পোড়ানোর আনন্দ উপভোগ করা যায়।'

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যেতে থাকলাম সামনের দিকে। দুটি সৈনিক চিৎকার করে উঠলো। আকাশে রকেট ফাটার আওয়াজ,

আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। বিস্ফোরণের অনেক পরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেলো।

আমাদের পাশেই শুয়েছিল সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এক সৈনিক। তাকে ভয়ংকর ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। দু'হাতে সে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। তার হেলমেটটা ভূলুণ্ঠিত। বাচ্চা ছেলের মতো আমার হাতের ওপর ভর দিয়ে সে আমার বুকের মধ্যে তার মুখটা আড়াল করতে চেয়েছিল। তার কাঁধ দুটো কেমরিনের মতো মনে হলো। ভয়ংকর ভাবে আহত সে, তাই তাকে ওই ভাবে শুয়ে থাকতে দিলাম, বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। কে জানে, কেমরিনের মতো একেবারে বিশ্রাম না হয়ে যায় এর ক্ষেত্রেও।

বিস্ফোরণের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত চিৎকার শোনা গেলো, কেউ হয়তো ভয়ংকর আহত। অবশেষে শব্দটা থিতিয়ে পড়লো। আমাদের মাথার ওপর বিরাট এক অগ্নিবলয় এবং ঝরে পড়ছে মাটিতে। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তাকালাম সেদিকে। আকাশে তখন রকেটের বিস্ফোরণ চলছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একটা আক্রমন ঘনিয়ে আসছে। তবে সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

তবে আমাদের অবস্থানের জায়গাটা বেশ শান্ত। উঠে বসে সেই সদ্য নিয়োগ-প্রাপ্ত তরুণ সৈনিকটির কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চিন্তা নেই বৎস, সব শেষ। এখন আর কোন গোলমাল নেই, সব ঠিক।'

সে তখন নিজের দিকে হতবাক হয়ে তাকালো।

তার হেলমেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খুব শীগগীর তুমি ওটা ব্যবহার করতে পারবে।'

সে তখন হেলমেটটা তার মাথায় তুলে নিলো। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকলো সে। তারপর হঠাৎ তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো এবং তাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখালো। সাবধানে সে তার পিঠে হাত রাখলো। বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম ঃ গোলাগুলির আতংক। তবে হেলমেটটা তে তার পেছনে কোমরের ক্ষতস্থান ঢাকার জন্যে ব্যবহার করেছিলাম, তা নয়। 'তোমার আগে এমন অনেকেই বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছে, তাদের প্যান্ট রক্তে সিক্ত হয়ে গেছে। তবে তোমার আঘাত তাদের মতো অতো গুরুতর নয়, ভেতরের আণ্ডারপ্যান্ট রক্তে ভিজে গেছে দেখছি, ওটা ছেড়ে ফেললেই চলবে। ওই ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ওটা ছেড়ে এসো।

চলে গেলো সে। পরিস্থিতি ক্রমশ শান্ত হয়ে এলো। কিন্তু চিৎকারটা তখনো থামলো না 'কি ব্যাপার অ্যালবার্ট?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দূরে সারিবদ্ধ ভাবে এক একটা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—'

চিৎকার চলতে থাকে। এ চিৎকার মানুষের নয়। এমন ভয়ঙ্কর ভাবে মানুষ কখনো চিৎকার করতে পারে না।

'তবে কি আহত ঘোড়াগুলো?' বলল ক্যাট।

অসহ্য। এ যেন পৃথিবীর শোক প্রকাশ করা, এ যেন শহীদের সৃষ্টি হওয়া, বন্য ক্ষোভের প্রকাশ। আবক্ষে ভরা গোঙানির আওয়াজ।

আমাদের মুখগুলো তখন থমথমে। ডেটারিং উঠে দাঁড়ালো। 'ঈশ্বর! ঈশ্বরের দোহাই, ওদের গুলি করো।'

সে একজন কৃষক, আর ঘোড়াগুলো তার খুবই প্রিয়। তারপর যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই আবার আগুণ জ্বলে উঠলো। পশুদের গোঙানির আওয়াজ আরো তীব্র হলো। এমন শ্বেতশুভ্র শান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের ঠিক কোন জায়গা থেকে যে আওয়াজটা আসছিল, কেউ সেটা নির্ধারিণ করতে পারবে না। এ যেন ভৌতিক আওয়াজ, শব্দের উৎস চোখে দেখা যায় না, অথচ শব্দটা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, যার কোনো পরিমাপ নেই। রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো ডেটারিং: 'ওদের গুলি করো! ওদের তোমরা গুলি করতে পারছো না? তোমরা আবার অপদার্থতার পরিচয় দিলে।'

'প্রথমে ওদের লোক খুঁজে বার করতে হবে', শান্ত ভাবে বললো ক্যাট।

আমরা আবার উঠে দাঁড়ালাম, চেষ্টা করলাম, আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে দেখার জন্যে। জানোয়ারগুলোকে আমরা যদি দেখতে পেতাম, তাহলে হয়তো তাদের চিৎকার সহ্য করা যেতো। মুলারের চোখে চশমা, আমাদের থেকে অনেক ভালো ভাবে দেখতে পাচ্ছিলো সে। আর অন্ধকারে আমরা শুধু দেখছিলাম, স্ট্রেচার হাতে বেয়ারাদের আনাগোনা, অস্পষ্ট হলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, এগুলো আহত ঘোড়া সব। তবে সবগুলো নয়, অদূরে কয়েকটা ঘোড়ার পতন দেখলেও একটু পরেই সেগুলোকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে যেতে দেখলাম। একেই বলে জানোয়ারের প্রাণ, মানুষের থেকে অনেক তফাত! একটা ঘোড়ার পেট চেরা— নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। অন্যসব আহত ঘোড়াদের পায়ে পা লেগে একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়ায় সে।

ওদিকে কেটারিং তার হাতের বন্দুকটা তুলে ধরে তাক করতে যায়। সেই দেখে ক্যাট চিৎকার করে বলে ওঠে, বাতাসে তার ধমকানির আওয়াজটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, 'আঃ তুমি কি শেষে পাগল হয়ে গেলে?'

কাঁপতে কাঁপতে কেটারিং তার হাতের বন্দুকটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আমরা তখন বসে পড়ে কানে আঙুল দিই। কিন্তু এই আতঙ্কে ভরা শব্দ, এই সব গোঙানির শব্দটা পীড়া দেয়। সব জায়গাতেই তারা বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রায় সব কিছুই সহ্য করতে পারি। কিন্তু এখন আমরা খুবই ঘেমে গেছি।

এখন আমাদের পালাতে হবে এখান থেকে, কোথায় যে যাবো তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে, এমন একটা জায়গায় যেতে হবে, যেখানে এই চিৎকার আর শোনা যাবে না! আর এ চিৎকার মানুষের নয়, কেবল ঘোড়ার।

অন্ধকারে আবার স্ট্রেচারের আনাগোনা শুরু হলো। তারপরেই একটা গুলির আওয়াজ। দূর থেকে মনে হলো যেন একটা কালো স্তূপ কেঁপে উঠলো, এবং তারপর একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে পড়লো অবশেষে। কিন্তু তবু এটাই শেষ নয়। যন্ত্রণাকাতর জানোয়ারদের ডিঙিয়ে যেতে পারে না মানুষ, হাজার হোক তারা তো মানুষ, মানবতা বলে কথা আছে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলে, সে পশুই হোক কিংবা মানুষ হোক, থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হবে। একজন সৈনিক হাঁটু মুড়ে বসলো, একটি গুলি, একটি ঘোড়ার পতন—তারপর আবার একটা। শেষ ঘোড়াটি নিজের চার ওপর ভর দিয়ে ঘোড়ার নাগরদোলার মতোন বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে; আপাত-দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে তার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। ছুটন্ত সৈনিকরা পালা করে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে ঘোড়াটাকে। ধীরে ধীরে যেন অতি বিনয়ের সঙ্গে ঘোড়াটা মাথা নত করে মিশে গেলো মাটির সঙ্গে।

আমরা আমাদের কানের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। কোনো চিৎকার নেই, স্তব্ধতা নেমে এলো। তারপরেই আবার রকেট নিক্ষেপের কান ফাটা আওয়াজ। উত্তেজনায় ছটফট করে উঠলো ডেটারিং, অভিশাপ দিতে দিতে বললো সে, 'ওরা আমাদের কতো ক্ষয়ক্ষতি করেছে, জানাতে হবে।' তার উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়; 'তোমাদের আমি বলেছিলাম না, যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার হীনতার পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়।'

এবার আমাদের লরীতে ফেরার পালা। আকাশ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। এখন তিনটে, ভোর হয়ে এলো। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। আমাদের জায়গা বদল করতে হবে এখন। ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। কাজনস্কি আর এগোতে চায় না, লক্ষনটা খারাপ। 'কি ব্যাপার ক্যাট?' জানতে চাইলো ক্রপ।

'আমার ইচ্ছে এখন বাড়িতে ফিরে যাওয়া। বাড়ি—মানে ক্যাম্পে।

'খুব শীগগীর ক্যাম্পের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই থাকবে না, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, আর সেটা হবে আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা।'

স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছে সে এখন। 'আমি জানি না, আমি জানি না—' বিড়বিড় করে বকে গেলো সে।

আমরা এলাম যোগাযোগ ট্রেঞ্চে। আর তারপরেই দেখলাম, মুক্ত আকাশের নিচে মাঠের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই ছোট্ট জঙ্গলটা আবার ভেসে উঠলো আমাদের

চোখের সামনে। এখানকার জমির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এখানে আছে কবরখানা, সমাধিস্তূপ, আর কালো ক্রশ চিহ্ন। যে মুহূর্তে আমাদের পেছনে বোমাবর্ষণ হলো, জায়গাটা থরথর করে কেঁপে উঠলো, যেন ভূ-কম্পন হলো, সেইমাত্র, আমাদের সামনে প্রায় একশো গজ দূরে জায়গাটার ওপর একটা কালো পুরু ধোঁয়ার আস্তরণে ঢেকে গেলো। পরমুহূর্তেই আবার সেই বুক কাঁপানো বিস্ফোরণ। অরণ্যের একটা অংশে তিন-চারটে গাছ আছড়ে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় সবুজ পাতাগুলো তাদের রঙ হারিয়ে বিবর্ণ, একটু পরেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

'নিজেকে আড়াল করো', কে যেন বলে উঠলো, 'আড়াল করো!'

বিস্তীর্ণ মাঠ, অরণ্য বেশ খানিকটা দূরে এবং সেটা এখন তেমনি বিপজ্জনক, তেমনি বিভীষিকাময়। এখন নিজেকে আড়াল করতে হলে একমাত্র সামনের ওই কবরখানা আর সমাধিস্তূপ ছাড়া অন্য কিছু নিরাপদ বলে তো মনে হলো না। অন্ধকার হোঁচট খেতে হলো প্রতিটি পদক্ষেপ। কালো পিচের মতো অন্ধকার ঘনিভূত হতে থাকে। বোমাবর্ষণের আলোর কবরখানাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এখন এই কবরখানাই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়, এখানেই আমাদের থাকা উচিত।

ঘন ঘন বোমাবর্ষণে আমাদের সামনে পায়ের তলার মাটি তখন ফেটে চৌচিড়। বৃষ্টির মতো কাদা ছিটকাচ্ছে। গোলাগুলির টুকরোয় আমার একটা হাত ছড়ে গেলো। হাতের মুঠি শক্ত করে ধরলাম। তবে কোনো যন্ত্রণা নেই। তবু আস্বস্ত হতেও পারছিলাম না। কিন্তু এর পরেই গোলাগুলির টুকরোয় আমার চোয়াল ফেটে গেলো। একটু একটু করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে থাকলাম আমি। বিদ্যুৎ-গতিতে আমার মনে তখন কেবল একটাই চিন্তা উদয় হলো, জ্ঞান হারিও না। আর একটা গোলাগুলির টুকরো এসে লাগলো আমার হেলমেটে। কাদা লেগেছিল চোখে, হাত দিয়ে মুছে ফেললাম। তারপর আবার এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ওদিকে বোমাবর্ষণের শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। সবার মুখে একটাই সাবধান বানী উচ্চারিত হচ্ছিল—যে ভাবেই হোক, নিজেকে আড়াল করো বোমার আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে।

অন্ধকার আর একটা বড় বাধা তখন পথ চলার পক্ষে। চোখ বন্ধ করে পথ চলতে হচ্ছিলো গোলাগুলির টুকরোর হাত থেকে দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করার জন্যে। এক সময় হোঁচট খেয়ে বাধ্য হলাম চোখ খুলতে। আমার হাতের আঙুলগুলো একটা হাত আঁকড়ে ড়রলো। আহত সৈনিকের হাত? চিৎকার করে তার পরিচয় জানতে চাইলাম—কোনো উত্তর নেই—তার মানে—তার মানে মৃত সে। আবার হাত বাড়ালাম—উপড়ে পড়া গোছের হাত ঠেকলো। এখন আমার মনে হলো, আমরা কবরে অবস্থান করছি। কিন্তু তা সত্বেও এই মুহূর্তে আমার মনে হলো হোক কবর,

এ অবস্থায় কবর বা কফিন যে কোন আশ্রয়স্থল থেকে নিরাপদ। পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি তখন আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম কফিনের ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে। এখন সেটাই আমাকে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবে, যদিও মৃত্যু সেখানে নিজেই বাসা বেঁধে বসে আছে। অতীতের এক মৃত্যুর সঙ্গে আসন্ন আর এক মৃত্যুর সহাবস্থান ঘটতে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হাত আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরলো—তবে কি মৃত লোকটি আবার জেগে উঠলো? সেই হাত করমর্দন করলো আমার সঙ্গে। আর এক দফা চমকানোর পালা। চকিতে আমি আমার মাথা ঘোড়াতে গিয়ে আকাশে বোমা বর্ষণের আলোর ঝলকানিতে অবাক চোখে দেখলাম কাজনস্কিকে। সে তখন চিৎকার করে বলতে চাইছিল, তার কাছে যাওয়ার জন্যে—সেই সঙ্গে সে আমাকে সাবধান করে দিলো: 'বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে এখানে—এখান থেকে পালিয়ে চলো।'

আমি আমার গ্যাস মুখোশটা হাতে চেপে ধরলাম। আমার অদূরে কে যেন পড়ে রয়েছে। আমার তখন কেবল একটাই চিন্তা—সে যেই হোক না কেন, বিষাক্ত গ্যাসের কথা জানে তো সে! আকাশ পথে গ্যাস বোমা ফাটাচ্ছে শত্রু সেনা। মোটা-সোটা গোলগাল চেহারার একজন লোকের ছায়া পড়লো আমার পেছনে। গ্যাস মুখোসের গগলস পরিষ্কার করে তাকাতে গিয়ে দেখি ক্যাট, আর তাকে অনুসরণ করছে ক্রপ ও অন্য কে একজন যেন! এরপর আমরা চারজন তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে পড়ে রইলাম সেখানে, যতোটা সম্ভব হাল্কা ভাবে নিঃশ্বাস নিলাম, যাতে করে শত্রুপক্ষ শুনতে না পায়। এক সময় আমি আর ক্যাট আবা হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে। আমার হাতটার ওপর নজর রাখতে হচ্ছে। আর একটু গেলেই একটা কফিন—কাছে যেতেই দেখলাম, কফিনের ঢাকনাটা আলগা, এক টানে অতি সহজেই আমরা সেটা খুলে ফেললাম। মৃতদেহটা কফিন থেকে অপসারণ করতে খুব একটা অসুবিধে হলো না। এই ভাবে আমরা এক একটা কফিনের দখল নিলাম।

গ্যাস মুখোস পড়ার দরুণ ভাল ভাবে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, যেকোনো মুহূর্তে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে পারে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পরে আবার উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, সেখানে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পা টলছিল, তবে একেবারে জ্ঞান হারায়নি তখনো—চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছিল সে, দু'এক পা এগিয়েও গেলো সে—আমি এবার গ্যাস মুখোসটা সরিয়ে ফেলতেই মাটিতে পড়ে গেলাম। শীতল বাতাস অনেকটা ঠাণ্ডা জলের কাজ করলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বোমাবর্ষণ এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। তবে তীব্র বোমা বর্ষণে জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিকে তাকালাম নিমেষের জন্য। তারপর অন্যদের দিকে।

তারা তাদের মুখের ওপর থেকে গ্যাস মাস্ক সরিয়ে দিয়েছিল। আহত লোকটাকে আমরা তুলে ধরলাম। মৃত্যুর পরে শান্তিতে শায়িত কবরখানা একদিন যাদের কাছে মৃত্যুবাসর ছিলো, আজ সেটা যেন শ্মশানের রূপ নিয়েছে, সব কিছু বিধ্বস্ত। সেই কবরখানা আজ আর নেই, কবরখানার সেই নির্জন শান্ত পরিবেশটা আজ আর নেই, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আজ মৃত মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি,—তোমাদের ঘুম থেকে আর জাগানো হবে না, কফিনই হবে তোমার শেষ শয্যা, তোমাকে শেষ নমস্কার জানিয়ে তোমায় সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটানোর প্রতিশ্রুতি জানিয়ে একদিন ফিরে গেলেও, আজ আবার তোমাদের মতো মৃত ব্যক্তিদের কথা আমাকে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে। কফিন আর মৃতদেহগুলো ইতস্তত ছড়ানো। নতুন করে আবার হত্যা করা হয়েছে তাদের। তবে প্রতিটি মৃতদেহ তাদের কফিনে আমাদের আশ্রয় দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে।

আমাদের সামনে একজন পড়েছিল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আহত লোকটার সঙ্গে একা একা এগিয়ে চললো ক্রপ। মাটির ওপর পড়ে থাকা লোকটা সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত। আঘাতটা তার কোমরে, রক্তে ভর্তি। লোকটা এতই পরিশ্রান্ত যে, আমার মনে হলো, তাকে একটু জল খাওয়ানো দরকার। এই কথাটা ভেবে আমি আমার জলের বোতলে হাত রাখলাম—তাতে এখনো কিছু রাম অবশিষ্ট আছে। কিন্তু বাধা পেলাম ক্যাটের কাছ থেকে। সে তখন ঝুঁকে পড়েছে লোকটার ওপর।

'তোমার এ দশা কোথায় কিভাবে হলো কমরেড?'

পিটপিট করে কোনো রকমে তাকালো লোকটা। খুবই দুর্বল সে, উত্তর দিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। সাবধানে তার ট্রাউজারটা খুলে ফেললাম আমরা। ককিয়ে উঠলো সে যন্ত্রণায় 'আস্তে, আস্তে বন্ধু—'

ঠোঁটে যদি আঘাত পেয়ে থাকে সে, অবশ্যই কিছু পান করা উচিত তার। বমি ভাব নেই তার, ভালো লক্ষন। আঘাত তার কোমরে, তার পক্ষে হাঁটা আর সম্ভব নয়। আমি তখন তার শুকনো গলা ভেজানোর জন্য বোতল থেকে তার মুখে কিছু মদ ঢেলে দিলাম। তার চোখ দুটো আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। এখন আমরা দেখলাম যে, তার ডান হাত দিয়েও রক্ত ঝরছে। তার এই রক্ত ঝরা বন্ধ করতে হলে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার।

ইতিমধ্যে সেই মৃত সৈনিকটির পকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ সংগ্রহ করে এনেছিল এবং সাবধানে তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিলো। তরুণ সৈনিকটি এবার স্থির চোখে তাকালো আমাদের দিকে, কৃতজ্ঞ সে আমাদের বন্ধুসুলভ ব্যবহারে। 'এখন আমরা তোমার জন্যে স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছি', বললাম আমি।

সে তখন ক্ষীণকণ্ঠে কোনো রকমে বলে উঠলো, 'না, যেওনা তোমরা, এখানেই থাকো তোমরা—'

'আমরা খুব শীগগীর আবার ফিরে আসছি', বললো ক্যাট। 'আমরা তোমার জন্যে কেবল স্ট্রেচারের ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি—'

জানি না সে আমাদের কথা বুঝতে পারলো কিনা। সে তখন বাচ্চা ছেলের মতো অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো, 'চলে যেও না তোমরা—'

চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো ক্যাট, 'এখন আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। এখন আমাদের হাতে একটা রিভলবার তুলে নিয়ে এখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটানো উচিত নয় কি?'

এমন আহত অবস্থায় ওকে বহন করে নিয়ে গেলে কতক্ষণই বা জীবিত থাকতে পারে সে? আর সে যে এ যাত্রায় রক্ষা পাবে তার কিই বা নিশ্চয়তা আছে! তাছাড়া আর মাত্র কয়েকদিনই বাঁচার আয়ু আছে। আপাতত কতো দূর সে গেছে, তার সাফল্যই বা কতোটুকু, সেটা বড় কথা নয়—তার কাছে এখন বড় কথা হলো কতক্ষণে মারা যাবে সে। এখন তার শরীরটা অসাড়, অনুভূতিশূন্য। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে সে। তার এক একটা দিন বেঁচে থাকা মানেই অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করা। আর সেই যন্ত্রণা সে পেলো কি পেলো না, তাতে কার কি মাথা ব্যাথা?

একটা স্ট্রেচার পাওয়া গেলো। মাথা দোলালো ক্যাট। 'বেচারা, এতো কম বয়েস—সে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো, 'নিষ্পাপ তরুণ—'

আমাদের ক্ষতি অনুমানের থেকেও কম। পাঁচজন নিহত আর আটজন আহত। অবশ্য স্বল্পকালীন বোমাবর্ষণ, তাই ক্ষয়ক্ষতি একটু কম। এর মধ্যে দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে কবরখানায়। আমাদের কাজ শুধু মাটি ফেলা তাদের ওপর। ফিরে চললাম আমরা। আহতদের ড্রেসিং স্টেশনে পাঠানো হলো। মেঘে ঢাকা সকাল। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো? এক ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের লরির কাছে পেঁছে উঠে পরলাম। ফেরার সময় লরি বেশ ফাঁকা ফাঁকাই লাগলো। অথচ আসার সময় জায়গার বড় অভাব অনুভূত হয়েছিল—তার মানে কতকগুলো মৃত্যু এসে লরির স্থান বাড়িয়ে দিয়েছে।

লরি চলতে শুরু করতেই একটা নতুন ঝামেলা দেখা দিলো। টেলিফোনের তারগুলো রাস্তার ওপর এতো নীচ দিয়ে ঝুলছিল যে মাথায় ঠেকে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল বারে বারে। দুজন লোক প্রস্তুত হয়েই ছিলো, টেলিফোনের তার এলেই সাবধানে সেটা সরিয়ে দিতে গিয়ে চিৎকার করে উঠছিলো তারা—'খেয়াল রেখো, টেলিফোনের তার!'

লরি এগিয়ে চলে সামনের দিকে, কোনো বৈচিত্র নেই, বড্ড যেন একঘেয়ে, একঘেয়ে লাগে সহযোদ্ধাদের ডাকগুলো, একঘেয়ে লাগে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে আমাদের মাথায়, ফেলে আসা মৃতদেহগুলোর ওপর, আহতদের

ওপর, এমন কি কেমরিকের কবরের ওপরেও। আর পড়ে আমাদের হৃদয়ের ওপরেও।

কোথায় যেন বোমাবর্ষণের আওয়াজ হলো। আমরা সংকুচিত হয়ে পড়লাম, আমাদের চোখে আতংকের ছায়া পড়তে দেখা গেলো, আমাদের হাত দুটো প্রস্তুত, রাস্তার ধারে লরিটা গর্তে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে যাতে ডিগবাজি খেয়ে আমরা থেয়ে লাফিয়ে পড়তে পারি। তবে কিছুই ঘটলো না, কেবল সেই একঘেয়ে চিৎকার —'খেয়াল রেখো, মাথার ওপর টেলিফোনের তার।' আমাদের হাঁটু বেঁকে গেলো। আমরা আবার আধো ঘুমে ডুবে গেলাম।

□ পাঁচ □

গুজবটা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হলো। হিমেলস্টোস এসেছেন। গতকালই তাঁকে দেখা গেছে। পরিচিত কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি। কয়েকজন সদ্য নিয়োগ-প্রাপ্ত তরুণদের দিয়ে চাষের মাঠে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি জানতেন না, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে তাঁর ওপর নজর রাখছিলেন। আর তাতেই তাঁর আখের বেশ ভালো হলো। এখানে তাঁর জন্যে এক চমক অপেক্ষা করছে। তাঁকে কি বলা যায় এ নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে মধ্যস্থতা করছিল ট্যাডেন। হেই তার নিজের হাতের থাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছিল। খেলায় হারানোটাই তার জীবনের একমাত্র নেশা। সে আমাকে প্রায়ই বলতো, এ ধরনের স্বপ্ন দেখে সে আজকাল। ক্রপ আর মুলার দুজনে হাসিঠাট্টায় মশগুল। ক্রপ তার নিজের জন্যে রান্নাঘর থেকে মটরশুঁটির একটা পুরো টিন হাতিয়ে থাকবে। মুলার খুবই ক্ষুধার্ত, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে বললো শুধু, 'আচ্ছা অ্যালবার্ট, ধরো, হঠাৎ যদি আবার শান্তি ফিরে আসে তখন তুমি কি করবে বলো?'

'শান্তি আর কখনো ফিরে আসবে না', সরাসরি বলে দিলো অ্যালবার্ট।

'ঠিক আছে, কিন্তু যদি—' জোর দিলো মুলার, 'তখন তুমি কি করবে।'

'সব জঞ্জাল সাফ করবো', গর্জে উঠলো ক্রপ।

'অবশ্যই। আর তারপর?'

'মাতাল হবো', বললো অ্যালবার্ট।

'বাজে কথা বলো না, আমি খুব গুরুত্ব দিয়েই বলছি—'

'হ্যাঁ, তোমার মতো আমিও', বললো ক্রপ, 'এছাড়া একজন লোক আর কি করতে

পারে ?'

আগ্রহী হয়ে উঠেছে ক্যাট। কাপের মটরশুঁটির টিনের দিকে হাত বাড়ালো সে, কিছুটা গলাধকরণ করলো সে। একটু সময়ের জন্যে কি যেন ভাবলো সে, তারপর বলল, 'অবশ্যই প্রথমে তুমি মদ খাবে, কিন্তু তারপর পরবর্তী ট্রেন ধরে বাড়ি আর মায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কারণ তখন যে শান্তির সময় অ্যালবার্ট—'

পকেট বুক থেকে একটা ফটো বার করে সবাইকে দেখালো সে। 'আমার মা!' তারপর ফটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললো, 'সর্বনাশা যুদ্ধ খতম হোক—'

'তোমার পক্ষে এরকম কথা বলা খুবই ভালো', আমি তাকে বললাম, 'তোমার স্ত্রী আছে, তোমার ছেলে মেয়ে আছে, তাই কেবল তোমার মুখেই এ কথা সাজে।'

'সত্যি, খুবই সত্যি', মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল সে, 'আর আমাকে দেখতে হবে, তাদের আহারের কিছু ব্যবস্থা আছে কি ?'

তার কথা শুনে হেসে উঠলাম আমরা। 'তার অভাব তাদের হবে না, ক্যাট, কোথাও না কোথাও থেকে তুমি ঠিক চুরি করে আনবে সেটা।'

মুলারের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর নিজেকেও শান্তি দিতে চায় না। হেই ওয়েস্থাসের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চাইলো সে। 'শান্তির সময়ে তুমি কি করবে হেই ?'

'তুমি যেভাবে কথা বলছো, তাতে আমি তোমার পশ্চাদ্দেশে এক লাথি মারবো।' অনেক বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে হেইয়ের পক্ষে। সে তার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'তার মানে তুমি যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখনকার কথা বলছো।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর তুমিও তো সেই কথা বলেছিলে।'

'বেশ তো, অবশ্যই তখন আমার প্রথম প্রয়োজন হবে একটা মেয়েমানুষের। হেই-এর জিভ দিয়ে লালা গড়ালো।

'নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরের দিব্যি', বললো হেই, তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে, 'তখন আমি নাদুসনুদুস সুন্দরী, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এমন একটা মেয়ে ধরে নিয়ে আসবো, যাকে আমি বাগ মানাতে পারি, আর সোজা বিছানায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, বুঝলে। বুঝলে বৎসরা, সত্যিকারের পাখির পালকের মতো নরম বিছানা, স্প্রিং-এর গদি আঁটা থাকবে সেই বিছানায়। একবার ট্রাউজার খুললে এক সপ্তাহ ধরে গায়ে আর পোশাক চাপাবো না।

সবাই স্তব্ধ। চমৎকার একটা ছবি। আমাদের দেহ গরম হয়ে উঠেছে। অবশেষে মুলারই প্রথমে মুখ খুললো : 'আর তারপর কি করবে ?'

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে থামলো হেই। তারপর নেহাত অস্বস্তির মধ্যে ব্যাখ্যা করে বললো সে, 'আমি যদি নন-কমিশনড অফিসার হই, তাহলে

প্রুসিয়ানদের সঙ্গে থাকবো, আর এই ভাবেই সময় কাটিয়ে দেবো।'

'হেই, তোমার মাথায় স্ক্রু নিশ্চয়ই ঢিলে হয়ে গেছে!' আমি বললাম।

'তুমি কখনো পীট খুঁড়েছো?' পাল্টা বিদ্রুপ করলো, 'চেষ্টা করে দেখো।'

'ট্রেঞ্চ খোঁড়ার থেকে খারাপ হবে না নিশ্চয়ই', আমি বললাম।

দাঁত বার করে হাসলো হেই। 'যদিও অনেকদিন চলবে, তবে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না।'

'কিন্তু বাড়িতে থাকাটাই ভালো নিশ্চয়ই।'

'কোনো ভাবে হয়তো', বললো সে। তারপর যেন সে দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন হলো।

সে যে কি ভাবছে, অনায়াসে তুমি দেখতে পারো। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছোট্ট একটা বাড়ি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সামান্য বেতন, শ্রমিকের নোংরা পোশাক।

'শান্তির সময়ে তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না', বলে চলে সে, 'প্রতিদিন তোমার খাবার পেয়ে যাবে, ভালো বিছানা পাবে, প্রতি সপ্তাহে নিখুঁত ভদ্রলোকের মতো পরিস্কার পোশাক পাবে। তুমি তোমার নন-কমিশনড্ অফিসারের কর্তব্য পালন করতে পারলেই তুমি ভালো স্যুটও পেতে পারো। সন্ধ্যায় তুমি মুক্ত পুরুষ, ইচ্ছে করলে তোমার পছন্দ মতো পানশালায় যেতে পারো।

তার সেই ধারণায় অভূতপূর্ব ভাবে প্রভাবিত হলো হেই। এই রকম জীবনই তার খুব পছন্দ।

'আর তোমার বারো বছর চাকরী জীবন অতিক্রান্ত হলে তুমি তখন তোমার অবসরকালীন ভাতা পাবে। আর গ্রামের পাহারাওয়ালা হয়ে যাবে। তখন তুমি প্রায় সারাটা দিন যতো খুশী ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

ইতিমধ্যেই ঘামতে শুরু করেছিল। 'ভেবে দেখো, তখন তোমার গ্রামবাসীরা কি ভাবে গ্রহণ করবো। গ্রামের পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সবাই ভালো ব্যবহারই করে থাকে, বুঝলে!

'আরে, এ যে দেখছি গাছে কাঠাল, গোফে তেল। ওসব কিসসু হবে না তোমার', মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে উঠলো ক্যাট, 'আসলে তুমি কখনোই নন-কমিশনড্ হতে পারবে না।'

বিমর্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো হেই। তখনো সে ভাবছিল হেমন্তের মেঘ মুক্ত সুন্দর একটা সন্ধ্যার কথা, রবিবারের এক অরণ্যপথে লতা পাতার মর্মরধ্বনি শোনা, গ্রামের গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শোনা, অপরাহ্নের পরে সন্ধ্যায় পরিচারিকার সঙ্গে সময় কাটানো, পানশালায় বল্গাহীন অফুরান সময় কাটানো।

হঠাৎ এমন একটা সুন্দর স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে পারে না সে? তাই সে নেহাতই গর্জে উঠলো, 'কি সব বোকাটে ধরণের প্রশ্ন করছো?'

মাথা গলিয়ে সে তার শার্ট'টা খুলে ফেললো। এমন কি জামার নিচে আঁটো পোশাকটাও খুলে ফেললো সে।

'তা ট্যাডেন, তুমি কি করবে ঠিক করলে ?' জিজ্ঞেস করলো ক্রপ।

ট্যাডেন কেবল একটা জিনিষই চিন্তা করে। 'আমি দেখতে চাই, হিমেলস্টোন যেন আমাকে ছাপিয়ে না যায়।'

আর ক্রপকে জিজ্ঞেস করতেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে বললো সে, 'আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, আমি চাইতাম, আমি যেন একজন লেফটেনাণ্ট হই। তখন তুমি দেখবে কি করে তাকে ফুটন্ত জলে চোবানো যায়।'

'আর ডেটারিং, তুমি !' এবার মুলার জানতে চাইলো, মুলার স্কুল ইন্সপেক্টরের মতোন। সে হলো একজন জাত স্কুলমাষ্টার। তার মুখে সব সময় একটা না একটা প্রশ্ন ঠিক লেগেই আছে।

হক কথার মানুষ ডেটারিং। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মুখ খুললো সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কেবল একটা বাক্যই উচ্চারণ করলো : 'আমি সোজা চলে যাবো ফসল গুদামজাত করার জন্যে।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করে দিলো সে। চিন্তিত সে। তার স্ত্রীকে খামারের কাজকর্মের দিকে নজর দিতে হয়। ওরা তার দু'দুটো ঘোড়া ধরে নিয়ে গেছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়ে থাকে সে। তার লক্ষ্য তার প্রিয় ওল্ডেনবার্গে বৃষ্টি নামলো কিনা।

এই সময় হিমেলস্টোসের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেলো সেখানে। তার হাঁটার ভঙ্গি এখন অনেক শ্লথ। আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁর সম্মানে আমরা কেউ উঠে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কৌতুহলী চোখে তার দিকে তাকাল ক্রপ, আমাদের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। তিনি তখন বুঝতে পারছিলেন না, এরপর কি করবেন তিনি ? তিনি তখন মনে মনে চাইছিলেন আগের মতো তিনি আমাদের ঘোড়দৌড় করান। কিন্তু তখন তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে, যুদ্ধক্ষেত্র আর প্যারেড গ্রাউণ্ড এক নয়। ক্রপ তাঁর খুব কাছের লোক, তাই সে তাকে পছন্দ করে থাকে। নরম গলায় বললো সে, 'আপনি তাহলে এখানেও এলেন ?'

কিন্তু অ্যালবার্ট তার বন্ধু ছিলো না কস্মিনকালেও। 'আমার ইচ্ছে ছিলো আরো দেরীতে দেখা হলেই বোধহয় ভালো ছিলো।' তার কথায় বিরক্তি ঝরে পড়ে।

তাঁর লাল গোঁফ দুলে উঠলো। 'কি ব্যাপার, দেখছি, তোমরা আমাকে যেন চিনতেই চাইছো না।'

'আমিও তাই মনে করি', চোখ তুলে তাকালো ট্যাডেন। 'আর আপনি কি জানেন, আপনি কি ?' হিমেলস্টোসকে উত্তেজিত করার জন্যে আরো রূঢ় ভাষায়

বলে উঠলো সে' 'কবে থেকেই বা আমরা অতো পরিচিত হলাম? আমার তো মনে হয় না, আমরা এক সঙ্গে কখনো গর্ত বা খানায় শুয়েছিলাম।'

এই রকম এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি যে হতে হবে তাঁকে, তাঁর ধারণা ছিলো না। এরকম খোলাখুলি তিক্ত আতিথেয়তা আশা করেননি তিনি। কিন্তু তিনিও তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

খানা বা গর্তের প্রশ্নে ট্যাডেন এতোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তাকে এখন হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল। 'না আপনি নিজে কখনো শুয়েছিলেন সেখানে?'

তেলে বেগুনে জ্বলতে শুরু করলেন হিমেলস্টোস। ওদিকে ট্যাডেনও তার থেকে অনেক বেশী রেগে উঠেছে তখন। তাঁকে আগে বেশী অপমান করতে চায় সে। 'আপনি কি জানতে চান না? আপনি একজন অতি নোংরা জঘন্য লোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক তাই। এই কথাটা বলার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

খুশিতে তার চোখ দুটো শূকরছানার মতো জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'আপনি, আপনি একদম নোংরা, অতি জঘন্য লোক?'

হিমেলস্টোস এবার ফুঁসে উঠলো: 'এসব কি হচ্ছে শুনি? নোংরা পাঁকে যার জন্ম, তার এতো স্পর্ধা? উঠে দাঁড়াও! উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানো না?'

তাঁকে একরকম ধাক্কা দিয়ে বললো ট্যাডেন, 'হিমেলস্টোস, এখান থেকে এখুনি কেটে পড়ো, তা না হলে —'

হিমেলস্টোস তখন থরথর করে কাঁপছে। কাইজারও বোধহয় এতো অপমানিত হয়নি। 'ট্যাডেন, তোমার উর্দ্ধতন অফিসার হিসেবে আমি তোমাকে হুকুম করছি, উঠে দাঁড়াও।'

'আপনি কি আরো খারাপ কিছু আশা করেন?' জানতে চাইলো ট্যাডেন।

'তোমরা আমার হুকুম মানবে কি মানবে না বলো?'

পরিণাম কি হতে পারে, সেকথা না জেনেই উত্তর দিলো ট্যাডেন। সেই সঙ্গে সে তার পেছনের দিকে তাকালো—জায়গাটা উন্মুক্ত আছে কিনা।

'জানো, আমি তোমাকে কোর্টমার্শাল করতে পারি?' ফেটে পড়লো হিমেলস্টোস। তারপরেই পিছু হটতে শুরু করলো।

আমরা তাঁকে আর্দালি ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। হেই ও ট্যাডেন হাসিতে ফেটে পড়লো। আর হেই-এর হাসির দমক এতোই তীব্র ছিলো যে, হাসতে গিয়ে তার চোয়াল দুটো এতো ফুলে উঠলো যে, পরে সে তার মুখের হাঁ কিছুতেই আর বন্ধ করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত অ্যালবার্ট ছুটে এসে তার গালে ঘুষি মারতে তবে সে আবার মুখ বন্ধ করতে পারলো।

ভয় পাওয়ার মতো করে ক্যাট এই প্রথম মুখ খুললো, 'উনি যদি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন, তাহলে ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে।'

'তুমি কি মনে করো, উনি রিপোর্ট করবেন?' জিজ্ঞেস করলো ট্যাডেন।

'নিশ্চয়ই।' এবার ক্যাটের হয়ে আমি বললাম।

'কম করেও পাঁচদিন তোমাকে গ্রেপ্তারবরণ করতে হবে', বললো ক্যাট।

তার জন্যে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করলো না ট্যাডেন। 'পাঁচদিন জেলে থাকা মানেই তো পাঁচদিন বিশ্রাম নেওয়া।

'আর তারা যদি তোমাকে কোনো দুর্গে চালান করে দেয়?' এবার মুলার জিজ্ঞেস করলো।

'বেশ তো আমার সঙ্গে তাঁর সব যুদ্ধ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকবে।'

ট্যাডেনকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। তার কোন চিন্তা নেই। উত্তেজনা এড়াতে সেই আর লীয়ার দুজনে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

ওদিকে মুলারের বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি। ক্রপের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আবার কোমর বাঁধলো সে। 'আচ্ছা অ্যালবার্ট', সত্যি সত্যি তুমি যদি এখন বাড়িতে থাকতে, কি করতে তুমি?'

'আমাদের ক্লাসে এখন ঠিক কতোজন আছি?'

আমরা তখন গুনতে থাকি: কুড়িজনের মধ্যে সাতজন মৃত, চারজন আহত, আর একজন পাগলাগারদে। তার মানে অবশিষ্ট থাকে বারোজন।'

'এদের মধ্যে আবার তিনজন লেফটেনাণ্ট', বললো মুলার। 'তুমি কি মনে করো, এখনো তারা ক্যানটোরেককে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করাবে?'

আমাদের তা মনে হয় না। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'আমরা জার্মানিরা ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে ভয় করি না।'

'মেলবোর্নে কতজন অধিবাসী আছে? জিজ্ঞেস করলো মুলার।

'এই প্রশ্নের উত্তর যদি তোমার জানা না থাকে, তুমি তোমার জীবনে সাফল্য কি করেই বা আশা করতে পারো?' অ্যালবার্টকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

চিন্তিত সুরে বললো মুলার, 'এসব আবোল তাবোল প্রশ্ন করার কি প্রয়োজন? আমাদের তো ফিরে যেতেই হবে, আবার নতুন ভাবধারায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।'

'সেটা প্রশ্নাতীত বলে আমি মনে করি। হয়তো আমাদের বিশেষ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।'

'তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর তা যদি করতে না পারো, তাতে কি

লাভ? ছাত্রজীবনটা খুব একটা ভালো নয়। তোমার যদি টাকা না থাকে, শয়তানের মতো কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'সেটা মন্দের ভালো। কিন্তু সে তো একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, ক্ষয়-রোগীর মতো একেবারে খতম হয়ে যাওয়া। ওরা তোমাকে সব কিছুই শেখাবে।'

আমাকে সমর্থন করে বললো ক্রপ: একজন এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে কি করে সব কিছুর ওপর এতো গুরুত্ব আরোপ করতে পারে?'

'তবু তোমাকে যে কোন একটা পেশা তো গ্রহণ করতে হবে', তাগিদ দেয় মুলার, এমন ভাবে কথাটা সে বললো, যেন সে নিজেই ক্যানটোরেক।

অ্যালবার্ট ছুরি দিয়ে তার নখ কাটতে কাটতে বললো, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। ক্যাট, ডেটারিং আর হেই তাদের কাছে ফিরে যাবে, কারণ এরই মধ্যে কাজ তারা পেয়ে গেছে। এবং হিমেলস্টোসও। কিন্তু আমাদের হাতে তো কোনো কাজ নেই। তাহলে যুদ্ধের অবসানের পর আমাদের চলবে কি করে?' কথাটা বলে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকালো সে।

'আমাদের তখন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আয়ের পথ খুঁজে বার করতে পারলে তখন কোনো রকমে অরণ্যের ছায়াতলে আমরা আমাদের বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো', আমি বললাম বটে, সঙ্গে সঙ্গে এই অবাস্তব ধারণা করে নেওয়ার জন্যে নিজেকে ভীষণ হীণ বলে মনে হলো যেন।

'কিন্তু ফিরে যাওয়ার পরে সত্যিকারের কি ঘটতে পারে?' মুলারের আশংকা যায় না তবু, তখনো তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্রপ কতোকটা তাচ্ছিল্যের মতো করে বললো, 'জানি না। আগে তো ফেরা যাক, তারপর আমরা একটা উপায় খুঁজে বার করবোখন।'

কার্যত আমরা তখন দিশেহারা। 'কিই বা করতে পারি আমরা?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি কিছুই করতে চাই না', হতাশ গলায় বললো ক্রপ। 'একদিন না একদিন তোমাকে মরতেই হবে, অতএব তাতে কি এসে যায়? আমার তো মনে হয় না যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যেতে পারবো আমরা।'

'জানো অ্যালবার্ট, এ ব্যাপারে আমি যখন চিন্তা করি', পিছন দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'শান্তির সময়ের কথা যখন শুনি, তখন কথাটা আমার মাথায় ঘোরা-ফেরা করে; আর সত্যিই যদি সেই সময়টা কখনো আসে, আমার মনে হয়, হয়তো অচিন্তানীয় কিছু একটা আমি করতে পারি, এমন একটা কিছু—বুঝলে, যা এখানকার সব থেকে নিকৃষ্ট কিছুর থেকে অন্তত একটা ভালো কিছু হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারি না আমি। তবে এই যে সব নানান ধরণের পেশা, শিক্ষা, বেতন আর এ ধরণের যাবতীয় সব কিছুই আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়, সব

সময়েই এসব আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলেই মনে হয় যেন। জানো অ্যালবার্ট আমার চোখের সামনে এমন আদৌ কোনো কিছুই দৃশ্যত নয়। এই মুহূর্তে সব কিছুই আমার কাছে বিভ্রান্তিকর আর হতাশাব্যাঞ্জক বলেই মনে হচ্ছে।

ক্রপও তাই মনে করে। 'এটা আমাদের সবার কাছে একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামিল। তবে বাড়িতে এ বিষয়ে কেউই খুব বেশী চিন্তিত হবে বলে মনে হয় না। দু'বছরে বোমার ভয় আর আতঙ্কের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা খুব একটা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়।'

এ ব্যাপারে আমরা, আমাদের বয়সের সবাই তার সঙ্গে একমত। অ্যালবার্টের বিশ্লেষণ আরো বেশী গভীর ও ব্যাপক: 'সব কিছু ব্যাপারেই যুদ্ধ আমাদের একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

ঠিকই বলেছে সে। আমাদের সেই তারুণ্য আজ আর নেই। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে পৃথিবীকে দেখতে চাই না আমরা। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি আমাদের নিজেদের জীবন থেকে। আমাদের বয়েস যখন কৈশোরোত্তীর্ণ আঠারো বছর তখন আমরা ভালবাসতাম জীবনকে, পৃথিবীকে; আর তার জন্যে আমাদের বন্দুক কাঁধে তুলে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিলো না। প্রথম বোমা, প্রথম বিস্ফোরণ ফেটে পড়েছিল আমাদের হৃদয়ে। আমরা বিচ্ছিন্ন আমাদের কর্মক্ষমতা থেকে, আমাদের সংগ্রাম থেকে, আমাদের প্রগতি থেকে। এসব ব্যাপারে আর আমাদের বিশ্বাস নেই, এই সেদিনের সেই বিশ্বাসটা যেন হারিয়ে গেছে কবেই। আমরা এখন যুদ্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি।

আর্দালি ঘরে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। সেখানে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলেছে হিমেলস্টোস। সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর পুরোভাগে রয়েছেন মোটাসোটা গোলগাল চেহারার সার্জেণ্ট মেজর। দেখতে বিস্ময় লাগে, প্রায় সব নিয়মিত সার্জেণ্ট মেজররাই গায়ে গতরে খুবই হৃষ্টপুষ্ট, এক কথায় বেশ মেদবহুল।

তাঁকে অনুসরণ করলেন হিমেলস্টোস, তাঁর চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল, আর তার পায়ের বুটজোড়া রোদ্দুরে জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছিল। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম।

'ট্যাডেন কোথায়?' চিৎকার করে উঠলেন সার্জেণ্ট।

অবশ্যই কেউ তার খোঁজ জানে না। তবু শ্যেন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন হিমেলস্টোস। 'তোমরা, হ্যাঁ তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। কিন্তু তোমরা মুখ খুলবে না, এটাই ঘটনা।'

আমাদের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন সার্জেণ্ট। কিন্তু ট্যাডেনকে যে আর দেখা যাবে না, সেটা তিনি জেনে গেছেন বলেই অন্যভাবে চেষ্টা করলেন তিনি।

'আর্দালি ঘরে দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাডেনকে রিপোর্ট করতে হবে।' তারপর হিমেলস্টোসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'ভাবছি এর পর সঙ্গে করে কিছু লোহার তার নিয়ে আসবো হিমেলস্টোসের পায়ে বেড়ি পড়ানোর জন্যে', আভাষ দিলো ক্রপ।

'ওঁর সঙ্গে যথেষ্ট রসিকতা করেছি আমরা', হেসে উঠলো মুলার।

এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা—একজন পোষ্টম্যানকে এই ভাবে বের করে দিতে চাই আমরা। ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে ট্যাডেনকে সতর্ক করে দিলাম, উধাও হয়ে গেলো সে নিমেষে।

আধঘণ্টা পরে আবার ফিরে এলেন হিমেলস্টোস। কেউই আগ্রহ দেখালো না তার প্রতি। ট্যাডেনের খোঁজ নিলেন তিনি। আমরা কাঁধ ঝাঁকালাম।

'তাহলে আবার তার খোঁজ করো তোমরা', জোর দিয়ে বললেন তিনি, 'তোমরা তার খোঁজ করোনি?'

ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বললো ক্রপ, 'আগে কখনো আপনি এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখেছেন?'

'সেটা তোমার দেখার কথা নয়', খিঁচিয়ে উঠলেন হিমেলস্টোস। 'আমি সোজা উত্তর চাই তোমাদের কাছ থেকে।

'সে তো খুব ভাল কথা', উঠে বসলো ক্রপ। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেখুন তো, ওই যে, যেখানে সাদা পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো মেঘের আনা-গোনা, হ্যাঁ ঠিক ওখানে। ওইখানে আকাশে ভাসছে এ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফট। গতকাল ওই আকাশের নিচে ছিলাম আমরা। পাঁচজন নিহত, আটজন আহত। এসব কিছুই নয়, তাই না? এরপর আপনি যখন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন, মরবার আগে তারা আপনার কাছে আসবে আর কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করবে, 'দয়া করে বলুন, আমি কি যেতে পারি? আপনার মতো একজনের দেখা পাবার জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।' কথাটা বলেই সে আবার বসে পড়ে আর কমেটের গতিতে আবার উধাও হয়ে যায় হিমেলস্টোস।

'নির্ঘাত তিনদিন অন্তরীণ', মন্তব্য করলো ক্যাট।

'এবার আমি পালিয়ে যাবো', আমি বললাম অ্যালবার্টকে।

তবে সেই শেষ। শেষ থেকেই বুঝি শুরু। সেদিনই সন্ধ্যায় ট্রায়ালের জন্যে কেসটা তোলা হলো। আর্দালি ঘরে আমাদের লেফটেনাণ্ট বারটিংক বসেছিলেন। একে একে আমাদের সবাইকে তিনি ডাকলেন।

সাক্ষী হিসেবে আমাকে হাজির হয়ে ট্যাডেনের অবাধ্যতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলো। বিছানার অব্যবস্থার কাহিনী শুনে প্রভাবিত হলেন তিনি। হিমেলস্টোসকে আবার ডেকে পাঠানো হলো। আমি তখন আবার আমার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি

করলাম।

'এটা কি সত্য?' হিমেলস্টোসের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন বারটিংক।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু সব শেষে ক্রপ যখন একই কাহিনী শোনালো, তখন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন হিমেলস্টোস।

'তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ একজন রিপোর্ট করলে না কেন?' জানতে চাইলেন বারটিংক।

আমরা নীরব রইলাম। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন যে, এসব ব্যাপারে রিপোর্ট করার যৌক্তিকতা কি আছে? সেনাবাহিনীতে কথায় কথায় রিপোর্ট করাটা শোভা পায় না। গুরুত্বটা উপলব্ধি করে তিনি তখন হিমেলস্টোসের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রটা কখনই প্যারেড গ্রাউণ্ড হতে পারে না। তারপর এলো ট্যাডেনের পালা। ক্লান্তিকর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হলো তাকে এবং তাকে তিনদিন আন্তরীন থাকার দণ্ডাদেশ দেওয়া হলো। তারপর ক্রপের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে বারটিংক তাকে একদিনের জন্যে আন্তরীণ থাকার আদেশ দিলেন। 'এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না', দুঃখের সঙ্গে বললেন তিনি ক্রপকে। চমৎকার মানুষ তিনি।

আন্তরীণ থাকাটা অনেক সুখকর, সেখানে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারি। আর আমরা এও জানি যে কি করে বন্দোবস্ত করতে হয়। আর জেল বন্দী! সে বড় ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবস্থা!

ঘণ্টাখানেক পরে ট্যাডেন আর ক্রপ তখন লোহার তারে ঘেরা বেড়ার ওপারে স্থিত হয়ে বসেছিল। চলার পথে তাদের সামনে গিয়ে আমরা বসলাম। আমাদের অভিবাদন জানালো ট্যাডেন। রাতে আমরা স্কেটিং করলাম। অবশ্যই ট্যাডেনেরই জয় হলো, হতভাগ্য হয়েও ভাগ্যবান সে।

□ ছয় □

সীমান্তে শত্রুপক্ষের হামলার গুজব শোনা গেলো। দু'দিন আগেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হলো আমাদের। যাওয়ার পথে একটা স্কুল চোখে পড়লো। স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি সম্পূর্ণ নতুন কফিন সাজানো থাকতে দেখলাম। সংখ্যায় কম করেও একশোটা হবে।

'যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে এটা বেশ ভালোই', আশ্চর্য কথা বললো মুলার।

'ওই কফিনগুলো আমাদের জন্যে', গর্জে উঠলো ডেটারিং।

'বাজে কথা বলো না', রাগত স্বরে ক্যাট বললো তাকে।

'আরে অমন সুন্দর একটা কফিন পেলে ধন্য হয়ে যাবে তুমি', দাঁত বার করে হাসলো ট্যাডেন।

আমাদের সামনে সব কিছুই জ্বলজ্বল করছিল, কাঁপা কাঁপা আলোর দীপ্তি। প্রথম রাত্রে সব কষ্ট সহ্য করার চেষ্টা করলাম। এক সময় সব শান্ত হয়ে এলে শত্রুপক্ষের সীমান্ত বরাবর যানবাহন চলার যান্ত্রিক আওয়াজ কানে ভেসে এলো, সকাল হওয়া পর্যন্ত শব্দটা ক্রমাগত কানে এসে আঘাত করতে থাকলো। ক্যাট বললো, 'ওরা ফিরে যাচ্ছে না, আরো সৈন্য আনার জন্যেই তাদের এই তৎপরতা—আরো সৈন্য, আরো অস্ত্রশস্ত্র।'

ইংরাজ পদাতিক সেনাবাহিনীকে যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, আরো শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম। এছাড়া তারা বেশ কয়েকজন পশুর মতো নিষ্ঠুর সৈনিকদেরও আনছে। আমাদের উৎসাহ এখন অনেকটা স্তিমিত। ঘণ্টা দুই ধরে ক্রমাগত বোমাবর্ষণের পরে আমাদেরই গোলাবারুদের টুকরোগুলো আমাদের ট্রেঞ্চের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মত টুপ টুপ করে পড়ছে। চার সপ্তাহের মধ্যে মধ্যে এই নিয়ে তিনবার আক্রমন। লক্ষ্যে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয় কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ব্যারেলগুলো অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। শটগুলো এতোই অনিশ্চিত যে, সেগুলো আমাদের লাইনেই ভূপতিত হয়ে থাকে। আজ রাতে আমাদের দুজন সৈনিক আমাদের গোলাতেই আহত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রটা ঠিক যেন একটা খাঁচার মতোন, সেই খাঁচার চারপাশে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা ট্রেঞ্চের নেট ওয়ার্কে শুয়ে আছি এক অনিশ্চিত রহস্যের মধ্যে। আমাদের মাথার ওপর যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান ভেসে উঠতে পারে। একটা বোমা যদি আমাদের মাথার উপর পড়ে, তাহলে সব শেষ। আমরা জানি না, কিংবা আন্দাজও করতে পারি না, কোথায় সেটা পড়তে পারে।

এটা নেহাতই একটা দৈব ঘটনা, আমি এখনো বেঁচে আছি, কারণ যেকোনো মুহূর্তে আমার গারে বোমার আঘাত লাগতে পারতো। বম্ব-প্রুফ ট্রেঞ্চে হয়তো আমি বোমার আঘাতে অনুপরমানুর মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারি, আর মুক্ত আকাশের নীচে সুযোগ মতো এদিক ওদিক পালিয়ে বড় জোর দশঘণ্টা আমার পরমায়ু বাড়াতে পারি। কোনো সৈনিকই হাজারবার বাঁচার সুযোগ পেতে পারে না। কিন্তু প্রতিটি সৈনিকই সুযোগে বিশ্বাসী আর তাদের ভাগ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে তাদের।

এবার আমাদের রুটির খোঁজ করতে হবে। ট্রেঞ্চের অবস্থা অতি সঙ্গীন, নোংরা আবর্জনায় ভরে উঠেছে সেটা—আর এর ফলে ইঁদুরের উৎপাত ক্রমশ বেড়ে চলেছে, আর তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এখন এখানে এমন অবস্থা যে, অর্ধভুক্ত রুটি লুকিয়ে রাখার মত নিরাপদ জায়গা কোথাও নেই। যেখানেই রাখো না কেন, ইঁদুরগুলোর নজর ঠিক পড়বেই।

তারা খুবই ক্ষুধার্ত। প্রায় প্রত্যেকেরই বরাদ্দ রুটি ছিলো। ক্রপ তার ওয়াটার-প্রুফ শীটে অবশিষ্ট রুটি মুড়ে রেখে তার মাথার নীচে গুঁজে রাখলো। কিন্তু ঘুমোতে পারলো না সে, কারণ সেই রুটির টুকরোর খোঁজে ইঁদুরগুলো তার মুখের ওপরে প্যারেড শুরু করে দিলো। ওদিকে ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বুদ্ধি করে একটা তারের সাহায্যে ঘরের সিলিং-এ রুটিটা ঝুলিয়ে রাখলো কেটারিং। রাতে সে তার পকেট-টর্চটা জ্বালতেই দেখে সেই ঝুলন্ত তারটা দুলছে। ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখলো, সেই রুটির টুকরোর ওপর ধারলো দাঁত বসাচ্ছে একটা মোটা ইঁদুর।

এভাবে চলতে পারে না। অভুক্ত রুটির টুকরো আমরা ফেলে দিতে পারি না, কারণ সকালে ব্রেকফাষ্ট করার মতো অবশিষ্ট কিছু আর থাকে না। অবশেষে ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ করতে একটা উপায় বার করলাম আমরা। কিছু কিছু রুটির টুকরো সংগ্রহ করে মেঝের মাঝখানে জড়ো করে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম ইঁদুরগুলোর আসার অপেক্ষায়। রাত নামতেই অন্ধকারে ছোট ছোট পায়ের শব্দ কানে ভেসে এলো আমাদের। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাদের পায়ের শব্দ যখন আর শোনা গেলো না, তখন বোঝা গেলো যে, সব ইঁদুর জড়ো হয়েছে ওই রুটির টুকরোগুলোর সামনে। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম—এবার আমাদের অভিযান শুরু করতে হবে। সবার হাতে এক একটা কোদাল, ইঁদুরগুলোর ওপর আঘাত হানার জন্যে। ওদিকে কেটারিং, ক্রপ আর ক্যাটের হাতে পকেট টর্চ, তারাও প্রস্তুত। এক সময় তাদের হাতের টর্চগুলো ঝলসে উঠতেই সবাই তাদের হাতের কোদাল দিয়ে আঘাত হানলো জমায়েত ইঁদুরগুলোর ওপর অতর্কিতে এর সুফল পাওয়া গেল। বেশ কিছু ইঁদুর মারা পড়লো, বাকী সব আধমরা হয়ে ছুটে পালাল প্রান বাঁচানোর জন্যে। তারপর সেই মরা ইঁদুরগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে প্যারাপেটে সাজিয়ে রেখে আবার প্রতীক্ষা। এবারেও সুফল পাওয়া গোলা—ইঁদুরগুলো রুটি খেতে এলো না, ওরা তখন ইঁদুরের মাংসের টুকরোর দারুণ ভক্ত হয়ে উঠলো, সম্ভবত তারা রক্ত-মাংসের স্বাদ পেয়ে থাকবে। তার আর ফিরে এলো না ট্রেঞ্চে। পাশের সেক্টরে তারা দুটো বড় বেড়াল আর একটা কুকুরকে মেরে মৃত কুকুর বেড়ালের টুকরো টুকরো মাংস ইঁদুরদের উপহার দিতে সেখানেও ইঁদুরের উপদ্রব কমে যায়।

রাতে খবর এলো শত্রুপক্ষ গ্যাস বোমা নিক্ষেপ করবে। এ ধরণের আক্রমন আশা করছিলাম আমরা। আর তার জন্যে প্রস্তুতি নেওয়া ছিলো আমাদের—গ্যাস মাস্ক-এর ব্যবস্থা করা ছিলো। যাইহোক, একসময়ে ভোর হয়ে এলো, কিন্তু তেমন কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হলো না আমাদের। কিন্তু সীমান্তে শত্রুপক্ষের ট্রেন, লরির যাতায়াতের বিরতি নেই এক মুহূর্তের জন্যেও। তবে তাদের এই মনোনিবেশ কিসের জন্যে? আমাদের পদাতিক সৈন্যরা ক্রমাগত গুলি চালিয়েছে তাদের ট্রেন আর লরি লক্ষ্য করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের যানবাহত চলাচলে একটুও কমতি হয়নি।

আমরা তখন ভীষণ ক্লান্ত—সেই ক্লান্তির ছাপ পড়েছিল আমাদের মুখে। আমরা এ ওর দৃষ্টি এড়াতে চাইছিলাম। আগের ফ্রন্টে ট্রেঞ্চের মধ্যে সাত দিন সাত রাত্রি বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল আমাদের', বললো ক্যাট। এখানে আসার পর থেকে ক্যাট যেন তার সব হাসি ঠাট্টা ভুলে গেছে। তার এই লক্ষণ ভালো নয়, কারণ সে হচ্ছে সদা-সতর্ক প্রহরী—সামনে যে কোনো বিপদের গন্ধ সে পেয়ে যায় আগে-ভাগে। আমরা সবাই যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে আমাদের মুখের সব হাসি, আনন্দ মুছে গেলেও একমাত্র ট্যাডেনকেই বেশ খুশী দেখাচ্ছিল। এর কারণ তার জন্যে ভালো রেশন ও মদের বরাদ্দ আছে। তার ধারণা, কোনো বিপদ ঘটবে না, আমরা নিরাপদে ফিরে যেতে পারবো বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। এই ভাবেই দিনের পর দিন কাটছিল। সম্ভবত আমরা ভাগ্যবান হবো।

সারাটা দিন আকাশে নজরদার বেলুন উড়তে থাকে। একটা গুজব শত্রুপক্ষ ট্যাঙ্ক বসাতে যাচ্ছে এখানে এবং অল্প উঁচু থেকে বিমান হানা করা হবে। কিন্তু এ খবরে আমাদের কোনো আগ্রহ হলো না, কারণ আমাদের কাছে একটা নতুন বিপদের খবর আছে—অগ্নিবৃষ্টির খবর, এ হলো শত্রুপক্ষের নতুন আবিষ্কার।

মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। পায়ে নীচের মাটি তখন অসম্ভব কাঁপছিল। ওপরে আমাদের এলাকায় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলছিল তখন। হামাগুড়ি দিয়ে এক কোনায় চলে গেলাম আমরা। প্রতিটি বোমার চরিত্র আমাদের জানা ছিল। আমরা জানতাম কোন গোলাগুলির টুকরো ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, আমাদের জীবনহানি হতে পারে। আমরা সবাই যে যার জিনিষপত্র সামলাতে ব্যস্ত তখন। ট্রেঞ্চের ভেতরটা তখন বারুদের গন্ধে ভরে গেছে, বাইরে রাতের বিভীষিকা, বোমার আগুনের আলোয় আলোকিত যুদ্ধক্ষেত্র। মাঝে মাঝে সেই আলোয় আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালাম, বিষণ্ন মুখে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমরা আমাদের মাথা দোলালাম।

প্যারাপেটের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ব্যাপারটা সবাই জেনে গেছে তখন, আর ট্রেঞ্চের ওপরের কংক্রীটের স্তর ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাও তাদের অজানা নয় এখন আর।

গোলাগুলির টুকরো যখন এসে নামলো ট্রেঞ্চের ছাদে, আমরা তখন সহজেই অনুমান করে নিলাম তার ভয়াবহ পরিণামের কথা—কি পরিমান গর্ত হতে পারে, সেটাও আমরা তখন জেনে গেছি। গ্যাস বোম—ট্রেঞ্চের পরিবেশ তখন ভয়ঙ্কর ভাবে দূষিত। ইতিমধ্যে নবাগতরা বমি করতে শুরু করে দিয়েছিল। অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ওরা।

ভোর হয়ে আসছে। বন্দুকের বা কামানের এক একটা আওয়াজ মনে হচ্ছিল খনি গর্ভের বিস্ফোরণের মতো। আর সেটা তখন দারুণ ভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল আমাদের সবাইকে, ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই তখন ছটফট করছি—এরপর কি ঘটতে পারে? সম্ভাব্য একটা ভয়াবহ ছবিও তখন আমরা এঁকে ফেলেছি আমাদের মানসপটে। আর সেই ছবিটা আমাদের অভিজ্ঞতারই ফসল—ওরা যেখানেই যায়, সেই জায়গাটা অন্যের কবরখানায় পরিণত হয়ে যায়। তবে একটা শুভ লক্ষণ যে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো ক্রময় স্পষ্ট হয়ে উঠছে, শত্রুপক্ষের গতিবিধি এবার খালি চোখে ধরা পড়বে। সম্ভবত দুপুরের দিকে আবার আক্রমণ হানা হবে, ওরা এখন ওদের অস্ত্রে শান দিচ্ছে। তবে বোমাবর্ষণ কমেনি, বরং বর্ষার বারি বর্ষণের মতো অব্যাহত। আমরা ক্রমশ শক্তি হারিয়ে ফেলছি। বাকশক্তিও প্রায় রহিত হতে বসেছে। আমরা নিজেরাই নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না!

এদিকে আমাদের ট্রেঞ্চও প্রায় খতম। অনেক জায়গায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু, তাও বোমার আঘাতে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে, আর সেই গর্ত দিয়ে মাটির স্তূপ নেমে এসেছে নিচে, ট্রেঞ্চের ভেতরে। অদূরে একটা পোষ্টের সামনে বোমার টুকরো এসে পড়লো এক সময়—ট্রেঞ্চটা একবার আলোকিত হয়ে উঠে পরমুহূর্তেই আবার কালো স্লেটের মতো অন্ধকারে ঢেকে গেলো জায়গাটা। আমরা এখন একটা কবরের মধ্যে অবস্থান করছি, এমনি অবস্থা এখন আমাদের। এখনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এক ঘণ্টা পরে প্রবেশ পথ আবার পরিস্কার হয়ে গেলো। আমরা এখন শান্ত—শান্ত হওয়া দরকার আমাদের এখন, কারণ আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে।

আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চের ভেতরে ঢুকে জানালো আরো দুটো ট্রেঞ্চ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। নবাগত সৈনিকরা তাকে দেখে কিছুটা শান্ত হলো বুঝি। সে আরো খবর দেয়—সন্ধ্যের দিকে খাবার আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। খাবার এলেও জলের অভাবে গলা ফেটে যাচ্ছিল আমাদের। এখন আমাদের এমন অবস্থা যে, তৃষ্ণা মেটাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের ঘামে ভেজা হাত চাটছি, যদি কিছুটা মেটে।

খাবার আসছে শুনে আমরা বয়স্করা আশ্বস্ত হলেও তরুণ সৈনিকরা মোটেও তাতে উল্লাসিত হলো না। তাদের ধারণা, বড়রাই সেই খাবারে অংশগ্রহণ করবে।

আর তাদের খাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে তাদের ক্ষিদে আরো বেড়ে যাবে, ভয়ংকর ক্ষুধা দমন করতে না পেরে হয়তো তারা তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাই খাবার আসার খবরটা তাদের কাছে অভিশাপ বলেই মনে হলো।

রাতটা যেন অসহ্য। খিদের তাড়নায় চোখে ঘুম আসছিল না। ট্যাডেন অভিযোগ করলো, আমাদের রুটি থেকে কিছু অংশ ইঁদুরগুলোকে ভেট দেওয়া উচিত হয়নি। সেটা থাকলে এখন হয়তো কিছুটা খিদে মেটানো যেতো।

একজন কর্পোরাল হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ট্রেঞ্চে এসে ঢুকলো। তার হাতে একটা গোটা রুটি। এ সৌভাগ্য মাত্র তিনজনের। রাতটা তাদের বেশ ভালোই কাটবে। তাদের কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেলো, বোমাবর্ষণ অব্যাহত তখনো। শত্রুপক্ষ কোথা থেকে যে এতো বোমার যোগান পাচ্ছে, সেটাই বড় রহস্য আমাদের কাছে। খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বিনীদ্র রজনী কাটিয়ে উঠে দুপুর গড়িয়ে গেলো, তখনো কিন্তু সেই কর্পোরালের খবর মতো খাবার এসে পেঁাছনোর কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলো না। ফলে যা আশা করা হয়েছিল তাই ঘটলো শেষ পর্যন্ত। একজন তরুণ সৈনিককে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে দেখা গেলো—ফিট হওয়ার লক্ষণ। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, তার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ঝিম মেরে বসেছিল সে, বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার দেহটা অবশ হয়ে আসছ, চোখ দুটো বুজে আসছে। আর তারপরেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো সে, জরাজীর্ণ বৃক্ষের মতো ভেঙ্গে পড়লো সে।

তারপরেই হঠাৎ একটা অদ্ভূত কাজ করে বসলো ছেলেটি, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো ক্লান্ত দেহটা কোনো রকমে বহন করে নিয়ে। তার উদ্দেশ্য অনুমান করে নিয়ে আমিই প্রথম বাধা দিলাম তাকে ঃ 'কোথায় যাচ্ছো তুমি ?'

'মিনিট খানেকের মধ্যেই আবার আমি ফিরে আসবো', বললো সে, সেই সঙ্গে আমাকে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

'একটু অপেক্ষা করো, বোমাবর্ষণ একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে।'

মুহূর্তের জন্যে শুনলো সে আমার কথাগুলো। তার চোখ দুটো একবার পরিষ্কার হয়ে উঠে আবার ঝাপসা হয়ে উঠলো। তার তখন পাগলের মতো অবস্থা, খাবারের সন্ধানে বাইরে তাকে যেতেই হবে, পেটের জ্বালা এমনি, মৃত্যুকেও পরোয়া করা যায় না তখন।

'বৎস, এক মিনিট', এবার ক্যাট ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে। আমরা তখন দুজনে মিলে তাকে ধরে ফেললাম। তখন সে পাগলের প্রলাপ বকতে বকতে গর্জে উঠলো ঃ 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে বাইরে যেতে দাও। বাইরে আমি যাবোই !'

কোনো কথাই শুনবে না সে। তার গলা শুকিয়ে আসছিল তৃষ্ণায়, তবু অসংলগ্ন ভাবে কথা বলতে কসুর করছিল না সে। আমরা তাকে যেতে দিলে, যে কোনো জায়গায় ছুটে পালাতে পারে সে, বলাবাহুল্য তার জন্যে বোমাবর্ষণ থামবে না, পদে পদে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে থাকবে তার জন্যে। তা সে যতো চিৎকারই করুক না, যতো চোখ লালই করুক না কেন, আমরা তখন তাকে আড়াল করার চেষ্টা করলাম, যাতে করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনা যায়। অবশেষে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হলো, এক সময় শান্ত হয়ে বসে পড়লো সে। আর আমরাও একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

এক অপ্রীতিকর ঘটনার পর একটা বদ্ধ আবহাওয়ায় আমাদের স্নায়ুর ওপর এবার একটা প্রচণ্ড চাপ পড়তে শুরু করলো। অতঃ কিম! আমরা তখন এমন ভাবে অপেক্ষা করছিলাম যে, যেকোন মুহূর্তে আমাদের দেহটা এই মাটির নীচে সুরঙ্গ পথে কবরস্থ হয়ে যেতে পারে—এই চিন্তাটাই এখন আমাদের বিষাক্ত পোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল যেন।

হঠাৎ একটা বিরাট বোমা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেলো এবং অন্ধকার ট্রেঞ্চে দিনের আলোর মতো ঝলকানি চোখে পড়লো। ট্রেঞ্চে ফাটল ধরেছে, সেটার সব সংযোগস্থলে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত হানা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত কংক্রীটের হাল্কা ব্লকটা অক্ষত অবস্থায় তখনো দাঁড়িয়েছিল। সেখানে তখন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছিল—সেই ঝড়ে রাইফেল, হেলমেট, মাটি, কাদা সব কিছুই উড়ছিল। সেই সঙ্গে সালফরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল সেই হাল্কা কংক্রীটের ব্লকটা। এখন মনে হচ্ছে, আমরা যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে কেউ আর এখন জীবিত থাকতে পারতাম না। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়লো আমামের মধ্যেও, বিশেষ করে তরুণ সৈনিকদের মধ্যেও। সেই তরুণ সৈনিকটি আবার ক্ষেপে উঠেছে। এবার আরো দুজন তাকে অনুসরণ করতে চাইলো। একজন তো লাফিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। একবার ভাবলাম, তার পায়ে গুলি চালাই, তখনি সে আবার চিৎকার করে উঠলো। আমি তখন ফিরে এলাম।

প্রথম তরুণ সৈনিকটি মনে হলো পাগল হয়ে গেছে। সে তখন ছাগলের মতো দেওয়ালে নিজের মাথা ঠুকছিল। আজ রাতে তাকে ট্রেঞ্চের একেবারে পেছনে রেখে আসতে হবে। ইতিমধ্যে তাকে আমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলাম। তবে শত্রুপক্ষের আক্রমন ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তার সব বন্ধন খুলে দিতে হবে।

আবার রাত নেমে এলো। আমরা তখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছিলাম। আমরা সবাই তখন প্রচণ্ড স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছিলাম, সেটা যেন ধারালো ছুরির মতো আমাদের শিরদাঁড়ায় বিঁধছিল। পা চলতে চাইছিল না, আমাদের হাত কাঁপছিল, আমাদের তখন পাগলের মতো অবস্থা। কয়েকদিন প্রায়

অনাহারে থেকে আমাদের দেহ শিথিল হয়ে পড়েছিল। বসন্তের পাতা-ঝড়া শুকনো গাছের মতো জরাজীর্ণ চেহারা হয়ে গিয়েছিল আমাদের তখন। কারোর দিকে তাকানোর মতো সাহস আমাদের ছিলো না, যদি সহ্য করতে না পারি, যদি ভয় পেয়ে যাই আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে! আমাদের মধ্যে তখন কেবল একটাই আশা—এই ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসান হলেই একসময়—

হঠাৎ নিকটবর্তী বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে গেলো। তবে কামান আর বন্দুকের গোলাগুলি বর্ষণ চলতে থাকে। আমাদের ট্রেঞ্চটা মুক্ত। আমরা তখন হ্যান্ড-গ্রেনেড হাতে নিয়ে ট্রেঞ্চের বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত রণক্ষেত্রে কোনো লোক থাকার কথা কেউ চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু তখনো ট্রেঞ্চের চারপাশে জায়গায় জায়গায় হেলমেট চোখে পড়লো। আর পঞ্চাশ গজ দূরে একটা মেশিন গান ইতিমধ্যেই পজিশন নিয়ে গর্জন করছিল। ঝড়ের গতিতে শত্রু সেনাদের এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমাদের পদাতিক সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিলো, আর সেইসঙ্গে আক্রমন, পাল্টা আক্রমন শুরু হয়ে গেলো। মেশিনগানের গর্জন, রাইফেলের গুলির আওয়াজে জায়গাটা থমথম করতে থাকলো। হেই আর ক্রপ তখন হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে ব্যস্ত—যতো দ্রুত সম্ভব। শত্রু সেনাদের থেকে হেই-এর দূরত্ব তখন সত্তর গজ, আর ক্রপের ষাট, এটা মাপা, কারণ দূরত্বটা খুবই জরুরী এক্ষেত্রে। শত্রু সেনাদের যা দৌড়, তা দেখে মনে হচ্ছে যে, চল্লিশ গজের কাছাকাছি আসার আগে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হেলমেটের নিচে ওদের মুখের সামান্য অংশ দেখা গেলেও চিনতে ভুল হলো না, ওরা যে ফরাসী সৈন্য, আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলমে। দু'পক্ষের মাঝে তারের বেড়ার কাছে আদের বহু সেনা হতাহত হলো। আমাদের মেশিনগানের গোলায় কাঁটাতারের পায়ে তাদের মৃতদেহ পড়ে থাতে দেখা গেল। এর ফলে আমরা দম নেবার যথেষ্ট ফুরসত পেলাম, ওরা তখন আরো কাছে এগিয়ে এলো। তাদের একজনকে আমি প্রত্যক্ষ করলাম। তারের বেড়ায় জট পাকিয়ে গিয়ে সে তখন শূন্যে দু'হাত জড়ো করে এমন ভাবে ঝুলছিল, যেন মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল তার পাপের স্বীকারোক্তি জানিয়ে। তারপর আমাদের গুলির আঘাতে তার দেহটা ঝুলে পড়লো তারের বেড়ার ওপর।

যে মুহূর্তে আমরা পিছু হটতে যাবো, ঠিক সেই সময় পিছন থেকে তিনজন শত্রুসেনা আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। একটা হেলমেটের নিচে দুটো চোখের আগুন ঝলসে উঠলো আমার দিকে তাকিয়ে। আমি আমার হাত তুললাম, কিন্তু সেই অদ্ভুত ভয়ংকর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হলো আমার। মনে হয়, এই রকন পাগল করা মুহূর্তে অতি বড় জল্লাদের মধ্যেও

চাঞ্চল্য দেখা দেয়, আমারও ঠিক সেই রকমটিই হলো বুঝি। তার সেই আগুণ-ঝরা চোখ দুটি তখন স্থির, অকম্পন, তারপর তার মাথাটা একটু একটু করে ওপরে উঠতে থাকলো, সেই সঙ্গে একটা হাত—একটু নড়াচড়া মানেই যেকোন মুহূর্তে তার হাতের হ্যাণ্ড গ্রেনেডটা নিক্ষেপিত হবে আমার দিকে। কিন্তু, কিন্তু এবার আমি আমার সব জড়তা, বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে তাকে চোখের পলক ফেলতে দেওয়ার আগেই আমি আমার হাতের হ্যাণ্ড গ্রেনেডটা তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারলাম। শূন্যে সামান্য একটু উঠে গ্রেনেডটা গিয়ে সোজা আঘাত করলো তার বুকে।

এবার আমরা পিছু হটতে শুরু করলাম। ট্রেঞ্চের মুখে দড়ি বাঁধা বোম রাখা ছিলো, ওরা সেখানে এলে ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে সেই দড়ি ধরে টানার যা অপেক্ষা। আর পিছনে থেকে তখন ক্রমাগত মেশিনগানের গোলাবর্ষণ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে তখন পশুর শক্তি ভর করেছিল যেন। আমরা যুদ্ধ করছিলাম না, তবে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতেই আমাদের এই অস্ত্র ধরা! এ আমাদের মানুষ খুন করা নয়, নিজেদের খুন হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এছাড়া আমরা আর কি করতে পারি তখন? আমরা কি বলতে পারি, আমাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিচ্ছি, এসো, তোমরা এসো আমাদের বিনা বাধায় হত্যা করে যাও। নিজেদের রক্ষা করার জন্যে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আমরাও যে ঠিক সময়ে অস্ত্র ধারণ করতে পারি, মানুষের সভ্যতা ধ্বংস করতে পারি, হত্যা করতে পারি, সেটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই আমরা তখন পশুর থেকেও অধম হয়ে যাই। আমাদের তখন এমনি মানসিকতা যে, যদি তোমার বাবাও ওদের সঙ্গে আসতেন, তখন তুমি তাঁর দিকে বোমা ছুঁড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতে না।

সামনের ট্রেঞ্চগুলো পরিত্যক্ত। ওরা কি ট্রেঞ্চের মধ্যে এখনো রয়েছে? না, তা মনে হয় না, আর সম্ভবও নয়, কারণ প্রতিটি ট্রেঞ্চ শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তবে এর জন্যে তাদেরও কম খেসারত দিতে হয়নি—তাদের সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা আমাদের থেকে অনেক, অনেক বেশী।

এখন প্রায় দুপুর! সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, প্রচণ্ড গরম! জমে ওঠা চোখ মুখের ঘাম জামার হাতা দিয়ে মুছতে হচ্ছে অনবরত, কখনো বা রক্তও! হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একটা ভালো ট্রেঞ্চের সামনে এসে পেঁছিলাম। পাল্টা আক্রমনের পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। আমাদের ট্রেঞ্চের পরেই সীমান্তরেখা। তারা আর এগোতে পারবে না। আমাদের পদাতিক সৈনিকরা তাদের আক্রমন প্রতিহত করে দিয়েছে, তারা বিদ্ধস্ত, বিচ্ছিন্ন। তবু আমরা নজর রাখি। একশো গজ উঁচু সমান আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলজ্বল করতে থাকে। আমার পাশেই একজন ল্যান্স-কর্পোরালের মাথা ফেটে যেতে দেখলাম। সেই অবস্থায় কয়েক পা ছুটে যায় সে,

তখন তার গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল। তবে সে যুদ্ধ একেবারে মুখোমুখি বা হাতাহাতি নয়; ওদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আবার আমাদের সেই বিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে এসে পেঁছিলাম এবং সেটা পেরিয়ে এলাম।

একজনের জন্যে আর একজনের অনুভূতি, চিন্তা ভাবনার কথা আমরা যেন ভুলেই গেছি এই নিষ্ঠুর যুদ্ধের আবর্তে পড়ে। একজন অপরজনকে দেখলে, কিংবা কেউ কারোর ভালো দেখলে সহ্য করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। আমরা অজ্ঞ, মৃতবত, আমরা কেবল জানি চালাকি করতে, কয়েকটা ভয়ংকর ম্যাজিক দেখিয়ে এখনো আমরা ছোটাছুটি করতে পারি, খুন করতে পারি।

যে তরুণ ফরাসী যুবকটি আমাদের পেছনে ছিলো, সে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেলো, তার হাতে রিভলবার, হাতটা তুললো সে। তার মানে কি সে গুলি করবে, নাকি সে নিজে—। না, কোনো কিছু করার আগেই প্রথমেই তার মুখের ওপর একটা কোদাল আছড়ে পড়লো। তারপর তার পেছনে বেয়নেটের আঘাত। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে। তৃতীয়বার আঘাত হেনে তার হাতটা রাইফেলমুক্ত হয়ে গেলো। আরো কয়েকজন বন্দীদের সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো আহতদের বহন করার জন্যে।

হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেলো আমরা কখন যেন শত্রুপক্ষের আস্তানায় এসে গেছি। আমরা তখন আমাদের পিছু হটা শত্রুর একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ে ছিলাম। এই আসার পথে আমাদের অনেক সৈন্যকে প্রান বিসর্জন দিতে হয়েছিল। একটা মেশিনগান গর্জে উঠেছিল বটে, তবে বোমার আঘাতে সেই গর্জন স্তব্ধ হয়ে যায়। তবু তা সত্বেও ওই কয়েক সেকেন্ডে আমাদের পাঁচজন সৈনিকের আহত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময়। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে অক্ষত মেশিনগান চালকের মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিতে ছাড়লো না ক্যাট। অন্যেরা বোমার ধারে কাছে যাওয়ার আগেই বেয়নেট দিয়ে আমরা তাদের একেবারে স্তব্ধ করে দিলাম। তারা তাদের গরম বন্দুক ঠাণ্ডা করার জন্য জল সঙ্গে এনেছিল, সেই জল পান করে আমরা আমাদের তৃষ্ণা মেটালাম অতঃপর।

যুদ্ধের সাময়িক বিরতি। শত্রুর সঙ্গে চরম মোকাবিলা করা থেকে বঞ্চিত হলাম আপাতত। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে আনরা থাকতে পারি না। আমাদের পদাতিক সৈন্যদের ছত্রছায়ায় ফিরে যেতেই হবে আমাদের নিজস্ব পদে। আমরা কবে ফিরছি, কথাটা জানা মাত্র আমরা কাছাকাছি ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নেবো।

যাইহোক, বেশ ভালোভাবেই আমরা ফিরলাম। নতুন করে শত্রুরা আর আক্রমন করলো না। কেউ মুখ খোলার আগে প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেলাম আমরা। আমরা তখন আর আমাদের মধ্যে ছিলাম না, আমরা তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। আমাদের তখন প্রচণ্ড খিদে পাওয়া সত্বেও আমরা আমাদের বরাদ্দের কথা ভাবতেই পারলাম

না। তারপর আস্তে আস্তে আমরা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এলাম, কতকটা মানুষের মতোন। খানিক আগেও আমরা বোধহয় জানোয়ার বনে গিয়েছিলাম। পশুর মতো উম্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম শত্রুপক্ষের ওপরে।

সারা রণক্ষেত্রে করনড্ বীফ খুবই বিখ্যাত। আমরা জানি, আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এটা খুবই খারাপ, তবু খেতে হয়, কারণ সব সময়েই আমাদের খিদে পায়। পাঁচটা টিন আমরা আমাদের ঝোলায় পুড়লাম। ওদিকে হেই কোত্থেকে যেন সাদা ফ্রেঞ্চ রুটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল। আমরা যে একটু ভালো খাবার খেতে পেলাম সেটা ভালো লক্ষণ। আমাদের বাড়তি শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে এর বড় প্রয়োজন ছিলো। ভালো ট্রেঞ্চের মতো যথেষ্ট খাবার খেতে পাওয়াটা খুবই জরুরী, আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে সেটা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর সেই কারণেই সেটার প্রতি আমাদের খুব লোভ। ট্যাডেনও চুপ করে বসেছিল না। ফরাসী মদ ভর্তি দু'বোতল জল সংগ্রহ করে এনেছিল সে।

সন্ধ্যা মানেই এখন আমাদের কাছে বিরাট আশীর্বাদ, সেই সন্ধ্যা নামলো। এর পরেই রাত্রি আসছে। চারদিকে একটা ভুতুড়ে আবহাওয়া। শীতের রাত্রি। ধারালো ছুরির মতো গায়ে বিঁধছিল হিমেল বাতাস। পাহারায় আছি আমি। অনুমানের একটা আলাদা চোখ আছে, সেই চোখ দিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি অন্ধকারের দিকে। আমার সব শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, যেমন হয় আক্রান্ত হওয়ার পর। তাই আমার ভাবনাগুলো ঠিক ঠিক সাজানো নয়, বিক্ষিপ্ত, একটার সঙ্গে আর একটার কোনো যোগসূত্র নেই। আসলে সেগুলো এক একটা স্মৃতি, এক এক সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা, যা আজও আমার কাছে স্মরণীয় স্মৃতি হিসেবে গেথে গেছে আমার হৃদয়ে। আমার দুর্বল মুহূর্তের সেই ভাবনাগুলো, অতীতের সেই সব স্মৃতিগুলো আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় আমার দুর্বল মুহূর্তে, আর অদ্ভূত ভাবে আমার মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

প্যারাসুটের আলোটা ওপর দিকে ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকে আর সেই আলোর আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি, গ্রীষ্মের মতো সন্ধ্যা। আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি গীর্জার একটা আচ্ছাদিত উদ্যানে, আর তাকিয়ে থাকি লম্বা লম্বা গোলাপ গাছগুলোর দিকে,। গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটে ওঠে গীর্জার ভিক্ষুদের সমাধি সৌধের পাশে। দেওয়ালে গাঁথা থাকে পাথরে খোদাই করা ক্রুশ চিহ্ন। কেউ নেই সেখানে। ফুল ফোটার এই জায়গায় এক অভূতপূর্ব নির্জনতা বিরাজ করছিল। ধূসর পাথরের সৌধের ওপর তপ্ত সূর্যের ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে মেঘের সঙ্গে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমার বয়স যখন কুড়ি হবে, তখন ভালবাসার ভাবাবেগের অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবো

তো? কাছেই সেই ছবির প্রতিবিম্বটা ভয়ঙ্কর ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আলোয় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সেটা আমা মন ছুঁয়ে যায় দারুণ ভাবে। আর সেই সব সুখকর দিনগুলির ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলে আজও আমার হৃদয়ে নাম না জানা এক অদ্ভূত অনুভূতি ও আলোড়ন জাগিয়ে তোলে যা আজও ভুলতে পারিনি, ভোলাও যায় না বোধহয়।

আরো আশ্চর্যের কথা হলো, এই সব স্মৃতিগুলো যখন আমার মনের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে, তাদের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ আমি দেখতে পাই। তারা যেন সব সময়েই ধীর, স্থির ও শান্ত, সেটাই যেন তাদের প্রাধান্য, বৈশিষ্ট্য। আর এমন কি যদি তারা শান্ত নাও হয়, শান্ত হয়ে যায় এক সময়। নিঃশব্দে তারা আসে আমার কাছে, কথা বলে আমার সঙ্গে চোখে চোখে। কথা নয়, শুধু তাদের নীরব চাহনীটাই একটা সতর্কতার বাণী বহন করে নিয়ে আসে আমার কাছে, যা আমাকে আমার হাতের রিভলবারটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মতো শক্তি জোগায় এই কারণে যে, মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে পাছে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিই, তা নাহলে আমার অতি প্রিয় এই দেহটা শান্ত ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই অর্থেই তারা শান্ত, আর সেই প্রশান্তির দিকে এখন আমাদের কারোরই নজর দেওয়ার মতো সময় নেই। রণক্ষেত্রে শান্ত ভাবের কোনো প্রশ্রয় নেই, রণক্ষেত্রের অশান্ত ভাবের অভিশাপ আর আক্ষেপের সুর এখনো পর্যন্ত আমাদের কানে যা পেঁছেছে, সেটা ছাড়িয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। এমন কি একেবারে এক সময়ে আমাদের বিশ্রামের এলাকাতেও কামানের গোলার চাপা আওয়াজ আমাদের কানে ভেসে আসে। শোনা যায় না এমন এক দূরত্বের ব্যবধানে আমরা কখনো যেতে পারি না। বেশ কয়েকদিন ভীষণ অসহ্য লাগে সেটা।

তাদের সেই নীরবতাই একটা কারণ—অতীতের এই সব স্মৃতিগুলো অসহনীয় দুঃখ ও বিষণ্ণতার মতো যেন আমাদেয় ইচ্ছেটাকে জাগায় না। যদি বা কখনো সেই ইচ্ছেটা জাগে—তারা কিন্তু ফিরে আসে না আর। তারা চলে গেছে, তারা এখন অন্য জগতের, আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। ব্যারাকে তাদের বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়, ফিরে আসার জন্য তাদের মধ্যে একটা বন্য আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। আর তখনো তারা আমাদের বাধ্য, আমরা তাদের একজন, আর তারা আমাদের, যদিও আমরা তাদের কাছ থেকে অনুপস্থিত। সৈনিকদের গান গেয়ে তারা আসে, যে গান গেয়ে আমরা মার্চ করি। মনে রাখার মতো তারা একটা অবিস্মরণীয় স্মৃতি যা আমাদের মধ্যে ছিলো আর আমাদের কাছ থেকেই এসেছিল।

কিন্তু এখানে ট্রেঞ্চের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। তারা আর জেগে ওঠে না। আমরা মৃত, আমরা শেষ হয়ে গেছি, আর তাদের অবস্থান

এখন সদূর দিগন্তে, তারা একটা রহস্যময় প্রতিবিম্ব, মানসিক চেতনা, ভূতুড়ে আবির্ভাবের মতো, যা আমাদের কৌতূহল জাগায়, যা আমরা কোনো আশা ব্যাতিরেকেই ভয় করি, ভালোবাসি। তারা শক্তিশালী, আর আমাদের ইচ্ছাশক্তিও কম শক্তিশালী নয়—কিন্তু আমরা জানি যে, তারা অধিগম্য নয়।

আর যদি আমাদের সেই যৌবনের দৃশ্যগুলো আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন আমরা কি করবো বোঝা মুশকিল। সেই তারুণ্যের ভাবাবেগ, গোপনীয়তা, প্রভাব তা তাদের কাছ থেকে আমাদের মধ্যে বর্তায়, নতুন করে আর জেগে উঠতে পারে না। হয়তো আমরা আবার তাদের মধ্যে মিশে যেতে পারি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি, আমরা হয়তো তাদের স্মরণ করতে পারি, ভালোবাসতে পারি, আর তাদের দেখে আলোড়িত হতে পারি। কিন্তু সেটা হবে মৃত কমরেডের ফটোর চাকচিক্যের মতো; সেগুলো তার এক একটা আকৃতি, অবয়ব, সেটা তার মুখাবয়ব। আর সে দিনগুলি আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি আমাদের জীবনের সব সুখে দুঃখে, সে সব আজ শুধুই স্মৃতি, শুধুই বেদনা; কিন্তু সেই মানুষটা—সে তো আর ফিরে আসবে না, সে যে হারিয়ে গেছে আমাদের কাছে। সেই সব দৃশ্যের মাঝে আমরা আমাদের পুরনো অন্তরঙ্গতা আর পুনরুদ্ধার করতে পারবে না কখনো।

ভ্রমনার্থীদের নতো আজ আমরা আমাদের যৌবনের সেই সব দৃশ্যগুলো বুড়ি ছোঁয়ার মতো শুধুই ছুঁয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন অনেক বদলে গেছি। হয়তো আমরা আমাাদের অস্তিত্ব জীইয়ে রাখতে পারি, আরো কিছু কাল বেঁচে থাকতে পারি, হয়তো সেই বেঁচে থাকা অনন্তকাল হতে পারে—কিন্তু সেটা কি সত্যিকারের বেঁচে থাকা হবে? যুদ্ধের বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে সেই বেঁচে থাকাটা কি আগের মতো মসৃণ ও সুখকর জীবন যাপন হতে পারে?

এখন আমরা শিশুদের মতো অবহেলিত, আর বৃদ্ধ মানুষের মতো অভিজ্ঞ। আমরা এখন অপরিণতে পরিণত, দুঃখ বেদনার প্রতীক, আর আমাদের অস্তিত্ব ভাসা-ভাসা আমার বিশ্বাস, আমরা হারিয়ে গেছি, আমরা ফুরিয়ে গেছি।

ঠাণ্ডায় আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। গায়ের চামড়া কুঁকড়ে আসছিল। তবু রাতটা যেন গরম বলেই মনে হলো। ট্রেঞ্চে ফিরে এসে এক মগ বার্লি' দেখতে পেলাম। মোটা ও সুস্বাদু, ধীরে ধীরে খেলাম সেটা। চুপ চাপ বসে রইলাম আমি, যদিও অন্যেরা বেশ মুখর, হাস্য কৌতুকে ভরপুর, কারণ বোমাবর্ষণ বন্ধ আপাতত। এক একটা দিন যাচ্ছে, আর অবিশ্বাস্য ভয়ংকর ঘণ্টাগুলো কাটাতে হচ্ছে আমাদের প্রাণ হাতে করে। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমনে হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নিহত সৈনিকদের ঘটনাস্থলেই কবর দেবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, আর

আহতদের মধ্যে যাদের আঘাত কম, তাদের উদ্ধার করা হচ্ছে, আর অন্যদের ফেলে রাখা হচ্ছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গোনার জন্যে। তাদের মধ্যে একজনকে আজ দু'দিন হলো খোঁজ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ। মনে হয়, ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে সে, আর পেটের ওপর ভর দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে সে হয়তো কোথায়। মুখটা তার মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে হয়তো, তাই তার কোনো চিৎকার বা সাড়া-শব্দ আমাদের কানে এসে পেঁছিচ্ছে না। আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে কেউ তাকে খুঁজে বার করতে পারলে তাকে তিনদিন বাড়তি ছুটি মঞ্জুর করা হবে। লোভনীয় প্রস্তাব! ক্যাট আর ক্রপ সেই বিকেলে বেরিয়েছে তার খোঁজে, আর অ্যালবার্টও বসে নেই চুপ করে, কান খাড়া করে সেও বেরিয়ে পড়েছে। কোনো লাভ হলো না তাতে। শূন্য হাতে ফিরে এলো তারা! এখন সহজেই অনুমেয় যে, তার সন্ধান হয়তো আর পাওয়া যাবে না। আমাদের কাছ থেকে যেন সে হারিয়ে গেলো এই ভাবে—হয়তো প্রথমে সে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে থাকবে—তারপর হয়তো প্রচণ্ড চোট—আঘাতে ভুল বকে থাকবে, সে তখন তার স্ত্রী, তার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে থাকবে, আমরা প্রায়ই তার মুখ থেকে একটি নাম শুনে থাকি—সে নাম এলিস।

মেঘমুক্ত নীলাকাশ। সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে গেলেও মাটি থেকে প্রচণ্ড তাপ উঠে আসতে শুরু করলো। বাতাসে বারুদের গন্ধের সঙ্গে রক্তের গন্ধ ভেসে এলো, রক্তের গন্ধের সঙ্গে ক্লোরোফর্মের গন্ধে তখন আমাদের বমি হওয়ার উপক্রম হলো।

হঠাৎ আবার আকাশ থেকে বোমাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। চটপট উঠে বসলাম আমরা পাল্টা আক্রমনের জন্যে। একটা দারুণ টেনশান শুরু হয়ে গেলো আমাদের মধ্যে।

আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, চার্জ, শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করা, তাদের হটিয়ে দেওয়া, এই সব কথাগুলোই এখন এখানে চল হয়ে গেছে, আমাদের মুখে মুখে শুধু এই কথাগুলোই এখন ঘোরাফেরা করে থাকে। কিন্তু এসব কথাবার্তার মাঝে আমরা অনেক ভালো ভালো লোককে হারিয়েছি, বেশীর ভাগই নবাগত, তরতাজা যুবক। নতুন করে আবার ফৌজ পাঠানো হয়েছে আমাদের সেক্টরে, তাদের মধে বেশীরভাগই তরুণ, যাদের এখনো স্বপ্নভঙ্গ হয়নি, যারা এখনো ভবিষ্যত সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে, সেই সঙ্গে আবার যুদ্ধের নেশাও আছে তাদের। তাদের ট্রেনিং বলতে কিছু নেই। কয়েক সপ্তাহের পুঁথিগত শিক্ষা দিয়েই তাদের পাঠানো হয়েছে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে কলের পুতুলের মতো। তারা জানে না, বলির পাঁঠার মতো তাদের এখানে পাঠানো হয়েছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে। তাদের মধ্যে খুব কম সৌভাগ্যবান আছে,

যারা শুধু মৃত্যুর চুম্বনের স্বাদ একবার নিয়েই রণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, আহতদের তালিকা বাড়াবার জন্যে। কিন্তু তাতে লাভ কি আমাদের? দলের সংখ্যা বারানোর জন্যে? আধুনিক যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতাই এদের নেই, এরা জানে না কোথায় কখন বোমা ফেলতে হয়, কখন কিভাবে চোখ কান খোলা রেখে শত্রুসেনার অস্তিত্বের ওপর নজর রাখতে হয়। তাই এইসব অনভিজ্ঞ নবাগতদের জন্যে আজ আমাদের যুদ্ধের এই পরিণতি, এতো বেশী ক্ষয়ক্ষতি। এক একজন অভিজ্ঞ শত্রু সেনাদের হাতে আমাদের এই বালখিল্যের দলের পাঁচ থেকে দশজন খতম হচ্ছে প্রতিবার আক্রমনে।

তার ওপর আচমকা গ্যাস বোমার আক্রমনে ক্ষয়ক্ষতি যেন আরো বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় তাদের কি যে করতে হয়, তারা কিছুই জানে না। তাদের তখন দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর পথে পা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

ট্রেঞ্চের একটা অংশে হঠাৎ হিমেলস্টোসের কথা মনে পড়ে গেলো। রুদ্ধশ্বাসে আমরা তখন নতুন করে চার্জের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। খুঁজতে গিয়ে ট্রেঞ্চের একেবারে এক কোনায় তার সন্ধান পেলাম, তার চোখে মুখে সামান্য ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম, কিন্তু তাকে সাংঘাতিক আহত হওয়ার ভান করতে দেখলাম। তার মুখ বিবর্ণ, তাঁকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত বলে মনে হলো। তা সত্বেও তার ওপর আমার একটু মায়া হলো না এই কারণে যে, যেখানে তরুণরা মরীয়া হয়ে উঠে মৃত্যু আসন্ন জেনেও যুদ্ধে ঝাপ দিচ্ছে—সেখানে সে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিয়েছে এখানে। ছিঃ ছিঃ—

'বেরিয়ে যাও!' চিৎকার করে উঠে ধমক দিলাম ওকে।

তাতে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তার ঠোঁটজোড়া শুধু একটু যা কেঁপে উঠলো, তাঁর গোঁফ সংকুচিত হলো একটু যা। তবু তিনি উঠলেন না। আমি তখন তাঁর হাত ধরে তাঁকে টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। চিৎকার করে উঠলো সে। এ একেবারে অসহ্য ঠেকলো আমার কাছে। এবার আমি তার গলা ধরে জিনিস ভর্তি থলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তোলার মতো তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম। মাটির ঢেলা কোথাকার, আবার বলছি, তুমি এখান থেকে বেরোবে—নীচ, শুয়োরের বাচ্চা, বেরোও!' আমি তাকে দরজার দিকে ঠেলে দিলাম।

তার ওপর আমাদের আক্রমনের সামিল হলেন আর একজন, একজন লেফটেনান্ট। দৃশ্যটা দেখা মাত্র আন্দাজ করে নিয়ে তিনিও আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠলেন, 'যাও, এগিয়ে যাও, তরুণদের সঙ্গে যোগ দাও!' তাতে কাজ হলো। তাঁর হুকুম মান্য করলো হিমেলস্টোস। তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকালো সে, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙলো তার। তারপরেই তাঁকে অনুসরণ করলো। আমি তার গমন পথে

তাকিয়ে রইলাম। প্যারেড-গ্রাউণ্ডের মতো আর একবার স্মার্ট হতে দেখলাম হিমেলস্টোসকে।

বোমা-বৃষ্টি, গ্যাস চার্জ, কামানের গোলাবর্ষণ, ট্যাংক, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড —এ শুধু কথার কথাই নয়, এগুলো এখন পৃথিবীর কাছে, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে ভয়ংকর ভয়াবহ এক একটি শব্দ। আমাদের চোখগুলো জ্বলছে, আমাদের হাত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, আমাদের হাঁটু থেকে রক্ত ঝরছে, আমাদের কারোর কনুই ভেঙ্গে ঝুলে পড়েছে। কতদিন ধরে এইভাবে চলছে? সপ্তাহ—মাস—বছর? না, কতকগুলো দিন মাত্র। মৃত্যু পথযাত্রী কয়েকটা বিবর্ণ মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা—আর প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুতি নেওয়া।

কয়েক ঘণ্টার অবসর নেওরার পর আমি তাদের উচিত শিক্ষা দিলাম। হেই ওয়েস্থাস দারুণ আঘাত পেলো তার পিঠে। আমি ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ওকে বললাম, 'বন্ধু, সব ঠিক হয়ে যাবে!' ক'কিয়ে উঠলো সে, যন্ত্রণায়। ও নিজেই নিজের হাত কামড়ে ধরলো।

শুধু হেই নয়, ওর মতো আরো কত আহত সৈনিকদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের চোখের সামনে। বোমার আঘাতে কারোর চোয়াল উড়ে গেছে; আমরা দেখতে পাচ্ছি পা দুটো কাটা যাওয়া সত্বেও সৈনিকরা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শ্লথ গতিতে পথ চলছে, আমরা দেখতে পাই মুখ-বিহীন মানুষ, আমরা দেখেছি একজন আহত সৈনিক তার হাতের ক্ষতস্থানটা মুখে চেপে ধরেছে রক্ত বন্ধ করার জন্যে, যাতে সেই ভয়ংকর রক্তক্ষরণের দরুণ মৃত্যুর দুয়ারে না যেতে হয় তাকে। সূর্য অস্ত গেছে, রাত্রি আসছে, বোমাবর্ষণের তীব্র আওয়াজ, প্রাণের শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের জীবন এখন।

রণক্ষেত্র হাজার হাজার মানুষের রক্তে রঞ্জিত। তবু এই বিরাট ধরিত্রীর কিছু পবিত্র ভূমি এখনো অবশিষ্ট আছে, যার ওপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, যেখানে চাষ করলে এখনো কিছু ভাল ফসল তোলা যায়। সেই মাটি আমরা আমাদের শত্রুদের উপহার দিতে পারি। কিন্তু—সেদিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়, সেখানে যে তিন হাতের ব্যবধানে এক একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

সবেমাত্র আমরা মুক্তি পেয়েছি। লরি ছুটে চলেছে। 'মনে রেখো, তোমাদের মাথার ওপর টেলিফোনের তার, সাবধানবাণী শোনা মাত্র আমরা হাটু মুড়ে মাথা নীচু করলাম তাড়াতাড়ি। পথের দু'ধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন গাছ। এখন হেমন্ত, গাছগুলো এখনো সবুজ, রাত ধূসর এবং ভিজে ভিজে। এখন কে যেন আমাদের কোম্পানীর নাম ধরে ডাকছে। হ্যাঁ, কোম্পানী কমাণ্ডার, তিনিও

এসেছেন, তারপর—তাঁর ভাঙ্গা হাতে পট্টী বাঁধা। আমরা তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ক্যাট ও অ্যালবার্ট'কেও চিনতে পারলাম আমি। আমরা এক সঙ্গে দাঁড়ালাম পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়লাম এবং এ ওর দিকে তাকালাম।

আবার আমরা আমাদের কোম্পানির নাম ধরে তাঁকে ডাকতে শুনলাম: 'দ্বিতীয় কোম্পানি, এই পথে।' তারপর আরো নরম কণ্ঠস্বর, 'আর কেউ নেই, দ্বিতীয় কোম্পানি?' তারপর তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেলো।

রাত্রি শেষে ভোর হলো, ধূসর রং সকলের। গ্রীষ্মে আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আসি তখন আমরা সংখ্যায় খুবই শক্তিশালী ছিলাম। এখন আমরা সীমিত, এখন হেমন্ত, গাছের পাতাগুলো রুক্ষ, ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় কে যেন আমাদের সংখ্যা গুণে চললো, 'এক—দুই—তিন—চার—' এবং বত্রিশে এসে থেমে যায় সেই কণ্ঠস্বর। তারপর সেই কণ্ঠস্বর আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আর, আর কেউ নেই?'

দিনের শুরু ভোর, সকালে অতি কষ্ট করে একটা ছোট্ট সংখ্যা আবার উচ্চারিত হলো সেই কণ্ঠে: 'বত্রিশ।'

□ সাত □

ওরা আমাদের ফিল্ড ডিপোতে নিয়ে গেলে নতুন করে সেনাবাহিনী সাজানোর জন্যে। আমাদের কোম্পানির এখন কম করেও আরো একশো সৈন্যের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কিছুদিনের জন্যে আমাদের অবসর দেওয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পরে হিমেলস্টোস এসে হাজির হলো আমাদের কাছে। মনে আছে তাকে ট্রেঞ্চে মারধোর করার পর এই প্রথম দেখা। সে এখন আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলো। আমিও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। কারণ আহত হেই ওয়েস্থাসকে যত্ন করে ফিরিয়ে আনতে আমি দেখেছিলাম তাকে। তাছাড়া আমাদের হাতের রেস্ত ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হিমেলস্টোসের বদান্যতার জন্যেই ক্যান্টিন থেকে অনাহারে ফিরতে হয়নি আমাদের। তবে আমরা প্রায় সবাই তাকে ক্ষমা করে দিলেও ট্যাডেন এখনো আগের মতোই তার বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক এবং তার প্রতি ওর সন্দেহ এখনো যায়নি।

তবে এহেন ট্যাডেনেরও মন জয় করে ফেললো সে। হিমেলস্টোস জানালো, সার্জেন্ট কুকের কাজ সে করবে এখন থেকে, কারণ নিয়মিত কুক ছুটিতে গেছে। প্রমাণ হিসেবে আমাদের জন্যে দু'পাউন্ড চিনি আর বিশেষ করে ট্যাডেনের জন্যে আধ পাউন্ড মাখন সঙ্গে এনেছিল সে। এখন আমরা নিশ্চিন্ত। সেনাবিভাগে

ভালো খাবার আর বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। হিমেলস্টোসের সৌজন্যে এখন আমরা খুশী। এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার—এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও।

যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে আমরা সবাই কেমন জানোয়ারের মতো হয়ে যাই, মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না আর তখন। এরও অবশ্য একটা কারণ আছে, আর সেটা হলো জীবনের অনিশ্চয়তা—কখন কার ওপর মৃত্যু এসে যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ জানে না। আর সেই মৃত্যুভয়ে আমরা তখন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আবার আমরা জীবনের মানে খুঁজে পাই যেন। তাই আর কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদ বা ইচ্ছে থাকে না। আমরা বাঁচতে চাই যে কোন মূল্যে। কেমরিক মৃত, হেই ওয়েস্থাস মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে এখনো। নিহত সৈনিকদের পরিবার সরকারী চাকরী পাবে, এটুকু যা সান্ত্বনা। মাটেমের দুটো পাই কেটে বাদ দিতে হয়েছে, সে আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না কখনো। ফেয়ার, ম্যাক্স আর থেয়ারও মৃত। হ্যামারলিংও মৃত। ওরা ছাড়া এখনো একশো কুড়িজন আহত সৈনিকের কোনে খোঁজ নেই। কে কোথায় পরে রয়েছে কে জানে। সে যাইহোক, তারা কোথায় গেলো, কে বাঁচলো, সে খবরের কি দরকার আমাদের—আমরা যে এখনো বেঁচে আছি, সেটাই তো সব থেকে বড় কথা। তবে ওরা বেঁচে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই ওদের যত্ন নিতাম বৈকি!

কিন্তু আমাদের কমরেডরা মৃত, আমরা তাদের কোন সাহায্যই করতে পারি না। তাদের এখন অখণ্ড অবসর। আর কে জানে, আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে? এখন আমরা আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করবো, পেট ভরে খাবো, আকণ্ঠ পান করব। আমাদের সময় একটুও নষ্ট হতে দেবো না, কারণ জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত।

এই কিছুদিন আগেও এখানে একটা সৈন্যদের থিয়েটার ছিলো। রঙিন পোস্টার আজও রাস্তায় রাস্তায় ঝুলতে দেখা তায়। আমি আর ক্রপ হাঁ করে সেইসব পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। একটি মেয়ে পরণে তার গ্রীষ্মকালীন স্বচ্ছ পোষাক, কোমরে বাঁধা লাল পেটেন্ট লেদারের বেল্ট। মেয়েটি ছাড়াও, তার পেছনে সুন্দর আলো ঝলমল রোদ্দুরের নীচে সমুদ্র নীল পোশাক, আর সাদা ঘোড়া পাশে রেখে দাঁড়িয়েছিল একটি যুবক। পোস্টারে মেয়েদের ছবি আমাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। সে রকম কোনো কিছু আছে কিনা, আমরা নিজেরাই তা জানি না, এমন কি এখনো আমরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করি না। এ রকম দৃশ্য আমরা বেশ কয়েক বছর দেখিনি। দেখিনি সেই সব সুখের সৌন্দর্যের ও আনন্দের দৃশ্য। এখন শান্তির সময়, হয়তো এই রকম শান্তির সময়েই এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা

ঘটে থাকে। আমরা দারুণ উত্তেজিত।

'মেয়েটির ওই পাতলা জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, ওই রকম জুতো পড়ে মাইলের পর মাইল কেউ হাঁটতে পারে না', আমি বললাম। আর তারপরেই লজ্জা পেলাম এখানে ওই রকম ছবির দৃশ্য দেখে।

'আচ্ছা, ওই মেয়েটির বয়স কতো হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?' জানতে চাইল ক্রপ।

'খুব বেশী হলে বাইশ', আন্দাজে বললাম আমি।

'তাহলে তো আমাদের থেকে বয়সে বড়। কিন্তু আমি বলছি, সতেরোর বেশী নয় সে!'

আমাদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো, সপ্তদশী মেয়ের কথা শুনে।

'বাড়িতে আমার কিছু সাদা ট্রাউজার আছে', বললো সে।

'সাদা ট্রাউজার!' বললাম আমি, 'কিন্তু মেয়েটির কি পছন্দ হবে?' আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। যুবকটির পরণে নোংরা ইউনিফর্ম, নিরাশ করার মতো।

তাই আমরা হোর্ডিং থেকে সাদা পোশাকের যুবকটির ছবিটা ছিঁড়তে উদ্যত হলাম। সতর্ক হতে হলো, যাতে করে মেয়েটির ছবিটা নষ্ট না হয়।

আমি উৎসাহবোধ করলাম না। কারণ কারোর পোষাক অন্যদের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তাছাড়া পুরুষমাত্রই ইতর বিশেষ। তবে ছবিটা যখন আমরা একবার বিবেচনা করেছি, আমি নিজে আমার ইচ্ছের কথা ঘোষণা করলাম। এমন কি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আমি বললাম, 'দেখা যাক, ভালো পরিষ্কার শার্ট পাওয়া যায় কিনা—'

'মনে হয় তার চেয়ে সকস্ ভালো হতে পারে', কোনো কারণ না দেখিয়ে বললো অ্যালবার্ট।

'হ্যাঁ, সম্ভবত সকস্‌ই ভালো। চলো একটু ঘুরে দেখা যাক।'

লীয়ার ও ট্যাডেন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালো। পোস্টারের দিকে তাকানো মাত্র তারা অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিল। আমাদের মধ্যে লীয়ারই প্রথম সহবাসে লিপ্ত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ দিলো সে। ছবিটা খুব উপভোগ করলো সে। তাকে সমর্থন করলো ট্যাডেন।

ঠিক অসুবিধেয় পড়তে হলো না আমাদের। কোন সৈনিক অশ্লীল নয়? হয়তো এই মুহূর্তে প্রসঙ্গটা আমাদের ভালো লাগলো না, যাইহোক, আপাতত ব্যাপারটা আমরা এড়িয়ে গেলাম।

সন্ধ্যায় আমরা সাঁতার কাটতে গেলাম। তিনটি মহিলা ভবঘুরের মতো জলের

ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধীরে ধীরে হাঁটছিল তারা কোনো দিকে না তাকিয়েই-যদিও আমাদের সাতারের স্যুট ছিলো না।

তাদের আহ্বান জানালো লীয়ার। তারা হেসে উঠলো, দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের লক্ষ্য করলো। আমাদের মাথায় যা এলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় তাদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলাম আমরা। সেই সঙ্গে আমরা সবাই ঘিরে ধরলাম তাদের ধরে রাখার জন্যে। খুব একটা সুন্দরী ছিলো না তারা, কিন্তু এখানে এদের থেকে ভাল মেয়ে কোথায় আর পাওয়া যায়?

ওদের মধ্যে একজন ছিলো পিঙ্গল-কেশী শ্যামাঙ্গী মেয়ে। হাসলে তার মুক্তোর মতো শ্বেত শুভ্র দাঁতগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার পরণের পোষাক যথেষ্ট আলগা, হাওয়ায় বুঝি বা একটু বেসামাল, তখন হাঁটুর সীকোন বলতে কিছু আর থাকে না। আমরা তাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করার চেষ্টা করলাম, তাদের উত্তরগুলো আমাদের বোধগম্য হলো না। রসভঙ্গ হতে না দিয়ে আমরা শুধু হেসেই গেলাম। আমাদের থেকে অনেক বেশী সতর্ক ও বুদ্ধিমান ট্যাডেন। বাড়িতে ছুটে গিয়ে সেনাদের রুটি সংগ্রহ করে ফিরে এলো সে।

তাতে বিরাট লাভ হলো। ওরা তখন কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে তাদের কাছে যেচে বললো। কিন্তু জলাধারের বিপরীত দিকে যেতে আমাদের নিষেধ আছে। প্রত্যেক ব্রীজের পাহারাদার আছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। তাই আকারে ইঙ্গিতে আমরা তাদের আভাষ দিলাম, বরং তারা যেন এপাড়ে আসে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজী নয় তারা। বরং মাথা ঘুরিয়ে তারা ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো যে ওই ব্রীজটা অতিক্রম করতে চায় না। তারা তখন ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর ক্যাগলের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। আমরাও সাঁতার কাটতে কাটতে তাদের অনুসরণ করে চললাম। কয়েকশো গজ গিয়ে তারা তাদের বাড়ির দিকে আঙুল দেখালো, সেখান থেকে সামান্যই দূরে—বাড়ির চারপাশে সারি সারি গাছ, বেশ একটা ছায়াঘনো আবহাওয়া, অরণ্যের পরিবেশ!

আমরা তাদের বললাম, কিছু পরে, প্রহরীরা যখন তাদের দেখতে পাবে না, তারা আসবে ওদের বাড়ীতে। রাতে, হ্যাঁ আজই রাতে। তারা আর অপেক্ষা করতে চায় না। মেয়েদের আহ্বান, সুন্দরী না হোক, নারী তো বটেই। হাত নেড়ে তারা বিদায় জানালো। পিঙ্গলকেশী মেয়েটির দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ থাকে লীয়ারের দিকে। সোনালী চুলের মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমাদের জন্যে রুটি এনো, যেন ভালো হয়—'

হাত নেড়ে আমরা তাদের ইচ্ছেয় সায় দিলাম। তারপর আমরা চেইন-স্মোকারের মতো একটার পর একটা সিগারেট টানতে থাকলাম। এক সময় ক্রপ বলে উঠলো, 'ওদের জন্যে কিছু সিগারেটও নিয়ে যাবো আমরা।'

আকাশের রঙ বদলায়—এখন আকাশটা ঠিক সবুজ আপেলের মতো দেখাচ্ছিল। ওরা তিনজন, আর আমরা চারজন। তাই একজনকে বাদ পড়তে হবে। ট্যাডেনকেই বাতিলের তালিকায় ফেলতে হবে। তাই রাম আর কোল্ড বীয়ার মিশিয়ে খাওয়ানো হলো ওকে যতক্ষণ না পুরোপুরি মাতাল হয়ে ওঠে ও। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। আমাদের দেহ মন তখন কামনায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে—কতক্ষণে যে মেয়েগুলোর সঙ্গে মিলিত হবো, এখন এটাই কেবল চিন্তা সকলের।

পিঙ্গলকেশী মেয়েটি আমার, এই রকমই বন্দোবস্ত হলো আমাদের মধ্যে। আমরা সবাই আমাদের বরাদ্দ রুটিগুলো কাগজে প্যাক করে সঙ্গে নিলাম। সেই সঙ্গে সিগারেট ও আজই সন্ধ্যায় পাওয়া মেটে সসেজ। সব মিলিয়ে চমৎকার উপহার হবে মেয়েদের কাছে আমাদের তরফ থেকে।

জানালাগুলো বন্ধ, উঁকি মেরে মেয়েগুলোকে দেখার উপায় নেই। আমরা তখন বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ালাম, কোথাও ফাকফোকর আছে কিনা দেখার জন্যে। ব্যর্থ হয়ে শেষে আমরা অধৈর্য হয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটু ইতস্তত করে বলে উঠলো ক্রপ ঃ 'ধরো যদি ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে মেজরকে দেখা যায়?'

'তাহলে আমরা তাকে সাফ করে দেবো', বলে দাঁত বের করে হাসলো লীরার। এখানে আমাদের রেজিমেণ্টের নম্বর পড়তে পারে সে।'

কোর্টইয়ার্ডের দরজা খোলাই ছিলো। আমাদের বুটের কর্কশ শব্দ হচ্ছিল। বাড়ীর দরজা সামান্য খোলা, সেই সামান্য খোলা পথে বাইরে আলো চুঁইয়ে পড়ছিল। এই সময়ে একজন মহিলার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'সশ্, সশ্! আপনারা কারা কমরেড?' উত্তরে আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম, সেইসঙ্গে হাতের প্যাকেটগুলো দেখিয়ে প্রতিবাদ জানালাম।

এবার অপর দুটি মেয়েকেও আবির্ভূত হতে দেখা গেল সেখানে। এবার দরজা পুরোপুরি খুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যায় বাইরের অন্ধকার ভেসে গেলো। ওরা আমাদের চিনতে পেরে আমাদের আবির্ভাবে হাসিতে ফেটে পড়লো।

'এক মিনিট—' মুহূর্তের জন্যে একবার অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে আড়াল থেকে এক বাণ্ডিল পোশাক ছুঁড়ে দিলো আমাদের উদ্দেশ্যে। খুশি হয়ে সেই সব পোশাকের আবরণে ঢেকে ফেললাম আমরা নিজেদেরকে। তখন আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো। তাদের ঘরে একটাই ছোট্ট ল্যাম্প। ঘরটা বেশ গরম এবং একটা মিষ্টি মধুর গন্ধে ঘরটা ম' ম' করছিল। আমরা আমাদের প্যাকেটের মোড়ক খুলে মেয়েগুলোর হাতে তুলে দিলাম। তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারা যে ভীষণ ক্ষুধার্ত, তাদের চোখমুখ দেখে বোঝা

গেলো। মেটে সসেজ আর রুটির প্রতিটি টুকরো খেতে গিয়ে তারা বারবার আমাদের প্রশংসা করতে ভুলছিল না। আমরা তাদের ভাষা ঠিক বুঝতে না পারলেও তাদের বলার ভঙ্গিমা, অভিব্যক্তি খুবই ভালো লাগছিল আমাদের। তাদের প্রতিটি কথা, কথা বলার ভঙ্গিমাও বন্ধুসুলভ। আমরা দেখতে তরুণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পিঙ্গলকেশী মেয়েটি আমার ঘন চুলে ওর আঙুলের বিলি কাটতে কাটতে ফরাসী মহিলারা যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পুরুষদের ভালো কেশ ও দাড়ি গোঁফ দেখে, ঠিক সেই রকমই ওকে বিগলিত হতে দেখা গেলো।

আমি ওর হাতটা শক্ত করে ধরে ওর হাতের চেটোয় আমার ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম। দু'হাতের চেটোয় ও আমার মুখটা তুলে ধরলো, ওর আয়ত চোখ দুটি তখন স্থির অকম্পন আমার চোখের ওপর। আমি ওর বাদামী রঙের নরম হাতের স্পর্শ আর ওর লাল ঠোঁট দুটোর ঘ্রাণ যেন অনুভব করছিলাম খুব কাছ থেকে। ওর মুখের ভাষা আমি না পারছিলাম বুঝতে, না পারছিলাম ওর চোখের ভাষা পড়তে। আমরা এখানে আসার সময় যা আশা করছিলাম, বুঝি তার থেকেও অনেক বেশী কিছু বলতে চাইছিল তারা।

সেই ঘরের সংলগ্ন আরো কিছু ঘর ছিল। সেই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম, একটা ঘরে স্বর্ণকেশী মেয়েটিকে দারুণ ভাবে পটিয়েছে লীয়ার। এসব খেলায় সে বেশ পাকাপোক্ত, ভালো খিলাড়ী। কিন্তু আমি, আমি যে হারিয়ে গেছি, হাজার যোজন দূরে পড়ে রয়েছি আমি, আমি যে ডুবে গেছি আমার দুর্বলতায়, আমার কামনা বাসনায়। অথচ আমার যে ভীষণ বিশ্বাস ছিলো, আমি আমার চরিত্রে এতটুকু কলঙ্ক স্পর্শ করতে দেবো না কখনো। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমার এই সব ইচ্ছেগুলো বেড়ে বেড়ে পাহাড় সমান হয়ে গেছে, এর ফলে আমি ক্লান্ত, আমি বিষণ্ন। আমাদের নিজস্ব পোশাক, জুতো সব কিছুই পরিত্যক্ত, এই যে এখন আমাদের গরমের পোশাক, পায়ের চটি সবই ওই মেয়েগুলোর দেওয়া উপহার, সৈনিকের নিজস্ব আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই রইলো না আর, রইলো না আমাদের রাইফেল, কোমরের বেল্ট, মাথার টুপি; এমন কি আমাদের ট্রাউজারের নিচের আণ্ডারওয়্যারটাও ওদের দান। নিজেকে আমি এখন সপে দিয়েছি অজানা, অনিশ্চিতের ওপর, এখন যা কিছুই ঘটুক না কেন, সব কিছুই মেনে নিতে হবে। আমার এখন ভীষণ ভয়, কি হয়, কি হয়।

পিঙ্গলকেশী যখন কোনো কিছু চিন্তা করে ওর ভ্রু কাঁপতে থাকে, কিন্তু কথা বলার সময় ওর ভ্রুজোড়া অস্বাভাবিক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। আর ওর কণ্ঠস্বর এক এক সময় ঠিক কথা হয়ে ঝড়ে পড়ে না, তখন মনে হয়, বুঝি ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, কিংবা আমার কাছে অন্তত মনে হয় অসমাপ্ত কথা, যেন এক অজানা পথের নিশানা, যে পথের নিশানা আছে, কিন্তু সঠিক নির্দেশ নেই। আমি এর কি

দেখেছি—আর আমি এর কিই বা জানি? এই পিঙ্গলকেশীদের কথা খুব কমই আমি বুঝি। ওরা আমাকে শান্ত করে দিতে চায়—এই আধো আলো আঁধারীর মধ্যে। সবার উপরে, আমার চোখের সামনে কেবল একটা জ্বলন্ত মুখ, সে মুখের পিঙ্গল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, স্পষ্ট জলের মতো স্বচ্ছ।

একই অঙ্গে এতো রূপ? একই মুখের কতো না অভিব্যক্তি! কিন্তু মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে এই মুখই ছিলো আমার কাছে এক অজানা, অচেনা, আমার স্পর্শের বাইরে। আর এখন? এখন ওই মুখ স্পর্শ করা যায় অনায়াসে, ওই মুখে আমার মুখ আমি রাখতে পারি, ওর ওই ঠোঁট জোড়ায় আমার বহু তৃষিত ঠোঁট জোড়া চেপে ধরতে পারি। এ আমার কামনা বাসনা বা ভাবাবেগ নয়, কিন্তু এ হলো রাতের মোহ, এ এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের, এ সবই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক সঙ্গে, জ্বলজ্বল করতে থাকে এক সঙ্গে। কিন্তু বাড়িতে কেন এমন মনে হয় না?

সৈনিকদের ব্রথেলের অবস্থার মধ্যে কি তফাত—এখানেই আমাদের যাওয়ার অনুমতি মেলে, দীর্ঘ লাইনের অপেক্ষা করতে হয় তাদের সাক্ষাত বা সঙ্গ পাওয়ার জন্যে। অথচ তাদের কথা আমি কখনো ভাবিওনি। কিন্তু ইচ্ছেটাই আমার মনটা ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের দিকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে। আর আমার আশঙ্কা, সেই ইচ্ছে থেকে আমি আবার কখনো মুক্ত হতে পারবো কিনা।

কিন্তু কি আশ্চর্য ঠিক তখনি আমি সেই পিঙ্গলকেশীর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শসুখ আমি অনুভব করলাম এবং আমি আমার ঠোঁটজোড়া চেপে ধরলাম তার ওপর। আমার চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে আবেশে। আমি তখন মনে মনে চাইছিলাম, এক সত্ত্বাটা জেগে উঠুক আমার মধ্যে, যুদ্ধের ভীতি ভোলবার জন্যে, সেই পোষ্টারের মেয়েটির ছবির কথা মনে পড়ে যায়। আর মুহূর্তের জন্যে আমি চিন্তা করি মেয়েটিকে জয় করার ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে। আর মেয়েটি ওর যে উর্দ্ধ বাহুলতা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে এখন, আমি যদি তার ওপর চাপ দিই, সম্ভবত একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে…

এক সময় আমরা আবার যখন এক সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে চলেছি—রাতের ঠাণ্ডা হওয়া এসে লাগছে আমাদের তপ্ত দেহে, জ্যোৎস্নার আলোর লুকোচুরি খেলা চলছে আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের আড়ালে, নিচে ক্যানেলের ছোট ছোট ঢেউ-এ, তখনি লীয়ার বলে উঠলো, 'আমাদের বরাদ্দ রুটির সুফল পাওয়া গেলো।'

সুফল! সুফল মানেই তো দেহের সুখ, মনের অসুখের আরোগ্য লাভ! এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে নিজেকেই আমি বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বলতে কি এতে আমি একটুও সুখ পাইনি, সুখ নামে পাখির কলকাকলি আমি শুনতে পাইনি সেখানে, যা কিছু অনুভূত হয়েছে সেখানে, আমার মনে হয় যে সে সবই অসুস্থ দেহ মনের বিকার ভুলতে আসা কয়েকটা জানোয়ার শহরে অরণ্যের

পরিবেশটাকে কায়েম করতে চাইছে বুঝি। তারপরেই আমরা এক জোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা উঠে আসছিল ব্রথেলের দিক থেকেই। একটু একটু করে সেই পায়ের শব্দটা আমাদের কাছে আসতে থাকলো। কাছে আসতেই আমরা দেখতে পেলাম একটি নগ্ন সৈনিককে, পায়ে বুট, ঠিক আমাদের মতোই; তার হাতে একটা প্যাকেট, আর সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই আসছিল। সে হলো ট্যাডেন। নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে।

আমরা হেসে উঠলাম। সকালে অভিশাপ দেবে সে আমাদের।

ডাক পেয়ে আমি ছুটে গেলাম আর্দালি রুমে। ছুটির ও ভ্রমণের দুটো পাশ আমাকে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন কোম্পানি কমাণ্ডার। দেখলাম সতেরো দিনের ছুটির মধ্যে তিনদিন ভ্রমণের। যথেষ্ট নয়, জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রমণের জন্যে পাঁচদিন ছুটি মঞ্জুর করলে হয় না! বারটিঙ্ক তখন পাশটা দেখতে বললেন আমাকে। ভালো করে সেটা লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখি, ছুটি থেকে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না। ছুটি উপভোগের পর আমাকে ট্রেনিং-এর জন্যে একটা ক্যাম্প রিপোর্ট করতে হবে। সহযোদ্ধাদের কাছে আমি হিংসার পাত্র হয়ে গেলাম। তবে ক্যাট আমাকে একটা ভালো উপদেশ দিলো, আমি যেন ভালো স্থায়ী চাকরীর চেষ্টা করি। আমার মন বিষণ্ণ—ছয় সপ্তাহের জন্যে আমি দূরে চলে যাবো। অবশ্য সেটা খুবই সৌভাগ্যের। কিন্তু ফিরে আসার পর এখানে এসে কি দেখতো? কি ঘটতে পারে তখন! তখন কি আমি আমার সব বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে পাবো? ইতিমধ্যে তো হেই আর কেমরিক চলে গেছে আমাদের ছেড়ে—এর পর কে, কে যাবে?

রাতে আমরা আবার গেলাম ক্যানালের বিপরীত দিকের সেই বাড়িতে। সেই পিঙ্গলকেশী মেয়েটির সঙ্গে ছুটিতে যাওয়ার আগে একটু সঙ্গ সুখ উপভোগ করার জন্যে। আমি যে ছুটিতে যাচ্ছি আর যখন ফিরে আসবো তখন আমরা এ ওর কাছ থেকে বহু দূরে চলে যাবো, আমরা যে আর কেউ কাউকে দেখতে পাবো না, এই নিষ্ঠুর সত্য কথাটা ওকে বলতে ভীষণ ভয় লাগছিল আমার এই ভেবে যে, ও কিভাবে নেবে সেটা, আঘাত পাবে না তো! কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা শোনার পর ও শুধু মাথা নাড়লো, বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিলো না, কিংবা ওর কথ্যে তেমন কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। এখন ভাবছি—হ্যাঁ, লীয়ার ঠিকই বলেছিল—আমি যদি আবার যুদ্ধে যেতাম, তাহলে ও আমাকে আবার আহ্বান জানাতো। কিন্তু স্রেফ ছুটিতে যাওয়া, একথা শুনতে আগ্রহী নয় ও। যুদ্ধে যাওয়া মানেই তো অনিশ্চিত জীবন! তাহলে কি এ ধরণের মেয়েরা আমাদের স্থায়ীভাবে পেতে চায় না, যেমন করে চায় বিয়ে করা স্ত্রী? এরা যেন সবাই এক একটা ভাড়াটে প্রেমিকা।

অপর মানুষের প্রতি তাদের আন্তরিক কোনো টান বা আকর্ষণ নেই। এরা সব অলৌকিক স্বপ্ন দেখে, এদের ঘুম ভাঙ্গে ভালো ভালো খাবার আর রুটির হাতছানিতে।

পরদিন সকালে ছুটির মুক্তি পেয়ে রেলষ্টেশনে চলে গেলাম। ক্যাট ও অ্যালবার্ট আমার সঙ্গে এলো। তখনো ট্রেন ছাড়তে বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরী ছিলো। ওদের যে যার ডিউটিতে ফিরে যেতে হবে। তাই আমরা এ ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম ট্রেন ছাড়ার আগেই। 'গুড লাক ক্যাট, গুড লাক অ্যালবার্ট'।'

ওরা চলে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে একটু একটু করে ওরা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে এক সময়, এবং হলোও তাই। আমি তখন আমার ব্যাগেজের ওপর বসে পড়লাম। হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে উঠলো, নিজেকে ভীষণ একা বলে মনে হলো, বড় বেশী নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম, আর তখনি আমার এতদিনের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুড়িয়ে গেলো।

বহু ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করেছি, বহু সুপ-কিচেনের সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছি লাইনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু আজকের মতো এতো বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি, ধৈর্য হারাতে হয়নি। এখন সন্ধ্যা, আর ট্রেনটার যান্ত্রিক ঘর্ঘর আওয়াজ যদি না শুনতে পেতাম, তাহলে আমি হয়তো পাগলের মতো চিৎকার করে উঠতাম। ট্রেনটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নীল পাহাড়টা একটু একটু করে আমার চোখের আড়ালে চলে যেতে থাকলো। ডোলবেনবার্গের প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা, এখানকার অরণ্য, এখানকার পাহাড়, নদী-নালা আকাশ বাতাস সব আমার পরিচিত। এ সবের পেছনেই রয়েছে শহরটা। আমার সেই বহু পরিচিত ছবিটা এক সময় হারিয়ে গিয়ে আর এক পরিচিত ছবির উদ্দেশ্যে ট্রেনটা ছুটে চলে এক এক করে মাঠ-প্রান্তর অনেকগুলো ষ্টেশন ছাড়িয়ে। এক সময়ে সেই ছেলেবেলা দেখা আমার অতি প্রিয় ছবিটা এখানে অস্পষ্ট, তারপর একটু একটু করে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো আমার কাছে। একটা রাস্তার ক্রসিং। জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। সেখান থেকে আমি এক পাও নড়তে পারছিলাম না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। অথচ অন্যেরা কেমন যে যার মালপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো পরবর্তী ষ্টেশন আসা মাত্র যাতে করে চটপট ট্রেন থেকে নেমে পড়তে পারে। আর আমি তখন যে ক্রসিংটা পেরিয়ে এলাম, সেই রাস্তাটার নাম মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকি—ব্রেমারস্ট্রেস, ব্রেমারস্ট্রেস।

নিচে সেখানে কতো না সাইকেল আরোহী, লরী, পথচারী মানুষ, এটা একটা ধূসর রাস্তা, ধূসর সাবওয়ে। আমার মনে ভীষণ দাগ কেটে যায় সেটা, যেন সেটা আমার প্রিয় মা।

এক সময় ট্রেনটা থেমে গেলো। স্টেশনে বড় হৈ-চৈ আর চিৎকার, আর সাইন-বোর্ডে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন। না, আর নয়, এবার আমি এক হাতে রাইফেল আর অপর হাতে আমার প্যাকেটটা নিয়ে নেমে পড়লাম সেই ষ্টেশনে। প্লাটফর্মে নেমে চারিদিকে তাকালাম। প্লাটফর্মের কোনো মুখই আমার পরিচিত নয়। একজন রেডক্রশ সিস্টার আমাকে ড্রিঙ্ক দিতে চাইলো, কিন্তু ফিরিয়ে দিলাম আমি। বোকার মতো, আবিষ্টের মতো হাসলো সে, নিজেই নিজেকে গুরুত্ব দিতে ব্যস্ত তখন। 'দেখো, আমি তোমাকে সোলজার কফি দিচ্ছি।' সে আমাকে 'কমরেড' বলেই সম্বোধন করলো। কিন্তু এ সব কিছুই আমার প্রাপ্য নয়। আমি তখন আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করেছি।

পরিচিত সব রাস্তা, ব্রীজ বাড়ি ঘরদোর—কেবল মুখগুলো সব বদলে গেছে, যাদের দেখে গিয়েছিলাম তারা আজ উধাও, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে, কিংবা শুয়ে আছে শেষ শয্যায়—কবরে। পথে একটা মিষ্টির দোকান দেখে মনে পড়লো, ওখানে আমরা আইসক্রীম খেতাম, আর সেখানে বসেই আমরা প্রথম ধূমপান করতে শিখি। এখানকার প্রতিটি দোকান, মুদিখানা, ডাক্তারখানা সব কিছুর সঙ্গেই আমি পরিচিত। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে এসে দাঁড়ালাম একটা বাদামী রঙের দরজার সামনে। তালায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে উঠছিল। দরজা খুলতেই একটা অদ্ভূত ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো আমার গায়ে, আমার চোখ তখন ঝাপসা।

সিঁড়িতে নিজের বুটের শব্দ শুনে নিজেই চমকে উঠি, যেন করে পদধ্বনি শুনতে পাই—অতি পরিচিত সেই শব্দ, নাকি কোনো প্রেতাত্মার। পরক্ষণেই ভুল ভেঙ্গে যায় আমার। এতো আমারি পায়ের শব্দ। কেন আমি ভয় পাচ্ছি অহেতুক। ওপর তলায় দরজা খোলার ঘর্ঘর শব্দ, রেলিং-এর ধারে কেউ যেন ঝুঁকে পড়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। যে দরজাটা খোলা হয়েছিল, সেটা রান্নাঘরের, ওয়া আলুর কেক তৈরী করছে। আজ শনিবার, আমার বোন বোধহয় রেলিং-এর ধারে ঝুঁকে থাকবে। মুহূর্তের জন্যে আমি লজ্জা পেলাম, মাথাটা নামিয়ে নিলাম। তারপর মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলে ওপর দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, সে আমার বড়দিদি।

'পল', চিৎকার করে উঠলো সে, 'পল—'

মাথা নেড়ে সায় দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে তখন একটা দরজা খুলে ডেকে উঠলো', 'মা, মা পল এসেছে।

মা খবর পেয়ে গেছেন, এখুনি ছুটে আসবেন। তাই আমি আর এক পাও নড়তে পারলাম না। হাতের রাইফেলটা শক্ত করে ধরলাম দেওয়ালে ভর দিয়ে। আমার পা দুটো অসম্ভব কাঁপছিল তখন। কথা বলতে পারছিলাম না, কারণ আমার দিদির ডাকটা আমার বাকশক্তি রহিত করে দিয়েছে, এখন আমি যেন কিছুই করতে পারিনা।

মরীয়া হয়ে উঠে আমি তখন হাসবার চেষ্টা করলাম, কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোলো না। তাই অসহায়ের মতো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থানুর মতো।

আমার দিদি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ওপরে উঠে আসছো না কেন ভাই, কি হয়েছে তোমার? ওপরে উঠে এসো।'

কোনো রকমে পা টেনে টেনে তো ওপরে উঠলাম। এবার আমি মা'র গলার স্বর শুনে ভয় পেলাম। আওয়াজটা ভেসে এলো তাঁর শয়নকক্ষ থেকে। 'তিনি কি বিছানায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনি অসুস্থ—' উত্তরে বললো দিদি।

মার কাছে গিয়ে শান্ত গলায় বললাম, 'মা, আমি এসে গেছি।'

'তুমি কি আহত?' উদ্বেগভরা গলায় মা জানতে চাইলেন।

'না, আমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি।' বললাম আবার, 'মা, তুমি কি অসুস্থ?'

'এখন একটু আধটু উঠতে পারছি', বলে দিদির দিকে তাকালেন তিনি, 'ওকে ওর প্রিয় খাবার দেবার ব্যবস্থা করো।'

'তুমি যে আসছো, আমরা জানতাম—' বলে হাসলে আমার দিদি।

'আর আজ শনিবার', আমি বললাম।

'এসো, আমার পাশে এসে বসো।'

আমি তাঁর পাশে বসলাম। জানালা পথে চেসনাট গাছ দেখতে দেখতে নিজের মনে বললাম, 'তুমি এখন তোমার বাড়িতে। সব কিছুই আমি এখন ফিরে পেয়েছি এখানে, তবু কেন জানিনা মনে হলো, আমি যেন এখানে নেই। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে—আমাদের মধ্যে যেন একটা পর্দার আড়াল পড়ে গেছে।

প্যাকেট খুলে ক্যাটের দেওয়া এডমার চীজ, দুটি রুটি, মাখন, দু'টিন লিভার-সসেজ বার করে বললাম, মনে হয় এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে।'

খাবারগুলো নিয়ে গেলো। হঠাৎ মা আমার একটা হাত চেপে ধরে চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'পল সেখানকার সবথেকে বেশী খারাপ কি বলো তো?'

'মা, আমি তোমাকে এর কি উত্তর দেবো? তুমি বুঝতে পারবে না, কখনো উপলব্ধি করতে পারবে না—কি খারাপ তুমি জিজ্ঞেস করছো, শোনো মা—আমি মাথা দুলিয়ে মিথ্যে করে বললাম, 'না মা, খুব একটা খারাপ নয়। সেখানে আমরা সবাই প্রায় এক সঙ্গেই থাকি, তাই খুব একটা খারাপ লাগে না।'

'কিন্তু একটু আগে হেনরিক ব্রেডমেয়ার এসেছিল, সে যে বললো সাংঘাতিক অবস্থা সেখানে। গ্যাস বোমা চার্জ হচ্ছে—'

শুধু কি গ্যাস বোমা? শত্রুপক্ষ আরো কতো যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে, সে সব কথা শুনলে মা হয়তো হার্টফেল করে মারা যাবেন। তাই সব কথা প্রকাশ করা যায় না তাঁর কাছে। বানিয়ে বানিয়ে বলতে হলো, 'না মা, ওসব কথার কথা আর কি', উত্তরে আরো বললাম, 'ব্রেডমেয়ার যা বলে গেছে ঠিক অতটা খারাপ নয়। তার প্রমাণ তো আমিই! আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ, সুস্থ দেখছো না আমাকে?' মাকে কোনো রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রান্নাঘরে এসে দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মার কি হয়েছে বলো তো?'

দিদি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'কয়েক মাস হলো ওঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। অনেক ডাক্তারই দেখে গেছে ওঁকে। তবে তোমাকে মা'র এ অবস্থার কথা লিখতে চাইনি তুমি ভাববে বলে। একজন ডাক্তার বলেছেন, সম্ভবত ওঁর আবার ক্যান্সার হয়েছে।'

রিপোর্ট করার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্টের কাছে গেলাম। কচ্চিৎ দু'একজন আমার সঙ্গে কথা বললো। আমার এখন অনেক কাজ, বেশী কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না। ব্যারাক থেকে ফেরার পথে চিৎকার করে কে যেন ডাকলো আমাকে। তখনো চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলাম আমি। চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই দেখি আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেজর সাহেব। 'স্যালুট জানাতে পারো না?' রাগে ফেটে পড়লেন তিনি।

'আমি দুঃখিত মেজর', থতমত খেয়ে বললাম আমি, 'আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।'

'অফিসারদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় জানো না?' খিঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর মুখে ঘুসি মারি, কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। কারণ ওঁর ওপর আমার এখানে ছুটি কাটানো নির্ভর করছে! ওঁর কথার অবাধ্য হলে উনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। এসব কথা ভেবে আমি আবার কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'হাই মেজর, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।' আমি তাঁকে আরো বললাম, মাত্র এক কি দু'ঘণ্টা আগে আমি এখানে এসে পেঁৗছেছি, ক্লান্ত ছিলাম বলে ঠিক মতো তাকাতে পারিনি। তাতেও কোন লাভ হলো না। তিনি আমার নাম জানতে চাইলেন, জানতে চাইলেন কোন রেজিমেণ্ট থেকে আমি আসছি, তারও খোঁজ নিলেন তিনি। ঠিক ঠিক উত্তর দিলেও তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, আরো উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, 'তুমি ভেবেছ ফ্রণ্ট লাইনের মতো ব্যবহার এখানেও করবে, কি ভেবেছ তুমি? যাইহোক, এখানে ওসব বরদাস্ত করবো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানে আমাদের একটা নিয়মানুবর্তিতা আছে।' এই বলে তিনি হুকুম

করলেন, 'কুড়ি কদম পেছনে, আবার সামনে ফিরে এসো ডবল মার্চ করে।'

ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছিলাম, তবু প্রতিবাদ করতে পারলাম না, ওই যে, উনি যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে বসেন, সেই ভয়ে চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। এবং তাঁর হুকুম মতো কাজ করতে হলো।

এই ভাবেই আজকের প্রথম ছুটির সন্ধ্যাটা আমার মাটি হয়ে গেলো। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার ইউনিফর্ম ঘরের এক কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর ওয়ারড্রোব থেকে ঘরোয়া পোশাক বার করে গায়ে চাপিয়ে নিলাম। আগের পোশাক যথেষ্ট আঁটো হয়ে গেছে। এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে গায়ে-গতরে বেশ বেড়ে গেছি আমি। আয়নার সামনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মজা পেলাম বেশ। আর আমার মা আমাকে ঘরোয়া পোশাকে দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বাবার ইচ্ছে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে তাঁর পরিচিতদের সামনে আমি হাজির হই। আমি তাঁর সেই ইচ্ছেটা যে পূরণ করতে অপারগ, কথাটা আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম তাকে।

চেজনাট গাছের নিচে।

এখন বীয়ার গার্ডেনে কোনো নির্জন জায়গায় বসে থাকা অনেক আনন্দদায়ক বলে মনে হলো আমার। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে টেবিলে বীয়ারের গ্লাসের পাশে। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় থেকেই ড্রিংক করতে শুরু করি আমি। চেজনাট গাছের পাতায় আড়াল থেকে জ্যোৎস্নায় চাঁদের লুকোচুরির খেলা দেখতে দেখতে উদাস হয়ে যাওয়া ভালো লাগে, ভালো লাগে অদূরে সেন্ট মার্গারেট চার্চ থেকে ভেসে আসা সান্ধ্য প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর শুনতে।

এই ভালো, এই আমার পছন্দ। এখানকার লোকগুলোর মুখোমুখি হতে ভাল লাগে না—একটার পর একটা প্রশ্নে তিতিবিরক্ত করে ছাড়বে, এদিক দিয়ে আমার মা অনেক ভালো, কোনো প্রশ্ন করেন না। কিন্তু বাবা? তিনি চান, সব সময় যুদ্ধের কথা বলি। কিন্তু তাতে ওঁর মন ভরে না। উনি জানতে চান, আমি কখনো শত্রু-সেনার মুখোমুখি যুদ্ধ করেছি কিনা! উত্তরে আমি ওঁকে বলি, 'না।' আর তারপরেই উঠে পড়ি ওঁর কাছ থেকে আর এখানে চলে আসি। কিন্তু বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এলেও রাস্তায় নেমে প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে চলছি, পেছন থেকে কে যেন আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলো। পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি, আমার জার্মান শিক্ষক, আর তারও সেই গতানুগতিক প্রশ্ন: 'ভালো কথা, যুদ্ধের খবর কি? কেমন চলছে সব সেখানে? ভয়ংকর, উঃ ভয়ংকর, তাই না? হ্যাঁ, ভয়ংকর তো হবেই, কিন্তু আমাদের অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে। তবে যাই হোক, শুনেছি, সেখানে নাকি ভালো খাবার পাওয়া যায় না।

কিন্তু তোমাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে পল। স্বভাবতই মনে করতে পারি, তুমি ওখানে বেশ ভালোই ছিলে, আর এখানে তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে, কি বলো? খুবই স্বাভাবিক। ভালো সৈনিকরা কখনো অভাব অভিযোগ করে না। তুমি তাদের দলেই বলে মনে হচ্ছে আমার।'

এরপর তিনি আমাকে এই টেবিলের সামনে নিয়ে এলেন অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা আমাকে স্বাগত জানালো। আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন হেডমাষ্টার মশাই এবং বললেন: 'তাহলে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছো? সেখানে সবাই নিশ্চয়ই খুব তেজদীপ্ত, যুদ্ধ করতে গিয়ে খুশী, দেশের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে কারোর দ্বিধা নেই, তাই না? চমৎকার, ওঃ সত্যি চমৎকারই তো বটে! বাড়ি ফিরতে মন নিশ্চয়ই চায় না তাদের?'

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম, ঘরে ফিরে আসার জন্যে কেউই দুঃখিত হয় না।

হাসলেন তিনি। আমার কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না তাঁর। তিনি আমাকে সিগার উপহার দিয়ে বললেন, 'এখানে ধূমপান করে দেখো, ভালো লাগবে।' তারপর ওয়েটারের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমাদের এই তরুণ যোদ্ধার জন্যে আর এক বোতল বীয়ার দিয়ে যাও।' তারপরেই আবার দ্বিতীয় বোতলের ফরমাস দিলেন তিনি আমার জন্যে। এখানকার মানুষ সৈনিকদের প্রতি কতই না কৃতজ্ঞ, হেডমাষ্টার মশায়ের ব্যাপারে সেটা প্রতীয়মান হলো! হেডমাষ্টার মশায়ের ইচ্ছে সারা বেলজিয়াম, ফ্রান্সের কয়লাখনির অঞ্চল, রাশিয়ার কিছু অংশ যেন আমরা দখল করে নিই। এ সবের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করলেন তিনি আমার কাছে। উত্তরে আমি তাকে বোঝালাম, কাজটা অতো সহজ নয়, ওদের রিজার্ভফোর্স আমাদের থেকে অনেক বেশী। একা জার্মান, আর আমাদের বিপক্ষে প্রায় সারা বিশ্ব লড়াই করছে। তাছাড়া যুদ্ধটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—লোকেরা যা জানে ঠিক তার উল্টো।

তিনি আমার কথা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার বয়স কম, তুমি যুদ্ধের কিছুই জানো না। তবে তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও দেশের জন্যে। জীবনের ঝুঁকি নিও, সেটাই হবে তোমার কাছে সর্বোচ্চ সম্মান—তোমার প্রতীজ্ঞা হবে, শত্রুকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ করা—' এই ভাবে আমাকে জ্ঞান দেওয়ার ফাঁকে তিনি তৃতীয় বীয়ারের বোতলের ফরমাস দিলেন আমার জন্যে। তারপর আরো কয়েকটা সিগার আমার পকেটে রেখে দিয়ে বন্ধুসুলভ পিঠ চাপড়ে বললেন, 'শুভেচ্ছা রইলো! আশা করি খুব শীগগীর তোমার কাছ থেকে আরো ভালো সংবাদ শুনতে পাবো।'

ভেবেছিলাম এবারের ছুটির আমেজটা অন্য রকম হবে—অন্তত এক বছর আগের থেকে আলাদা তো হবেই! সেই সময় যুদ্ধ বলতে কি, যুদ্ধের বিভীষিকার রূপ কি রকম আমি জানতাম না, তখন আমি একটা শান্ত পরিবেশে ছিলাম, তখন আমার সেক্টরে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়েনি। তাই তখন এখানকার পরিবেশও ছিল শান্ত, সংযত, এতো কৌতূহল ছিল না তখন মানুষের মধ্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি যেন এখানকার কেউ নই, আর এটা আমার কাছে বিদেশ। কিছু লোক অবান্তর প্রশ্ন করে, আর কিছু জ্ঞানী লোক আছে, যারা প্রশ্ন করে না, নীরব থাকাটাই জ্ঞানী লোকেরা শ্রেয় বলে মনে করে থাকে, কারণ তাদের বিশ্বাস, জ্ঞানী লোকেদের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বাড়তি কথা না বলাই ভালো।

এখন আমার একা থাকতেই পছন্দ, যাতে করে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে না পারে। সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে আসে আমার কাছে, যুদ্ধের খবর নেয়, যুদ্ধ বেশীদিন চলবে কিনা, যুদ্ধ বেশীদিন চললে এক শ্রেণীর অসৎ লোকেদের কাছে পৌষ মাস, কারণ যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের অভাবের সুযোগ নিয়ে চড়া দামে বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা লুটতে পারবে। কিন্তু অন্যদের কাছে এই যুদ্ধ যে সর্বনাশ, তা তারা মানতে চায় না কিংবা বুঝতে চায় না। যুদ্ধ মানুষকে কতো না অমানুষ, নিষ্ঠুর করে তোলে? তাই এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে মন চায় না আর।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে ভালো কিছু জিনিসও আবার আছে। যেমন এখানকার সাধারণ সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মীদের দেখে আমার ভালো লাগে, যেমন ওদের যুদ্ধের কোনো চিন্তা নেই, আতঙ্ক নেই, একটা নির্ভাবনা ও নিটোল সুখের জীবনের প্রতিশ্রুতি আছে তাদের মধ্যে। এই রকম জীবনের প্রতি এখন আমার মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। এখানে থেকে আমি যুদ্ধের আতঙ্কের কথা ভুলতে চাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অনুশোচনা হয় নিজের মধ্যে, সে তো নিজের কাছ থেকে পালিয়ে আসার সামিল হবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই তো এই যুদ্ধ! আর সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি পালিয়ে আসতে চাইছি? তাই এখন নতুন করে এখানকার লোকগুলোর সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে। এখানকার মানুষগুলোর চরিত্র ভিন্ন ধরণের, যাদের আমি বুঝতে পারিনা, যাদের আমি অবজ্ঞা করি, ঘৃণা করি। এখন ক্যাট, অ্যালবার্ট ট্যাডেন আর মুলারের কথা আমার ভাবা উচিত। আচ্ছা, ওরা এখন কি করছে? নিঃসন্দেহে ওরা এখন হয়তো ক্যান্টিনে বসে যুদ্ধের গল্প করছে, কিংবা সাঁতার কাটছে—খুব শীগগীর তাদের আবার হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে।

আমার ঘরে ফিরে এসে অনেকদিন পরে বাদামী রঙের সোফায় বসে বুকসেলফের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে পড়লো, আমি তখনো সৈনিক হইনি, এই ঘরে বসে বই

পড়তাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। বই কেনাটা আমার একটা হবি ছিলো। বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না, এই সত্যে আমি বিশ্বাসী। কতকগুলো বই আমার মনকে ভীষণ ভাবে স্পর্শ করেছিল সেই সময়, তখন কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক আমি। সব বই পড়া শেষ হয়নি, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের বইগুলো। কিছু কিছু বই আছে, যা আমি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এসে আর ফেরত দিইনি, কারণ সেই সব ভালো লাগা বইগুলো হাতছাড়া করতে চাইনি। আমার ভাগ্য যদি ভালো হয়, জীবিত অবস্থায় যদি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, আমার ইচ্ছে আছে এ ঘরে বসে আমি অপেক্ষা করবো যতদিন না বইগুলো পড়া শেষ হয়। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। ওই বইগুলো হয়তো আমার যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে পারে, আমার উপলব্ধি বোধটা আমি আবার ফিরে পেতে পারি। আমি বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—অপেক্ষা করে থাকি সেই শান্তির সময়টার জন্যে।

এক সময় মনে হয়, কেমরিকের মার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। এমন কি মিটেলস্টেয়েডেটের কাছেও যেতে হবে, সে নিশ্চয়ই এখনো ব্যারাকেই আছে। ফিরে ফিরে বুকসেলফের দিকে চোখ গিয়ে পড়ে। ওই বইগুলো যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বলছে, এসো, আমাদের কাছে এসো, তোমার সেই যৌবনের চোখ দিয়ে আমাদের দেখো, আমাদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। তাতে আমাদের সবার লাভ। আমাদের তুমি জানতে পারবে, আর সেই সঙ্গে তুমি আবার তোমার সেই হাড়ানো যৌবন ফিরে পেতে পারবে। সেলফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাই।

বোবা দৃষ্টি দিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি একটা বই-এর দিকে, যেমন করে আসামী তাকিয়ে থাকে বিচারপতির দিকে—শেষ রায় শোনার জন্যে। বইয়ের অক্ষরগুলো আজ আর বোধগম্য হয়না। সেই বই পড়ার মনটা আজ আর নেই, মরে গেছে যেন কবেই। ধীরে ধীরে বইটা আবার সেলফে রেখে দিলাম। যৌবন আমার হারিয়ে গেছে কবেই, মনে মনে ভাবি, আর নয়। এবার এখান থেকে বিদায়ের পালা।

শান্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছুটি, অবসর—এ সবের অর্থ কি? ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পরেই বোঝা যায় যে, সেটার প্রয়োজনীয়তা মানুষের কাছে কতখানি, বিশেষ করে সৈনিকদের একটা ছুটির পর পরবর্তী ছুটির দিনগুলো ফিরে আসার মাঝে এমন তো হতে পারে যে, এই ছুটির শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে একেবারে ছুটি হয়ে যেতে পারে আমার, জীবন থেকে শেষ ছুটিতে যাওয়া—যেমন কেমরিকের অবস্থা হয়েছে। তাই সেই সব কথা ভেবেই বুঝি ছুটির গুরুত্ব বেশী করে মনে পড়ছে আমার। নীরবে মা আমাকে লক্ষ্য করে থাকেন এখন—আমি জানি তিনি এখন দিন গুনছেন। তিনি আমার

জিনিষপত্র সরিয়ে রেখেছেন আড়ালে, সেগুলো দেখে আবার ফিরে যাওয়ার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। যতো দিন যায়, আমার মা'র চোখ দুটোয় যেন বেদনার ছাপটা ক্রমশ আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মাত্র চারদিন আর বাকী আছে ছুটি ফুরতে। যাওয়ার আগে কেমরিকের মার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। কেমরিকের মা আমাকে দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাসিয়ে দিলেন তার মুখ চোখের জলে। তবে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না ভাল করে। সেখানে আরো অনেক অশ্রু জমে আছে—যে কোনো মুহূর্তে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে পারে কেমরিকের জন্যে। তাঁর সব দুঃখ, সব জ্বালা তিনি ভুলতে চান এই ভাবে। ভেতরের জ্বালাটা কোনো রকমে চেপে তিনি জানতে চাইলেন, 'কিভাবে ওর মৃত্যু হলো বলো আমাকে। সত্যি কথাটাই বলো, আমি সহ্য করতে পারবো। আমি সত্যকে জানতে চাই। আমি জানি, কি নিদারুণ কষ্টেই মারা গেছে আমার বাছা। হায়, এ কি নিষ্ঠুরতা!' চেয়ারের ওপর ধপাস করে বসে পরে পুত্রহারা শোকের বিলাপ বকতে বকতে তিনি জানতে চাইলেন করুণ কণ্ঠে, 'ছেলেবেলায় তোমরা দুজনে কতোই না আবদার করতে আমার কাছে। তোমরা দুজনেই ছিলে আমার দুই ছেলের মতোন। মৃত্যুর সময় তুমি কি ওর পাশে ছিলে? কি করে মারা গেলো সে? খুবই কি কষ্ট পেয়েছে ও মরবার আগে?'

আমি তাঁকে বোঝালাম, গুলিটা ওর ঠিক হৃৎপিণ্ডে লেগেছিল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর মৃত্যু হয়, বানিয়ে বানিয়ে বলি, একটুও কষ্ট পেয়ে ওকে মরতে হয়নি। সন্দেহের চোখে তিনি তাকালেন আমার দিকে: 'তুমি মিথ্যে বলছো। আমি বেশ ভালো ভাবেই জানি, বাছা আমার খুবই কষ্ট পেয়েছে মরবার সময়ে। রাতে ওর মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার আমি শুনেছি। আমি ওর ক্রোধের কথা অনুভব করতে পারি। দয়া করে স্রেফ সত্যি কথাটাই তুমি আমাকে বলো। অনিশ্চিত ভাসা ভাসা খবর আমি সহ্য করতে পারি না। ওর সেই যন্ত্রণার কথা একবারই শুনবো, একবারই আমি কষ্ট পাবো, তা হোক, বাছা আমার মৃত্যু যন্ত্রণায় কি ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছে জানলে আমি ওর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো, ওর আত্মার সংগতি হোক, ও যেন পরের জন্মে এ রকম কষ্ট আর না পায়। প্রার্থনা করবো, আর যেন যুদ্ধ না বাধে, বাচ্চা ছেলেগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে বেঘোরে যেন প্রাণ দিতে না হয় আর।'

না, আমি ওঁকে সত্যি কথাটা কিছুতেই বলতে পারবো না। বললে হয়তো প্রথমে তিনিই আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। ওঁর জন্যে করুণা হয়, আবার ওঁকে ভীষণ বোকা বলে মনে হয় আমার। কেন উনি বিলাপ বকা বন্ধ

করছেন না? কেমরিক কি ভাবে মরলো, কষ্ট পেয়ে মরলো কি মরলো না, সেকথা জেনেই বা কি লাভ? ও তো আর ফিরে আসবে না, মৃতই রয়ে যাবে ও, এই সত্যটা কেন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না! একজন মানুষ যখন অনেক মৃত্যু দেখেছে, অনেক কেমরিককে যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছে, তখন একজন বিশেষ কেমরিকের জন্যে কেন এই উতলা হওয়া? তাই আমি শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম: 'সঙ্গে সঙ্গেই ওর মৃত্যু হয়েছিল। আদৌ ওর কোনো কষ্টই হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার সময় ওর মুখের অভিব্যক্তি ছিলো অতি শান্ত, নিরুত্তাপ, উত্তেজনাহীন।'

একটু সময়ের জন্যে নীরব থেকে তারপর ধীরে ধীরে তিনি বললেন: 'তুমি শপথ নিয়ে বলতে পারো, গুলির আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওর মৃত্যু হয়েছিল? আর একথা যদি সত্যি না হয়, তাহলে তোমার কি আর ফিরে আসার ইচ্ছে নেই?'

'বেশ, আমি বলছি, ওর যদি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হয়ে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি যেন ফিরে আর না আসি, ওর মতো আমারও যেন মৃত্যু হয়।'

এ প্রসঙ্গে যে কোনো শপথ আমি নিতে পারি, আমার মনের অবস্থা তখন এমনি। তবে মনে হলো তিনি আমার কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এবার তিনি কান্নায় ফেটে পড়লেন। তখন আমাকে মিথ্যে গল্প ফেঁদে ওঁকে বলতে হলো, কিভাবে কেমরিকের মৃত্যু হয়েছিল। আমার সেই বানানো গল্প বলার ভঙ্গিমায় এমন একটা কিছু ছিলো যে, নিজের কাছেই সেটা একান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো।

ফিরে আসছি ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উনি আমাকে চুমু খেয়ে কেমরিকের একটা ছবি আমার হাতে তুলে দিলেন। মিলিটারি ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি। ওর পেছনে অরণ্যের ছবি আঁকা একটা পর্দা, আর সামনে টেবিলের ওপর এক মগ বীয়ার।

বাড়িতে আমার ছুটির সেই শেষ সন্ধ্যা। সবাই শান্ত। তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলাম। বালিশে মুখ গুঁজে ভাবি, কে জানে পাখির পালকের মতো এমন নরম বিছানায় আর কোনোদিন শুতে পারবো কি না!

গভীর রাতে মা আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি ভেবেছিলিন, আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর আমি সেই রকম ভান করেই ছিলাম। তখন কারোর সঙ্গে কথা বলা আমার কাছে কষ্টকর বলেই মনে হচ্ছিল। তবু এক সময় মা'র কষ্ট দেখে জেগে ওঠার ভান করে চোখ মেলে তাকালাম তাঁর দিকে। বললাম আমি, 'যাও মা, ঘুমতে যাও, এখানে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'পরে ঘুমোবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবো', একটু সময়ের জন্যে নীরব থেকে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'যুদ্ধে ফিরে যেতে তুমি খুব ভীত পল?'

'না তো।'

'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, অবশ্য তোমার ভালোর জন্যেই বৎস, ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। ওরা ভালো নয়।'

'আঃ মা! তুমি কি ভাবো, আমি এখনো বাচ্চা আছি?' তাকে বোঝালাম, 'আমরা যেখানে থাকি, সেখানে কোনো মহিলার স্থান নেই।'

'যুদ্ধক্ষেত্রে সাবধানে থেকো পল।'

'আঃ মা, আবার চিন্তা করছো?' এক এক সময় ভাবি, তোমার হাতে হাত রেখে কেন আমি মরতে পারি না। আমরা বেচারা কত না অসহায়। তাঁকে আশ্বস্ত করতে বললাম, 'ঠিক আছে মা, আমি অবশ্যই সাবধান হবো।'

'প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্যে প্রার্থনা করবো পল।'

'আঃ মা, ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে পুরনো দিনে ফিরে যাওনা কেন, যখন আমি তোমার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমতাম—'

'সম্ভবত চেষ্টা করলে অন্য চাকরী তুমি পেতে পারো, যাতে জীবনের কোনো ঝুঁকি নেই, বিপদের হাতছানি নেই—'

'হ্যাঁ মা পারি, বুকহাউসে একটা চাকরী যোগাড় করে নিতে পারি—কিন্তু সেটা কি আমার উপযুক্ত হবে?' উত্তরে বললাম, 'বর্তমান চাকরীর জন্য আমি চিন্তা করি না। দেশের জন্যে যদি বা মরি, সে মরণেও শান্তি আছে, সুখ আছে। আর তুমিও আমার মা হয়ে গর্ব করতে পারবে, দেশের জন্যে শহীদ হওয়া ছেলের মা তুমি—'

চমকে উঠলেন তিনি আমার মুখ থেকে অশুভ কথাটা শুনে, অস্পষ্ট অন্ধকারে মায়ের মুখটা অসম্ভব সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। নিমেষে কে যেন তাঁর মুখের সব রক্ত বুঝি শুষে নিয়েছে। থাকতে না পেরে বলে ফেললাম, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি ভালো থেকো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বৎস, তাই থাকবো।'

আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মাকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হলো আমার। আমি চলে যাচ্ছি, তিনি যেন সহ্য করতে পারছিলেন না, ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি যেন চিরদিনের মতো আমাকে হারাতে যাচ্ছেন। চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি আমাকে বললেন, 'এই উলের দুটো আণ্ডারপ্যাণ্ট সঙ্গে নিয়ে যাও, এগুলো তোমার জন্যে কিনে রেখেছিলাম। এগুলো তোমার শরীরটা বেশ গরম রাখবে।'

'আঃ মা! এসব তুমি করেছো কি? আমি জানি, ওগুলো কিনতে কত খরচ পড়েছে তোমার। এই খরচ যোগাতে তোমাকে কিভাবে ধার করতে হয়েছে। আঃ মা, এর পরে তোমাকে আমি কি করে ছেড়ে যাই বলো? আমার ওপর একমাত্র

তোমারি দাবী আছে। কিন্তু তাই বলে সেই দাবী পূরণ করতে গিয়ে নিজেকে তুমি এভাবে কষ্ট দেবে?'

'ও কিছু নয় বাছা, তুমি নাও এগুলো, তাতে আমি শান্তি পাবো।'

সেগুলো মা'র হাত থেকে নিয়ে ধরা গলায় বললাম, 'শুভরাত্রি মা।'

'শুভরাত্রি বৎস।'

মা চলে যেতেই সব আলো যেন নিভে গেলো আমার চোখের সামনে থেকে। ঘরটা তখন ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। মায়ের দীর্ঘশ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি দেওয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দ। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আর মনে মনে ভাবলাম, আর এখানে কখনো আসবো না। এখান থেকে চলে গেলে আমি তখন অন্য মানুষ হয়ে যাই যেন। আমি তখন একজন সৈনিক, আর এখন আমার মধ্যে এক রাশ চিন্তা, দুঃখ ও জ্বালা নিজের জন্যে, আমার মা'র জন্যে।

ছুটিতে আর কখনো বাড়ি আসবো না।

□ আট □

ধু-ধু করছে মাঠ—সেখানকার ক্যাম্পটা আমার আগেই জানা ছিলো। মনে আছে এখানেই ট্যাডেনকে তার শিক্ষার পাঠ দিয়েছিল হিমেলস্টোস। কিন্তু এখন এখানকার খুব কম লোককেই আমি জানি। সব কিছুই বদলে গেছে এখানে।

যন্ত্রের মতো কাজ করে চলি। সন্ধ্যায় সাধারণত আমি যাই সোলজারস হোমে। সেখানে খবরের কাগজ পড়ে থাকে, তবে একটা লাইনও আমি পড়ি না। সেই পিয়ানোটা এখনো পড়ে রয়েছে সেখানে। পিয়ানো বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। দুটি মেয়েকে পরিচর্যায় দেখা যায়, তাদের মধ্যে একজন যুবতী।

উঁচু কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্যাম্প। আমাদের ক্যাম্পের পাশেই বিরাট রাশিয়ান বন্দী শিবির। তারের একটা বেড়া দিয়ে তাদের শিবির থেকে আমাদের ক্যাম্পটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্দীরা আমাদের কাছে আসে। তাদের নার্ভাস আর ভয়ার্ত বলে মনে হয়। কিন্তু তারা খুব উঁচুতলার বাসিন্দা। তারা আমাদের কাছে আসে আর্থিক সাহায্যের জন্যে, মিলিটারি রুটি মাখন পাওয়ার জন্যে। তারা ভদ্র, নম্র, কিন্তু তারা ভয়ংকর ভীত, স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছে এখন। এই সব বিষাদগ্রস্ত বন্দী শত্রুদের দেখলে মায়া হয়, প্রায় অনাহারে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে তারা একটু একটু করে। এরা ফেলে দেওয়া জঞ্জালের

স্তূপ থেকে খালি খাবারের টিন সংগ্রহ করে নিয়ে যায় তারের বেড়ার ওপর থেকে এই আশায় যে, যদি সামান্য কিছু খাবার অবশিষ্ট থাকে। আশ্চর্য, আমাদের এই সব শত্রুদের মুখ দেখে মনে হয়, এরা যেন এক একজন সৎ চাষী, চওড়া কপাল, টিকোল নাক, লম্বা লম্বা হাত আর পাতলা চুল। ঠিক আমাদের ফ্রিশল্যান্ডের চাষীদের মতোন। তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে গিয়ে নিদারুণ বেদনা পেতে হয়, দুঃখ পেতে হয় সামান্য একটু খাবারের জন্যে তাদের ভিক্ষে করতে দেখে। রনক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত তারা। আর এখন বন্দী শিবিরে জীবন যুদ্ধেও তারা পরাস্ত। আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট খাবার নেই। না খেতে পেয়ে তাদের দেহটা নুইয়ে পড়েছে, তাদের হাঁটু ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, রোগাটে, শীর্ণ হাত বাড়িয়ে কোনো রকমে তারা ভিক্ষে করে, সদ্য শেখা কয়েকটা জার্মান ভাষায় তারা যখন কথা বলে, মনে হয় যেন করুণ সুরে তারা দুঃখের গান গাইছে, বেদনার অশ্রু তাদের দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে তখন।

কিছু লোক আছে যারা তাদের লাথি মেরে হটিয়ে দেয়, সৌভাগ্য যে, তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বেশীর ভাগ লোক কিছুই করে না, কেবল এড়িয়ে যায় তাদের কোনো কথা না বলে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা ভিখিরীর মতো তাদের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পথ আগলায়, তখন মানুষ পাগল হয়ে যায়, আর তখনি এই সব যুদ্ধ-বন্দীদের লাথি মারতে বাধ্য হয় তারা।

সন্ধ্যায় ওরা ক্যাম্পে আসে রুটির জন্যে। ওরা ওদের যেকোনো জিনিষের বিনিময়ে এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতে চায়। উঃ, সে কি করুণ আবেদন, সর্বত্র হাহাকার—এক টুকরো রুটি দাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে। প্রায়ই তারা সফল হয়, কারণ ওদের পায়ে থাকে অতি সুন্দর নরম চামড়ার বুট জুতো, আর আমাদের বরাদ্দ জুতো সে তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। স্বভাবতই ওদের জুতোর ওপর আমাদের লোভ পড়ে যায়। ওদের এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে দু'তিনটে রুটি, কিম্বা একটা রুটি ও শুকোর সসেজ দেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এখন বেশীর ভাগ রুশীদের কাছে অবশিষ্ট বলতে কিছু নেই, তাদের পরনের জরাজীর্ণ পোশাক ছাড়া, আর সেই অবশিষ্টটুকুর বিনিময়ে রুটি সংগ্রহ করতে হলে তাদের নগ্ন হয়ে যেতে হয়। তাই এখন তাদের স্রেফ ভিক্ষে করা কিংবা আস্তাকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলো না তাদের সামনে। আমাদের চাষীরা এতোই কঠিন যে, তাদের এই করুণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কসুর করে না। আশ্চর্য, যুদ্ধে আমাদের মন এতোই ছোট হয়ে গেছে যে, আমরা এখন কেউ কারোর অভাব বুঝি না, অন্যের দুঃখে কাতর হই না।

প্রায়ই এই রুশীদের প্রহরা দিতে হয় আমাকে। ওরা তারের বেড়া ঘেঁষে

দাঁড়ায় এক টুকরো রুটির আশায়। কখনো পায়, আবার বেশীর ভাগ সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় তাদের। তখন ওদের হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। ওরা কথা বলার শক্তিও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে খেতে না পেয়ে। আমাদের থেকে অনেক বেশী অভাগা বলে মনে করে। যাইহোক, ওদের কাছে যুদ্ধ এখন শেষ, এখন ওদের বেঁচে থাকার লড়াই শুধু। আর এ লড়াইও বেশীদেন চলবে না, এই নিষ্ঠুর সত্যটা ওরা জেনে গেছে বলেই ওরা আরো বেশী ভেঙ্গে পড়েছে। ওরা জেনে গেছে, এক টুকরো রুটির বিনিময়ে ওদের দেবার কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাই ওরা এখন আর খাবারের প্রত্যাশা করে না। এখন মাঝে মাঝে শুধু সিগারেটের নেশাটা রয়ে গেছে ওদের, খিদের তাড়না মরে গেছে কবেই।

আমি ভীত, আমি সন্ত্রস্ত। আমি আর ভাবতে পারি না। তবে এও জেনে গেছি যে, এভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। এটা ধ্বংসের পথ, মানুষের, সভ্যতার, একটা গোটা সমাজের, জাতির এবং সারা বিশ্বের। এই ধ্বংসের হাত থেকে গোটা দুনিয়াকে বাঁচাতে হবে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আমরা। যদিও এই মুহূর্তে যুদ্ধের অবসানের কথা চিন্তা করা যায় না, তবুও এই চিন্তাটা আমি আমার মন থেকে একেবারে মুছেও ফেলতে পারি না, সযত্নে লালন করে রাখি যেমন করে মা তার শিশুকে লালন পালন করে রাখে। এই ধ্বংসের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে থাকে, এই আমার লক্ষ্য, এই মহৎ লক্ষ্যে পেঁছিনোর জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাকে। ট্রেঞ্চে থাকার সময়েই এই চিন্তাটা উদয় হয়েছিল আমার মনে। এই মরণ যুদ্ধের অবসানের পর আমার এই চিন্তা ভাবনার একটা বাস্তব রূপ দেয়ার কাজটা সমাধা করার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়, সবার হওয়া উচিত, শত্রু মিত্র সবার, এ কথাও আমি ভেবে রেখেছি বৈকি।

ওরা আমাদের দেশের শত্রু জেনেও আমি আমার অবশিষ্ট সিগারেটগুলো বার করে এক একটা দু'ভাগ করে রুশীদের হাতে তুলে দিলাম জীবনের অন্তিম লগ্নে পেঁছে ওদের শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ করার জন্যে। ওরা আমার প্রতি নতজানু হয়ে শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে টুকরো সিগারেট ধরায়। ধূমপানের আমেজে সবার মুখ উদ্ভাসিত এখন। আনন্দ পেলাম ওদের মুখে হাসি দেখে। মনে হলো গ্রাম্য কুটিরের ছোট্ট জানালার বাইরে ধূ-ধূ অন্ধকারের পেছনে বুঝি শান্তির ঠিকানা আমি খুঁজে পেলাম এই মুহূর্তে।

দিন গড়িয়ে চলে। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে আর একজন রুশী বন্দীকে কবর দেওয়া হলো। প্রায় প্রতিদিন ওদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটছে। কবর দেবার সময় আমাকে ওদের প্রহরায় থাকতে হয়। বন্দীরা তাদের মৃত কমরেডের উদ্দেশ্যে শেষ

শ্রদ্ধা জানায় ক্ষীণ কণ্ঠে, তাদের গানের কথাগুলো মনে হয় যেন অনেক অনেক দূরে থেকে ভেসে আসছে, অথচ আমি ওদের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে থাকি। কবর দেবার কাজটা খুব দ্রুত সারা হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় ওরা আবার আসে যথারীতি ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে। এ যেন দিনক্ষয়, পাপক্ষয়। যারা আসে, তাদের মধ্যে একজনের হয়তো অদ্যই শেষ রজনীর মতো, আগামীকাল তাকে কবর দিতে হবে, আমি ওদের প্রহরী থাকবো। আবার, আবার সেই করুণ সুরে গান, সহস্র যোজন দূর থেকে ভেসে আসার মতো শোনাবে তাদের কণ্ঠস্বর। এই ভাবেই এক এক করে একদিন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যাবে বন্দী শিবির। শেষ হয়ে যাবে একটা সভ্যতা মনুষ্যত্বের জলাঞ্জলি দিয়ে। সেই মৃত সভ্যতার কবরের কান্না শুনতে শুনতে হয়তো আর একটা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সভ্যতাই।

দীর্ঘদিন আমি ছুটি নিয়েছিলাম বলে কোনো রবিবারই আমার ছুটি ছিলো না। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে শেষ রবিবার আমার বাবা ও আমার দিদি এলেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সারাটা দিন আমরা সোলজারস হোমেই কাটালাম। এছাড়া যাওয়ার জায়গাটাই বা কোথায় আর? ক্যাম্পে থাকতে চাইলাম না আমরা। দুপুরে বাইরে ঘুরতে বেরোলাম।

সময় যেন এখন যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের কাছে, কিছুতেই কাটতে চায় না। কি প্রসঙ্গে যে আমরা কথা বলবো, আমরা নিজেরাই জানি না। তাই মায়ের অসুখের ব্যাপারেই আলোচনা শুরু করলাম। তিনি যে ক্যান্সারে ভুগছেন, এখন নিশ্চিত হওয়া গেছে। ডাক্তারের আশা এটা অপারেশন করলেই তিনি আবার ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা কখনো শুনিনি যে, ক্যান্সার ভালো হয়ে যায়।

'তাহলে উনি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'লুইসা হাসপাতালে', বললেন আমার বাবা। 'জানি না অপারেশনের খরচ কতো।'

'জিজ্ঞেস করেননি?'

'সরাসরি জিজ্ঞেস করিনি। আমি তা করতে পারি না—তাহলে সার্জেন বিরক্ত হতে পারেন, অপারেশন নাও করতে পারেন। কিন্তু তোমার মা'র অপারেশন একান্ত জরুরী।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। আমরা গরীব বলেই ডাক্তাররা আমাদের ওপর নির্দয় হতে পারেন, আমাদের কথায় বিরক্ত হতে পারেন। অথচ ধনীদের শত গালাগালিতে ও'রা বিচলিত হন না একটুও, এর একটাই কারণ, চাঁদীর জুতো খাওয়াটাও অনেক ভালো।' বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কাছে একেবারেই

কি টাকা নেই ?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, তবে ওভারটাইম করে টাকাটা আমি তুলতে পারবো বলে মনে হয়।'

আমি জানি, ও'র ওভারটাইম করা মানেই তো রাত বারোটা পর্যন্ত ঠায় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করা। রাত আটটায় সামান্য কিছু টিফিন করা। তারপর মাথার যন্ত্রণা উপশম করতে একটা ট্যাবলেট খাওয়া। যাইহোক, তাঁকে উৎফুল্ল রাখার জন্যে আমি তখন কিছু হাল্কা গল্প শোনালাম তাঁকে, জেনারেল আর সার্জেণ্ট মেজরদের নিয়ে সৈনিকদের জোক শোনালাম।

তারপর আমি ওদের রেলস্টেশন পর্যন্ত পেঁছিতে গেলাম। দিদি আমাকে একটা জ্যামের শিশি আর এক ব্যাগ আলুর কেক দিলো, মা এগুলো তৈরী করেছেন আমার জন্যে।

সন্ধ্যায় কেকের ওপর জ্যাম মাখিয়ে আমি খেলাম। কিন্তু কোনো স্বাদ পেলাম না। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে সেগুলো রুশীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে মনস্থ করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো, না জানি গরম স্টোভের সামনে কতো কষ্ট করেই না এই খাবারগুলো মা তৈরী করেছেন আমার জন্যে। তাই আমি প্যাকেটটা আমার ব্যাগে চালান করে দিয়ে কেবল মাত্র দুটো কেক নিলাম রুশীদের দেওয়ার জন্যে।

□ নয় □

বহুদিন হলো আমরা চলেছি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। আকাশে সেই প্রথম বিমানের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল। আমি তখন ব্যস্ত আমার রেজিমেণ্টের খোঁজে। কিন্তু কেউ জানে না আসলে সেটা কোথায় এখন। আমার মালপত্র আর রাইফেল সঙ্গে নিয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু। শুনেছি আমরা নাকি এখন একটা ভ্রাম্যমান ডিভিসনে আছি—যেখানে খুব জরুরী প্রয়োজন, আমাদের কাজ হলো সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া। খবরটা অবশ্যই সুখকর নয়। ওরা আরো বললো, আমাদের প্রচুর সৈনিকদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ক্যাট আর অ্যালবার্টের খোঁজ করলাম, কিন্তু কেউই তাদের খোঁজ দিতে পারলো না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট খবর পেয়ে বিকেলে আর্দালি রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

সার্জেণ্ট মেজর রুখে দিলেন সেখানে আমাকে। দু'দিনের মধ্যে এক কোম্পানী

সৈন্য ফিরে আসছে। আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা আপাতত নেই তাদের। তিনি জানতে চাইলেন, 'তোমার ছুটি কেমন কাটলো? খুব ভালো নিশ্চয়ই?'

'আংশিক ভাবে', জবাবে বললাম আমি।

'হ্যাঁ' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যুদ্ধে আবার ফিরে না আসতে হলে আরো ভালো ছিলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবনের ঝুঁকি অনেক বেশী!'

পরদিন ভোর সকালে রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত কোম্পানী সৈন্য ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। অনেকেই ফেরেনি ওদের মধ্যে। যাইহোক ওদের আসতে দেখে আমি লাফিয়ে উঠলাম। আমার চোখ দুটো খুঁজে ফেরে আমার অতি পরিচিত মুখগুলোর উদ্দেশ্যে। জলে ভেজা ঝাপসা চোখের সামনে এক এক করে ভেসে উঠলো ট্যাডেন, মুলার—তার নাকে ক্ষতচিহ্ন, সব শেষে ক্যাট ও ক্রপ। ওদের ক্লান্ত দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার খুবই অস্বস্তি লাগছিল, নিজের বিবেক দংশনে জর্জরিত হচ্ছিলাম।

ঘরে ফিরে এসে ওদের আলুর কেক ও জ্যাম খেতে দিলাম। কেক চিবোতে চিবোতে ক্যাট জিজ্ঞেস করলো, 'এগুলো কি তোমার মায়ের তৈরী?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

'ভালো', বললো সে আবার, 'স্বাদ দেখেই আমি বলে দিতে পারি।'

মা'র প্রসঙ্গ উঠতেই আমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা তখন। বেশীক্ষণ নিজেকে সংসত রাখতে পারলাম না। তবে ফিরে আবার ক্যাট ও অ্যালবার্টদের সঙ্গ পেয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের মধ্যেই তো আম্যর যা কিছু আনন্দ, আমার বাঁচার তাগিদ, আমার অস্তিত্ব, সব কিছুই।

'তুমি খুব ভাগ্যবান', ঘুমবার আগে ফিসফিসিয়ে বললো ক্রপ, 'ওরা বলছিল বলছিল আমরা নাকি রাশিয়ায় যাচ্ছি।'

'রাশিয়ায়? সেখানে খুব বেশী যুদ্ধ হচ্ছে না?' ওদিকে রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণে আমাদের ঘরের দেওয়ালগুলো কেঁপে উঠলো।

হঠাৎ সাজ সাজ রব পড়ে গেলো আমাদের মধ্যে। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের পরীক্ষা করা হলো। ছেঁড়া-পুরনো যা কিছু সব বাতিল করে স্থলাভিষিক্ত হলো নতুন জিনিষ, নতুন পোষাকে। এ সবের পেছনে জোর গুজব হলো, যুদ্ধ নয় শান্তি ফিরে আসছে। কিন্তু অন্য আর এক কাহিনী হলো—রাশিয়ার যেতে হচ্ছে আমাদের। তাহলেও রাশিয়ার নতুন জিনিষের কি প্রয়োজন আমাদের? অবশেষে আসল খবরটা প্রকাশ হয়ে গেলো—আমাদের পুনর্গঠনের জন্যে স্বয়ং কাইজার আসছেন। তাই যদি হয়, তাহলে একজন সৈনিকের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও সেটা

আরো বেশী উত্ত্যক্ত হওয়ার কারণ স্বরূপ।

সেই মুহূর্তটা এলো অবশেষে একদিন। কাইজারের আবির্ভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে আমরা মনোযোগ সহকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁকে দেখে আমরা শুধু বিস্মিতই নয়, সত্যি কথা বলতে কি ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিরক্ত; ছবি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, তিনি খুব শক্তিশালী পুরুষ, তাছাড়া তাঁর কণ্ঠস্বর হবে বজ্রগর্জনের মতো। আমাদের প্রত্যেককে একটা করে লোহার ক্রুশ চিহ্ন উপহার দিলেন তিনি। তারপর আমরা মার্চ করলাম।

পরে এ নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করি নিজেদের মধ্যে। বিস্ময় প্রকাশ করে ট্যাডেন বলে উঠলো, 'তার মানে মোদ্দা কথা হলো রাজাকে সম্মান জানাতে হবে। এমন কি হিণ্ডেনবার্গকেও। তাঁর সম্মানার্থে তাকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, এইতো ?'

'নিশ্চয়ই', বললো ক্যাট।

ট্যাডেন তার বক্তব্য শেষ করেনি তখনো। একটু ইতস্তত করে বললো সে, 'তাহলে একজন রাজা কি একজন সম্রাটের সামনে উঠে দাঁড়াবে ?

এ ব্যাপারে আমরা কেউই নিশ্চিত নই। তবে আমরা তা মনে করি না। পদমর্যাদায় ওঁরা এতো উঁচুতে, সম্ভবত কেউ কাউকে ওভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে জোর করেন না।

উধাও হয়ে যায় ট্যাডেন।

'কিন্তু আমি কি জানতে চাই জানো ?' বললো এ্যালবার্ট, 'কাইজার যদি একবার বলতেন—'না', তাহলে কি আদৌ যুদ্ধ হতো ?'

'আমি নিশ্চিত, যুদ্ধ তিনি করতেন', আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'শুরু থেকেই যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন তিনি।'

'ঠিক আছে, ধরো তিনি ছাড়া আরো বিশ তিরিশজন যদি একযোগে বলতেন, 'না যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই আমরা—তাহলে তখন কি হতো ?'

'তা সম্ভব', আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি জানি, তারা হ্যাঁ-ই বলতো, যুদ্ধের পক্ষেই তাদের মতামত জাহির করতো।'

'বড় অশুভ লাগে কেউ যখন এ ব্যাপারে চিন্তা করে', ক্রপ বলতে থাকে, আমরা এখানে এসেছি পিতৃভূমি রক্ষা করতে। আর ফরাসীরা তাদের পিতৃভূমি রক্ষা করতে ব্যস্ত। এখন কারা ঠিক ?'

'সম্ভবত উভয় পক্ষেই', কোনোরকম বিশ্বাস না করেই আমি বললাম।

পুনরাগমন হলো ট্যাডেনের। তখনো বেশ উত্তেজিত সে, এবং যুদ্ধের শুরু কি করে হলো, এই আলোচনায় যোগ দিলো সে আবার।

'সম্ভবত একটা দেশ আর এক দেশের বিরুদ্ধে ভীষণ অন্যায় আর ক্ষতিসাধন করলেই যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এমন ভাবে উত্তরটা সে দিলো, যেন অন্যদের

থেকে তার জ্ঞান বুঝিবা একটু বেশী।

ট্যাডেন কিন্তু না জানার ভান করলো। 'একটা দেশ? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেমন ধরো, জার্মানির একটা পাহাড় ফ্রান্সের একটা পাহাড়ের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিংবা একটা নদী, অরণ্য অথবা ধান কিংবা গম জাতীয় শষ্যক্ষেত্র…'

'তুমি কি সত্যি এত বোকা? আমি আদৌ ও কথা বলতে চাইনি। তাহলে একজন লোক অন্যজনকে যদি অপমান করে…'

'মানে দেশের কর্ণধার। যিনি সেই দেশের প্রধান, রাষ্ট্র—' আরো ব্যাখ্যা করে বললো মুলার।

'রাষ্ট্র, রাষ্ট্র'—তিক্তস্বরে বললো ট্যাডেন, 'সেনাবাহিনী, পুলিশ, কর, বাড়তি করের বোঝা, এই কি তোমাদের রাষ্ট্র? এই যদি হয়, কি ব্যাপারে তুমি কথা বলছো। না, আমি এ ব্যাপারে নেই, ধন্যবাদ।'

'ওটাই ঠিক', বললো ক্যাট, 'শোনো ট্যাডেন, একবার তুমি এ ব্যাপারে কিছু একটা বলেছিলে যেন। রাষ্ট্র আর পল্লী অঞ্চলের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েছে।'

'হ্যাঁ, পল্লী বা এক একটা প্রদেশ রাষ্ট্রের বাইরে নয়, উভয়কেই একসাথে চলতে হয়', জোর দেয় ক্রপ। 'রাষ্ট্র ছাড়া কোন পল্লী বা প্রদেশ একা চলতে পারে না।'

'কথাটা সত্যি, কিন্তু আবার এ কথাও ভেবে দেখো, আমরা প্রায় সবাই স্রেফ গেঁয়ো মানুষ। আর ফ্রান্সেও বেশীর ভাগ অধিবাসী শ্রমিক, কর্মচারী, কিংবা করণিক। এখন তাহলে চিন্তা করে দেখো একজন ফরসী ব্ল্যাকস্মিথ কিংবা একজন জুতো প্রস্তুতকারক কেনই বা আমাদের আক্রমন করতে যাবে? না এ শুধু শাষকদেরই খামখেয়ালীপনা—'

'তাহলে কিসের জন্যেই বা এই যুদ্ধ?' জানতে চাইলো ট্যাডেন।

'মনে হয়, কিছু লোকের কাছে এই যুদ্ধ খুবই প্রয়োজনীয়।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ক্যাট।

'ভালো কথা, আমি ওদের দলে নেই', দাঁত বার করে হাসলো ট্যাডেন।

'তুমি শুধু বেন, এখানে কেউই যুদ্ধ চায় না।'

'তাহলে কারাই বা চায়?' চাপ দেয় ট্যাডেন। 'এমন কি কাইজারের কাছেও যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর চাহিদা মতো ইতিমধ্যেই সব কিছু পেয়ে গেছেন তিনি।'

'এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত নই', মানতে চাইলো না ক্যাট। 'এখনো পর্যন্ত একটা যুদ্ধেরও মুখ দেখেননি তিনি। আর প্রতিটি প্রভাবশালী সম্রাটই অন্তত একটা যুদ্ধ অবশ্যই চাইবেন, তা না হলে বিখ্যাত হতে পারবেন না তিনি।

তোমার স্কুলের পড়ার বইতেও এর নজির দেখতে পাবে।

'আর জেনারেলদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাটাই ভাবা হায়', ডেটারিং মন্তব্য করলো, 'যুদ্ধের মাধ্যমেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে তারা।'

'এমন কি সম্রাটের থেকেও আরো বেশী বিখ্যাত হয় তারা', মন্তব্য করলো ক্যাট।

ওদিকে কেটারিংও পিছিয়ে রইলো না, বললো সে, 'আরো কিছু লোক আছে, যারা যুদ্ধের ফায়দা লুটতে চায়।

'আমার মনে হয় এটা একটা সংক্রামক রোগের মতো', বললো এ্যালবার্ট, 'আমরা কেউ যুদ্ধ চাই না, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলেই আমরা যেমন জড়িয়ে পড়ি, অন্যেরাও তাই, অর্থাৎ যুদ্ধ চায় না। কিন্তু বিশ্বের অধিক অংশই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পরে।

'মানলাম, এ সবই সত্য', তবু পুরোপুরি মেনে নিতে পারলো না ট্যাডেন, 'কিন্তু কোনো যুদ্ধই মানুষের কোনো সুরাহা করতে পারে না।'

ঘাসের ওপর শুয়েছিল এ্যালবার্ট তাদের আলোচনার কথা মন দিয়ে শুনছিল সে। এবার থাকতে না পেরে রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠে বললো সে, 'এসব বাজে কথা নিয়ে আর আলোচনা না করলেই ভালো হয়।'

'এতে কোন লাভও নেই', ক্যাট সমর্থন করলো তাকে।

পরে ব্যাপারটা আরো খারাপে দাঁড়ালো, আমরা যখন আমাদের সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম—কাইজার বাহিনীর আমাদের পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারটা।

রাশিয়ায় না গিয়ে আমরা আবার আমাদের লাইনে ফিরে গেলাম। কখনো অরণ্যের ভেতর দিয়ে আমরা চলছিলাম, আবার কখনো বা লাঙ্গল দেওয়া শষ্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে। বোমার আঘাতে অরণ্যের গাছগুলো বিদ্ধস্ত। 'কামানের গোলায় বিদ্ধস্ত গাছগুলো', আমি বললাম ক্যাটকে।

'ট্রেক মরটার', উত্তরে বললো সে, তারপর একটা গাছের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে।

সেই গাছের একটা শাখায় কয়েকজন মৃত লোককে ঝুলে থাকতে দেখা গেলো। তাদের মধ্যে একজন নগ্ন সৈনিক, তার মাথায় হেলমেটটা থাকার দরুণ তাকে সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত করা গেলো। তার দেহের কেবল অর্ধেক অংশই দৃশ্যত, দুটো পা-ই উধাও। কোথাও বা মাটিতে কারোর হাত পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

এ সবই কিছুক্ষণ আগে ঘটে থাকবে, তার কারণ তখনো রক্ত ঝরে পড়ছিল মৃত দেহগুলো থেকে—মাটির রক্ত কালচে-লাল, ভিজে ভিজে তখনো। যেদিকে দু'চোখ যায় আমাদের—কেবলি সারি সারি মৃতদেহ দেখে, অযথা সময় নষ্ট করতে চাইলাম

না আমরা। তবে পরবর্তী পোস্টে স্ট্রেচার বেয়ারারদের খবর দিলাম আমরা—আমাদের চোখে দেখা সেই সব মর্মান্তিক দৃশ্যগুলো রিপোর্ট করলাম সেখানে।

শত্রুপক্ষের আঘাতে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি আবিষ্কার করার জন্যে একটা বাহিনী পাঠাতে হবে। ছুটিতে থাকার সময় আমি আমার সহকর্মীদের জন্যে অদ্ভূত একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। তাই আমি স্বেচ্ছায় সেই বাহিনীর সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেলাম। আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে অনুসন্ধান কার্য চালানোর পরিকল্পনা করলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা কামানের গোলার গর্ত দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে বুকে ভর দিয়ে গেলাম সেখানে। সেখান থেকে চোখ পিট পিট করে তাকালাম আমি। আধুনিক মেসিন গান থেকে গোলাবর্ষণ। যে কোনো দিক থেকেই সেটা গোলাবর্ষণ করতে পারে, খুব একটা প্রচণ্ড ভাবে নয়, তবে যেকোনো লোককে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

প্যারাসুট বোমা বর্ষণ শুরু হলো সেই মাত্র। অন্ধকার থিক্‌থিক্‌ করছিল চারিদিকে, মাঝে মাঝে বোমার আগুনে ঝলসে উঠছিল জায়গাটা। তারপর আবার কালো পিচের মতো অন্ধকারে ঢেকে গেল জায়গাটা। ট্রেঞ্চে থাকাকালীন সময়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছিল, আমাদের সামনেই রয়েছে ব্ল্যাক ট্রুপস। এটা একটা খুবই খারাপ ব্যাপার, তাদের দেখা খুবই মুশকিল। আর টহল দিতেও খুবই দক্ষ তারা। আবার এক এক সময় তারা বোকাও বনে যায় অতি সহজেই। যেমন একবার এই ধরণের এক সৈনিককে ক্যাট ও ক্রপ গুলিবিদ্ধ করে ফেলে। সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেশ মৌজ করে সিগারেট টানছিল। ক্যাট ও ক্রপদের খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি, তার সিগারেটের আগুন লক্ষ্য করে বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিয়েছিল—অব্যর্থ লক্ষ্য—এক শটেই কুপোকাত সে।

বোমা বা সেরকম কিছু অস্ত্র আমার ঠিক সামনে এসে পড়লো। পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো শব্দ শুনতে পাইনি, ভীষণ আতঙ্কিত আমি তখন। আমার তখন জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো অন্ধকারে। এখন আমি এখানে একা নিঃসঙ্গ। সম্ভবত এক জোড়া চোখ আমার সামনে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। সামনেই একটা বোমা পরে রয়েছে ফাটার অপেক্ষায়, আমাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেবার জন্যে। এটাই আমার প্রথম টহলদারি নয়, কিংবা বিশেষ করে ঝুঁকির দিক থেকেও নয়। কিন্তু ছুটির পর এই প্রথম এক অজানা জায়গায়, এক অজানা পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে। আমি যেন আমার মায়ের সেই সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছি—মা বলেছিলেন, একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের সামনা সামনি যেও না। আর ঠিক এই মুহূর্তে যুদ্ধবন্দী রুশীদের তারের বেড়ার সামনে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকার সেই করুণ দৃশটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—এক টুকরো

রুটির জন্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের দাঁড়িয়ে থাকা—কখনো বা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে। এখন যেদিকে তাকাই না কেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, শব্দবিহীন রাইফেল আমার দিকে তাক করা রয়েছে। আমি আমার মাথাটা নিরাপদ জায়গায় ঘোরাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু সর্বত্রই তো বিপদ এখন ওঁৎ পেতে বসে আছে। সেই আতংকে এখন আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। এক পাও নড়তে পারছি না আমি, ভয়ে পা দুটো যেন সেঁটে গেছে মাটির সঙ্গে। ঠিক করলাম সেখানেই পড়ে থাকবো।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম আমি। তারপর অন্ধকারের চোখ দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম। আমার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছিল তখন। আবার একটা গোলা ছুটে এলো। অমি আবার মাথা নিচু করে বসে পড়লাম।

জ্ঞানহীন, কতকটা অবিবেচকের মতো বন্য যুদ্ধে আমি তখন লিপ্ত, আমি তখন সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আপ্রান চেষ্টা করে যাচ্ছি; তবু মাঝে মাঝে পিছু হটতে হচ্ছে। নিজের মনেই তখন আমি বলতে থাকি: 'তোমাকে পাবতেই হবে, তোমার কমরেডদের জন্যে, এটা কোন নির্বোধ নির্দেশ নয়।' তারপর আবার সেই প্রশ্ন: 'এতে আমার কি এসে যায়, আমার তো একটাই জীবন, না হয় সেটা হারালাম। কিন্তু বিনিময়ে তো আরো অনেকগুলো জীবন রক্ষা করে যেতে পারবো।'

আমার পর্যবেক্ষণের এই হলো ফলাফল। কিন্তু নিজেকে আমি কিছুতেই আশ্বস্ত করতে পারছিলাম না। আমার তখন শোচনীয় অবস্থা, যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারি আমি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কোনো রকমে ক্লান্ত দেহটাকে একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। আমার অর্ধেক দেহ সেই গর্তের মধ্যে, বাকীটা মাটির ওপরে। সেখান থেকেই একটা শব্দ একবার শোনার পরেই সেটা আর শুনতে পেলাম না। একটু পরেই সন্দেহজনক পদাতিক সৈন্যবাহিনীর বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দটা ভেসে এলো ঠিক আমার পেছন থেকেই। ওরা আমাদেরই লোক হবে—ট্রেঞ্চের পাশে ঘোরাফেরা করছে। একটু পরেই এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—ভালো করে কান পেতে শুনতে গিয়ে এবার নিশ্চিত হলাম—এ কণ্ঠস্বর ক্যাটেরই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা নতুন জাগরণ দেখা দিলো। এই সব পায়ের শব্দ, এই সব শান্ত কথাগুলো, আমার পেছনের ট্রেঞ্চ থেকে ভেসে আসছে—আমার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিলো দারুণ ভাবে; আমার সেই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা, মৃত্যু ভয়, যা আমাকে এতক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল, আমাকে প্রায় ধ্বংসের পথে টেনে

নিয়ে যাচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে, সে ভাবটা আমি কাটিয়ে উঠেছি, নতুন এক শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছি আমি। ওরা আমার একার জীবনের চেয়ে অনেক মূল্যবান। ওদের কণ্ঠস্বর মাতৃসুলভ ও স্নেহ-মমতার থেকে অনেক বেশী আদরণীয়, আর মৃত্যুর ঊর্ধে। সেসব কণ্ঠস্বর অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক প্রেরণাদায়ক, আরামদায়ক। আর কেনই বা আমার এই অনুভূতি? সে তো আমার কমরেডদেরই কণ্ঠস্বর।

এখন এই অন্ধকারে আর নিজেকে একা মনে হলো না। আমি তাদেরই একজন, আর আমরা আমাদের সব ভয়, মৃত্যুর ভয় সবার সঙ্গে এক করে নিতে পারি। প্রেমিকাদের থেকেও আমরা এ ওর অনেক কাছের মানুষ, অনেক আপনজন। আমি পারি তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে, এই সব কথাগুলো আমাকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে, আর এই কথাগুলোই আমার একান্ত প্রেরণা, আমার একলা চলার পথে প্রিয় সঙ্গী যেন।

ইতিমধ্যে শব্দটা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দ্রুত এক জোড়া পায়ের তলায় পিষ্ট হলো আমার দেহ। প্রথম এক জোড়া চলে গেল। তারপর আবার এক জোড়া···ওদিকে ক্রমাগত মেসিনগানের গর্জন ভেসে আসছিল দূর থেকে। সবে মাত্র আমি একটু ঘাড় ফেরাতে যাবো, ঠিক সেই সময়ে কে যেন হঠাৎ হোঁচট খেলো, আর তারপরেই একটা ভারী দেহ আছড়ে পড়লো আমার ওপর কামানের গোলার গর্তে এবং আমার উল্টোদিকে তার দেহটা এলিয়ে পড়লো—

এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে যে আমাকে পড়তে হবে, আমি আদৌ ভাবতে পারিনি। আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। তবে পরক্ষণেই পাগলের মতো ছুরি দিয়ে আঘাত হানলাম তার বুকে। বেশ বুঝতে পারলাম, হঠাৎ তার দেহটা থরথর করে একবার কেঁপে উঠলো, তারপর নিস্তেজ হয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলো। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তখন দেখি আমার হাতটা কেমন ভিজে ভিজে, আঠালো।

জল থেকে বুদ্বুদ ওঠার মতো গলগল শব্দে রক্ত বেরিয়ে এলো লোকটার মুখ থেকে। মনে হলো, লোকটার প্রতিটি শ্বাস বিকট চিৎকারের মতো শোনালো— বজ্রপতের মতো—কিন্তু সেই শব্দটা আমার বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল। মুখে মাটি গুঁজে দিয়ে আমি তার মুখ বন্ধ করতে চাইলাম। আমি তাকে ছুরি দিয়ে আবার আঘাত করলাম। আমার তখন কেবল একটাই চিন্তা, কি করে তাকে একেবারে স্তব্ধ করা যায়, আমার সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা করছে সে। অবশেষে নিজেকে সংযত করলাম, কিন্তু তখনি আমার মনে হলো, তাকে আঘাত করার জন্য আমি আর হাত তুলতে পারছি না। ছুরিটা তখনও ধরা ছিলো আমার হাতে। তখনো তার মুখের সেই গোঙানির আওয়াজটা ছিলো বটে, তবে ক্রমশ তা ক্ষীণ হয়ে আসছিল,

বেশ বুঝতে পারলাম। আর এও বুঝতে পারলাম যে, সে তখন তার জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে পেঁছেছে।

তখন আমার কেবল একটাই ইচ্ছে কি করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবো। কিন্তু মাটির উপর তখনো ক্রমাগত মেসিনগান থেকে গুলিবর্ষণ হয়ে যাচ্ছিল ভরা বর্ষার বারিধারার মতো। আমি তখন পরীক্ষা করার জন্য হেলমেটটা হাতে নিয়ে মাটির তলায় তুলে ধরলাম মেসিন গানের গুলির রেঞ্জ দেখার জন্যে, আর তখনি একটা বুলেট এসে আমার হাতে বিদ্ধ হলো। তার মানে বুলেট ছুটে আসছে মাটি ঘেঁষে। আর শত্রুপক্ষের ঘাঁটি থেকে যে আমি খুব বেশী দূরে নেই, তাও বুঝলাম। হাতটা অসম্ভব জ্বলছিল, তবু আমাদের সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের অপেক্ষায় আমাকে থাকতে হলো।

তারপরেই দেখলাম, আমার হাতের ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ধারা নেমেছে, এবং হঠাৎ অসহায় বোধ করলাম। তখন আমি সেই ক্ষতস্থানে মাটি দিয়ে ঘষতে থাকলাম হাতের চামড়ার ওপরে। এখন আমার হাতটা কর্দমাক্ত, আর রক্তও দেখা গেল না।

তবে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলো না। উভয় পক্ষ থেকেই প্রচণ্ড ভাবে গুলি বিনিময় হতে থাকলো। আমার দলের লোকেরা হয়তো আমাকে এখন তারা তাদের খরচের খাতায় ধরে নিয়ে থাকবে।

ভোর হয়ে আসছে—আকাশের রঙ এখন ধূসর ও অনেকটা পরিষ্কার। লোকটার গোঙানি তখনো থামেনি। আমি আমার কানে হাত চাপা দিলাম, তবে একটু পরেই কানের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিতেই অন্য শব্দটা আর শুনতে পেলাম না। মৃত্যু-পথযাত্রী এই লোকটার হাতে একটা অদৃশ্য ছোরা আছে, যা দিয়ে সে আমাকে বিদ্ধ করে ঃ সময়ও আমার চিন্তা। এখানে পড়ে থেকে তার মৃত্যু যন্ত্রণার কাতরোক্তি শোনা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে এখন। যাইহোক, দুপুর তিনটে নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আবার। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যে। অচিরেই সেই নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠলো আমার কাছে। এর থেকে লোকটার গোঙানির আওয়াজ অনেক ভালো ছিলো। আমার তখন পাগলের মতো অবস্থা। কিন্তু কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। মৃত লোকটাকে আরাম করে শুইয়ে দিলাম, যদিও এখন ওর মধ্যে অনুভূতি জাগবার মতো প্রাণশক্তি নেই। আমি ওর চোখ দুটো বন্ধ করে দিলাম। বাদামী চোখ, কালো চুল, কানের দু'পাশে ঈষৎ কোঁকড়ানো।

তার বৌ যে এখনো তার কথা চিন্তা করে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জানে না, তার স্বামীর জীবনে কি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। এখনো বেশ কিছু দিন সে তার স্বামীর কাছ থেকে চিঠি পাবে ডাকে—আগামীকাল, কিম্বা এক

সপ্তাহের মধ্যে। সম্ভবত এক মাস পরেও। চিঠিটা পড়বে সে, আর সেই চিঠিতে লোকটা তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে, হয়তো অন্তরঙ্গ ভাবেও।

আমার অবস্থা তখন চরমে। আমি আর ভাবতে পারছি না। আচ্ছা তার স্ত্রী কেমন দেখতে? ক্যানালের ওপারে সেই পিঙ্গলকেশী বারবণিতার মতো? সেই মেয়েটি কি এখনো আমারি আছে, নাকি অন্য কোন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে গেছে আমার অনুপস্থিতিতে। এখন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ক্যানটোরেক যদি আমার পাশে বসে থাকতো! আর আমার মা যদি আমাকে দেখতে পেতেন—! মৃত লোকটি যদি আরো দু'গজ ছুটে যেতে পারতো, তাহলে সে আরো তিরিশ বছর বেঁচে থাকতে পারতো অনায়াসে, এতক্ষণে সে হয়তো ট্রেঞ্চে বসে তার স্ত্রীকে নতুন করে আর একটা চিঠি লিখতে পারতো আজকের ডাকে পাঠানোর জন্যে।

আর ভাবতে পারলাম না, কারণ ওই মৃত লোকটার মতো দুর্ভাগ্য আমাদের জীবনেও নেমে আসতে পারে। যেমন কেমারিকও আজ বেঁচে থাকতে পারতো যদি তার পা-টা ডানদিকে ছয় ইঞ্চি দূরে থাকতো; আর হেই ওয়েস্থাসও যদি তার পিঠটা আরো তিন ইঞ্চি সামনের দিকে এগিয়ে দিতে পারতো, তাহলে সেও আজ থাকতে পারতো আমাদের মধ্যেই—

নিস্তব্ধতা যেন আমাকে গিলতে আসছিল। কথা না বলে আর থাকতে পারছিলাম না। তাই সেই মৃত লোকটির উদ্দেশ্যে আমি মুখর হয়ে উঠলাম: 'আমি তোমাকে খতম করতে চাইনি কমরেড। তুমি যদি আবার বেঁচে উঠে বিবেচকের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, তোমাকে আমি খুন করতে যাবো না। কিন্তু যখন তুমি, যে ভাবে আমাকে আক্রমণের জন্যে, আমাকে খতম করার জন্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, তখন আমি আমার মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এখন আমার ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, তুমি তো আমার মতোন। এখন আমি যেন তোমার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখ, আর আমাদের মিত্রতার বন্ধন। আমাকে ক্ষমা করো কমরেড। আমাদের এই উপলব্ধি কেন এমন দেরীতে হয়? কেন আগে বুঝলাম না যে, আমাদের সবার মায়ের মতো তোমার মা-ও তোমার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছেন, প্রতীক্ষা করছে তোমার স্ত্রীও, আমাদের উভয়েরই একই ভাবে মৃত্যুভয়, একই দুশ্চিন্তা, কখন মৃত্যুর পরোয়ানা নেমে আসে আমাদের ওপর। আমাকে ক্ষমা করো কমরেড। কি করেই বা তুমি আমার শত্রু হতে পারো? এই রাইফেল, এই ইউনিফর্ম' যদি আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তখন তুমি আমার ভাই হয়ে যেতে পারো, ঠিক ক্যাট ও অ্যালবার্টের মতো।

বৃষ্টির মতো বুলেটের ধারা বয়ে যাচ্ছিল তখনো—লক্ষ্যহীন নয়, একেবারে

অব্যর্থ। তাই এখনো এখান থেকে বেরনো সম্ভব নয়।

'আমি তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখবো', মৃত লোকটিকে বললাম, 'আমি তাকে চিঠি লিখবই। আমার কাছ থেকে অবশ্যই তার শোনা দরকার। তোমাকে আমি যা যা বলেছি, ঠিক তাই বলবো, কোনো কিছুই গোপন করবো না। 'তাতে মনে হয় না কষ্ট পাবে সে। আমি তাকে সাহায্য করব, আর তোমার অভিভাবক-দের, আর তোমার সন্তানকেও...'

তার ওপরের জামার বোতাম খোলা—ভেতরের জামা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে পকেট-বুকটা সহজেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বইটা খুলতে একটু ইতস্তত করলাম। আচ্ছা, এই বইতে কি তার নাম লেখা আছে? এখনো পর্যন্ত লোকটার নাম আমি জানতে পারিনি। হয়তো আমি তাকে ভুলেও যেতে পারি। সময়ই এই ছবিটা তাকে মনে পড়িয়ে দিতে পারে—এই জন্যেই সেটা সংগ্রহ করে রাখা দরকার আমার।

প্রথমে পকেটবুক নয়, ওয়ালেটটা আমি হাতে নিতে অসাবধানতাবশত একগুচ্ছ ফটো পড়ে গেলো মাটিতে। সেগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা ফটোর ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো—একজন মহিলা ও একটি ছোট্ট মেয়ের ছবি। মনে হয় লোকটার স্ত্রী ও কন্যার ছবি। ওয়ালেটের ভেতরে কিছু চিঠিও ছিলো, ফরাসী ভাষায় লেখা। একটু আধটু ফরাসী ভাষা আমার জানা ছিলো। সেই জ্ঞান নিয়ে এক একটা কথা অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে হতে থাকলো—আমার বুকে যেন শেল বিঁধছে—বুকে ছুরির আঘাতের মতো একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় ছটফট করে উঠলাম।

আমার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হতে থকলো। ভেবেছিলাম মৃত লোকটির স্ত্রীকে চিঠি লিখবো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা সম্ভব নয় আর। ভদ্রমহিলায় ছবিটার দিতে তাকালাম, চেহারা ও পোষাক দেখলে মনে হয় না, তারা বিত্তবান। পরে রোজগার করতে পারলে তাদের টাকা পাঠাতে হবে। এখন মনে হচ্ছে, এই মৃত লোকটা যেন আমার উপর একটা ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। এখন আমার অনেক কাজ। মনে মনে শপথ নিলাম, এই মৃত লোকটির পরিবারের জন্যে আমাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। তবে এখন কথা হচ্ছে যে, আমাকে বাঁচতে হলে এখন শত্রুপক্ষের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে হবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে এবার নোটবুকটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তারপর ধীরে ধীরে পড়লাম—জেরার্ড ডুভাল, কম্পোজিটার।

মৃত লোকটির পেন্সিল দিয়ে একটা খামের ওপর তার নাম ঠিকানা লিখে নিলাম। একজন মুদ্রাকর জেরার্ড ডুভালকে আমি খুন করেছি। আমাকে মুদ্রাকর হতেই হবে, বিভ্রান্ত হয়ে চিন্তা করলাম, একজন মুদ্রাকর হবো, একজন মুদ্রাকর—

অপরাহ্নে আমি একেবারে শান্ত হয়ে গেলাম। আমার ভয়টা অমূলক। মৃত লোটার নামটা এখন আর আমাকে কষ্ট দেয় না। আমার সেই পাগল করা ভয়টাও এখন আর নেই। 'কমরেড', শান্ত গলায় মৃত লোকটির উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'আজ তোমার মৃত্যু হয়েছে, কাল আমার হবে। তবে আমি যদি এই যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে যেতে পারি, তাহলে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবো। এই যুদ্ধ আমাদের উভয়কেই বিরাট একটা দাগা দিয়েছে—যেমন আমি তোমার জীবন নিয়েছি, আগামীকাল হয়তো তোমারই কোন সহকর্মী আমার জীবন নেবে। না, কমরেড, এটা আর চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি প্রতীজ্ঞা করছি এরকমটি আর ঘটবে না কখনো। এখন কোনো রকমে দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে যেতে পারলেই হলো। দম দেওয়া পুতুলের মতো আমি বলে চললাম, 'আমি তোমাকে যা যা প্রতিশ্রুতি দিলাম, সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো—' কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি জেনে গেছি যে আমি তা করতে পারবো না।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমি যে এখানে আছি, আমার কমরেডরা তো জানে না, তাই হয়তো তাদের হাতেই আমি খুন হতে পারি। তাই ওরা এলেই চিৎকার করে উঠতে হবে, যাতে করে ওরা আমাকে চিনতে পারে। তারা উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত ট্রেঞ্চের সামনে পড়ে থাকবো আমি।

একটু পরেই আকাশে প্রথম একটা তারা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। আমি তখন উত্তেজিত হয়ে নিজের মনে বলে উঠলাম, 'এখন আর বোকামি নয় বন্ধু, এখন সব শান্ত—তুমি বেঁচে যাবে বন্ধু।' আমি যখন আমার খৃষ্টিয়ান নামটা ব্যবহার করি, তখন মনে হয়, কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলে, এ যেন এক অদৃশ্য শক্তি বলে মনে হয় আমার কাছে।

অন্ধকার আরো ঘনিভূত হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে আমার উত্তেজনাও প্রশমিত হয়। প্রথম রকেট বর্ষণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বাইরে বেরিয়ে এসে আমি আমার লোকজনদের সন্ধান করার জন্যে কাছাকাছি ট্রেঞ্চের দিকে তাকাই। রকেটের আলোয় জায়গাটা এক এক সময় দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এক অনিশ্চিত সন্দেহের আবর্তে পড়ে আমি যখন প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছি, ঠিক তখনি আমি আমাদের সৈনিকদের হেলমেট দেখতে পেয়ে চিনতে পারলাম। তারপরেই আমি চিৎকার করে উঠলাম ওদের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পেলাম ওদের কাছ থেকে, আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম। 'বন্ধু—বন্ধু —বন্ধু—এই যে আমরা এখানে, তুমি কোথায়— ?'

আবার ওদের ডাকে সাড়া দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাট ও অ্যালবার্ট স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে এলো আমার সন্ধানে।

'তুমি কি আহত ?'

'না, না—' আমি ওদের ঘটনার কথা সব খুলে বললাম। যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে, নতুনত্ব কিছু নয়। রাশিয়ায় ক্যাটেরও এরকম হয়েছিল, শত্রু-শিবিরের খুব কাছেই আটকা পড়ে যায় সে। কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। তবে সেই মৃত মুদ্রাকরের কথা বললাম না আপাতত। কিন্তু পরদিন সকালে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, কিভাবে লোকটাকে হত্যা করলাম আমি। ওরা দুজনেই আমাকে শান্ত করতে গিয়ে বললো, 'এ ব্যাপারে তোমার আর অন্য কোন পথ ছিলো না। এছাড়া তোমার আর করারই বা কি ছিল বলো ? ওকে হত্যা না করলে তুমি কি এখন ফিরে আসতে পারতে আমাদের কাছে ?'

আমি ওদের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনতে গিয়ে স্বস্তিবোধ করলাম। ওদের উপস্থিতিতে নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে হলো আবার।

□ দশ □

এবার আমাদের একটা নতুন কাজ দেওয়া হলো। একটা গ্রামের ওপর প্রচণ্ড ভাবে বোমাবর্ষণ করেছিল শত্রুপক্ষ, সেটা এখন পরিত্যক্ত। আর সেই গ্রামটাই এখন আটজনকে পাহারা দিতে হবে। বিশেষ করে রসদ যোগানোর গুদামটার ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের, কারণ সেটা এখনো খালি হয়ে যায়নি। সেই একই গুদাম থেকে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেদেরই নিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে আমরাই ঠিক উপযুক্ত—ক্যাট, অ্যালবার্ট, মুলার, ট্যাডেন, ডেটারিং, আমাদের পুরো দলটাই রয়েছে এখানে। অবশ্য হেই এখন মৃত। তবে আমরা ভাগ্যবান, কারণ অন্য সব স্কোয়াডে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক, অনেক বেশী।

এখন আমাদের কাজ হলো কেবল অসুস্থ-আহত মানুষের নার্সিং নয়, তাদের মনের প্রসারতা ঘটানো। এই সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। যুদ্ধ অত্যন্ত বেপরোয়া, যা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে যায়, আমাদের মধ্যে ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে দীর্ঘ সময় ধরে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমার মাথায় এই ভাবটা জেগেছিল। অথচ তখনো আমি জানতাম না, যুদ্ধের এত ভয়াবহতা, সেটা না জেনেই আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, সুযোগ পেলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নেমে পড়বো। মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করবো, যুদ্ধই শান্তি নয়, শেষ প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এই যুদ্ধই ধ্বংস করে দেয় দেশ, দেশের

সভ্যতা, দেশের নিরীহ মানুষজনকে। আমার প্রশ্ন হলো সেই সব যুদ্ধবাজ লোক গুলোকে, তোমাদের ইগো, তোমাদের জিদ, তোমাদের দাপটটাই কি সব থেকে বড় হলো, দেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে তোমাদের দিলো? দেশ রক্ষার নামে পররাজ্য জয়ের অন্যায় অভিলাষ তোমাদের বন্ধ করতেই হবে। একদিন দেশের মানুষ তোমাদের অপরাধের প্রতিশোধ নেবে ঠিকই, দেখবে তখন তোমরাই হবে দেশছাড়া, কিংবা এমন এক অবস্থায় পড়বে তখন তোমরা যে, তখন তোমাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ আর থাকবে না—এই হবে আমার সেই সব যুদ্ধবাজদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী!

শুধু খাওয়া, মদ্যপান করা, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো আর ঘুমোনো ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না তখন আমাদের! আর মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের আক্রমনের মোকাবিলা করা। এই ভাবে কেটে গেলো এক পক্ষকাল। কেউ আমাদের বিরক্ত করতে এলো না। গ্রামটা বোমার আঘাতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকলো। আর এদিকে আমরা বেশ মৌজ করে কাটাতে থাকলাম। যতদিন এখানে খাবারের যোগান থাকবে ভালো, আমাদের কোনো চিন্তা নেই। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই আমাদের।

আরো আটদিন পরে হুকুম হলো আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমাদের আনন্দের দিন শেষ। দু-দুটো বিরাট বিরাট লরি এলো আমাদের নিয়ে যেতে। সঙ্গে নিলাম প্রচুর পরিমাণে হ্যাম সসেজ, টিন ভর্তি লিভার সসেজ, সিগারেটের বাক্স আমাদের হৃদয় উল্লাসিত। প্রতিটি লোকের হাতে একটা করে ব্যাগ।

ধীরে ধীরে লরিদুটো চলতে শুরু করলো। আমাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে ঝুলতে থাকে একটা কিং সাইজের সিগারেট। আমরা গান গাইলাম। পিছনে ফেলে আসা পরিত্যক্ত গ্রামে তখনো বোমা পড়ছিল মাঝেমাঝে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে, ওরা জানে না, এই গ্রামে প্রাণের চিহ্ন এখন বলতে গেলে নেই। তবু যুদ্ধের নেশা এমনি অন্ধ যে, একটা পড়ে ওঠা সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করা পর্যন্ত থামবে না ওরা।

কয়েকদিন পরে আমাদের পাঠানো হলো বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটা গ্রাম খালি করার জন্যে। যাওয়ার পথে দেখলাম, গ্রামবাসীরা যে যার মালপত্র নিয়ে চলেছে সারিবদ্ধ ভাবে অজানার উদ্দেশ্যে। তাদের দেহ নুইয়ে পড়েছে, তাদের মুখ বিষাদ-পূর্ণ। শিশুরা তাদের মায়েদের হাত ধরে চলেছে, কখনো বা ছোট ভাইবোনেরা দিদির হাত ধরে চলতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন মনে করছে না। কেউ কেউ বা তাদের মতোই ম্লান—বিষণ্ণ মুখের পুতুল বুকে চেপে ধরেছে। পুতুলের মতোই তারা সবাই নীরব, কারোর মুখে কথা নেই, নেই হাসি, কেবল চোখ ভর্তি জল—বেদনার অশ্রু, সব হারানোর দুঃখে ঝরে পড়া অশ্রু'...

আমরা দল বেঁধে মার্চ করছিলাম। যে গ্রামে এখনো কিছু অধিবাসী রয়ে গেছে, আমার ধারণা ছিল, ফরাসীরা সেখানে বোম ফেলবে না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ আকাশ পথে বোমারু বিমান উড়ে এলো কোত্থেকে যেন। একটু পরেই মাটি কাঁপিয়ে শুরু হলো বোমা বর্ষণ। অতর্কিত আক্রমণ। আমাদের স্কোয়াডের পিছন দিকে একটা বোমা এসে আছড়ে পড়লো। নিরুপায় হয়ে আমরা তখন মাটির উপর শুয়ে পড়লাম। আমার তখন ভয়ে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো। কে যেন বলে উঠলো, 'তুমি শেষ হতে চলেছ—' নাকি এ আমার অবচেতন মনের সতর্কবার্তা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বাঁ পায়ে চাবুক মারার মতো আঘাত এসে পড়লো। অ্যালবার্টের চিৎকার শুনতে পেলাম। সে আমার পাশেই ছিলো।

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো অ্যালবার্ট।' আমিও চিৎকার করে উঠলাম। আমরা তখন মাটির ওপর অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিলাম।

আমার কথায় উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো সে। আমিও তার পাশে পাশে ছুটতে থাকলাম। সামনে একটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে লুকোতে হবে। ঝোপ-ঝাড়গুলো উচ্চতায় আমাদের থেকে বড়। ক্রপ একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লো, আমি তার পা দুটো তুলে ধরলাম তাকে সাহায্য করার জন্যে। চিৎকার করে উঠলো সে তার পায়ের আঘাতজনিত যন্ত্রণায়। এক লাফে আমিও তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে সেই ঝোপঝাড়ের পিছনে একটা ডোবার মধ্যে আছড়ে পড়লাম। আমাদের মুখ কাদা মাটিতে ভরে গেলো। তবে ডোবাটা নিজেদের লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ নিরাপদ। বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডোবার জলে ডুব দিতে থাকি। প্রায় এক ডজন বার এই ভাবে জলে ডুব দিতে গিয়ে এক সময় দেহটা আমার ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এলো।

'চলো, এখান থেকে সরে পড়া যাক, তা নাহলে এই পচা ডোবায় ডুবে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়তে হবে', কঁকিয়ে ওঠার মতো করে বললো অ্যালবার্ট।

'তোমার আঘাতটা কোথায় ?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'মনে হয় আমার হাঁটুতে।'

'তুমি ছুটতে পারো ?'

'মনে হয় পারি—'

'তাহলে বেরিয়ে পড়ো।'

ডোবাটাকে পেছনে ফেলে ছুটতে শুরু করলাম। কামানের গোলা অনুসরণ করে ফেরে আমাদের। রাস্তাটা গিয়ে পড়েছিল শত্রুশিবিরের গোলা বারুদের গুদামের দিকে। ওখানে গিয়ে পড়লে আমাদের জুতোর লেসটা পর্যন্ত অটুট থাকবে না। তাই আমরা আমাদের পরিকল্পনা বদল করে কাঁপিত্র পথে ছুটতে লাগলাম।

ওদিকে অ্যালবার্ট খোঁড়াতে থাকে। করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো সে, 'তুমি এগিয়ে যাও, আমি পরে আসছি।' তারপরেই মাটিতে বসে পড়লো সে।

আমি তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঝাকুনি দিয়ে বললাম, 'ওঠো অ্যালবার্ট' তুমি একবার বসে পড়লে আর উঠতে পারবে না। তাড়াতাড়ি করো, আমি তোমাকে তুলে ধরছি।

অবশেষে আমরা একটা ছোট্ট ট্রেঞ্চে এসে পেঁছিলাম। আমি তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। গুলিটা লেগেছে তার হাঁটুর ঠিক ওপরে। তারপর আমি নিজের দিকে তাকালাম। আমার ট্রাউজার রক্তে মাখামাখি, আর আমার হাতটাও। অ্যালবার্ট তার পোশাকের কিছু অংশ ছিঁড়ে আমার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। অ্যালবার্ট তার পা আর বাড়াতে পারবে না। তাই এখন ভাবতে হচ্ছে, কি করে এখান থেকে পালাবো। না, আমাদের এখান থেকে পালাতেই হবে, এমন কি আমাদের পায়ে গুলির আঘাত লাগলেও।

ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগোতেই একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেয়ে থামতে বললাম চালককে। যান্ত্রিক শব্দ তুলে অ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের তুলে নিলো। আহত সৈনিকে ভর্তি অ্যাম্বুলেন্সটা। আর্মি মেডিক্যাল ল্যান্স কর্পোরাল আমাদের সবাইকে এ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকসন দিয়ে দিলো।

'এখন আমরা বাড়ির পথে অ্যালবার্ট,' বললাম আমি।

'সেই রকম আশা করা যাক', উত্তরে বললো সে, 'আমি তো জানি, কি আমি পেয়েছি।'

যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। ব্যাণ্ডেজটা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। একের পর গ্লাস জল খেতে শুরু করলাম আমরা।

'হাঁটুর কতো ওপরে আমার আঘাতটা? জিজ্ঞেস করলো ক্রপ।

'কম করেও চার ইঞ্চি হবে এ্যালবার্ট।' উত্তরে বললাম আমি।

'আমি ঠিক করে ফেলেছি', একটু চুপ করে থেকে বললো এ্যালবার্ট, 'ওরা যদি আমার পা কেটে বাদ দিয়ে দেয়, আমি তাহলে আমার জীবনের ইতি টেনে দেবো। খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না আমি।'

আমাদের কথা চিন্তা করতে করতে অপেক্ষা করতে থাকলাম আমরা।

সন্ধ্যায় আমরা এসে পেঁছিলাম ড্রেসিং স্টেশনে। দারুণ ভয় পেলাম। এখানে সামান্য কারনে হাত-পা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কেমরিকের দুরাবস্থার কথা মনে পড়ে গেলো। তবে যাই ঘটুক না কেন, আমাকে ক্লোরোফর্ম করতে দেবো না, এমন কি তার জন্যে কয়েকজনের যদি চোয়াল ভেঙ্গে দিতে হয়, সেও ভালো। সেই

মতো পরা আমাকে ক্লোরোফর্ম করতে এলো। দুজন আর্দালি আমার হাত দুটো চেপে ধরলো। তবু তা সত্ত্বেও তাদের হাতের বন্ধন ছিন্ন করে সার্জেনের চশমার ওপর ঘুঁষি মারতে যাবো, দেখে ফেললো সে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে দূরে সরে গেলো। 'স্কাউন্ড্রেলটাকে ক্লোরোফর্ম করো', পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো সে।

আর তখনি আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। শান্ত গলায় বললাম, 'ডক্টর, মাফ করবেন, আমি চুপ করে থাকবো, দয়া করে আমাকে ক্লোরোফর্ম করবেন না।'

'ঠিক আছে এখন আমাকে আমার কাজ করতে দাও', দ্রুত কথাগুলো বলে সে আবার তার যন্ত্রপাতি হাতে তুলে নিলো। লোকটা ভাল, তিরিশের বেশী বয়স হবে না। সুপুরুষ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। চশমার কাঁচের আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকলো সে। আপাতদৃষ্টিতে আমার সহ্য-শক্তি দেখে খুব খুশি হলো সে। এখন অতি যত্ন সহকারে সে আমার পা-টা সেট করে প্লাস্টার লাগিয়ে বললো, 'আগামীকাল তুমি বাড়ি যেতে পারো।' ক্রপের কাছে ফিরে এসে বললাম, 'কাল সকালে হসপিটাল ট্রেন আসছে।'

সার্জেন্ট-মেজরকে দুটো সিগার দিতেই শুঁকে দেখলো সে। তারপর বললো, 'আর আছে?'

ক্রপের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার ওই কমরেডের কাছে ভালো স্টক আছে। কাল সকালে আমরা যখন হসপিটাল ট্রেনে চেপে বসবো, জানালা গলিয়ে কয়েকটা সিগার আপনাকে দিতে পারি।' আমাদের কথার অর্থ বুঝতে পারলো সে—আমরা চাইছিলাম, সে নিজে উদ্যোগি হয়ে আমাদের ট্রেনে তুলে দিক। তারপর খুশী হয়ে আমরাও তার নেশার খোরাক যোগাতে পারি। 'ধরে নাও, তোমাদের হসপিটাল ট্রেনে যাওয়া পাকা হয়ে গেছে।'

রাতে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমতে পারলাম না আমরা। সাতজন কমরেড মারা গেছে আমাদের ওয়ার্ডে। তাদের মৃত্যু আমাদের ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল।

আমাদের স্ট্রেচার প্ল্যাটফর্মে রাখা ছিলো। ট্রেনের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বৃষ্টি পড়ছিল, ষ্টেশনে কোনো ছাদ বা আচ্ছাদন ছিলো না। আমাদের কম্বলগুলো পাতলা। ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টা হলো আমাদের অপেক্ষা করা হয়ে গেছে।

স্নেহপ্রবণ মায়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল সার্জেন্ট-মেজর। যদিও আমার খুব খারাপ লাগছিল, তবু আমাদের মতলবের কথাটা মন থেকে ছেঁটে ফেলতে পারছিলাম না। আমি তাকে আগাম একটা সিগার উপহার দিলাম। বিনিময়ে সার্জেন্ট-মেজর আমাদের বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে একটা

ওয়াটারপ্রুফ শীটে ঢেকে দিলো আমাদের। সন্ধ্যায় আমরা লর্ডের মতো খাতির যত্ন পেলাম তার কাছ থেকে, যদিও এর জন্য প্রতি ঘণ্টায় একটা করে সিগারেট খরচ করতে হলো আমাদের। একটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো আমাদের মন্টা—ক্যাট আমাদের সঙ্গে নেই। ট্রেনটা যদি একদিন দেরীতে ছাড়ে, তাহলে ক্যাট আমাদের ঠিক খুঁজে বের করতে পারবে।

সকালে ট্রেন যখন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো, আমাদের স্ট্রেচারগুলো তখন জলে ভিজে একাকার। সার্জেণ্ট-মেজর আমাদের দুজনকে একই কামরায় তোলার ব্যবস্থা করলো। রেডক্রস নার্সদের ভীড় থিকথিক করছিলো। ক্রপের বিছানার ব্যবস্থা হলো আমার ঠিক নিচে। বিছানার দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হলাম 'হায় ঈশ্বর!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'কি ব্যাপার?' সিস্টার জিজ্ঞেস করলো।

চকিতে আর একবার বিছানার দিকে তাকালাম আমি। তুষার-শুভ্র লিলেনে ঢাকা বিছানা। আর আমার শার্টটা ছয় সপ্তাহ হলো লণ্ড্রীতে দেওয়া হয়নি। ময়লা পোশাকে এমন সুন্দর বিছানায় শুতে সংকোচ লাগছিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সিস্টার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নিজের থেকে বিছানায় শুতে পারবে না?'

'কেন পারবো না?' আমি তখন ঘেমে নেয়ে উঠেছি। একটু ইতস্তত করে বললাম 'তবে তার আগে বেডকভারটা সরিয়ে নাও।'

'কেন, কিসের জন্যে?'

'আমাকে শুকরছানার মতো দেখাচ্ছে—দেখছো না সারা গায়ে কাদামাটি? এতে অমন সুন্দর বিছানার চাদরটা নোংরা হয়ে যাবে—' তখনো আমি ইতস্ততঃ করতে থাকি।

'একটু নোংরা বটে', সে আমাকে যথেষ্ট উদারতা দেখালো। 'তাতে কিছু এসে যায় না, আমরা ওটা আবার কেচে দেবো।

মেয়েটির দিকে আমি তাকালাম—যুবতী এবং বেশ চনমনে। মেয়েটি নাছোর-বান্দা। সে আমাকে বাধ্য করলো অমন সুন্দর নরম বিছানায় শুতে। আমি জানি কার বদান্যতায় আমার এই সুখ শয্যার আয়োজন? তাই এখন আমি আর কোন পরোয়া না করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। তারপর বেডকভারটা টেনে গায়ে ঢেকে দিলাম। একটু পরেই বেডকভারের ওপর কে যেন হাত বুলিয়ে দিলো। সার্জেণ্ট-মেজর। সে তার পাওনা সিগার বুঝে নিয়ে তবে বিদায় হলো। এক ঘণ্টা পরে লক্ষ্য করলাম, আমরা এগিয়ে চলেছি।

পর পর দুটো দিন ঘুমিয়ে কাটালাম। তৃতীয় রাত্রে আমরা বারবেস্তালে পৌঁছলাম। সিস্টারের মুখে শুনলাম, অ্যালবার্টের জ্বর বাড়ার জন্যে তাকে

পরবর্তী ষ্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হবে। 'ট্রেন এখন কোথায় চলেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম সিস্টারকে।

'কোলনের পথে।'

'অ্যালবার্ট', তুমি কোন চিন্তা করো না, দেখো আমরা দুজন ঠিক একই সঙ্গে থাকবো। কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

সিস্টারের পরবর্তী রাউণ্ডে শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার, তার ওপর মাথার যন্ত্রণা, নিজেই নিজের কপাল টিপে ধরলাম। আমার মুখ ফুলে উঠতে দেখা গেলো, একটু পরেই সারা মুখ লাল হয়ে উঠলো। আমার সেই অস্থিরতা দেখে আমার বেডের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলো সিস্টার, 'তোমার কি যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ', আমার কণ্ঠস্বর গোঙানির মতো শোনালো, 'দেখো না, হঠাৎ কি রকম—'

আমার হাতে একটা থার্মোমিটার দিয়ে চলে গেলো সে। আমার মাথায় তখন একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেলো। অ্যালবার্টকে আমি কথা দিয়েছি, আমি ওর কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অথচ পরবর্তী ষ্টেশনে ওকে নামিয়ে দেওয়া হবে, কারণ ওর শরীরের তাপ বেড়েছে, ওর জ্বর হয়েছে। কিন্তু আমার দেহের তাপ স্বাভাবিক। অতএব যে ভাবেই হোক, কৃত্রিম উপায়ে গায়ে জ্বর আমার আনতেই হবে। থার্মোমিটারটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাপমাত্রা একশো পয়েণ্ট দু ডিগ্রীতে তুললাম। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তখন আমি দেশলাই জ্বেলে সাবধানে থার্মোমিটারের পারদের কাছে জ্বলন্ত কাঠিটা রেখে একশো এক পয়েণ্ট ছয় ডিগ্রীতে তুললাম।

সিস্টার ফিরে আসতেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'আমি, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—'

তখনি সে খস্ খস্ করে একটা কাগজে কি যেন লিখলো। সে যে কি লিখতে পারে আমি জানি। অ্যালবার্ট আর আমাকে পরবর্তী ষ্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হলো এক সময়।

ক্যাথলিক হাসপাতালের একই ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের সুনাম আছে—ভালো চিকিৎসা ও ভালো খাবারের জন্যে। আমাদের ট্রেনের রোগীতেই হাসপাতাল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। সার্জেনের অভাবে আজ আর আমাদের পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না। রাত যেন বড় বিরক্তিকর, কাটতে চায় না। কেউ ঘুমাতে পারলো না। ভোরের দিকে আমরা আমাদের চোখের পাতা দুটো এক করলাম কোনো রকমে। এক সময়ে করিডোরে কারোর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার, অন্যেরাও জেগে উঠলো

আমার সঙ্গে। হাসপাতালে বেশ কিছুদিন আছে, এমন এক রোগী এই কণ্ঠস্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে : 'এই সময় সিস্টাররা সকালে প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে থাকে। তাই তোমরা যাতে অংশ নিতে পারো, সেইজন্যে দরজা খুলে রাখা হয়।'

এটা যে একটা শুভ প্রচেষ্টা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে আমাদের মাথার যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেয়। 'এমন একটা অবাস্তব!' আমি বললাম, ঠিক যখন কেউ ঘুমতে যাচ্ছে, তখনি এই প্রার্থনা সংঙ্গীতের কোনো মানে হয় না।' অ্যালবার্টের গোঙানির আওয়াজ শোনা গেলো। আমি তখন রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'থামবে তোমরা?'

মিনিটখানেক পরে একজন সিস্টার ঘরে ঢুকতেই কেউ একজন বলে উঠলো, 'সিস্টার, দরজাটা বন্ধ করে দেবে? আমরা ঘুমাতে চাই—'

'ঘুমের চেয়ে প্রার্থনা অনেক ভালো', ভালোমানুষের মতো বললো সে, 'সাতটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে;'

আবার অ্যালবার্টের গোঙানির আওয়াজ শোনা গেলো। এবার আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'দরজা বন্ধ করে দাও। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো। তারপরেও যদি দেখি দরজা বন্ধ হয়নি, দেখিয়ে দেবো, আমি কি করতে পারি।'

'আমিও তোমার সঙ্গে আছি, 'আমার সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন বলে উঠলো।

আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণলাম। তারপর আমি একটা বোতল হাতে নিয়ে করিডোর লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। বোতলটা ভেঙ্গে হাজার টুকরো হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে প্রার্থনা সংঙ্গীতও বন্ধ হয়ে গেলো। সিস্টাররা দল বেঁধে এসে দুঃখ প্রকাশ করলো আমাদের কাছে।

'কোনো কথা নয়, 'আমরা সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

দরজা বন্ধ করে ওরা চলে যায় সেখান থেকে এক এক করে। প্রথমে ছোট খাটো চেহারার যে সিস্টারটা এসেছিল, সবার শেষে চলে যেতে গিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বললো সে, 'যতো সব নাস্তিকের দল।' ও যাই বলুক না কেন, আমরা জিতেছি, এতেই আমাদের আনন্দ।

দুপুরে হসপিটাল ইন্সপেক্টর এসে আমাদের ওপর চোটপাট করতে থাকলো। এরা ক্লার্ক বই কিছু নয়, আমাদের জানা ছিলো। তাই আমরা তাকে কথা বলতে দিলাম। যাইহোক, ওরা আমাদের কিই বা ক্ষতি করতে পারে?

কে বোতল ছুঁড়েছিল?'

আমি স্বীকার করবো কিনা যখন ভাবছি, ঠিক তখন কে যেন বলে উঠলো,

'আমি, আমি ছ‍ুঁড়েছি !' খাড়া খাড়া দাড়ি মুখে একজন লোক উঠে বসলো বিছানার ওপর। আমরা সবাই উত্তেজিত—ও কেন এভাবে ঝ‍ুঁকি নিতে গেলো ?

'তুমি ?'

'হ্যাঁ। কারণ আমার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যেতেই আমার তখন জ্ঞান ছিলো না। তখন আমি নিজেই জানতাম না, আমি কি করতে যাচ্ছি।'

কেতাবী ঢঙে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'কি নাম তোমার ?'

'জোসেফ হ্যামেচার।'

তারপরেই ইন্সপেক্টরকে চলে যেতে দেখা গেলো।

আমাদের সবার মনে কৌতূহল জাগলো। 'কেন তুমি স্বীকার করতে গেলে ? তুমি তো আদৌ ও কাজ করোনি !'

দাঁত বার করে হাসলো সে।' তাতে কিছু নয়। আমার একটা শুটিং লাইসেন্স আছে।'

আমরা সবাই তখন বুঝে গেছি—শুটিং লাইসেন্স যার আছে, যা খুশী করতে পারে সে।

'হ্যাঁ', আরো ব্যাখ্যা করে বললো সে, 'আমার মাথায় আঘাত লেগেছে বলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। ওরা আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছে—ওই ঘটনার ব্যাপারে আমি দায়ী নই। এরপর থেকে সময় আমার ভালো যাবে। কেউ আমার ওপর রাগ করবে না। আর কেউ আমার কিছু করতেও পারবে না। আগামীকাল সকালে প্রার্থনার সময় ওরা যদি আবার দরজা খোলা রাখে, আমরা আবার উচিত শিক্ষা দেবো।'

আমরা খুব খুশী। জোসেফ হ্যামেচার আমাদের মধ্যে রয়েছে। এখন আমরা যে কোনো রকমের ঝ‍ুঁকি নিতে পারি। তারপর ফ্ল্যাট ট্রলির আগমনের শব্দ ভেসে এলো। ওরা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে।

নতুন করে আমাদের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো—সেখানে আমরা আটজন রোগী। আমাদের মধ্যে কালো কোকড়ানো চুলের পিটারের অবস্থা সব থেকে খারাপ, তার আঘাতটা ভয়াবহ। একটা ফুসফুস ফেটে গেছে। আর গোড়ার দিকে ফ্রাঞ্জ ওয়াচারের আঘাত খুব একটা গুরুতর বলে মনে না হলেও তিন দিনের দিন দেখা গেলো তার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে গড়াচ্ছে, এমন কি পিটারের থেকেও। ফ্রাঞ্জ তার শক্তি আর ফিরে পেলো না। একদিন তাকে আমাদের ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। এ ব্যাপারে সব জানতো জোসেফ হ্যামেচার। সে-ই আমাদের খবর দিলো, 'ওকে আমরা আর কখনো দেখতে পাবো না। ওরা ওকে ডেডরুমে চালান করে দিয়েছে।'

'ডেড রুম মানে ?' জানতে চাইলো রুপ।

'মানে মৃত্যুর শিয়রে এসে দাঁড়ায় যারা, তাদের ওই ঘরে রেখে আসা হয়, যাতে অন্য রোগীরা তার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে না পায়। তাছাড়া সেখান থেকে মর্গটা খুব কাছেই।'

'সবাই কি তা জানে ?'

'যারা এখানে অনেকদিন আছে, তারা অবশ্যই জানে।'

অপরাহ্নে দেখা গেলো ফ্রাঞ্জ ওয়াচারের বিছানার নতুন এক রোগীকে। কয়েক দিন পরে এই নতুন রোগীটিকেও নিয়ে যাওয়া হলো। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে জোসেফ ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো, তাকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা অনেককেই আসতে আর চলে যেতে দেখলাম।

এক এক সময় রোগীর আত্মীয় স্বজনরা বিছানার পাশে এসে বসে থাকে, কাঁদে, নরম গলায় কথা বলে, অস্বস্তির মধ্যে কাটায়। একজন বয়স্কা মহিলা হাসপাতাল ছেড়ে যেতে চান না, কিন্তু সারা রাত্রি ধরে এখানে থাকতেও পারেন না। পরদিন ভোর সকালে তিনি চলে আসেন, তখন তিনি দেখেন সেখানে নতুন এক রোগী শুয়ে আছে। তখন তিনি ছোটেন মর্গে কারণ তিনি জেনে গেছেন যে, তখন তাঁর ছেলের স্থান ডেড রুম কিংবা মর্গেই হওয়া উচিত। তাঁর সঙ্গে আনা আপেলগুলো তিনি বিতরণ করে যান আমাদের মধ্যে, আমরা তো তখন তাঁর ছেলেরই মতোন।

এরপর বেচারা পিটারের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। তার টেম্পারেচার চার্ট ক্রমশ খারাপের দিকে গড়াতে থাকে। একদিন তার বিছানার সামনে একটা ফ্ল্যাট ট্রলি এসে দাঁড়ালো। তার বুক কেঁপে উঠলো সেটা দেখে। ভয় বুকে চেপে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কোথায় যেতে হবে ?'

'ব্যাণ্ডেজ করবার ওয়ার্ডে।'

তাকে সেই ট্রলিতে তোলা হলো। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিলো। কিন্তু তার ভেতরের জামাটা হুক থেকে অপসারণ করে ট্রলিতে রেখে একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেললো সিস্টার। দু'বারের যাতায়াতের কষ্টটা লাঘব করতে চেয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে ট্রলির ওপর ছটফট করতে শুরু করলো পিটার। ওরা তাকে জোর করে শান্ত করার চেষ্টা করতেই সে তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি ডাইং রুমে যেতে চাই না।' দরজার সামনে উঠে বসবার চেষ্টা করলো সে। তার কালো কোঁকড়ানো চুলের মাথাটা টলতে থাকে, তার দু'চোখ ভর্তি জল। 'আমি বাঁচতে চাই। আমি আবার ফিরে আসবো। আমি আবার ফিরে আসবো! আমি আবার ফিরে আসবো!'

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা সবাই উত্তেজিত তখন। কিন্তু আমরা কিছুই বলতে পারলাম না। অবশেষে জোসেফ বলে উঠলো; 'অনেকেই এ রকম বলে

থাকে। কেউ একবার সেখানে গেলে, কখনো আর ফিরে আসে না।'

অপারেশনের পরে দু'দিন আমার খুব বমি হলো। আমার হাড় আর বাড়বে না, এই রকমই বলেছে সার্জেনের সেক্রেটারি। নতুন রোগীদের মধ্যে দু'জন তরুণ সৈনিক ছিলো, তাদের দু'জনেরই পা ভেঙ্গে গেছে। চীফ সার্জেন তাদের পরীক্ষা করে খুবই খুশী হয়ে উঠে বললেন, 'একটা ছোটখাটো অপারেশন করলেই তোমাদের রূপ আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে, স্বাভাবিক হয়ে হাঁটতে পারবে তোমরা।'

তিনি চলে যাবার পরেই জোসেফ বলে উঠলো, 'ওঁকে দিয়ে তোমরা অপারেশন করিও না। এটা একটা চমক ওঁর। খোঁড়া পা দেখলেই উনি পাগল হয়ে যান অপারেশন করার জন্যে। আর একবার অপারেশন হলে, তোমরা তোমাদের আগের পা আর ফিরে পাবে না। দেখবে, তখন তোমাদের লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলতে হবে।

'তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত?' তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো।

'বলো, তোমরা অপারেশন করাবে না। আর তোমাদের চলতে ফিরতে তো কোনো অসুবিধে হয় না। প্লাস্টার করলেই দেখবে দু'এক মাস পরে পা ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা আমার কথা শোনো, তোমরা যদি না করো, তাহলে উনি তোমাদের পা অপারেশন করার সাহস আর পাবেন না।'

অ্যালবার্টের জখমি পায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তারা ওকে অপারেশন থিয়েটার রুমে নিয়ে গেছে তার পা-টা কেটে বাদ দেবার জন্যে। ওর ওই জখমি পা-টার সারাবার মতো অবস্থা আর নেই। উরু থেকে পা-টাই কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এখন ও আর কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। একবার ও বলেছিল, আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই কথাটা, যদি ওর পা-টা কেটে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ও ওর হাতের কাছে তার রিভলবারটা একবার পেলেই প্রথম সুযোগেই আত্মহত্যা করবে। কে জানে সেই কথাটা ওর এখনো মনে আছে কিনা।

নতুন আর একটা কনভয় এলো। আমাদের ঘরে দুটি নতুন রোগী এলো, দুজনেই অন্ধ, বোমার আঘাতে তাদের এই অন্ধত্বপ্রাপ্তি। ওদের দুজনের মধ্যে একজনের বয়স খুবই অল্প—সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়ে থাকবে হয়তো। সে একজন ভালো মিউজিসিয়ানও বটে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল সে মনের দিক থেকে। তার বিষণ্ন মুখ দেখে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, অবশ্য তার এখন ফুরিয়ে যাওয়া কিংবা হারাবার অবশিষ্ট বলতে কিছু ছিল না। এখন বাকী ছিলো তার শুধু জীবনের খোলসটা পাল্টানো।

সিস্টাররা কি ভেবে কে জানে, এই দুটি অন্ধ যুবকের কাছে ছুরি রাখতে দিতো না কখনো। কিন্তু তাদের সব সাবধানতা থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেলো হঠাৎ একদিন। একদিন এক সন্ধ্যায় কর্তব্যরত সিস্টার এই তরুণ মিউজিসিয়ানকে খাওয়াচ্ছিল যখন, হঠাৎ ডাক পড়তে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সিস্টার। সে তখন হাতড়াতে হাতড়াতে আন্দাজে একটা কাঁটাচামচ হাতে তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা অদ্ভূত কাজ করে বসলো—সে তার দেহের সর্বশক্তি দিয়ে সেই কাঁটাচামচটা নিজের বুকে বিদ্ধ করে বসলো, তাতেও ক্ষ্যান্ত হলো না সে, সে তার পায়ের জুতো খুলে সেটা হাতুড়ি হিসেবে ব্যবহার করলো। কাঁটাচামচের হাতলের ওপর ঠুকে ঠুকে সেটার প্রায় সবটাই বুকের মধ্যে বিঁধিয়ে দিলো যতটা পারলো, ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমরা তখন সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠতেই তিনজন লোক এসে তার বুক থেকে কাঁটাচামচটা টেনে বার করলো বটে, কিন্তু ততক্ষণে তার যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছিল, সারা রাত্রি ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলো সে। আমাদের কারোর চোখেই ঘুম থাকলো না সে রাতে। পরদিন সকালে তার জীবনদীপ নিভে গেলো। তার বিছানা আবার খালি হয়ে গেলো।

এভাবে কতো রোগী এলো, আর কতো রোগীই না চলে গেলো, এমন এক সময় সময় এলো, যখন ডেথ রুমও খালি হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসতে থাকলো হাসপাতালে। কেবল আমরা কয়েকজন টিম টিম করে জ্বলছিলাম। তবে এরই মধ্যে এক নতুন আলোর বর্তিকা বহন করে নিয়ে এলো আমাদের সবার প্রিয় সিস্টার লিবারটিন—আমাদের সবাইকে দারুণভাবে অবাক করে দিয়ে একদিন একটা ফ্ল্যাট ট্রলি বহন করে নিয়ে এলো—আর সেখানে একটা স্ট্রেচারের ওপর পাতলা রোগাটে শীর্ণ চেহারার কালো কোঁকড়ানো চুলের পিটারকে শুয়ে থাকতে দেখা গেলো—তার মুখে জয়ের উল্লাস—মৃত্যুকে জয় করে ডাইং রুম থেকে ফিরে এসেছে সে। সে তার কথা রেখেছে, 'দেখো, আমি আবার ফিরে আসবো…।' আমরা তো অনেক আগেই ধরে নিয়েছিলাম যে, মারা গেছে সে কবেই।

চারদিক তাকিয়ে বললো সে, 'তোমরা এখন কি বলবে?'

আর জোসেফকে স্বীকার করতেই হলো, এই প্রথম ব্যতিক্রম হতে দেখলো সে, মৃত্যুর দুয়ার থেকে পিটারের ফিরে আসার ঘটনা তার জীবনে এই প্রথম।

ধীরে ধীরে আমাদের কয়েকজনকে উঠে বসবার অনুমতি দেওয়া হলো। আর আমাকে ক্রাচ ব্যবহার করতে দেওয়া হলো হাঁটা চলা করার জন্যে। কিন্তু সেগুলো আমি ব্যবহার করতে পারলাম না এই কারণে যে, আমি আবার হাঁটছি, চলা ফেরা করছি, সেই দৃশ্যটা দেখে অ্যালবার্টের প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে গিয়ে আমার বুকটা

কেমন হাহাকার করে ওঠে। তাই আমি ওর চোখের সামনে ক্র্যাচ দুটো ব্যবহার না করে খোঁড়ার মতো লেংচাতে লেংচাতে বাইরে করিডরে চলে যাই, সেখানে গিয়ে ক্র্যাচের সাহায্যে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করি আমি।

আমি, পিটার, অ্যালবার্ট, তবু আমরা এখনো বেঁচে আছি। আবার কেমরিকের মতো হাজার হাজার লোক অসময়ে মরে গেছে—তাদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে হাসপাতালের চারপাশে কবরের অপেক্ষায়। আবার ওদের মধ্যেই কিছু লোকের দেহে এখনো প্রাণের স্পন্দন শোনা যায়, তারা সংখ্যায় নেহাত কম নয়। আর এটাই এখানে একমাত্র হাসপাতাল বলে এখানে সব দেশেরই রোগীরা রয়েছে—হাজার হাজার জার্মান, ফরাসী আর রুসী তারা। শত্রু-মিত্র কেউ বোঝবার চেষ্টা করে না, এখানে এই হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যারা শেষ লড়াই করছে, তারা আর যাইহোক, মানুষ বটে। আর সবার ওপরে মানুষ সত্য। এই হাসপাতালে তাদের অবস্থান প্রমাণ করে দেয়, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই-এর চেয়ে মানুষে মানুষে লড়াই কতো না বিপজ্জনক—এ লড়াই বন্ধ হওয়া উচিত অচিরে। এই হাসপাতালের দিকে তাকালেই যুদ্ধের বিভীষিকা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

আমি এমন কুড়ি বছরের যুবক। তবু জীবন সম্পর্কে এখনো তেমন জ্ঞান হয়নি। তবে আমি পারি মৃত্যু ভয়টাকে বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে। দেখতে পাই, কেমন নিঃশব্দে, অজান্তে, নির্বোধের মতো একজনের আজ্ঞাবাহক হিসেবে নির্বিচারে একজন অপরের ওপর আঘাত হানছে। আর এও দেখতে পাই, বিশ্বের সব দিক থেকে বুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্ক ভাঙিয়ে মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে মারাত্মক সব অস্ত্র ও বোমা আবিষ্কার করা হচ্ছে। অথচ এই সব জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক যদি শান্তির জন্যে ব্যবহার করা হতো, তাহলে আজ বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতো, মানুষের সভ্যতার এমন বিকৃত রূপ কাউকে দেখতে হতো না। আর আমার বয়সী সমস্ত যুবকদের এমন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হতো না। আমরা বংশ পরম্পরায় একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসছি যুগ যুগ ধরে। হঠাৎ আমরা যদি আমাদের পিতামহের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের এই কৃতকর্মের কৈফিয়ত দাবী করতাম, কি উত্তর দিতেন তাঁরা? যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন ওরা আমাদের কাছ থেকে কিই বা আশা করতে পারেন? বছরের পর বছর ধরে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যে ব্যাহত হয়ে চলেছে, এর কৈফিয়তই বা কে দেবে? আমাদের জীবনের জ্ঞান মৃত্যুতে সীমিত। তারপর কি ঘটবে? আর আমাদের মধ্যে থেকে কিসের ভবিষ্যতই বা সূচিত হবে—সেকি অন্ধকারের, নাকি আলোর ফেরার?

আমাদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক হলো লিওনডোস্কি। তার বয়স এখন চল্লিশ।

পেটে সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে মাস দশেক হলো এই হোটেলে শয্যাশায়ী সে। কয়েক সপ্তাহ হলো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সে এখন আরোগ্যের পথে। পোল্যাণ্ড থেকে তার স্ত্রী চিঠি লিখে তাকে জানিয়েছে, কিছু টাকা জমিয়েছে সে এখানে আসার খরচের জন্যে, তাকে দেখতে আসছে সে। যে কোনো দিন এখানে এসে পড়তে পারে সে।

বছর দুই হলো সে তার স্ত্রীকে দেখেনি। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে সে। লিওনডোস্কির মনে এখন অন্য এক চিন্তা। সে এখন ভাবছে, তার স্ত্রী এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যবে কিনা। দীর্ঘ দিন পরে কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাইরেও আরো কিছু পেতে চায় গভীর ভাবে। এ ব্যাপারে লিওনডোস্কি সবিস্তারে আলোচনা করেছে আমাদের সঙ্গে। সেনাবিভাগে এ ব্যাপারে কোনো গোপনীয়তা থাকে না। আরো বড় কথা হলো, এতে কারোর বিরোধিতা করার প্রশ্ন থাকে না। আমাদের মধ্যে যাদের বাইরে বেরুবার সৌভাগ্য হয়েছে, তারা তাকে এই শহরে বেড়াবার মতো স্পট, পার্ক আর স্কোয়ারের কথা তাকে বললো—যেখানে কেউ তাদের বিরক্ত করতেও যাবে না। এমন কি আমাদের মধ্যে একজন আবার আরো গভীরে চলে গিয়ে তাকে নির্জনে নিভৃতে দুজনে থাকার একটা ছোট্ট ঘরের উল্লেখও করলো তার কাছে।

কিন্তু তাকে এতো সব খবরাখবর দেওয়ার কিই বা মানে আছে। চলার মতো শক্তি এখনো ফিরে পায়নি সে। তাই বাইরে যাবে কি করেই বা সে। পরদিন অপরাহ্নে তার স্ত্রী এলেন—তাঁকে কেমন যেন একটু এলোমেলো ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল, পাখির মতো চোখ দুটো তাঁর অতি চঞ্চল। মুখটা তার কালো বোরখায় ঢাকা—জানি না এই অভ্যাসটা কোত্থেকে অর্জন করেছেন তিনি।

'এসেছো, ভালোই করেছো মারজা', বললো লিওনোডোস্কি, 'ওরা তোমাকে আঘাত দেবে না। তারপর আমাদের সবার সঙ্গে সে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলো।

সময়টা বেশ ভালোই ছিলো লিওনডোস্কির কাছে। ডাক্তারের ভিজিট তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আর সিস্টারদের মধ্যে মাত্র একজনই আসতে পারে। আমরা তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবোখন। সিস্টার লিবার্টিন এলে তো কথাই নেই, সে আমাদের অতি প্রিয়, আমাদের সব কাজেই তার সায় থাকে। তাই আমাদের মধ্যে একজন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলো আবহাওয়া অনুকূল কিনা, সেটা দেখার জন্যে। ফিরে এসে মাথা নেড়ে জানলো সে, 'একটা প্রাণীকেও দেখা যাচ্ছে না, এখন এই তোমার সুযোগ লিওনডোস্কি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও—'

আমরা এখানে নিজেদেরকে একই পরিবারের মানুষ বলে মনে করছি। ভদ্র-

মহিলা খুব খুশি, আর ওদিকে লিওনডোস্কি ঘামে ভেজা মুখে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা আমাদের প্রত্যেকের বেডে এসে আমাদের সসেজ উপহার দিলেন, তিনি চান তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমরাও তাঁর আনা সসেজ ভক্ষণ করি। এখন তাঁকে যথেষ্ট সুন্দরী দেখাচ্ছিল। আমরা তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করলাম। তাতে তিনি খুশি হয়ে আমাদের বালিশ চাপড়ে তিনি তাঁর খুশির আমেজটা প্রকাশ করলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে প্রতিদিন সকালে আমাকে ম্যাসাজ বিভাগে যেতে হলো পা ম্যাসাজ করানোর জন্যে। আমার হাতের চোটটা অনেক আগেই সেরে গিয়েছিল। নতুন কনভয় এসে পেঁছিলো। অ্যালবার্টের চোটটাও এখন প্রায় সারার মুখে। পায়ের কাটা অংশের ক্ষতটাও মিলিয়ে গেছে। সে এখন অল্পবিস্তর কথা বলে আমাদের সঙ্গে। সে যদি এখন আমাদের সঙ্গে না থাকতো, তাহলে মনে হয়, সে তার কথা মতো এতোদিনে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে খতম করে ফেলতো কবেই। তবে মনে হয়, সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে সে এখন।

রোগমুক্তির পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে ছুটি গেলাম আমি। আমার মা চাইলেন না, যুদ্ধে আমি আবার ফিরে যাই। তাঁর আশংকা এবার আমি যুদ্ধে ফিরে গেলে তিনি আমাকে হারাবেন চিরদিনের জন্যে। কিন্তু ডাক পেয়ে আমি আমার রেজিমেণ্টে ফিরে গেলাম। বন্ধু অ্যালবার্ট ক্রপের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু যুদ্ধের চাকরীটাই এমনি যে, সব দুঃখ কষ্ট, কিংবা ভাব প্রবণতা থেকে দূরে সবে থাকতে হয়। এখানে সেণ্টিমেণ্টের কোনো বালাই নেই।

□ এগারো □

এখন আমরা আর সময়ের হিসাব করি না। আবার যখন আমি ফিরে এলাম, তখন শীতকাল। আর আকাশ থেকে মাটিতে যখন বোমা বৃষ্টি চলছে, তখন গাছে গাছে কচি কচি সবুজ পাতা গজাতে শুরু করেছে আবার। প্রাণের সঞ্চার ঘটাচ্ছে প্রকৃতি—এটাই শুভ লক্ষণ। তবু আমাদের জীবনে কোথায় যেন একটা তফাত রয়ে গেছে বাড়ি আর যুদ্ধক্ষেত্রের জীবনের মধ্যে। যুদ্ধ মানেই যেন মৃত্যুর হাতছানি—ক্যান্সার আর যক্ষ্মা রোগের মতো। মৃত্যুর বিরাম নেই, অহরহ ঘটে চলেছে, হরেক রকমের মৃত্যু এবং এক একটা ভয়ঙ্কর মৃত্যু যেন।

প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টার সঙ্গে তাল দিয়ে প্রতিটি কামানের গোলা আর প্রতিটি মৃত্যুর ধ্বজাধারী এই যুদ্ধের প্রতি মানুষের সমর্থন ক্রমশ কমে আসছে। আর একটার পর একটা বছর দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর তার প্রভাব আমাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল ভয়ংকর ভাবে।

এ প্রসঙ্গে ডেটারিং এর পাগল করা কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেলো। সে ছিলো এমনি যে, নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতো। হয়তো এটাই ছিলো তার মস্ত বড় পাগলামি। আর তার দুর্ভাগ্য হলো, একটা বাগানে চেরি গাছ দেখেছিল সে। আমাদের ক্যাম্পের সামনেই এই চেরি গাছটা ছিলো। কোনো পাতা ছিলো না গাছটার, তবে অনেকগুলো সাদা কুঁড়ি ছিলো।

সন্ধ্যায় ডেটারিংকে আর দেখতে পাওয়া গেলো না। অবশেষে গভীর রাতে ফিরে এলো সে হাতে একগুচ্ছ চেরি ফুলের কুঁড়ি নিয়ে। আমরা তার সঙ্গে ঠাট্টা করে জানতে চাইলাম, সে কি করতে যাচ্ছে। কোনো উত্তর দিলো না সে, বিছানায় পড়ে রইলো। রাত আরো গভীর হলে তাকে শব্দ করতে শুনলাম, মনে হয় সে তার বিছানাপত্র গোছগাছ করছে। কেমন যেন সন্দেহ হতেই তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। 'খারাপ কিছু করো না ডেটারিং।'

'কেন ওসব কথা ভাবছো, আমার ঘুম আসছে না তাই—'

'তাহলে একগুচ্ছ চেরি ফুলের কুঁড়ি তুলতে গেলেই বা কেন?' আমি তাকে বোঝালাম, 'সম্ভবত খুব শীগগীর তুমি ছুটি পেয়ে যাবে। এমন কি তোমাকে একজন চাষী হিসেবে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

মাথা নাড়লো সে, কিন্তু সে তখন অনেক এগিয়ে গেছে। এই সব কৃষকরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন তাদের কেমন বোকা বোকা দেখায় যেন। তার

এখনকার মানসিক চিন্তাধারা বদল করার জন্যে আমি তার কাছ থেকে এক টুকরো রুটি চাইলাম। কোনো কথা না বলে সে আমাকে সেটা দিলো। কিন্তু সে ছিলো মহা কৃপণ, তাই তার এই দরাজ হাতের লক্ষণ দেখে আমার কেমন সন্দেহ হলো। তাই বাকী রাতটা আমি জেগে কাটিয়ে দিলাম। তেমন কিছুই ঘটলো না, সকালে সে আবার স্বাভাবিক। সে কিন্তু বুঝে গেছে আমি তার উপর নজর রাখছি। দ্বিতীয় দিন সকালে বেরিয়ে গেলো সে। অনেকেই ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডে গেছে, তাই তখন কোনো সন্দেহ জাগেনি তার এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে।'

কিন্তু রোল কল করার সময় হাজির হলো না সে। সপ্তাহ খানেক পরে খবর পেলাম, মিলিটারি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সে। জার্মানির দিকে পালাচ্ছিল সে। এটা তার বোকার মতো কাজ। সবাই জানে সে ছিলো ঘরমুখো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একশো মাইল পিছনে কি কারনে তার কোর্ট মার্শাল হয়েছিল, কে বলতে পারে? এর বেশী আমরা আর কিছু জানতে পারিনি ডেটারিং সম্পর্কে।

মুলার মৃত। কেউ হয়তো তার পেটে গুলি চালিয়ে থাকবে। আধ ঘণ্টা বেঁচে ছিলো সে, জ্ঞান ছিলো পুরোপুরি, সেই সঙ্গে ভয়ংকর যন্ত্রণা। মারা যাওয়ার আগে সে তার পকেট বুকটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে কেমরিকের দেওয়া বুটজুতোও দিয়ে যায় আমাকে সে। সেটা আমার পায়ে ভালোই ফিট করে। আমার পরে এই জুতোজোড়া পাবে ট্যাডেন, আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

কোনো রকমে মুলারকে কবর দিতে পারলেও যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, খুব বেশীদিন শান্তিতে কবরে শেষ শয্যায় শুয়ে থাকতে পারবে না। আমাদের রেজিমেণ্টের পতন ঘটছে একটার পর একটা। নতুন করে ইংরাজ ও আমেরিকান রেজিমেণ্ট আসতে শুরু করে দিয়েছে। প্রচুর গোলাবারুদ ও খাবার সামগ্রী আসছে, আর আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান। সে তুলনায় জার্মানির শক্তি অনেক কম এখন।

'খুব শীগগীর জার্মানি শূন্যতায় ভরে উঠতে বাধ্য', বললো ক্যাট।

একদিন এই যুদ্ধের অবসান হবে, এ আশা আমরা এখন ত্যাগ করেছি। একজন সৈনিক বুলেট রুখে দিতে পারে, এবং নিহত হতে পারে; আর যদি আহত হয়, তাহলে তার পরবর্তী স্থান হবে হাসপাতাল। সেখানে তারা যদি তার পা কেটে বাদ না দেয়, আগে কিংবা পরে ওয়ার সার্ভিস ক্রসের সার্জেনের হাতে ধরা পড়ে যাবে। 'কি বললে, একটা পা তোমার কম? তাই যদি হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার দরকার নেই তোমার। লোকটা এ-ওয়ান। বাতিল!'

ভসগেস থেকে ফ্লাণ্ডার্স পর্যন্ত চালু এই কাহিনীর কথা শোনালো ক্যাট।

কাঠের পা লাগানো একজন সৈনিক স্টাফ সার্জেনের সামনে হাজির হলে সেই একই কথা সে বলবে, 'এ-ওয়ান—' আর তারপর ক্যাট তার গলা চড়িয়ে বলে, 'সৈনিকটি তাকে বলে : 'আমার কাঠের পা, কিন্তু সেই অবস্থায় আমি যদি তাদের কাছে আবার হাজির হই, তখন তারা আমার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে। তখন আমি কাঠের মাথা লাগিয়ে স্টাফ সার্জেন হয়ে যেতে পারি, এরকম কাহিনীও শোনা যায়।' এই উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুলকিত ও রোমাঞ্চিত করে তোলে।

এরকম আরো অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলো খুবই তিক্ত। সে যাইহোক, বিদ্রোহ করার কিছু নেই। তারা নেহাতই সৎ। কিন্তু এই সেনা বিভাগেই জালিয়াতি, অবিচার ও ভিত্তিহীন অভিযোগের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটার পর একটা রেজিমেন্ট প্রায় সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, দুর্বল সেনাদের ওপর সবল সেনাবাহিনীর আক্রমন যে বর্বরোচিত হবে, সেটা তো জানা কথাই, অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রে এটাই এখন চল হয়ে গেছে।

কামানের গোলা, গ্যাস নিঃসৃত মেঘপুঞ্জ, এবং যুদ্ধের ট্যাঙ্ক বহনকারী জাহাজ, এ সবই চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয়।

আমাশয় রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড—আগুনে লাল করা লোহার রডের ছ্যাঁকা লাগানো, শ্বাসরোধ করে দেওয়া—এ সবেরই কেবল একটাই নাম—মৃত্যু।

ট্রেঞ্চ, হাসপাতাল, সাধারণ কবর—ছাড়া আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই।

মাসের পর মাস অতিক্রম করে যায়। ১৯১৮ সালের রক্তাক্ত গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত ভয়ংকর। এখানকার প্রতিটি মানুষ জানে, যুদ্ধে আমরা হারছি। শেষ বিরাট ধাক্কা খাওয়ার পর আমরা ফিরে আর আক্রমন করতে পারবো না, কারণ আমাদের লোকবল নেই, মনোবল হারিয়ে ফেলেছি, আর অস্ত্রশস্ত্রও নেই।

তবু যুদ্ধ জয়ের প্রচারের কমতি নেই। ওদিকে মৃত্যুর হারও কম নয়। এই কি জীবন? হায় জীবন। আমরা বাঁচতে চাই, আমরা মরতে চাই না—১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মতো এমন রুক্ষ, নিস্তেজ, প্রাণহীন বলে এর আগে কখনো মনে হয়নি। মনে হয়নি কখনো এমন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে কোনো গ্রীষ্মকাল। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম এলো আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত ভাবে—এই গ্রীষ্মে কোনো আশার বার্তা বহন করে আনতে পারলো না আমাদের জন্যে। এই গ্রীষ্ম হচ্ছে অস্থিরতা, বিরক্তিকর, মৃত্যুর আতঙ্ক, এবং অনুভূতিহীন প্রশ্নে ভরা। কেন? কেন তারা যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে? আর কেনই বা যুদ্ধ শেষের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে?

কেন আমাদের এই পরাজয়? এই প্রথম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখি, একটা

জার্মান বিমানের পেছনে ধাবমান কম করেও অন্তত পাঁচটি ইংলিশ ও আমেরিকান বিমান। একজন ক্ষুধার্ত জার্মান সৈনিকের বরাদ্দ খাবারের পেছনে লাইন পড়ে থাকে কম করেও পাঁচজনের। আমরা মার খাইনি। সৈনিক হিসেবে আমরা দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আমাদের পরাজয় আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মিথ্যে প্রচারের জন্যে। তাদের শক্তি সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করার প্রবনতাই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ।

এরপর আছে প্রকৃতির বিরূপতা—খরা, অতি বৃষ্টি কিংবা শীতের অতিরিক্ত প্রকোপ। যেমন ধরা যাক বৃষ্টিতে ভেজা আমাদের পোষাক কিংবা জুতো শুকতে হলে গায়ে চাপিয়ে সেগুলো শুকতে হবে। কারণ বাড়তি পোষাক বলতে আমাদের কিছু ছিলো না।

আমাদের হাতগুলো যদি মাটি হয়, তাহলে আমাদের দেহটা হবে কাদা-মাটি আর চোখ ভর্তি অশ্রুবৃষ্টি। আমরা জানি না, আমরা এখনো বেঁচে আছি কিনা। এই অভিশপ্ত খাবার আনতে গিয়ে গোলার আঘাতে ক্যাট পড়ে গেলো মাটিতে। আমরা দুজনে তখন প্রদীপের শেষ সলতের মতো। মনে হয়, তার পাটা গুড়িয়ে গেছে, পায়ের হাড়ে আঘাত। বেপরোয়া হয়ে চিৎকার করে উঠলো ক্যাট, 'অবশেষে—একেবারে সব শেষে—'

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। 'কে জানে এই অচল অবস্থা আর কতদিন চলবে? তবে তুমি এখন নিরাপদে আছো, খুব যা হোক বেঁচে গেছো।' ক্যাটের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। স্ট্রেচার-বেয়ারাদের খোঁজ করলাম। কিন্তু এ তল্লাটে তাদের ঠিকানা জানা নেই আমাদের।

ক্যাটের চেহারাটা খুব একটা ভারি নয়। তাই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ড্রেসিং স্টেশনের দিকে চললাম আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালালাম। ওদিকে ক্যাটের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল। আবার এই বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার তাগিদও ছিলো। জায়গাটা বিপজ্জনক বলে কোথাও আশ্রয় নিতেও পারছিলাম না আমরা। গোলাবর্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা ছোট ট্রেঞ্চে আমরা অপেক্ষা করলাম। জলের বোতল থেকে চা ঢেলে ক্যাটকে খাওয়ালাম। তারপর দুজনে সিগারেট ধরালাম। 'ভালো কথা ক্যাট', বিমর্ষ গলায় আমি বললাম, 'অবশেষে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি।' নীরবে আমার দিকে তাকালো সে।

'তবু ক্যাট, যে ভাবেই হোক, শান্তির সময় আমার আগে তুমি যদি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারো, অবশ্যই আমরা আবার পরস্পর দেখা করবো।'

'তোমার কি মনে হয় এই খোঁড়া পা নিয়ে আবার আমি এ-ওয়ান হিসেবে চিহ্নিত হবো?' দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো ক্যাট।

'তা যদি হয়, তাহলে তোমার পক্ষে সেটা হবে মঙ্গল। তুমি তখন সম্পূর্ণ ভাবে

বিশ্রাম নিতে পারবে। ফলে তাড়াতাড়ি তোমার জখমি পা-টা ভালো হয়ে যাবে। পরে সম্ভবত আমরা দুজনে কিছু একটা করতে পারবো।'

ক্যাটের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আর দেখা হচ্ছে না, একথা আমি যেন ভাবতেও পারছি না। এই কয়েক বছর যে ক্যাটের সঙ্গে দিবা রাত্র এক সঙ্গে কাটিয়ে এসেছি, সে আমার সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে ছেড়ে কি থাকা যায়? যাইহোক, তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও ক্যাট। আর তোমাকেও আমার ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'

হঠাৎ ক্যাটের মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসতেই তার মুখটা ফ্যাকাশে হলদে হয়ে গেলো। 'চলো, আর এখানে এক মুহূর্তও নয়', ক্যাট তোতলায়, 'চ-চ-লো যাওয়া যাক এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠে ক্যাটকে আবার আমার কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে শুরু করে দিলাম। এক রকম ছুটে ড্রেসিং স্টেশনে এসে ক্যাটকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ক্যাটের শান্ত মুখটা দেখে খুশিতে হেসে উঠলাম—যাক, এ যাত্রায় ও তাহলে বেঁচে গেলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ড্রেসিং ষ্টেশনে ডাক্তার নার্স আর আর্দালিদের ফিসফিস গলার আওয়াজ শুনে সেই প্রথম আমার মনে একটা সন্দেহ জাগলো।

ওদিকে ক্যাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে আর্দালি বলে উঠলো, 'পাথরের মতো ওর কঠিন দেহে প্রাণ নেই।

আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম, 'ক্যাটের আঘাত তো তার পায়ে, আর এই মুহূর্তে আমি অন্য কিছু আর ভাবতে পারছি না। আমার তো মনে হচ্ছে, সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে, একটু পরেই সে আবার গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠবে। দশ মিনিট আগেও আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি!

নরম গলায় বললো আর্দালি, 'তোমার থেকে আমি ভালো জানি। বলছি ও মারা গেছে। এর ওপর যে কোনো মূল্যের বাজি আমি ধরতে পারি।'

ক্যাটের হাত দুটো এখনো বেশ গরম। 'দ্যাখো তুমি—' আর্দালি আগের মতো তেমনি দাঁত বার করে হাসলো।

ধীরে ধীরে আমি উঠে দাঁড়ালাম তখন।

'তুমি কি ওর পে বুক আর জিনিষপত্র নিয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করলো ল্যান্স-কর্পোরাল।

আমি মাথা নাড়তেই সেগুলো আমার হাতে তুলে দিলো সে।

'তুমি নিশ্চয়ই ওর আত্মীয় নও?' জানতে চাইলো আর্দালি।

'না', আমি মাথা নাড়লাম।

আমি কি এখন হাঁটতে পারি? আমি কি এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছি? আমার

দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে চারিদিকে বৃত্তাকারে। আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে সব কিছুই স্বাভাবিক এখন। কেবল মিলিটিয়াম্যান স্ট্যানিস্লস কাজিনস্কি মৃত। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

□ বারো □

এখন হেমন্ত। পুরনো বন্ধুরা কেউ আর বেঁচে নেই এখন। আমাদের সাত জনের মধ্যে কেবল আমিই এখনো রয়ে গেছি। সবাই এখন শান্তির কথা বলছে। সবাই এখন অপেক্ষারত। আবার যদি সেটা অলৌকিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সবাই এক সঙ্গে ফেটে পড়বে। প্রত্যেকেই অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর এ অবস্থায় যদি শান্তি চুক্তি বানচাল হয়ে যায়, তাহলে বিদ্রোহ অনিবার্য।

আমার এখন চোদ্দ দিনের বিশ্রাম। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে সারাটা দিন আমি বসে থাকি বাগানে। খুব শীগগীরই যুদ্ধবিরতি ঘটতে যাচ্ছে। এখন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাবো। এখানে আমার ভাবনা হোঁচট খেলো হঠাৎ।

১৯১৬ সালে যদি আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে এখনকার মতো এতোটা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে হতো না আমাদের। এখন তো আমাদের সব আশা ভরসা ফুরিয়ে গেছে। আমরা একেবারে নিঃস্ব এখন। এখন আমরা আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ খুঁজে পাবো না।

লোকেরা আমাদের বুঝতে পারবে না। আমাদের আগের প্রজন্মের লোকেরা বেশ সুখে আছে, এবং থাকবেও যে যার পুরনো পেশা, ঘর সংসার নিয়ে। আর যুদ্ধের কথা ভুলে যাবে তারা একদিন। কিন্তু আমরা? যারা এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলাম, কি করে ভুলবো সেই সব ধ্বংসলীলার কথা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সুবিধাবাদীর দল আবার হয়তো মাথা তুলে দাঁড়াবে—কিন্তু বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও অবশেষে দেখা যাবে, আমরা নিঃশেষ হয়ে গেছি একেবারে, মুখ থুবড়ে পড়েছি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

তবে সম্ভবত আমার এই এতো কিছু দুশ্চিন্তা, বাস্তবে এসব কিছুই থাকবে না। হ্যাঁ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সত্যি তাই যেন হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা যেন আমরা ভুলে যেতে পারি, আবার যেন আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। আর তারপরেই কেমন যেন মনে হলো, হাজার হাজার মুখ আমার সামনে ভেসে উঠলো,

এরা সবাই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, এদের স্বপ্ন আছে, এদের আকাঙ্ক্ষা আছে, এদের জন্য নারীর দৈববাণী আছে। বোমার আঘাতে এসব কখনই উধাও হয়ে যেতে পারে না রণস্থল থেকে।

এখানে গাছগুলো এখনো সতেজ সোনালী রঙ মেখে নতুন সাজে সেজেছে যেন। এখানে সর্বত্র গুজব—যুদ্ধবিরতি ঘটতে যাচ্ছে, শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে।

একটা অজানা, অনাস্বাদিত খুশির মেজাজে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি এখন একেবারে শান্ত। আমার মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা কিংবা ভাবাবেগ নেই। আমি এখন সামনের মাস ও বছরগুলোর প্রতিক্ষায়। আমার মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই, কারণ আগামী বছরগুলো আমার কাছে যেন কিছুই নিতে পারবে না, আমার দেবার আর কিছু নেই। তাই কোনো কিছু হারাবার ভয়ে ভীতও নই আমি। আমি এখন একেবারে একা, নিঃসঙ্গ, আমার আর কোনো আশা নেই। তাই সামনের বছরগুলো আমার কাছে যে ভাবেই আসুক না কেন, আমি তাদের মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র ভয় পাবো না। গত কয়েকটা দুঃসহ বছরে আমার যে জীবনটা কেটেছে আশা নিরাশায় ও উদ্বিগ্ন ভাবে, যে চোখে আমি দেখেছি আমাদের সর্বনাশ, সেই জীবন, সেই চোখ এখনো আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। সেই সব ভয়ংকর দুঃখ যন্ত্রণায় আমি বিদ্ধস্ত কিনা, জানি না। কিন্তু যতদিন আমার প্রাণশক্তি আছে, যতদিন আমার ইচ্ছাশক্তি আছে, আমি জানি সামনের বছরগুলোতে যে ঝড়ই আসুক না কেন, আমার সেই প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি সেই সব বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পথ ঠিক খুঁজে বার করবেই।

১৯১৮ সালের অক্টোবরে তার জীবন-দীপ নিভে যায় যে দিনটিতে একটা ধীর স্থির শান্ত ভাব নেমে আসে যুদ্ধক্ষেত্রে। সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষ এক কথায় তাদের রিপোর্টটা এই ভাবে শেষ করেছে : 'পশ্চিম রণাঙ্গণে সব শান্তি…'

মাটির ওপর তার চিরশান্ত মৃতদেহটা পড়েছিল, যেন সে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে আছে, এমনি এক প্রশান্তি ছড়িয়েছিল তার চোখে মুখে। এখন তার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখলে, তার মনে হবে, এই মৃত্যুতে কোনো যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়নি তাকে। তার মুখের অভিব্যক্তি এমনি শান্ত যে, সে যেন নিজের থেকেই চাইছিল তার জীবন অবসান হোক, একটা খুশির ভাব নিয়ে চলে যেতে চায় সে এই পৃথিবী থেকে।

দ্বিতীয় পর্ব

দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক

□ এক □

সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে কবরখানার স্মৃতিফলক বিক্রেতা হাইনরিথ ক্রল এ্যাণ্ড সন্স এর অফিস ঘর। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাস। ব্যবসা এখন ভালোই চলছে। কিন্তু অনেক কিছু হারাতেও হয়েছে আমাকে, তবে তাতে আমাদের করবার কিছুই ছিলো না। মৃত্যুকে পাশ কাটানো যায় না, আবার মানুষের দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গীটিও বড় অদ্ভূত। যেমন কেউ মামুলী বেলে পাথর, কেউ বা দামী মার্বেল পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ দেয়। আবার যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনার পরিমানটা বিরাট, সেখানে বহু মূল্যেবান পালিশ করা কালো সুইডিশ গ্রানাইট স্মৃতিস্তম্ভ খচিত হয় কবরে। শোকের উপকরণ বিক্রীর মরশুম শরৎ ও বসন্তকালে, অন্য ঋতুর তুলনায় মানুষ মরে বেশী এই সময়। শরৎকালে প্রকৃতির প্রাণরস একেবারে নিঃশোষিত হয়ে যায়, আর বসন্তকালে সেই প্রাণরস অতিরিক্ততার দরুণ দুর্বল শরীরকে শুষে নেয়, যেমন মাত্রাতিরিক্ত মোটা পলকের আগুন শুষে নেয় মোমবাতিকে জানি না এটা কতোটা যুক্তি গ্রাহ্য কিংবা সত্য, তবে আমাদের সেরা এজেন্ট সরকারী কবরখানার করবখনক লাইবেরম্যানের ধারনা এই রকমই। তার এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় দীর্ঘ আশী বছর বয়সে প্রায় দশ হাজার মানুষকে কবর দেওয়া থেকে। চাকরীর টাকায় আর কবরের স্মৃতিফলক বিক্রী বাবদ কমিশনের টাকায় নদীর ধারে একটা বাড়ি তৈরী করেছে লাইবেরম্যান, ট্রাউর মাছের হ্যাচারীও আছে তার আর ব্রাণ্ডি রসিক লাইবেরম্যানের জীবন সুখের হলেও একটা ব্যাপারে সে কিন্তু বেশ অসুখী সেটা হলো দাহনচুল্লী, যেখানে শহরের মৃতদেহ পোড়ানো হয়। লাইবেরম্যানের সঙ্গে আমরাও একমত এই কারনে যে, ভস্মাধার বিক্রী করে আর যাই হোক, মুনাফা বাড়ে না।

আজ শনিবার। বারোটা বাজতে মিনিট কয়েক দেরী তখনো দোকান বন্ধ করবার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি এই অফিসের একধারে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, নকশাবাবু আর হিসাব রক্ষক গত একবছর ধরে এই সব পেশায় নিযুক্ত আছি, কিন্তু এর কোনোটাই আমার পেশা নয়।

ড্রয়ার থেকে একটা সিগার বার করলাম, সিগারটা বেশ ভালোই। হাতের কাছে একটা দেশলাই নেই। ঘরের এক কোনে ছোট্ট একটা চুল্লী জ্বলছিল। দশ মার্কের একটা নোট পাকিয়ে তা দিয়ে চুল্লী থেকে আগুন নিয়ে সিগারটা ধরালাম। এপ্রিলের শেষেও ঘরের চুল্লী জ্বেলে রেখেছে দোকানের মালিক জর্জ ক্রল। তাঁর বিশ্বাস অফিসঘর ভালো মতো গরম থাকলে খদ্দের বেশী করে আসবে। উত্তাপ সব কিছুকেই গলায়, এমন কি টাকার থলিকেও।

দশ মার্কের নোটের আধপোড়া অংশটা চুল্লীর আগুনে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে উল্টোদিকের বাড়ির জানালা খোলার শব্দটা ভেসে এলো। সেদিকে না তাকিয়েই আমি বুঝে গেছি, ওটা কার কাণ্ড হতে পারে। সরাসরি সেদিকে না তাকিয়ে আড় চোখে তাকালাম হাত আয়নাটার দিকে, ওটা টেবিলের ওপর এমন ভাবে রাখা ছিল যাতে করে উল্টোদিকের বাড়িটার পুরো প্রতিবিম্ব পড়ে। আমার অনুমানই ঠিক। হ্যাঁ, ঘোড়ার কসাই ওয়াট জেকের বৌ লিসা তখন জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে। দুটো বাড়ির মাঝের গলিটা সংকীর্ণ, ফলে দুটো বাড়ির বাসিন্দারা এ ওর বাড়ির সব কিছুই দেখতে পায়। সহসা লিসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ইশারায় আমার আয়নাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করলো ও। লিসার শ্যেনদৃষ্টি কোনো কিছু থেকেই দৃষ্টি এড়ায় না। ওর কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি, তাতে ভীষণ রাগ হলো আমার। তাই নিজেকে আড়াল করলাম অন্যদিকে সরে গিয়ে। একটু পরেই আবার সেই জানালার সামনে এলাম, দেখলাম লিসা তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, আমাকে দেখেই দাঁত বার করে হাসতে শুরু করলো ও। না দেখার ভান করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে একটা চুমোরও ইঙ্গিত করলাম। টোপটা সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেললো লিসা। জানালা গলে নিচে ঝুঁকে পড়ে রাস্তার দিকে তাকালো ও। কিন্তু কেউ ছিলো না সেখানে। এবার আমি দাঁত বার করে হাসলাম। লিসা তখন রেগে আগুন, দ্রুত সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলো।

কেন যে আমি এরকম রসিকতা করি আমি নিজেই তা জানি না। লিসার নগ্ন শরীরটা ভয়ঙ্কর রকমের উগ্র, যে কোনো পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। জানি এর ওই নগ্ন দেহের সৌন্দর্য দেখবার জন্য এমন কিছু লোক আছে, যারা কয়েক লাক মার্ক খরচ করতে কিন্দুমাত্র কার্পন্য করবে না। আমারও যে ভালো না, তা বলবো না। কিন্তু ওই শ্লথ বাড়ী মেয়েটার দুপুর পর্যন্ত বিছানায় অলস ভাবে কাটাবো, আর ওই ভাবে ওর নগ্ন শরীরটা দেখিয়ে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এ সব কথা মনে পড়লেই আমার মাথায় কেমন রক্ত উঠে যায়। লিসা কিন্তু ধুরন্দর মেয়ে। ও ওর ওই দেহটুকুই শুধু দেখায়, তারপর নিজের কাজে ডুবে যায়। ওর নগ্ন দেহ দেখার প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে কিরকম হলো, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর ওর নেই। ও তখন নিজের তৈরী খাবার গব গব করে গিলতে ব্যস্ত। ওদিকে ওর স্বামী ঘোড়ার কসাই ওয়াট জেক বেচারা গাড়িটানা বুড়ো ঘোড়াগুলোকে একটার পর একটা জবাই করে চলেছে কসাইখানায়।

কিছুক্ষণ পরে জানালার সামনে এসে আবার দাঁড়াতে দেখা গেলো লিসাকে নকল গোঁফ লাগিয়ে। এর অর্থ পাশের বাড়ির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মেজর

বৃদ্ধ নোপফের ওপর ওর দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু তার ঘরের জানালা তো অন্য দিকে তাহলে?

এই সময় সেণ্ট মেরী গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠলো। গির্জাটা ছিলো আমাদের গলির একেবারে শেষ প্রান্তে। হঠাৎ আমাদের অফিসঘরের অপর জানলাটার দিকে নজর পড়তেই দেখলাম, আমার মালিকের টাক মাথাটা চট করে সরে গেলো সেখান থেকে। তাতে রেগে গেলো লিসা, রাগমাগ করে জানালাটা বন্ধ করে দিলো শব্দ করে। সেণ্ট এ্যাণ্টনির লোভাতুর হাতছানি আর একবার এড়িয়ে গেলো সে।

জর্জ ক্রলের মাথা জোড়া টাক হলে কি হবে কি, তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। টাকটা এতই চকচকে যে পাঁচ বছর আগে আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চে থাকতাম, তখন তাকে লোহার টুপি পড়ে থাকতে হতো। শুধু কাজের সময় নয়, অন্য সময়েও তাকে সেই টুপি পড়ে থাকার হুকুম ছিলো কর্তৃপক্ষের এই কারণে যে, অতি নিরীহ শত্রুও তার টুপিবিহীন টাক মাথা দেখে গুলি করবার লোভ সামলাতে পারবে না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমি খবর দিলাম, 'কোম্পানি সদর দপ্তর, ক্রল এণ্ড সন্স? দেখুন, কর্মচারী শত্রুর ওপর নজর রাখছে। ওয়াট জেক এলাকায় সেনাদের সন্দেহ জনক ভাবে আনাগোনা করতে দেখা যাচ্ছে।'

'আরে, তা কেন হবে? লিসা তো সকালের ব্যায়াম করতে ব্যস্ত', উত্তরে জর্জ ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার জন্য বললো, 'ল্যান্স কর্পোরাল বোদমার, অন্য দিকে মাথা না ঘামিয়ে তুমি বরং নিজের চরকায় তেল দাও তো হে। ওসব দৃশ্য তোমার চোখকে যদি পীড়া দেয়, তাহলে ঘোড়াদের মতো সকাল থেকে চোখে ঠুলি লাগিয়ে নাও না কেন? তাহলে তোমার এইটুকু সতীত্বও হানি হবে না। জীবনের তিনটি সেরা জিনিষ কি, তার খবর কি রাখো তুমি?'

'জীবন পরিক্রমা তো এখনো শেষ হয়নি, এখানে আমার অন্বেষণ চলছে। তাই এখনি ওসব জানবো কি করে বলো?'

'বেশ, তাহলে জেনে রাখো'—বললো ক্রল, মমতা, সরলতা আর যৌবন, এগুলো তুমি যদি একবার হারিয়েছ, আর ফিরে পাবে না কখনো। আর বয়স, অভিজ্ঞতা ও অসফল জ্ঞানের মতো মূল্যহীন অপদার্থ বস্তু আর কিছু পৃথিবীতে আছে বলে তো মনে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। 'কেন থাকবে না? আছে অসুস্থতা, আরে আছে একাকিত্বের নিঃসঙ্গতা।'

'আরে এ আর নতুন কি? আসলে এগুলোই তো বয়স, অভিজ্ঞতাও অসফল জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র।'

সিগারেট টানছিলাম, জর্জ আমার ঠোঁট থেকে সেটা টেনে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর গম্ভীর গলা বললো, 'মনে হচ্ছে ধাতু কারখানা থেকে পাওয়া এটা

ঘুষের মাল।' পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য সিগারেট হোল্ডার বের করে আধপোড়া সিগারেটটা তাতে লাগিয়ে সুখটান দিতে থাকলো সে। আমি তাকে বললাম: 'দেখো, তুমি যে একরকম গা জোয়ারি করে আমার মুখের সিগারেটটা টেনে নিলে, তার জন্য আমি কিছু মনে করিনি। তবে এর থেকে আমার ধারানা হয়েছে, এটা বেহারার মতো গায়ের জোর ফলানো। তাছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধ থেকে নন কমিশণ্ড অফিসাররা তো এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছে। সে যাইহোক, সিগার হোল্ডার ব্যবহার করছো কেন? আমি তো আর সিফিলিস রোগী নই।'

'আমিও সমকামী নই', সংক্ষিপ্ত উত্তর ক্রলের। তারপর সে আরো বললো, 'সাড়ে বার বছর হলো যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের সময় চরম দুঃখের দিনেও আমরা মানুষ ছিলাম। কিন্তু আজ আমরা অতি মুনাফার লোভে নির্লজ্জের মতো মানুষের গলা কাটছি। এই নিষ্ঠুর সত্যটা গোপন করবার জন্য সব ব্যাপারের ওপর পালিশ লাগিয়ে চলেছি কেমন। যাইহোক, সিগার আর আছে নাকি? না বলো না, কারণ আমি ভালো করেই জানি, ধাতু কারখানার লোকের একটা মাত্র সিগার ঘুষ দেয় না, দেয় কি?'

ড্রয়ার থেকে আর একটা সিগার বার করে জর্জের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললাম, 'সবই তো জানো দেখছি। দেখছি বয়স হলে আর জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়লে মানুষের অনেক উপকার হয়।'

দেঁতো হাসি মুখে ফুটিয়ে জর্জ বললো, 'আর কিছু হলো নাকি?'

'না, একটাও খদ্দের নেই। তবে আমার মাইনে বাড়াতে হবে।'

'আবার? গতকালই তো মাইনে পেলে?'

'না, গতকাল নয়, আজেই সকালে নটার সময় পেয়েছি। মাত্র দশ হাজার মার্ক। আজ সকাল নটা পর্যন্ত দাম কিছুটা ছিলো বটে, তবে একটু আগে ডলারের নতুন দাম টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, তাতে ওই দশ হাজার মার্কে নেকটাই কেনা যাবে না, বড় জোর সস্তা দামের এক বোতল মদ পাওয়া যেতে পারে। অথচ আমার একটা টাই না কিনলেই যে নয়।'

'কেন, ডলারের দাম কতো হয়েছে এখন?' জিজ্ঞেস করলো জর্জ।

'আজ সকালে ছিলো তেত্রিশ হাজার। সেটা বেড়ে এখন বেলা বারোটায় ছত্রিশ হাজার মার্কে দাঁড়িয়েছে।'

'ছত্রিশ হাজার? চমকে উঠে জর্জ বললো, 'জানি না এই ইঁদুর দৌড় কবে শেষ হবে। মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে যে হারে বাড়ছে, রাইখ্স ব্যাংক নোট ছাপিয়ে উঠতে পারছে না।'

'এই হারে যদি বাড়তে থাকে, তাহলেই হয়েছে—'

'হায় ঈশ্বর, দীর্ঘশ্বাস ফেললো জর্জ, '১৯২২ সালের কথা মনে পড়লে মনে হয়

তখন আমরা কি সুখেই না ছিলাম। তখন ডলারের দাম দুশো পঞ্চাশ থেকে বেড়ে মাত্র দশ হাজার মার্কে উঠেছিল। আর ১৯২১ সালের কথা তো ভাবাই যায় না— তখন মাত্র সাড়ে সাতশোয়ে উঠেছিল, মনে আছে তোমার?'

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। হাত-আয়নাটা জানালায় রেখে চুল আঁচড়াচ্ছে লিসা, তার পরণে টিয়াপাখির ছাপ দেওয়া একটা ফ্রক। ওর প্রতি জর্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'দেখো, ওকে একবার দেখো! ও বীজও বোনে না, ফসলও ঘরে তোলে না। তবু কি করে যে এর দিন চলে কে জানে। গতকালও ওই ফ্রকটা ওর ছিল না। বেশ দামী সিল্কের ফ্রক বলেই তো মনে হচ্ছে। অথচ আমাকে একটা টাই কেনবার জন্য তোমার কাছে হাত পাততে হচ্ছে।'

জর্জ হাসলো। 'যুগের সঙ্গে তুমি ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারছো না, তাই তোমার এই দুর্ভোগ। অথচ লিসাকে দেখো, ও কেমন কালোবাজারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিব্বি খোশ মেজাজে আছে। তোমাকে বলে রাখি, কবরখানার পাথর বেচে তুমি কোনদিনই পয়সা করতে পারবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো, তোমার বন্ধু উইলির মতো হেরিবু মাছ কিংবা শেয়ার বাজারে দালালির কাজ নাও, তাতে আখের আছে, বুঝলে?'

'ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি একজন দার্শনিক, ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, দালালদের মতো ছ্যাঁচড়ামো আমি করতে পারবো না। তাই আমি আমার ব্যবসা নিয়েই পড়ে থাকতে চাই। ওসব কথা থাক, এখন বলো, তুমি আমার মাইনে বাড়াবার কি করলে? দার্শনিকরাও মানুষ, তাদেরও সখ-আহ্লাদ বলে কথা আছে, বুঝলে?'

'কেন, টাইটা তোমার না কিনলেই কি নয়?'

'কাল রবিবার, কাল আমার টাইটার খুব দরকার।'

একটা মোটা ব্যাগ থেকে দুটো নোটের তাড়া বার করে আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলার মতো করে বলল, 'জর্জ', এতে হবে?'

'একশো মার্কের সব নোট, ওতে হবে না। এ টাকা তো লোকে আজকাল গির্জার ভিখিরীকে দান করে থাকে। না, আরো একটা বাণ্ডিল ছাড়ো।'

টাকাটা দিতে গিয়ে গোমড়া মুখ করে একবার তাকালো সেটার দিকে, তারপর তৃতীয় বাণ্ডিলটা আমার হাতে তুলে দিলো জর্জ।

'ঈশ্বরের করুণা অশেষ যে কাল রবিবার। সপ্তাহে এই একটা দিন মার্কের দাম কমে না। মনে হয় রবিবারটা সৃষ্টি করবার সময় এটা তিনি ভেবে দেখেননি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক করে বলো তো আমাদের ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?' আমি জানতে চাইলাম। আমরা কি সত্যি সত্যি দেউলিয়া হয়ে গেছি, নাকি সব ঠিক ঠিক চলছে?'

সিগারে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো জর্জ, 'জার্মানীতে কেউ যে নিজের সম্পর্কে এরকম ধারণা পোষণ করে, আমার তা মনেই হয় না। টাকা পয়সা যাদের জমানো ছিলো, তাদের যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন কারখানার বা অফিসের খেটে খাওয়া শ্রমিক কর্মচারীরা বুঝতেও পারছে না, তাদের অবস্থাটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এখানকার সুখী মানুষরা হলো বিদেশী মুদ্রা, শেয়ার বা সম্পত্তি কেনা-বেচা করছে তারা। এর থেকে তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে তো ?'

'সম্পত্তি ?' বাইরে বাগানের দিকে তাকালাম। ওই বাগানটাই আমাদের গুদামঘর। এখন ওখানে দামী মার্বেল পাথর খুব বেশী পড়ে নেই। আছে কিছু বেলে পাথর আর ঢালাই সিমেন্টের জিনিষ। সম্পত্তি বলতে আমাদের বেশি কিছু তো নেই আর। আর যা আছে, সেসব তোমার ভাইপো লোকসান দিয়ে বিক্রী দিচ্ছে। আমি বলি কি, এখন বিক্রী-বাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

আমার কথার জবাব দেবার প্রয়োজন বলে মনে করল না জর্জ। তবে ঠিক এই সময় বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বাজার আওয়াজ ভেসে এলো। একটু পরেই বেশ মেজাজের সঙ্গে পুরনো সিঁড়ি ভেঙ্গে ভারি ভারি পা ফেলে উঠে আসার শব্দ ভেসে আসছে। যে আসছে এখন তাকে নিয়েই বাড়িতে যতো সব ঝামেলা—হাইনরিখ এল, জুনিয়ার। এই ব্যবসার সে একজন অন্যতম মালিক।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা হাইনরিখের, খোঁচা খোঁচা গোঁফ। ধুলো ভরা প্যাণ্ট। আমাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো সে। হাইনরিখের ধারনা, আমরা কেবল আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই। আর ও কিনা কাক-ভোর সকাল থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাজের ধান্ধায় গ্রামে গঞ্জে, যেখানে আমাদের এজেণ্ট আছে, কারখানা আছে, সেখানে যায় সে, খোঁজ-খবর নেয়, বিক্রি-বাটা কেমন চলছে সেখানে। তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ওকে দারুণ আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে, তাই সকাল সন্ধ্যায় নিয়ম করে ও আজকাল বিয়ার খায়। ও জানে গ্রামের চাষা-ভুষোরা ধূর্ত রোগাটে চেহারার লোকদের তুলনায় মোটাসোটা লোকেরাই কাজের, তাই সে বেশি পছন্দ করে তাদের। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্টেইন কেয়ার কোম্পানীর কালো শার্ট কোট পরে না হাইনরিখ তথা হেলিম্যান। বরং ক্রোংজ কোম্পানীর এজেণ্টদের নীল স্যুটই পড়ে থাকে সে। তার ওপর ডোরাকটা প্যাণ্টের সঙ্গে গাঢ় রঙের কোটে বেশ ঘরোয়া লোক বলেই মনে হয় ওকে। বিশেষ করে প্যাণ্টে ক্লিপ গোঁজে বলে গ্রামের মানুষরা ওকে নিজেদের খুব কাছের লোক বলেই মনে করে, খোলা মন নিয়ে ব্যবসার কথা বলে ওকে।

টুপিটা মাথা থেকে সরিয়ে কপালের ঘাম মুছলো হাইনরিখ। বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, আর তার কপালেও ঘামের লেশমাত্র ছিলো না, তবু লোক দেখানো কপালের ঘাম মোছার অর্থ হলো, ও দেখাতে চায়, আহা কত পরিশ্রম করেই না এলো ও বাইরে

থেকে। 'স্মারক ক্রুশটা বেচে এলাম।' বিনীত ভাবে বললেও ওর গলার আওয়াজটা সিংহের গর্জনের মতো শোনালো।

'কোনটা? আমি জানতে চাইলাম, 'ছোটো মার্বেল পাথরেরটা?'

'না, বড়টা', ধীর স্থির শান্ত গলায় উত্তর দিলো হাইনরিখ।

'কি বললে?' চমকে উঠলাম, 'তার মানে জোড়া থাম আর ব্রোঞ্জের মালা জড়ানো সেই সুইডিশ গ্রানাইড পাথরটা?'

'হ্যাঁ, সেটাই তো। কেন, তুমি কি অন্য কিছু ভেবেছিলে?'

হাইনরিখ ভেবেছে, আমি বুঝি বোকার মতো প্রশ্ন করেছি, আমার বোকামীতে ও বেশ আনন্দ পেয়েছে বলে মনে হলো। 'কি করবো বলো, ওটা ছাড়া অন্য আর কিছু ছিলো না আমাদের। অসুবিধেটা সেখানেই, ওটাই ছিলো আমাদের শেষ অবলম্বন, তাই না?'

'না কি দামে বিক্রি করলে শুনি?' এবার জানতে চাইলো জর্জ ক্রল।

বুক ফুলিয়ে বললো হাইনরিখ, 'সাড়ে সাত লাখে। খোদাই আর প্যাকিং-এর খরচ বাদে।'

'হায় ঈশ্বর।' একটা চাপা আর্তনাদ আমার আর জর্জের মুখ থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

বুনো শুওরের মতো গোঁ ধরে আমাদের দিকে তাকালো হাইনরিখ। 'জানো, এর জন্য কি ভয়ংকর লড়াই করে আমাকে জিততে হয়েছে?'

'তা হেরে গেলেই বোধহয় ভালো ছিলো, থাকতে না পেরে আমি বললাম।

'কি বললে?' চিৎকার করে হাইনরিখ তার বিরক্তি প্রকাশ করলো।

'ও বলতে চাইছে, ওটা তুমি বিক্রী না করলেই বোধহয় মঙ্গল হতো,' জর্জ তাকে বোঝায়।

'তোমাদের কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটার পরেও, এমন কি ভালো ব্যবসা করেও তোমাদের কাছ থেকে প্রশংসার বদলে যদি দুর্নামই আমার প্রাপ্য হয়, তাহলে এরপর থেকে তোমরাই না হয় গ্রামে গঞ্জে গিয়ে চেষ্টা করেই দেখো না কেন…'

'হাইনরিখ।' জর্জ তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'তোমার কঠিন পরিশ্রমের কথা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা যা, তাতে কোনো কিছু বিক্রী মানেই মোটা টাকায় লোকসান। দেখছো না, যুদ্ধের পর থেকে জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ওদিকে টাকার দাম ঠিক উল্টো, ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে। বিশেষ করে এবছরের ডলারের দাম কোথায় পৌঁছেছে দেখেছো? তাই তো বলছি, টাকার অঙ্কই—'

'আমি বোকা নই, তোমরা কি মনে করো, আমি এব্যাপারে কিছুই জানি না?'

'এ প্রশ্নের কোনে অর্থ হয় না। কেবল বোকারাই এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকে। আর বোকারাই শুধু প্রতিবাদ করে থাকে। প্রতি রবিবার পাগলদের আশ্রয়স্থলে গিয়ে এই উপলব্ধিটা আমার হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নোটবই দেখিয়ে হাইনরিখ বলে উঠলো, 'দেখো, এতে লেখা রয়েছে, আমরা এটা পঞ্চাশ হাজারে কিনেছিলাম। আর এখন সেটা সাড়ে সাত লাখে বিক্রী করে তোমরা মনে করছে লাভ সামান্যই হয়েছে?'

বেশ বুঝতে পারলাম যে, ও কথা বলে ও আমাকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে চাইছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে কয়েক মাস আমি চাকরী করে ছিলাম। শেষে একরকম বাধ্য হয়ে পলিয়ে আসি সেখান থেকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ওকে একটু খোঁচা দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না। 'আরো বেশি লাভের মুখ আমরা দেখতে পেতাম যদি তুমি ওই ক্রশটার বদলে ওই অপয়া, ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে ওঠা লম্বা চতুষ্কোন স্তম্ভ অবিলিস্কটা বিক্রী করতে পারতে। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে তোমার বাবা ওটা কতো টাকায় কিনেছিল জানো? মাত্র পঞ্চাশ মার্কে!'

'অবিলিস্ক? তা এর সঙ্গে অবিলিস্কর কি সম্বন্ধ?' প্রতিবাদ করে উঠলো হাইনরিখ, 'ওটা যে বিক্রীর জন্য নয়, একটা শিশুও জানে কথাটা।'

'হ্যাঁ, এই কারণেই তো বলছি, ওটা বিক্রী হলে কারোরই দুঃখ হতো না। কিন্তু তাই বলে ক্রশটা বিক্রী করে এলে! আর একটা কিনতে গিয়ে আমাদের অনেক খরচ হবে, আমার সন্দেহ সেইরকমই। কাল রাইজেলফেল্ড আসবে, তখন দেখা যাবে নতুন ফরমাস দিতে হবে।'

'এখবরটা আগে জানাওনি কেন? প্রতিবাদ করে উঠলো হাইনরিখ। 'ঠিক আছে, যা কথা বলার আমি বলবো রাইজেনফিল্ডের সঙ্গে। আমি দেখতে চাই দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আমার আর জর্জের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো। ঠিক করলাম, এ কাজটা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। প্রয়োজন হলে হাইনরিখকে সকাল থেকেই মদের নেশায় বুঁদ করে দিতে হবে, কিংবা ওর প্রিয় বীয়ারের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে দিতে হবে। হাইনরিখের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, সে এখনো সেই সত্য যুগের মততার মধ্যে পড়ে আছে। অথচ রাইজেনফিল্ডের কাছে সততার কোনো দাম নেই, ঘন ঘন সততার মানে বদলায় সে।'

'আরে দাম তো রোজই যখন বদলাচ্ছে, দাম জিজ্ঞেস করার কি দরকার বলো?' প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করলো জর্জ।

'তাই বুঝি? তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে দামটা সুবিধাজনক হয়নি।'

'সেটা বোঝা যাবে পরে। এখন বলো, টাকাটা সঙ্গে এনেছো, নাকি...' জিজ্ঞেস

করলো জজ'।

অবাক চোখে জজে'র দিকে তাকালো হাইনরিখ। 'সঙ্গে এনেছি কিনা জিজ্ঞেস করছেন? কি মূর্খে'র মতো কথা বলছো? জিনিষ হাতে না পেয়ে কেউ টাকা দেয়? অসম্ভব, না, তা হয় না।'

'কেন, অসম্ভব কেন হবে?' সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রতিবাদ করে উঠলাম। 'আজকাল এমনি হচ্ছে, এটাকে বলা হয় আগাম দাম দেওয়া।'

'আগাম দাম দেওয়া?' বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল হাইনরিখের মুখে, 'তুমি তো এক সময় স্কুল মাষ্টার ছিলে, তা তুমি কি বুঝবে হে এ ব্যবসার? আমাদের ব্যবসায় অগ্রিম চাওয়া যায় না। কবরের মাটি তখনো শুকোয়নি, তখন কি করে আগাম টাকা চাইবো? তাছাড়া আমি মনে করি, জিনিষ হাতে তুলে না দিয়ে দাম আগাম পাওয়া যায় না।'

'অবশ্যই চাওয়া যায়। ওরা তখন দুর্ব'ল থাকে, আর সেই দুর্ব'লতার সুযোগ নিয়ে তখন ওদের কাছ থেকে টাকা বার করে নেওয়া খুবই সহজ।'

'ওরা তখন দুর্ব'ল থাকে বলছো? তুমি আর হাসিও না আমাকে। জানো, ওই সময় ওরা ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে যায়। কফিন, যাজক, কবর, ফুল, রাত-ভোর উপাসনা বাবদ খরচ মেটাবার পর ওদের হাতে অবশিষ্ট কি আর থাকতে পারে বলো। এই সব বাড়তি খরচার সামাল দিতে দাও ওদের আগে, তারপর তো কবরে গিয়ে জিনিষটা দেখার পর দাম ঠিক করবে।'

হাইনরিখের বাস্তব বুদ্ধির অভাবের নমুনা দেখে আমি তার কথায় প্রথমে কান দিলাম না, দেওয়ার কথাও নয় আমার। কারণ এটা ঠিক যে, এই অফিসে আমার কাজ হলো কবরের নকসা তৈরী করা। তবে এর সঙ্গে আমি একটু বাড়তি কাজও করে দিই—নকশাটার রঙ করে দিয়ে, এবং তার পাশে ফুলের কেয়ারী ও দু'একটা গাছও এ'কে দিই। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোনালী অক্ষরে পাথরের ফলকে উৎসগ' জাতীয় কিছু লেখাও দিয়ে থাকি, এটা খদ্দেরদের খুবই মন-পসন্দ ছিলো আমার মালিও খুশি হবে। কিন্তু আমাদের প্রতিযোগীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল।

এই সব কথা চিন্তা করেই শেষ পর্য'ন্ত আবার না বলে থাকতে পারলাম না, হের রল, বর্ত'মান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আলোচনা করবার অনুমতি যদি তুমি দাও তাহলে আমি বলতে পারি, তোমার নীতিটা খুব মহৎ। তবে এও বলে রাখি, তোমার এই মহৎ নীতি মতো চললে দুদিনেই ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বালতে হবে। এখন সবাই টাকা রোজগারের ধান্দায় নেমে পড়েছে, আমরাই বা পিছিয়ে থাকি কেন বলো? আবার দেখা যাচ্ছে, এখন মানুষের কেনার ক্ষমতা প্রায় বিপর্য'স্ত। তাই আমাদের মত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এখন বেচার যুগ নয়, বরং

কেনার যুগ, আর নগদে দাম পেতে হবে। টাকার দাম যে ভাবে কমছে, তাতে একদিন ঠিক শূন্যতে গিয়ে পেঁছবেই, দেখো। মানুষ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কল্পনায় আর পঁচিশ ভাগ বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে বাস করছে। হয়তো এটা তার দুর্বলতা, আবার শক্তিও বলতে পারো। তবে আমার উপলব্ধি হলো, এখন যে যুগ, তাতে জেতা মুশকিল। এই যেমন ধরো, আজ তুমি যে জিনিষটা বেচে এলে দু'মাস পরে তার যে দাম পাবে সেটার মূল্য দেখবে ওই পঞ্চাশ হাজারেই নেমে গেছে।'

রাগে লাল হয়ে উঠলো হাইনরিখের মুখ। ফুঁসে উঠে বললো সে, 'আমাকে তুমি অতো নির্বোধ ভেবো না। আর তোমার অতো বক্তৃতা দেবারও কোনো দরকার নেই। ব্যবসা যেমন চলছে, তেমনি চলবে। নিজের চরকায় তেল না দিয়ে কেনই বা তুমি পরের চরকা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসেছো শুনি।'

এরপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না হাইনরিখ, একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বেশ বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছে ও। এখন ও ওর প্রিয় রুমস রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকবে। 'রাগে আমার মাথার ঠিক ছিলো না, কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলাম জর্জের কাছে, 'তুমিই ভেবে দেখো, এই রকম লোকের সঙ্গে আমাদের কারবার চালাতে হবে—'

হাসলো জর্জ 'ও সব ভাবনা ছাড়ো তো। একটু আগে তুমি না বলছিলে, টাই কিনবে? টাকা নিয়ে এখন বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে।'

জর্জের কথায় কান না দিয়ে আমি বললাম, 'সত্যিই কি রাইজেনফেল্ড কাল এখানে আসছে?'

'হ্যাঁ, তারবার্তা পাঠিয়েছে সে।'

'কি চায় সে? টাকা?'

'এলে তার মুখ থেকেই না হয় শুনো,' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে জর্জ বললো।

□ দুই □

একটু পরে অফিসের দরজা বন্ধ করে আমিও বাইরে চলে এসে বাগানের সামনে দাঁড়ালাম। বাগানে এখন বসন্তের আমেজ। সোনালী সূর্যের দীপ্তিতে আকাশ ঝলমলে, কোথাও মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার স্পর্শে একটা অদ্ভুত অনুভূতি শরীরের প্রতিটি লোমকূপে।

আমাদের এই কামরাটা শো রুমেরও কাজ করে। স্মৃতিস্তম্ভগুলো এখানেই সাজানো থাকে। অবিলিস্ক অটোর পেছনে সৈনিকের মতো সবগুলো সাজানো

সারিবিদ্ধ ভাবে। আর অটোটা যেন সেনাপতি। পাথরের এই স্তম্ভটা এখন আর আমাদেও দস্ত নয়, সবচেয়ে পুরনো জিনিষ, এটাই বিক্রী করে দেবার কথা বলেছিলাম হাইনরিথকে। অটোর ঠিক পেছনেই রয়েছে বেলেপাথরের টুকরোগুলো, কবরের আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় ওগুলো। এছাড়া আছে ঢালাই সিমেণ্টের তৈরী জিনিষ, অপেক্ষাকৃত গরীব মানুষের কাজে লাগে। এর পরেই রয়েছে দু ধাপের বেদী, যারা জীবনে কখনো উঁচুতে উঠতে পারেনি, এগুলো তাদেরই জন্য। এগুলো সস্তা দামের। আর ওই বেলেপাথরের স্মৃতিস্তম্ভগুলো, ওগুলোয় মার্বেল আর কালো পাথরের কাজ করা হয়। এগুলো কেনা হয়েছে ছোটো ছোটো ব্যবসাদার, ফোরম্যান ও কারিগরদের জন্য, তারা হাতের কাজ করে রুজি রোজগার করে থাকে। এরা তাদের প্রকৃত যোগ্যতা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাবার ভান করে থাকে। এছাড়া আছে মার্বেলপাথরের তৈরী দামী স্তম্ভগুলো। জোড়া বেদীর ওপর বসানো পালিশ করা। এগুলোর খদ্দেররা হলো মধ্যবিত্তরা, বড় ব্যবসাদাররা, বড় দোকানদাররা আর ভালো বেতনের চাকুরীজীবিরা।

তবে এগুলোই শেষ নয়। অভিজাতদের জন্য আছে দামী সুইডিশ কালো পাথরের স্তম্ভ, পালিশ করা। কবরের চুড়োয় ওই পাথরের তৈরী ক্রুশ চিহ্নও দেওয়া হয়। এগুলোর খদ্দের হলো ধনী কৃষক, সম্পত্তির অধিকারী লোক, অতিমুনাফাকারী, হুণ্ডীতে কারবার করা অসৎ ব্যবসায়ীরা।'

আমরা দুজনে এক সঙ্গে তাকালাম সেই জিনিষটার দিকে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ওটা আমাদেরই ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই। ওটার গায়ে এখন অন্য লোকের নাম খোদাই করা হবে। আপন মনে বললাম, 'বিদায়, কালো ডায়না, বিদায়। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এসব থেকে তুমি বেহায়ার মতো ওই ঠকবাজ ফ্লেডারের নাম ঘোষনা করে, বলবে অন্তহীন সময়। অথচ ওই লোকটাই ভেজাল খাবার বেচে দু'হাতে মুনাফা লুটছে। কিন্তু কিছু করার নেই। বিদায়—'

'খুব ক্ষিদে পেয়েছে', বললো জর্জ, 'ওয়াল হাল্লার যাবে? না, তুমি তো আবার টাই কিনবে বলছিলে—'

'পরে কিনবোখন। তাছাড়া দোকান বন্ধ হতে এখনো অনেক দেরী আছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত ডলারের দামে হের ফের হয় না। কেন হয় না বলো তো।'

'শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে বলে। যাইহোক, ওসব আজে বাজে প্রশ্ন ছেড়ে এখন চলো তো ওয়াল হাল্লাতে, ওখানে গরুর মাংসের ভালো সুরুয়া করেছে, সেই সঙ্গে আলুসেদ্ধ, আচার। ব্যাংক থেকে ফেরার সময় মেনুটা দেখে এসেছি।'

'বেশ তো চলো, যাওয়া যাক। ভালো হবে, এডয়ার্ড নবলককে একটু তাতিয়ে আসা যাবে।'

ওয়াল হাল্লার বড় ডাইনিং হল। সেখানে প্রবেশ করা মাত্র ওই হোটেলের মালিক এডুয়ার্ড নবলকের দিকে নজর পড়লো। দৈত্যের মতো চেহারা তার। মাথায় বাদামী টুপি, ডিনার কোটে চাকচিক্য আছে। আমাদের দেখেই চমকে উঠলো ও।

আড়চোখে তার চমকে ওঠার ভাব দেখে মনে মনে হাসলাম। 'সুপ্রভাত হের নবলক', বললো জর্জ। 'আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার কি বলেন। এমন সুন্দর আবহাওয়ায় ক্ষিদে বেড়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে কিছু খাই—'

'কিন্তু বেশী খাওয়া ভালো নয়। ডাক্তারদের মতে বেশী খেলে লিভার নষ্ট হয়ে যায়। আর ভালো খাবারও বেশী খেতে নেই, বুঝলে হে···তাছাড়া—'

কাঁধে একটা ভারী থাপ্পর পড়তেই চমকে উঠলো এডুয়ার্ড, 'আমাদের কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি বরং তোমার নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাবো। তা তোমার কবিতা কেমন হচ্ছে?'

'তেমন কিছুই হচ্ছে না। একদম সময় পাই না, দিনকাল কি যে হচ্ছে—'

এক্ষেত্রে আমি হাসতে পারলাম না এই ভেবে যে, এডুয়াড' কেবল হোটেল মালিক নয়, ও একজন কবিও বটে, তাই এ ব্যাপারেই শুধু একটু সম্মান দিতে হলো ওকে। প্রসঙ্গ বদল করে বললাম, 'তা এখন আমরা কোন্ টেবিলে বসবো বলে দাও।'

চারদিকে তাকাতে গিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এডুয়ার্ডের মুখ। 'একটা টেবিলও খালি নেই দেখছি, কোথায় যে বসতে বলি তোমাদের।'

'চিন্তা করার কিছু নেই। আমরা অপেক্ষা করছি—'

এডুয়ার্ড আবার চারদিকে তাকিয়ে কি যেন জরীপ করে বলে উঠলো, 'খুব শীগগীর কোনো খদ্দেরের খাওয়া যে শেষ হবে বলে মনে হয় না। সবে সুপ দিয়ে শুরু হয়েছে। তোমরা বরং এক কাজ করো, রেল রোড হোটেলে চলে যাও, ওখানে বেশ ভালোও খাওয়া চলে।'

'ভালো খাওয়া?' একি রসিকতা লোকটার? আমরা এসেছি গরুর মাংসের সুরুয়া খেতে,' আর এ লোকটা বলে কিনা, অন্য হোটেলে যেতে। ওয়ালহাল্লার এটাই সেরা খাবার।'

এডুয়ার্ড কবি, সে আবার মানুষের মনের খবর জানতে পারে, তা তো জানা ছিলো না। তা না হলে ও বললোই বা কি করে, 'অপেক্ষা করে কি করবে, ততক্ষণে হয়তো সুরুয়া ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অন্য কিছু খাওনা কেন।'

'দরকার হবে না, টেবিল বোধহয় একটা খালি হচ্ছে। ওই যে এক সুন্দরী রমনীর সঙ্গে এক সুবেশ সুপুরুষ ভদ্রলোক বসে আছেন, ওখান থেকে যে আমায় ডাকছে, ও আমার বন্ধু উইলি। আমরা ওখানেই যাচ্ছি, ওখানে একটা বেয়ারা

পাঠিয়ে দাও এডুয়ার্ড।'

সেই টেবিলটার দিকে আমরা এগিয়ে যেতে গিয়ে এডুয়ার্ডের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম। আমাদের এখান থেকে ভাগাতে চাওয়ার পেছনে এডুয়ার্ডের সঙ্গত কারণ আছে। অনেক দিন আগে দোকানের বিক্রী বাড়াবার জন্য এডুয়ার্ড এক গুচ্ছ কুপন প্রবর্ত্তন করেছিল। এক সাথে অনেকগুলো কুপন কিনলে সস্তা পড়ে। একবেলার খাওয়ার জন্য একটা কুপন। হিসেব করেই কুপন বিক্রী প্রবর্তন করেছিল ও। কিন্তু কে জানতো মার্কের দাম রাতারাতি এতো কমে যাবে। ওর প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু হলো। দু'সপ্তাহ আগে অনেক কুপন কিনে রেখেছিলাম আমরা। আমাদের মতো কফিন মিস্ত্রী উইলকি, কবরখানার পাহারাদার লাইবেরমান, আমাদের ভাস্কর শিল্পী কুর্ট বাক, উইলি এমন কি লিসাও অনেক কুপন কিনে রেখেছিল। প্রতিটি বইতে দশটা করে কুপন। এডুয়ার্ড ধরে নিয়েছিল যে, দশ দিনের মধ্যেই কুপনগুলো খদ্দেররা ব্যবহার করে ফেলবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। আমরা প্রত্যেকেই প্রায় তিরিশটা করে কুপনের বই কিনে রেখেছিলাম। মার্কের দাম পড়ে যাওয়াতে এখন ওই কুপনগুলো আধা দামের হয়ে গেছে। এখন এমন অবস্থা যে, ওই কুপনে মাত্র দশটা সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। বেগতিক দেখে মাঝে এডুয়ার্ড একবার কুপন নিতে অস্বীকার করলো। তাই দেখে আমরা এক উকিল বন্ধুকে সঙ্গে করে এনে খাওয়া দাওয়া করলাম ওয়াল হাল্লাতে। হোটেলের বিল মেটানোর সময় সেই উকিল বন্ধুটি কুপন চুক্তির শর্ত নিয়ে ছোটো খাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। ও তখন কুপন নিতে বাধ্য হলো। তবে ও ওর সেদিনের সেই প্রচণ্ড রাগ আর লোভ প্রকাশ করলো একটা ব্যঙ্গ কবিতা ছাপিয়ে। আমরা তখন আবার সেই উকিল বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। সে তখন এডুয়ার্ডকে বুঝিয়ে দিলো, কাউকে ব্যঙ্গ করলে আইন মাফিক তার কি শাস্তি হতে পারে। এরপর থেকে এডুয়ার্ড একটু সংযত হলেও প্রতিদিনই সে জানতে চাইতো, আর কতো কুপন অবশিষ্ট আছে আমাদের কাছে। আমরা তার প্রশ্নের উত্তর দিতাম না, বলতাম না যে, তখনো আরো সাত মাসের মতো কুপন অবশিষ্ট আছে আমাদের কাছে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল উইলি তখন। তার পরণে ছিলো দামী সবুজ রঙের সুট। মুক্তো ঝুলছিল তার টাইতে, আঙুলে দামী আংটি। আশ্চর্য পাঁচ বছর আগে এই উইলি ছিলো আমাদের কোম্পানির রাঁধুনীর সহকারী। আমারি বয়সী হবে সে, পঁচিশ বছরের যুবক সে এখন।

'আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' বললো উইলি, 'জর্জ ক্রুল, লডউইগ বোদমার। আর ইনি হলেন প্যারিসের মুলারুজের মাদামোয়াজেল রেণী দ্য লা তুার।'

বেশ ভদ্রতার সঙ্গেই আমাদের স্বাগত জানালেন মাথা নিচু করে রেণী দ্য লা তুার।

উইলির দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা অবাক হলাম ওর চোখে মুখে গর্বের ভাব দেখে। 'এড়ুয়াড' তোমাদের এড়াতে চাইছিল, তাই না?' সুরুয়াটা বেশ সুস্বাদু, তবে পেঁয়াজ একটু কম।'

এড়ুয়াডের সঙ্গে কুপন নিয়ে ঝামেলার ঘটনা উইলি জানতো। 'বেয়ারা?' চিৎকার করে উঠলাম আমি। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারাটা কানই দিলো না আমার ডাকে। ফিরে আবার ডাকলাম, 'এই বেয়ারা!'

'তুমি কি জঙ্গলের মানুষ?' আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো জর্জ, 'লোকটাকে অপমান করছো কেন তুমি? ১৯১৮ সালের বিপ্লবে তুমি সামিল হওনি? হের ওবের?' বললো জর্জ, 'হ্যাঁ, এই ভাবে ওদের ডাকতে হয়।'

মনে আছে জার্মানীতে ১৯১৮ সালের বিপ্লবে সবচেয়ে কম রক্তপাত হয়। এর কারণ বিপ্লবীরা ভীষণ ভয় পেয়ে আন্দোলন তুলে নেয়, সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করে। পুরস্কারস্বরূপ সরকারের কাছ থেকে তারা নগদ টাকা আর খেতাব পায়। আর সেই সময় ঠিক হয়, বেয়ারাদের আর বেয়ারা বলে ডাকা চলবে না, ওদের 'হের ওবের' বলে সম্বোধন করতে হবে, তার মানে 'শ্রীযুক্ত হেড বেয়ারা।'

'হের ওবের!' আবার ডাকলো জর্জ। কিন্তু এবারেও সাড়া দিলো না সে। হঠাৎ রেস্তোঁরা কাঁপিয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'ওবের, উত্তর দিচ্ছো না কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি, উনি বারবার ডাকছেন, আর তুমি শুনতে পাচ্ছো না?' চাবুক খাওয়া যুদ্ধের ঘোড়ার মতো বেয়ারাটা এবার ছুটে এলো আমাদের কাছে। 'বলুন, আপনাদের কি দেবো?'

'গোমাংসের নুডুল সুরুয়া দু-প্লেট আর দুটো চপ আমাদের দুজনের জন্য', ফরমাস দিলো জর্জ, 'চটপট আনবে।'

চিৎকারের শব্দটা এড়ুয়াডের কানেও গিয়েছিল। ছুটে এলো আমাদের কাছে সে। 'আমি তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, আমার দোকানে ওসব হৈ-চৈ চেঁচামেচি চলবে না, বুঝলে?'

ওর কথার উত্তর আমরা কেউ দিলাম না, কেবল ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। ওদিকে রেণী দ্য লা তুার নাকে পাউডার ঘষছিল। ব্যর্থ এড়ুয়াড ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ তার কানে এসে বাজলো আবার সেই বাজখাই কণ্ঠস্বর, 'ওহে হোটেল মালিক, ওখান থেকে কেটে পড়ো।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো এড়ুয়াড। আগের মতোই বোকা বোকা দৃষ্টি নিয়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। কিন্তু এড়ুয়াডের দৃষ্টি তখন রেণী দ্য লা তুারের দিকে, তাকে লক্ষ্য করে ও বললো, 'আপনিই কি একটু আগে—?'

'হল্লোটা কি শুনি?' পাউডারের কৌটোটা টিপে বন্ধ করে রেণী কৈফিয়ত চাইবার ভঙ্গিতে বললো, 'আপনি কি চান বলুন তো?'

এডুয়াড' তো একেবারে থ। 'দেখছি অতিরিক্ত খাটাখাটুনির জন্য তুমি মাথার ঠিক রাখতে পারছো না হের নবলক। তুমি যেন দিনের বেলাতেই ভূত দেখছো।'

'কি বলছো তুমি? এইমাত্র আমি এখানে—'

'আমি আবার বলছি তোমাকে, তোমার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে', আমি বলতে শুরু করলাম, 'দেখছি শরীরও তোমার বেশ খারাপ। আমি বলি কি, কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে এসো। তোমার আত্মীয় বা উত্তরাধিকারীকে এতো তাড়াতাড়ি সস্তায় কবরের পাথর বিক্রী করতে চাই না আমরা।'

চোখ পিট পিট করে তাকালো এডুয়ার্ড।

'বিচিত্র প্রকৃতির লোক বলে মনে হচ্ছে তোমাকে', রেনী দ্য লা ত্যুর বাঁশির মতো মিষ্টি সুরেলা গলায় বললো, 'আপনার বয়গুলো কালা, নাকি শুনেও শুনতে চায় না। অথচ এনিয়ে একটু হাঁক-ডাক করলেই খদ্দেরদের ঘাড়ে অহেতুক দোষ চাপাও তুমি।' বলেই মিষ্টি হাসি হাসলো সে।

সত্যি সত্যি এডুয়াডে'র মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হলো। সত্যিই তো, এমন সুরেলা কণ্ঠস্বর যে মেয়ের, সে কি কখনো অমন বাজখাই গলায় চিৎকার করতে পারে?

'বলি, তুমি এখন এখান থেকে কেটে পড়বে? নাকি, আমাদের সঙ্গে শুধু তর্ক'ই করে যাবে?' এবার প্রশ্ন করলো জর্জ'।

'আর দেখো, ভালো খাবার বলে যেন গোগ্রাসে গিলো না, লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে', আমি রসিকতা করে একটু আগের ওর কথাগুলোই ফিরিয়ে দিলাম।

ছুটে পালাবার পথ পেলো না এডুয়ার্ড'। উইলির দিকে এই প্রথম আমার নজর পড়ল, হাসির চাপ চাপতে না পেরে ওর শরীরটা তখন ফুলছিল। ওদিকে রেণী দ্য লা ত্যুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম, চোখে তৃপ্তি মেশানো আনন্দের দীপ্তি।

'জানো উইলি, আমার কোনো দাম নেই, কোনো পরিচিতি নেই। তবে অনেক দিন পরে ছেলেবেলার দিনগুলোতে ফিরে যেতে পেরে সত্যিই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। কিন্তু তুমি কি করলে বলো তো?'

উইলি নীরবে রেণীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষ'ণ করলো।

আমি তখন ফরাসী ভাষায় মেয়েটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'মাদামোয়াজেল, আমি ঠিক…'

আমার মুখে অনভ্যস্ত ফরাসী ভাষা শুনে জোরে হেসে উঠলো উইলি, 'ওকে 'পেটি' বলে ডাকবে।'

'কি বললে?' মুখে মেয়েলী মিষ্টি হাসি, কিন্তু এবার গলার স্বরটা পুরুষের

মতো ভারিকি স্বরে বলে উঠলো রেণী।

'জানো, রেণী একজন শিল্পী,' হাসি চেপে বললো উইলি, 'দ্বৈত সংগীত গায়। কি বুঝলে?'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'দ্বৈত সংগীতও গায় বলে, কিন্তু একলাই। একটা ভীষণ চড়া গলা, পুরুষের মতো, আর অন্যটা ভীষণ মিষ্টি, ঠিক কোকিলকণ্ঠী মেয়ের মতোন।'

এতক্ষণে রহস্যটা উদ্‌ঘাটন হলো আমাদের কাছে। সত্যিই রেনী এক অনন্য সাধারণ নারীই বটে। উইলি আর লোটিকে খাওয়ার আহবান জানিয়ে বললো জর্জ, 'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এডুয়ার্ড আজ চারজনের জন্য কুপন পাচ্ছে, যার দামে মাংস দূরে থাক কয়েক টুকরো হাড়ও বোধহয় পাওয়া যায় না।'

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। অফিসের ওপর আমার ঘরের জানলার ধারে বসে ছিলাম। আমাদের বাড়িটা ছিলো একটু ঢালু জমির ওপর, পুরনো আমলের। আগে এটা গির্জার সম্পত্তি ছিলো। এখন ক্রল এ্যান্ড সন্সের অধিকারে গত ষাট বছর ধরে। সম্পত্তির মধ্যে আছে দু'পাশে দুটো নিচু বাড়ি, খিলান দেওয়া গেট হলো প্রবেশ পথ। অপর বাড়িতে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মেজর নোফক, তাঁর স্ত্রী আর তিন কন্যা। আর তারপরেই আমাদের সুন্দর বাগানটা। বাঁদিকে দোতলা কাঠের বাড়ি, একতলার বাসিন্দা আমাদের ভাস্কর কুর্ট বাক্। তার শিল্পকলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শোকাহত সিংহ কিংবা উড়ুক্কু ঈগল, সেগুলো সৈনিকদের কবরে বসাবার কাজে লাগে। আর অলস মুহূর্তে স্বপ্ন দেখে, সে তার শিল্প কর্মের জন্য সোনার মেডেল পাচ্ছে। কুর্ট বাকের বয়স মাত্র বত্রিশ।

রোগাটে চেহারার কফিন মিস্ত্রী উইলকির ঘর সংসারের খবর কেউ জানে না। কেউ মারা গেলে তাঁর আত্মিয়রা আমাদের কাছে কবরের জিনিষগুলো কিনতে এলে কফিনের দরকার থাকলে আমরা উইলকিকে ফরমাসটা দিতে বলি। তবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হোলমান এ্যান্ড ক্লোৎদের দালালটা ভীষণ নাছড়বান্দা। কেউ মারা গেছে শুনলে হয় একবার, তখনি চোখে পেঁয়াজের রস মেখে চোখ লাল করে ঠিক হাজির হবে মৃতের আত্মিয়ের বাড়িতে। মৃতের আত্মিয়রা দেখে লোকটা সত্যি শোকাহত তাদের মৃত মানুষটির জন্য। এর ফলে সেই দালালটার প্রতি সহানুভূতি জাগাটাই স্বাভাবিক। চোখ কান বন্ধ রেখে কবরের জন্য সব কেনাকাটার ভার পড়ে সেই লোকটার ওপর। সেই দালালটার এ হেন স্বভাবের জন্য তার নামকরণ করা হয়েছে—'কাঁদুনে অল্ডার।'

ওদিকে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে একে একে রাস্তার সব আলোগুলো জ্বলে উঠলো। আলো জ্বললো লিসার ঘরেও। জানালার পর্দা টানা ভেবে মনে হলো

ঘোড়ার কসাইটা তাহলে বাড়িতে আছে। লিসাদের বাড়ির পাশে মদের কারবারী হোলসম্যানের বাগান। সেখান থেকে মিষ্টি ফুলের সুবাস ভেসে আসছে।

আমাদের বাড়ির গেট খুলে বেরোলেন সার্জেণ্ট মেজর নোফক। যথারীতি মাথায় টুপি, আর হাতে লাঠি ঠক ঠক করতে এগোচ্ছিলেন। তাঁর চেহারার মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিত নীট্শের আদল আছে, কিন্তু কুচকাওয়াজ করার বই ছাড়া অন্য কোনো বই জীবনে তিনি পড়েছেন বলে মনে হয় না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ওঁর যাতায়াত—ফেরেন কিঞ্চিত মাতাল হয়ে। তবে উনি কেবল জিনের ভক্ত। এক চুমুক দিয়েই কোন্ জিন কোন্ সরাইখানার, অনায়াসে বলে দিতে পারেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁর বাজি জেতার রেকর্ড আছে।

আমার ঘরটা বেশ ছোটই বলা যায়। ঘরের আসবাপত্র সামান্যই। একটা খাট, বইয়ের র‍্যাক, গোটা কয়েক চেয়ার একটা টেবিল, আর একটা সখের পিয়ানো। বছর পাঁচেক আগে আমি ছিলাম একজন সৈনিক। সে হিসেবে আমি আজ বেশ সুখী, এ রকম সুখ যে আমি পাবো, সেটা আমি কল্পনাই করিনি কখনো। আমরা তখন ছিলাম ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে। জোর লড়াই চলছে তখন। আমাদের অবস্থা খুবই করুণ। জোর লড়াই চলছে, অথচ আমাদের দলের বেঁচে আছে মাত্র সিকিভাগ লোক। এরই মধ্যে একদিন পেটে গুলি লাগার দরুন জর্জ ক্রলকে হাসপাতালে ফিরে যেতে হলো। তার ঠিক তিন সপ্তাহ পরে হাঁটুতে গুলি খেয়ে আমিও চলে এলাম হাসপাতালে। আমার অসুস্থ মায়ের একান্ত ইচ্ছে ছিলো, আমি যেন স্কুল শিক্ষক হই। তাঁর সেই ইচ্ছের মর্যাদা দিলাম। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই মা মারা যান। এদিকে যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে আমার জীবন্ত সমাধি হলো। স্কুলের ছোটো ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে থেকে আর তাদের খাবার খেয়ে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মে যাচ্ছিল আমার।

বইতে মন বসাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। বসন্ত ঋতুটার একটা আলাদা উম্মাদনা আছে, মন উতলা করে তোলে। সন্ধ্যার আধো অন্ধকার আমাকে যেন গ্রাস করছিল। আলো জ্বলতেই আমার উদাস ভাবটা কেটে গেলো। টেবিলের ওপর পড়েছিল আমার কয়েকটা কবিতা। খবরের কাগজে পাঠাই, ছাপা হয়, কখনো আবার ফেরতও আসে। জর্জের বন্ধুর সুবাদে সম্পাদক আমার কবিতা ছেপেছেন। আর বাড়তি লাভ হলো, ওয়ারদেনব্রুক ক্লাবের সদস্য করে নেওয়া হয়েছে আমাকে। এডুয়ার্ডের ওল্ড জার্নাল রুমে আমাদের সাপ্তাহিক সভা বসে।

হঠাৎ কবিতাগুলো আমার খুব ছেলেমানুষী রচনা বলে মনে হলো। যুদ্ধের সময় আমার প্রথম কবিতা লেখা শুরু। ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জীবনকে আমি তখন অন্য চোখে দেখতাম। বলিষ্ঠ প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হতো

আমার কবিতার প্রতিটি লাইনে। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এখন বুঝতে পারি, এই পৃথিবীতে অনেক কিছুরই সহাবস্থান আছে, অথচ তা হওয়ার কথা নয়। তবে এর জন্য কবিতা লেখার আর দরকার নেই। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে আমরাই বা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? বোধহয় সেই তাগিদেই লিখি আজও। কিন্তু লক্ষ্য করি, এখনকার লেখার মধ্যে এক অস্পষ্টতা এক অদ্ভুত বিবর্ণতা ফুটে ওঠে যেন, যার সঙ্গে উজ্জ্বল, ভাস্বর প্রভৃতির কোনো মিল থাকে না।

নিচে নেমে অন্ধকার অফিসঘরটা পেছনে ফেলে বাগানে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ সেই সময় একটা পাখি গান গেয়ে উঠলো। যে কুশটা হাইনরিখ বিক্রী করে এসেছে, তারই মাথায় বসে ছিল একটা থ্রাশ পাখি। সেই পাখির গানের সুরটা একদিকে যেমন আমার মনে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিলো, সেই সঙ্গে আবার বিষাদের ছায়াও পড়তে দেখলাম। আমি যেন নিজেকে হারাতে বসেছি তখন। ভরা সন্ধ্যায় আকাশ, পাখির গান সব যেন কেমন আমার মনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এক অদৃশ্যালোকে নিয়ে যেতে চাইছে। যাইহোক, অতিকষ্টে মনটাকে সংযত করে ফিরে এলাম আবার ঘরে।

তারপর পিয়ানোয় পাখির সেই গানের সুরটা তোলবার চেষ্টা করলাম। একটু পরেই কে যেন রাস্তা থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো আমার উদ্দেশে, 'ওহে শুনছো, তোমার হাত আছে, কিন্তু বাজাতে লিখছো না কেন?'

জানালার কাছে ছুটে গিয়ে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটা কালো দীর্ঘ ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না আমার। এখান থেকে ইঁট ছুঁড়লেও তার নাগাল পাবো না। না, রাগ করে লাভ নেই, লোকটা তো ঠিকই বলেরে—এ জীবনে আমি কিছুই ঠিক ঠিক শিখতে পারলাম না। সব ব্যাপারেই আমি বড় চঞ্চল, বড় অসহিষ্ণু তাই আমার জীবনে কিছুই হলো না। এখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, জীবনটাকে সত্যিই কি ব্যাখ্যা করা যায় নিয়ন্ত্রন করা যায় ঘোড়ার লাগাম টানার মতো? নাকি পালতোলা নৌকোর মতো হাওয়ার বেগে জীবন এগিয়ে যায়? একটা নিটোল পরিপূর্ণতার স্বাদ কি করে পায় জীবন? এই যে আকুতি, হতাশা, অবসাদ কিংবা সুখ, কিসেরই বা সেই সুখ? কিংবা কোনো প্রশ্ন ব্যাতিরেকেই কি আত্মসমর্পন? যার আর এক নাম মৃত্যু? আর কেনই বা আমি বেঁচে আছি? কিসের জন্যই বা এই বেঁচে থাকা? এই ভাবে বেঁচে থাকার কি কোনো অর্থ আছে?

□ তিন □

রবিবারের সকাল। গির্জার ঘণ্টা বাজছে। গতরাতের সব স্বপ্ন এখন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। ডলারের দাম আজ ছত্রিশ হাজারেই মুখ থুবরে পড়ে আছে। সময় যেন হঠাৎ আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। পরিষ্কার আকাশ, চারদিকে একটা পবিত্রতার ভাব। এই মুহূর্তে মানুষের মন এতোই উদার যে, খুনীকেও ক্ষমা করতে পারে সে, পাপ পুন্য এই শব্দ দুটি নিরর্থক বলে মনে হয় যেন।

ভোরের সূর্যস্নান ঠাণ্ডা বাতাস জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল। বাতাসে মেজর নোফকের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসে করাত চালানোর মতোন। কফির সঙ্গে মার্জারিন মাখিয়ে রুটি খেলাম। এরপর পোশাকে দিকে নজর দিলাম—অবস্থা তেমন ভালো নয়। সৈনিকের দুটি ইউনিফর্ম ছিলো, সেগুলো টেলারকে দিয়ে কাটিয়ে ভদ্রগোছের পোশাক বানিয়ে নিয়েছি, সেই সঙ্গে একটা নীল আর একটা কালো রঙ করিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া যুদ্ধে যাবার আগে একটা স্যুট করিয়েছিলাম। সেটা এখন ভালো ফিট না করলেও চলে যায়। গতকাল কেনা টাইটা এই স্যুটের সঙ্গে ভালই মানাবে। এটা পরেই ইসাবেলের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাবো।

বেশ খুশি খুশি মন নিয়ে হাঁটছিলাম। ওয়ারডেনব্রুক শহরটি বেশ প্রাচীন, হাজার ষাট লোকের বসবাস। পুরনো কাঠের বাড়ির সঙ্গে হালফ্যাসানের বাড়িও আছে। একটু দূরে ছোট একটা পাহাড় চোখে পড়ে, তারপরেই একটা বড় পার্ক, আর ওই পার্কেই আছে পাগলাদের আশ্রম। এখানেও পবিত্র রবিবারের পরশ লেগেছে। বাতাসে পাখির কাকলী, ফুলের মিষ্টি সুবাস। এই আশ্রমটির লাগোয়া একটা গির্জা আছে, প্রতি রবিবার প্রার্থনা সভায় আমি অর্গান বাজাই।

অর্গান বাজিয়ে কিছু অর্থও উপার্জন করে থাকি। মুচি কার্ল ব্রিলের বেয়াড়া ছেলেদের সপ্তাহে একদিন অর্গান বাজানো শেখাই, পরিবর্তে মুচি আমার জুতো সেলাই করে দেয়, সেই সঙ্গে সামান্য কিছু নগদ টাকাও দেয়। আবার এই বইয়ের দোকানের মালিক বাউয়ারের গবেট ছেলেটিকে বাজনা বাজতে শেখাই, বিনিময়ে সে আমাকে নতুন নতুন বই বিনা পয়সায় পড়তে দেয়, আর কিনলে ভালো কমিশনও দেয় আমাদের ক্লাবের অনেক কবিই আমার মাধ্যমে এই সুযোগটা নিয়ে থাকে। এমন কি বই কেনার প্রয়োজন হলে এডুয়ার্ড নবলক তথন আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে।

প্রার্থনা সভা শুরু হয় সকাল ন'টায়। সবার আসার অপেক্ষায় আমি বসে

থাকি অর্গানের সামনে। বেদীর ওপর মোমবাতি জ্বালা হয়েছে। দামী জোব্বা পরিহিত যাজক দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বাজাতে শুরু করলেই সবার দৃষ্টি পড়ে আমার দিকে। তবে তাদের ফ্যাকাশে মুখে আর গাঢ় চোখের তারায় কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। আমি বাজনা শেষ করতেই যাজক তার বক্তৃতা শুরু করেন। সামনের সারির ভক্তরা বেশ মনোযোগ সহকারে তাঁর ধর্মোপদেশ শোনে। আর পেছনের সারির ভক্তরা তখন যেন কোনো এক অপার্থিক জগতে বিচরণ করতে থাকে।

সামনের সারির দিকে তাকাতেই ডানদিকে ইসাবেলকে বসে থাকতে দেখলাম। মাথাটা ঈষৎ হেলানো, ঠিক প্রার্থনার ভঙ্গিমার নয়, তবে ও এখন এমন এক জগতে চলে গেছে, যেখানে ওর নাগাল পাওয়া যাবে না। আমি ধীরে ধীরে অর্গান বাজাতে শুরু করে দিলাম। খুব নরম সুরে, সেই সুরে ঈশ্বরীয় রূপান্তর ঘটে চলেছে রুটি আর মদ ক্রমশঃ ঈশ্বরের মাংস আর রক্তে পরিণত হচ্ছে।

প্রার্থনা উপাসনা আর বাজনার পর আশ্রম সেবিকারা আমাকে প্রাতঃরাশ দিলো— এটা আমার পারিশ্রমিকের একটা অংশ। এতেই আমার দুপুরের খাবার সারা হয়ে যায়। তাছাড়া এডুয়াড' রবিবার কুপন ব্যবহার করতে দেয় না। প্রাতরাশ ছাড়া যাতায়াতের ভাড়া বাবদ দুহাজার মার্ক নগদ পাওয়া যায়। এখানে আমার মাইনে বাড়াবার কথা কখনো বলিনি।

খাওয়ার পর পার্কে ঘুরে বেড়াই, বুক ভরে এখানকার নির্মল বাতাস গ্রহণ করে থাকি। পার্কটা আমার খুব প্রিয়। কারণ এই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ, রাজনীতি কিংবা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কেউ অহেতুক তর্ক জুড়ে দেয় না।

এই পার্কে আশ্রমের সীমিত রোগীদের বেড়াবার অনুমতি আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কেউ বেঞ্চে মাথা নিচু করে বসে থাকে, কেউ বা আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে। প্রথম প্রথম পাগলদের দেখলে ভয়ে আমার গা শিউরে উঠতো। মনে পড়ে যেতো প্রথম দিনের মৃতদেহ দেখার অনুভূতি। আমার তখন কতই বা বয়স—মাত্র বারো। সেদিন শুনলাম, জর্জ হোলমান মারা গেছেন। আশ্চর্য, মাত্র এক সপ্তাহ আগে তার সঙ্গে আমি কত খেলাই না খেলেছি। অথচ মৃত্যুর পর ফুলে ফুলে ঢাকা সে তখন অন্য এক জগতের মানুষ হয়ে গেছে। মুখে কেমন একটা হলদেটে ভাব। পরবর্তীকালে যুদ্ধে কতো সৈনিককে মরতে দেখেছি, কিন্তু মৃত হোলমানের মুখটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। মানুষ বোধহয় তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা কখনো ভুলতে পারে না, যেমন আমি পারিনি। সেই রকম মৃত্যুর ছায়া আমি এখানকার প্রায় সব পাগলদের চোখে মাঝে মাঝেই দেখে থাকি, ব্যতিক্রম শুধু ইসাবেল।

এক সময় মেয়েদের জমায়েতের দিকে ইসাবেলকে আসতে দেখলাম। পরনে ওর হলুদ রঙের ঝলমলে পোশাক, হাতে চওড়া ধাঁচের টুপি। আমি তখন এগিয়ে

গেলাম ওর দিকে। লম্বাটে মুখ ওর, চোখ আর মুখ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। ওর চোখের তারা ধূসর, সবুজ ও স্বচ্ছ। ঠোঁট জোড়া যক্ষা রোগিনীর মতো টকটকে লাল, কিংবা খুব করে রঙ লাগিয়েছে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝেই হঠাৎ ওর চোখের রঙ কেমন বদলে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, তখন ওকে খুব বয়স্কা মহিলার মতো দেখায় যেন। ওই অবস্থায় ও তখন জেনী হয়ে ওঠে, তখন ওর ওপর ভরসা করা যায় না, ওর প্রতি কোনো আকর্ষণই থাকে না। সব কিছুতেই কেন জানি না ওর অসন্তুষ্ট ভাব। আশ্চর্য, এই জেনীই আবার স্বাভাবিক সময়ে, ওর চোখের তারা যখন ধূসর সবুজ থাকে তখন ও ইসাবেল। ওর এই দুটো রূপই কিন্তু অলীক। আসলে ও হলো জেনেভিয়েভ তার হোভেন : এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে ও, ওর চেতনা দ্বিধাবিভক্ত। ওর মধ্যে দুটো সত্তা পরস্পর ক্রিয়াশীল। আর সেই কারণেই কখনো ও নিজেকে জেনী ভাবে, আবার কখনো বা ইসাবেল। এই মানসিক রোগীদের মধ্যে ওই সব থেকে কমবয়সী। শুনেছি ওর মা বেশ বিত্তবান, থাকেন আলমাসেতে। মেয়ের খোঁজ খবর বড় একটা নেন না। একবারের জন্যও মেয়েকে দেখতে আসতে দেখিনি আমি।

আজও ইসারেল। ইসাবেল হয়ে থাকার মুহূর্তগুলোতে ও যেন এক স্বপ্নের ঘোরে বিচরণ করে থাকে। তখন মনে হয়, যেন ওর কোনো অবসর নেই, নেই কোনো ভার। তখন ওর সেই হাল্কা শরীর কিংবা কাঁধের ওপর হলুদ প্রজাপতি যদি উড়ে এসে বসে তাতে আমি একটুও আশ্চর্য হবোনা। সেই হলুদ প্রজাপতির ডানার স্পর্শে ওর মনটা যদি তখন রঙিন হয়ে ওঠে তাতেও আমি আশ্চর্য হবো না।

'বাঃ তুমি আবার এসেছো দেখছি', আমাকে দেখে মৃদু হেসে ইসাবেল জানতে চাইলো, 'তা এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?'

ও যখন ইসাবেল হয়ে যায়, তখন আমাকে শুধু নয়, সবাইকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করে থাকে। ও আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে?'

'কেন, এই দিকে', আমি গেটটা দেখিয়ে বললাম, 'ওটার বাইরে ছিলাম।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো ইসাবেলের, 'কেন, বাইরে কেন? কিছু খুঁজছিলে বুঝি?'

'মনে হয় সেই রকম কিছু, তবে ঠিক কি খুঁজছি যদি জানতাম—'

এবার ও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দার্শনিকের মত করে বলে উঠলো, 'ওসব খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দাও রলফ। খুঁজে কেউ কখনো কিছু পায় না, শুধু খোঁজাই সার হয়।'

ওর মুখ থেকে রলফ নামটা শোনা মাত্র আমি একটু সিঁটিয়ে গেলাম। ইসাবেলের দ্বৈতসত্তার মতো মাঝে মাঝেই ও আমাকে রলফ বলে, আবার কখনো বা রুডলফ বলেও সম্বোধন করে থাকে। তাছাড়া মাঝে মাঝে ওর কথায় আমি জনৈক রাওয়েলও হয়ে উঠি। রলফ নামটা শুনলেই মনে হয় যেন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক

হবে। এরকম নাম আমার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু রুডলফ যেন এক দুরন্ত প্রেমিক—তাই ইসাবেলের মুখে ওই নামটা আমার খুব ভালো লাগে। তখন নিজেকে সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমিক বলে মনে হয়। কিন্তু আমার আসল নাম হলো লুডউইগ বোদবার। কিন্তু এই নামটা সব সময় এড়িয়ে চলে ও। এ নিয়ে আমি অনেকবার প্রতিবাদ করেছি, ও কান দিতেই চায় না।

প্রথম প্রথম ওকে আমার ভীষণ ভয় করতো। শুনেছি, পাগলরা মারাত্মক খুনে প্রকৃতির হয়। কিন্তু যতো ওর সঙ্গে আমি মিশেছি, ততই আমার কেন জানিনা মনে হয়েছে জেনিভিয়েভ এর ব্যতিক্রম। আর প্রথমে তো আমার মনেই হয়েছিল, ওর মধ্যে পাগলামির কোন লক্ষণই নেই, ওর কোন অসুস্থতাও নেই। বেশ হাসিখুশি স্বভাবের ফুটফুটে একটি মেয়ে। তবে কিছুদিন যাবার পরেই বুঝতে অসুবিধা হলো না, ওর ওই কুড়ি বছরের স্পর্শকাতর, রোগাটে চেহারার মধ্যে একটা দারুণ গরমিল আছে। আবার ওই বিষাদে ভরা ইসাবেলের মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণও যেন আছে।

ও আমার হাত ধরে বললো, 'এসো রল্‌ফ।'

'আমি রল্‌ফ নই', প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'আমি রুডলফ।'

'তুমি রুডলফ হতে পারো না!'

'না, আমি বলছি, আমি রুডলফই!'

এবার ও হেসে ফেলল। স্বাভাবিক মেয়ের মতো অবাধ্য ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করে ও বললো, 'তুমি আমার কাছে রুডলফও নও, আবার রলফও নও। আবার দুটোই না হলে তুমি, তুমি তাহলে কে?'

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, ইসাবেল পাগল নয়, আসলে ও পাগলের ভান করে থাকে। ইসাবেল ওর কথার জের টেনে বললো আবার, 'তুমি বড্ড বিরক্ত করো আমাকে। আচ্ছা, সব সময় তুমি একই লোক হয়ে থাকতে চাও না কেন বলো তো?'

'সত্যি, তুমি ঠিকই বলেছ, কেন চাই আমি?' চমকে উঠে আমি উত্তরে বললাম, 'ঠিকই তো একজনের মধ্যে এতো মূল্যবান কিই বা থাকতে পারে? আর মানুষ কেনই বা নিজেকে এতো গুরুত্ব দেয়?'

ইসাবেল মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি আর ডাক্তার দুজনেই সমান। কেন যে তোমরা আমার কথা মেনে নাও না।'

'তা ডাক্তারও বুঝি মানে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, ও নিজেকে সবজান্তা বলে মনে করে থাকে। সে আমার মনের কথা বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি মনে করি, ও কিছুই জানে না। এমন কি রাতে যখন কেউ নজর দেয় না ঘাসেরা তখন কেমন দেখতে হয়, তাও সে জানে না।'

'কেন, ঘাসেরা আবার কেমন দেখাবে? অবশ্যই ধূসর রঙের। আবার

অন্ধকারে কালোও দেখাতে পারে। তবে চাঁদের আলোয় বোধহয় রূপোলী দেখায়।'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে ইসাবেল বললো, 'যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ডাক্তারের মতোই কথা বললে তুমি।'

'বেশ তো তুমিই বলো কেমন দেখায় ?'

উঠে দাঁড়ালো ও। দমকা হাওয়ায় ওর হলুদ রঙের ঝলমলে ফ্রকটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

'রাতে ওরা থাকে না', বললো ইসাবেল।

'বেশ তো ঘাস না থাকলে, কি থাকে ওখানে ?'

'কিছুই থাকে না। তুমি যতক্ষণ লক্ষ্য করবে, দেখবে ততক্ষনই থাকবে।' আমার কথনো যদি হঠাৎ মুখ ঘোরাও, তখনি হয়তো বুঝতে পারবে—'

'কি বুঝতে পারবো ? ঘাস ওখানে থাকে না, এই তো ?'

'না, না তা নয়। আসলে কি ভাবে ওগুলো ফিরে আসছে বুঝতে পারবে। আসলে সব ব্যাপারেই তাই হয়ে থাকে। চোখ ফিরিয়েছে কি দেখবে সবকিছু হারিয়ে গেছে।'

'তা কি হারিয়ে যেতে পারে ইসাবেল ?' সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। 'যা কিছু তোমার পেছনে থাকে। তোমার পেছন ফেরা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করে থাকে, তারপরেই সব নিরুদ্দেশ।'

কি বলতে চায় ইসাবেল ? তাহলে ও কি বোঝাতে চাইছে যে, মানুষের পেছনে সব সময় থাকে এক অনন্ত শূন্যতা। এই সব চিন্তা করেই আমি জানতে চাইলাম, 'তাহলে তুমি যখন পেছন ফেরো, আমিও থাকি না ?'

'হ্যাঁ, তুমিও থাকো না। শুধু তুমি কেন, কিছুই থাকে না।'

'তাই বুঝি ?' একটু কটাক্ষ করেই শুনে বললাম, 'কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়ালেও সব সময়েই আমি থাকি।'

'তার কারণ কি জানো ? তুমি ভুল দিকে ঘোরো', হার মানতে রাজী নয় ইসাবেল।

'কেন, ঘোরারও দিক আছে নাকি ?'

'তোমার জন্য আছে রলফ।' আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম, 'আর তোমার বেলায় ?'

আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসলো ও। 'আমার ক্ষেত্রে ? আমিতো এখানে নেই-ই।'

'তাই নাকি ? কিন্তু তুমি যে আমার কাছে সত্যি সত্যিই আছো, আর থাকবেও চিরকাল।'

সঙ্গে সঙ্গে ইসাবেলের মুখের ভাব পাল্টে গেল। ও যেন আবার আমার সহজ ভাবে চিনতে পারছে। একান্ত আপনজনের মত গাঢ় স্বরে বললো ও, 'সত্যি তুমি বলছো একথা? আমি যে এই কথাটাই বারবার শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে, কেন তুমি বলো না?'

'কিন্তু আমি তো সব সময়েই এই কথা বলে থাকি।'

'আমি যে আরো, আরো শুনতে চাই। যতোই তুমি বলো না কেন, যথেষ্ট বলে মনে হয় না। আশ মেটে না আমার।' আমার একান্ত সান্নিধ্যে সরে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ইসাবেল। ওর নরম দেহের স্পর্শ পেলাম, ওর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ এসে লাগলো আমার নাকে। আবেশে তন্ময় হয়ে গেলাম। যেন অনেক, অনেক দূরে থেকে ওর দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ আমার কানে ভেসে এলো, 'যতোই বলো না কেন, আমার মন ভরে না। কেন যে তোমরা এ কথাটা বুঝতে পারো না? তোমরা সবাই যেন এক একটা পাথরের মূর্তি।'

হ্যাঁ, আমরা পাথরের মূর্তিই বটে। এছাড়া আর কি ভূমিকাই বা থাকতে পারে আমাদের? ইসাবেল সুন্দরী যুবতী, এক এক সময় ও আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়, একটা দারুণ আকর্ষণ বোধকরি ওর জন্য। ওর সান্নিধ্যে এলেই আমার তখন মনে হয়, আমার প্রতিটি স্নায়ুতে হাজার হাজার ডাক আসছে দূরভাষে। তারপর এক সময় রঙ নাম্বার হয়ে ফোনটা কেটে যাচ্ছে। নিজেকে বড় বেশী অসহায় বলে মনে হয় তখন। পাগলকে কেই বা চায়? কেউ চাইলেও পেতে পারে না, অন্তত আমি তো নয়ই। কিন্তু ওকে অস্বীকার করিই বা কি করে? ও যেন ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় আমার চারপাশে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খোলামেলা জায়গায় আমরা চলে এসেছিলাম, রোদ বেশ চড়া এখানে। ওকে বললাম, 'টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নাও ইসাবেল। ডাক্তার বলেছে না?'

টুপিটা বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও বললো, 'ডাক্তারদের কথা? আমি তো ধর্তব্যের মধ্যে ফেলি না। ডাক্তার তো অনেক কথাই বলেছিল আমাকে। বলেছিল সে আমাকে বিয়ে করবে, কিন্তু কথা সে রেখেছে কি? একেবারে জালি লোক সে।'

কথা বলার মাঝেই ফুল বাগানের মধ্যে বসে পড়লো ইসাবেল। টিউলিপ ফুলগুলোকে দেখিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, বলতে পারলো না, হঠাৎ ভীষণ ভয় পাওয়ার মতো করে লাফিয়ে উঠলো ও।

ওর অমন অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো?'

ফুলের কেয়ারিটা দেখিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলে উঠলো, 'ওই দেখো, ওখানে সাপ!'

'সাপ? কোথায় সাপ! ওখানে তো কোনো সাপ নেই।'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি। তুমি দেখতে পাচ্ছো না। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না- ওরা কি চায় আমার কাছ থেকে।'

'কেন, ওরা আবার কি চাইতে পারে তোমার কাছ থেকে! ওরা তো শুধুই ফুল!'

কাঁপা কাঁপা গলায় ইসাবেল বললো, 'ওরা আমায় স্পর্শ করতে চায়।

আমি ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অন্য পথে হাঁটতে শুরু করলাম তখন। ওর বুকের ধুকপুকানি আমার বুকের স্পর্শে অনুভব করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ও খুবই উত্তেজিত।

'তুমি এটা হতে দিও না রুডলফ।' ওর মুখে রুডলফ নামটা উচ্চারিত হতে শুনে বুঝতে পারলাম, স্বাভাবিক হয়ে আসছে ও।

'না ইসাবেল, তুমি দেখো, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। আমি—' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আশ্রমের একজন সেবিকা এগিয়ে এসে জানালো, 'চলুন, এবার আপনার খাবার সময় হয়েছে।'

'খাওয়া?' বিরক্ত হয়ে বললো ইসাবেল, 'আচ্ছা রুডলফ, সব সময়েই কি খেতে হয়?'

'হ্যাঁ, বাঁচবার জন্য তো খেতেই হবে।'

'আবার মিথ্যে বলছো? প্রতিবাদ করে উঠলো ইসাবেল, 'পাথররা কি খেতে পারে?'

'না, খায়না বটে, তবে', আমি এবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'পাথরের কি প্রাণ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি! তারা তো অমর।'

কথা না বাড়িয়ে সেবিকা এবার ইসাবেলের হাত ধরলো।

'আমার টুপিটা কোথায়?'

ফুলের বাগানের চারপাশে তাকিয়ে দেখে এক সময় এগিয়ে গেল সেবিকা।

সে চলে যেতেই ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো ইসাবেল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না রুডলফ। এরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তুমি যেও না।'

'না, না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথ্থাও যাবো না, দেখো!'

ওদিকে ইসাবেলের চোখে শেষ বিদায়ের ছবি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। অবশ্য এ ব্যাপারটা প্রতিদিনের। জানি না, এর পরে যখন আবার দেখা হবে, তখন ও কেমন থাকবে।

চলার পথে একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকালো না ইসাবেল, অভিমানে কিংবা দুঃখে কিনা কে জানে। জেনেভিয়েভের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মার্চ

মাসের গোড়ার দিকে। নিজের থেকে যেচে এমন ভাবে আলাপ করেছিল ও সেদিন, যেন কতো দিনের চেনা ও আমার। তবে এই পাগলাগারদে এটাই স্বাভাবিক। এখানে কেউ কারোর পরিচয় করিয়ে দেয় না ঘটা করে। সামান্য কথা নিয়ে শুরু হয়ে যায় আলাপ। অবশ্য কেউ কারোর কথা যে মন দিয়ে শোনে তা নয়, সবাই অনর্গল কথা বলে যায়, এটাই রেওয়াজ। আর অপর পক্ষ শুনে যায় নীরবে, কিছু মনে করতে নেই। তাই জেনেভিয়েভ আপন মনে আমার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলে আমি কিছু মনে করিনি। তবে ও ছিলো তখন ইসাবেল। সেদিন ওর পরনে ছিলো দামী সোনালী রঙের গলাবন্ধ কোট। সান্ধ্য পোশাক আর সোনালী জুতো। সকাল এগারোটায় এ পোশাকে কেউ কাউকে দেখে হাসবারই কথা, কিন্তু এলাকার এই পরিবেশে সে কথা মনেই হয়নি আমার। আমার তখন মনে অন্য কথা জেগেছিল। মনে হয়েছিল, ও যেন অন্য কোনো সুখী পৃথিবী থেকে প্যারাসুট করে এই গ্রহে নেমে এসেছে, ওর সেই পৃথিবীতে বয়স দিনের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই সুমেরু-প্রভার আলোয় ওর কাছে সবকিছুই তখন শুধুই স্বপ্নময়। এখানে এসে ওর সেই আগে সময়টাও যেন একেবারে হারিয়ে ফেলেছে তার গতি।

প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই ও আমাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, না পারছি একে ভুলে যেতে, না পারছি ওকে ছেড়ে চলে আসতে। অথচ আমি যুদ্ধের পোড় খাওয়া ছেলে হয়েও ওর সান্নিধ্যে এলে আমি যেন আমি আর থাকি না। আমার আপন সত্তা বিলীন হয়ে যায় ওর মধ্যে। ও আমার সামনেই বসেছিল, অথচ মনে হয়েছিল, ওর শরীরটা অসম্ভব হাল্কা, হাওয়ায় ভাসছে অশরীরী ছায়া মূর্তির মতো। ওর কথাগুলোর অসংলগ্নতা থাকলেও এক অদ্ভূত ধারালো যুক্তির ছাপ আমি দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। আবার যখনি মনে হয়েছে ওকে বুঝি আমি আমার খুব কাছে পেয়ে গেছি, তখনি মনে হয়েছে ও যেন অনেক, অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে। প্রথম দিনেই অনেক আয়াশ করে ও আমাকে চুমু খেয়ে ছিল, ওর সেই চুমু খাওয়ার সহজ, স্বাভাবিকতার কোনো অর্থই আমি খুঁজে পাইনি তখন। কিন্তু আমার ঠোঁটে ওর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শে আমার রক্তে একটা দারুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ ও ওর ঠোঁট জোড়া আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরেছিল, মনে হয়েছিল যেন সমুদ্রের একটা বিরাট ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়েছে। আমি বেশ ভালো করেই তখন বুঝে গিয়েছিলাম যে আমাকে ও চুমু খায়নি ও চুমু খেয়েছিল রলফ কিংবা রুডলফকে। তবে আবার এও হতে পারে, ওই দুই নামে ওর পরিচিত কোনো পুরুষই ছিলো না ওর জীবনে, সবই ইসাবেলের কল্পনার জগতের।

তারপর থেকে প্রতি রবিবার পার্কে আসতো ইসাবেল। আর বৃষ্টি পড়লে গির্জা ঘরে মাদার সুপিরিয়রের উপাসনার পরেও আমাকে অর্গান প্রাক্টিস করার

অনুমতি দিয়েছিলেন। বৃষ্টির দিনে আমি গির্জা ঘরে অর্গান বাজাতাম আপন মনে। কখনো কখনো ইসাবেল এসে বসতো আধা অন্ধকার জায়গায়। বাইরে জানালার বৃষ্টির ফোটা পড়ার শব্দ আর গির্জা ঘরে অর্গানের মায়াজাল সৃষ্টি করা সুর তখন ইসাবেলকে স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে যেন কোন্ এক অজানা জগতে। সব সময়েই ও কেমন যেন তন্ময় হয়ে থাকতো। ওর কিসের অতো চিন্তা বুঝতে পারতাম না। সেই প্রায় অন্ধকার বিরাট গির্জা ঘরের দুই প্রান্তে বসে থাকি সঙ্গী বিহীন প্রাণীর মতো। রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ আর অর্গানের মিষ্টি সুর আমাদের দুজনের মধ্যে তখন সৃষ্টি করে রাখতো এক অনন্ত ব্যবধান। আমাদের দুজনের অবস্থা তখন অন্ধ, মূক ও বধির মতোন। অথচ আমরা কেউই অন্ধ, মূক বধির নই। কেন হঠাৎ ও আমার জীবনে এলো, ওর সঙ্গে কেনই বা এমন একটা অদ্ভুত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলো, তার মানে আজও বুঝতে উঠতে পারিনি। আমাদের দুজনের মধ্যে কতই না বাধা, ব্যবধান স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক, প্রকৃতিস্থ আর অপ্রকৃতিস্থের মধ্যে, সামাজিক বাধা নিষেধের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; অথচ এসব কথা দূরে সরিয়ে রেখে কেমন আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে আমি নিজের অজ্ঞাতেই একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি ওর দিকে। কিন্তু কেন এই উত্তরণ?

ইতিমধ্যে একজন সেরিকা এসে জানিয়ে গেলো, সুপিরিয়ার আমাকে ডাকছেন। হঠাৎ কেনইবা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, নিজেকে প্রশ্ন করি তবে কি ইসাবেলের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মেলমেশাটা উনি বুঝতে পেরেছেন? যাইহোক, ভয় বুকে চেপে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমার আশঙ্কা অমূলক। মাদার সুপিরিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, মে মাসের ধর্মীয় সংগীত শুরু করলে কেমন হয়। মে মাসের প্রতি সন্ধ্যার প্রতি গির্জায় ধর্মীয় সংগীতের চল আছে। তবে রোজ না করে এখানে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় গানের আসর বসাতে চান তিনি।

'একটা কথা আপনাকে বলে রাখি', বললেন তিনি 'আপনাকে সকালের জন্য যা দেওয়া হয়, ওই রকম টাকাই দেবো, তার বেশী কিছু দিতে পারবো না।'

'টাকার দাম তো দিনকে দিন খুবই কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে। কিন্তু এখানে মানুষ আসে ঈশ্বরের সেবা করতে, টাকার লোভে নয়, সে তো অস্বীকার করা যায় না।' উদার মনোভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মাদার সুপিরিয়ার আমাকে আশ্বস্ত করতে বললেন, 'তবে হ্যাঁ, হিজ রেভারেন্স রাতে নৈশভোজ এখানেই সেরে থাকেন। চাইলে আপনিও রাতের খাওয়াটা এখানে সেরে যেতে পারেন।'

ও'র এই কথাটা আমার মনে খুব ধরলো। আমি জানি এখানকার খাবার

এডুয়ার্ডের রেস্তোরাঁর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের হবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া প্রধান ধর্ম যাজকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার সৌভাগ্য কারই বা হয়? তাছাড়া ডিনারের টেবিলে ওঁর জন্য দু' এক বোতল ভালো মদ কি আর পরিবেশন করা হবে না? এই সব কথা মনে রেখেই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, আমি তাতেই রাজী।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন', বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বললেন মাদার সুপিরিয়ার।

পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম বাড়ি ফেরার জন্য। ওই তো কতো নিচে আমাদের শহরটা, শহরের সরু গলিগুলো পাহাড়ের ওপর থেকে এক একটা সরু ফিতের মতো দেখাচ্ছে যেন। তারপর ফাঁকা মাঠ, পুকুর, পাহাড়ী ঝরনা। দশ বছর আগে পর্যন্ত বাচ্চা ছেলের মতো পুকুরে মাছ ধরতাম, প্রজাপতি ধরতাম। কিন্তু সেই সর্বনাশা ১৯১৪ সালের যুদ্ধ যেন সব আমূল পাল্টে দিয়ে গেছে। সেদিনের সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। দুটি জীবন যেন সম্পূর্ণ আলাদা। তাই কি ইসাবেলের দুটি আলাদা আলাদা জীবন সত্তাকে চিনে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না। তবে ও নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক সুখী। কারণ সেই ভয়াবহ যুদ্ধে ট্রেঞ্চের মধ্যে অসহায় মানুষের মৃত্যু, নৃশংসতা, ক্ষুধা, প্রতারণা আর প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে নিচে নেমে যাওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের যা আছে, সেগুলোর সঙ্গে ইসাবেল একেবারেই পরিচিত নয়। আর সেই কারনেই বোধহয় আজকের এমন এক শান্তির পরিবেশেও মনের দিক থেকে আমরা ভীষণ অশান্ত ও অসুখী।

□ চার □

রাইজেনফেল্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাইজেনফেল্ডের সঙ্গে আমাদের আজকের লেনদেনের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। হাইনরিখ ক্রলকে কায়দা করে আমরা হটিয়ে দিয়েছি। এই আলোচনায় ও থাকলে আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে তাই উইলিকে দিয়ে জিন খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে হাইনরিখকে।

রাইজেনফেল্ডের কাছে থেকে যে দামী মালটা আমরা চাইবো, তার জন্য আগাম দেবার মতো টাকা আমাদের হাতে এখন নেই। তাই আমরা ঠিক করেছি, একটা তিন মাসের মেয়াদী হুণ্ডী ওকে দেবো। তার মানে কার্যত তাকে নগদে কিছুই দিতে হচ্ছে না। এই প্রস্তাবটা রাইজেনফেল্ডেরই। ফলে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। ও এলে আমরা ওকে রাজকীয় সম্মান দেবার চেষ্টা করি। তবু এ ব্যাপারে

চিন্তা করতে হচ্ছে আজ রাইজেনফেল্ডকে কি ভাবে আপ্যায়ন করা যায় বলো তো?' নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমি বললাম, 'ওর মন ভোলাবার মতো এবার তো আমাদের কাছে কিছুই নেই। অবশ্য ওর যা খাই তা সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাই তো চিন্তার কথা। হাতের কাছে তেমন কোনো সুন্দরী মেয়েও নেই যে ওর ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ কাহিনী শুনবে হাঁ করে।'

ঘাড় নেড়ে বললো জর্জ, 'তাছাড়া টাকা পয়সার অভাবে ভালো মদও কিনে রাখা হয়নি। সস্তা দামের মদে ওর আবার মন ভরে না—'

কথা শেষ হবার আগেই রাইজেনফেল্ডকে আসতে দেখা গেলো। স্বাগত জানালাম ওকে আমরা। একটা চেয়ারে বসে ও বললো, 'ও সব অভিনয় টভিনয় ছাড়ো তো এখন!'

'কেন, তাই তো করতে যাচ্ছিলাম, চাঁচাছোলা উত্তর আমার, 'কিন্তু তুমি যে আবার কবে থেকে আমাদের এই ভদ্রতাকে অভিনয় বলে ভাবতে শুরু করলে—'

'দেখো হে, ওসব ভদ্রতা টদ্রতায় আজকাল কোনো কাজ হয় না।'

'তবে কিসে হয় শুনি?'

'লোহার মতো শক্ত কনুই, আর রবারের মতো টানলে বড় হওয়া বিবেক।'

'কিন্তু মিঃ রাইজেনফেল্ড', এবার জর্জ মুখ খুললো, 'তোমার ভদ্রতা কিন্তু সবার প্রশংসনীয়।'

'তাই বুঝি? তা কোথাও ভুল করছো না তো?' মুখে ঠাট্টার ভাব দেখালেও মনে মনে সে কিন্তু খুব যে খুশি হলো তা বোঝা গেলো তার চোখ মুখের ভাব দেখেই।

জর্জ জিনের বোতল বার করলো।

'তা আজ কি খাবে রাইজেনফেল্ড?'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফুঁসে উঠলো রাইজেনফেল্ড, 'বড়দের কথার মাঝে ছোটদের কথা না বলাই ভালো হে ছোকরা! এই দেখো আমার এখন ছাপান্ন অথচ মনে হয় কয়েক বছর আগেও আমার বয়স ছিলো কুড়ি। হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। জর্জ, তোমার কি ধারনা?'

'ওই রকমই, মানে তোমার মতোই। কিন্তু আমার বয়স এখন চল্লিশ, অথচ দেখতে হয়ে গেছি যেন ষাট বছরের বুড়ো একজন।'

'আমার বেলায় কিন্তু তা খাটে না।' ওদের কথার মাঝে আগ বাড়িয়ে আমি বললাম, 'মাত্র সতেরো বছর বয়সে আমি যুদ্ধে যাই। এখন পঁচিশ, অথচ মনে হয় যেন এখনো সতেরোতেই আছি। সতেরো থেকে সত্তরের মধ্যে আর কি। যুদ্ধ আমার সব যৌবন লুঠ করে নিয়েছে।'

'তোমার বেলায় সেটা নয়। যুদ্ধ তোমাকে এঁচড়ে পাকিয়ে দিয়েছে। তা না হলে তোমার বয়স এখন বারোয় পেরোতো না।'

'তোমার এই সুন্দর প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।' রাইজেনফেল্ডের চোখে চোখ রেখে বললাম। 'তবে এও বুঝলাম যে, আজ আমাদের সুবিধে হচ্ছে না। আজ তোমার অন্য মেজাজ।' ওকে লোভ দেখাবার জন্য কবিদের ক্লাবে যেতে বললাম। কিন্তু সেখানে কোন মেয়ে কবি নেই জেনে ওর আগ্রহে ভাঁটা পড়ে গেল।

হার স্বীকার করতে যাচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ লিসার ঘরের জানালাটা খুলে গেল। পাতলা ফিনাফনে পর্দার ওপর ফুটে উঠলো শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরা লিসা। আলো জ্বালাতে যাচ্ছিলাম, খেঁকিয়ে উঠলো রাইজেনফেল্ড, 'আলোর দরকার নেই, ওই তো ওই জানালা থেকে আলোর ছটা কেমন ছড়িয়ে পড়েছে এখানে—তোমরা কি বলতো, কবিতা তোমাদের ভাল লাগে না? ওখানে আমি কবিতার উৎস দেখতে পাচ্ছি।'

জানালার কাছে গিয়ে দেখলো রাইজেনফেল্ড, লিসা তখন একটা টাইট জামা মাথা দিয়ে গলাচ্ছে। 'আহ! কি মোহিনীময়ী নারী ও। যেন সুন্দর একটা স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন। তা কে এই মেয়েটি?'

'স্নানরতা সুসানা', আমি রহস্যের মধ্যে ফেলতে চাইলাম ওকে।

ঠাট্টা ছাড়ো তো। চমৎকার এই মহিলা। ফরাসী রমণী হবে নিশ্চয়ই।' সবজান্তার মতো বললো রাইজেনফেল্ড।

আমি জানি বোহেমিয়ার মেয়ে লিসা। তবু ওকে খুশি করতেই বললাম, 'তা বলতে পারি না। তবে শুনেছি ওর নাম মাদামোয়াজেল দ্য লা তুর।'

'হতেই হবে!' রাইজেনফেল্ডের চোখের দ্যুতি উজ্জ্বল হলো। 'দেখলে আমার অনুমান কি রকম অব্যর্থ। আরে, মেয়েমানুষ দেখলেই আমি বলে দিতে পারি, কে হতে পারে সে।' নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো সে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এলো লিসা। আরে ওইতো রাস্তায় নেমে এসেছে লিসা। মুগ্ধ লোভাতুর দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে রাইজেনফেল্ড।

প্রচণ্ড ভীড় রেড মিল রেস্তেরাঁয়। শেষ পর্যন্ত অর্কেস্টার পাশেই আমাদের বসার জায়গা হলো। অর্কেস্ট্রা বাজছে, কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে। তাই আমরা বোবার ভূমিকায় বসে থাকতে বাধ্য হলাম।

উপচে পড়া ভীড়ে নাচের আসর থেকে সাদা সিল্কের পোশাক পরিহিত একটি মহিলা রাইজেনফেল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই উঠে গিয়ে তার সঙ্গে নাচতে শুরু করে দিলো সে। মেয়েটি স্পষ্টতই বিরক্ত ওর সঙ্গে নাচতে গিয়ে। 'কি মুশকিল, ও যদি আবার ওই মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাহলেই হয়েছে', প্রমাদ গুনলো

জর্জ'। 'এরই মধ্যে পাঁচ বোতল মদ শেষ। এই রেটে চললে আজ রাতেই আমাদের দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখতে হবে দেখছি।'

চিন্তার কিছু নেই, মেয়েটি এখানকার বারমেড। আমাদের সঙ্গে আহারে বসলে মদ পরিবেশন করবে কে তাহলে?' আমি ওকে আশ্বস্ত করতে বললাম।

ওদিকে মুখ লাল করে ফিরে এলো রাইজেনফেল্ড, ঘামছে ও। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও, 'চলনসই। তবে সেই জানালার ধারের কবিতাটি অসাধারন, কি তার ছন্দই, যা ভোলা যায় না ওকে। আমি কার কথা বলছি, বুঝতে পারছো তো?'

এই সময় হঠাৎ জোরে বাজনা বেজে উঠলো। নাচ বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ চমকে উঠলাম—এ কাকে দেখছি? ফ্যান্সি ড্রেস নাচের ভঙ্গিতে বাঁদরের মুখোশ পরে ভীড় ঠেলে আমারই প্রেমিকা এরণা এগিয়ে আসছে। ও আমাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ওর লাল চুল দেখেই দূর থেকে হলেও আমি ঠিক চিনতে পারলাম। ওহ্ কি বেহায়া মেয়ে ও। একটা ফাটকাবাজের কাঁধে হাত রেখে কেমন নিঃসংকোচে নাচের তালে হাঁটছে। রাগে উত্তেজনায় আমার সারা শরীর ফুলছে তখন। নাচতে শুরু করে দিল এরণা। হায় আমার কি দুর্ভাগ্য—এই মেয়ের জন্যই কি আমি দশ দশটা কবিতা লিখেছি? আর আমার অপ্রকাশিত কবিতার বই আবার ওকে উৎসর্গ করে বসে আছি। পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে বলে আজ এক সপ্তাহ হলো আমার সঙ্গে দেখা করেনি এরণা। পড়েছে ও ঠিকই, তবে ওই ফাটকাবাজ ছোকরাটার খপ্পরে পড়েছে ও। আর আমিও কি বোকা? আজ বিকেলেই ওর প্রেমে গদগদ হয়ে এক গুচ্ছ গোলাপী টিউলিপ ফুল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছি ওর কাছে, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা কবিতাও। আর সেই কবিতাটা ওই ফাটকাবাজ ছোকরাটাকে পড়ে শোনাতে গিয়ে দুজনে নিশ্চয়ই হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে উঠে থাকবে।

আমার মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখে রাইজেনফেল্ড বলে উঠলো, 'তোমার কি হলো? শরীর খারাপ নাকি?'

'ঘামছি', চিৎকার করে বলে উঠলাম। পরক্ষণেই আমার খেয়াল হলো, এরণা যদি আমাকে এখন এভাবে দেখে, ব্যাপারটা তাহলে খুব বিশ্রী দেখাবে। তার চেয়ে বরং ওই ছোকরাটার সঙ্গে ও নাচছে তাতে কি হয়েছে, ভ্রূক্ষেপ না করার ভান করলাম।

আড়চোখে জর্জ একবার আমাকে দেখে নিয়ে রাইজেনফেল্ডের উদ্দেশে বললো, 'তা তুমিও তো ঘামছো দেখছি।

'এ অন্য ঘাম। জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে ঘেমে ওঠা,' চিৎকার করে উঠলো রাইজেনফেল্ড।

ওদিকে নাচতে নাচতে এরনা এক সময় আমার কাছে চলে এসেছিল। আমার

আমার গলায় ঘামে ভিজছে। আমার চোখ মুখ আরক্ত। আমার প্রেমিকা আমার কাছেই আসছে শেষ পর্যন্ত। একটা চাপা উল্লাস অনুভব। মুহূর্তের সেই ভালো লাগা ভাবটা নিমেষে মিলিয়ে গেলো যখন দেখলাম, এরনা আমাকে আগে লক্ষ্যই করেনি, তাতে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লাম। একসময় নাচের আসর ভাঙতেই দেখলাম, এরনা তার নতুন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে একটা কেবিনে ঢুকে পড়লো। আমি তখন একেবারে ভেঙে পড়লাম।

আমার সেই অবস্থা দেখে রাইজেনফেল্ড তার স্বভাবসুলভ খোঁচা দিতে পিছপা হলো না। 'একটু আগে পর্যন্ত তুমি কি যেন ছিলে হে? সতেরো নাকি সত্তর?'

অন্য কথা পেড়ে তার সেই খোঁচাটা হজম করতে যাচ্ছি, এমন সময় স্টেজে সদ্য বিবাহিতা কনের সাদা পোশাক পরা রেণী দা লা ত্যুরকে উঠে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললাম, এরনাকে দেখাতে হবে, রেণীর সঙ্গে আবার ঘনিষ্টতা আছে।

রেণী তখন চড়া মেয়েলী গলায় একটা গান গাওয়ার পরেই খাদে নামিয়ে পুরুষালি গলায় গান ধরলো। তার গানে সবাই তখন মজে গেছে, মেতে উঠেছে, তার গান বেশ জমে উঠেছে।

'কেমন লাগছে মহিলাটিকে?' রাইজেনফেল্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'ওর সঙ্গে দেখা করছো? ও হলো মাদামোয়াজেল দ্য লা ত্যুর!'

'কি যা তা বকছো?' অবাক হয়ে বললো রাইজেনফেল্ড, 'ও আর সেই জানালার সামনে দেখা মেয়েটি? কার সঙ্গে তুলনা করছো? যাইহোক, এখন সামনে তাকিয়ে দেখো, কে আসছে?'

'হ্যাঁ, মিথ্যে বলেনি সে, ঠিকই বলেছে। সেই মুহূর্তে লিসা এসে ঢুকলো সেখানে। ওর দু'পাশে দুই ফুর্তিবাজ লোক। লিসাকে এমন ভাব করছিল, যেন দারুন শিক্ষিতা এক মহিলা সে।

'কি ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, মেয়েমানুষ আর পুলিশের হাঁটা চলা দেখেই রাইজেনফেল্ড সব বুঝতে পারে।' কথাটা বলে মুখ টিপে হাসলো জর্জ, কিন্তু নিজেও লিসাকে হাঁ করে দেখতে লাগলো।

স্টেজে দ্বিতীয় খেলা শুরু হয়ে গেলো। অল্পবয়সী একটি মেয়ে জিমনাষ্টিক দেখাচ্ছিল। আমাদের নজর লিসার ওপর।

'শ্যাম্পেন,' বেশ মেজাজের সঙ্গে বললো রাইজেনফেল্ড।

আমি আর জর্জ খরচার ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। 'এখানকার শ্যাম্পেন ভালো নয়—'

'বুঝেছি,' গর্জে উঠলো রাইজেন ফেল্ড, 'অর্ডারটা আমিই দিচ্ছি। এটা আমার তরফ থেকে।'

এরই মধ্যে বরফের বালতিতে ডোবানো সোনালী মুখের বোতল এসে গেছে।

লোলুপ দৃষ্টিতে শ্যাম্পেনের বোতলের দিকে তাকালো রাইজেনফেল্ড। অন্য মহিলাদের চোখেও পড়লো সেদিকে। আমরাও হাসিমুখে শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলতে যেতে গেলাম। একটু পরে উইলি এলো। নিয়মিত খদ্দের সে এখানকার। আমাদের পাশের খালি টেবিলটার সামনে সে বসতে না বসতেই রেণী দ্য লা ত্যুর সঙ্গে কালো সান্ধ্যপোশাকের একটি মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিলো উইলি 'গার্দা স্লিভার। ভেবেছিলাম, রাইজেনফেল্ড বুঝি আগ্রহে প্রকাশ করবে এদের সম্পর্কে। কিন্তু তা হলো না, ও এখনো লিসারই একনিষ্ঠ ভক্ত সেজে বসে আছে।

'ওকে নাচের সাথী করবে না?'

'না,' নিষেধ করলো জর্জ। কি কুক্ষনেই যে অফিসে তখন বলে ছিলাম লিসাকে চিনি না। এখন কোনো বাহানাতেই বুঝবে না ও, নিজের মনে ভাবলো জর্জ।

'তোমার নাচ করতে ইচ্ছে করে না?' হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসলো গার্দা।

'আমার নাচ ভালো হয় না। তালও ঠিক রাখতে পারি না।'

'আমারও ওই একই দশা। তবু চলো না, চেষ্টা করতে দোষ কি?'

নাচতে গিয়ে হঠাৎ গার্দা বলে উঠলো আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে, 'তোমরা তিনজন বন্ধু মিলে নাইট ক্লাবে এসেছো, অথচ বান্ধবী সঙ্গে আননি, এ কেমন ব্যাপার?'

'কেন আবার, আমার বন্ধু জর্জের ধারনা, ভেড়ারাই নাইটক্লাবে বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে আসে।'

'জর্জ কোন লোকটি? ওই নাক লম্বাটা?'

'না, টাকমাথায় লোকটি। হারেম পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ও। ও মনে করে, মেয়েরা ভালো জিনিষের তালিকায় পড়ে। তাই ভালো জিনিস কখনো বাইরে বার করা উচিত নয়, জৌলুস কমে যায়।'

'তা অবশ্য ঠিক। আর তোমার ধারণা কি শুনি?'

'আমার কোনো ধারণার বালাই টালাই নেই। হাওয়ায় ওড়া খড়কুটো আমি।'

'আঃ লাগছে, আমার পায়ের ওপর থেকে পা সরাও।' গার্দা মৃদু হেসে বললো, 'না, তুমি মোটেই খড়কুটো নও। তোমায় ওজন কম করেও পঞ্চাশ কেজী হবে।'

তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলাম। নাচতে নাচতে এক সময় চলে এসেছি এরনার

টেবিলের সামনে। এবার আমায় চিনতে পারলো ও। কিন্তু সেই ফাটকাবাজটার কাঁধ থেকে মাথা সরালো না। আমি তখন ওকে দেখানোর জন্য গার্দাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নিলো, তবে আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো এরনার দিকে, ওর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য।

একটু পরে হেসে উঠলো গার্দা, 'ছাড়ো আমাকে। আমার বুক দুটো তুমি কি থেঁতলে দেবে? না, এ ভাবে তোমার কোনো লাভ হবে না তোমার ওই লালচুলের মেয়েটার ব্যাপারে।' আমার গালে গার্দা তার গাল ঘষতে ঘষতে বললো, 'তুমি তো সেই চেষ্টাতেই আছো, তাই না?'

'না, তা কেন হতে যাবে?' আমি মিথ্যে করে বললাম বটে, কিন্তু আমি তখন জেনে গেছি, গার্দার কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। ফিরে এলাম আমাদের টেবিলে। মাথা উঁচু করে বসলাম বটে, কিন্তু আমার সারা দেহ মন তখন লজ্জায় ডুবে গেছে।

এদিকে শ্যাম্পেনের প্রতিক্রিয়া তখন শুরু হয়ে গেছে জর্জ আর রাইজেনফেল্ডের মধ্যে, ওরা তখন দুজনে তুই তোকারি করছে। অবশ্য আজ রাতটা কাটলেই কাল সকালে দুজনেই সব কিছু ভুলে যাবে। এক সময় রাইজেনফেল্ড বলে উঠলো, 'চলো, এবার ওঠা যাক।' হঠাৎ ওর চলে যাওয়ার বাহানার কারণটা হলো, লিসাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে চলে যাওয়ার জন্য। গান বাজনাও শেষ তখন।

চলে আসবার সময় টুপি কোট নেবার জায়গায় গিয়ে দেখি আমি ঠিক এরনার পাশেই গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাকে দেখে নীরস গলায় ও বললো, 'এ ভাবে যে আমার চোখে আজ তুমি ধরা পড়ে যাবে, ভাবতেও পারেনি, তাই না?'

'বাঃ, তুমি আমাকে ধরেছো, নাকি তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গেছো?'

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললো এরনা, 'আহ্। সঙ্গিনীর ছিরি কি? তা শেষ পর্যন্ত এক নর্তকীর খপ্পরে পড়লে তুমি? 'এরনা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠলো, 'না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না না। এর মধ্যে তুমি আবার কি রোগ বাধিয়ে বসে আছো, কে জানে।'

আমি ওকে ছোঁবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। খোঁচা দিয়ে বললাম, 'তোমার ওই ঠুনকো দেহের স্পর্শ পাবার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে এসেছি আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু তুমি, তুমি কেন এসেছো এখানে?'

'ব্যবসা?' আমার কথার জের টেনে তীক্ষ্ণ গলায় বললো এরনা, 'এখানে আবার ব্যবসা? কেন, কে আবার মরলো?

'কেন, দেশের মেরুদণ্ড, গরীব লোকেরা। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এদের কবর দেওয়া হচ্ছে। আর তাদের কবরের ওপর যে স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হয়, তার আর এক নাম ফাটকাবাজার।'

ফাটকাবাজারের কথা শুনে ওর মুখের ভাবটা কেমন বদলে গেলো। 'কি করে যে ওই লোকটার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম,' এরনা যেন আমার কথা শুনতে পায়নি, এমন ভাবে বললো, 'আজই তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেলো হের বোদমার।'

'আজ বিকেলে কে বলেছিল, মাথা ব্যথার জন্য বাইরে বেরোতে পারবো না,' আমি এবার ফুঁসে উঠলাম, 'আর এখন একটা ফাটকাবাজের সঙ্গে দিব্যি লটর পটর করে বেরাচ্ছো? বাঃ বেশ, বেশ।'

একথায় ভীষণ রেগে উঠলো এরনা। 'চুপ করো নকল কবি। তুমি, তুমি একটা অভদ্র ছোটলোক! মনে রেখো, মৃত কবির কবিতা নকল করলেই কবি হওয়া যায় না।'

'বাজে কথা রাখো তো। জানো, আমি এখানে এসেছি দুজন সৎ ব্যবসায়ীর সঙ্গে। আর তুমি, তুমি এসেছো কার সঙ্গে, পরিচয় দিতে পারো তার?' ওর পথ আগলে দাঁড়ালাম ওর মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার জন্য।

'আরে, তুমি আমাকে কি ভেবেছো, ভাঁটিখানার বেশ্যা নাকি? পথ ছাড়ো। এতো রাতে রাস্তায় একা একা ফিরতে হবে না আমাকে?'

'তোমার এখানে আসাই উচিত হয়নি।'

'বাঃ বাঃ এরই মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেলো হুকুম করা? এরপর কি বলবে, মোজা সেলাই করো! আমি এখানে বীয়ার খেলাম, আর উনি দামী শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করে এলেন।' এরনার গলায় অভিমান ঝরে পড়তে দেখা গেলো।

'শ্যাম্পেনের খরচ জুগিয়েছে রাইজেনফেল্ড।'

'আহ! যেন অবোধ শিশু! শোনো, আমার পেছনে লাগবার চেষ্টা করবে না। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ।'

ইতিমধ্যে এরনার সেই ফাটকাবাজ সঙ্গীটি ওর কোট আর টুপি হাতে নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং জর্জও। জর্জকে দেখে আমি বলে উঠলাম, 'ওর কথা শুনলে তো?'

জর্জ মাথা নেড়ে সায় দেয়, হ্যাঁ, শুনেছে সে। উত্তরে জর্জ বললো, 'মেয়েদের সঙ্গে কখনো তর্ক করতে যেও না।'

বাইরে এসে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় রাইজেনফেল্ডের মেজাজ তখন বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। বললো সে, 'বাড়িতে ভালো কফি খাওয়াবে তো?' জর্জ মাথা নাড়লো।

বাড়িতে ঢুকেই সেই বিশ্রী দৃশ্যটা দেখতে হলো—সার্জেণ্ট মেজর নোপক আজ রাতেও আমাদের সেই কালো অবিলিস্কের গায়ে প্রস্রাব করছে।

'আঃ সার্জেণ্ট মেজর, এসব কি হচ্ছে ?' আমি বিরক্তি চাপতে পারলাম না।

'কেন, ঈশ্বর তো তোমার চোখ দিয়েছেন, দেখতে পাচ্ছো না কি করছি', জড়ানো গলায় বললো নোপক।

কথা না বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এক বালতি জল নিয়ে এসে পাথরটা ধুয়ে দিলাম।

তর সইছিল না রাইজেনফেল্ডের। ঘরে ঢোকা মাত্র লিসার জানালার দিকে তাকালো সে। হতাশ গলায় বললো সে, 'দেখছি এখনো ফেরেনি ও। ফিরবে নিশ্চয়ই, অপেক্ষা করা যাক, কি বলো ?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করার ফাঁকে আমাদের ব্যবসার ব্যাপারটা সেরে ফেললে হতো না ?' সুযোগ বুঝে কথাটা বললো জর্জ।

'অবশ্যই।'

আমাকে এখন রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরী করতে হবে। আর যতক্ষণ না জর্জের ডাক পাই, ফিরতে পারবো না। ওদিকে কফিন প্রস্তুতকারক উইলকির ঘর থেকে হাইনরিখের নাক ডাকার গর্জন ভেসে আসছে এখানে। বেচারা!

জানালার ফ্রেমে দূরের আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে রক্তিমাভা ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। একটা অভিশপ্ত রবিবার শেষ হওয়ার ইঙ্গিত সেটা।

□ পাঁচ □

কবরের জন্য পাথর কিনতে এসেছে শোকের পোষাক পরা এক মহিলা। ওর মৃত স্বামীর কবরের জন্য পাথর কিনতে এসেছেন উনি। কবরের মাথার দিকে যে পাথরের ফলক লাগানো হয়, সেগুলোর দিকে মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'আজকাল এগুলো খুব চলছে, নিতে পারেন—'

'হ্যাঁ, এরকমই চাইছি আমি। কিন্তু অনুমতি পাবো কিনা জানি না।'

'কেন আপনার স্বামীর কবরে আপনি কি ধরণের পাথরের ফলক বসাবেন, তার অনুমতি নিতে হয় নাকি আজকাল ?'

'সমাধিটা যে গির্জার কবরখানায় নেই।'

'কিন্তু কেন ওখানে স্থান হলো না বলুন তো ?'

'আমার স্বামী আ—আত্মহত্যা করেছিলেন বলে', কথাটা বলেই ভদ্রমহিলার চোখে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেলো। চোখের জল সম্বরণ করে ভয়ে ভয়ে তিনি আরও বললেন, 'ক্যাথলিক গির্জার কবরখানার পবিত্র জমিতে এধরণের মৃত মানুষের কবর দেওয়া নাকি চলে না। এটাই নিয়ম।'

'যতো সব বাজে নিয়ম।' রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাজকদের যতো সব মনগড়া উল্টোপাল্টা বিধান। তা আপনার স্বামীকে কবর দিয়েছেন কোথায় ?'

'গির্জার কবরখানার বাইরে। শুনেছি, সরকারী কবরখানায় অনেক বাজে লোকদের কবর দেওয়া হয়। অথচ আমার স্বামী খুবই ধর্মভীরু লোক ছিলেন।'

'তাহলে কেনই বা তিনি এমন কাজ করতে গেলেন ?'

'অর্থাভাবে। আমার প্রথম পক্ষের মেয়ের বিয়ের পণ বাবদ ব্যাংকে স্থায়ী আমানত গচ্ছিত ছিলো। সেই টাকাটা দু'সপ্তাহ আগে ব্যাংক থেকে তোলা হয়। আমার মেয়ের ভাবী স্বামী টাকার অংকটা জানতে পেরে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার মেয়ে নীরবে কেঁদেছিল শুধু। আমার স্বামী তার কান্না সহ্য করতে পারেন নি। ওঁর ধারণা হয়েছিল, উনি যদি আরো বেশী কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমাতে পারতেন, তাহলে বোধহয় এ বিয়ে ভাঙ্গতো না।'

'এই যদি হয়, তাহলে তো স্বীকার করতেই হয় যে, আপনার স্বামী কোন অন্যায় কাজ করেন নি। এটাকে অপরাধের পর্যায়ে ফেলা যায় না।'

ভদ্রমহিলা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। তাহলে আপনি বলছেন, পবিত্র জমিতে কবর না দিলেও সমাধি তৈরী করা যেতে পারে ?'

'অবশ্যই। তবে সরকারী পারমিট থাকা চাই।'

এবার একটু ইতস্ততঃ করে ভদ্রমহিলা মাঝারি ধরণের একটা ছোট পাথর দেখিয়ে বললেন, 'ওটার দাম কতো ?'

'এক লাখ মার্ক।'

'না, অতো টাকা তো দিতে পারবো না আমি।'

সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন ভদ্রমহিলা। গরীব মানুষরা কম দামের পাথরের দাম আগে কখনো জানতে চায় না, বোধহয় তাদের সম্মানে বাধে। তবে শেষ পর্যন্ত সব থেকে কম দামের পাথরই কেনে তারা। ভদ্রমহিলা ইচ্ছের কথাটা প্রকাশ করতেই বললাম, 'তাহলে ওই বেলে পাথরটাই নিন। দাম পড়বে চল্লিশ হাজার মার্ক। আপনার স্বামীর নামধামটা অমর করে রাখাই তো আপনার আসল উদ্দেশ্য, তাই না ?'

'হ্যাঁ, এটাই আমার পছন্দ। কিন্তু—'

'এর মধ্যে আর চিন্তার কিছু নেই। সোনালী বর্ডার দেওয়া আর নাম লিখনের জন্য বাড়তি খরচ আপনার লাগবে না। আপনার জন্য এটুকুও কি আর করতে পারবো না ? কবরের পাশে বিনা পয়সায় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়েও দেবো।'

ভদ্রমহিলা হু হু করে কেঁদে ফেললেন আবার। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি ছাড়া অন্য কেউ নাকি তাঁর সঙ্গে একটুও ভালো ব্যবহার করেনি। তারপর সামলে নিয়ে তিনি সযত্নে পাট করা দু'বাণ্ডিল নোট বের করে বললেন, 'গুণে নিন।'

'দরকার হবে না। ঠিকই আছে বলে আমার বিশ্বাস।' আমি জানি এখানে আসার আগে হাজারবার গুনেছেন নোটগুলো উনি। এমনো হতে পারে, পরের মাসের বাড়ি ভাড়ার টাকাটাও রেখে আসতে পারেননি উনি ও'র বাড়িতে। শেষ সম্বলটুকু মানুষ অতি যত্ন সহকারেই রেখে থাকে।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর কয়েক পেগ জিন গলাধঃকরণ করলাম। মানুষের উপকার করতে পেরে হঠাৎ আমি যেন একটু উদার হয়ে গেছি, ওদিকে রাইজেনফেল্ডকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেছে জর্জ। ওর ওপরেই আমাদের ব্যবসা চলবে কিনা, সেই প্রশ্নটা নির্ভর করছে।

'মাত্র ছয় সপ্তাহের ক্রেডিট দেবে রাইজেনফেল্ড, ব্যাংক থেকে ফিরে এসে খবরটা জর্জ দিলে আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম।

আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেললো জর্জ। 'শোনো, ছ'সপ্তাহ শুনে হতাশ হবার কিছু নেই। এক মাস পরেই রাইজেনফেল্ড আবার আসবে। তখন নতুন করে আবার একটা চুক্তি হবে।'

'ও সত্যিই আসবে তো?'

'হ্যাঁ, আসতে বাধ্য ও', মুচকি হেসে বললো জর্জ 'অন্তত লিসার টানে নিশ্চয়ই আসবে ও।'

'আমাদের ভাগ্য ভালো যে, দিনের আলোয় লিসাকে দেখেনি ও।' আমি বললাম।

'তাতে কিছু এসে যেতো না,' উত্তরে দার্শনিকের মতো বললো জর্জ', 'দিনের আলোয় সব মেয়েকেই অন্য রকম লাগে, এমন কি অতি সুন্দরী মেয়েকেও!'

আজকাল জর্জের কথাবার্তা শুনে, বিশেষ করে লিসার ব্যাপারে, ওর ওপর জর্জের নজর পড়েনি তো? না, অতো নিচে নামবার লোক নয় জর্জ। কারণ আমাদের মধ্যে একমাত্র ওই-ই সমাজের উঁচু তলার খোঁজখবর রাখে। বার্লিনের খবরের কাগজ পড়ে, শিল্প সংস্কৃতির বিষয় আগ্রহ দেখায়। ও'র এক বন্ধু লন্ডন থেকে মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকা পাঠায়। যদিও ফ্রান্স ছাড়া বিদেশের অন্য কোথাও যায়নি সে এখনো, তাও ওর সেই যাওয়া যুদ্ধে। বার্লিনও নিজের চোখে দেখা হয়নি ওর এখনো। তবু বলবো যে, আমাদের সবার চেয়ে ওর রুচি অনেক বেশী মার্জিত।

কাজের কথা সেরে নিয়ে হঠাৎ জর্জ বলে উঠলো, 'সাত সকালে মদ গিলতে গেলে কেন? গন্ধ বের হচ্ছে। আশাকরি এরনার জন্য নিশ্চয়ই নয়?'

'না, মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আজ সকালেই একটু···জানি সবাইকে মরতেই তো হবে একদিন।' সকালের সেই ভিরু পায়রার মতো মহিলাটির ম্লান বিবর্ণ মুখ ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে।

'ঠিক বলেছে। এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে মৃত্যু চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক। আমার মতো জর্জও কেমন উদাস হয়ে গেলো।

তখন সন্ধ্যা নামতে একটু দেরী, খবরের কাগজে মৃত্যু সংবাদগুলো মনযোগ সহকারে পড়ছিলাম, প্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে সযত্নে তুলে রাখাই আবার কাজ, করতে বেশ ভালোই লাগে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। এখানে সবাই এক, সবাই স্নেহপ্রবণ পিতা, দরদী স্বামী, আদর্শবান সন্তান, স্নেহময়ী মাতা, দাদামশাই—দিদিমা। এখানে ব্যবসায়ীরা তাদের খদ্দেরদের প্রতি একনিষ্ঠ সৎ, সেনাপতিরা অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের এখানে প্রত্যেকেই প্রয়াত আত্মাকে প্রায় স্বর্গীয় পর্যায় তুলে ধরে। সবাই যেন হৃদয় উজার করে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করে মৃতের প্রতি। কিন্তু সত্যি কি এদের আসল রূপ এটাই?

এই যে পাউরুটিওলা নাইবুরের প্রসঙ্গেই আসা যাক না কেন। নাইবুরের মৃত্যুর খবরটা আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। খবরে প্রকাশ, নাইবুরকে এক অতি সহৃদয়, বিবেকবান, প্রেমিক স্বামী ও স্নেহশীল পিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কতো মিথ্যে যে লুকিয়ে আছে নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় খবরটাই সত্য বলে মনে হতো আমার। আমি নিজের চোখে চামড়ার বেল্ট হাতে নাইবুরকে তার স্ত্রীর দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। আর সে তার ছেলে রোলাণ্ডের হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল তাকে বেধরক পিটিয়ে। অথচ মৃত্যুর পরে কতোই না মহৎ হয়ে উঠেছে সে তার স্ত্রী পুত্রের কাছে। মৃত্যুকে ঘিরে মানুষ কতই না মিথ্যে ভীষণ দিয়ে থাকে। আশ্চর্য। জীবিত অবস্থায় যাদের কাছে সে ছিলো শয়তানের প্রতিভূ মৃত্যুর পরে তারাই তাকে দেয় ঈশ্বরের মর্যাদা। সম্পর্ক যাইহোক না কেন, যতো তিক্তই হোক না কেন, মানুষ যে আজও সৎ, সুন্দর ও মহত্তের পুজারী, এই সত্যটা পদে পদে উপলব্ধি করা যায় মৃত্যু-সংবাদগুলো পাঠ করলে। তখন আমি মনুষ্যজাতি সম্পর্কে খুবই আশাবাদী হয়ে উঠি। আরো সাতটি মৃত্যু সংবাদের কাটিং আমি কেটে রেখেছি আমার কাছে। তবে নাইবুরেরটা আলাদা করে রেখে দিলাম হাইনরিখের জন্য—এটার ব্যাপারে ও যা করবার করবে।

জর্জ চলে গেলো নিজের ঘরে। আজকের মতো কাজ শেষ করে আমার ঘরের জানালাটা খুলে দিলাম। আমাকে দেখে লিসা লাল গোলাপের একটা বড় তোড়া আমাকে দেখালো, একটা চুমোও ছুঁড়ে দিলো আমার উদ্দেশে। এটা নিশ্চয়ই জর্জের কাজ। তাই আমি ওর ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। লিসা তখন জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ফুলগুলোর জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের আচরন শকুনের মতো, আবার কখনো বা প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠো।'

এর পরেই একটা চিঠি পড়ে শোনালো লিসা : 'শ্রদ্ধেয়া, আপনার রূপে আমি ভয়ঙ্কর মুগ্ধ। খুশিতে এই গোলাপগুলো আপনার চরণে অঞ্জলি দিলাম।' হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে হাসলো লিসা। '৫নং হ্যাকেন স্ট্রীটের সার্সি'তে'—আচ্ছা সার্সি' কি বলো তো?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো লিসা।

'এক ধরণের মোহিনী মায়া হলো সার্সি', পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয় তারা।' শব্দ করে হাসলো ও।

এটা কিন্তু জর্জে'র কাজ নয়, এই ভেবে জানতে চাইলাম, 'কে লিখলো চিঠিটা?'

'আলেক্স রাইজেনফেল্ড। সেই যে বেঁটে ষাঁড়টি, কাল যে তোমাদের সঙ্গে নাইট ক্লাবে গিয়েছিল?'

'ওকে তুমি ষাঁড় ভেবো না, ও একজন কোটিপতি।'

লিসার মুখের ভাব বদলে গেলো। কি ভেবে মৃদু হেসে চলে গেলো ও। আর আমিও অকারণ এরণার কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে শুরু করলাম ফুর্ট' বাকের স্টুডিওর দিকে। গীটার বাজাচ্ছিল ও। পেছনে সদ্যসমাপ্ত সেই সিংহমূর্তি'টা। এটা একটা পার্টি'র ফরমাস।

'আচ্ছা কুর্ট', কেউ যদি তোমার ইচ্ছাপূরণ করতে চায়, তখন তুমি কি চাইবে?'

'এক হাজার ডলার', মুহূর্তে'ও সময় নষ্ট করতে চাইলো না কুর্ট'।

'ফুঃ আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি একটা ভাবজগতের মানুষ।'

'আরে আমি তো তাই। আর সেই জন্যই তো হাজার ডলারের খুব দরকার আমার। ওই টাকায় একটা বড় ফ্ল্যাট বাড়ি কিনে ওগুলো ফিরে ভাড়া দিয়ে দেবো। তারপর সেই বাড়ি ভাড়ার টাকায় বসে বসে খাবো, আর সুদের টাকায় মৌজ করে গান বাজনা করবো।'

থাকতে না পেরে আমি তখন বললাম, 'তুমি বাড়ি ভাড়ার টাকায় খাবে? আমি ভাবতেও পারি না কুর্ট', তুমি একটা স্থূল প্রকৃতির লোক!'

'হ্যাঁ, দিনরাত শুধু সিংহ আর ঈগলের মূর্তি' গড়তে আর ভাল লাগে না আমার।

'তাহলে কি তোমার ভাল লাগে শুনি?'

'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন', কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই চটজলদি উত্তরটা দিয়ে দিল কুর্ট'।

না, ছলনাময়ী নারীর চিন্তা ভুলতে হলে জর্জে'র মতো সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা যায় না রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তাই অগত্যা বাড়ী ফিরে এলাম।

দূরে থেকে দেখলাম গেটের সামনে লিসা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হাতে সেই গোলাপের তোড়া। কাছে যেতেই ও বলে উঠলো, 'ধরো এগুলো, এসবের আমার দরকার নেই।'

'তাহলে কি তোমার দরকার শুনি ?'

'গহনা', পাল্টা প্রশ্ন করলো লিসা, 'তা তুমি কি ভেবেছিলে ?'

'পোশাকে হয় না ?'

'হয়, কেনই বা হবে না ? তবে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হলে পরে।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললো লিসা, 'তোমার মেজাজ আজ খারাপ মনে হচ্ছে, দেবো নাকি একটু চাঙ্গা করে ?' বলে মুচকি হাসলো ও।

'ধন্যবাদ, চাঙ্গাই আছি আমি। বরং তুমি চাঙ্গা হতে চাইলে নাইটক্লাবে চলে যেতে পারো।'

'না, আমি নাইটক্লাবের কথা বলছি না', বলল লিসা, 'আচ্ছা তুমি কি পাগলদের আশ্রয়স্থলে এখনো অর্গান বাজাও ?'

'হুঁ।' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি, তুমি জানলে কি করে ?'

'খবর তো হাওয়ায় উড়ে আসে।' রহস্য করে বললো লিসা। ওখানে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে। নিয়ে যাবে তুমি আমাকে একদিন ?'

'আমাকে নিয়ে যেতে হবে না, দেখবে একদিন তুমি নিজেই চলে গেছো সেখানে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের মধ্যে কে ওখানে আগে যাবে', সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা ফিরিয়ে দিয়ে বললো লিসা, 'নাও, এই ঘাস-পাতাগুলো ফেরৎ নাও। আমার কর্ত্তাটির আবার ভীষণ হিংসে। ক্ষুরের ফলার মতো হিংসে।

হিংসে ক্ষুরের ফলার মতো হয় কিনা জানা নেই আমার, কিন্তু ওর ওই উপমাটা আমার খুব পছন্দ হলো। বললাম, 'কর্ত্তার যখন এতোই হিংসে, রাতে নাইটক্লাবে যাও কি করে ? এতো সব দামী দামী গহনা পোষাক কোত্থেকে পাও তার কৈফিয়ত দাও কি করে ?'

'আরে সব স্বামীরাই বুদ্ধু' নকল গহনা বলে তাকে আরো বোকা বানিয়ে দিই।' লিসা চলে গেলো ফুলের তোড়াটা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে।

ঘরে ফিরে এসে মনে হলো, রাইজেনফেল্ড বেশ দামী জিনিষই উপহার দিয়েছিল লিসাকে। কম করেও পঞ্চাশ হাজার মার্ক তো হবেই। গতকাল রাতে এরণার সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করা যে আমার উচিত হয়নি, এখন উপলব্ধি করতে পারছি—ওরও তো হিংসে হতে পারে। ওর কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। দ্রুত কয়েক লাইনের একটা চিঠি লিখে ফেলে আমাদের মালিকের বংশধর ফ্রিৎস ক্রলকে ডাকলাম, তার বয়স বারো হবে।

'কি হে বৎস, দু'হাজার মার্ক রোজগার করবে ?'

'বুঝেছি, সেই ঠিকানায় যেতে হবে তো ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো তুমি।' সেই গোলাপের তোড়া আর আমার চিঠিটা নিয়ে ফ্রিৎস চলে যাওয়ার পর ভাবলাম—আশ্চর্য, ফুর্ট, লিসা, ফ্রিৎসকে না পাঠালেই

বোধহয় ভালো ছিলো।

বাইরে থেকে বেরিয়ে ফিরে যখন এলাম, তখন আকাশ ভরা গ্রহ তারা। আর টেবিলের ওপর সেই ফুলের তোড়াটা, আমার পাঠানো চিঠিটা, খামটা খোলা পর্যন্ত হয়নি। আর সেই সঙ্গে ফ্রিৎসের ছোট্ট একটা চিরকুট—'মহিলাটি আপনাকে উপদেশ দিয়েছেন, গলায় দড়ি দিতে।—ইতি ফ্রিৎস।"

রাগে, অপমানে, লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকতে হলো অনেকক্ষণ। কিন্তু এ ভাবে নতিস্বীকার করতে মন চাইলো না। তখনি আর একটা চিরকুট লিখে আমি চলে গেলাম বেড় মিল নাইটক্লাবে। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে গেলাম, এটা পাঠিয়ে দিও ফ্রাউলিন গার্দা স্নিকারকে।

অবজ্ঞা ভরে দারোয়ান বললো, 'এটা চাকর বাকরদের কাজ।' 'বেশ তো তুমি যা মনে করো তাই। যাইহোক, কাজটা আমার করে দিও।' গার্দার কাছে পাঠিয়ে আশ্বস্ত হলাম। এবার এরনা এসে নিজের চোখে ওকে আমার সঙ্গে দেখুক।

বিক্ষিপ্তভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে এক সময় বাড়ি ফিরে এলাম।

□ ছয় □

গাছের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে নিটোল গোল চাঁদটা উঁকি মারছে। আজ বেশ গরম। আমি আর ইসাবেল বাগানের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসেছিলাম।

'রুডলফ, আমাকে ছেড়ে তুমি আবার কোথায় চলে গিয়েছিলে বলো তো?'

রুডলফ! যাক, আজ রল্‌ফ বলে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দেয়নি ও। তাই খুশি হয়ে বললাম, 'কই আমি তো তোমাকে ছেড়ে যাইনি। এই তো আমি আছি আজও তোমার, শুধু তোমারি জন্য। মাঝে ক'দিন একটু বাইরে গিয়েছিলাম, এই যা—'

'কেন?'

'তা তো জানি না। আমরা তো অনেক কাজই করে থাকি আগে থেকে কারণ না জেনেই—'

'জানো রুডলফ, কাল রাতে তোমাকে আমি কতো না খুঁজেছিলাম। সেই সময় আকাশে একটা অদ্ভুত চাঁদ ছিলো। আজকের মতো এমন লাল, চঞ্চল ছিলো না। অতি শান্ত ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ সেই চাঁদ, যা তুমি এক চুমুকে অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারো।'

'কিন্তু ইসাবেল, চাঁদকে কি খাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, খাওয়া যায় বৈকি। জলের সঙ্গে, অতি সহজেই। তবে সে সময় আলো

জ্বালা চলবে না, জ্বালালেই চাঁদ হারিয়ে যাবে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু জলের সঙ্গে খাবে কি করে?'

হাতটা বাড়িয়ে দেখালো ইসাবেল, 'জানালা গলিয়ে গ্লাসটা এই ভাবে আকাশের নিচে মেলে ধরবে। দেখবে তখন চাঁদ এই গ্লাসের মধ্যে ধরা পড়ে গেছে আলোয় ভরে গেছে সারা গ্লাসটা।'

'তুমি কি চাঁদের ছায়ার কথা বলছো?'

'না, ছায়া নয়। গোটা চাঁদটাই গ্লাসের ভেতরে থাকে। কিন্তু ছায়া বলতে তুমি কি বোঝ?'

'এই যেমন ধরো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখা, সেটাই তো ছায়া। সব মসৃন জিনিষের ওপরেই ছায়া পড়ে থাকে, এমন কি জলেও।'

'হয়তো তাই হবে।'

'না, তাই হবে না, আমার কথাটাই ঠিক। আর তুমি যা দেখো, সেটা তুমি নও, কেবল তোমার ছায়া মাত্র।'

'আয়নার ধর্ম কি?'

'কাছে যা থাকে তারই প্রতিফলন আয়নায় দেখানোই তার কাজ বা ধর্ম যাই বলো না তুমি কেন।'

'আর কিছু যদি না থাকে?'

'না, কিছু তো একটা থাকতেই হবে।'

'কিন্তু রাতে যখন আকাশে চাঁদ থাকে না, শুধু অন্ধকারে ভরে থাকে, তখন আয়নার কিসের ছায়া পড়ে?'

'অন্ধকারের।' বললাম বটে, কিন্তু নিজের এই উত্তরটার ব্যাপারে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। প্রতিফলনের জন্য সত্যিই তো আলোর প্রয়োজন।

'আর পুরোপুরি অন্ধকার হলে আয়না কি তখন মরে যায়?'

'না, তা কেন হবে? ওরা তখন ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে, আমাদের স্বপ্ন দেখে। আমাদের ডানদিক হলে ওদের বাঁদিক, আর ওদের বাঁদিক মানেই আমাদের ডানদিক।'

ইসাবেল আবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাহলে ওরা আমাদের উল্টোদিক? কিন্তু একটু আগে তুমি না বললে যে, ওদের মধ্যে কিছু থাকে না, অথচ এখন বলছো, ওরা আমাদের উল্টোদিকে থাকে।'

'তা তো বটেই। তবে যতক্ষণ সামনে থাকি। আয়নার সামনে থেকে সরে গেলে আর থাকে না। আমি আবার বলছি, আয়নার কিছুই থাকে না।'

'তা তুমিই বা এতো জোর দিয়ে বলছো কেন? তুমি চলে যাবার পর তো আর ফিরে দেখার কথা ভাবো না।'

'আমি না এলেও অন্য লোকেরা যারা আসে, তারাও দেখতে পায় না। তারা তখন আয়নায় কেবল নিজের ছবিটাই দেখতে পায়।'

'কেন, ওরা নিজেদের ছায়া দিয়ে আগেকার ছায়া ঢেকেও তো ফেলতে পারে। তখন আমার ছায়াটা যায় কোথায় শুনি? ওখানেই থাকতে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই।' অপরাধীর মতো বললাম, 'আয়নার সামনে তুমি আবার ফিরে তখন নিজের ছবিটাই দেখতে পাবে আবার।'

আমার এই কথায় দারুন উত্তেজিত হয়ে ইসাবেল বললো, 'আরে এই কথাটাই তো আমি বলতে চাইছি সেই কখন থেকে। তাহলে কেনই বা তুমি বলতে গেলে ছায়াটা ওখানে ছিলো না?'

হঠাৎ আমার কাঁধ ভর দিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলো ইসাবেল, 'তাহলে কি আমি যতোগুলো আয়নায় নিজেকে দেখেছি, সব কটাতেই আমার এক একটা অংশ রয়ে গেছে সেখানে? ওরা কি প্রত্যেকে আমার এক একটা অংশ ধরে রেখেছে নিজেদের মধ্যে? তাহলে আমার নিজের বলতে কিই বা অবশিষ্ট রইলো?'

'তা কেন হবে? তোবার সবটাই তোমার মধ্যেই রয়ে গেছে। আয়না কিছুই নেয় না, বরং ফিরিয়ে দেয়। আসলে আমাদেরই একটা অন্ধকার থেকে আলোকিত অংশকে প্রতিফলিত করে আবার আমাদেরকেই আবার দেখায়।'

'তার মানে আমারি অংশ দেখায়?' ইসাবেলের মন থেকে সন্দেহ তবু যায় না, ও বলে, 'কিন্তু ধরো তা যদি না হয়? মনে করো হাজার হাজার আয়নার তলায় চাপা পড়ে আছি আমি? আমি হারিয়ে গেছি একেবারেই। আয়নায় প্রথম দেখা আমার সেই মুখটা কি আজও তেমনি আছে? এক একটা আয়না কি আমাকে টুকরো টুকরো করে চুরি করে নেয়নি?'

'না ইসাবেল, কেউ তোমাকে চুরি করেনি। তুমি ছিলে, তুমি আছো, আর তুমি থাকবেও, আমারি হয়ে, ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবলাম, এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে বোধহয় ভালো হবে, এই পরিবেশে ওর সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য বললাম, 'চলো ইসাবেল, ওই ধারটায় চলো, ওখানে অনেক আলো, ওখানে কোনো আয়না নেই, ওখানে তোমার হারিয়ে যাওয়ারও ভয় নেই।

কথা না বলে ও আমার কাঁধে মাথা রাখলো। আমি ওর নাক মুখ চোখের স্পর্শ অনুভব করলাম। ওর জন্য গভীর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো আমার বুকটা। একরকম জোর করে ওকে বাইরে টেনে আনলাল। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, মাঝে মাঝে ওর দেহের স্পর্শ পাচ্ছি, ওর শরীরের ঘ্রাণ আমার নাকে এসে লাগছে যখন তখন যেন এক অদ্ভূত অনুভূতিকে তন্ময় হয়ে যাচ্ছি। অথচ আমি জানি, আমরা একই গ্রহের মানুষ হলেও দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দার মতোন, দুটি মেরু

কখনো এক হতে পারে না, আমাদের এই যে এখন এক সঙ্গে পথ চলা, এটা সাময়িক, চিরদিনের জন্য হতে পারে না কখনো। হঠাৎ ইসাবেলের কথায় আমার হারিয়ে যাওয়া মনটা আবার ফিরে পেলাম।

'তুমি, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো রুডলফ?' ওর গলার স্বরটা খুবই নরম শোনালো।

'না, কখখনো না।'

'শপথ করে বলছো?'

'হ্যাঁ শপথ করেই বলছি।'

'ঠিক আছে রুডলফ, যেন ওর সব সমস্যা মিটে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে ও বললো, 'ভুলে যেওনা কিন্তু। তোমার বড় ভুলো মন।'

'তবু কথা দিচ্ছি ভুলবো না।'

'তাহলে এবার চুমো খাও।'

আমি ওকে কাছে টেনে নিলাম ধীরে ধীরে। নিজেকে আমার কাছে সম্পূর্ণ করে সঁপে দিলো ইসাবেল। ওর মুখটা আমার দু'হাতের চেটোয় তুলে ধরে যখন ভাবছি কি করবো, কি করা উচিত, ঠিক সেই সময় ওর শুকনো ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাতেই হঠাৎ ও আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলো। রক্ত ঝরে পড়লো। তাতে ইসাবেলের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, ও তখন হাসছে, ওর মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তোমার ঠোঁটে কেন রক্ত ঝরালাম জানো রুডলফ? তুমি আবার ঠকাতে, আবার তুমি কোথাও চলে যেতে আমাকে ছেড়ে, হারিয়ে যেতে হয়তো। এখন হারিয়ে যাওয়ায় ভয় আর নেই। রক্তের সীলমোহর দিয়ে দিলাম, তোমার ঠিক চিনে বার করবো।'

গম্ভীর গলায় বললাম, 'আমি কোথাও যেতেও চাই না। কিন্তু এ তুমি কি করলে ইসাবেল? মাদার সুপিরিয়ারকে আমি মুখ দেখাবো কি করে? আমি ওঁকে ব্যাখ্যা কি করবো?'

'কোনো ব্যাখ্যাই করতে হবে না তোমাকে। সব ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে হয়?'

ইসাবেল যা বললো, সেটার কোনো মানেই হয় না। বেশ বুঝতে পারি ইসাবেল এখন জেদী হয়ে গেছে। ওর চোখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের ধূর্ত হাসি। এই সময় কে যেন আমাকে খবর দিয়ে গেলো, ভক্তি গানের সময় হয়ে গেছে।

গান শেষে হাজার মার্ক হাতে এলো। এবার খাবার পালা। বিশপের প্রতিনিধি বোদেতদিয়েকের পাশেই আবার খাবার আসন নির্দিষ্ট হলো। তাঁর গায়ে এখন যাজকের পোশাক নেই, সাধারণ মানুষের পোশাক। একটু আগে ধর্ম সভার মোমবাতির আলোয় তাঁকে বেশ স্বর্গীয় পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল, আর এখন খাবারের টেবিলে একেবারে অতি সাধারণ মানুষ যেন। অথচ এঁরই কাছে আগে

কতবারই না গেছি অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে।

মাদার স্যুপিরিয়ার একটা মদের বোতল পাঠিয়ে দিয়েছেন। দশ বছর আগে বিশপের প্রতিনিধির সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খাবো, এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। সেই মদ বোদেনদিয়েক একটু চেখে দেখলেন। হ্যাঁ, মদটা ছিলো প্রিন্স হাইনরিখ ফন প্রুসেনের এলাকার স্কেলিস রেইনহার্টসার্ডনের। 'মাদার স্যুপিরিয়ারের রুচিজ্ঞান আছে, স্বীকার করতেই হবে', বললেন বোদেনদিয়েক। 'মদের ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কিরকম?' তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'খুবই কম।'

'এসব শিখে রাখা উচিত বৎস। খাদ্য ও পানীয় হচ্ছে প্রভুর দান। এদের উপভোগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, বুঝলে?'

'মৃত্যুও তো প্রভুর দান, তাহলে সেটাওতো উপভোগ করতে হয়।'

'খৃষ্টানদের কাছে মৃত্যু কোনো সমস্যাই নয়। মৃত্যু হলো অন্তহীন জীবনে প্রবেশের দরজা। একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অনেকের কাছেই এটা মুক্তির একটা উপায়—'

'মুক্তির উপায়? কি ভাবে শুনি।'

'অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট আর নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়া।'

'এরই নাম বুঝি মুক্তি?' ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বললাম, 'দুঃখ-শোকের জগৎটা সৃষ্টি করারই বা কি দরকার ছিলো? কেনই বা প্রভু আমাদের সরাসরি শাশ্বত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন না?'

বাইবেলে মানুষ, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুন্য, পতনের কথা লেখা আছে।'

'দেখুন ওসব অনেক শুনেছি। কবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাপ করে গেছেন তার শাস্তির বোঝা কি বহন করে যেতে হবে আমাদের আজও?'

আরো একটু মদ ঢেলে গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে বোদেনদিয়েক বললেন, 'এ জীবনে যে যতো কষ্ট ভোগ করে নেবে পরের জীবনে ততোটাই সুখ তার।'

এমন একটা অদ্ভূত কথা শুনে আমি আর থাকতে না পেরে বলে ফেললাম, 'আমি জানি, একজন মহিলা দীর্ঘ দশ বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগেছিলেন। দু'বার মারাত্মক ধরণের অপারেশন হয় তার সেই অসুস্থ শরীরে, তাতেও তিনি মরেননি। অথচ একদিনের জন্যও ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাননি তিনি। এক সময়ে তাঁর দুটি ছেলেই মারা গেলো। তারপর থেকেই ভদ্রমহিলা গির্জায় যাওয়া আর উপাসনা করা, সব ছেড়ে দিলেন। গির্জাকে অস্বীকার করে চরম পাপ করে বসেন তিনি, সেই পাপের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় একদিন মারা গেলেন তিনি। এখন আপনি কি বলবেন, ঈশ্বর ওঁকে ভালবেসে সৃষ্টি করেছিলেন? আর এটাই কি তার ন্যায়-বিচার?'

'সেই মহিলাটি তোমার মা ?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি, 'তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক' ?'

'উনি তোমার মা কিনা, তাই বলো ?'

'ধরুন, তাই যদি হয়...'

'মৃত্যুর মুহূর্তেও যদি কেউ ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাহলে সে মুক্তি পেয়ে যায়। পরমপিতার বিচার বড়ই সূক্ষ্ম।'

'সত্যিই কি তিনি বিচার করেন ?'

'করেন বৈকি। তার নাম ভালোবাসা।'

'ভালোবাসা! অপরকে দুঃখ দিয়ে ভালোবাসা! জানি না, এ কি ধরণের ভালোবাসা ?'

এই সময় খাবার এসে গেলো। বোদেনদিয়েকের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'বাঃ বেশ ভালো ভালো খাবার দেখছি...'

আমরা দুজন খাবার খেতে শুরু করেছি, এমন সময় ডাক্তার এসে হাজির হলেন সেখানে। এখানেই থাকেন তিনি।

'খাবেন নাকি ? তাহলে বসে পড়ুন। দেরী করলে ফুরিয়ে যেতে পারে।'

'না, এখন সময় নেই। ঝড় উঠলো বলে। এই সময় রোগীরা খুব অস্থির হয়ে ওঠে।'

'ঠিক আছে, এই বিধর্মীটার নাম করে একটু মদ অন্তত খাবেন তো ?, কথাটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন রোদেনদিয়েক, যেন একটু মস্করা করতে চান উনি।

ডাক্তারের নাম গুইদো ওয়েরনিক। বয়স পঁয়ত্রিশ। দীর্ঘদেহী, কান দুটো বড় সড়। চোখ দুটো কোটরাগত।

'ফ্রাউলিন তারহোভেন কেমন আছেন ? জানতে চাইলেন রোদেনদিয়েক।

'তারহোভেন ? অর্থাৎ জেনোভিয়েভের কথা বলছেন তো ? খুব একটা ভালো বলবো না!' উত্তরে বললেন ডঃ ওয়েরনিক, 'এখানে কে কখন যে ভালো থাকছে বলা মুশকিল।'

বোদেনদিয়েকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ আমার কেন জানি না মনে হলো, কিছুই ভালো লাগছে না, এমন কি খেতেও। ইসাবেলের কথাটা মনে পড়ে গেলো, 'আয়নায় দেখা আমার সেই প্রথম মুখটা মনে হয় আজ আর নেই, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে...' ও ঠিকই বলেছিল, আমাদের প্রথম সব কিছুই যেন হারিয়ে যায়, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আকাশটা ফালা ফালা করে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেলো। ঝড় উঠবে। অথচ ঘরের মধ্যে ডাক্তার তখন পরম নিশ্চিন্তে রোদেন দিয়েকের সঙ্গে আলোচনায় মেতে

উঠেছেন গভীর ভাবে। 'বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় উঠতে পারে', আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁর রোগীদের কথা ভেবে।

'তাই নাকি?' সামান্য একটু মুখ তুলে ডাক্তার আবার আলোচনায় মেতে উঠলেন বোদেনদিয়েকের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আর আলোচনা হলো ইসাবেলের দ্বৈত সত্তার অসুখকে কেন্দ্র করে। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ কিভাবে এক এক সময়ে নিজেকে বিভিন্ন মানুষ ভাবে। তাই যদি হয়, আমি ভাবলাম, তাহলে তো এ অসুখে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভুগছি। আমরাও তো এক এক সময় নিজেদের নানা ভূমিকায় চিন্তা করে থাকি। অতএব সত্যিকারের রোগী কে? টেবিলের সামনে ফিরে গিয়ে গ্লাসের বাকী মদটুকু গলাধঃকরণ করলাম। এখন মনে হলো, মনটা আমার বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'আপনার ঠোঁটে রক্ত কেন?'

'ঘুমের ঘোরে কামড়ে ফেলেছি।'

হেসে ফেললেন বোদেনদিয়েক। এই সময় একজন নার্স একটা মদের বোতল আর তিনটে গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ঝড় উঠছে, রোগীদের সামাল দেবার জন্য ডাক্তার চলে গেলেন।

ওদিকে মদের বোতলটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে বোদেনদিয়েক বললেন, 'মনে হয় তোমার আর চলবে না, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ চলবে। এখন বেশ ভালোই লাগছে। তাছাড়া আপনি তো শেখালেন—?'

ভুরু কুঁচকে উঠলো বোদেনদিয়েকের। নিজের গ্লাসটা পুরো ভরে নিয়ে আমার গ্লাসে সিকি ভাগ মদ ঢেলে অতি বিজ্ঞজনের মতো বললেন, 'এসো আমরা পান করি, স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য।'

দূরে কোথাও বাজ পড়লো। আমার ঘরে ফিরে এসে এরনার চিঠিগুলো সামনে রেখে ভাবছি আমি, ওর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। এখন ওর কোনো কিছুই আর ভাল লাগছে না, ওর খারাপ দিকগুলোর হিসেব করে মন থেকে ওকে মুছে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা হয়নি আমার। আমার মনের আকাশে এখন নানান উদ্ভট উদ্ভট স্বপ্নের মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে—এখন যদি একটা দামী গাড়ি হাঁকিয়ে নাইট ক্লাবে যাই, সঙ্গিনী কয়েকজন নামী-দামী অভিনেত্রী, আর পকেট ভর্তি ঠাসা মার্ক। স্বপ্ন দেখি, কাল যদি আমি কাগজের একটা বিরাট খবর হয়ে যাই, কয়েকটা শিশুকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে দারুণ ভাবে আমি পুড়ে গেছি…ওদিকে লিসার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্ন

ভেঙ্গে গেলো।

জানালা খুলে ইশারা করলো লিসা। আমার ঘর তো অন্ধকার? ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে কাকেই বা ইশারা করলো ও নিজের বুকে আঙুল রেখে। এই কৌতুহলটা মেটানোর জন্য অতি সতর্কতার সঙ্গে অন্ধকারে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, লিসা তার বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। পায়ের জুতো তার হাতে, বুঝলাম, জুতোর শব্দ এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া। মিনিট কয়েক পরেই জর্জের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এলো। তাহলে তলে তলে তারা এতদূর এগিয়েছে?

ওদিকে তখন মুশল ধারায় বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির একটা নিজস্ব সুর আছে, আছে গান। জলের স্রোতের সঙ্গে সুরের লহরী বইতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের কি বোঝে জর্জ? সে তো আর প্রকৃতি প্রেমিক নয়।

এরপর চিঠিগুলো জানালা গলিয়ে নিচে ফেলে দিলাম। জলের স্রোতে ভেসে যেতে থাকলো একদা আমার প্রেমের অ, আ, ক, খ'র সব সাক্ষ্য প্রমাণ। আমার প্রেমের একটা অধ্যায় শেষ, আর ওদের প্রেমের প্রথম পাঠ শুরু হলো—গুণ গুণ করে মিষ্টি মধুর কথা বলতে শুরু করলো লিসা আর জর্জ গানের কলির মতোন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আজকের রাতটা যেন ওদের কাছে মধুময় হয়ে ওঠে। ওদের মনের কথা উপলব্ধি করে প্রকৃতিও যেন আজ কেমন বন্য হয়ে উঠেছে। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার ঘরটা ভরে উঠেছে এক অসীম শূন্যতায়, তাই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো। এক দুঃসহ যাতনায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। ভাবলাম, হাতের কাছে যদি একটা যোগের বই পেতাম তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে খানিকটা স্বস্তি পেতাম।

ঘুম আসছিল না, তবু বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম শ্লথ গতিতে, আর তখনি আয়নায় ছায়া পড়লো। ওটা কে, কে ও? আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঠোঁটের দিকে তাকালাম, কার বিদেহী ঠোঁট স্পর্শ করেছে ওটাকে? এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

□ সাত □

কথা মতো রাইজেনফেল্ড ঠিক এলো। আমাদের উঠোনের শোরুমে তাঁর পাঠানো দামী দামী পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আর স্তম্ভমূল সাজিয়ে রাখা হচ্ছে একটার পর একটা প্যাকিং খুলে। অফিসের সবাই এসেছেন, জর্জের না শ্রীমতী কুলও এসেছেন। গেটের পাশে দাঁড় করানো সেই অবহেলিত কালো অবিলিস্কটার বর্তমান হাল তিনি দেখলেন করুণ দৃষ্টিতে তাঁর স্বীকার আমলের জিনিষের একি পরিণাম হয়েছে?

কুর্ট বাক একটা বড় কালো পাথর নিয়ে গেলো তার ষ্টুডিওতে একটা মুমূর্ষ, পিঠে বল্লম বেঁধা সিংহের মূর্তি বানাতে হবে। উকর্ট্রিনজেনের গ্রামে যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এই মূর্তিটা স্থাপন করা হবে। এই ফর্মাসটা এসেছে অবসরপ্রাপ্ত মেজর উকর্ট্রিনজেন এবং কয়েকজন বৃদ্ধ সৈনিকের কমিটির পক্ষ থেকে। উকর্ট্রিন জেনের ইচ্ছে, চার মাথাওয়ালা সিংহের মুখ থেকে আগুনের হল্কা ঝরে পড়বে। এই হলো সিংহমূর্তির রূপ।

উরটেমবার্গ ঢালাই কারখানা থেকেও মাল ডেলিভারি দিয়ে গেছে। সবে উড়তে যাচ্ছে—এমন ভঙ্গিমার চারটি ঈগলের মূর্তি মাটিতে বসানো হয়েছে। দেশের যুবমানসে প্রেরণা জাগাতেই অন্য যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভে ওগুলো বসানো হবে। সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার ভার পড়েছিল আমার ওপর।

মাথার ওপর নির্মেঘ নীল আকাশ। বাতাসে পাখিদের কলরব ভেসে আসছে, ভারি মিষ্টি। সব মিলিয়ে দিনটা সত্যিই সুন্দর রমনীয়। কিন্তু এমন সুন্দর একটি দিনের সব আনন্দ কাগজে তিনটি আত্মহত্যার খবর যেন বিষাদের ছায়া ফেলে দিলো। সবাই নিম্নবিত্তের মানুষ। শ্রীমতী কুবালক তাঁর বসবার ঘরে গ্যাসের নলটা খুলে দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং একসময় তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়েন। দ্বিতীয়জন হলেন বিধবা শ্রীমতী গ্লাস, তাঁকে পাওয়া গেছে তাঁর রান্নাঘরে, তাঁর পাশেই পড়েছিল একটা ব্যাঙ্কের পাসবই, মাত্র পঞ্চাশ হাজার মার্ক অবশিষ্ট ছিলো ব্যাঙ্ক। আর তৃতীয়জন হলেন একজন সরকারী কেরানী হোপফ্। আত্মহত্যা করার আগে সুন্দর পরিপাটি করে দাড়ি কামিয়ে ছিলেন তিনি, সুন্দর করে রিপু করা পুরনো স্যুটটা পড়েছিলেন, আত্মহত্যা করার সময় তাঁর হাতে ছিলো লাল সীল লাগানো হাজার মার্কের এক গোছা নোট, সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী ওগুলোর কোনো দাম নেই এখন আর।

কফিন তৈরীর ছুতোর মিস্ত্রী উইলকির ঘর থেকে কাঠে পেরেক ঠোকার শব্দ ভেসে আসছে। ওর ব্যবসা তাহলে বেশ ভালেই চলছে বলে মনে হয়। আমাদের

অর্ডার আসবে। এবার আমরা একটা খরচার মুখ দেখতে পাবো। শ্রীমতী ক্রুল আমাদের স্যান্ডউইচ ও কফি দিলেন।· লিসাকে বাইরে বেরুতে দেখেছিলো। তার পরণে টকটকে লাল সিল্কের পেশোক। ওকে ভালো চোখে দেখতে পারেন না মিসেস ক্রুল। 'নোংরা মেয়ে।'

'নোংরা, কোন্ মেয়েটা আবার নোংরা?' সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদে পা দিলো জর্জ।

'কে আবার, ওই যে ওই মেয়েটা? ভালো পোশাকের নিচে নোংরা কি আর ঢাকা পড়তে পারে?'

জর্জ আর কথা বাড়ালো না।সে জানে ভালোবাসার ব্যাপারে নোংরা পরিস্কারের বাছ বিচার থাকতে পারে না, ওটা বুড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ। যতো দোষ ত্রুটিই থাকুক না কেন, নোংরা মেয়ে ও নয়।

এরপর অফিসঘরে যেতেই গার্দা স্লিভারকে বসে থাকতে দেখলাম। বেশ সাজগোজ করে এসেছে ও। বুকের বাঁদিকে রাইজেনফেল্ডের গোলাপের তোড়ার একটা লাল ফুল এঁটে এসেছে ও। সেই ফুলটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো ও, 'কি অপূর্ব, তাই না? সবাই হিংসে করছে। এমন চমৎকার উপহার রাজরানীর পাবার কথা।'

এ যেন এক পার্থিব ভালোবাসা, জর্জের ভাষায় বলতে হয়—সুস্পষ্ট, সংকল্পে দৃঢ়তা, বয়সে তারুন্য, আর ব্যবহারে কোনোরকম ছলচাতুরি নেই। আমি ওকে ফুল উপহার দিয়েছি, আর ও এসেছে তার প্রাপ্তি স্বীকার জানাতে। ফুল পাঠানোর উদ্দেশ্যটা সরল মনেই নিয়েছে ও।

'আজ বিকেলটা কি ভাবে কাটাচ্ছো?' জানাত চাইলো গার্দা।

'পাঁচটা পর্যন্ত এখানে কাজ থাকবে, তারপর এক হাঁদারামকে শেখাতে যাবো।'

'তার মানে ছ'টা বেজে যাবে, এই তো? ঠিক আছে, ছ'টার পরে আল্ স্টাডটার হলে চলে এসো, ওখানেই আমি ব্যায়াম করি, তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

কোনো কিছু না ভেবেই বললাম, 'বেশ যাবো।'

এবার গার্দা উঠে দাঁড়ি চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াল। আমার কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে গার্দা ওর মুখটা তুলে ধরলো আমার মুখের কাছে। এতোটা আশা করিনি। অতি সতর্কতার সঙ্গে আমি ওর গালে আলতো করে চুমু খেলাম।

'এতো ভীতু?' কথা শেষ করেই দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে একটা গাঢ় চুমু খেলো আমার ঠোঁটে। 'ভবঘুরে শিল্পীদের মতো ভাবালুতা দেখালে চলে না এখানে। ভাবছি, দু'সপ্তাহ পরে এখান থেকে চলে যাবো সে যাইহোক, ছ'টার পরে আসছো তো?'

গার্দা চলে যেতেই বাগানে ঢুকলেন মিসেস ক্রুল জলের ঝারি হাতে নিয়ে। 'মেয়েটি দেখতে বেশ ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। মেয়েটির পেশা কি?'

'জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখায়।'

'আশ্চর্য! এরা ভালো মেয়েই হয়। ওকি কিছু কিনতে এসেছিল?'

'না, এখনো সময় হয়নি।'

হেসে ফেললেন মিসেস ক্রুল। 'শোনো লুডউইগ, তোমার যখন সত্তর বছর বয়স হবে, তখন তোমার নিশ্চয়ই মনে হবে, আজকের জীবনযাত্রাটা কি কুৎসিতই না ছিলো।'

'না সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না, কারণ এখনই আমার এই জীবনটা খুবই খারাপ লাগছে।'

আগের মতোই হাসলেন বৃদ্ধা, কোনো কথা বললেন না।

আজ গৃহ শিক্ষকদের মাইনে হচ্ছে। অথচ আমার ছাত্র আজ আমার সঙ্গে একটা বিশ্রী রসিকতা করেছিল, আমার চেয়ারে কিছু পেরেক ছড়িয়ে রেখেছিল। রাগে আমার সারা শরীর তখন জ্বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, ছাত্রের মাথাটা জলের চৌবাচ্চায় চেপে ধরে চুবোই। কিন্তু পরক্ষণের নিজের আখেরের কথা ভেবেই রাগটাকে আমায় সামলাতে হয়েছিল। আজ আমার টাকার খুব দরকার ছিলো।

আর্থারের বইয়ের দোকানে ঢুকে দোকানীকে আমার প্রয়োজনের কথা বলতেই বললো সে, 'আপনি যোগের বই চাইছেন তো? এই নিন, সব রকম বই আছে এর মধ্যে—যোগের, বৌদ্ধধর্মের, নিরীশ্বর বাদের। তা আপনি ফকির টকির হতে চাইছেন নাকি?'

বেশ বিরক্ত হলাম ওই কৃশকায় মানুষটার কথা শুনে। দাঁড়াও তোমার এই অন্যায় স্পর্ধার উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। একটা ধারালো প্রশ্ন করলাম আর্থারকে: 'বলতে পারেন বেঁচে থাকার মানে কি?'

'বেঁচে থাকার অর্থ? ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে? আমার তো মনে হয়, সোমবারের বিকেলে এই যে আমার বইয়ের দোকানে এতো খদ্দেরদের সমাগমের জন্যই কি আপনি জানতে চাইছেন জীবনের মানে কি?'

'হ্যাঁ', তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তাহলে এখন স্বীকার করুন, আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই, এমন কি র‍্যাকে ওই থরে থরে অতো বই থাকা সত্বেও?'

'তা প্রশ্নটা আপনার ক্লাবের সদস্যদের কাছে তোলেননি কেন?'

'সে কি আর বাকী রেখেছি বলতে চান?' উত্তরে আমি বললাম, 'ওদের উত্তর গুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমি যে প্রকৃত সত্যটা জানতে চাই।'

'প্রকৃত সত্য ? ওসব দার্শনিকরা জানে। আমি একজন পুস্তক বিক্রেতা একজন মহিলার স্বামী, একটি ছেলের বাবা। এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। এর বেশী কিছু আমি জানতে চাই না। আমার এই ধারনা নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

'আপনার পঁচিশ বছর বয়সেও কি আপনার এই রকম ধারণা ছিলো ?'

'হ্যাঁ, ছিলো বৈকি। তখনো আমি চাইতাম, আমার একটা বইয়ের দোকান হবে, আমি বিয়ে করবো, আমার ছেলের বাবা হবো। কিন্তু তাই বলে আপনার মতো সাধু কিংবা ফকির হবার বাসনা আমার জাগেনি।'

ইতিমধ্যে একজন মহিলা খদ্দের দোকানে আসতেই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আর্থার। আর আমি তখন দোকানের ভেতরে ঢুকে শোকেসের বইগুলো দেখতে থাকি। বাছাই করা সব দর্শনশাস্ত্রের বই। শেষ পর্যন্ত প্লেটোর সিম্বোজিয়াম আর ভদ্র হতে গেলে কি রকম আচরণ করতে হয়, তার ওপর একটা বই কিনে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

সরাইখানা আলস্টাডটারে ভ্রাম্যমান অভিনেতা, যাযাবর আর ঘোড়ারগাড়ির দারোয়ানদের যাতায়াত। তিন তলার ঘরগুলো ভাড়া খাটে, নিচে বড় হল ঘরে ব্যায়াম করার সাজ সরাঞ্জাম রাখা থাকে। তবে সরাইখানার বড় আকর্ষণ মদও থাকে। এখানে অপরাধ জগতের বাসিন্দরাও আসে।

হলের মধ্যে তখন রেণী দ্য লা ত্যুর পিয়ানো বাজিয়ে গান তুলছিল। ডান দিকে একটা লোক দুটো কুকুরকে খেলা শেখাচ্ছিল। দুটি কুস্তিগীর ধরনের মেয়ে মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আর ওই তো গার্দা, পাখির মতো একটা ট্রাপিজে দোল খাচ্ছে।

'ওই দেখো, ও এখন প্র্যাক্টিশ করছে', বললো রেণী, 'সার্কাসে ফিরে যেতে চায় ও আবার।'

'সার্কাসে ফিরে যেতে চায় মানে ? কেন ওকি আগে সার্কাসে কাজ করতো নাকি ?'

ট্রাপিজে দোল খেতে খেতে আমাকে দেখছিল গার্দা।

হঠাৎ রেণী একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা উইলি কি সত্যি সত্যিই বিত্তবান পুরুষ ?'

'তাই তো মনে হয়। অন্তত আজকের বিত্তবানদের সংখ্যা অনুসারে তো বটেই। কারন ওর অনেক রকমের ব্যবসা আছে।'

'পুরুষমানুষের প্রচুর অর্থ থাকবে এটাই আমি চাই, 'হাসতে হাসতে বললো রেণী, 'আমার মনে হয়, সব মেয়েরাই হয়তো তাই চায়।'

'এ আর নতুন কি কথা শোনালে তুমি সেটা আমারো নজর এড়ায়নি। আজকাল

সৎ কেরানীর চেয়ে অসৎ জোচ্চর ফাটকা বাজদেরই কদর বেশী মেয়েদের কাছে।'

হা হা করে হেসে উঠলো রেণী। সততা আর সম্পদকে একই শ্রেণীতে বিচার করো না। আসলে মেয়েরা কি চায় জানো জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ আর নিরাপত্তা। টাকা না থাকলে এসব কিছুই আশা করা যায়না পুরুষদের কাছ থেকে।'

গার্দা কখন যে আমার পাশে এসে বসেছিল। টের পাইনি। হঠাৎ ওর কথায় হুঁস হলো আমার, হাঁপাতে হাঁপাতে ও তখন বলছিল আমাকে, 'রেণীর কথা বিশ্বাস করো না, ও মিথ্যে বলছে। ও যা বললো, স্রেফ নিজের মনের কথা, সব মেয়েদের কথা নয়। তার কথাই শেষ কথা নয়—'

গার্দার কথা শুনে রেণীর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ব্যাঙ্গের সুরে বললো সে, 'মেয়েরা যেদিন মিথ্যে কথা বন্ধ করে শুধু অনর্গল সত্যি কথা বলে যাবে, সেদিন আর তারা মেয়ে থাকবে না।' খিল খিল করে হেসে উঠলো রেণী। 'মেয়েদের ধর্মই হলো মিথ্যে বলা।'

'তুমি একটু অপেক্ষা করো, একটু পরেই পোশাক বদল করে আমি আসছি।'

যাবার সময় আমাকে বলে গেলো গার্দা।

'গার্দাকে সুখী করার চেষ্টা করো,' হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে উঠলো রেণী, 'মাত্র দুসপ্তাহের ব্যাপার, আশাকরি কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না, তাই না?'

আমার বলার কিছু ছিলো না। আমার বিব্রতবোধটা কাটিয়ে দিলো মাঝখানে উইলি এসে। ও আমাকে বাঁচালো, বন্ধুর মতোই। ও আজ দারুন সাজগোজ করে এসেছে। রেণীর পাশে এসে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটা দামী পাথর বসানো সোনার আংটি পকেট থেকে বার করে রেণীর আঙুলে পরিয়ে দিলো। রেণী তখন বেসামাল। অপ্রত্যাশিত আনন্দে গদগদ হয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ওঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না।'

রেণীর চিৎকার গার্দাও শুনতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলো ও, 'এতো চিৎকার কিসের, ব্যাপার কি শুনি?'

'চটপট তৈরী হয়ে নাও সবাই,' উইলি ঘোষনা করলো, 'বেরোতে হবে।'

গার্দা আর রেণী পোশাক বদল করতে চলে গেলো। উইলিকে একা পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি হলো উইলি? রেণীকে তুমি আংটিটা পরেও তো দিতে পারতে। গার্দার কাছে আমি ছোটো হয়ে যাবো।'

'ও সব আজে বাজে চিন্তা করো না?' উইলি আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করলো, 'আমি যেভাবে রেণীকে চাই, সেভাবে গার্দাকে তুমি চাও না। রেণী এক অনন্য অসাধারণ মহিলা।'

'তাকে যদি তোমার এতোই ভালো লাগে, তা ওকে বিয়ে করছো না কেন?'

'বিয়ে ?' গভীর বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো উইলি, 'এ ধরনের মেয়েকে নিয়ে বাইরে বাইরে স্ফূর্তি করা যায়, কিন্তু বিয়ে করে ঘরে তোলা যায় না।'

রেণী ফিরে আসতেই উইলি তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে চলে গেলো আর গার্দা আসতেই আমি ভাবলাম, এডুয়াডের্র রেস্তোরাঁর কয়েকটা কুপন তো তখনো অবশিষ্ট ছিলো, সেখানে যাবো কিনা। কিন্তু পরক্ষনেই মনে পড়ে গেলো, সন্ধ্যায় কুপন চলে না। তাহলে এখন কি করি ভাবছি, এমন সময় গার্দা বলে উঠলো, 'আমার একটা প্ল্যান ছিলো, শোনো। চলো, গ্রামের পথে কোথাও বেরিয়ে আসি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে একটা গ্রামে যাবো, তারপর সেখান থেকে হাঁটা পথে অন্য গ্রামে।'

নিজের কানকেই বড় অবিশ্বাসী বলে মনে হলো গার্দার প্রস্তাব শুনে। গ্রামের পথে হেঁটে বেড়ানো। এই রকমই একটা প্রস্তাবকে এরনা একদিন কি ভাবেই না ব্যঙ্গ করেছিল। আচ্ছা এরনা কি কথাটা বলেছে গার্দাকে ? বললেও বলতে পারে।

'না, বরং ওয়াল হাল্লাতে গেলে কেমন হয় ?' সাবধানে প্রস্তাবটা দিলাম।

'দরকার কি। আলুর স্যালাড তৈরী করা আছে। পথে কিছু সসেজ আর বীয়ার কিনে নিলেই চলবে।'

গার্দার এমন সুন্দর একটা প্রস্তাবটা ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার আশংকা এতো সুখ আমার সইলে হয়। যাইহোক, মনঃস্থির করে ফেলে বললাম, 'ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজী। চলো গ্রামেই যাওয়া যাক।'

□ আট □

উসাট্রিনজেন গ্রামটা সেদিন নতুন উৎসবে মেতে উঠছিল। জর্জ, হাইনরিখ কুর্ট বাক আর আমি সেই উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে সেখানে। যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলো আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছি। দুটো গির্জারই ধর্ম যাজকরা আলাদা আলাদা ভেবে এসেছেন। তবে ক্যাথলিক গির্জার জাক জমকটা একটু বেশী যেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট যাজকরা স্মরনস্তম্ভ উন্মোচনের আসরে উভয় গির্জার যাজকরা হাজির।

মৃত সৈনিকদের মধ্যে দুজন ইহুদীও আছে, যাদের উদ্দেশে স্মৃতিস্তম্ভ করা হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইহুদী ধর্মগুরু বাবাই এর এখানে প্রবেশ নিষেধ। এর একটাই কারণ হলো, এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করার আয়োজক সমিতির

প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর ভোকেন স্টেইন হলেন প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষী। আজ তিনি রাজকীয় বাহিনীর পোশাক পরেও নিয়মভঙ্গ করেছেন। ১৯১৮ সালের যুদ্ধতে যারা মারা যায়, তাদের আত্মিয়স্বজনরা সেই যুদ্ধকে মনে প্রানে ঘৃণা করে থাকে। কিন্তু যারা যুদ্ধে গিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছে, তারা গর্ববোধ করে। মেজর ভোকেন স্টেইন দেশাত্মাবোধক বক্তৃতা দিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। সত্যি তাঁর বক্তৃতা গর্ব করার মতো।

এরপর আবরণ উন্মোচন করা হলো। পিঠে বল্লম বেঁধা সিংহ, স্তম্ভের চার কোনায় ডানা মেলা চারটি ঈগল, দামী গ্রানাইট পাথরের তৈরী। নিখুঁত কাজ।

ক্যাথালিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের যাজকরা এসে মালা দিলেন বেদীতে। যুদ্ধের সময় জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের যাজকরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন, তাঁদের দেশের সৈনিকরা অক্ষত অবস্থায় দেশে ফিরে আসে আর তাঁদের দেহেরও যেন ক্ষতি না হয়। তখন ঈশ্বর ঠিক তখন কার কথা শুনতেন? আদৌ কি শুনতেন?

যাইহোক, এক সময় উৎসব শেষ হলো। সন্ধ্যার পর গির্জাতে ধর্মসভা বসবে। আজই টাকাটা চাই, কারণ ডলারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এখন। আমি আর জর্জ হাজির হলাম মেয়রের বাড়িতে। উনি তখন আহার সারতে লেগে পড়েছেন। আমরা আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতেই সরাসরি জানিয়ে দিলেন, 'এখন টাকা পয়সা দেওয়া সম্ভব নয়। পরের সপ্তাহে আসুন।'

কফি আর কেকেস সঙ্গে সিগারও দেওয়া হলো আমাদের। আমরা ফিরিয়ে দিলাম না। ওদিকে জর্জ নাছোড়বান্দা, বললো সে, 'কিন্তু জিনিষের দাম আজ আমাদের চাই। এ রকমই কথা দিলো আমাদের সঙ্গে তাছাড়া টাকাটা আমাদের ভীষণ দরকার।'

'তা টাকার দরকার কার বা নেই বলুন?' মেয়রের কেরাণী গায়ে পড়ে কথাটা বললো।

'বললাম তো পরের সপ্তাহে আসুন,' মেয়র তাঁর কথা থেকে এক চুলও নড়তে চান না।

'না, তা হয় না। আমাদেরও পাওনাদার আছে, তার পাওনাটা আজই আমাদের মিটাতে হবে আজই, এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই টাকাটা আমাদের চাই-ই।'

এই সময় মেয়রের কেরাণীটা আবার ফোরন কেটে বললো, 'আর টাকা না পেলে কি স্মৃতিস্তম্ভগুলো তুলে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে, তাও করতে পিছপা হবো না।' হঠাৎ রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললাম, 'আমরা চারজন আছি, নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

'কোনো লাভ হবে না তাতে। উৎসর্গ করা জিনিস এখানকার হাজার হাজার লোকের সামনে থেকে কি করে নিয়ে যান দেখি ?'

আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি, বুঝতে অসুবিধে হলো না। এখন ভাবছি, কি করা যায়। এই সময় কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'মেয়র, সর্বনাশ হয়ে গেছে, দুর্ঘটনা ! শীগ্‌গীর আসুন।'

'কেন, হয়েছেটা কি শুনি ?'

'ছুতোর মিস্ত্রী বেস্টে, ওরা ওর পতাকা টেনে নামাতে যায়, আর তখনি দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।'

'বেস্টে কি গুলি চালিয়েছে ?' খিঁচিয়ে উঠলেন মেয়র। 'এই সব হতভাগা সমাজবাদীগুলো জাতীয় সমস্যা······'

'না, বেস্টে গুলি চালায়নি।' খবরদাতা আরো জানালো যে, 'একমাত্র তার নাক মুখ দিয়েই রক্ত বেরুচ্ছে, অন্য আর কেউ আহত হয়নি।'

খবরটা শোনার পর মেয়রের মুখটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। 'তা এতো চিৎকার কিসের ? এসো আমার সঙ্গে।' চলে যাওয়ার আগে মেয়র আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'গুরুতর ব্যাপার, বুঝতেই পাবছেন। আজ আর কোনো কথা নয়—'

আমরাও ওঁর সঙ্গ নিলাম। ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বেশ গোলমেলে। আজ যাদের জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হচ্ছে, তারা সবাই মারা যায় জার্মানীতে রাজতন্ত্র থাকাকালীন, তাই স্বভাবতই পুরনো জমানার পতকা টাঙ্গিয়ে ছিল সবাই। কিন্তু এখনকার সরকারী পতাকা অন্য প্রজাতন্ত্রের পতাকা। বেস্ট সেটাই টাঙ্গাতে যায়। আর সেজন্যই তার বিরুদ্ধে এই বিরোধিতা।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, বেস্টে তার বাড়ির পাশের গলিতে পড়ে রয়েছে। তার পাশে প্রজাতন্ত্রের পতাকাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। জনতার ভীড়। একজন পুলিশ তার নোটবুকে রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। কে কে ঘটনাটা দেখেছে জিজ্ঞেস করতেই সকলে মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরেই একজন ডাক্তার এসে এক নজর দেখেই তিনি ঘোষণা করলেন, লোকটা মৃত। এরপরেই সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের পালা শুরু হয়ে যাবে। তাই দেখে আমি আর জর্জ সরে পড়লাম। একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে কফি খাইয়ে তার কাছ থেকেই জানা গেলো; মৃত বেস্টের বেয়াদপি ঘোচাবার জন্য কিছু লোক তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তার হাতের নশকাটা টেনে নামাবার চেষ্টা করতেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। বেস্টে যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্রে ওর ফুসফুসে গুলি লেগেছিল, তাই সামান্য একটু ধাক্কাধাক্কিতেই মুখে রক্ত উঠে খতম হয়ে গেলো ও। লোকটাকে সাক্ষী হবার কথা বলতেই চমকে উঠে সে বলে, 'ক্ষেপেছেন মশাই বৌ ছেলে নিয়ে ঘর করি। এই সব ঝুট ঝামেলায় যেতে আছে না৷কি ?'

আশ্চর্য, হঠাৎ সারা গ্রামটা যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত হয়ে গেছে। এ নিয়ে মাথা আর না ঘামিয়ে আমরা চললাম মেয়রের কাছে। আমাদের ফিরে যেতে দেখে রুক্ষগলায় মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা আবার টাকা পয়সার কথা বলতে আসেননি তো ?'

'হ্যা, তাই এসেছি। আর এটাই তো আমাদের পেশা। তাছাড়া মানুষের মৃত্যু নিয়েই তো আমাদের কারবার।'

'কিন্তু এখন তো আমার হাতে একটুও সময় নেই। জানেনই তো কি ঘটে গেছে।'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি। আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে অনেক কিছুই তো দেখলাম, জানলাম। আপনি আমাদের সাক্ষী মানতে পারেন এ ব্যাপারে। টাকার জন্য যখন আমাদের থেকে যেতেই হচ্ছে, আগামীকাল পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারবো আমরা।'

'সাক্ষ্য ?' চমকে উঠলেন মেয়র, 'কিসের আবার সাক্ষ্য শুনি ?'

'কেন, বেস্টের খুনের ব্যাপারে। তাকে খুন, আর খুন করার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করে তোলার ব্যাপারে ?' শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলো জর্জ।

'তোমরা কি আমায় ব্ল্যাকমেল করার ধান্দা করছো ?' রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন মেয়র।

'আপনার বক্তব্য আমাদের ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না', আরো অনুত্তেজিত গলায় বললো জর্জ।

এবার মেয়র আর কোন কথা না বাড়িয়ে আলমারী খুলে নোটের বাণ্ডিল বার করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে রাগে গর গর করতে করতে বললেন, 'নিন, এগুলো গুণে নিয়ে রসিদ দিয়ে যান। আর জেনে রাখুন, এখান থেকে ভবিষ্যতে আর কোন অর্ডার পাবেন না, বুঝলেন ?'

'অর্ডার পাবো না জোর দিয়ে কি বলা যায় ?' জর্জ উত্তরে বললো, 'এমনও তো হতে পারে, আমরা হয়তো বিনা পয়সায় বেস্টের সমাধিতে স্তম্ভ বসাতে পারি।'

এরপর আমরা সোজা ষ্টেশনে চলে এলাম। কুর্ট আর হাইনরিথ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। দূরে একটা বেঞ্চে ভাবুকের মত বসেছিলেন ভোকেনস্টেইন।

'বেস্টের কেসের ব্যাপারে কি হবে বলো তো ?' জানতে চাইলাম আমি।

হঠাৎ জর্জ কেমন দার্শনিক হয়ে গিয়ে উত্তর দিলো. কিসসু হবে না। সবাই মিলে সাক্ষ্য দেবে, এই ছুতোর মিস্ত্রীটাই দোষী। দেশে প্রজাতন্ত্র হয়েছে বটে, কিন্তু সেই রাজতন্ত্রের আমলের বিচারপতি, পুলিশ, প্রশাসন তো আগের মতোই রয়ে গেছে। অতএব এদের কাছ থেকে নতুন ভালো কিছু আর কি আশা করা যায় বলো ?'

সূর্য ডোবার পালা শুরু হয়ে গেছে তখন। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমারও তাই মনে হলো। সত্যি এদের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করতে গেলে ব্যর্থ হতে হয়। যুদ্ধে আমরা হাজার লক্ষ মানুষকে মরতে দেখেছি, সেটা এখন পরিসংখ্যান হয়ে গেছে। তাই মাত্র একজনের মৃত্যুতে এতো'ভাবনা-চিন্তার কি দরকার? একটা লোক মরলে আমরা সেটা শুধু মৃত্যু বলে ধরে নিই, ব্যস এই পর্যন্তই।

☐ নয় ☐

মিসেস নাইবুর তাঁর মৃত স্বামীর জন্য 'সমাধি-গির্জা' ছাড়া অন্য আর কিছু পছন্দ নয়!

'বেশ তাই হবে', আমি বললাম, সমাধি-গির্জাই হবে।' নাইবুর মৃত্যুর পরে সাময়িক ভাবে এই শান্ত, ভীরু স্বভাবের মহিলাটি ভীষণ বাচাল আর ঝগড়াটে হয়ে উঠেছেন যেন। রুটিওয়ালার কবরে স্মৃতিস্তম্ভ হবে, না কি সমাধি হবে, তাই নিয়ে গত দু'সপ্তাহ ধরে মহিলাটির সঙ্গে একটানা বাকবিতণ্ডা চলেছে আমার। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, সমাধির একটা নমুনা দেখান, পছন্দ হলে তখন না হয়—'

'সমাধির নমুনা তৈরী থাকে না। রানীর নাচের আসরের পোশাকের মতো আগে থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে তৈরী করাতে হয়। তবে নকশা আছে আমার কাছে, পছন্দ হলে আপনার জন্য বিশেষ ধরণের একটা কিছু করে দিতে পারবো।'

'অবশ্যই! একেবারে বিশেষ ধরণের হতে হবে। বৈচিত্র থাকবে, তা না হলে আমি কিন্তু হোলমান এ্যাণ্ড ক্লোৎজ-এর কাছে যাবো।'

'আমার অনুমান, আপনি আগেই ঘুরে এসেছেন সেখানে। আর আমরাও চাই যে আমাদের খদ্দেররা আমাদের কাছে আসার আগে আমাদের প্রতিযোগী কোম্পনী-গুলোয় ঘুরে আসুক।

হোলম্যান ক্লোৎসের এজেণ্ট কাঁদুনে অস্কারের কাছ থেকে আগেই আমরা খবরটা পেয়েছিলাম। তাই তাকে মোটা টাকার কমিশনের লোভ দেখি মিসেস নাইবুরকে আমাদের দিকে ভিড়িয়ে দেখার কথা বলেছি তাকে। অস্কার এখন দোটনায় পড়েছে মোটা টাকার কমিশনের লোভটা হাতছাড়া করতে পারছে না সে, আবার কোন্‌দিকে ঠিক যাবে। সেটাও স্থির করতে পারছে না।

'ঠিক আছে, ওই নকশাগুলোই দেখান।' জমিদার গিন্নীর মেজাজে হুকুম করলেন

যেন তিনি ।

নক্‌শা বলতে আমাদের কিছুই নেই। তবে তা না বলে যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের কয়েকটা স্কেচ দেখালাম বেশ রঙচঙে, নিশ্চয়ই ও'র পছন্দ হবে।

পরপর নানান ধরনের স্কেচ ও'কে দেখানো হলো, কিন্তু একটাও ও'র মনে ধরলো না। মিসেস নাইবুর জিজ্ঞেস করলেন 'আর কিছু ?'

'না, আপাতত আর কিছু নেই।' আমি সরাসরি বললাম।

'নেই ?' মিসেস নাইবুর এবার ও'র স্পষ্ট মতামত জানিয়ে দিলেন, 'তাহলে তো হোলমান অ্যান্ড ক্লোৎজের কাছে না গিয়ে উপায় নেই আমার।' এই বলে উনি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন এরপর আমি ও'র হাতে পায়ে ধরবো আমাদের অর্ডার দেবার জন্য। না, আমি তার ধারে কাছে না গিয়ে সরাসরি বলে দিলাম, 'ঠিক আছে, গিয়েই দেখুন না সেখানে। আর আমরাও চাই, আমাদের খদ্দেররা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের জিনিষ দেখে আমাদের কাছে ফিরে আসুক। আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির তৈরী জিনিষে একবার দেখা যায়, দেবদূতের দুটোই বাঁ পা হয়ে গেছে, আর যীশুর হাতের এগারোটা আঙ্গুল। যখন আবিস্কার হলো, তখন আর করার কিছু ছিলো না।'

'ওটা কোনো ব্যাপার নয়, তৈরী করার সময় ঠিক মতো নজর রাখলেই চলবে।' বললেন মিসেস নাইবুর। আর মনে মনে ভাবলাম, তা উনি যে ধরণের মহিলা, নজর তো রাখবেনই, যখন স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোক দেখানোটাই ও'র কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

মিসেস নাইবুর চলে যেতেই কফিন মিস্ত্রী উইলকি তার কারখানা থেকে বেরিয়ে এলো। তার হাতে একটা স্প্রাউট মাছ ভাজার বাক্স।

ওকে দেখেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'জীবন সম্পর্কে তোমার কি ধারনা উইলকি ?'

'ধারনা অনেক রকমের', তারিয়ে তারিয়ে মাছ ভাজা খেতে গিয়ে বললো উইলকি, 'সকালে অন্যরকম, বিকেলে আর একরকম ; আবার শীতে যেমন মনে হয় গ্রীষ্মে ঠিক তার উল্টো ধরনের, খাবার আগে যেরকমটি মনে হয়, খাবার পরে কিন্তু ধারণাটা বদলে যায়। আর এই যে যৌবনে যে ধারণা রয়েছে আবার, বার্দ্ধক্যে সেরকমটি হয়তো থাকবে না।'

'অপূর্ব'! এ যে দেখছি দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর হে তোমার।'

'তাই বুঝি ? কিন্তু উত্তর যদি তোমার জানাই ছিলো, তাহলে আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেই বা কেন ?'

'শেখবার জন্য, শেখার কি শেষ আছে ? যেমন সকালে একভাবে প্রশ্ন করি, বিকেলে অন্যরকম ভাবে। শীত আর গ্রীষ্মের প্রশ্ন আলাদা আলাদা ভাবে করি।'

আবার সহবাসের আগে, যে ভাবে প্রশ্ন করি, পরে সহবাসের উপভোগ প্রশ্নটা অন্য রকম হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ বাঃ দারুণ কথা বলেছো তো…সহবাসের উপভোগের পরে প্রশ্নটা অন্যরকম হয়ে যায়…' কথাটা লুফে নিয়ে সঙ্গে ফলে উইলকি বলে উঠলো, 'শোনো, তোমার কাছে সোয়েটার পড়া একটি মেয়েকে প্রায়ই আসতে দেখি, ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে ?'

অবাক চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম কফিন মিস্ত্রীর দিকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না গার্দার কথাই বলছে ও. আর ওই মেয়েটির জন্যই আমি এখন অপেক্ষা করছি। তাই ওর কথায় কান না দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরেই বললাম, 'আমি মেয়ে মানুষের দালালি করি না। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, মেয়েদের নিয়ে তোমার ওই কবরখানার ঢুকো না। মেয়েরা কফিন দেখলে ভীষণ ভয় পায়। তখন তাকে নিয়ে তোমার সব আনন্দ, উপভোগ মাটি হয়ে যাবে, বলে রাখছি।'

'তাহলে যাবোটা কোথায় শুনি ? হোটেলে। আমার অতো টাকা নেই। পার্কে ? ওখানে আবার পুলিশের উতপাৎ আছে। আর এই বাগানে ? তার চেয়ে আমার কারখানা অনেক নিরাপদ। আরু আছে।'

'কেন, তোমার ফ্ল্যাটে নেই ? সেখানে তো তাদের নিয়ে যেতে পারো।'

'না, তা সম্ভব নয়। বাড়িউলিটা ভীষণ বজ্জাতে। বছর দশেক আগে একরকম বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক পাকিয়ে ছিলাম, সে কথা আজও ভুলতে পারেনি ও। তা দাও না ভাই, ওই সোয়েটায় পরা মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে।'

আমি ওর হাতের খালি মাছের বাক্সটা দেখিয়ে বলে উঠলাম, 'ওতে আর ভাজা মাছ নেই।' ও তখন হাত ধুতে চলে গেলো। এই ফাঁকে আমি আমার অফিসঘরে পালিয়ে এসে নাইবুরের সমাধির নকশা তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই দেখলাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গার্দা হাসছে। তাড়াতাড়ি নক্‌শার কাগজপত্র গুটিয়ে রাখলাম। উইলকি দেখতে পেয়েছে ওকে। ও তখন মাছভাজার বাক্সটা দেখিয়ে দুটো আঙ্গুল দেখালো, অর্থাৎ দু'বাক্স মাছ ভাজার টোপ ফেললো ও। বিনিময়ে গার্দার সঙ্গে ভাব জমাতে চায় ও।

গার্দার পরণে ছাই রঙের স্কার্ট আর হাল্কা ধূসর রঙের সোয়েটার। আজ ওকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। কফিন মিস্ত্রীও গার্দাকে চাইছে, যে নারীকে একাধিক পুরুষ কামনা করে, তার আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ারই কথা।

'নাইট ক্লাবে গিয়েছিলে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওই আস্তাকুড়ে ?' মাথা নাড়লো গার্দা। 'না প্র্যাক্টিস করছিলাম।'

আজ ভীষণ ভাল লাগছে গার্দাকে। ওদিকে উইলকি তিনটে আঙ্গুল দেখালো

আবার, তার মানে তিন বাক্স ভাজা মাছের টোপ। মন্দ কি এই মুদ্রাফীতির বাজারে বিনা পয়সায় তিন বাক্স মাছ ভাজা পেয়ে যাওয়া। না, তা বলে ওই নারীলোভী লোকটার হাতে গার্দাকে সঁপে দেবে? তা হয় না এখন আর। এরনার রূঢ় ব্যবহার, এবং ইসাবেলের নিস্পৃহতার পর গার্দাই এখন আমার জীবনের শেষ অবলম্বন, একটু সুন্দর স্বপ্নের মতো আমার জীবনে উদয় হয়েছে ও যেন। আমি আমার উচ্ছাস আর চেপে রাখতে পারলাম না, ওকে বললান, 'চলো গার্দা, আজ বরং ওয়াল হাল্লায় যাওয়া যাক। তুমি চলে যাবে। তাই চলো, আজ তোমার সম্মানে একটা উৎসব করা যাক।'

গার্দাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি, ম্লান বিষণ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে উইলকি। চোখে চোখ পড়তেই দশটা আঙুল তুলে দেখালো সে, তার মানে দশ বাক্স মাছ ভাজার প্রলোভন। হাসলাম, সাড়া দিলাম না।

রাতে কুপন নেয় না নবলক। কিন্তু গার্দাকে এক নজর দেখে নিয়েই হঠাৎ ও কেমন রাজী হয়ে গেলো কুপন নেবার জন্য। শুধু তাই নয়, টেবিলের কাছে অহেতুক ঘুরঘুর করার সময় একবারের জন্য একটু থেমে শেষ পর্যন্ত সে তার মনের কথাটা বলেই ফেললো, 'আমার সঙ্গে তোমার বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

কুপন নিতে রাজী হয়েছে সে, তাই অগত্যা তার কথা মানতে হলো। 'ইনি হলেন এডুয়ার্ড নবলক, অনেকগুন আছে ওর—একাধারে হোটেল মালিক, কবি, কোটিপতি তবে অসম্ভব কৃপন?' এডুয়ার্ডের দিকে ফিরে সে আবার বললো। 'আর ও হলো ফ্রাউলিন গার্দা স্নিভার।'

'ওর কথায় কান দেবেন না ফ্রাউলিন।' এডওয়ার্ড খুশি হলেও রাগতে কসুর করলো না।

'আপনি যে একজন কোটিপতি', এক গাল হেসে বললো গার্দা, 'কি ভালোই না লাগছে কথাটা শুনে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডুয়ার্ড আবার। 'ব্যবসায়ীর দুঃখের কথা ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। এর কথায় আপনি কান দেবেন না। যাইহোক, আপনার কি অপরূপ রূপ। ঈশ্বর যেন আপনার মধ্যে রূপ বিতরণ করতে গিয়ে কোনো কৃপনতা দেখাননি। একই অঙ্গে এত রূপ। চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। আপনি যেন এক মুক্তপাখির মতোন, বিষাদ ভরা আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছেন।'

এডুয়ার্ডের রোমান্টিক কথা শুনে আমি তো থ! আর আজ গার্দাও দেখছি দারুণ মোহিনী হয়ে উঠেছে। এডুয়ার্ডের প্রতি আমার হিংসেও হলো, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'ওসব পুথিগত বিদ্যে কপচানো ছাড়ো। জানো, উনিও একজন

শিল্পী।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বিষাদে ভরা আকাশ আমাকেই বোঝাতে চাইছো? এতো সব কাব্য না করে, যাও আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দাও ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'বাঃ, হের নবলক দেখছি সত্যি সত্যি ভালো কবি একজন। দারুণ কাব্য করতে জানেন।' তার দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে গার্দা বলে উঠলো, 'ভাবতে অবাক লাগছে, এতো কাজের মধ্যেও কাব্য করার সময় পানই বা কোথ্থেকে?'

'সবই করে রাখা ভালো', প্রশংসা শুনে গদগদ হয়ে বললো গার্দা, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনিও একজন স্বভাব কবি।'

বেশ বুঝতে পারি, এরই মধ্যে রেণী দ্য লা তুরকে ভুলে গেছে সে, এখন ওর লক্ষ্য গার্দার দিকে। গার্দার দিক থেকে ওর ক্রূর-দৃষ্টি ফেরানোর জন্য বললাম, 'ও একজন শিল্পী বটে, তবে গানবাজনার নয়, সার্কাসের বাঘ সিংহ খেলায়।'

'হ্যাঁ, আবার আমি সার্কাসে যাচ্ছি, ফেলে আসার জীবনটাকে আর একবার ঝালিয়ে নিতে চাই।'

'তা তুমি কি শুধু হাঁ করে গার্দার দিকে তাকিয়ে থাকবে, নাকি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে?'

এবার এডুওয়ার্ড ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'তা হ্যাঁ, আমি নিজে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।' গার্দার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো সে, 'একজন শিল্পী আজ আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁকে তো একটু বেশী করে খাতির যত্ন তো করতেই হবে।'

অপসৃয়মান এডুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে গার্দা বললো মানুষটা দারুন ভালো। উনি কি বিয়ে করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছিল বৈকি। তবে ওর ওই নোংরা স্বভাব আর কিপ্টেমির জন্য ওর বৌ ওকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'তা ওর বৌয়েরই তো দোষ। পুরুষদের খরুচে হলে চলে না। তাতে টাকা জমে না। কোটিপতি হওয়া যায় না।'

'মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃপণতা দেখানোটা কি মূর্খামো নয়?'

'কিন্তু টাকাটাও তো ঠিক মতো খাটাতে হবে?' ছুরি-কাটাগুলো অকারণ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বললো গার্দা, 'তোমার বন্ধু শুধু কবিই নন, ব্যবসা বেশ ভালোই বোঝেন।'

গার্দা বলে কি? নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'তা না হয় মানলাম। কিন্তু বৌকেও তো একটু সুখে রাখতে হবে। এডুয়ার্ডের কাছে বৌ মানেই বিনি পয়সায় কাজের লোকের মতো উদয়াস্ত খাটিয়ে নেওয়া।'

গার্দার ঠোঁটে মোনালিসার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'তুমি এখনো শিশু!

আছো, প্রত্যেক আয়রণ সেফের নিজস্ব চাবি থাকে, বুঝলে।

গার্দা আমাকে ক্রমাগত অবাক করে তুলছে। গতকাল পর্যন্ত এই মেয়েটাই কত সহজ সরল জীবনের কথা শুনিয়েছিল আমাকে। অথচ আজ! এডুয়ার্ডের দিকে ওকে ফেরাবার শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য বললাম, 'তুমি যা ভাবছো লোকটা ঠিক তা নয়। আসলে ও মাথামোটা, নোংরা আর ভয়ঙ্কর কৃপণ?' নারী বিশেষজ্ঞ রাইজেনফেল্ড আমায় জ্ঞান দিয়েছিল—কোনো পুরুষের সম্পর্কে এই তিনটি বিশেষণ শুনলেই মেয়েরা সেই পুরুষটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। কিন্তু গার্দার মধ্যে সেরকম ভাব লক্ষ্য করলাম না, ও যেন আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো মোটেই নয়। উল্টে বেশ আগ্রহ সহকারে কাট গ্লাসের ঝাড়লণ্ঠনগুলো দেখতে গিয়ে কেমন ভাবাবেগে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো ও, 'ওঁর যত্ন নেওয়ার মতো কেউ আর নেই দেখছি। ওঁর সেই ঘর পালানো বৌয়ের মতো নয়, এমন একজনকে ওঁর প্রয়োজন, যে কিনা ওঁর ভালো দিকটা তুলে ধরবে, ওঁর গুণের প্রশংসা করবে।'

এবার আর অবাক হওয়া নয়, রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। ভেবেছিলাম, সামনের দুটো সপ্তাহ একটু সুখে কাটাবো, কিন্তু এখন দেখছি আমার কপালে সুখ নেই। মরীয়া হয়ে বলে উঠলাম, 'এডুয়ার্ডের কোনো ভালো গুণ নেই।'

'আছে, প্রত্যেক মানুষেরই আছে।' হাসলো গার্দা, 'তবে সেটা প্রকাশ করিয়ে নিতে হয়।'

এই সময় ওয়েটার টেবিলে প্লেট-ভর্তি খাবার সাজিয়ে দিলো।

'এ আবার কি?' জিজ্ঞেস করলাম ওয়েটারকে।

'রাজহাঁসের মেটে দিয়ে তৈরী খাবার।'

'কিন্তু এ খাবারের অর্ডার তো আমরা দিইনি।'

'হের নবলক নিজের থেকে অর্ডার দিয়েছেন', এই বলে ওয়েটার খাবারের বেশী অংশ তুলে দিলো গার্দার প্লেটে, আর আমার প্লেটে সামান্য অংশটুকু। রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই গার্দা আমাকে থামিয়ে দিলো আমার পায়ের ওপর ওর পায়ের চাপ দিয়ে। প্লেট দুটো পাল্টাপাল্টি করে নিয়ে বললো ও, 'পুরুষেরই তো বেশী খাওয়া উচিত।'

ওয়েটারটা ঘাবড়ে গেলো। আমতা আমতা করে বললো সে, 'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু সেটা বাড়িতে, হোটেলে নয়।' তার মানে বুঝলাম, এডুয়ার্ড তাকে এই ভাবেই দম দিয়ে পাঠিয়েছে।

এদিকে এডুয়ার্ড ছুটে এলো পরিস্থিতি নিজের হাতে সামাল দেওয়ার জন্য। এক পলকে দেখে নিয়ে সে আমার প্লেট থেকে বড় একটা অংশ তুলে নিয়ে আবার গার্দার প্লেটে রেখে দেয়। তারপর বেশ গদগদ হয়ে বললো, 'খেতে শুরু করুন।' তারপর

সে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি রকম লাগছে?'

'ভালই। তবে হাঁসের মেটে যদি বলো তাহলে খারাপ বলবো।'

'কেন, এটা তো হাঁসেরই মেটে।'

'কিন্তু স্বাদটা তো বাছুরের মেটের মতো।'

'জীবনে কখনো হাঁসের মেটে খেয়েছো নাকি?' ব্যাঙ্গ করে বললো, নবলক। তারপর গার্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো সে, 'তা আপনার কেমন লাগছে বলুন?'

'অপূর্ব!'

খুশিতে ভরপুর মন নিয়ে চলে গেল এডুয়ার্ড। গার্দা তখন মুখ খুললো, 'তুমি না বলছিলে, লোকটা কৃপণ, কিন্তু কৃপণ বলে তো আমার মনে হলো না!'

'তুমি সার্কাসের মেয়ে', দাঁতে দাঁত ঘসে আমি তখন বললাম, 'তুমি কি বুঝবে কে কেমন লোক? তুমি তো জানো না, ওই কৃপণ লোকটার সব দর্প চূর্ণ করে ওর বৌ একজন ফাটকাবাজের হাত ধরে ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তা তুমিও কি ওর বৌয়ের মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে চাইছো?'

'বাজে কথা বলো না তো! এতো ঠুনকো সম্মান যার, বাঁচতে পারে না সে। বরং আমি কি বলি জানো, ওঁর মতো ভালো রোজগারের ধান্দা দেখ।'

'তোমার পরামর্শটা সৎ। কিন্তু রোজগার করবো বললেই তো আর করা যায় না। আর সেটা কোন ম্যাজিকও নয়।'

'কিন্তু অন্যরা কি ভাবে করে। যেমন—'

'বুঝেছি, কার কথা তুমি বলতে চাইছো। হ্যাঁ, এডুয়ার্ড এটা পেয়েছে ওর উত্তরাধিকার সূত্রে।

'আর উইলি?'

'ও তো হরেক রকমের ধান্দা করে থাকে। ও তো একটা ফাটকাবাজ। ধরা না পরা পর্যন্ত ও চালিয়ে যাবে ওর সেই অসৎ ব্যবসা।'

'তাহলে দেখছো তো, মানুষের ইচ্ছে থাকলে সব কিছুই করা যায়?'

আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, অতো নিচে আমি নামতে পারবো না। ওই অসৎ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মাথার মধ্যে আমার তখন আগুন জ্বললেও শান্ত সংযত গলায় বললাম, 'এখন মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলেছো।'

'হ্যাঁ, আমি কখনো বেঠিক কিছু বলি না। 'কিন্তু ওটা, ওটা কি আবার?'

মুর্গীর রোষ্ট পাঠিয়ে দিয়ে এডুয়ার্ড নিজেই আবার ছুটে এসে পরিবেশন করতে লেগে গেলো। গার্দার প্লেটে মুরগীর ঠ্যাং আর আমার প্লেটে শুধু পাঁজরার হাড়। আমার মনের অবস্থার কথা ভেবে এডুয়ার্ড বললো, 'এগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু। খাও চুষে খাও।' ওর কথায় প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই, পরে সামলে নিয়ে

চিৎকার করে উঠলাম।

ষাড়ের মতো অমন চিৎকার করছ কেন হে?' কৈফিয়ত চাওয়ার মতো করে বললো এডুয়ার্ড।

'কই আমি তো চেঁচাইনি। গার্দা স্যালাড চাইছিল।'

সন্দেহের চোখে গার্দার দিকে তাকালো সে। 'আপনি আমায় ডাকলেন?'

ব্যাপারটা না বুঝেই গার্দা বললো, 'তা স্যালাড একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন।

এডুয়ার্ড ফিরে গেলেও তার কেমন যেন সন্দেহ হলো—তার ধারণা, রেণী দ্য লা তুয়েরই বোন হবে। রেণীর মতো এই মেয়েটিও কি দু'রকম গলায় কথা বলতে পারে? ওর ভুল শুধরে দিলো ওয়েটার, 'না হের বোদকার ডেকেছিলেন।' এডুয়ার্ড তখন রাগে এতোই খাপ্পা যে তার কথা সে কানেই নিলো না।

রাত তখন অনেক। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে। অনেক দূরে চাঁদের আলোর ছায়া পড়েছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল লাইলাকের মিষ্টি সুবাস। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা চটপট আমাদের বাগানে ঢুকে পড়লো। এটা রোজকার ব্যাপার, তাই মাথা ঘামালাম না।

হঠাৎ ঘোড়ার কসাই ওয়াটজেককে দূর থেকে আসতে দেখে আমার গায় কাঁটা দিয়ে উঠলো। একটু পরেই সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওদের ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। এরপর সে নিশ্চয়ই লিসাকে খুঁজবে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না। একবার ভাবলাম, জর্জকে গিয়ে খবর দিই। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকাকে এ সময় বিরক্ত করতে মন চাইলো না। এদিকে সেই কসাইটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চারপাশটা দেখলো। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠতে দেখা গেলো। একটু পরেই দরজার সামনে চেয়ার টেনে বসলো সে। দেখলাম, তার পায়ের বুট জুতোয় একটা লম্বা ছুরি গোঁজা রয়েছে। তার মানে প্রস্তুত হয়েই বসে আছে সে, লিসা ফিরলেই ধরবে তাকে। দেখছি আজ একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে ছাড়বে না সে। আর লিসারও বলিহারি, সেই যে জর্জের ঘরে ঢুকেছে, বেরুবার নাম নেই। একটু আগে ওদের প্রেমের প্রথম পাঠ শেষ হয়েছে। ওরা কি এখন প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে বসেছে নাকি? এখন যদি লিসা তার স্বামীর হাতে ধরা পড়ে? অবশ্যই সেই দৃশ্যটা হবে অতি ভয়ঙ্কর।

অতি সন্তর্পণে জর্জের ঘরে গিয়ে টোকা মারতেই ওর টাক মাথা বেরিয়ে এলো দরজার ফাঁক দিয়ে। ঘটনাটা খুলে বললাম ওকে। 'এখন উপায়? যে ভাবেই হোক ওকে ওর ঘর থেকে সরিয়ে দাও।' জর্জ আমার হাত চেপে ধরে অনুরোধ করলো 'আমাকে দয়া করো, নইলে—'

জর্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম ওয়াটজেকের কাছে। ওর মন ভোলানোর

জন্য কাব্য করে বললাম, 'কি সুন্দর রমণীয় রাত, তাই না?'

'রাত সুন্দর রমণীয়ই থাকে', পরক্ষণেই ভয়ংকর রুক্ষ গলায় ওয়াটজেক বললো, 'তবে বেশীক্ষণ থাকবে না।'

'কি থাকবে না?' সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'এই নোংরামি।'

'নোংরামী?' এবার আমি সত্যি সত্যি ভয় পেলাম। 'এ তুমি কি বলছো?' বলেই চকিতে ওর বুটে গোঁজা লম্বা ছুরিটার দিকে দৃষ্টি ফেললাম আমি। তারপরেই একটা কাল্পনিক দৃশ্য ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে—মাটির ওপর পড়ে আছে জর্জের দেহটা, দেহ থেকে তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন। আশ্চর্য, এরা ওদের দুশ্চরিত্র স্ত্রীকে শাস্তি দেয় না, কারণ দিতে ভয় পায়। সব দিক বাঁচিয়ে আমি ওকে বললাম, 'ব্যাপারটাকে তুমি কি চোখে দেখবে, তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করে।'

'আমি কিছু বুঝি না', উত্তরে খুব গম্ভীর হয়ে বললো ওয়াটজেক, 'এই নোংরামির জন্য প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে। দেখবে রক্তের স্রোত কেমন বয়ে যায়। অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি তো পেতেই হবে। কোনো ক্ষমা নেই।

কথা না বলে আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম স্থির দৃষ্টিতে। ওয়াটজেক আবার নিজের থেকেই বললো, 'উনিই আমাদের বিধাতা, উনিই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওঁর কথা শুনেছো তুমি?'

'কার, কার কথা বলছো তুমি বলো তো?' আমি যে কিছুই শুনিনি, এমন ভাব দেখিয়ে বললাম। একবার দেখে নিয়েছি জর্জের ঘরের জানালা বন্ধ হয়ে গেছে। সময় কাটানোর জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা তুমি শোনাতে চাইছো? আমাদের পরমগুরু, ঈশ্বরের কথা বলছে?'

'না, তিনি একজন জীবিত মানুষ, যাঁর নাম শুনলে মানুষ যেমন ভয় পায়, আবার শ্রদ্ধাও করে থাকে। তিনি আমাদের ফুয়েরার। অ্যাডলফ হিটলার।'

'হিটলার? ওহো, তাই বলো', মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'উনিই তাহলে—'

'উনিই তাহলে…এভাবে কথা বলছো কেন? ওর কাজকর্ম তুমি কি তাহলে সমর্থন করো না?' ওয়াটজেকের কথায় একটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গী।

'কি দারুণ সমর্থন আমি ওঁকে করি, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু এখন ওর কথা এখানে আসে কি করে?'

'তাহলে ওঁর কথা তুমি শুনলে না কেন?'

'কি করেই বা শুনবো; উনি তো আর এখানে নেই।'

'তা ঠিক। আজ তিনি রেডিওতে জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। আমার

আস্তাবলে ছ'ব্যাটারির একটা ট্রানজিসটার আছে, তাতেই শুনেছি। ওঃ, কি অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন তিনি। একমাত্র উনিই জানেন আজকের সমাজে গলদটা কোথায়। ও'র বক্তব্য, সব কিছুর পরিবর্তন আনতে হবে।'

'তা তো ঠিকই। পরিবর্তন আনতে হবে। তার আগে বীয়ারে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হতো না?'

'বীয়ার?' ওয়াটজেকের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো বীয়ারের নাম শুনে। 'কিন্তু ওটা পাই কোথায়?'

'ব্রুমসে। ওই, ওদিকটায়—কোণের রেস্তোরায়।'

'এখন ওখানে যেতে পারবো না। আমি আমার নচ্ছার বৌয়ের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'তা অপেক্ষা তো তুমি ব্রুমসেও করতে পারো।' আমি ওকে তাতাবার জন্য বললাম, 'হিটলার আরো কি কি বললেন, বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার রেডিওটা আমার খারাপ হয়ে আছে।'

এবার ওয়াটজেক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'অনেক, অনেক কিছুই বলেছেন। সবজান্তা উনি।' এই বলে চেয়ারটা ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে ও এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করলো আমার সঙ্গে। কাছেই ব্রুমস গার্ডেন রেস্তোরা, ওই তো দেখা যাচ্ছে।

□ দশ □

বিকেলের কনে-দেখা আলোয় পাগলদের আশ্রয়স্থলের পরিবেশটা মোটামুটি শান্ত। আমার পাশে বসা দুজন লোক এ ওকে বুঝিয়ে চলেছে, কে পাগল এখানে, আর কোন লোকটাই বা স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু আসলে কেউ কারোর কথাই শুনছে না। শুনবেই বা কি করে, তারা তো এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা!

ওদিকে একদিনে ডলারের দাম বেড়ে গেছে কুড়ি হাজার মার্ক। আশ্চর্য, তাতেও কারোর দুশ্চিন্তা নেই। কেবল একজোড়া বয়স্ক দম্পতি গত রাত্রে আত্মহত্যা করেছেন। আজ সকালে তাদের মৃতদেহ আবিস্কৃত হয় পোশাকের আলমারির ভেতরে। পোষাক শুকোতে দেয়ার দড়ির দুই প্রান্ত দুজনে গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছিলেন। ওই দড়িটুকু ছাড়া তাঁদের আর এক টুকরো সুতোও আর অবশিষ্ট ছিল না বাড়িতে, দেনার দায়ে সবই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এমন কি সেই আলমারিটাও। খদ্দের আলমারিটা নিতে এসে তাদের মৃতদেহ দুটি আবিস্কার

করে। সেই দম্পতি আত্মহত্যা করার আগে একটা চিরকুটে লিখে গেছেন : তাদের ইচ্ছে ছিলো রান্নার গ্যাসে আত্মহত্যা করার। কিন্তু বিলের টাকা মেটাতে না পারায় গ্যাস কোম্পানী গ্যাসের লাইন কেটে দিয়ে গেছে। ও'রা আলমারির খদ্দেরের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছেন।

এক সময় ইসাবেল এলো। নীল রঙের টেনিস হাফ প্যান্ট, গোলাপী ব্লাউজে মানিয়েছিল ভালো ওকে বেশ। গলায় অ্যাম্বারের মালা। ইদানীং উপাসনার পরেই বাড়ি চলে যেতাম। বোদেনদিয়েক ও ডঃ ওয়েরনিকের সঙ্গে রাতের খাওয়াটা ভালো হলেও ওদের সঙ্গ এড়িয়ে পালিয়ে আসতাম, তার চেয়ে গার্দার সঙ্গ আমার কাছে অনেক ভালো লাগতো।

'কতদিন দেখিনি তোমায়! এতোদিন আমাকে না দেখে থাকতে পেরেছিলে তুমি? উঃ কি নিষ্ঠুর তুমি?' সেই একই অভিযোগ করলো ইসাবেল। আমার পাশে বেঞ্চের হাতলে বসে ও জিজ্ঞেস করলো, 'টাকার মূল্য যেখানে বেশী, তুমি কি এতোদিন সেখানেই ছিলে? আমার পাশে বসা লোকদুটি বিরক্ত হয়ে উঠে গেলো। আরও ঘনিষ্ট হয়ে ইসাবেল নিজের থেকেই আবার বললো, 'বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কেন অসময়ে মারা যায় বলতে পারো? কদিন পরেই যখন ওরা মারা যাবে, তখন ওদের জন্ম দিয়ে লাভ কি বলো?'

'এসব প্রশ্ন তো তুমি বিশপের প্রতিনিধি বোদেনদিয়েককে করলেই পারো। উনি বলেন, ঈশ্বর নাকি সব জানেন, সব কিছু লিখে রাখেন তিনি। কখন কে জন্মাবে, কার কখন মৃত্যু হবে…'

'ঈশ্বর সব লিখে রাখেন?' হাসলো ইসাবেল। 'তা কার কথা লিখে রাখেন তিনি। নিজের কথা শুধু? কিন্তু কেন, তিনি তো শুনেছি সর্বজ্ঞ?'

'হ্যাঁ, উনি সর্বজ্ঞই বটে', হঠাৎ রেগে গিয়ে বললাম, 'শুধু তাই নয়, তিনি ন্যায়-পরায়নও বটে, আর সকলেই তার প্রিয়। তবু শিশুদের মৃত্যু হয়, মৃত্যু হয় শিশুদের মা-বাবারও।'

ইসাবেলের হাসি মিলিয়ে গেছে। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো ও, 'আচ্ছা রুডলফ, পৃথিবীতে কেউ সুখী নয় কেন বলতে পারো?'

'হয়তো ঈশ্বর তা চান না।'

'না, তুমি কিছুই জানো না', প্রতিবাদ করে উঠলো ইসাবল, আসলে ঈশ্বর ভয় পান আমাদের। আমরা সবাই সুখে শান্তিতে থাকলে যদি আর তাকে স্মরণ না করি, সেই জন্য।'

'কিন্তু কিছু সুখী লোকও ঈশ্বরের ভজনা করে থাকে', পাল্টা প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'ওরা ভজনা করে ভয়ে, পাছে ওদের সুখ নষ্ট হয়ে যায়? সকলেই ভয় পায়। তুমি পাও না রুডলফ?'

'কিসের? প্রাণের?' আমি জানতে চাইলাম।

মাথা নেড়ে ইসাবেল বললো, 'না, তারও পরের ব্যাপারে।'

'মৃত্যুর কথা বলছো তুমি?'

'না', এবারেও মাথা নাড়লো ইসাবেল। আগের চেয়ে ওকে এখন অনেক বেশী গম্ভীর দেখাচ্ছে। এই মুহূর্তে কে বলবে ও পাগল? অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও জিজ্ঞেস করলো। 'কথা বলছো না কেন তুমি?'

'কি হবে কথা বলে?'

'অনেক কিছু। তা তুমি কি কথা বলতে ভয় পাও রুডলফ?'

'হ্যা, কথাকে আমরা ভীষণ ভয় পাই। সত্যিই তো, কথা দেওয়া, কথা দিয়ে কথা না রাখা—সব কিছুই দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয় আমাদের যেন।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাও?' ইসাবেল একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসলো হঠাৎ, 'তুমি কি আমাকে ভয় পাও কথা দিতে?'

আমার তখন বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো, 'না ইসাবেল, একমাত্র তোমাকেই আমি ভয় পাই না। কারণ আমার মতো তোমারও পৃথিবীর সব অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে যতো মাথা ব্যাথা।' এখানে একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'অনেক সময় কিছুই বলা যায় না। তখন নিজেই নিজের বাধা হয়ে দাঁড়াই।'

'তবু কথা বলা দরকার। জানো তো রুডলফ, ছুরি নিজেকে কখনো কাটতে পারে না। কিন্তু ছুরি ব্যবহার না করলে ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই তা চাইবে না।'

'জানি না, কি বলবো।'

'জানবার জন্য বেশী সময় নষ্ট করলে পরে দেখবে, যখন তুমি জানলে তখন হাতে আর সময় নেই। তাই আবার আমি বলছি, ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে কথার আশ্রয় তো নিতেই হবে। জানো, কথা অনেকটা আলোর মতো, সব অন্ধকার দূর করে দেয়। কথা বলে, কথা দিয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করছো না কেন রুডলফ?'

অমি আমার কামনার কথা আর চেপে রাখতে পারলাম না, আবেগ মেশানো কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'আমি যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, আমার চেয়ে সুখী আর কে হতে পারে বলো?'

হঠাৎ ইসাবেল দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো, ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর, ওর দেহের ঘ্রাণ কি মিষ্টি, বুক ভরে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে তো ক্ষণিকের জন্য শুধু। আমার সেই ভালো লাগার মুহূর্তটা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো, 'আমার সঙ্গে এসো। ওরা ডাকছে।'

'কারা?'

'ওদের কণ্ঠস্বর তুমি শুনতে পাচ্ছো না ? ওরা যে আমায় সবসময় ডাকে।'

ওর ঠোঁটে চুমু খেয়ে গাঢ় স্বরে বললাম, 'আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি ইসাবেল।'

অন্ধকার নামছে। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে একজন সেবিকাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। কাছে এসে বললো সে, 'সময় শেষ, এবার ফেরার পালা।'

'ওরা আমায় বার বার ডাকে। ওদের হদিশ তুমি কোনদিনও পাবে না। আচ্ছা, ওরা এতো কাঁদে কেন বলো তো ?' কথা বলতে গিয়ে ইসাবেলের কণ্ঠস্বর ক্রমশ করুণ হয়ে এলো, জড়িয়ে যেতে থাকলো। এক সময় ওর অবশ, অচৈতন্য দেহটা কোনো রকমে ধরে নিয়ে এসে একটা সোফায় শুইয়ে দিলাম ওকে।

আজ বোদেনদিয়েক আগেই খাওয়া সেরে চলে গেছেন। বাকী ছিল আমি আর ডঃ ওয়েরনিক। ডাক্তারকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'যে সব রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই, তাদের মেরে ফেললেই তো হয়।'

'আপনি পারবেন তাদের মারতে ?' পাল্টা প্রশ্নটা করলেন ডাক্তার।

'বলতে পারছি না, তবে ধরুন যারা মৃত্যু যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কষ্টের দিনগুলো কমিয়ে আনার জন্য আপনি আপনারা তাদের এমন ইনজেকসন দিন যাতে করে তারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে, চিরদিনের জন্য।'

ডাক্তার চুপ করে রইলো। ভাগ্য ভালো বোদেনদিয়েক নেই, থাকলে তিনি নৈতিক বা ধর্মীয় প্রসঙ্গ তুলে আলোচনাটা বানচাল করে দিতেন। ডাক্তারকে নীরব থাকতে দেখে বললাম, 'আমি জানি, কারোর প্রাণ নেওয়া ভীষণ অপরাধ, তাকে হত্যা করাও। যুদ্ধে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে দেখে তারপর থেকে একটা মাছিও মারতে চাই না আমি এখন আর। অথচ দেখুন, এই যে আমরা প্রতিদিন কতো প্রাণীর মাংস খাচ্ছি, এর জন্যও তো তাদের প্রাণ দিতে হচ্ছে, সেটা কি হত্যা নয় ? কি বিচিত্র জীবনের বিধি নিষেধ ? এমনিতে অসুস্থ মানুষকে এমন কি একটা কুকুরকে মারতে আমাদের বিবেকে বাধে। কিন্তু যুদ্ধে লাখ লাখ লোককে নির্বিচারে হত্যা করতে গিয়ে একবারও আমরা আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি না, কেন এই হত্যা ?

ডাক্তারকে এবারেও মুখ খুলতে না দেখে আমি নিজেই আবার বলে চললাম, 'বোদেনদিয়েক ধর্মপুত্তুর, তিনি এখানে থাকলে বলে উঠতেন, পশুদের সঙ্গে মানুষের তুলনা চলে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? বোদেনদিয়েক কোনো কিছু তলিয়ে না দেখে দার্শনিকের মতো বলে থাকেন, বিশ্বাস থাকলেই সব হয়, বিশ্বাসেই মিলায় বস্তু। কিন্তু আমার ধারণা কি জানেন, ও সব ঠুনকো ভক্তি বা বিশ্বাসের মূলে একটাই আসল সত্য হলো, ভয়, মৃত্যু ভয়। কিন্তু কেন ?'

'আপনার বলা শেষ হয়েছে ?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'না। তবে আপনার কাছে আর কিছু জানতেও চাইবো না।'

'ভালো। কারণ আপনার এ ধরনের প্রশ্নের কোনো উত্তরই আমার জানা নেই।'

'আপনি যথার্থই বলেছেন। পৃথিবীর এমন কোনো লাইব্রেরী নেই, যেখানকার সব বইপত্র ঘাটলেও আমার এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেসব দুঃস্থ দরিদ্ররা কায়ক্লেশে, দুরারোগ্য রোগ নিয়ে সমাজের নিচুস্তরে আজও কোনরকমে দিন কাটিয়ে চলেছে, তাদের জীবন বলতে কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন ?'

'দেখুন, আমি একজন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, মানুষের জীবন-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কাজ নয়, আমার কাজ হলো মানুষের রোগ নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ করা। আর বোদেনদিয়েক সব কিছু মেনে নিয়ে দার্শনিকের মতো চিন্তা করেন। কিন্তু আপনি, আপনি কি করছেন ? এই দুয়ের মাঝে অনিশ্চয়তার দোলায় ঝুলছেন, ঝুলছেন না ?'

বুঝলাম ডাক্তার আমার আলোচনার ইতি টানতে চাইছেন এখানেই। তাই এ প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বললাম, 'ফ্রাউলিন কেমন আছে ? আগের চেয়ে ভালো মনে হয় ?'

'না, খারাপই বলতে পারেন। ওর মা এসেছেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, মেয়ে তাঁকে চিনতে পারলো না।'

'চিনতে পারলো না, নাকি চিনতে চাইলো না।'

'ঠিক এই রকমই আমি মনে করি। মেয়েটি তার মাকে চিনতেই চাইলো না। চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তুমি যাও, চলে যাও এখান থেকে। ঠিক যেমনটি হয় এক্ষেত্রে।'

'তার মানে ?'

'সে অনেক কথা। তাহলে তো দ্বৈতসত্তার অসুখের ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলতে হয়। কিন্তু এখন আমার অতো সময় নেই। পরে বোঝাবো।'

'আচ্ছা ডাক্তার, ও কি সেরে উঠবে ?'

'সেরকম সম্ভবনা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাহলে কেনই বা ওকে অযথা এখানে রেখে দিয়েছেন ?'

'পৃথিবীতে অনেক কেন'র উত্তর পাওয়া যায় না। তার চেয়ে চলুন আমার সঙ্গে ওয়ার্ডে, যদি আপনার এই কেন'র উত্তর পেয়ে যান—'

সেণ্ট্রাল কাফে—আমি, জর্জ আর উইলি বসে আছি। আজ রাতে বাড়ি ফেরার আর ইচ্ছে হচ্ছে না। ডাক্তার পাগলা গারদে যা দেখিয়েছে, তাতেই আমার মাথা ঘুরে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে, ট্রেঞ্চে আর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই অহরহ

দেখেছিলাম চার বছর আগে, সেই চিত্রটাই আজ প্রত্যক্ষ করলাম অন্যরূপে, কয়েকজন মানুষের ফ্যালফেলে দৃষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম পাগলাগারদের ওয়ার্ডে।

'উঠে দাঁড়ান!' আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। এই নিয়ে চারবার। অর্কেস্ট্রায় তখন জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজানো হচ্ছিলো। এবার আমরা বসেই রইলাম, বার বার উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এর আগে তিন তিনবার আমরা দাঁড়িয়েছিলাম।

আমাদের বসে থাকতে দেখে একটি বছর সতেরোর কিশোর আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। হুকুম করলো সে, 'চটপট উঠে দাড়ান।'

'যা যা, স্কুলের ছেলে, স্কুলে গিয়ে পড়গে', আমি তাকে পাত্তা দিতে চাইলাম না।

'বলশেভিক নাকি দাদা?' আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়েই ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো, 'বন্ধুগণ, এখানে কিছু বলশেভিক ঢুকে পড়েছে।'

প্রায় ডজনখানেক ছেলে উগ্র স্বদেশপ্রেমের নমুনা দেখাতে ছুটে এলো আমাদের কাছে। হুমকি দিলো তারা, 'উঠে দাড়ান, নয়তো ঝামেলা হবে।'

'কিসের ঝামেলা শুনি?' এবার উইলি জানতে চাইলো।

'নিজের চোখেই দেখবেন। আপনারা কাপুরুষ! দেশদ্রোহী! উঠে দাঁড়ান বলছি।'

'যা, এখান থেকে ভাগ।' জর্জ খিঁচিয়ে উঠলো.'এই সেদিনের কচিখোকার দল, যাদের জন্মাতে দেখলাম, তাদের কথায় আমরা উঠবো বসবো নাকি?'

বছর তিরিশেকের এক ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো। 'জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগে না?'

'জাগে বৈকি! তবে হোটেল রেস্তোরাঁয় এভাবে নয়', উত্তরে জর্জ বললো, দেশপ্রেমের প্রমাণ আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দিয়ে এসেছি।'

'বেকায়দায় পড়লে ও কথা সবাই বলে থাকে। প্রমাণ দেখাতে পারেন?'

এবার উইলি উঠে দাঁড়ালো। বাঁ পাটা তুলে দেখালো সে। পেছন দিকে শত্রু-পক্ষের কামানের গোলা লাগার চিহ্ন ছিলো তখনো। ও কিন্তু পাটা একটি যুবকের মুখের দিকে তুলেছিল ইচ্ছে করেই। এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধতে যাবে, ঠিক সেই সময় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় উপস্থিত হলো বোদো লেডার হোস। চামড়ার ব্যবসায়ী যুদ্ধে সে ছিলো আমাদের সহযোদ্ধা।

'এতক্ষণ আমি এই ছেলেগুলোর সব বেয়াদপি লক্ষ্য করেছি। এরা যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে, আমাকে বললে আমি চলে আসবো।'

ওদিকে রেস্তোরাঁর মালিক গণ্ডগোল দেখে ছুটে এসে হুমকি দিলো, 'আমার দোকানে এসব তাণ্ডবলীলা চলবে না, যা করার সব রেস্তোরার বাইরে গিয়ে করুন।'

ওদিকে বেগতিক দেখে অর্কেস্ট্রাবাদকরা অন্য সুরে বাজাতে শুরু করে দেয়। 'ঠিক আছে, পরে দেখে নেবো', বালখিল্যোরা শাসিয়ে চলে গেলো।

'তা নিশ্চয়ই দেখবে বৈকি', উইলি তাদের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তবে দলে একটু ভারী হয়ে এসো।'

বোদো তাদের ক্লাবে নিয়ে গেলো আমাদের। সেখানে ওই বাঁদরের দল নেই। তবে সেখানেও গান বাজনা হলো সমবেত কণ্ঠে। উইলি চড়া সুরে একটা গান গাইলো। গান শুনে বোদো মন্তব্য করলো, 'খাসা গলা তো! আমাদের ক্লাবের সদস্য হয়ে যাও', বোদো প্রস্তাব দেয়, 'অবশ্য পছন্দ না হলে পরে সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারো।'

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলো উইলি। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ করে নিলো ওরা। এই আনন্দে ও আমাদের বীয়ার, মটরসুঁটির সুপ আর শুয়োরের মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করলো। আড্ডা বেশ জমে উঠলো। এক সময় উইলি বললো বোদোকে, এক মহিলার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে, একই সঙ্গে মিষ্টি মেয়েলী সুরে আর পুরুষের মতো চড়া সুরে গান গাইতে পারে সে। ও যে রেণী দ্য লা ত্যুরের কথা বলতে চাইছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না। সেই মহিলার কথা শুনে বোদোরা তো মহা খুশী। রেণীর অনুপস্থিতিতেই তারা তাকে তাদের সম্মানিত সদস্য করে নিলো। সে তখন রেণীর মতো শিল্পীকে নিয়ে অন্য দলগুলোকে হারিয়ে দেবার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠলো।

এক সময় আমি আর জর্জ উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের গমণ পথের দিকে অনেকক্ষণ নজর রাখলো উইলি জানালা পথে। না, কেউ আর ঝামেলা করতে আসেনি আমাদের সঙ্গে। বাজার এলাকা এখন বেশ শান্ত। দূর থেকে একটা মিষ্টি সুরের গান ভেসে আসছে। এই সময় জর্জকে হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করে উঠলাম, 'জর্জ, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি সুখী জীবনে?'

আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জর্জ বললো, 'তার আগে তুমিই বলো, ছুঁচের ডগায় মানুষ কতক্ষণই বা বসে থাকতে পারে?'

□ এগারো □

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ওদিকে ডলারের দাম এক লক্ষ কুড়ি হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। এর মধ্যে ছোট খাটে দু'একটা সমাধি স্তম্ভ বিক্রি করে ফেলেছি। এক বিধবার দু'টি বাচ্চা ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেছে। পাগলের মতে জর্জ কাসছে, তারও ওই মারাত্মক রোগ হয়েছে।'

ক্লান্তিবিহীন হাইনরিখ এসে হাজির। ও কয়েকটা অর্ডার সংগ্রহ করেছে, সেগুলো লেখানোর পর আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, 'এভাবে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করলে একদিন আমরা ঠিক দেউলিয়া হয়ে যাবো।'

'দেউলিয়া?' ওকে রাগাবার জন্য না জানার ভান করলাম।

'জানো, উর্সাট্রিনজেনে কি হয়েছে?'

'কেন, ওরা খুনীটার সন্ধান পেয়েছে নাকি?' আমি ওকে আরো রাগাবার জন্য বললাম, 'খুনীর সঙ্গে আমাদের দেউলিয়া হওয়ার কি সম্পর্ক আছে বলো?'

'ওটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি বলতে চাইছি, মেয়রের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের কথাটা। তাছাড়া ছুতোর মিস্ত্রীর বিধবাকে তোমরা নাকি বলে এসেছো, বিনা পয়সায় তার স্বামীর কবরের পাথর যোগান দেবে?'

ওর সঙ্গে কথা বলা মানেই তর্ক, তাই চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। ওর মতো লোকেরা নিজের বুদ্ধির ওপর বড় নির্ভরশীল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, ও নিজেই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিভাবে সে মেয়রকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওই গ্রাম থেকে কিছু অর্ডার পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ও বলতে চাইল, ওর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে।

সব শোনার পর উদাস ভাবে বললাম, 'তাহলে তুমি কি চাও, আমরা এখন তোমাকে পুজো করবো?'

'থামো! তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।' রুখে উঠলো হাইনরিখ, 'ভুলে যেও না, তুমি এখানকার কর্মচারী মাত্র।'

'ওটা আমি সব সময়েই ভুলে থাকার চেষ্টা করি। নকসা তৈরী করা থেকে ম্যানেজারী, বিজ্ঞাপন দেখাশোনা করি আমি। ভুলে থাকি, তা না হলে এতো সব কাজের জন্য তিনগুণ মাইনে আদায় করে ছাড়তাম আমি। আমি তোমাদের গোলাম নই। তাই যদি মনে করে থাকো তো দেখিয়ে দিতে পারি, হোলমান এ্যাণ্ড ক্লোৎজ কোম্পানি আমাকে লুফে নিতে পারে।'

এই সময় জর্জ ঘরে ঢুকে বলে উঠলো, 'তুমি যেন উসট্রিনজেনের কথা বলছিলে হাইনরিখ—আর তাই যদি হয় তো মাটির তলায় ভাঁড়ার ঘরে চলে যাও, চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকো। একজন খুন হয়ে গেছে, একজনের সংসার ভেসে গেছে, সেটা কোনো কর্তব্যের মধ্যে মনে করো না তুমি, তোমার কাছে মেয়রের সঙ্গে ভদ্রতাই হলো সব চেয়ে বড় কথা, এই তো?' ভীষণ রেগে গেছে জর্জ। হাইনরিখের দিকে এগোতেই ভয়ে পিছিয়ে গেলো সে। 'আমার কাছে আসবে না। দেখছি আমার মধ্যেও ইনফ্লুয়েঞ্জা না ছড়িয়ে ছাড়বে না তুমি।'

ওদিকে দুই ভায়ের ঝগড়া প্রত্যক্ষ করছিল লিসা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের ঝগড়া শুনছিল সে।

একরকম জোর করেই হাইনরিখকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে জর্জ বললো, 'যাও ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নাও, ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়।'

আমিও জর্জকে জোর করে তার ঘরে শুতে পাঠালাম। 'শুয়ে পরো, ভীষণ ঘামছো তুমি।'

'ঘাম হওয়া ভালো; দেখছো না আকাশটাও কেমন ঘামছে? আর রাস্তার ওপারে তাকিয়ে দেখো, জীবনের আর এক সতেজ সজীব নমুনা, বুক খোলা ড্রেসিং গাউন, শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি পাঁপড়ি মেলে ধরার অপেক্ষায়, মুক্তোর মতো সারিবদ্ধ দাঁত। অথচ দেখো কি জীবনই না কাটাচ্ছি আমরা, কবরের জিনিষ বেচেই আমরা নিজেদের কবর খননের ব্যবস্থা করছি। এরই নাম কি জীবন? প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো জর্জ। 'কেন, কেন আমরা পারিনা সব অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে?'

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো যেন। একটু পড়েই সরকারী কবরখানার কবরখননকারী লাইবেরমান ঘরে এসে ঢুকলো। লাল পায়জামা পরা জর্জের দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলো সে, 'আজ কি তোমার জন্মদিন?'

'না, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

'অভিনন্দন।'

'কেন, অভিনন্দন কেন?' জর্জ অবাক হয়ে যায় তার এমন অদ্ভুত কথা শুনে।

'কারণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাদের ব্যবসা বাড়াচ্ছে। তার প্রমাণ, এখন অনেকেই এই রোগে মারা যাচ্ছে।'

আশি পেরিয়ে গেছে লাইবেরমান। এই বয়সেও হাসিখুশিতে ভরপুর সে। তবু আমি তাকে বললাম, 'আমরা এখন ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। জর্জ এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী, তার এই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নিচ্ছি। তা এক গ্লাস ওষুধ খাবেন নাকি?'

'আমার শুধু জিন হলেই চলবে।'

জিনই দেওয়া হলো তাকে। এক চুমুকে সেটা গলাধকরণ করে নিয়ে লাইবেরমান ব্যাগ থেকে চারটে বড় সাইজের ট্রাউট মাছ বের করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে বললো, 'ছোট্ট একটা উপহার আমার তরফ থেকে। মাছগুলোর ফ্যাকাশে চোখে মৃত্যুর ছায়া থিক থিক করছে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো কয়েকজন লোকের ঠিকানা এনেছে লাইবেরমান। ইনফ্লুয়েঞ্জাতে বেশ লোক যে মরছে, তারই ইঙ্গিত বহন করছে সেই ঠিকানাগুলো। যুদ্ধের পর থেকে মানুষের দৈহিক প্রতিরোধের ক্ষমতা যেন হারিয়ে গেছে। এ সবই মানুষের অভাবের জন্য। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম না, আর নয়, এই চাকরীটা আমাকে ছাড়তেই হবে। যে কোনো কাজ এখন আমার কাছে অসহনীয়।

গায়ে ড্রেসিংগাউন চাপিয়ে এলো জর্জ। গাউনের রঙ দারুণ উজ্জ্বল। বাড়িতে জর্জের পোষাক তার পছন্দমতো রঙীন ঝলমলে হয়। এ প্রসঙ্গে ইসাবেলের কথা মনে পড়ে গেলো—'এই পরিবেশে আমরা অন্তত কয়েক ইঞ্চি কাছে যেতে পারি ঈশ্বরের।'

ওয়ালহাল্লা হোটেলে কবিদের আড্ডা বসে কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছোট্ট একটা ঘরে। তাকের ওপর সাজানো গ্যেটের একটা মূর্তি, দেওয়ালে টাঙ্গানো বহু কবি সাহিত্যিকদের ছবি। সপ্তাহে একদিন শহরের বুদ্ধিজীবী ও কবিরা জমায়েত হয় এখানে এসে। এর মধ্যে একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকও আছেন। যাঁদের লেখা ছাপা হয় তাঁর কাগজে, তারা তাঁকে চাটুকারের মতো ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ, তোষামুদে ভাষায় কথা বলে। আর যাদের লেখা ছাপা হয় না. তারা তাঁর বিরূপ সমালোচনা করে থাকে। উনি অবশ্য দুপক্ষের তোষামোদ আর সমালোচনা, কোনটাতেই কান দেন না। কেমন নির্বিকারে পাইপ টানেন, সব তর্কেই অংশগ্রহণ করেন। তবে দু'পক্ষই তাঁর ব্যাপারে একটা বিষয়ে ভীষণ মিল আছে, আর সেটা হলো—আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সম্পাদক মশাই যে কিছুই খোঁজ খবর রাখেন না, একমত তারা।

আর আসেন কিছু জেলা জজ, পেনসনভোগী পদস্থ সরকারী কর্মচারী, শিল্পী ও গায়ক গায়িকারা। সেই সঙ্গে আর্থার বাউয়ারও আসেন। আজও এসেছেন আর্থার। উঠতি সাহিত্যিক ম্যাথাই গ্রুন্ড তাঁকে খুব তেলাচ্ছে এই আশায়, যদি ওর লেখা 'বুক অফ ডেথ' উপন্যাসটা আর্থার ছাপে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এডুয়ার্ড নবলক আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার পাশেই বসে পড়লো। সেদিনের সেই ঘটনার পর আমি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। এডুয়ার্ড নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছো বলো।'

'ভালোই।' বললাম আমি।

'কয়েকটা কবিতা লিখেছি। তোমার আপত্তি থাকবে না নিশ্চয়ই।'

'কেন, আপত্তি থাকবার কি আছে?'

'না, মানে কবিতাগুলোর নাম রেখেছি 'গার্দা।'

'তা তোমার কবিতার যা খুশি নাম দাও না কেন—' কথা বলার মাঝখানে থেমে যেতে হলো, 'কি বললে 'গার্দা' নাম দিয়েছো? তা গার্দা শুধু কেন? 'গার্দা স্লিডার' হলেই তো ঠিক হতো?'

এতে আমার সন্দেহ হলো। 'এর অর্থ? তোমার কি মতলব বলো তো?'

এডুয়ার্ডের ঠোঁটে নকল হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'না, কিছুই নয়। আমি কেবল আমার কাব্য প্রতিভার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। জানো, আমার কবিতায় সার্কাসের খেলার কথা আছে?'

'ননসেন্স। বাজে কথা রেখে তোমার আসল মতলবের কথাটা বলে ফেলো তো। তুমি একটা ঠক, জোচ্চোর।'

'আমি ঠক, জোচ্চোর?' কপট রাগের ভান করলো এডুয়ার্ড। কেন ঠক তো তুমি নিজেই! তুমিই তো আমাকে ওর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলে, উইলির বান্ধবী ও, রেণীর মতো গান জানে ও—'

'না, আমি কখখনো বলিনি। ওটা তোমার মনগড়া, তোমার কল্পনা।'

'সে যাইহোক। খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি, তুমি মিথ্যুক। গার্দা আদৌ কোনো গান জানে না, গানের 'গা'-ও জানে না। ও, ও শুধু সার্কাসের মেয়ে।'

'এতো সব খবর পেলে কোথেকে?' আমি ওকে খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলাম না।

হঠাৎ মাদামোয়াজেল স্লিডারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দেখা করায় তুমি নিশ্চয়ই কোনো দোষ ধরবে না!' সহজ সরল মানুষের মতো বললো এডুয়ার্ড।

'শোনো এডুয়ার্ড, কবিতা দিয়ে ভোলানোর মতো মেয়ে নয় গার্দা। তুমি ওর নামে যতোই কবিতা লেখো না কেন, ওর মন তুমি পাবে না কখনো।'

একটুও হতাশ হলো না এডুয়ার্ড। ও বোঝাতে চাইলো, ও শুধু কবি নয়, একটা বড় রেস্তোরার মালিকও বটে। আর রেস্তোরার মালিক, কোটিপতির জন্য ওর প্রতি গার্দার যে দুর্বলতা আছে, তা আমার অজানা নয়।

'শয়তান!' রাগে গর্জে উঠলাম। 'কিন্তু তাতে কোন সুবিধে করতে পারবে না। জেনে রাখো, কয়েক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে গার্দা!'

'না, ও যাচ্ছে না', হেসে উঠলো এডুয়ার্ড, 'ওর কণ্ট্রাক্ট নবীকরণ করা হয়েছে আজই।'

'আর তাই বুঝি ওর নামে কবিতা লেখার উৎসাহ বেড়ে গেছে তোমার?' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম। 'কবিতাগুলো তুমি প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছো। না পাঠালে নিজের ভালো চাও তো চেপে যাও। একথা বলছি এই কারণে যে, গার্দার একটা দৈত্যের মতো ভাই আছে, সে তার বোনকে খুব ভালোবাসে। এর আগে দু-দুজন

লোক তোমার মতো গার্দাকে বিরক্ত করেছিল, আর সেই ভাইটি তাদের ক্ষমা করতে পারেনি—তারা এখন পঙ্গু জীবন যাপন করছে।'

'ও সব বাজে ভয় দেখিয়ে তুমি আমার কবিতা লেখা বন্ধ করতে পারবে না—' মুখে সাহসী প্রেমিকের মতো দেখাবার চেষ্টা করলেও এডুয়ার্ড যে মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়েছে, ওর চোখ মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেলো।

কবি হানস্ হানকারমান এসে মিলিত হলেন আমাদের সঙ্গে। বেশ কিছু কবিতা ও নাটক লিখেছেন উনি, কিন্তু সবই অপ্রকাশিত এখনো। 'অটো বামবাসের একটা নোংরা বই বেরিয়েছে, পড়েছো নাকি?' বললেন কবি হানস্। 'ওই নচ্ছার প্রকাশক আর্থার বাউয়ারটা আবার বইটা ছেপেছে।'

অটো বামবাস আমাদের শহরেরই সবচেয়ে নামী ও দামী কবি। সকলেরই ঈর্ষার পাত্র উনি। হানস্ও তাদের ব্যতিক্রম নন, নিজে উনি এখনো ওঁর ধারে কাছে যেতে পারেননি বলেই হিংসে করেন ওকে, ওঁর সব লেখাই ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন উনি। কিন্তু এই অটোর সঙ্গেই আবার বেশী ঘনিষ্ঠতা।

হানস্ এবার প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইলেন, 'ওই সার্কাসের মেয়েটির সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করছিলে না? ওই মেয়েটিকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি।'

হানস্-এর কথা শুনে মনে হলো, গার্দার গুরুত্ব অনেক, অনেকের কাছেই আলোচনার পাত্রী ও। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সত্যিই ওকে নিয়ে কবিতা লেখা চলে। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হলো, সবাই কেমন আড্ডায় জমে উঠলো, হেসে হেসে কথা বললো, কিন্তু আমার মনে তখন গার্দাকে নিয়ে এডুয়ার্ডের কবিতা লেখার কাঁটাটা কেবলি খচখচ করতে থাকলো।

□ বারো □

বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ো কাকের মতো উড়ে এসে বসলেন বোদেনদিয়েক। আজ তিনি বেশ খোজ মেজাজে আছেন। 'পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজ চলছে তো?'

'নজর রাখছি', উত্তরে বললাম।

'তা দার্শনিক মশাই, শেষ পর্যন্ত কি পেলে?

'জানলাম, গত দু'হাজার বছরে খৃষ্টধর্ম পৃথিবীর কোনো উপকারই করতে পারেনি', আমি আমার এই সত্য উপলব্ধির কথা না বলে থাকতে পারলাম না।

নিমেষে তাঁর একটু আগের সেই খোস মেজাজটা উধাও হয়ে গেলো তার মুখ

থেকে। পরিবর্তে মুখটা তাঁর কঠিন হয়ে উঠে পরক্ষণেই আবার শান্ত হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে বোদেনদিয়েক বললেন, 'এ ধরণের মন্তব্য করতে গিয়ে নিজেকে তোমার কি অপরিণত বলে মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, মনে করি বৈকি। তবে কি জানেন, বয়সের ব্যাপারটা তুলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করাটা একটা দুর্বল যুক্তি নয় কি? হ্যাঁ, বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, তাই কথাটা আমি বললাম। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপারও আছে। সম্প্রতি আমি ইতিহাস পড়ছি।'

'কেন, সেও কি বৃষ্টি পড়ার জন্য?'

ওঁর ওই খোঁচার তোয়াক্কা না করে আমি বললাম, 'কেন জানেন, হতাশার মধ্যে ডুবে যেতে আমার আর ইচ্ছে নেই, পৃথিবী সম্পর্কে কুৎসিত ধারণা নিয়ে আমি মরতেও চাই না। ঈশ্বরের প্রতি অন্ধ ভক্তি রেখে চোখ বুজে থাকলেও একটা বড় সত্যকে আমরা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না—সেই সত্যটা হলো যে, আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। আর আপনাদের মতো শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদের ক্রুশ চিহ্ন নেড়ে যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রার্থনা জানাতে দেখেছি আমি।'

বোদেকদিয়েক তাঁর টুপির জল মুছতে গিয়ে বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিককে আমরাই শেষ সান্ত্বনা জানাই—সে কথা ভুলো না যেন।'

'অতদূরে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার কি দরকার আমাদের, তার চেয়ে এক কাজ করুন না আপনারা, ওই সব ধর্মভীরু মানুষগুলোকে বলুন না কেন, যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য? যুদ্ধের সময় গির্জায় গিয়ে দেখেছি যাজকরা যুদ্ধে সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। আপনার কি ধারণা, যীশুর কানে ওই সব ভণ্ড স্বার্থান্বেষীদের কথা পৌঁছবে?'

এরসরেই বোদেনদিয়েকের সঙ্গে আমার প্রচণ্ড তর্ক শুরু হয়ে গেলো। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসীদের ধ্যানধারণার মধ্যে পার্থক্য কি; ইতিহাসে কিছু কি জ্ঞানের কথা লেখা আছে? আধ্যাত্মিক রহস্যময় খৃষ্টানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য গির্জা কেনই বা চেষ্টা করেছিল, এই সব ব্যাপারে জোর তর্ক বিতর্ক।

'এদের ব্যাপারে তোমার কি পড়াশোনা কিছু আছে?

'আছে, আর এও জেনেছি যে, খৃষ্টানদের জন্য এদের সহ্যশক্তির তুলনা হয় না। আমার উপলব্ধি হলো, মানুষের মহাশক্তিই হলো সব চেয়ে বড় সহায়।'

'তা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছো দেখছি', বোদেনদিয়েক রাগ চেপে হঠাৎ জোরে হেসে বলে উঠলেন তিনি, 'শোনো হে ছোকরা, তোমার মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এমনি তর্ক চালিয়ে আসছে যুগ-যুগান্ত ধরে, কিন্তু ফল শূন্য। যে পথেই তুমি যাওনা কেন, পথের শেষপ্রান্তে এসে দেখতে পাবে—ঈশ্বর ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর বোদেনদিয়েক আর দাঁড়ালেন না।

উপাসনা শেষ। আমি তখন ইসাবেলকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টি কমে এসেছিল। ইসাবেলের গায়ে একটা কালো বর্ষাতি। ওর সান্নিধ্যে এসে বোদেনদিয়েকের সঙ্গে তিক্ত আলোচনার কথা ভুলে গেলাম অচিরে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। তবু ওর দেহের উত্তাপ আমি যেন আমার হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি।

হঠাৎ ইসাবেল অভিযোগ করে উঠলো, 'তুমি আমাকে তেমন করে ভালবাস কই?'

অবাক হলাম, বলে কি ও? 'এর চেয়ে আর কতো ভালবাসা তুমি চাও? আমি তোমাকে আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসি।'

'তবু সেটা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া সেরকম ভাবে মোটেই তুমি ভালবাস না আমাকে—সেরকম ভাবে ভালোবাসলে আমরা দুজন আলাদা আলাদা ভাবে থাকি কেন?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, তাহলে আমরা এক হয়ে যেতাম?'

মাথা নাড়ালো ইসাবেল। এ প্রসঙ্গে জর্জের একটা দামী কথা আমার মনে পড়ে গেলো। 'আলাদা আলাদা ভাবেই থাকতে হবে আমাদের। তবে আমরা যে পরস্পরকে ভালবেসে এ ওর মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছি, এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা বেঁচে থাকবো।'

'তুমি কি মনে করো কখনো আমরা দুজনে এক ছিলাম?'

'বলতে পারবো না। তাছাড়া কবে কখন ছিলাম কি ছিলাম না, ওভাবে কখনো মনে রাখা যায় না।'

অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় ইসাবেল বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছ রুডলফ, মনে রাখা যায় না, হাজার হোক আমরা তো মানুষ। কেবল মনে থাকে এক কালে অনেক কিছুই ছিলো। কিন্তু কেন এই রকম হয়, বলতে পারো রুডলফ?'

সত্যি এমন একটা ঘটনার মুখোমুখি হলে তখন মনে হয় বহুকাল আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি সেটা, কিন্তু সেটা কবে কখন যে ঘটেছিল ঠিক মনে পড়ে না। তাই ওকে বললাম, 'মনে রাখা সম্ভব নয় ইসাবেল। এই মনে রাখা জিনিষটা অনেকটা বৃষ্টির মতোন। আমরা জানি হাইড্রোজেন দুই ভাগ আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলে গিয়ে জল হয়। কিন্তু সেই জলের ফোটা কি পারে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা আলাদা ভাবে মনে রাখতে? এখন ওরা কেবলি বর্ষায় বারিধারা, অতীতের কিছুই মনে পড়ে না ওদের।'

'আবার চোখের অশ্রুধারার মতোও বলতে পারো', বললো ইসাবেল। 'কিন্তু চোখের জলে যে মিশে আছে অতীতের অনেক স্মৃতির বেদনা।'

এর পর আমরা দুজনে অনেকক্ষণ হাঁটতে লাগলাম নীরবে। এক সময় ইসাবেলই

প্রথম মুখ খুললো আগের প্রসঙ্গের জের টেনে ; 'তাহলে এটা কি মৃত্যুর সামিল ?' যেন শেষ কথাটা বলে ফেললো ইসাবেল। 'ভালোবাসা, সত্যিকারের প্রেম ?'

'এর উত্তর কেউ বলতে পারবে না ইসাবেল। আসলে কি জানো, আমরা যতক্ষণ 'আমি' হয়ে আছি, ততক্ষণ সব বুঝতে পারি, সেই বৃষ্টির জলের মতো এক হয়ে যায়, এক সময় আমাদের 'আমিগুলো' উধাও হয়ে যায়।'

'আর আমাদের প্রেম যদি খাটি সত্য হয় তাহলে আমরা দুজনে মিশে গিয়ে এক হয়ে যাবো না কেন—প্রায় মৃত্যুর মতো ?'

'হতে পারি, তবে তাই বলে মৃত্যুর মতো নয়। মৃত্যুর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না। অবশ্য আমাদের সত্ত্বাকে আমরা হারিয়ে ফেলি, তখন আমরা আবার এক হয়ে যাই।'

'তার মানে প্রেম কি সব সময়েই অপূর্ণ থেকে যায় ?'

'না, তা কেন, পূর্ণ তো বটেই।' আমার মধ্যে স্কুল মাষ্টারের সত্ত্বাটা আবার জেগে উঠলো। তবে কিছু অপূর্ণতা থেকে যাবেই, কিন্তু সেটা অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।'

'যেমন মৃত্যুর মতো ?'

'সঠিক বলতে পারবো না। কে জানে মৃত্যুর অন্য কোনো নাম আছে কিনা। আমরা তো শুধু এক তরফা বিচার করি। কে বলতে পারে, এটাই ঈশ্বর আর আমাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রেম কিনা।'

'তাই কি প্রেম এতো করুণ, এতো নিষ্ঠুর ?' মুখ থেকে বৃষ্টির কণাগুলো মুছে ফেললো ইসাবেল।

'করুণ কেন বলছো ? পূর্ণতা লাভ করে না বলেই আমরা দুঃখ পাই, কষ্ট পাই। কিন্তু কি আর করা যাবে বলো ? এটাই আমাদের নিয়তি।'

নিয়তি কেন হতে যাবে ? আর কেনই বা হতে পারে না ? এটাই তো বড় দুঃখ, আর সেই জন্যই তো এই অপূর্ণতা'—কথাটা শেষ করতে পারলো না ইসাবেল, আমার কাঁধে মুখ গুঁজে চোখের জল আর সামলাতে পারলো না সে।

'এতে কান্নার কোনো মানে হয় না। অনেক কিছুর জন্য অনেক কিছুই তো বিসর্জন দিতে হয় আমাদের ?' সান্ত্বনার সুরে ওকে উপদেশ দিলাম বটে, কিন্তু আমিও তো কতবার নিজেকে বিসর্জন দিয়েছি কতো কিছুর জন্যই না, তখন তার মানে বুঝিনি। আর মৃত্যুর সময় সব কিছুই তো বিসর্জন দিয়ে চলে যেতে হবে আমাকে। তখন এরণা, ইসাবেল কিংবা গার্দা কারোর প্রেমই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না আমি।

ওদিকে ঘণ্টার শব্দটা আমাদের মনে করিয়ে দিলো, এবার আমাদের বিদায়ের পালা। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিলো ইসাবেল, এবার ফিরে যাবার সময় হয়েছে।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?'

'হ্যাঁ, চলো যাই।' আমরা পাশাপাশি এগিয়ে চললাম নীরবে।

দরজার কাছে এসে ইসাবেল একান্ত আপনজনের মতো বললো, 'এসো, আমার সঙ্গে এসো।'

'না', মাথা নেড়ে আমি বললাম, 'আজ নয়, অন্য আর একদিন যাবো।'

এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো ইসাবেল। ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা ছিলো না, ছিলো ভর্ৎসনা! ওর চোখের সেই দৃষ্টিতে আমার অপরাধ ধরা পড়ে গেছে, একটা শিশুকে আঘাত করার অপরাধ কিংবা একটা পাখিকে হত্যা করার অপরাধ যেন।

ইসাবেল আর দাঁড়ালো না। আর তখনি দেখা হয়ে গেলো ডাক্তারের সঙ্গে। 'ফ্রাউলিনকে তার হোভোতে পেঁছে দিয়ে গেলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। ওকে একটু সঙ্গ দেবেন মাঝে মাঝে। আপনারা কাছে থাকলে ওর মন মেজাজ বেশ ভালোই থাকে।

'কিন্তু ওর কাছে আমি তো অন্য লোক।'

'তা হোক। আমি আপনার কথা ভাবি না, আমার রোগিনীর আরোগ্য লাভ হলেই হলো।' ডাক্তার এবার মৃদু হেসে বললেন, 'জানেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় বোদেনদিয়েক আপনার খুব প্রশংসা করে বললেন, আপনি নাকি এবার সঠিক পথে ফিরে আসছেন।'

'দারুণ মজার কথা তো', এছাড়া আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

তারপর শহরে ফেরার পথেও ইসাবেলের চিন্তা মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছিলাম না। ওকে এখন ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই যেন।

□ তেরো □

হাঁটতে হাঁটতে পেঁছে গেলাম জুতো ব্যবসায়ী কার্ল ব্রিলের বাড়ি। আজ সন্ধ্যায় এখানে একটা আসর বসবে তাতে আমিও নিমন্ত্রিত। আজকের আসরে ফ্রাউ ব্রেকমানের সেই বিখ্যাত খেলাটিই প্রধান আকর্ষণ। আমাকে দেখে কার্ল ব্রিল জড়িয়ে ধরলো, ওর মুখ থেকে বীয়ারের গন্ধ বেরুচ্ছে, এখনি পা টলছে ওর। 'তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো। বাজীর টাকা জমা পড়ে গেছে—ত্রিশ লাখের মতো

বাজীর টাকা উঠেছে। ওদিকে ক্লারাও প্রস্তুত। এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ও যেন দারুণ খেলা দেখায়, ব্যর্থ না হয়। কার্ল চোখ ছোটো করে বললো, 'খেলা দেখানোর সময় খুব জমাটি কোন সুর বাজিও, যাতে করে ক্লারার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। ও যে গান দারুণ ভালোবাসে, তুমি তো জানো। বাজী না জিতলে আমি আধা দেউলে হয়ে যাবো।' তার পাশে তুলোয় মোড়া একটা বড় পেরেক আর হাতুড়ি পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

'ঠিক আছে, যুদ্ধের বাজনা বাজাবো, 'আমি বললাম, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার জন্যও ছোটো-খাটো একটা বাজী ধরলে হতো না? কেবল আট হাজারেই আমার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।'

কি যেন একটু চিন্তা করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কার্ল। আপনাদের মধ্যে কেউ কি এই পিয়ানো-বাজিয়ের বিরুদ্ধে আশি হাজার বাজি ধরবেন?'

'হ্যাঁ, আমি রাজী আছি', একজন মোট-সোটা লোক এগিয়ে এসে বেঞ্চের ওপর বাজীর টাকাটা রাখলো। আমিও আমার টাকাটা রাখলাম তার টাকার পাশে। মনে মনে জুয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালাম, তিনি যেন আমার ওপর করুণা করেন, তা না হলে কাল অভুক্ত থাকতে হবে।

'তাহলে এবার খেলা শুরু করা যাক, কেমন?' ঘোষণা করলো কার্ল রিল।

সেই তুলোয় মোড়া পেরেকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে দেখানো হলো। দেওয়ালের সামনে গিয়ে পাছা বরাবর উচ্চতায় পেরেকটা পুঁতে দিলো কার্ল। মাত্র এক তৃতীয়াংশ দেওয়ালে ঢুকে ছিল। তারপর ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে এমন ভাব দেখিয়ে বললো কার্ল, 'পেরেকটা খুব শক্ত ভাবে গেঁথে গেছে, যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

সেই মোটা লোকটা এবার এগিয়ে এলে। তার সামান্য একটু চাপেই পেরেকটা খসে পড়লো মাটিতে। তা দেখে মোটা লোকটা বলে উঠলো, 'আমি তো ওটা ফুঁ দিয়ে খুলে ফেলতে পারতাম। তার জন্য এত টাকার বাজী ধরবার কি ছিলো?'

কার্ল রেগে গেছে। 'পাছা দিয়ে পেরেক খোলা অত সহজ নয়।' উত্তেজিত গলায় বললো সে, 'ঠিক আছে, এতোই যখন সন্দেহ, তোমরা যে যার বাজীর টাকা তুলে নিতে পারো।'

তার কথায় কান না দিয়ে মোটা লোকটা করলো কি, অন্য এক জায়গায় নিজের হাতে পেরেকটা পুঁতলো। মাত্র ছয়-সাত সেণ্টিমিটার বেরিয়ে রইলো। নিজের হাতের জোরে পেরেকটা টেনে দেখে নিয়ে সে বলে উঠলো, 'এখন খেলা শুরু করা যেতে পারে।'

কার্লের মুখ কালো হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করারও নেই, এটাই মেনে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে তাকে। এই সময়ে পর্দা তুলে বেরিয়ে এলো ক্লারা। কালো।

রঙের জাপানী কিমানো ওর পরনে। লোহার মত শক্ত শরীর ওর। বুলডগের মতো দেখতে মুখ। ওর বুক, ওর পাছা সব কিছুই যেন পাথরের ওপর খোদাই করার মতো। সবার দৃষ্টি শুধু ওর পাছার দিকে। ওর ওই পাছা দিয়েই পেরেকটা খুলে ফেলবে ও। আগে এ খেলা ও নির্বিঘ্নে দেখিয়েছে। কিন্তু আজ ঝামেলা বাধিয়ে বসলো ওই মোটা লোকটা।

সার্কাসী কায়দায় সবাইকে অভিবাদন জানালো ক্লারা। তারপর আস্তে আস্তে দেওয়ালের দিকে গিয়ে পেরেকের ওপর ও ওর পাছাটা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। তারপরেই ওর সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠলো, বিশেষ করে পাছাটা, পাছায় মাংস আছে বলে মনেই হলো না, যেন ঝামা-পাথর···পেরেকের ওপর পাছা ঠেকিয়ে একবার, দুবার তিনবার চাপ দিতেই হঠাৎ ঠং করে একটা ধাতব শব্দ হলো, ক্লারা সরে দাঁড়াতেই পেরেকটা পড়ে গেলো মেঝের ওপর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসলো কার্ল ব্রিল, বিজয়ীর হাসি।

মোটা লোকটা পেরেকটা হাতে তুলে নিয়ে অস্ফুটে শুধু বললো, 'বিশ্বাস করা যায় না।

আশি হাজার বাজী জিতে বেশ খোশ মেজাজে বাড়ি ফিরছি। কিন্তু গেটের কাছে এসে যথারীতি নোপফকে অবিলিস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দারুণ ক্ষেপে গিয়ে ওর পাছায় জোরে এক ধাক্কা মারলাম।

মৃদু চিৎকার করে উঠলো ও, 'প্যান্টটা একেবারে ভিজিয়ে ছাড়লে ?'

'কাজটা বাড়ি গিয়ে না সারার খেসারত এটা। হঠাৎ কেমন মায়া হলো নোপকের জন্য। অতটা রূঢ় না হলেই বোধহয় ভালো ছিলো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে নোপকের কথা ভুলে গিয়ে আবার ইসাবেলের মুখটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। কাল ওর কাছে ফুল পাঠাতে হবে, কার্লের ওখান থেকে বাজী জেতার কিছু টাকা খরচ করতে হবে ইসাবেলের জন্য। ওই আমার একমাত্র আপন-জন, একমাত্র ভরসা এখন। কিন্তু ও তো আমার আসল পরিচয় জানে না। তবে ক'জনই বা জানে ?

হঠাৎ সেদিন হোলমান ক্রোৎজের সেলসম্যান অস্কার এলো আমাদের অফিসে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওদিককার খবর কি ? গ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ? আর মৃতের সংখ্যা ?'

'না, কারোর তো তেমন ক্ষতি হতে দেখছি না। গ্রামে চাষারা মোটামুটি বেশ ভালোই খেতে পাচ্ছে। তবে শহরের চিত্রটা ঠিক উল্টো দেখছি, এই দেখো না, মার কোম্পানীর জন্য দু'দুটো অর্ডার তো প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। একটা হলো লাল গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ—যার দাম প্রায় বাইশ লাখ মার্ক। আর

একটা একটু ছোট গোছের—তেরো লাখ। তোমরা এক লাখ কমালে অর্ডারটা তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি। তবে আমার কমিশন কিন্তু শতকরা কুড়ি ভাগ চাই।'

'না, পনেরোয় রাজী হয়ে যাও।' মুখ ফসকে অফারটা বেরিয়ে গেলো আমার।

'কুড়ির কম হলে চলবে না।' অস্কার কাঁদুনে গাইলো, 'পনেরো তো হোলমান ব্রোংজ আমাকে দেয়। তাহলে শুধু শুধু তাকে প্রতারণা করতে যাবোই বা কেন?'

ও যে মিথ্যে বলছে তা আমি জানি। আসলে ও পায় দশ পার্সেন্ট, আরো বাড়তি দশ পার্সেন্ট চাইছে আমাদের কাছ থেকে। তবু ওকে হাতে রাখার জন্য ওর জোচ্চুরি সহ্য করে নিয়ে বললাম, 'তা তুমি আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলালেই তো পারো অস্কার। হোলমানের চেয়ে বেশী কমিশনই দেবো।'

'না ভাই, এই বেশ মজায় আছি। বুড়ো হোলমানের সঙ্গে বনিবনা না হলে তখন তাকে ছেড়ে তোমাদের কোম্পানীতে চলে আসবে। আবার তোমাদের কোম্পানীতে এলে তোমাদেরও তখন একই কথা বলবো। এতে আমি বেশ উত্তেজনা বোধ করি কেন জানো? কবরের পাথর বিক্রীর কাজটা এখন খুবই একঘেয়ে লাগে তাই।

'একঘেয়ে? কি বলছো তুমি? প্রতি বছর ভালো সেলসম্যানের কাজ করেও এ কাজ তোমার একঘেয়ে লাগছে?'

বিজ্ঞের মতো হাসলো অস্কার। অদ্ভূত প্রকৃতির লোক এই অস্কার আমাদের লাইনে। কেউ মরেছে শুনলে চোখে কাঁচা পেঁয়াজের রস লাগিয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো আগে। অবশ্য এখন তা করে না। জাত অভিনেতার মতো এখন সে অনায়াসে চোখে জল আনতে পারে। চোখে জল, স্বভাবতই সহানুভূতি উতলে পড়বে তার ওপর সকলের, তাই তার সাফল্য নিশ্চিত।

এক সময় জর্জ ক্লল ঘরে ঢুকে তার এই হঠাৎ হঠাৎ চোখে জল ফেলার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতেই গম্ভীর হয়ে গেলো অস্কার। তার অমন অবস্থা দেখে জর্জ জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার অস্কার, তোমার শরীর টরির খারাপ নাকি?'

তখনো নীরব থেকেই চোখ বুজলো অস্কার। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার চোখ মেলে তাকাতেই দেখা গেলো তার চোখ ভর্তি জল। রুমাল বার করলো সে জল মোছার জন্য।

'কি, এবার বিশ্বাস হলো তো? মাত্র দু'মিনিট সময় নিয়েছি। আর বাড়িতে মৃতদেহ থাকলে এক মিনিটই যথেষ্ট।'

'তোমার কোনো তুলনা হয় না অস্কার। তুমি মহান।' লাফিয়ে উঠলো জর্জ।

'আরে তোমার তো অভিনেতা হলেই ঠিক হতো।'

'কিন্তু কান্নার রোলই বা কোথায়? একমাত্র ওথেলোকে ছাড়া আর কিছু তো।

মনে পরছে না। শুধু কল্পনা, অভিনয়ের জন্য শুধু কল্পনা করে যাওয়া চাই।'

'তা আজ তুমি কি কল্পনা করে এসেছিলে শুনি?' জানতে চাইলো জর্জ।

'কিছু যদি মনে না করো তো বলি', বললো অস্কার, 'আমায় কল্পনা ছিলো, তোমার হাত-পা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, একদল হিংস্র ইঁদুর তোমার চেতনাহীন দেহটা কুরে কুরে খাচ্ছে, আর চেতনা ফিরে পেয়ে তুমি যন্ত্রণায় কাতরে উঠছো থেকে থেকে, অথচ হাত পা তোমার নেই বলে তুমি ইঁদুরগুলোকে তাড়াতেও পারছো না।'

জর্জ নিজে হাত দিয়ে নিজের দেহের ওপর বুলিয়ে বললো, 'কিন্তু আমার দেহ তো অক্ষত রয়েছে।'

হাসলো অস্কার। 'কিছুদিন হলো মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে হেঁচকি তুলছি। এতে ভালো ফল পাচ্ছি। খদ্দেররা ভাবে দুঃখ ও সহানুভূতিতে আমার বুঝি ওই রকম হচ্ছে। তাই তারা তাড়াতাড়ি অর্ডার দিয়ে দেয় আমাকে।'

'তোমাকে আমাদের মধ্যে না পেয়ে খুবই দুঃখ হচ্ছে বটে,' বললো জর্জ, 'তবে আমরা সত্যিকারের সফল শিল্পী, ও তা ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা করতে জানি।'

দুটো নতুন অর্ডারের নাম ঠিকানা লিখে রাখলাম। কাগজটা দেখে ভ্রূ কুঁচকালো হাইনরিখ। অস্কারকে ঘৃণার চোখে দেখে সে। তবু বিড় বিড় করে করে বকতে বকতে কাগজটা পকেটস্থ করলো সে। আগের দিন ঝড় বৃষ্টিতে ছাদের নর্দমার পাইপটা ভেঙ্গে যায়। মিস্ত্রী সেটা বদল করে পুরনো ভাঙ্গা পাইপটা দেখিয়ে বললো, 'এটা তো আপনাদের আর কোনো কাজে লাগবে না, নিতে পারি এটা?'

'না, 'ওটা থাক', সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবাম, 'পাইপটা আমাদের কাজে লাগবে।

'কি সেই কাজ?'

'আজ সন্ধ্যেবেলায় দেখিয়ে দেবো।'

হাইনরিখ সাইকেলে চেপে বেরিয়ে গেলো। আজ খুব গরম পড়েছে। গরম কাটাতে ঠান্ডা বীয়ার খাচ্ছি আমরা। বীয়ার ফুরিয়ে যেতেই রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বীয়ার পাঠিয়ে দিতে বললো জর্জ। একটু পরেই তার মা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হেরিং মাছ ভাজা আর তার সঙ্গে একটু আচার চলবে নাকি?'

'খুব চলবে।'

'হ্যাঁ, এরই নাম জীবন। খাও পিও আর জীও।' আমি বললাম, 'তা না, নিজেকে বঞ্চিত করে পরের জন্য লাখ লাখ মার্ক সঞ্চয় করে যাও, পরে তারা যাতে লুটে পুটে খায় তার ব্যবস্থা করে যাওয়া।'

'হ্যাঁ, মানুষ ভুলে যায়, মানুষ অমর নয়, মৃত্যু অবধারিত', দার্শনিকের মতো বলে উঠলো জর্জ। 'আমি তো ভাবছি, মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন সময় থাকতে

থাকতে টাকা পয়সা সব গুছিয়ে নিয়ে ভাবছি বার্লিনে চলে যাবো। জীবনের বাকী দিনগুলো খুব ফুর্তি করে কাটাবো সেখানে, আর মনের মতো বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেবো, কটা দিনই বা বাঁচবো আর…এখানে একটু থেমে জর্জ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করবে তাই বলো এবার।'

'আ-আমি?' সতর্ক হতে হলো। যেদিকে দু'চোখে তাকালাম উত্তরটা খোঁজার জন্য—বাগানটা সূর্যস্নাত হয়ে কবোষ্ণ হয়ে গেছে, সবুজের সমারোহ। মাথার ওপর অন্তবিহীন নীলাকাশের মতো বড় উদার হতে ইচ্ছে হয়, সেই উদারতার পরশ লাগলো বুঝি আমার কথায়, 'এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, পরে ভেবে বলবো।'

'দেখো, বেশী ভাবতে গিয়ে যেন আবার পাগলা গারদে যেতে না হয় তোমাকে', বলে হাসলো জর্জ।

'কথাটা কিন্তু মন্দ বলোনি হে।'

নোপকের বাড়ি থেকে শব্দ ভেসে এলো। তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে জর্জ জিজ্ঞেস করলো, 'ওকে নিয়ে তুমি কিছু মতলব আঁটছো নাকি?'

সেটা জানার জন্য আজ রাত পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

□ তেরো □

এডুয়ার্ড নবলকের রেস্তোরাঁ। সেখানে ঢুকতে গিয়েই ধাক্কা খেলাম গার্দাকে একটা মদের টেবিলে বসে একটা বড় মাংসের টুকরো খেতে দেখে। টেবিলে ফুলে ভর্তি ফুলদানি। তবে এই মুহূর্তে গার্দা একাকী বসে আছে।

'আচ্ছা জর্জ, এটা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?'

'কেন, বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার ছিলো নাকি?'

'না, কিন্তু এভাবে প্রতারণা করারও কোন কথা ছিলো না।' রেগে গিয়ে বলে উঠলাম, 'দ্যাখো জর্জ, এভাবে দার্শনিক হওয়ার চেষ্টা করো না। এর মধ্যে যে এডুয়ার্ডের নোংরা হাত আছে, তুমি কেন বুঝেও বুঝতে পারছো না?'

'তা না বোঝার কি আছে এতে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো জর্জ, 'তা প্রতারণা কে তোমায় করেছে? গার্দা, নাকি এডুয়ার্ড?'

'আমার মতে গার্দাই। পুরুষকে দায়ী করা উচিত নয়। তা তোমার কি অভিমত?'

'নারীকেও নয়', জর্জ, তার মতামত জানালো।

'এডুয়ার্ড নয়, গার্দাও নয়, তাহলে অপরাধী কে শুনি?'

'সে তুমি, শুধু তুমি।'

'এ কথা তোমার পক্ষেই সাজে', আমি ওকে কটাক্ষ করে বললাম, কারণ তুমি নিজেই নিজেকে ঠকাও। তোমার নীতিজ্ঞান বলতে কিছু নেই।'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জর্জ ঘাড় নেড়ে আমার কথায় সায় দিয়ে বললো, 'প্রেম, ভালোবাসা হলো মনের উচ্ছ্বাস, এর মধ্যে নৈতিকতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আর মনে উচ্ছ্বাস যেখানে, সেখানে ঠকানোরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ সেটা এমনি একটা জিনিষ, চিরস্থায়ী নয়—এই আছে, আবার এই নেই। তাই আমার মতে এসব ব্যাপারে কখোনোই চুক্তি করা যায় না। আর তুমি কি গার্দাকে কখনও এরনার কথা বলেছিলে?'

'গোড়ায় এরনার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তাছাড়া রেড মিলে ওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনে এরনাতো আমার সঙ্গেই ছিলো, সব দেখেছিল ও।'

'তাহলে হা-হুতাশ করো না। হয় কিছু একটা করো, না হয় ওকে ছেড়ে দাও।'

'ডলারের দাম ক্রমশ বাড়ছে। আমার জীবনটাও ঠিক এই মুদ্রাস্ফীতির মতোন। প্রথমে এরনা, তারপর গার্দা, একে একে সবাই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—'

'তবু লড়ে যাও বন্ধু', জর্জ ভরসা দেয়, 'আশা এখনো আছে, আশার বিনাশ নেই। তোমার হবে। যাও, এখন গার্দার কাছে চলে যাও। পেতে হলে লড়তে তো হবেই।'

'কিন্তু আমি লড়াই করবো কি নিয়ে? শুধু কবরের পাথর নিয়ে? অথচ দেখো, এডুয়ার্ড ওকে কেমন দামী হোটেলে বসিয়ে ওর মন পসন্দ খাওয়াচ্ছে, আর এখানেই আমি ওর কাছ থেকে অনেক পিছিয়ে। হয়তো কবিতা লেখার ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার তেমন কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু খাওয়ানোর ব্যাপারে গার্দার জন্য আমার বরাদ্দ খরচের পার্থক্যটা ও বেশ ভালোই বুঝবে। তবে হ্যাঁ, আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, ভুল আমারি, কেনই বা গার্দাকে এই হোটেলে আমি আনতে গেলাম?'

'তাহলে আর কি? ভুলে যাও ওকে—লড়ে কিই বা হবে তোমার?'

'কিছু হবে না বলছো তুমি? অথচ একটু আগে তুমিই না আমাকে বলেছিলে, মেয়েটির সঙ্গে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকতে। কি কারণে জানতে পারি?'

'কারণ আজ মঙ্গলবার। ওই দ্যাখো, কেমন রবিবারের স্যুট পড়ে আছে এডুয়ার্ড, এমন কি বাটনহোলে গোলাপ ফুলটি গুঁজতে পর্যন্ত ভুল করেনি। বন্ধু, আর কোনো আশা নেই, গলা পর্যন্ত ডুবে গেছো তুমি।'

এডুয়ার্ড টেবিলের কাছে এলে জর্জই প্রথম তাকে খোঁচা দিলো, 'আচ্ছা, একজন

সৈনিক কি তার সঙ্গী আর এক সৈনিকের পেছন থেকে পিঠে ছুরি বসাতে পারে? এক কবি আর এক কবিকে আশাহত করে?'

'কবিদের ধর্মই সেরকম। আর সেইজন্যই তো কবিরা বেঁচে থাকতে বেশী আগ্রহী।'

'হ্যাঁ, তাদের সেই বাঁচার লড়াই হয় ময়দানে, পেছন থেকে ছুরি মারার জন্য নয়', শেষ পর্যন্ত না বলে থাকতে পারলাম না আমি।

দেঁতো হাসি হাসলো এডুয়ার্ড। 'লুটের মাল যে শেষ বারের মতো লুঠ করে সেই পায় লুডউইগ।'

এডুয়ার্ড কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, গার্দা সেখানে হাজির হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'তোমরা তো আমার কাছে এলে না, তাই আমি নিজেই চলে এলাম এক সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।'

'তাহলে তোমার অনুমতি নিয়ে খাওয়া যাক?' আমি বললাম।

'তা এডুয়ার্ডের অনুমতি নেবার কি দরকার বুঝছি না', বললো গার্দা, 'আমার বন্ধুদের সঙ্গে খেতে ভালো লাগে জানলে এডুয়ার্ডের খুশি হওয়ারই তো কথা। কি বলো এডুয়ার্ড?'

দ্বিচারিণীটা এরই মধ্যে এডুয়ার্ডের নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে? জর্জ ঠিকই বলেছে, গলা পর্যন্ত আমি ডুবে গেছি। না, আমার আর কোনো আশা নেই।'

আমতা আমতা করে এডুয়ার্ড বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এতে তো খুশি হওয়ারই কথা।'

'তাহলে এডুয়ার্ড, আমার এই দুই বন্ধুকে আজ ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তুমি ওদের এবার দেখিয়ে দাও, তুমি কতোই না উদার আর মহৎ। ওদের ধারণা, তুমি নাকি ভীষণ কৃপণ। তোমার সম্পর্কে ওদের এই অপবাদটা ঘুচিয়ে দাও।'

'ওরা আমার বন্ধু নয়, শত্রু', ফুঁসে উঠলো এডুয়ার্ড।

'সেকি বন্ধু কবির রক্ত তোমার আমার দু'জনের মধ্যেই রয়েছে, সে হিসাবে তোমার আমার অন্তরের সম্পর্ক আছে। মনে নেই তোমার, কবিদের ক্লাবে সেদিন তুমি কি বলেছিলে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে সে কথা? আমার কিন্তু আজও মনে আছে—কোন ছন্দে, আর কাকে নিয়েই বা তুমি এখন কবিতা লিখছো। সেটা গার্দাকে জানিয়ে দেবো নাকি?'

'কি বলছো তোমরা?' অবাক চোখে তাকায় গার্দা। 'তোমাদের কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না—'

'কি করেই বা বুঝবে তুমি', এডুয়ার্ড বললো, 'ওরা দুজন কখনো সত্যি কথা বলে না। জোকারের মতো রসিকতা ছাড়া আর কিছু জানে না ওরা। ওরা জীবনের

মহত্ব কি বুঝবে।'

'কি বলছো তুমি? যারা কবর খোঁড়ে আর কফিন তৈরী করে, তারা ছাড়া আমাদের চেয়ে বেশী জীবনের গুরুত্ব আর কে বোঝে বলো?' আমাদের সম্পর্কে ওর মিথ্যে অপবাদটা ঘোচাবার চেষ্টা করলাম।

'আবার সেই মৃত্যু নিয়ে তর্ক জুরে দিলে তো?' কটাক্ষ করে বললো গার্দা। 'আর এ কারনেই জীবনের সত্যিকারের মহত্ব যে কি সেটা তোমরা উপলব্ধি করতে পারলে না এখনো।'

সেকি! আমি অবাক। গার্দা যে একেবারে এডুয়ার্ডের কথা বলছে? বুঝলাম আমার আর লড়া উচিত হবে না।

'তা এই সত্যটা তুমি উপলব্ধি করলে কি করে?' ওকে ব্যঙ্গ করার লোভটা আমি সামলাতে পারলাম না।

'তোমরা দিনরাত শুধু কবরখানার চিন্তা করে করে ভালো কিছু ভাববার মানসিকতাটা হারিয়ে ফেলেছো। তবে কেউ কেউ এর মধ্যে ব্যতিক্রম, যেমন ধরো এডুয়ার্ড। আমার কাছে ও তো একটা ভোরের পাখি যেন—'

এডুয়ার্ডের মুখটা আরক্ত হয়ে উঠলো লজ্জায়। সেটা লক্ষ্য করে গার্দা বলে উঠলো, 'এর পর আশা করি ভালো ভালো খাবারই তুমি পাঠাবে। যাও, তাড়াতাড়ি করো। আমার খুব খিদে পেয়েছে।' বাচ্চা মেয়ের মতো বললো গার্দা।

ভালো ভালো খাবার নিয়ে এসে এডুয়ার্ড পাকা গিন্নীর মতো নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করলো আমাদের। কিন্তু আজ কেন জানি না অতি ভালো খাবারেরও কোনো স্বাদ পেলান না। আর তখনি আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, না, আর নয়, এডুয়ার্ডের সুখের পথে কাঁটা হয়ে আমি আর থাকবো না। গলা পর্যন্ত ডুবেছি যখন, তখন না হয় একেবারেই তলিয়ে যাই না কেন!

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলো নোপক। আর ওরই জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম অনেকক্ষণ ঘরের আলো নিভিয়ে। সেই জলের ভাঙ্গা পাইপের একটা প্রান্ত আমার জানালায়, আর অপর দিকটা ছিলো নোপকের বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথে। খালি চোখে কারোর সেদিকে নজর পড়ার কথা নয়। আমি তখন মুদ্রাস্ফীতি, অনাহারে একজনের আত্মহত্যা, শ্রমিক ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করার ফাঁকে আমার দৃষ্টি কিন্তু পড়ে রইলো গেটের দিকে। এই সময় এক জোড়া যুবক-যুবতীকে ছুটে এসে আমাদের বাগানে ঢুকে পড়তে দেখলাম। ওদের দুর্ভাগ্য, পকেটে রেস্ত কম থাকলে এসব জায়গাতেই কাজ চালিয়ে নিতে হয় সময় সময় জৈবিক তাড়নায়।

রাত এখন প্রায় আড়াইটে, নোপক বাড়ি ফিরছে মাতাল হয়ে। আজো অন্য

দিনের মতো সোজা সেই কালো অবিলিস্কের দিকে এগিয়ে গেলো। আমি তখন জলের পাইপের প্রান্ত ভাগে মুখ লাগিয়ে চাপা গলায় তার নাম ধরে ডাকলাম, 'নোপফ!' সঙ্গে সঙ্গে পাইপের অপর প্রান্তে শব্দটা যেন ভূতুড়ে আওয়াজ তুললো। এবার তাকে গালিগালাজ করে বললাম, 'নোপফ, তুমি একটা জানোয়ার, লজ্জা করে না? মাতাল হয়ে কবরের পাথরের গায়ে প্রস্রাব করার জন্যেই আমি তোমাকে সার্জেণ্ট মেজরের পোস্টে তুলে এনেছি?'

চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়ালো নোপফ। 'কে, কে তুমি? তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'তুমি একটা অভদ্র, ইতর। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষস্থানীয় কেউ যখন কথা বলে, চুপ করে শুনতে হয়, কোনো প্রশ্ন করতে নেই, এটুকু শিক্ষা নেই তোমার? আমার কণ্ঠস্বর কি ভূতুড়ে আওয়াজের মতো কানে বাজছে তোমার?'

নোপক তখন দিশেহারা হয়ে চারদিকে তাকালো, না, ধারে কাছে কেউ তো নেই। তার সব ঘরের আলোও নেভানো। কিন্তু কে কথা বলছে তাহলে?'

'সোজা হয়ে দাড়াও সার্জেণ্ট মেজর! ছিঃ ছিঃ সৈনিকদের নিয়মানুবর্তিতা তুমি শেখনি? তোমাকে এইভাবে দেখার জন্যই কি আমি তোমার কলারে আর কাঁধে সর্বোচ্চ সম্মানের তারকা চিহ্ন ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম?

নোপফ আমাকে দেখতে না পেলেও অন্ধকার ঘরে বসে বাইরে চাঁদের আলোয় আমি কিন্তু তাকে বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম। প্যাণ্টের বোতামে হাত দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, চোখে মুখে বিহ্বলতা। সে যেন ভেবেই পাচ্ছে না, এই গভীর রাতে ভূতুড়ে গলায় কে কথা বলছে?

'সাবধান নোপক! যদি দেখি তোমাকে আবার ওখানে প্রস্রাব করতে, তাহলে তোমাকে বর্তমান পদ থেকে নামিয়ে দেবো। ধিক, জার্মান সৈনিকের মর্যাদা কি করে রাখতে হয়, জানো না তুমি!'

কান খাড়া করে শুনছিল সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর নোপফ। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'কাইজার, আপনি?'

'কোনো কথা নয়, প্যাণ্টের বোতাম লাগিয়ে ফিরে যাও তোমার ঘরে। এর পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়। যাও, এগিয়ে যাও।'

মদের নেশায় আর ভূতুড়ে নির্দেশে নোপকের পা দুটো টলতে থাকে তার আস্তানায় ফিরে যেতে গিয়ে।

□ চোদ্দ □

এড্‌ওয়ার্ডের আস্তানায় কবিদের ক্লাবের সভা বসেছে। অথচ এড্‌ওয়ার্ড অনুপস্থিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি ব্যাপার, তুমি থাকছো না কেন?'

'কি দরকার? এই তো বেশ আছি।'

'সত্যি কি তাই?' বিশ্বাস হলো না, ও নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছে।

'হোটেলের কোনো পরিচারিকাই ওর কামনার আগুন থেকে রেহাই পায়নি। আমার সঙ্গী হানস হাঙকারমান, যে কিনা তার 'কাসানোভা' বইটার জন্য পরামর্শ করতে এসেছিল, চোখ একটু ছোট করে একটা কদর্য ইঙ্গিত করলো সে, 'আর ওর প্রস্তাব না মানলে হোটেলের চাকরী খোয়াতে হয় তাদের।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলাম। খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যা। আমরা এখন চলেছি বারো নম্বর বাহনট্রাফেতে। শহরে দুটি বারোয়ারি বাড়ির মধ্যে এই বারো নম্বর বাড়ীটাই সব থেকে ভালো। শহরের একেবারে সীমানা ছাড়িয়ে সেই বাড়িটা। চারদিকে পপলার গাছ। আমার বহু পরিচিত বাড়িটা। কৈশোরের কতো দিনই না কেটেছে এই বাড়িতে, অবশ্য তখন আমি জানতাম না এই বাড়িটার বাসিন্দাদের কাজ কি, কি তাদের ভূমিকা আমাদের সমাজে। ঘুরতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে ক্লান্তি কাটাতে গলা ভেজাবার জন্য খুঁজতে খুঁজতে আমরা সবাই সেই বারো নম্বর বাড়িতে চলে এসেছিলাম। সেখানে তখন কতো মেয়েদেরই না দেখেছিলাম আমরা। ওরা আগ্রহ নিয়ে তখন জানতে চাইতো, কি নাম আমাদের, কোন ক্লাসে পড়তাম আমি। কখনো বা আমাদের পড়া দেখিয়ে দিতো। মায়ের মতোই স্নেহ করতো ওরা আমাদের। মেয়েমানুষ যে কি, সেই বোধটা তখনো আমাদের হয়নি। ওদের বয়স নিয়েও কোনো উৎসাহ ছিলো না আমাদের। আমার মা তখন হাসপাতালে ছিলেন, তাই ওদের কাছ থেকে স্নেহ, যত্ন ও আদর-ভালোবাসা পেয়েই মন ভরে থাকতো আমার। তারপর একদিন আমরা সেই পাড়া ছেড়ে চলে আসি অন্যত্র, সেই সঙ্গে বারো নম্বর বাড়ির সঙ্গে আমাদের সব পাটও চুকে-বুকে যায়।

তারপর অনেকদিন পরে, মনে আছে যুদ্ধে যাবার আগের দিন সেই শেষবার আমরা যাই বারো নম্বর বাড়িতে। তখন সবে আমি আঠারোটি বসন্ত পেরিয়ে এসেছি। নারী সঙ্গর অনুভূতি তখনো আমরা অনুভব করিনি; যুদ্ধে যাওয়া মানেই নির্ঘাৎ মৃত্যু, সেটা অনুভব না করে মরতে চাই না আমরা। তাই আমরা

পাঁচ বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম সেদিন সেই বারো নম্বর বাড়িটিতে। আমাদের মধ্যে উইলির উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল সব থেকে বেশী। ওই প্রথম এগিয়ে গিয়ে এক লাস্যময়ী মেয়ে ফ্রিৎজিকে কাছে ডেকে কেমন সাহস করে অম্লান বদনে বলেছিল, 'হবে নাকি প্রিয়তমা ?'

'কেন হবে না !' এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল ফ্রিৎজি, 'কিন্তু তোমার পকেট ভর্তি আছে তো ?'

'যথেষ্ট', উইলি তার পকেট উজার করে তার মাইনের পুরো টাকাটা দেখায়।

'ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে', ফ্রিৎজি ওর সঙ্গে কথা বললেও তার নজর ছিলো বীয়ারের টেবিলের দিকে। কিন্তু তার সঙ্গে ওপরতলায় যাওয়ার জন্য মাথার টুপিটা টেবিলের ওপর রাখতেই ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে উইলির লাল চুলের দিকে। দীর্ঘ সাত বছর পরে হলেও উইলির সুন্দর লাল চুল দেখে ওকে চিনতে ভুল হয়নি তার। এমন কি ওর নামটা পর্যন্ত। 'এক মিনিট, আচ্ছা তোমার নাম উইলি না ?'

'হ্যাঁ', ওকে চিনতে পেরেছে জেনে বেশ গদগদ হয়েই বললো উইলি।

'সাত-আট বছর আগে তোমরা এখানে এসে স্কুলের পড়াশুনো করতে না ?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'আর সেই দুধের শিশু এখন তুমি আমার ঘরে আসতে চাইছ ?'

'হ্যাঁ, আমাদের পরিচয় যখন আগে থেকেই হয়েছে', দাঁত বের করে হাসলো উইলি।

ওর সেই হাসি দেখে আর কোনো কথা না বলে ফ্রিৎজি একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, উইলির গালে একটা চড় কসিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো, 'এক সময়ের শিশু আজ কৈশোরে পুরনো পরিচয়ের সুবাদে মায়ের বয়সী একজন নারীর সঙ্গে শুতে এসেছো তুমি ? জানোয়ার কোথাকার ! সব কিছুর একটা সীমা আছে—'

'তার মানে কি বলতে চাইছো তুমি ?' উইলি আমতা আমতা করে বললো, 'কিন্তু আর সবাই যে—'

'আর সবার কথা আমি ভাবতে যাবো কেন ? আমি কি ওদের স্কুলের পড়া তৈরী করে দিতাম। তোমার নাক দিয়ে সর্দি পড়তো তখন, আমি মুছে দিতাম—'

'সে যাইহোক, এখন আমার বয়স সাড়ে সতের বছর—'

'আবার বড়দের মুখের ওপর তর্ক ? চুপ করো। লজ্জা করে না তোমার মায়ের বয়সী মেয়েমানুষের সঙ্গে শুতে এসেছো ? যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—'

'আগামীকাল ও যুদ্ধে যাচ্ছে, ফিরবে কিনা ঠিক নেই', ওর হয়ে আমি বললাম, 'দেশের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছে ও, এরই নাম দেশপ্রেম। তোমার মনে দেশপ্রেম জাগে না ?'

ফ্রিৎজি এবার আমার দিকে ফিরে তাকালো। 'ওঃ তুমি? তা তুমিও তো ওর সঙ্গে তখন আসতে তাই না?'

ওদিকে হৈচৈ, চিৎকার শুনে বাড়িউলি এসে হাজির হলো তাদের মধ্যে। ফ্রিৎজি সব বুঝিয়ে বললো তাকে। বাড়িউলি তখন মাথা নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ, তাই তো, ওই লাল চুলের ছেলেটাই উইলি না? আর তোমার যেন কি নাম?' আমার দিকে ফিরে সে এবার নিজের থেকেই বললো, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, লুডউইগ না?'

'হুঁ!' আমার হয়ে উইলি এবার বললো, 'এখন আমরা সৈনিক, যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। যুদ্ধে যাওয়ার আগে যৌন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অধিকার আমাদের আছে।

'কি বললে অধিকার আছে তোমাদের?' শব্দ করে হেসে উঠলো বাড়িউলি। 'ফ্রিৎজি, তোমার মনে আছে, এই ছেলেটাই একদিন বাইবেল ক্লাসে নোংরা জিনিষ ছুঁড়েছিল? আর সেই ছেলেটি আজ বলে কিনা যৌন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অধিকার আছে ওদের?' তেমনি হাসতে হাসতে কাকে যেন ডেকে বললো, 'ওরে শোন, এদের লেমনেড খাইয়ে ছেড়ে দে।'

'লেমনেড খাওয়ার বয়স আমাদের নেই', আমি বললাম, 'এখন আমরা মদ খাই। বড় হয়েছি, সবাই যেমন হয়।'

'বড় হয়েছো তোমরা? যাও, বেরোও এখান থেকে।'

এক রকম গলা ধাক্কা দিয়েই বের করে দেওয়া হলো আমাদের। রাগে ফুঁসছিল উইলি। দরজার কাছে এসে সে তাকে শাষায়, 'তোমরা আমাদের সঙ্গ না দিলে তো বয়ে গেলো। আমরা এখন চললাম রোলসস্ট্রাফেতে।'

কিন্তু সেখানে যাওয়া আর হলো না, টানা দু'ঘণ্টার রাস্তার ধকল সওয়ার মতো মানসিকতা ছিলো না তখন আমাদের কারোর।

শেষ পর্যন্ত নারী দেহের স্বাদ না নিয়েই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেতে হলো। যুদ্ধে আমাদের মতো সতেরোটি যুবকের যৌন অভিজ্ঞতা লাভের আগেই কৌমার্য বজায় রেখে মৃত্যুর শিকার হতে হলো। যাইহোক, তারপর প্রায় দেড় বছর পরে ফ্ল্যাণ্ডার্সে আমাদেষ প্রথম সেই অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এর ফলে উইলি যৌনরোগে আক্রান্তও হয়। তাই এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভালো মানুষেরা যে সব সময় পুরস্কৃত হয় তা নয়।'

অটো বামবাসের ধারণা গণিকালয়ের অ…আ…ক…খ… সব আমি জানি। অন্যরাও সেখানে গেছে, কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন তারা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তবে নাট্যকার পলের মধ্যেই সবজান্তার ভাব দেখা যাচ্ছে; কিন্তু আমি তো জানি, জীবনে ওই নিষিদ্ধপল্লীতে তার পায়ের ছাপ পড়েনি কখনো।

ওদিকে অটো ঘামতে শুরু করেছে। আমি ওকে বোঝাই, 'আরে, বেশ্যালয়ে

রোজ তো কেউ যায় না, নেহাত জৈবিক কামনা না জাগলে কেউ সেখানে যায় না। আর তেমন কিছু ক্ষতিও হয় না সেখানে গেলে। তেমন গোলমালও হয় না। তবে কি জানো বন্ধু, ফ্রিৎজি নামে এক বারবণিতা এই তো সেদিন তার একজন খদ্দেরের কান ছিঁড়ে নেয়।'

'সেকি?' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অটো।

'না, ঘাবড়াবার কিছু নেই, সবাই ঠিক ওর মতো নয়। আমরা এখানে আসি আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে, আদিম স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। তাতে ওদের আপত্তি থাকতেই পারে।'

'কিন্তু তাই বলে কান কেটে নেবে?' অটোর মন থেকে সংশয় আর যেন যেতে চায় না।

'আরে কান তো তবু সামান্য। অনেক সময় এইসব মেয়েমানুষগুলো পুরুষদের ধরে ধরে খাসি করে দিতে দ্বিধা করে না', গম্ভীর স্বরে বললো হাঙকারমান। 'কিছু মেয়ে আছে, যারা সমকামী, পুরুষদের ওপর নানান ভাবে অত্যাচার চালায়। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, এই ধরনের মেয়েদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাতে একটা অস্ত্র রাখবে।' এই বলে পকেট থেকে লাল চামড়ায় মোড়ানো একটা নকল হাতীর দাঁতের চিরুনী আর নখ কাটবার সরু উখো বের করলাম। এসবই এরনার উপহার—আর এক দ্বিচারিণীর কাছ থেকে পাওয়া। ও দুটো অটোর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'রেখে দাও, প্রয়োজনে কাজে আসতে পারে।'

'শোনো কবি, চিরুনী দিয়ে ধারী মেয়েটাকে কোপানো যাবে না', ঠাট্টা করতে ছাড়লো না হাঙকারমান।

'আর সিফিলিসের ব্যাপারটা?' তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে জিজ্ঞেস করলো অটো।

'আজ হলো শনিবার। এ পাড়ার প্রত্যেক মেয়েকে পরীক্ষা করে গেছে ডাক্তার। তাই ভয়ের কিছু নেই। আমি তাকে বললাম, এতোই যখন ভয়, তা বিয়ে করছো না কেন?'

'বিয়ে? না না, বিয়েতে ভীষণ ভয় আমার। সারা জীবনের বন্ধনে নিজেকে জড়াতে চাই না আমি', আঁতকে ওঠার মতো করে বললো অটো।

এখানে মদের দাম চারগুণ। তাই সঙ্গে আনা মদ আমরা একটু করে গলাধঃকরণ করে নিলাম। বাইরে এডুয়ার্ডের গাড়ি দেখে এসেছি, তার মানে আগেই চলে এসেছে সে। অটোকে হতাশ হতে দেখা গেলো, ও ভেবেছিল, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুলবে, বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাসে ম' ম' করবে, স্বল্পবাস পরা মেয়ে এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। তা না হয়ে তার বদলে কিনা ঝি ক্লাসের বারমেড?

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো অটো, 'এখানে নিগ্রো মেয়ে পাওয়া যায় না?' দূরে ছিপছিপে কালো কোঁকড়ানো চুলের একটা মেয়েকে দেখিয়ে আমি বললাম, 'ওই মেয়েটার মধ্যে নিগ্রো রক্ত আছে। চরিত্র সংশোধনী জেলখানা থেকে সবে মাত্র ছাড়া পেয়ে এসেছে এখানে। মেয়েটি তার স্বামীকে খুন করেছিল।'

মেয়েটির নাম আয়রণ হর্স। অনেক কবি, নাট্যকার, গীতিকার এই মেয়েটিকে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছে এর আগে। তাই একেই আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম অটোর জন্য। ও না হলে তখন ফ্রিৎজিকে ধরা যাবে। বলে রেখেছিলাম, সে যেন জমকালো পোশাক পরে আসে, মেয়েটি কথা রেখেছে আমাদের। অটোর সঙ্গে পরিচয় করানোর পর মেয়েটিকে হতাশ হতে দেখলাম। সে ভেবেছিল হয়তো, একটা অল্পবয়সী তরতাজা যুবককে তার বিছানায় পাবে। ওদিকে অটোর মুখ তখন ভয়ে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বয়স তার মাত্র ছাব্বিশ। আয়রন হর্স এগিয়ে এসে বললো, 'চলো আমার সঙ্গে।'

ডলারের দাম ক্রমশ বেড়ে যাওয়াতে খরচার ব্যাপারে শঙ্কিত হাঙ্কারমান ভয়ে ভয়ে বললো, 'মোট খরচ কত পড়বে? কুড়ি লাখের রফা হয়েছে আমাদের সঙ্গে। পোশাক খোলা আর আধ ঘণ্টা আমাদের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা একান্ত দরকার, তার জন্য ওই টাকাটা তোমাকে দেওয়া হবে।'

'না, আমার তিরিশ লাখ চাই', বললো আয়রণ হর্স, 'তাও তো এটা খুবই সস্তা।

'এই সব মেয়েগুলোর আজকাল কতো দাম হয়েছে, দেখেছো বন্ধুগণ, আমরা প্রতারিত হচ্ছি।' মেয়েটির কথায় কান না দিয়ে হাঙ্কারমান বলে উঠলো, 'আমাদের ওই এক কথা—কুড়ি লাখ মার্ক। দেখছি এখানে চুক্তির খুব খেলাপ হচ্ছে।'

'এসব ব্যাপারে আবার চুক্তি কিসের শুনি?' মেয়েটি ফুঁসে উঠলো, 'অতোই যখন টাকার চিন্তা, তাহলে সস্তা দামের মেয়ের কাছেই তো গেলে পারো তোমরা।'

এরপর আর দরদস্তুর করা চলে না। হাঙ্কারমান দেখলো, অটো নিজেও আয়রণ হর্সের জন্য কনিয়াক মদের ফরমাস দিলো। সেই দেখে উইলি সবার জন্য মদের ফরমাস দিলো। ওর মেজাজ আজ খুব খুশী—ও আজ আড়াই কোটি মার্ক উপার্জন করেছে। অটো আজ সাবালক হতে চলেছে, তাতে দারুণ খুশি হয়ে বললো ও, 'আজকের সব খরচই আমি দেবো।' তারপর অটোর পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে বিদায় দিতে গিয়ে বললো উইলি, 'যাও, নাবালকত্ব ঘুচিয়ে মানুষ হয়ে ফিরে এসো।'

অটোর উত্তরণ শুরু হলো, আয়রণ হর্সের হাতে হাত রেখে দোতলায় উঠে গেলো সে। আমার পাশে তখন ফ্রিৎজি বসেছিল। তার জীবনের করুণ কাহিনী শুনছিলাম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে তার ছেলের মৃত্যু হয়, তাই আমাদের সঙ্গে তার দোস্তি বেশ জমে উঠেছে। আর সেই মুখরা বাড়িউলির বেটপ

শরীরটা উপড়ু হয়ে পড়ে আছে আমাদের পাশেই ঘুমন্ত অবস্থায়।

ফ্রিৎজির সঙ্গে গল্প করার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়লো দোতলা থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসাতে। তারপরেই আন্ডারওয়্যার পরিহিত অটোকে এক রকম ছুটতে ছুটতে পড়ি কি মড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখলাম, আর তার পেছনে ছুটে আসছে আয়রণ হর্স, তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছিল। একটা টিনের মগ দিয়ে অটোকে পেটাচ্ছে সে। কোনো রকমে তার হাতের নাগাল পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো অটো। তখন আমরা তিনজনে মিলে কোনো রকমে আটকালাম আয়রণ হর্সকে।

মেয়েটি তখনো রাগে গজরাচ্ছিল। 'ওই শয়তানটা ছুরি সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে কারবার করতে এসেছিলো, এতো স্পর্ধা ওর?'

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরে আয়রণ হর্সকে বোঝালাম, 'আরে ওটা ছুরি নয়, ওটা নখ কাটার উখো।'

'উখো?' শুনে আয়রণ হর্স তো থ। সামলে নিয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিমায় বললো সে, 'আমি ওকে সুখের শিখরে তোলবার জন্য চাবুক দিয়ে আলতো করে একটু মারতেই ও কিনা উল্টে আমাকে···।'

যাইহোক দামী মদ খাইয়ে মেয়েটিকে শান্ত করলাম কোনো রকমে। তারপর বাইরে বেরিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অটোকে ধরে নিয়ে আসা হলো ভেতরে। পোশাক পরানো হলো ওকে, তবু ওর ভয় আর কাটে না। ও আর দোতলায় যেতে চায় না। আয়রন হর্সের সঙ্গে রফা হলো, পরের সপ্তাহে ও আবার আসবে, তখন সে আর টাকা নেবে না।

ইতিমধ্যে এডুয়ার্ড ফিরে এসেছে। ততক্ষণে সামলে নিয়ে পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে লিখতে শুরু করে দিয়েছে অটো। উঁকি মারতেই দেখি—কবিতার নাম দিয়েছে ও 'বাঘিনী'।

'পরে কবিতা লেখার সময় তুমি অনেক পাবে হে', ঠাট্টা করে বললাম ওকে।

'টাটকা টাটকা অভিজ্ঞতার আলাদা দাম আছে', মাথা নেড়ে অটো তার অভিজ্ঞতার ফসল লিপিবদ্ধ করতে থাকলো।

'বাঘিনী লেখার মতো কি এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে শুনি?'

'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যপার, কল্পনায় সব কিছু করা যায়।'

'আহা, কি কল্পনা শক্তি রে? এখন ওসব রাখো তো, এসো স্বাস্থ্য পান করা যাক।' আমি বললাম।

'তাহলে থাক', বলে কাগজ পেন্সিল গুটিয়ে মদ খেতে শুরু করলো অটো, দুধ খাওয়া মানুষটা আজ ক্ষেপে উঠলো, আকণ্ঠ মদ খেলো। এক সময় পাততাড়ি গুটিয়ে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

উইলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমার গাড়িটা কোথায় হে ?'

'রেণীকে দিয়েছি।'

'ওর জন্যে তোমার খুব যে মাথা ব্যাথা দেখছি। তা তুমি ওকে বিয়ে করবে বলে মনস্থ করেছো নাকি ?'

'হ্যাঁ। বিয়ের প্রথম পর্ব বাগদান সেরে ফেলেছি', হাসলো উইলি। অবাক হতে হলো, এও কি সম্ভব ?

তারপর বোদার গানের আসরে রাতটা কাটাবার প্রস্তাব করলাম আমরা সবাই। ঝরণার জলে চাঁদের রুপোলী আলো চিক চিক করছিল। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল। মদের মতো এক চুমুকে ঝরণার সব জলটুকু পান করে নিই।

□ পনেরো □

ভোর পাঁচটায় রাইজেনফেল্ডকে আসতে দেখে অবাক হলাম। 'আজ রোববার, ছুটির দিনে ভুল করে চলে এসেছো নাকি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'স্টক এক্সচেঞ্জও তো খোলা নেই, তাহলে ? রেড মিল নাইট ক্লাবে যাওয়ার জন্য রেস্তোর সন্ধানে এসেছো ?'

'না', ঘাড় নেড়ে বললো রাইজেনফেল্ড, 'ওপাশের সেই সুন্দরীর খবর কি ?'

'ওহো, তাই বলো, তাহলে তুমি রুপোর জন্যে নয়, রুপের টানেই চলে এসেছো সাত-সকালে ? তুমি তোমার বিগত যৌবনকে যে এখনো ধরে রাখতে পেরেছো, তার জন্য অভিনন্দন জানাই বন্ধু তোমাকে। কিন্তু তোমার যে কপাল খারাপ, জানো না রোববার ওর স্বামী বাড়িতেই থাকে। কুস্তিগীর হিসেবে ওর দারুণ পরিচিতি আছে। তাছাড়া বেশ ভালো ছুরি চালাতে পারে ও।'

'ওটা কিছু নয়', তাচ্ছিল্যের মতো বললো রাইজেনফেল্ড, 'আর এ ব্যাপারে আমি যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, জানো তো ? বিশেষ করে যদি মদ আর মাংস খেয়ে, সেই সঙ্গে কফি হলে তো কথাই নেই।'

ওপরের ঘরে যেতে চাইলো না রাইজেনফেল্ড। নিচের ঘরে বসেই মদ আর কফি খেতে চায় সে। উদ্দেশ্য আমার ঘর থেকেই জর্জের ঘরের ওপর নজর রাখা। আমাকে চেঁচিয়ে কথা বলতে দেখে আপত্তি করলো ও। 'এতো চেঁচিয়ে তুমি কথা বলছো কেন বলো তো ? তুমি কি ভেবেছো, রাতারাতি আমি বুঝি কালা হয়ে গেছি ?'

কি করে বোঝাই ওকে, কেন আমি চিৎকার করে কথা বলছি ওর সঙ্গে। ওকে

তো আর বলতে পারি না। জর্জ'কে ঘুম থেকে জাগাবার জন্যই আমার এই চিৎকার। যে কথা ওকে এখনো বলতে পারিনি, কিংবা যা বলা যায় না, তা হলো, লিসার স্বামী ওই কসাই ওয়াটজেক গত রাত থেকে বাড়িতে নেই, সে গেছে সমাজতন্ত্রীদের সভায় যোগ দিতে। আর সেই সুযোগে লিসা চলে এসেছে জর্জে'র ঘরে সারা রাত তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে থাকার জন্য। এখবরটা তো আর রাইজেনফেল্ডকে দেওয়া যায় না! জর্জে'র দরজার সামনেই বসে আছে ও। তাই লিসাকে এখন পেছনের জানালা টপকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ওদের এখন কি ভাবেই বা খবরটা দেওয়া যায় যে, রাইজেনফেল্ড সাত সকালে এসেছে লিসার রূপের ভজনা করতে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। বললাম আমি রাইজেনফেল্ডকে, 'একটু অপেক্ষা করো, ওপর থেকে তোমার জন্য কফি তৈরী করে নিয়ে আসি।' বলেই দৌড়ে দোতলায় চলে গেলাম।

দোতলায় গিয়ে একটা বই দড়িতে বেঁধে জর্জে'র জানালার সামনে দোলাতে থাকলাম। রাইজেনফেল্ড যে আমার ঘরে বসে আছে, খবরটা একটা চিরকুটে লিখে সেটা বইটার মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলাম। একটু পরেই জর্জে'র টাক মাথা চোখে পড়লো। ওর সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা হলো কিছুক্ষণ। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম পুরো ব্যাপারটা। রাইজেনফেল্ডের সঙ্গে আমাদের ব্রেড ও বাটারের সম্পর্ক, তাই ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে ওকে যে এখান থেকে সরানো যাবে না, আকারে ইঙ্গিতে সে কথাটাও বুঝিয়ে দিলাম জর্জ'কে।

রাইজেনফেল্ডকে কফির পেয়ালা এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখি হাইনরিখ ঘরে এসে ঢুকলো। বেশ আগ্রহ সহকারে রাইজেনফেল্ডের সঙ্গে করমর্দন করলো সে। আমার দিকে ফিরে হাইনরিখ বলে উঠলো, 'রাইজেনফেল্ডকে কিছু খেতে দাও।'

জার্মানীতে রাজতন্ত্র থাকাকালে রোববার দোকান পাট সব খোলা থাকতো, এখন প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর থেকে সে সব পাট চুকে বুকে গেছে।'

আমার কথা শুনে লাল চোখ করে তাকালো হাইনরিখ। জর্জ' কোথায়?'

'আমি তোমার ভায়ের চাকর নাকি যে তার খবর রাখতে যাবো?' কথাটা খুব জোরেই বললাম, যাতে করে জর্জ' শুনতে পায়, হাইনরিখও এসে গেছে।

'না, সে কথা বলছি না, তবে তুমি তো কোম্পানীর কর্মচারী নও।' আমার স্পষ্ট জবাব শুনে রাগে গজরাতে গজরাতে জর্জে'র ঘরের দিকে চলে গেলো হাইনরিখ। অপসৃয়মান হাইনরিখের উদ্দেশে আমি তখন চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'জর্জ' ঘুম থেকে ওঠার আগে রাইজেনফেল্ডকে কোথাও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এলেই তো পারো হাইনরিখ। সেই ফাঁকে আমি ওর জন্য ডিম আর বেসন দিয়ে রোল তৈরী করে রাখছি। আর জর্জ'ও ঘুম থেকে উঠে ততক্ষণে তৈরী হয়ে নেবে।'

'না, আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না,' জোর দিয়ে বলে উঠলো রাইজেনফেল্ড।

'কাল সারা রাত ঘুম হয়নি, তাই এখন একটু ঘুমিয়ে না নিলে চলবে না।'

হাল ছেড়ে দিলাম আমি। আমার আর করার কিছু নেই, এখন সব কিছুই নির্ভর করছে জর্জের ভাগ্যের ওপর।

গীর্জায় উপাসনা শুরু হতে তখনো ঘণ্টা দুই বাকী, কোনো ব্যস্ততা নেই। ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে মেখে শিশিরে ভেজা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধের ওপর কার যেন হাতের স্পর্শ পেয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। লম্বা রোগাটে চেহারার শহরে সবচেয়ে বদমাস লোক হারবার্ট সার্জকে দেখতে পেলাম। চোখ ছোট করে বললাম, 'সুপ্রভাত জানাবো, নাকি শুভসন্ধ্যা বলবো? তবে মনে হচ্ছে বিশ্রামের আগেকার অবস্থা এখন তোমার। তা ব্যাপারটা কি শুনি?'

'প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব।' হো হো করে হেসে বললো হারবার্ট। 'একটা নতুন ক্লাবের সদস্য হয়েছি। আজ তার কার্যনির্বাহী কমিটিকে ভোজ দেবো— 'প্রাক্তন রাইফেলমেনস সমিতি, বুঝলে হে?'

'বুঝেছি,' অস্ফুটে বলে উঠলো, ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহের মতো বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করাও একটা হবি হারবার্টের। তাছাড়া সে তার কল্পনায় অনুমান করে নেয়, প্রত্যেক ক্লাবের অন্তত দু' একজন সদস্য তার শবযাত্রায় হাজির থাকবে, ফুলের মালায় তার শববাহী গাড়ি ভরে যাবে, লোকে জানবে তার গুনমুগ্ধ লোকের সংখ্যা কতোই না। ওর বয়স এখন ষাট, আর দুদশ বছর বড় জোর বাঁচবে সে। এই সময়ের মধ্যে তাকে আরো অনেক ক্লাবের সদস্য হতে হবে।

'আচ্ছা, তুমি কি কখনো যুদ্ধে গেছো?' জানতে চাইলাম আমি।

'তার কি দরকার আছে? এমনিতেই তো ওরা আমাকে রাইফেলম্যানদের ক্লাবের সদস্য করে নিলো। এটা আমার দারুণ সাফল্য। পওয়ার্জ কোপফ খবরটা শুনলে হিংসেয় তার বুক নিশ্চয়ই ফেটে যাবে। ও এবার গো হারান হেরে যাবে আমার কাছে, দেখে নিও।'

শওয়ার্জ কোপফ হারবার্ট সার্জের এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। বছর দুই আগে হারবার্টের এই বাতিকটা দেখে বিদ্রূপ করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সে। আর তখন থেকেই শওয়ার্জ কোপফের এটা একটা বাতিকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেন। হারবার্ট সার্জের আর এক কল্পনা হলো, রাইফেলমেনস সমিতির সদস্য হলে তাকে কবর দেবার সময় রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে তাকে সম্মান জানানো হবে। ওকে বোঝালাম যে, আজকাল সাধারণ মানুষ রাইফেল হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না, আইন বিরুদ্ধ কাজ। ওকে রাগাবার জন্য বললাম, কোপফ এবার

গোলন্দাজদের ক্লাবের সদস্য হতে পারে। তা হলে রাইফেল নয়, কামান দাগা হতে পারে তাকে কবর দেবার সময়।'

হারবার্টে'র চোখের পাতাগুলো কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন। তবু যতোটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বললো সে, 'এ তোমার ঠাট্টা বই কিছু নয়। তারপরেই বলে উঠলো সে, 'ভাবছি একদিন যাবো তোমাদের ওখানে। পাহাড়ের ওপর একটা উঁচু জায়গাও কেনা হয়ে গেছে আমার। এখন একটা ভালো দেখে স্মৃতিস্তম্ভ বেছে রাখতে হতে আগে থেকে। তাই ভাবছি একদিন যাবো তোমাদের অফিসে।' এ কথা প্রায়ই বলে থাকে হারবার্ট' দেখা হলেই, কিন্তু আজ পর্য'ন্ত কবরের ওপর রাখবার স্মৃতিস্তম্ভটা নির্বাচন করে উঠতে পারলো না সে। অথচ এ ব্যাপারে মেয়েরা অনেক এগিয়ে। তারা তাদের কবরের সব ব্যবস্থাই করে রেখে যায় আগে থেকে।

'তা তোমাদের স্টকে নতুন ডিজাইনের কিছু নেই?' হারবার্ট' জিজ্ঞেস করলো।

'একটা আছে, তবে ধরে নিতে পারো সেটা প্রায় বিক্রীই হয়ে গেছে।' আমি তখন যেন সেলসম্যান হয়ে গেছি। টোপটা ফেলে দেখলাম।

'জিনিষটা কি রকম শুনি?'

'সমাধিস্তম্ভ। চমৎকার কারুকার্য'। শওয়ার্জ' কোপফের ওটা আবার খুবই পছন্দ।

হেসে ফেললো হারবার্ট'। 'তোমাদের সেলম্যানদের ওই সব ধরা বাঁধা গদ ছাড়ো তো। তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখছি, যতোই টোপ ফেলো না কেন, আমি গিলছি না।'

'তুমি কিন্তু আমার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলে না,' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'শওয়ার্জ' কোপফের ইচ্ছে হলো, ওটাকে একটা মরণোত্তর ক্লাবঘর হিসেবে ব্যবহার করাতে। ও ঠিক করেছে, ও ওর উইলে একটা মোটা টাকা বরাদ্দ করে যাবে, যাতে করে ওর মৃত্যু দিবসে প্রতি বছর ওর সমাধিক্ষেত্রে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওর সমাধি ঘরে অভ্যাগতদের বসবাস ব্যবস্থা থাকবে, উৎসব, শেষে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থাও থাকবে। চমৎকার পরিকল্পনা, কি বলো? অনন্তকাল ধরে চলবে ওর স্মৃতিচারণ। অন্য কবরের দিকে তখন কারোর নজরেই পড়বে না।

আগের মতোই হাসলো হারবার্ট' আমার কথাটা শুনে। তবে এবার ওকে যেন একটু চিন্তায় পড়তে হলো। তাই সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি বলছো, ওই ধরনের সমাধি স্তম্ভ তোমাদের আছে?'

'আছে নয়, ধরে নাও, ওটা একরকম বিক্রী হয়ে গেছে।' আমি ওকে বললাম, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আগে সেটা শওয়ার্জ' কোপফকে স্থাপনা করতে দাও,

দ্যাখো সেটা কেমন দেখতে লাগে—'

আবার সেই আগের হাসি হাসলো হারবার্ট, তবে আগের মতো ওর হাসিতে সেই ধার আর নেই। আমরা দুজনে কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু দুজনেই টোপটা গিলে ফেলেছি। শওয়ার্জ কোপফের টোপটা হারবার্ট গিলেছে, আর আমি ভাবছি, যদি আমি এই সুযোগে ফ্রাউ নাইবুরের অর্ডার দেওয়া সমাধি স্তম্ভটা ওকে গছাতে পারি তাহলে কাজের কাজ একটা হয়। কারণ মনে হয় না ভদ্রমহিলা সেটা নেবেন। তাই যদি হারবার্টকে পাটিয়ে পটিয়ে কিনতে রাজী করানো যায়।'

হারবার্ট সার্জের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর গীর্জার দিকে হেঁটে চললাম। পথে যেতে গিয়ে গার্দার বাড়ি সামনে পড়লো। ওর জানালার দিকে তাকালাম, কাক ভোরেও ওর ঘরের জানালা খোলা। আলষ্টাডটার সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসা একজন মাতাল নেশার ঘোরেই সাহায্য চাইলো, আরো মদ গিলতে চায় ও। বিরক্ত হলাম, আজ আমাদের এ কি হাল? সারা উম্মত্ত পৃথিবী যেন আজ বাঁচতে চাইছে একে অপরের কাজ থেকে সাহায্য পেয়ে।

গীর্জায় প্রার্থনা শেষে মাদার সুপিরিয়র আমার যৎসামান্য পাওনা মিটিয়ে দিলেন। টাকার অংকটা এতো কম যে, এক এক সময় ভাবি হাত পেতে নেবো না। কিন্তু ওঁরা দুঃখ পাবেন বলেই মুখ বুজে নিতে হয়।

সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম গ্রফেনস্ট্রাফেতে। তখন রাস্তা দিয়ে প্রতিবাদের একটা মিছিল চলেছে। প্রতিবন্দীদের মিছিল, যুদ্ধে যাদের হাত পা খোয়া গেছে। তারা আজ সার বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তাদের সবার হাতে এক একটা প্ল্যাকার্ড তাতে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, পেনসনের টাকায় তাদের জীবন ধারন একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। বিশেষ করে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ায় তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ডলারের দাম সকাল বিকেলে হু হু করে চড়ছে। তাই আজকাল সকাল বিকেলে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে, যাতে বিকেলে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার আগেই সকালে যে যার প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে রাখতে পারে। গতকাল ডলারের দাম ছিলো বারো লাখ মার্ক, আর আজ চোদ্দ লাখ। হয়তো আগামীকাল কুড়ি লাখে পেঁছে যাবে।

ওদিকে মিছিলের ভীড়ে একটা দামী গাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গাড়ির ছোকরা আরোহী তার বান্ধবীর পাশে বসে ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে চলেছে। সে যাতে মিছিল টপকে চলে যেতে না পারে, তার জন্য মিছিলকারীরা সমস্ত রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। আর একজন মিছিলের পেছনে আছে পিকনিকের দল চলেছে ফুর্তি করতে। আশ্চর্য, একি বৈষম্য? একদল বিকলাঙ্গ মানুষ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম মুখর হয়ে পথে নেমে এসেছে; অন্য আর একদল লোক ফুর্তি করবার জন্য পাগলের মতো উম্মত্ত হয়ে উঠেছে। আর সামনে তাদের পথ চলার বাধা

মিছিল দেখে কি তাদের আস্ফালন। এ কি পরিহাস।

বেড় মিল নাইট ক্লাবে বসে রাইজেনফেল্ডের টাকার কেনা শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলতে দেখলাম। আজ এর দাম কুড়ি লাখ মার্ক। এই পরিমান অর্থ ওই সব বিকলাঙ্গদের সারা মাসের পেনসন।

'ওর কথা আমি গোড়া থেকেই জানতাম, রাইজেনফেল্ড আমাকে বলছিল, আমার শুধু লক্ষ্য ছিলো, আমাকে নিয়ে তুমি কতোটা রগড় করতে পারো। কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে ওই রকম নোংরা গলিতে থাকতে পারে না।'

'তোমার ভুল ধারনা রাইজেনফেল্ড। তুমি না পোড় খাওয়া লোক? তুমি এ এ কথা বলতে পারলে? ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আজকাল সবার অবস্থাই অনেক নিচে নেমে গেছে। রাজকুমারী কিংবা রানীদের সেই আগের সুখের দিন আজ আর নেই, তারাও আজ অনেক নিচে নেমে এসেছে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এমনি কোনো গলিতে চলে এসেছে দেখবে—'

'চুপ করো, আর জ্ঞান দিতে হবে না। ওয়াটজেকের বৌ সম্পর্কে তোমার আর ওকালতি করতে হবে না। যা জানার আমি জেনে গেছি। আমাকে তুমি ঠকাতে এসো না…' ঝুঁকে পড়ে লিসাকে দেখলো রাইজেনফেল্ড। লিসা আর জর্জ দুজনে এক সঙ্গে ফক্স ট্রট নাচ নাচছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, রাইজেনফেল্ডের মুখের ওপর বলি, তুমিই না একদিন লিসার রূপ দেখে বলেছিলে, খাটি প্যারিস নন্দিনী ও, চিতাবাঘিনী। কিন্তু এই সত্য কথাটা বললে ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, আমাদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে পারে।

'তাতে অবশ্য লিসার সম্পর্কে আমার ধারনা একটুও বদলায়নি,' রাইজেনফেল্ড আরো বললো, 'বরং ওর প্রতি আমার আকর্ষন আরো বেড়ে গেছে। দ্যাখো, কি চমৎকার নাচছে ও। ঠিক সেই—'

'চিতাবাঘিনীর মতো, তাই না?' ওর অসমাপ্ত কথাটা আমি যোগান দিয়ে দিলাম।

চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকালো রাইজেনফেল্ড। 'এক এক সময় কি মনে হয় জানো, মেয়েমানুষ জাতটাকে তুমি বেশ ভালোই চিনেছো।'

'সে তো তোমার কাছ থেকেই শেখা রাইজেনফেলড।'

আমার কথা শুনে ও খুব খুশি হলো। আমি তখন ওকে প্রশ্ন করলাম, 'একটা ব্যাপারে আমার কেমন বাধা লাগে, এডেনওয়াল্ড তোমার নিজের বাড়িতে তোমাকে খুবই সম্মানিত লোক বলে মনে হয়, মনে হয় তোমার চেয়ে সুখী গৃহস্থ আর কে আছে। অথচ সেই তুমি নাইটক্লাবে এসে তোমাকে নেকড়ের মত লোভী পুরুষ বলে কেন মনে হলো বলো তো?'

'সৎ মানুষের খোলসটা ছেড়ে এখানে এসে অনেক বেশী মজা লোটার জন্য। আমার মধ্যে একটা বদ দিক আছে, দ্বৈত সত্তা যাকে বলে আর কি। কথাটা এর আগে কখনো শোনোনি বলে মনে হচ্ছে।'

'না, শুনিনি। আমিই তো তার জীবন্ত প্রমান।'

'তুমি ? এ তুমি কি বলছো ?' ওর ঠোঁটে ব্যাঙ্গের হাসি দেখে আমি নিজেকে গুটিয়ে ফেললাম। এই সময় লিসা আর জর্জ টেবিলে ফিরে এসেছিল। চমৎকার পোশাকে সেজেছে লিসা আজ।

খুশিতে ডগমগ হয়ে রাইজেনফেল্ড আমাদের সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিলো। তারপর লিসার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে বললো, আমার সঙ্গে ট্যাঙ্গো নাচলে ধন্য হবো মাদাম। জর্জের সঙ্গে ট্যাঙ্গো নাচ নাচতে শুরু করে দিলো রাইজেনফেল্ড। এই বয়সে সবাইকে বুদ্ধু বানিয়ে দুর্দান্ত নাচ করলো ও।

'এখন লিসার সঙ্গে নাচতে তোমার কেমন লাগছে রাইজেনফেল্ড ?' আমি জানতে চাইলাম।

'এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করো না। এখন বলো, সকালে লিসা তোমার ঘর থেকে পালালো কি করে ?'

'উঃ সে কি অসুবিধে। রাইজেনফেল্ড তো আমার ঘরের দিকে নজর রেখে বসেছিল তোমার ঘরে। শেষ পর্যন্ত লিসাকে কোনো রকমে রান্নাঘরে নিয়ে যাই এর দৃষ্টি এড়িয়ে। আর সেখান থেকেই জানালা টপকে ও চলে যায় নিজের ঘরে। রাইজেনফেল্ড যখন আমার ঘরে এলো, লিসা তখন ওর ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই রাইজেনফেল্ডকে আমন্ত্রন জানায় ও।

'এমনটি করা উচিত হয়নি ওর।'

'না, লিসা আমাদের ব্যবসার সুবিধের জন্যই সেটা করেছিল ও।' জর্জ বললো,

'পরে লিসা আমাকে ওর মনোভাবের কথা বলেছিল।'

'আর তুমি ওর সেই কথা বিশ্বাস করেছিলে ?'

'হ্যাঁ', সরল মনেই জবাব দিলো জর্জ।

লিসা আর রাইজেনফেল্ড ফিরে এসেছিল আমাদের টেবিলের সামনে। রাইজেন ফেল্ড বেশ ঘর্মাক্ত অবস্থায় ছিলো আর লিসা তখন বরফের মতো শীতল। আমাকে অবাক করে দিয়ে এই সময় অটো এসে হাজির হলো সেখানে। তারপর এলো উইলি, সেই সঙ্গে বাদ গেলো না রেনীও।

আড্ডা বেশ জমে উঠলো অচিরেই। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা কবিতা লেখা হয়ে গেছে অটোর আয়রণ হর্সকে নিয়ে। এবার ও লিখবে সার্কাসের একটি মেয়েকে নিয়ে। তার মানে গার্দার কথা জানা হয়ে গেছে তার। শুনে আমার মাথায় রাগ

চড়ে গেলো। ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'দ্যাখো অটো, পরের মেয়েমানুষের ওপর নজর দেওয়াটা অন্যায়।'

এ সব বুর্জোয়া কুসংস্কার,' আমার কথায় তোয়াক্কা না করে বললো অটো, 'আরে আমি তো কারোর বৌকে আমার কবিতায় টেনে আনছি না।'

'পরস্ত্রীর ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম, বৌদের ব্যাপারে অতো ছুতমার্গ'রও দরকার হয় না, কিন্তু পরের মেয়েমানষে বা বান্ধবীদের ব্যাপারটাই আলাদা। তাছাড়া ওতো সার্কাসের মেয়ে নয়, সার্কাসের টিকিট বিক্রী করতো কেবল।'

'উইলির ধারনা, মিথ্যে বলছো তুমি। মেয়েটি রীতিমতো সার্কাসের খেলা দেখাতো।'

'তাই বুঝি। আসলে উইলি ওই যে মেয়েটিকে নিয়ে নাচছে, ওটাই তো প্রকৃত সার্কাসের মেয়ে ;'

তবু বিশ্বাস করানো গেলো না অটোকে। ওদিকে লিসার সঙ্গে ফিরে আবার নাচতে শুরু করেছিল রাইজেনফেল্ড। জর্জের উদ্দেশে আমি বললাম আক্ষেপ করে, 'আচ্ছা জর্জ, আজ কেমন যেন সব উল্টোপাল্টা ঘটে যাচ্ছে। এই দ্যাখো না, যেমন তোমার বান্ধবী এখন রাইজেনফেল্ডের নাচের সঙ্গিনী। এদিকে আমার বান্ধবী গার্দার সঙ্গে ভাব জমাতে চায় অটো। ব্যাপার কি বলো তো? হঠাৎ লোকেদের কাছে আমাদের বান্ধবীদের আকর্ষন কি খুব বেড়ে গেছে?'

'এটাই তো এখানকার চল বলতে পারো, দার্শনিকের মতো বললো জর্জ।

'অন্যের মেয়েমানুষের আকর্ষণ নিজের মেয়েমানুষের থেকে পাঁচজন বেশী হয়ে থাকে। তবে রগড় দেখবে, একটু পরেই লিসা ফিরে এসে মাথা ধরার ভান করে কেটে পড়বে এখান থেকে।'

'তাহলে দারুন দুঃখ পাবে রাইজেনফেল্ড।'

'তা পেলেই বা, আমাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, এই বলে জর্জ জানতে চাইলো, 'গার্দাকে দেখছি না, ও কোথায়?'

'দ্যাখো গিয়ে ওয়ালহাল্লার এডুয়ার্ডকে সঙ্গ দিচ্ছে।'

একটু পরে লিসা ফিরে এসেই জানালো, 'আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। অ্যাসপিরিন খেতে চললাম।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রাইজেনফেল্ড। আর জর্জের মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

□ ষোলো □

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। এখানকার পাগলা গারদের মাঠে কর্মরত রোগীরাও ফিরে আসছে একে একে!

'ইসাবেল, ফিরে আসি আমরাও। অস্তিত্ব আছে এমন মানুষ কখনো হারিয়ে যেতে পারে না চিরকালের জন্য।

'তুমি বিশ্বাস করো এই সত্য বিশ্বাস না করলে তুমি আমি দুজনেই হারিয়ে যাবো? চিরদিন থাকতে পারি না?'

'না, আমরাও থাকতে আসিনি চিরদিনের জন্য।'

'দুজন দুজনকে ভালোবাসলেও থাকবো না?' দৃঢ়স্বরে বললো ইসাবেল।

'না, তাতেও না। কিন্তু মানুষ এই বিশ্বাস নিয়েই পরস্পরকে ভালোবাসে।' আমি বললাম, 'তবু মানুষকে চলে যেতে হয় বললো না, বরং বলবো, পালিয়ে যায়।'

'তা তুমিও কি পালিয়ে যেতে চাও রুডলফ? কিন্তু পালিয়ে যাবার মতো কোনো জায়গাও নেই। সব দরজাগুলোই সমান। বাইরে—'

ইসাবেলকে থামতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'দরজার বাইরে কি আছে ইসাবেল?'

'শূন্যতা।. ওগুলো স্রেফ দরজার প্রতীক মাত্র। দরজার বাইরে কিছু নেই।'

ধীরে ধীরে পার্কের আলোগুলো জ্বলে উঠতেই আমার হাত ধরে কাতর অনুনয় করে বললো, 'তুমি আমায় ছেড়ে কখনো যাবে না তো রুডলফ?'

'না, যাবো না, কখখোনো যাবো না তোমাকে ছেড়ে, কথা দিলাম।'

আগে ইসাবেল প্রতি সপ্তাহে একবার করে গীর্জায় যেতো উপাসনা করার জন্য। কিন্তু এখন আর যায় না। ফোয়ারার কাছে এসে অকারণ জল ছিটিয়ে দিয়ে ইসাবেল বলে উঠলো, 'স্বপ্নগুলো দিনের বেলায় কি করে রুডলফ?'

'মনে হয়, ঘুমিয়ে থাকে,' বেশ বুঝে সুজে উত্তর দিতে হলো, এই জন্যে যে, উত্তরের পরিণাম কি যে হবে তা বলা মুস্কিল। 'রাতে আবার জেগে ওঠে।'

'আর রাত যদি না আসে কখনো?' প্রশ্ন করলো ইসাবেল।

'তা হয় না, রাত ঠিক আসবেই।

'এতো মনের জোর তুমি পেলে কোথ্থেকে রুডলফ?'

'বাচ্চাদের মতো কথা বলো কেন ইসাবেল?'

'কেন, তুমি ভুল করো না রুডলফ?'

'করি। তবে ঠিক মতো বুঝতে না পারলে রাগ হয়, অন্যায় বলে মনে হয়।'

'না, কিছুই ভুল নয়, কিছুই অন্যায় নয়। ন্যায় অন্যায় বোঝবার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরের। ঈশ্বরের কাছে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। কেনই বা হবে, সব কিছুই তো ঈশ্বর! তাঁকে ছাপিয়ে অন্য কিছু থাকতে পারে না। যার জন্যে সব কিছুই ন্যায়, অন্যায় বলে কিছু থাকতে পারে না। এ রকম হলে ঈশ্বরকে মানা যায় না।'

আমি তো অবাক ইসাবেলের ব্যাখ্যা শুনে—ওর কথা ঠিক ধরে নিলে তাহলে নরক বা শয়তান বলে কিছুই থাকে না জগতে। থাকেও যদি ঈশ্বর বলে কিছু থাকতে পারে না।

আমার ধারনার কথা শুনে বললো ইসাবেল, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো রুডলফ। ঈশ্বর আছেন, তবে ওরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে। তাই তিনি বেরিয়ে আসতে পারছেন না।'

'ওরা কারা?'

'গির্জার যাজকরা।' ফিসফিসিয়ে বললো ইসাবেল, 'মোমবাতি জেবলে, উপাসনা করে ওরা ওঁকে কেন বন্দী করে রেখেছে জানো? ঈশ্বর খুবই বিত্তবান। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী উনি। ওঁকে মুক্ত করে দিলে ওঁর সব বিষয় সম্পত্তি ওদের হাতের বাইরে চলে যাবে। তখন ওদের খুব অসুবিধে হবে, ওদের বড়লোকী চাল বন্ধ হয়ে যাবে তখন। আর আমার ব্যাপারটাও ঠিক ঈশ্বরের মতো।'

'এ তুমি কি বলছো ইসাবেল?' অবাক চোখে তাকালাম ওর দিকে।

হাসলো ইসাবেল, 'ওরা আমাকে এখানে রেখে গেছে ওদের পথের বাধা সরাবার জন্যে। ওরা আমার সম্পত্তি, টাকাকড়ি লুটেপুটে খাচ্ছে। তাই আমি এখান থেকে ফিরে গেলে ওদের খুবই অসুবিধে হবে। সে যাইহোক, বিষয় সম্পত্তিতে আমার লোভ নেই।'

'বেশ তো, তোমার এই ইচ্ছের কথা ওদের জানিয়ে দিলেই তো পারো, তাহলে ওরা তোমাকে এখানে আর রাখতে যাবে না।'

'কেন এটাই খারাপ কি? অন্তত ওদের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে। মশার মতো আমায় ওদের কামড়ানোর হাত থেকে বেঁচে আছি এখানে ছদ্ম পরিচয়ে। ওদের ঠকানো খুবই সহজ।'

'তুমি এখানে ডঃ ওয়েরনিককেও ঠকাও?'

'ও তো সব সময় আমাকে বিয়ে করবে বলে থাকে। ডাক্তারও আর পাঁচজনের মতো। এখানে কতোই না বন্দী। তবে এখানকার লোকেরা একমাত্র ওই পেরেক-বিদ্ধ মানুষটিকে সব চেয়ে বেশী ভয় পায়। এদের সংখ্যা হাতে গোনা যায় না। এরা নিজেদেরকে অতি সৎ ও সজ্জন লোক বলে জাহির করে। কিন্তু আসলে ওরা

একেবারেই ভালো লোক নয়, ভালো লোকেদের রক্ত ঝরে। যারা আগ বাড়িয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটিয়ে চিৎকার করে বলে, 'আমি সৎ, আমি ধার্মিক…' তারাই সব থেকে বেশী অসৎ, ভণ্ড, শয়তান। তুমি ওদের দলে মিশে যেও না রুডলফ! ওদের উচিত, ওঁকে মুক্ত করে দেওয়া।' না, পরক্ষণেই আবার ইসাবেল ওর নিজের কথা সংশোধন করে দিয়ে বললো, 'ওঁকে ছেড়ে দিলে ওদেরই খুব ক্ষতি হবে, কারণ তাঁর যে দয়ার শরীর, বড় করুণাময় তিনি।

'তা যা বলেছো। আর সেই কারণেই কি ওরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছে?'

'হুঁ', মাথা নেড়ে বললো ইসাবেল, 'ওকে ছেড়ে দিলে ফিরে আবার ওঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করতে হবে যে।'

'তার মানে সততা আর ভালোবাসার দোহাই দিয়ে ওরা তাঁকে দ্বিতীয়বার হত্যা করবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। আর সেই কারণেই গির্জায় আমি যাচ্ছি না আর।'

এবার একটু নীরব হয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম, হঠাৎ হাসতে শুরু করলো ইসাবেল। ও যেন এখন একটা বাচ্চা মেয়ে হয়ে গেছে। না, ভালো করে দেখতে গিয়ে মনে হলো ওর মুখটা হঠাৎ যেন বীভৎস হয়ে উঠেছে। কি ভেবে যেন বলেই ফেললাম, 'তুমি আর নেই সে তুমি। তোমাকে এখন আমার খুব খারাপ লাগছে ইসাবেল, ঠিক ডাইনীর মতো।'

'ডাইনী?' ইসাবেলের ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক রহস্যময় হাসি। তেমনি রহস্য করে বললো ও, 'এতোদিনে তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পারলে?' তারপর আর একটি কথাও নয়। দ্রুত হাতে একটানে ইসাবেল ওর পরণের স্কার্ট'টা খুলে ফেললো, নিচে অন্তর্বাসের কোনো বালাই নেই। তেমনি দ্রুত হাতে ও এবার ব্লাউজটাও খুলে ফেললো। তারপর নগ্ন দুটি হাত বাড়িয়ে ও ওর নগ্ন বুকে আহ্বান জানালো আমাকে, 'এসো, আমার কাছে এসো—'

ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম—যদি বোদেনদিয়েক কিম্বা ডাক্তার এখন চলে আসেন এখানে? হুকুম করার মতো করে বললাম, 'গায়ে তোমার পোশাক চাপিয়ে নাও ইসাবেল!'

'কেন, একান্তই কি পরতে হবে?' ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে এসে আমার জামার বোতাম খুলে ফেললো ও। ওর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগে আমার বুকে, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি, এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—মনে হলো ওর মধ্যে থেকে আর একটা সত্ত্বা বেরিয়ে আসছে যেন। ও ওর সারা নগ্ন শরীরের আবরণে আমাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। আমিও তখন ভয়ংকর উত্তেজিত। আমার ভেতরের পশুটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো আমার, ইসাবেল অসুস্থ, এ অবস্থায় ওকে

কিছু করা মানেই বলাৎকার। তাই আমি আমার ভেতরের পশুটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে হাল্কা ভাবে ধাক্কা মারলাম ওকে।

'ভয় কিসের?' মরীয়া হয়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করলো ইসাবেল।

আমি আর থাকতে পারলাম না, এবার জোরে ধাক্কা দিলাম ওকে। ছিটকে পড়ে গেলো মাটিতে ও। তারপর সে কি অশ্রাব্য গালিগালাজ ওর। ওর মতো মেয়ে যে অমন খিস্তি খেউড় করতে জানে, ধারনা ছিলো না আমার। আর সে কি বিশ্রী অঙ্গভঙ্গিই বা। মিলন পিপাসু ইসাবেল যেন একাই দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে তার স্বাদ নিতে চাইছে—একাধারে ওর নিজস্ব নারীর ভূমিকা, আর আমাকে না পেয়ে সেই সঙ্গে আমার ভূমিকাটাও সেই সঙ্গে যোগ করতে চাইছি। সত্যি এ এক অদ্ভূত পিপাসা চোখে ওর, তৃষ্ণা ওর সারা বুক জুড়ে।

এরকম একটা মেয়েকে কি ভালোবাসা যায়? উত্তর দিতে গিয়ে ব্যর্থ আমি। অথচ ওকে ঘিরে আমার সব অনুভূতি, সব অনুরাগ, মায় সব সত্তা তখন মোমের মতো ফোটা ফোটা হয়ে গলে গলে পড়ছে। আমি চুপ করে আছি দেখে বিড়বিড় করে বলে উঠলো ইসাবেল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও চলে যাও এখান থেকে। আমার কাছে তুমি এখন অসহ্য, রিক্ত আমার দেহ মন…' কথাটা অসমাপ্ত রেখে মাটি থেকে স্কার্টটা তুলে নিয়ে ও ওর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। আমি এবার নিজেকে সান্ত্বনা দিই, এর আগেও তো কতো মানসিক রোগিনী নগ্ন হয়ে পাগলাগারদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি। অগত্যা মনটাকে এই ভাবে বুঝিয়ে জামাটা ঠিক করে নিয়ে আমিও ফিরে চললাম অতঃপর।

বাড়ি ফিরে এসে জর্জের ঘর থেকে হাল্কা হাসির শব্দ কানে ভেসে এলো—লিসার চপলতা। অকারণ উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্যে রাইজেনল্ডের উপহার দেওয়া মদের বোতলের ছিপি খুলে বসলাম আমি।

এক মহিলা তাঁর মৃত দুই যমজ পুত্রের জন্য এক জোড়া কফিন আর কালো গ্রানাইট পাথরের স্মৃতিস্তম্ভের অর্ডার দিয়ে গেছেন, সঙ্গে দশ লাখ মার্ক অগ্রিম। অগ্রিমটা তিনি দিয়েছেন ছেলে দু'টির লেখা পড়ার খরচের জন্য জমানো টাকা থেকে। কিন্তু স্তৃতিস্তম্ভ তৈরীর জন্য রাইজেনফেল্ড এক সঙ্গে দু'দুটো কালো সুইডিশ গ্রানাইট পাথর দিতে চাইলো না। 'জানো, ওই পাথরগুলোর দাম এখন নীল হীরের মতো হয়ে গেছে। লিসার সঙ্গে একটা সন্ধ্যে কাটাতে দেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য না হয় একটা পাথর দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে দুটো পাথর? তোমাদের এমন অদ্ভুত আবদার শুনে মনে হচ্ছে ফন হিন্ডেনবর্গ'কে কম্যুনিষ্ট হতে অনুরোধ করার সামিল।'

'তোমার মাথায় এমন সব অদ্ভূত চিন্তাও আসে বটে।' আমি বললাম।

'ওসব কথা থাক এখন।' গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে বললো রাইজেনফেল্ড, 'আরে তুমি তো এদের একজন কর্মচারী মাত্র।'

'তাই তো ভাবছি, পরের দাসত্ব আর ভালো লাগছে না। তাই ভাবছি চাকরীটা ছেড়েই দেবো,' কোনো কিছু না ভেবেই কথাই বলে ফেললাম।

'না, না, তুমি এখানেই থেকে যাও। কাজটা তুমি বেশ ভালোই শিখে নিয়েছো। তবে···কথার মাঝে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে ছুটে গেলো রাইজেনফেল্ড। উল্টোদিকে লিসা ওর ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাউজ খুলছিল। ব্লাউজের নিচে অন্তর্বাস নেই।

দৃশ্যটা ভীষণ তাতিয়ে তুললো রাইজেনফেল্ডকে, 'দ্যাখো, দ্যাখো, কি সুন্দর পুরুষ্টু বুক। আচ্ছা, ও কি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রায়ই এরকম করে থাকে?'

'হ্যাঁ। আর কেবল আমার ঘর থেকেই ওর জানালা দেখা যায়।'

'অথচ এর পরেও তুমি এখানকার চাকরী ছাড়ার কথা ভাবছো?'

'হ্যাঁ কিন্তু কেন জানো? ওইটুকুই দেখাবে লিসা, তারপর লোভ দেখিয়ে উদাসীনতা দেখিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। এ ভাবে নিজেকে তো আর ধ্বংস করতে পারি না আমি।

এই ফাঁকে লিসা অন্য ঘরে চলে যেতেই রাইজেনফেল্ড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'ওর কাছে একটা চিঠি পেঁছে দেবে?'

'এ ব্যাপারে চিঠিতে ফল পাওয়া যায় না।'

ওদিকে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর রাইজেনফেল্ডও চটপট বেরিয়ে পড়লো। 'এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না,' যাবার সময় বলে গেলো সে। একটু পরেই লিসা ও রাইজেনফেল্ডকে পাশাপাশি হেঁটে যেতে দেখা গেলো। দৃশ্যটা জর্জ ক্রল দেখলে কি মনে নিতো জানি না, তবে আমরা যে আরো একটা কালো সুইডিশ গ্রানাইট পাথর পাচ্ছি, সেটা নিশ্চিত।

ইসাবেলের ঘরের সামনে গিয়ে আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। কোনো সাড়া পেলাম না ওর কাছ থেকে। আবার বললাম, 'শোনো ইসাবেল, আমি তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি আমায় চিনতে পারছো?'

মাছ কাঁটা বাছার মতো করে আমাকে দেখলো ইসাবেল। তারপর জানতে চাইলো, 'কে তোমাকে পাঠিয়েছে? ডাক্তার বলে যে নিজেকে জাহির করে?'

সত্যি কথাটা ঢেকে দিয়ে বললাম, 'না, কেউ আমাকে পাঠায়নি। আমি নিজের থেকেই লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে।' তুমি বাইরে যাওনি কেন?'

'ওরা যে বাইরে দাঁড়িয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। ওরা জেনে গেছে আমি এখন এখানে থাকি। তুমি ওদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না?'

'না। ও তো বাতাসের শন্ শন্ শব্দ; মানুষের ফিসফিসানির আওয়াজ।'

'হতে পারে। কিন্তু ওই আওয়াজটা যেন আমাকে করাতের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে চায় বলতে পারো ?'

'দূর! শব্দ কি মানুষকে কাটে ?'

'হ্যাঁ কাটে।' অদ্ভুত শোনালো ইসাবেলের কণ্ঠস্বর।

'কি কাটে বলে তোমার মনে হয় ইসাবেল ?'

যন্ত্রণায় কাতরে ওঠার মতো করে ইসাবেল, ওর উরুর মাঝে হাত গুঁজে বললো, 'ও আমার এটা কেটে বাদ দিতে চায়, ও চায় না আমি কোনদিন মা হই।'

'ও, কে সে ?'

'ওই মহিলাটি। যে আমার জন্ম দিয়েছে বলে দাবী করে। ওই এখন আমাকে ওর পেটের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে নিতে চাইছে। ওই মহিলাটি আমার ওটা কাটতে চাইলেও ছেলেটা আমাকে চেপে ধরে আছে।'

'কে ধরে আছে বললে ?'

'ওই মহিলার জঠরের মধ্যে যে রয়েছে।' বলেই কেঁদে ফেললো ইসাবেল। 'আমি বোধহয় ওই মহিলার হাত থেকে কখনো রেহাই পাবো না। এক এক সময় কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাও রুডলফ ? আমি যে বড় অসহায়।' আমাকে নীরব থাকতে দেখে খুশী হতে পারলো না ও। গলা চড়িয়ে বললো ও, 'তোমাকে ওরা ঘুষ দিয়েছে। তা না হলে তুমি আমাকে ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এখান থেকে। ঠিক আছে, তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই তুমি যাও, চলে যাও এখান থেকে…'

কি করে ওকে বোঝাই, আমার মধ্যেও একটা পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে আমার মধ্যে। আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। তাই নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পাবার জন্যে ধীরে ধীরে ইসাবেলকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা কেউ কাউকে চিনি না, এ ওকে জড়িয়ে ধরেছি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি দুরন্ত ব্যবধান, সে তো আমি জানি।

'তুমি আমায় আরো গভীর করে ভালোবাসো না কেন রুডলফ ? তুমি ওদের খতম করে ফেলতে পারো না কেন -' আমার বুকে মুখ রেখে ইসাবেল বলতে থাকে, আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে তোমার করে নাও, তবেই আমি বাঁচতে পারবো। প্রতি রাতে সব কিছু মরে যায়, আবার সকাল হলেই জীবন ফিরে পায় আমিও সেই আশা নিয়েই যে বেঁচে আছি আজও।

কোনো কথা না বলে আমি ওকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রেগে গিয়ে বলে উঠলো ইসাবেল, 'তুমি কথা বলছো না কেন ? তুমি কি তাহলে ওদের গুপ্তচর ? যাও, তোমাকে আর কিছুই বলবো না। ওরা আমাকে খুন করবে…'

তুমি আবার ভুল করছো ইসাবেল, তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছো। আমি তোমাকে আবার বলছি, আমাকে আগে না মেরে কেউ যে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, আর কেউ না জানুক, অন্তত একজনের তো জানা উচিত।'

ইসাবেলের ঠোঁটে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠলো। 'জানবার খুব আগ্রহ হচ্ছে, তাই না? না, এবার তুমি গুপ্তচর বৃত্তিতে আর সফল হচ্ছো না, বুঝলে?'

কেন যে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না জানি না, চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'জাহান্নামে যাও তুমি। এর পর তোমার সম্পর্কে আমার আর কোন আগ্রহ থাকবে না।' ওকে স্পষ্ট কথাটা জানিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

'কি হলো?' আমার গম্ভীর মুখ দেখে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো।

'কি আবার হবে, যা হবার তাই হলো। ওকে দেখবার জন্য আমাকে পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। যখন ওর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করা দরকার ছিলো, তখন আমার কি যে হলো, মাথা গরম করে অযথা বকা-ঝকা করে বসলাম ওকে। ব্যর্থ আমি।'

'না, না, ব্যর্থ কেন হবে তুমি!' দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে বললো ডাক্তার, 'ওর ব্যাপারে একটা খবর শুধু আমি জানতে চাই, ওর মা যে এখানে এসেছেন, সে খবর ও জানলো কি করে!'

'সেকি?' চমকে উঠলাম, 'ওর মা সত্যিই তাহলে এসেছেন এখানে?'

'হ্যাঁ, গতকালই এসেছেন তিনি। কিন্তু এখনো ওর সঙ্গে দেখা করেননি। পরে ঠিক সময়ে মা মেয়ের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেবো।'

এবার বুঝলাম ইসাবেলের রাগের উৎসটা কোথায়। একটু আগে কোনো পাগলের প্রলাপই বকেনি ও। সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই ও ওর মার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল আমার কাছে। ওর মার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছিল আমাকে। বেচারী! জানি না আজ রাতে ও ঘুমতে পারবে কিনা। ওর বিনিদ্র রজনীর কথা চিন্তা করেই বললাম, 'ডাক্তার, জেনেভিয়েভকে ঘুমের পিল দিতে পারো না?'

'কেন পারবো না? কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যাবে না।'

'না পাওয়া যাক, আজকের রাতটা একটু শান্তিতে কাটাতে পারবে ও।

'বেশ তো তুমি যখন বলছো, এখুনি ওকে খাইয়ে আসছি, তাহলেই হবে তো?' ডাক্তার চলে গেলো, তার ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম।

নিজের ঘরে ফিরে এসে মনে হলো, কিছুই ভালো লাগছে না। ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু চাঙ্গা করতে পিয়ানো বাজাতে বসলাম। এই সময় লিসাকে ওর ঘরের জানালার সামনে হাতে একটা বিরাট ফুলের সাজি নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখলাম।

আমাকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো ও, 'এই ফুলগুলো রাইজেনফেল্ডের উপহার। ও একটা হাঁদা গঙ্গারাম। এই ফুলগুলো তোমার চাই?'

'না', মাথা নেড়ে বললাম। মনে মনে বললাম, এখন কাউকে ফুল পাঠাবার মতো মানসিকতা আমার আর নেই। আরো কিছুক্ষণ পিয়ানোয় করুণ সুর তুলে এক সময় নিচে নেমে এলাম। মনটা আগের মতোই অস্থির রয়ে গেছে এখনো। নিচে নেমে এসে দেখলাম সেই কালো অবিলিস্কের সামনে ফুলের সাজিটা রেখে গেছে লিসা। ফুলভর্তি সাজিটা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরটা মিষ্টি ফুলের গন্ধে ম' ম' করতে লাগলো। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গন্ধটা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ফুলের সাজিটা হাতে নিয়ে উইলকির কফিন তৈরীর কারখানায় চলে এলাম। একটা বিশাল কফিনের ওপর জিনের বোতল দেখতে পেয়ে কয়েক পেগ গলায় ঢাললাম। তারপর একটা জানালা খুলে কফিন থেকে জানালা পর্যন্ত ফুলগুলো ছড়িয়ে দিলাম, যা দেখে মনে হতে পারে রাতের গভীরে অশরীরী কেউ এসেছিল। মনে একটা অপার শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম এক সময়।

□ সতেরো □

'ইসাবেল!' অতি আপনজনের মতো গাঢ়স্বরে ডাকলাম ওর নাম ধরে। আজ ইসাবেলকে খুশীতে ডগমগ দেখাচ্ছিল। আর বেশ সুন্দর করে সেজেছে ও আজ। হাতে পান্নার ব্রেসলেটটা আলো ঝিকমিক করছিল। 'তুমি ভীষণ গোলমেলে লোক', হঠাৎ মুখর হলো ইসাবেল।

'না, আমি মোটেই গোলমেলে লোক নই', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি।

আচমকা আমার ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে ইসাবেল বললো, 'হ্যাঁ, তুমি গোলমাল করো বৈকি। এমনিতে তুমি বেশ শান্ত, এই যে তোমাকে আমি রুডলফ নামে ডাকি, তুমি কখনো প্রতিবাদ করো না। কিন্তু ওটা তো তোমার আসল নাম নয়, কি তোমার আসল নাম, বলো তো?'

'লুডউইগ', অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

'লুডউইগ?' তোমার নিজের কাছে এই নামটা একঘেয়ে লাগে না?'

'তাহলে সত্যি কথাটা শুনবে? নিজেকেই ভীষণ একঘেয়ে লাগে এখন আমার।'

'নামটা পাল্টে নিয়ে অন্য কোন দেশে চলে গেলেই তো পারো। এক একটা নাম মানেই এক একটা আলাদা দেশ।' বললো ইসাবেল, 'আমিও এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ভীষণ ক্লান্ত আমি রুডলফ··· ।'

'তোমাকে আমার ভালো লাগে ইসাবেল', হঠাৎ মনের কথাটা বলেই ফেললাম, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।' আমার সমস্ত সত্ত্বা যে ওকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল তখন। ওকে আমি কিছুতেই হারাতে চাই না। ওকে আরো বললাম, 'আমার সারা মন প্রাণ জুড়ে আছো তুমি। তুমি আমার সুখ, আমার যৌবন, আমার ভবিষ্যত, সব কিছুই। তোমার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, এমন কি জীবন বিসর্জন দিতে পারি··· ।'

'তাহলে এখন তুমি বুঝতে পেরেছো, সুখ আর দুঃখ কি রকম। অনেক অসম্ভব কাজও তুমি সম্ভব করে তুলতে পারো যদি না তোমার মনে অবিশ্বাস থাকে।'

'হ্যাঁ, পারবো আমি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি', আমি স্বীকার করে বসলাম। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমার সব কিছু যেন ইসাবেলের নিয়ন্ত্রিত, ওকে বিশ্বাস করে আমি যেন এখন ওঠা-বসা করতে পারি। আমি যেন একটা পাখি হয়ে গেছি, ইসাবেলের মোহিনীমায়ায় ওর অদৃশ্য খাঁচায় আমি এখন বন্দী।' দ্রুত সূর্যের রঙ বদলে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ার আগেই কিছু একটা করে নিতে হবে আমাকে।

'জানো ইসাবেল, এখন আমি ভালোবাসার মর্ম বুঝতে পেরেছি, ভালোবাসারই আর এক নাম জীবন। এই মুহূর্তে—'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তগুলোকে যখন হাতের কাছে পাও', আমাকে থামিয়ে দিয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বললো ইসাবেল, 'সেগুলোকে নষ্ট হতে দিও না রুডলফ।' তারপরেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেললো।

'কাঁদছো কেন ইসাবেল? তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা দাও, আমি তোমাকে সুখ দেবো।'

'দেবে নাকি?' হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গিয়ে নিজেকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমায় চুমো খেয়ে বলে উঠলো, 'বিদায় প্রিয়তম, বিদায়!'

'তুমি আমাকে কেন ছেড়ে চলে যেতে চাইছো ইসাবেল, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি?'

নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালো ইসাবেল। তারপর অস্ফুটে বললো, 'চলো আমার ঘরে চলো রুডলফ।' তারপর ইসাবেল ওর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে আমাকে আহ্বান জানালো দু'হাত বাড়িয়ে, 'এসো আমার খুব কাছে এসো তুমি।'

আমি তখন কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। ওর গাঢ় আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর সান্নিধ্য লাভের জন্য ওর পাশে শরীর এলিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও ওর নরম দুটি বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। তারপর ও আমার গালে ওর গাল ঘষতে ঘষতে অস্ফুটে বলে উঠলো, 'শেষ পর্যন্ত তুমি এলে আমার কাছে রুডলফ?'

ওর পাখির মতো নরম বুক দুটি আমার বলিষ্ট বুকের নিচে পিষ্ট হতে থাকলো তখন। ইসাবেলের তৃষিত দেহটা যেন বিলীন হয়ে যেতে চাইলো আমার মধ্যে। এক অপার সুখ-তৃপ্তিতে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ওর চোখ দুটো বুজে এলো, একটু পরেই ওর উষ্ণ দেহটা এলিয়ে পড়লো, ও আমার বুকে মুখ লুকলো লজ্জায়, এক অনাস্বাদিত সুখ তৃপ্তিতে।

ওই ভাবে কতক্ষণ যে ইসাবেলকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠলো ইসাবেল, বুঝি ওর চেতনা ফিরে এলো। আমার দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে ওর সারা শরীরটা তখন কঠিন হয়ে উঠেছিল। যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো করে বলে উঠলো ইসাবেল, 'কে, কে তুমি ?'

'আমি, আমি তোমার রুডলফ প্রিয়তমা !'

'তার মানে তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে শুয়েছিলে আমার বিছানায় ?' হঠাৎ ওর গলার স্বরটা কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠলো, 'যাও, চলে যাও এখান থেকে।' ও তখন আমাকে চিনতে পারছিল না, আমি যেন ওর কাছে এক আগন্তুক তখন। 'এখনো তুমি দাঁড়িয়ে রইলে ?'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম চলে যাওার জন্য। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললাম, 'যাচ্ছি, কিন্তু অহেতুক ভয় পেও না ইসাবেল।'

কম্বল দিয়ে ইসাবেল ওর নগ্ন দেহটা ঢেকে নিয়ে বললো, 'এখুনি এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে রলফ তোমাকে দেখে ফেললে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে যাবে। যাও, আর দেরী করো না রুডলফ।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো, রলফকে ও ভয় পাচ্ছে, কিন্তু কে, কে এই রলক ? এর আগে ওই রলফ-এর নাম তো বলেনি ও আমাকে। আর ওর ঘরে তো এর আগেও বহুবার গেছি, তবে কেন ও আজ ভয় পেয়ে বললো, কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে ?

বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমি। আমার মনটা তখন চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে উত্তাল। সব হারানোর দুঃখে মনটা ভারাক্রান্ত আমার। আমার সামনে এখন আলোর পাশেই আছে অন্ধকার, আছে দুঃখহতাশা, বঞ্চনা আর নিঃসীম শূন্যতা।

সার্জেণ্ট মেজর নোপক অসুস্থ। ডাক্তার বলে গেছে, মাত্র দু'একদিন আর বাঁচতে পারে সে। তার বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মিসেস নোপক শোকে পোযাক তৈরী করতে ব্যস্ত এখন। ঘরঘর শব্দে সেলাই মেসিনগুলো চলছে।

অফিস ঘরে জর্জ আর হোলমানের সেলসম্যান অস্কার। 'ডলারের দাম কমে যাচ্ছে', আমি বললাম। 'দেউলে হতে আর কত বাকী ?'

'যে দিন আমাদের সব মাল বিক্রী হয়ে যাবে', বললো জর্জ।

'নিশ্চিন্ত হলাম শুনে', জোর করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাগলাগারদের দিকে এগিয়ে চললাম অতঃপর।

আজই প্রথম সেখানে গিয়ে ইসাবেলকে গীর্জায় ভজনের আসরে হাজির থাকার কথা শুনলাম। ওকে খুঁজতে দেখে রোদেনদিয়েক রসিকতা করে বললো, 'ডাক্তার খুঁজছে তোমাকে। ওর কাছে গেলেই তুমি তোমার ইসাবেলের ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারবে।'

ডাক্তারের কাছে ছুটে যেতেই তিনি বললেন, 'ফ্রাউলিন তার হেভেনের সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছে? না হলে আপাতত দেখা করার চেষ্টা না করলেই ভালো।' ডাক্তার আরো বললেন, 'আমি মেয়েটির চিকিৎসক, ওর ভালোমন্দ দেখা আমার একান্ত কর্তব্য, তাই আপনাকে এই কথা বলা……আর একটা কথা জানতে চাই, মেয়েটিকে আপনি ভালোবেসে ফেলেননি তো?'

'ইসাবেলকে? না, সে ভাবে নয় যা আপনি ভাবছেন। কিন্তু আজ এ প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'না, কোন কিছু ভেবে বলছি না। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম', সঙ্গে সঙ্গে আবার এও বললেন, 'তবে ওকে আপনি ভলোবাসলেও অন্যায় হতো না।'

ডাক্তারকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। একটু পরেই তিনি আবার নিজের থেকেই বলতে শুরু করলেন: 'জানেন ইসাবেলের মা এখানে এসেছেন! তিনি তার মেয়ের প্রতি অবিচারের সব কথা স্বীকার করেছেন। স্বামী মারা যাবার সময় ভদ্রমহিলার বয়েস কম ছিলো, তখনো তাঁকে যুবতীই বলা যায়। আর দেখতেও খুব সুন্দরী ছিলেন তখনো। তাদের এক পারিবারিক বন্ধু তার স্বামীর মৃত্যুর পর ঘন ঘন আসতে শুরু করে দেন তাদের বাড়িতে। ইসাবেল তাকে মনে মনে ভালোবাসতে শুরু করে দেয়। বয়সে তরুণ ছিলো সে। কিন্তু তা হলে হবে কি, হঠাৎ একদিন ওর মা সেই যুবকটিকে বিয়ে করে বসে। সেই যুবকটির নাম রলফ্ কিংবা রুডলফ, এই রকম কিছু একটা হবে হয়তো। ওর সেই প্রেমিক হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ওর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয়। ইসাবেলের মা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে সেই যুবকটি, মানে তার দ্বিতীয় স্বামী এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাই মনে হয়, ইসাবেলের মাথা খারাপ হওয়ার মূল কারণটি যখন অপসারিত, তাহলে এবার নিশ্চয়ই ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে, ভালো কিছু ঘটবে বলে আশা করা যায়। এবার আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ওকে সম্পূর্ণ ভাবে ভালোবেসে একেবারে সুস্থ করে তোলার জন্য।'

ডাক্তারের কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হলো, ব্যঙ্গ করে বললাম, 'তাই বুঝি!'

'হ্যাঁ, স্বাভাবিক হয়ে না উঠলে আজই প্রথম গীর্জায় ভজন-সভায় গেলো কেন ও? আশা করি এর পর ভালো হয়ে যাবে ও। তাই আবার আমি আপনাকে বলছি,

কয়েকদিন ওর সঙ্গে দেখা করবেন না, আগে ওর মনটা স্থিতি হতে দিন, তারপর… বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মুখে বললাম বটে, কিন্তু আমার মনের ভেতরে তখন প্রবল ঝড় বইতে শুরু করেছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম, পা দুটো অসম্ভব টলছিল। আর ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। রাস্তার ধারে একটা সস্তার হোটেলে বসে গোগ্রাসে অনেক কিছুই খেলাম আমি। পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পথে অনেক ভিখারীর ভীড় চোখে পড়লো—তারা প্রায় সবাই যুদ্ধের শিকার। কারোর হাত নেই, কারোর পা নেই, বিকলাঙ্গ। নিজেকে ধিক্কার দিলাম, পাগলের মতো অতো বেশী না খেলেই চলতো, তাহলে এখন ওদের ওদের কিছু অন্তত সাহায্য তো করতে পারতাম।

ডাক্তারের ভবিষ্যতবাণী মতো যে সার্জেণ্ট মেজর নোপক মৃত্যুপথযাত্রী, তাকে হঠাৎ তার শয়নকক্ষের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, তাহলে এখনো মরেনি সে? জানালার কাঁচে তার ছায়া পড়েছে। একটু পরেই জানালা খুললো সে, এবার নোপকের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেয়ে জর্জকে বললাম, 'দ্যাখো, বুড়োটা বিছানায় শুয়ে মরতে চায় না শেষবারের মতো বাইরের ভাটিখানা না দেখে।'

তারপরেই দেখলাম, একটা বোতল মুখে ঠেকালো ও। আবার জর্জকে বললাম, 'দেখছো, সব মানুষই শেষ পর্যন্ত কেমন বাঁচতে চায়। ওই দ্যাখো, নোপক কেমন নিজের থেকেই ওষুধ খাচ্ছে।'

'ওষুধ না ছাই, ওটা জিনের বোতল। নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখে থাকবে। এখন ও ওর স্ত্রী ও মেয়েদের লুকিয়ে মনের সুখে গিলছে।'

'তাহলে ওর স্ত্রীকে খবর দিতে হয়!'

'তোমার কি মনে হয় ওর স্ত্রী জিনের বোতলটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে?' বললো জর্জ। 'তাছাড়া মরবার আগে একটু খেয়েই নিক না কেন। ডাক্তার তো বলেইছে, আর মাত্র দু'একদিন বাঁচবে…'

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে খবর দিলাম আমরা। সব শুনে তিনিও বললেন, মরেই যখন যাবে, ওকে মদ খেতে দিয়ে আমরা বরং নোপকের কবরে কি পাথরের স্তম্ভ বসাবো, সেটা যেন আগে ভাগে ঠিক করে রাখি। ডাক্তারের কাঠখোট্টা ধরনের কথা শুনে আমার কেন জানিনা মনে হলো, লোকটা কি ভীষণ নিষ্ঠুর। তা না হলে এতো সহজে একজনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে পারে? জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল আমার।

জর্জকে বললাম, 'এ চাকরী আমার আর পোষাবে না জর্জ। জীবনের সুন্দর

অনুভূতিগুলো এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি একেবারে, হয়তো সামান্য একটু ভোঁতা হয়ে থাকবে। তাই নতুন করে শানিয়ে নেবার জন্য সময় থাকতে এই চাকরীটা ছেড়ে দেবো ভাবছি।'

দুপুরে এডুয়ার্ডের হোটেল থেকে ফিরে নোপকদের বাড়ি থেকে চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম আমরা। জর্জ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'নোপক বোধহয় সত্যি সত্যি এবার টেঁসে গেলো হে। আহা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, ওর আত্মা যেন শান্তি পায়।' তারপর একটু থেমে সে আবার বললো, 'চলো, ওদের এই দুঃসময়ে, নোপকের পরিবারকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি··'

দরজা খোলাই ছিলো। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। সার্জেন্ট মেজর নোপক বাইরে বেরোবার পোষাক পরে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে, তার হাতে বেড়াবার একটা ছবি। তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে সেলাই মেশিনগুলো আড়াল করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অকথ্য ভাবে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে নোপক, মাঝে মাঝে ছড়ি দিয়ে পেটাচ্ছেও তার বৌ ও মেয়েদের। মেঝের উপর ছড়ানো অর্ধ-সমাপ্ত কালো পোষাক-গুলো। তার সেই রাগের কারণটা দেরীতে হলেও বোঝা গেলো—কেন তারা আগে থাকতে শোকের পোষাক তৈরী করছে। বৌ-মেয়েরা তাহলে নোপকের মৃত্যু কামনাই করছে। তাছাড়া এতোগুলো পয়সা তারা খরচ করতে গেলো কেন?

'তোরা সবাই শয়তান, তোরা ভেবেছিলি আমি বুঝি দু'একদিনে মরে যাচ্ছি, সেই আনন্দে খুশী হয়ে উঠেছিলি, আমাকে হারিয়ে শোক প্রকাশ করতে যাচ্ছিলি, নাকি খুশীর উৎসব করতে যাচ্ছিলি। দাঁড়া তোদের আমি উচিত শিক্ষা দেবো এখনি···' এই বলে নোপক তার স্ত্রী ও মেয়েদের বেধড়ক পেটাতে থাকে তার হাতের ছড়িটা দিয়ে। তার বৌ ও মেয়েরা যতো তাকে বোঝায় যে, তাদের কোনো দোষ নেই, ডাক্তারই তাদের ভুল বুঝিয়েছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে সে। কোনো যুক্তিই মানতে চাইছিল না সে। তার সেই এক কথা—কেন তারা অযথা শোক পোশাক তৈরী করতে গিয়ে এক গাদা টাকা খরচ করতে গেলো। তার স্ত্রী ও অন্যরা তাকে বোঝায়, পোশাকগুলো তারা অন্যত্র বিক্রী করে দিয়ে বরং বাড়তি কিছু লাভ করতে পারবে।

'আর কবরের পাথরের অর্ডার নিশ্চয়ই দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই শকুনগুলোকে? খিঁচিয়ে উঠলো নোপক।

এরপর আমরা আর স্থির থাকতে পারলাম না, বিশেষ করে যখন সে আমাদেরকেও খিস্তি করতে ছাড়লো না। আমি বললাম, 'অভিনন্দন মেজর নোপক, আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু আপনি বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, একটু শান্ত হোন।'

'এই সেদিনের ছোকরা, তুমি কি করে জানবে, এরা আমার কতো না সর্বনাশ করেছে? ওরা কবরের পাথরগুলোর অর্ডার পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।'

'আমরা কিন্তু ওই পাথরের দাম দিইনি এখনো', এই ফাঁকে তার স্ত্রী বলে উঠলো, 'ওদের তুমি নিজের মুখে জিজ্ঞাসাই করো না!' কথাটা ম্যাজিকের মতো বুঝি কাজ করলো। এর অর্থ হলো, লাভের মুখ দেখা যাবে পাথরগুলো পরে বিক্রী করলে, বিশেষ করে এই মুদ্রাস্ফীতির সময়।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, হের নোপক, এর থেকেই বুঝতে পারছেন, এতে লোকসানের বদলে আপনার লাভই হচ্ছে।'

লাভের কথা শুনে বুড়ো এখন শান্ত হয়ে যাবে, সে তার বৌ ও মেয়েদের আর মারধোর করবেন না, এই ভেবে আমরা ফিরে এলাম আমাদের অফিসে।

একটু পরেই বৃদ্ধ নোপক আমাদের অফিসে ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'কত দাম নেবে আমার কবরের ওই পাথরগুলোর জন্যে?'

'আশি লাখ মার্ক।' আমি বললাম।

নোপক অনেক দর কষাকষি করতে চাইলো, শেষ পর্যন্ত আশি লাখ মার্কের দলা পাকানো নোটের একটা বাণ্ডিল ছুঁড়ে দিলো টেবিলের ওপর। টাকাগুলো বৌ মেয়েদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা।

টাকাগুলো সবে মাত্র আমরা গোছাতে শুরু করেছি মেজর নোপক বলে উঠলো, 'আচ্ছা, এবার যদি ওই পাথরগুলো তোমাদের কাছে বিক্রী করে দিই তা কতো দাম দেবে তোমরা?'

'কেন, ওই আশি লাখই দেবো!'

'জোচ্চোর কোথাকার। একদিনে মার্কের দাম কমেনি?'

'হ্যাঁ, কমেছে স্বীকার করছি। কিন্তু এগুলোতো এখন হাত ঘুরে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মাল হয়ে গেল, দাম বরং কমবে বৈ বাড়বে না।' তবু ওঁকে আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, একবার বিক্রী হয়ে গেলে সে মাল আর নতুনের দামে বিক্রী হতে পারে না। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত রফা হলো, ওই পাথরগুলো এখন আমাদের হেফাজতেই থাকবে, পরে দাম বাড়লে আমরা বিক্রী করে দেবো।

গার্দা ডেকে পাঠিয়েছিল। ওর ঘরে যেতেই ও বললো, 'তুমি এসেছো, ভালোই লাগছে। জানো, কালই আমি চলে যাচ্ছি ওয়ালহাল্লা হোটেলে। ওখানে বারমেডের চাকরী নিচ্ছি।'

'তার মানে এডুয়ার্ডের কাছে যাচ্ছো?'

'তার মানে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের ইতি টেনে দিতে চাইছো এখানেই।'

'হ্যাঁ, এডুয়ার্ডকে আমি ঠকাতে পারবো না।' একটু থেমে গার্দা বললো, 'আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, এরপর নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে তাকে পুরনো প্রেমিকার কথা বলবে না, বলতে নেই। জীবনে সুখ বলতে কিছু পাইনি কখনো, কেবলি দুঃখে ভরা জীবন আমার। বিশেষ চাহিদাও নেই আমার, তাই এখন আমি আমার জীবনের স্থিতি চাইছি।'

'তুমি অনেক বদলে গেছো গার্দা'. কথাটা বলতে গিয়ে বুক আমার ফেটে যাচ্ছিল। কোনো রকমে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'ওয়ালহাল্লায় আমি আর কোনো দিনও যেতে পারবো না।

'কেন আসবে না, নিশ্চয়ই আসবে।' ঠোঁটে সামান্য একটু মাপা হাসি ফুটিয়ে বললো গার্দা, 'মেয়েদের মন তুমি কিছুই বোঝো না।' তারপর ও হাতব্যাগ থেকে একটা মেডেল বের করে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে গিয়ে বললো, 'এটা সব সময়ে এই ভাবে ঝুলিয়ে রেখো, দেখবে ভাগ্য তোমার সহায় হবে একদিন। যাও, এবার ফিরে যাও তোমার ঘরে।'

কার্ল বিলের কারখানায় গিয়ে দেখি একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে সেখানে। আজ কয়েক কোটি মার্কের বাজী ধরা হয়েছে। কার্লের প্রতিদ্বন্দ্বী খুশীতে বেশ ডগমগ। ওদিকে কার্ল তখন বেশ ঘেমে উঠেছে। তার কারণ আজ জিততে পারলে তার ভাগ্য ফিরে যাবে, আর হারলে একেবারে পথের ভিখিরী। আমাকে দেখে খুশী হয়ে উঠে বললো সে, 'আজ খুব মন দিয়ে পিয়ানো বাজাবে, ক্লারাকে চরম উত্তেজনায় তুলতে হবে।'

একটু পরেই ক্লারা এলো, পরণে ওর জাপানী কিমানো। কার্লের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পরিচয় হলো ওর। লোকটা পর্যায়ক্রমে টেবিলের উপর রাখা স্তুপীকৃত নোটের তাড়াগুলো আর ক্লারাকে দেখতে থাকলো।

খেলা শুরু হলো। পেরেকের ওপর তুলো জড়ানো। দেওয়ালে গাঁথা সেই তুলো জড়ানো পেরেকের ওপর পাছা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ক্লারা। একবার, দুবার, সারা দেহের শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বললো ও, 'দুঃখিত আমি। পারলাম না। দেওয়াল থেকে সরে এসে সোজা ও ওর ঘরে চলে গেলো।

চিৎকার করে উঠলো কার্ল, যেন আর্তনাদ করে উঠলো সে, 'ক্লা—ক্লারা?'

দর্শকরা তার পরাজয়ে হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে উঠেছে। কার্লের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ধীরে ধীরে টেবিলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নোটের তাড়াগুলো হাতাবার জন্যে। 'দাঁড়ান!' আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'কথা ছিলো তিনবার চেষ্টা করবে

ক্লারা, কিন্তু দু'বার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ এখনো একবার বাকী আছে।'

'না, ও তিনবারই চেষ্টা করেছে।' নির্লিপ্ত ভাবে বললো লোকটা।

শেষ পর্যন্ত দর্শকরা আমাদের হয়ে চাপ দিতেই প্রমাণিত হলো, সত্যিই দু'বার চেষ্টা করছে ক্লারা। অতএব আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে ক্লারা। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে উপরের ঘরে গেল কার্ল। ও তখন একটা ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় কার্লেরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

'ক্লারা, এ তুমি কি করলে ক্লারা?' ক্ষোভের সঙ্গে বললো কার্ল। 'তুমি ইচ্ছে করে এমন কাজ করতে পারলে?

'যদি করেই থাকি, বেশ করেছি', ধমক দিয়ে বলে উঠলো ক্লারা। 'তুমি একটা জানোয়ার, তোমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহারই করা উচিত। তুমি যে হোয়েন জোলেন' হোটেলের সেই ক্যাশিয়ারটার সঙ্গে শোওনি, অস্বীকার করতে পারো?'

কার্ল বিলের জন্য আমার দুঃখ হলো। ক্লারাকে পাল্টা আক্রমণ করার জন্য অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে ওকে জড়াতেই মেয়েটি একটা চড় কষিয়ে দিলো তার গালে। তারপর ওরা আমার উপস্থিতি তোয়াক্কা না করেই জানোয়ারের মতো ঝগড়া শুরু করে দিলো। কার্লকে আড়াল করে আমি তখন বলে উঠলাম, 'ও নিরপরাধ। আমার জ'ন্য কেনই বা শুধু শুধু শাস্তি পেতে যাবে ও!'

'কি বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, তাহলে শুনুন, দোষটা আমারই। ওই মহিলা ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কার্ল আমাকে আলাপ করিয়ে দেয়—'

'বাজে কথা!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ক্লারা বললো, 'আপনার মতো যুবক যে ওই বয়স্কা মহিলাকে সঙ্গিনী হিসাবে চাইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমি গরীব মানুষ। আজকালকার যুবতী মেয়েদের তুষ্ট করতে গেলে অনেক খরচ। তাই কম খরচায় ওই বয়স্কা মহিলাকেই আমি চেয়েছিলাম। তাছাড়া এই শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলা হলেন আপনি। তাই আপনাকে ছেড়ে ওই বয়স্কা মহিলার প্রতি কার্ল কেনই বা ঝুঁকতে যাবে বলুন?'

আমার কথায় কাজ হলো সঙ্গে সঙ্গে। তবু তারপরেও ওর মন গলানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আবার চেষ্টা করে দেখার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে ক্লারা বললো, 'একটা শর্তে খেলতে আমি রাজী, তোমাকে কথা দিতে হবে কার্ল, হের বোদমারকে মোটা টাকা ভাগ দিতে হবে এই জেতার টাকা থেকে। মনে থাকবে তো?'

কার্ল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

খেলা আবার শুরু হলো। ক্লারা শেষ বারের মতো এসে দাঁড়ালো দেওয়ালের

সামনে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টুং করে শব্দ হলো মেঝেতে। দেখা গেলো, পেরেকটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। তখন দারুণ হৈচৈ দর্শকদের মধ্যে। কার্লের মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠলো। তেমনি হাসতে হাসতে আমার কাছে এগিয়ে এসে কার্ল বললো, 'আমি দারুণ খুশী এখন। তুমি আমার অসময়ের বন্ধু। টাকা তো আমি দেবই। তাছাড়া আর কি চাও বলো? জুতো নেবে? কিসের জুতো?'

'পেটেণ্ট লেদারের।'

বাড়িতে ফিরে আমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, সার্জেণ্ট মেজর নোপককে দেখলাম সেই কালো পাথরের অবিলিস্কের সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে উদ্যত। তার কাছে গিয়ে বলে উঠলাম, 'ওই তো ওই পাথরটা রয়েছে, যেটা আপনি কিনে রেখেছেন। প্রস্রাব করতে হয়তো ওই পাথরটার ওপরেই করুন না কেন!'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? নিজের কবরের পাথরের ওপর কেউ কখনো প্রস্রাব করে নাকি?' তারপর কি ভেবে নিজের ঘরে চলে গেলো নোপক। আর আমি তখন ফিরে গেলাম নিজের ঘরে।

পাগলাগারদের বাগান। সুন্দর মার্জিত পোশাকে এক মহিলাকে আমার সামনে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমার জানা জেনেভিয়েভ তার হোভেন। কিন্তু তাকে আজ 'ইসাবেল' বলে সম্বোধন করতে সে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতার মতো বললো, 'আমায় কিছু বললেন?'

'তুমি আমায় চিনতে পারছো না ইসাবেল? আমি তোমার রুডলফ। কতো গল্পই না করেছি আমরা দুজনে এক সঙ্গে।'

'হয়তো বা। এখানে অনেক দিনই তো ছিলাম। কিন্তু এখন তো কিছুই মনে পড়ছে না। তা আপনিও কি অনেকদিন আছেন এখানে?'

'না, না আমি এখানে অর্গান বাজাতে আসি।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে, গীর্জায় আপনি বেশ বাজান।' বললো ইসাবেল, 'খুব শীগগীরই আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'তুমি চলে যাচ্ছো ইসাবেল? তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? রাতে যে সব নাম ঝরে পড়তো, যে সব ফুল মুখর হয়ে উঠতো, সেসব কিছুই কি মনে পড়ছে না তোমার?'

'কাব্যর কথা বলছেন?' ঘাড় দুলিয়ে ইসাবেল বললো, 'কবিতা আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু সব কবিতা সব সময় মনে থাকে না।'

আর কোনো আশা নেই। ইসাবেলকে এখন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে আমার। আমার আগের দেখা ইসাবেল মারা গেছে, সে জায়গায় ও যেন অন্য এক

নারী, অন্য এক সত্ত্বা নিয়ে হাজির হয়েছে আমার সামনে। এরপর সে হারিয়ে যাবে জনারণ্যে। অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করবে, সন্তানের মা হবে, স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করবে। আর আমি? বিদায় নিয়ে চলে গেলো ইসাবেল।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রাউলিন তার হোভেন সম্পর্কে কিছু বলবেন না? যাই মনে করুন না কেন, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, এই তিন সপ্তাহে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও। ওর ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সফল।'

'আপনি এটাকে সফল বলে মনে করেন?'

'সফল নয় তো কি? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ও আবার ওর আগের জীবনে ফিরে যেতে পেরেছে, এর চেয়ে সফল আর কি হতে পারে? সে যাইহোক, ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

'না, কোনো কিছু ভেবে বলিনি। ওর কেসটা একটা অদ্ভুত চমক যেন। নিমেষে সব কিছু বদলে যাওয়ার মতো। ওর এই মানসিক পরিবর্তন দেখে বলা যায় যে, মানসিক ভারসাম্য ও আর হারাবে না কখনো। মা ও মেয়ে এখন তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে, তারা দুজনেই প্রতারিত যে ভাবেই হোক না কেন। তাই সমব্যথীর মতো দুজনের সমদুঃখে পরস্পর পরস্পরের এতো কাছে আসতে পেরেছে কতো সহজে। একটু পরেই ওরা দুজনেই আসছে এখানে। দেখে যাবেন না?'

বিকেলের প্রার্থনা সভায় জেনেভিয়েভ আর তার মা এলেন। ভদ্রমহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশ, মাঝারি গড়নের, এই বয়সেও বেশ সুন্দরী তিনি। দারুণ গুছিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। অর্গান বাজানোর পর এক ফাঁকে গীর্জার বাগানে চলে এলাম, সঙ্গে জেনেভিয়েভও এলো। 'তাহলে এই সপ্তাহেই তোমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছো? তুমি খুশী তো?'

'নিশ্চয়ই।'

এরপর কিই বা আর আমি বলতে পারি। অন্ধকারে ওর মুখ ঢেকে গেছে, তবু সেই পুরনো নাম ধরে ওকে ডাকার লোভটা সামলাতে পারলাম না: 'ইসাবেল?'

আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে ও বললো, 'আমার মনে হয়, বারবার কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে আপনার। আমার নাম ইসাবেল নয়, জেনেভিয়েভ।'

'তা হতে পারে। অন্য কোন মেয়ের নাম হবে ইসাবেল। ওকে নিয়ে আগে আমরা কতো আলোচনাই না করেছি।

'তা করতেই পারি, কতো লোকের কথাই তো আমরা আলোচনা করে থাকি, তারপর একদিন একে একে তাদের সবার কথা ভুলে যাই আমরা।'

'তা যা বলেছেন।'

'খুব রোমাণ্টিক ব্যাপার, তাই না? হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে। দেরীতে মনে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

অবাক হলাম ওর ভদ্রতার খাতিরে মিথ্যে বলার জনা। 'গত সপ্তাহটা আমার কিভাবে যে কেটেছে, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।' আবার ভদ্রতা দেখিয়ে বললো সে, 'ঠিক আছে, এখনকার খবর বলুন।'

'কার খবর জিজ্ঞেস করছো? ওই ইসাবেলের? সে তো মারা গেছে।'

'আমি ভীষণ দুঃখিত', চমকে উঠে বললো জেনেভিয়েভ, 'এ খবরটা আমার জানা ছিলো না;'

'তাতে কি হয়েছে? আমিও কি ওর সব পরিচয় পেয়েছি?' আমি ধীরে ধীরে বললাম, 'ইসাবেল হঠাৎ এমন ভাবে মারা গেলো যে, ও নিজেই বুঝতে পারেনি। বড় অদ্ভূত লাগছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভূতই বটে!' হাত বাড়িয়ে ও আমার হাতে রেখে গাঢ় স্বরে বললো, 'আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে ইসাবেলের জন্য। ভারী মিষ্টি নাম। আগে কেউ আমাকে ওই নামে ডাকলে আমার খুব রাগ হতো।'

'এখন হয় না?'

'না', এক গাল হেসে বললো জেনেভিয়েভ।

সেখান থেকে চলে আসতে গিয়ে এখন আমার আজকের সব কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো এক এক করে। ডাক্তার খুশী তাঁর রোগিনীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্য। সেই আনন্দেই ওরা মশগুল। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সত্যিই কি এর মিল আছে? ওরা ওর কোন সত্তাটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? ইসাবেলের যে সত্তাটাকে আমি দিনের পর দিন আমার হৃদয় উজার করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে এসেছি, সেটা তো আজ হারিয়ে গেছে। আজ আমার মনে পড়ছে, সত্যিই কি আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছিলাম? ওরা বিদায় জানাবার আগে বলেছিলাম, 'তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। অবাক হয়ে জেনেভিয়েভ জিজ্ঞেস করছিল, 'কিসের জন্যে?' উত্তরটা আমি তখন দিতে পারিনি। পাহাড়ী ঢালু পথে নামতে গিয়ে নিজের মনে বলে ফেললাম, বিদায় ইসাবেল, বিদায়। ভোর বেলার ভালো লাগা স্বপ্নের মতো তুমি এসেছিলে আমার জীবনে, আবার আজ সন্ধ্যা নামতে না নামতেই অন্ধকারে তুমি হারিয়ে গেলে চিরদিনের মতো। তুমি এখন আমার কাছে ঝরা পাতা, বাসি ফুলের মতোন।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই আচমকা পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো ওয়াটজেক। খিস্তি করে বলে উঠলো, 'দাঁড়া কুত্তা, তোকে যখন একবার পেয়েছি, তখন আর ছাড়ছি না।'

'আপনি কি শেষে পাগল হয়ে গেলেন ?' প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি, 'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ?'

'হ্যাঁ, খুব চিনতে পারছি, বেজম্মা কোথাকার! আমার বৌয়ের সঙ্গে রাত কাটানোর জন্যে আজ তোকে মোক্ষম শাস্তি দেবো, একেবারে খতম করে ছাড়বো।'

এবার ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেলো আমার কাছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ওকে যতোই বোঝাবার চেষ্টা করি না কেন, ততই ক্ষেপে লাল হয়ে ওঠে ও। এই মুহূর্তে আমি জানি, জর্জের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে লিসা। অথচ এদিকে ঘোড়ার কসাইটার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে আমাকে। প্রাণ হারানোর ভয়ে বাগানে ছুটে এসে সেই অবিলিস্কের পেছনে আশ্রয় নিলাম ওয়াটজেকের পাগলামির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আমি তখন মরীয়া হয়ে উঠে এক ফাঁকে কোনো রকমে জামার বুকপকেট থেকে গার্দার ছবিটা বার করলাম, ছবির পেছনে লেখা ছিল, 'প্রিয় বোদমারকে—গার্দা।'

'এই দেখুন, আমার সত্যিকারের বান্ধবী', শেষ চেষ্টা করলাম ওয়াটজেককে বোঝাবার জন্যে। 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' ফটোটা অবিলিস্ক পাথরের সামনে ফেলে রেখে সরে এলাম। রাগে গজরাতে গজরাতে গার্দার ফটোটা দেখলো ওয়াটজেক। এখন বুঝতে পারলেন তো, আমি আমার বান্ধবীকে ছেড়ে কেনই বা আপনার স্ত্রীর কাছে যাবো বলুন ?'

'বেশ, তুমি না হলেও অন্তত কেউ একজন নিশ্চয়ই আমার বৌ-এর সঙ্গে রাত কাটায়', একটু ইতস্তত করে বললো ওয়াটজেক।

'মিথ্যে সন্দেহ আপনার। আপনার স্ত্রী আপনাকে ঠকাতেই পারেন না।'

ছুরীটা ওয়াটজেকের হাত থেকে খসে পড়লো। গার্দার ফটোটা পকেটে চালান করে দিয়ে ওয়াটজেককে কিছুটা শান্ত হতে দেখে এবার আমি তার কাছে এসে বললাম, 'মারুন, এবার আমাকে ছুরি মারুন।...ছেলেমানুষের মতো কি যে আপনি করেন ? আর একটু হলেই আমাকে খুনের দায়ে আপনাকে ফাঁসী কাঠে লটকাতে হতো।'

'আ—আমি ঠিক...' আমতা আমতা করেন ওয়াটজেক।

পরে সমস্ত ব্যাপারটা জানা গেলো। প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা কোনরসমান কান পাতলা ওয়াটজেককে লাগিয়েছে, লিসা এ বাড়িতে আসে রাতে। গার্দার ফটোটা ভালো করে ওঁকে দেখাতে উনি বুঝলেন, লিসা আর গার্দা প্রায় একই মাপের সব দিক থেকে। তাই সেই বৃদ্ধার চিনতে ভুল হয়ে থাকবে—গার্দাকে লিসা বলে ভুল করে থাকবে। সব বোঝার পর একটু নরম হলো ওয়াটজেক। তারপর বৌকে কি করে সুখী করতে হয়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিলাম ওঁকে। এরপর দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। ওয়াটজেক তখন বললেন, নতুন বন্ধুত্বের খাতিরে কাল উনি আমার জন্য ঘোড়ার মাংসের সসেজ পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন জর্জ কেমন দার্শনিকের মতো বললো, 'জানো, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্বামীরা যেন এক একটা গৃহপালিত জন্তু। মুরগী বা খরগোশের মতো খাদ্যবস্তু। কিছুদিন তাদের নিয়ে নাড়োচাড়ো, স্ফূর্তি করো, খেলো, তারপর অন্য আর একটা মুরগী কিংবা খরগোসের সন্ধান পেলেই আগের মুরগীটাকে জবাই করে ফেলো। আশ্চর্য সেই সব প্রাণীগুলো বুঝতেই পারে না, তাদের কি পরিণতি হতে যাচ্ছে। এইসব নকল সতী স্ত্রীদের স্ট্রৈন স্বামীগুলোরও ওই একই অবস্থা।'

টেবিলে রাখা ওয়াটজেকের পাঠানো ঘোড়ার মাংসের সসেজের প্লেটের দিকে দৃষ্টি ফেলে রসিকতা করলো জর্জ, 'তুমি কি ওটা খাবে? নাকি তোমার বিবেকে বাঁধছে? হ্যাঁ, ওয়াটজেক তো তোমার এখন নতুন বন্ধু হয়েছে', একটু থেমে জর্জ আবার বললো 'জানো, লিসা আমাকেও ঠকিয়েছে।'

'সেকি?' এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। 'কি করে বুঝলে তুমি?'

'এতে না বোঝারই বা কি আছে? যে কেউ বুঝতে পারে, অতো সব দামী দামী পোশাক, গহনা ওর আসে কোত্থেকে? ওয়াটজেক হাঁদাগঙ্গারাম হতে পারে, ও ওর স্বামী, কিন্তু আমি তো আর স্বামী নই, তাই বেশ বুঝতে পারি। তবে এ কথা ঠিক, লিসার মতো বহুবল্লভারা তাদের স্বামীদের সুখে রাখার চেষ্টা করে, সে যতোই অভিনয় হোক না কেন। তবে থাক ওসব কথা, এখন চলো এডুয়ার্ডের হোটেলে যাওয়া যাক, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

আমাদের দেখে এডুয়ার্ডের তখন জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। ডলারের দাম এখন তুঙ্গে—এক কোটি মার্ক। এ অবস্থায় কুপন কি আর গ্রহণ করা যায়? 'তোমাদের কুপন ফুরোচ্ছে না, তোমরা কি তাহলে কুপন জমা করছো?' অভিযোগ করলো এডুয়ার্ড। গত শীতকালে কেনা এই কুপনগুলোয় পেট ভরা খাবার কিনতে খরচ পড়তো দু'হাজার মার্ক, আর এখন তাতে আধ বোতল মদও পাওয়া যায় না। তাই এডুয়ার্ডের রাগের কারণটা অযৌক্তিক নয় একেবারে।

এই সময়ে হঠাৎ রাইজেনফেল্ডকে দেখতে পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম তার টেবিলের সামনে। চেয়ারে থিতু হয়ে বসে জর্জ আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম। এই ছোকরাকে ভালো কিছু খাইয়ে দিন আজ। গতকাল লিসার ব্যাপারে চমৎকার ডুয়েল লড়েছে ও ওয়াটজেকের সঙ্গে। যাকে বলে ছুরির সঙ্গে পাথরের টুকরোর লড়াই আর কি।'

সব কথা শুনে গম্ভীর গলায় বললো রাইজেনফেল্ড, 'এখন তোমাদের দুজনেরই এখানে আর থাকা উচিত নয়। আমার মনে হয় না, এতো সহজে তোমাদের ছেড়ে দেবে ওয়াটজেক।'

'আমার টাকমাথা, আমার বয়স হয়েছে, আমাকে দেখে ওর সন্দেহই হবে না যে, ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমি গোপন সম্পর্ক রাখতে পারি,' হাসতে হাসতে বললো জর্জ।

'তবে আমার যতো ভয় এই বোদমার ছোকরাটাকে নিয়ে।'

আমার কথা ভেবে একটু সময়ের জন্যে চিন্তা করে আমার দিকে ফিরে রাইজেনফেল্ড বলে উঠলো, 'তুমি তো প্রায়ই বলে থাকো, কবরের জিনিষ বিক্রীর কাজ করতে তোমার আর ভাল লাগে না। তাই বলছি, বার্লিনের একটা খবরের কাগজের অফিসে চাকরী করবে? রাজী থাকো তো উনিশশো চব্বিশ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সেই চাকরীতে যোগ দাও। কি রাজী তো?'

'কতো মাইনে পাবে ও?' আমার হয়ে জিজ্ঞেস করলো জর্জ।

'দুশো মার্ক', নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয় রাইজেনফেল্ড।

'এটা যে এক ধরণের রসিকতা, আমি জানতাম', রাগত স্বরে বললাম আমি, 'আমাদের মতো লোকের সঙ্গে রসিকতা করে আপনি খুব আনন্দ পান, তাই না? মাত্র দুশো মার্ক? এ ধরণের টাকার অঙ্ক বাজারে চালু আছে নাকি?'

'এখন নেই, তবে হতে যাচ্ছে খুব শীগগীর। রাই মার্কের নাম জানা নেই? আর রেন্টন মার্কই বা কি জিনিষ, জানো কি?'

অবাক চোখে আমি আর জর্জ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। বাজারে জোর গুজব, শীগগীর নতুন মার্ক চালু হতে যাচ্ছে। এক মার্ক সমান কিছু পরিমান রাইশস্য। জর্জ বিশ্বাস করে না। 'ওসব গুজবে কান দিই না', বললো সে, 'অনেক শুনেছি।'

'না, এটা আর গুজব নয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর পেয়েছি। তারপর রাইমার্ককে সোনার মার্কে পরিণত করা হবে। এটা সরকারী প্রচেষ্টা।'

'সরকার করছে? বাজে কথা। এই সরকারই তো মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছে।'

'আগে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। সরকারের ঋণ সব শোধ হয়ে গেছে। এখনকার এক কোটি মার্কের সমান হবে এক সোনার মার্ক।'

'তারপর সেই সোনার মার্কেরও দাম আবার পড়ে যাবে, তখন—' আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই রাইজেনফেল্ড ধমকে উঠলো, 'তুমি এই চাকরীটা করতে চাও কি চাও না স্পষ্ট করে বলো।'

হঠাৎ সব উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলো, একটা শান্ত পরিবেশ গড়ে উঠলো রেস্তোরায়। হ্যাঁ, না দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'হ্যাঁ, চাকরীটা আমার অবশ্যই চাই।' জবাবটা দেবার পর জর্জের দিকে তাকাবার সাহস আমার হলো না।

'তোমার মগজে তাহলে বুদ্ধি আছে বলতে হয়', গম্ভীর গলায় বললো রাইজেনফেল্ড।

ওয়াটজেকের হাত থেকে জর্জকে বাঁচাবার সুবাদে আমার সম্মানে ওয়েটারের উদ্দেশ্যে ও বলে উঠলো, 'ভালো এক বোতল মদ দিয়ে যাও এখানে।'

একটু পরেই এডুয়ার্ড'ও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। 'আমাকেও একটু মদ দাও। মন খুব খারাপ। এই বোতলটা আমিই পাঠিয়েছি, তোমাদের দাম দিতে হবে না এর জন্যে।'

'তা তোমার মন খারাপের কারণটা কি জানতে পারি?' জানতে চাইলাম আমি। 'হঠাৎ এতো যে উদাস হয়ে গেলে?'

'ভ্যালেন্টিনা মারা গেছে, এই মাত্র খবর পেলাম। হার্ট' এ্যাটাক।' এডুয়ার্ডে'র চোখে জল। 'একবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল ও।'

'কি বললেন? আপনিও মরতে মরতে বে'চে গেছেন?' রসিকতা করতে ছাড়লো না রাইজেনফেল্ড। 'এটা যে জীবন রক্ষা সমিতির সদর দপ্তর বনে গেছে দেখছি।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বললো সে, 'এখন চলি। সন্ধ্যায় অফিসে আবার দেখা হচ্ছে।'

ও চলে যাওয়ার আগে ওকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো জর্জ', 'ভুল করেও লিসাকে যেন আর ফুল পাঠিও না।' বলে হাসলো জর্জ'।

এডুয়ার্ডে'র হোটেল থেকে বেরিয়ে গীর্জার বাগানের শেষ প্রান্তের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম। হাতে জিনের বোতল, পকেটে সদ্য পাওয়া তিরিশ সুইস ফ্রাঙ্কর একটা চেক। গত দু'বছর ধরে সুইজারল্যাণ্ডের একটা পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর এটাই প্রথম ফসল। এবারে ছেপেছে, সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের চেকও পাঠিয়েছে পত্রিকার দপ্তর থেকে। মনটা এই দিক থেকে খুবই প্রসন্ন, আবার অন্য দিক থেকে আমি ব্যাথিতও বটে। ইসাবেলকে হারাতে হবে চিরদিনের মতো। এই বাগানেই ইসাবেলের সঙ্গে কতদিন সন্ধ্যা কাটিয়েছি, নুড়ি বিছানো পথে পাশাপাশি দুজনে হাতে হাত রেখে বেড়িয়েছি। এখানকার গাছের প্রতিটি পাতার সঙ্গে আমাদের দুজনের কতো স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে। তাই আজ এই মুহূর্তে' প্রতিটি পাতা, প্রতিটি নুড়িকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে, বুকে জড়াতে ইচ্ছে করছে, এখন আমার মনে শীতের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই যেন।

আমি এখন কেবল ইসাবেলের কথাই ভাবছি। চেকের টাকাটা দিয়ে একটা দামী স্যুট কিনবো। আর কার্ল' ব্রিল বলেছে, আমাকে একটা দামী পেটেণ্ট লেদারের জুতো উপহার দেবে। আচ্ছা, ওগুলো পরে ইসাবেলের সামনে গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়? ও কি আমাকে ফিরে চিনতে পারবে? ওর এক সময়ের প্রিয় রুডলফ বলে ডাকবে আমাকে? না, ওসব কথা ভেবে এখন আর কোনো লাভ নেই। ইসাবেলের নতুন জীবনের কাছে আমার সব স্মৃতিই এখন বিলুপ্ত। ও এখন শুধুই জেনেভিয়েভ তার হোভেন, যে কিনা এক সময় রলফ নামে এক যুবককে ভালোবাসত, কামনা করতো……

খালি জিনের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম রেড মিল রেস্তোরায়

যাওয়ার জন্যে—সেখানে আমার জন্যে একটা বিদায় সম্বর্ধনার পার্টি দিচ্ছে রাইজেনফেল্ড। আমি তো এখন সব কিছুতেই বিদায় জানাতে প্রস্তুত। আর বছরটাও তো প্রায় শেষ—উনিশশো তেইশের…

রাইজেনফেল্ডের পার্টি থেকে বাড়ি ফিরছি, একটা খবরের কাগজ কিনলাম। প্রথম পাতায় হেডলাইন দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম—'মুদ্রাস্ফীতির অবসান, এক কোটির বদলে এক মার্ক'……' খবরের চমক।

'কি, আমার ভবিষ্যদ্বাণী এবার মিলে গেলো তো?' আমার পাশ থেকে মাতব্বরের মতো ফোড়ন কাটলো রাইজেনফেল্ড, 'তখন তো তুমি এটা বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

'সেকি?' চমকে উঠলো উইলি, 'এদিকে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেলো ভাই।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেণী দ্য লা তুরের দিকে তাকালো সে; এরপর রেণী তার সঙ্গে থাকবে কিনা সন্দেহ, এখন তার কেবল এই চিন্তা।

পথ চলতে গিয়ে জর্জ দুঃখ করে বললো, 'আমি আর রাইজেনফেল্ড ভীষণ অবিচার করেছি ওয়াটজেকের ওপর, ওর সংসারে ভাঙন ধরানোটা ঠিক হয়নি!'

'এখন ওসব কথা ভুলে যাও জর্জ। সব কিছুকে এন সরল ভাবে মেনে নেওয়ার সময় এটা।' আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম।

বাড়িতে ঢোকার মুখে নোপকের ছোট মেয়েটা আমাদের সামনে এসে জানালো, 'বাবা বলছিলেন, ওই পাথরটা আপনারা বারো কোটি মার্ক দিয়ে কিনে নিতে পারেন।'

'তোমার বাবাকে বলো খুব বেশী হলে আট মার্ক দিতে পারি।'

জানালায় মুখ বাড়িয়ে নোপক হাঁক দিলো, 'কেন হে, আজ হঠাৎ এমন জলের দর বলছো কেন?'

'কেন আজকের কাগজ পড়েননি? মুদ্রাস্ফীতির জমানা শেষ এখন।'

'ঠিক আছে, তাহলে এখন ওটা আর বেচছি না, পরে দাম তো আবার চড়বেই।' বলেই বৃদ্ধ নোপক শব্দ করে জানালা বন্ধ করে দিলো।

□ আঠারো □

ওয়ারদেনবুর্ক কবি সমিতি আমার বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে ওয়াল-হাল্লার ক্লাবঘরে। আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাথায় কবিরা বেশ ব্যাথাতুর। হাংকারমান আমাকে কাছে পেয়ে বললো, 'তুমি তো আমার কবিতা পড়েছো, আর তুমিই সেদিন বলেছিলে আমার কবিতায় নাকি স্তেফান জর্জে'র ছায়া আছে।'

উক্তিটা আমার নয়, অটো বামবাসের, হাংকারমানও তার কবিতার প্রশংসা করে বলেছিল, রিলকের চেয়ে তার কবিতা নাকি অনেকাংশে ভালো। এ হলো এ ওর ঢাক পিটানোর ব্যাপার। কিন্তু সেই সত্যটা প্রকাশ করে আমি ওর মনে ব্যাথা দিতে চাইলাম না, অন্তত এই বিদায় বেলায়।

'এই স্যুটটা তুমি নতুন কিনলে?' হাংকারমানের পরবর্তী প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সুইজারল্যাণ্ডের এক পত্রিকায় কবিতা লিখে মোটা টাকা পাই, সেই টাকায় এটা কিনলাম। যুদ্ধের পর এই প্রথম অসামরিক পোশাক করাতে পারলাম। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি অবসানের জন্যও বটে।'

'সুইজারল্যাণ্ড থেকে কবিতা লেখার জন্য পারিশ্রমিক? তাহলে তোমার তো এটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ? তা কারা দিল? খবরের কাগজ কর্তৃপক্ষ?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

খবরের কাগজের নাম শুনে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাংকারমান বললো, 'যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। আমি কিন্তু কবিতা লিখি প্রথম সারির পত্র-পত্রিকায় ছাপানোর জন্য। খবরের কাগজে কখনো লিখবো না আমি। তবে নেহাত আর্থার বাউয়ার জোর করে আবার একটা কবিতার বই ছাপালো, আমার ইচ্ছে ছিলো না একেবারেই। বিজ্ঞাপন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু দেয়নি। বিনা বিজ্ঞাপনে তাই মাত্র পাঁচশো কপি বিক্রী হয়েছে।

ও যতোই বলুক না কেন, ভেতরের খবর তো আমি জানি। হাংকারমান একটা স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশক আর্থারের বই তাদের স্কুলে চালু করবে না বলে হুমকি দিয়েছিল ও। তাই ভয় পেয়ে আর্থার ওর কবিতার বইটা প্রকাশ করতে একরকম বাধ্য হয়। মাত্র আড়াইশো কপি ছাপিয়েছিল সে, বিক্রী হয়েছে আঠাশটা, তার মধ্যেও হাংকারমান নিজেই নাকি গোপনে উনিশ কপি কিনেছিল।

অবসেষে নিজের উদ্দেশ্যের কথাটা বলেই ফেললো হাংকারমান। 'দ্যাখো, তুমি তো বার্লিনে যাচ্ছো, আমার এই কবিতার বই সম্পর্কে তোমার কাগজে একটা ভালো

সমালোচনা লিখে দেবে? তুমি আমি দুজনেই তো কবি। তা বন্ধু হিসেবে এই উপকারটুকু করবে না তুমি?'

'করবো বৈকি।'

'এইতো ঠিক বন্ধুর মতো কথা বলেছো তুমি', আবেগে গদগদ হয়ে বললো হান্কারমান, 'তা তুমি এখন কি লিখছো বন্ধু?'

'কিসসু না। আগে জগতটা ঘুরে দেখি। তারপর তো সেই সব অভিজ্ঞতা কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলবো?'

'তা যা বলেছো, এই সত্য উপলব্ধির কথা ক'জনই বা বোঝে বলো। উচ্ছ্বাসের শিকার হয়ে অনেকেই বাজে বাজে কবিতা লিখে ফেলে। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, আগে অভিজ্ঞতা, তারপর লেখা।' তারপর ও নিচু গলায় বললো, 'তোমার আমার মধ্যে এই যে সব আলোচনা হলো, অন্য কাউকে যেন বলো না, বুঝলে?'

এবারেও মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

এরপর সম্বর্ধনা সভার শেষে অটো বামবাস ওর উচ্ছ্বাসে ভরা উপহার বাণী লেখা একটা কবিতার বই আমাকে উপহার দিয়ে ও হাঙ্কারমানের মতো একই অনুরোধ করলো, বার্লিনের কাগজে ওর কবিতার ভালো সমালোচনা করে লিখতে।

হঠাৎ এই আনন্দমুখর পরিবেশে স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের নগ্ন প্রকাশভঙ্গিমায় পরিবেশটা মনে হলো যেন অনেক, অনেক দূরের। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মুদ্রাস্ফীতি, ইসাবেল, কোনো কিছুই এখন যেন আমাকে আর আকর্ষণ করে না। এখন পৃথিবীর সব কিছুই আমার তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। এসব ছেড়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে পারলেই যেন আমি বাঁচি।

উইলি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে মুদ্রাস্ফীতির যুগ শেষ হওয়াতে। রাতারাতি বড় ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছে ও। লাল গাড়িটাও বিক্রী করে দিয়েছে। ঘরে রঙিন কাগজের বদলে দামী অঙ্কের নোট এঁটে দিয়েছে ও। উইলির মতে এতে খরচ কম। ও এখন একটা ব্যাঙ্কের চাকরী নেবে ভাবছে। রেণী দ্য লা তুর আমাদের অনুমান মতো ওকে ছেড়ে চলে গেছে মাগদেবুর্গে। সেখানে দি গ্রীন কোকাতু রেস্তোরায় গান গেয়ে দারুণ পসার জমিয়ে বসেছে। উইলি জানালো, রেণী ওকে চিঠি লেখে মাঝে মাঝে।

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'রেণী তো ভালো মেয়ে বলতে হয়, তবু তো তোমার সঙ্গে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছে ও।'

'কোনো মানে হয় না এ সবের, জানো লুডউইগ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলে, চোখের আড়াল মানেই তো মনের আড়াল হয়ে যাওয়া। সে যাইহোক, এখানে লক্ষ লক্ষ মার্কের নোট আছে, যতো খুশী নিয়ে যাও। সব কিছুই যেন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, তাই না? তুমি কি বলো?'

ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত।' এছাড়া কি আর বলার থাকতে পারে আমার।

অফিসে আমার আজই শেষ দিন। আজ রাতের ট্রেনেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হঠাৎ টেলিফোন এলো। 'আচ্ছা, তুমি কি সেই বাচ্চা ছেলে লুডউইগ, ছেলেবেলায় ব্যাঙ ধরতে যে ভালোবাসতো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে কথা বলছো?'

'ফ্রিৎজ। তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিই—আয়রণ হর্স মারা গেছে।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ। হার্ট এ্যাটাক, গত সন্ধ্যায়। তখন ওর ঘরে খদ্দের ছিলো।'

'চমৎকার মৃত্যু, কারবার চালাতে চালাতে—কিন্তু বড্ড অসময়ে—'

'হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। শোনো যে জন্যে তোমাকে ফোন করা। তুমি বলেছিলে, কবরের পাথরের ব্যবসা করো। তা যদি হয়, তাহলে এখুনি এখানে চলে এসো। আয়রণ হর্সের কবরের ব্যাপারে বাড়িউলির ইচ্ছে কবরের পাথরের অর্ডারটা তোমাকেই দেন। তোমার প্রতি ওর খুব দুর্বলতা দেখলাম। ইতিমধ্যে একজন দালাল এসে হাজির হয়ে গেছে কবরের পাথর বেচার জন্যে। লোকটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ও নাকি আয়রণ হর্সকে—'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না', ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'লোকটার নাম অস্কার। ঠিক আছে, আমি এখনি যাচ্ছি।'

বিদায় বেলায় বহুদিনের পড়ে থাকা সেই কালো পাথরের অবিলিস্ক পাথরটা বিক্রী করে এলাম আয়রণ হর্সের কবরের জন্যে। দরদস্তুর করিনি। দামের প্রশ্নে বাড়িউলীকে বলেছি, 'এমনিতে এর দাম হাজার মার্ক।' সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি, 'তবে আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই কোন ছেলেবেলা থেকে, সেই সুবাদে ছশো মার্ক। আর আয়রণ হর্স আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন বলে তাঁর সম্মানে এর দাম তিনশো দিলেই চলবে। আমার এই শেষ বিক্রীর ওপর প্রথমে কোনো কমিশন নিতে চাইনি আমি। কিন্তু জর্জের পীড়াপীড়িতে কমিশনের টাকা নিতেই হলো শেষ পর্যন্ত। ওর যুক্তি হলো, আজ রাত বারোটা পর্যন্ত তুমিতো আমাদের কোম্পানীরই একজন……'

আমাকে বিদায় জানাতে এলো বোদোর দল, গান বাজনা করে ওরা আমাকে শেষ বিদায় দিয়ে চলে গেলো।

জর্জ আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে ষ্টেশনে এলো। বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার আমেজ। প্ল্যাটফর্মে আমরা দুজন শুধু—জর্জ আর আমি। অন্ধকারের বুক চিরে ইঞ্জিনের সার্চলাইট দেখা যাচ্ছে।

'খুশী মনে থেকো', বললাম জর্জ'কে, 'অবশ্যই আমরা অমর হয়ে থাকবো।'

'আর তুমিও ভালো থেকো', ধরা গলায় বললো জর্জ', 'কতবারই না মৃত্যুর শিয়র থেকে ফিরে এসেছো তুমি, তাই বাঁচতে তো তোমাকে হবেই।'

'সে তো নিশ্চয়ই। ভাবাবেগে আপ্লুত কণ্ঠস্বর আমার, 'অন্তত যারা বাঁচতে পারেনি, তাদের জন্যে তো বটে, কি বলো?'

'ওসব বাজে কথা এখন রাখো তো।' ধমক দিয়ে উঠলো জর্জ', 'বাঁচতে যদি হয়, নিজের জন্যেই বাঁচবে তুমি।'

ট্রেনটা আসতেই উঠে বসলাম একটা জানালার ধারে। দেখলাম জর্জে'র চোখে জল চিকচিক করছে। কান্নাস্বরে বললো সে, 'কারোর কাছ থেকে চলে যাওয়া মানেই চির দিনের মতো তাকে হারানো নয়, কি বলো?'

'না, হারাবার কথা বোকারাই ভাবে শুধু', আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, 'তবে কি জানো জর্জ', শেষ পর্যন্ত সব কিছু হারাতে হয় বলেই কি মানুষ জয়ের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে থাকে?'

'জয়? সে কিসের জয় বন্ধু?'

ট্রেনটা তখন ছেড়ে দিয়েছিল। জর্জে'র হাতটা চেপে ধরলাম শক্ত করে। সেদিন রাতে মারামারির সময় ওর হাতটা কেটে গিয়েছিল, এখনো সেই ক্ষতটা সারেনি। ওর সেই ক্ষতের ওপর হাত বুলোতে থাকি, বেশীক্ষণ ওর হাতটা ধরে থাকতে পারলাম না। ট্রেনটা হঠাৎ জোরে চলতে শুরু করতেই আমার মুঠি থেকে ওর হাতটা বেরিয়ে গেলো। হঠাৎ মনে হলো ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে, আজই প্রথম দেখলাম, ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে, ওর সারা মুখ ছেয়ে আছে বিষাদে আর বিবর্ণতায়। একটু পরে জর্জ' আমার দৃষ্টির আড়াল হতেই আমি তখন জানালা পথে আকাশের দিকে তাকালাম— সেখানে শুধু এখন ধাবমান আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

পরে ওদের কারোর সঙ্গেই আমার আর দেখা হয়নি। কতো দিন ভেবেছি যাবো ওদের কাছে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তবে আমার ফেলে যাওয়া শহরে একদিন ফিরেছিলাম, সে অনেক পরে, তখন সব শেষ হয়ে গেছে, আমার দেখা শহরটা তখন ভগ্নস্তূপে পরিণত।

জর্জ' রুল মারা গেছে। বিধবা কোনরসমান শেষ পর্যন্ত জর্জ' আর লিসার গোপন সম্পর্ক'টা ধরে ফেলেছিল। দশ বছর পরে ১৯০৪ সালে ওয়াটজেক যখন ফুয়েরারের বিশেষ পুলিশবাহিনীতে চাকরী করতো, তখন ওই শয়তানী বুড়িটা তার কানে খবরটা পেঁাছে দেয়। বছর পাঁচেক আগে লিসাকে ডিভোর্স' করা সত্বেও প্রতিশোধ নেবার জন্যে জর্জ'কে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল ওয়াটজেক। সেখানে বন্দী অবস্থাতেই কয়েক মাস পরে জর্জে'র মৃত্যু হয়।

হাইনরিখ বুদ্ধিমান। ঠিক সময়ে ও গা ঢাকা দিয়েছিল বলে, এখন সে বেশ ভালো ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে।

মেজর ভোকেনস্টেইন ছিলো ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা। তাই আজ সে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন হোমরা চোমরা অফিসার। বিশপের প্রতিনিধি বোদেন-দিয়েক আর ডাঃ ওয়েরনিক পাগলাগারদে কিছু ইহুদীদের পাগল সাজিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল বলে বোদেনদিয়েককে একটা ছোট্ট গ্রামের গীর্জায় বদলী করে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই, কারণ খোদ বিশপই ইহুদী হত্যা করাকে পবিত্র কর্ম বলে মত প্রকাশ করায় তাঁকে সরকারী খেতাব দেওয়া হয়। আর ডাঃ ওয়েনরিক ইহুদীদের বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই ১৯৪৪ সালে তিনি নিহত হন। উইলির মৃত্যু হয় ১৯৪২-এ। অটো বামবাস মারা যায় ১৯৪৫ সালে, আর কার্ল ব্রিল ১৯৪৪-এ। লিসা আর জর্জের মার মৃত্যু হয় বোমার আঘাতে ১৯৪৩-এ।

অস্কার যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবর দেবার দায়িত্ব পেয়েছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে এখন হাইনরিখ ক্রলের সঙ্গে ব্যবসা জমিয়ে বসেছে দারুন ভাবে। আমি চলে যাবার তিন মাস পরেই সার্জেন্ট মেজর নোপক গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। আর তাঁর স্ত্রী সবাইকে অবাক করে দিয়ে কফিন মিস্ত্রী উইলীকিকে বিয়ে করে। দুজনেই এখন বেশ সুখে শান্তিতে ঘর করছে।

যুদ্ধের সময় ওরারদেনব্রুক শহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বোমার আঘাতে। একটা বাড়িও আস্ত ছিলো না। এখন সেখানে নতুন করে শহর গড়ে উঠেছে। এখন এই নতুন শহরটাকে দেখলে আগের শহরের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। যৌবনে ফেলে আসা কেউ যদি তার চেনা শহর দেখতে আসে, তবে তাকে আগেকার শহরের ছবির পোষ্টকার্ড কিনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শুধু সেই পাগলাগারদটা আজও অক্ষত রয়ে গেছে, শহর থেকে একটু দূরে ছিলো বলেই বোধহয়। আজও সেখানে তেমনি ভীড়। বিশেষ করে যুদ্ধের পরে মানুষ আর তাদের ভারসাম্য রাখতে পারছে না।

থ্রী কমরেডস

□ এক □

ঘড়ির দিকে তাকালাম—আটটা বাজতে দেরী ছিলো, আরো মিনিট পনের অপেক্ষা করা যেতো। তবু গেট খুলে পেট্রল পাম্প গুছিয়ে রাখলাম। সাত-সকালেও দু-একখানা গাড়ি তেল নিতে আসে। হঠাৎ পেছন থেকে বহু পুরোনো মেশিন চালু হওয়ার যান্ত্রিক শব্দের মতো কর্কশ শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। আর শব্দটা যেন মাটির নিচ থেকে আসছে। কারখানা ঘরের দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলতেই চমকে উঠতে হলো—আরে, ওটা কি ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে? ভূত নাকি! পরণে হাঁটু ছুঁই ছুঁই স্কার্ট, নীল রঙের আলগা আলখাল্লা। বিরাট দেহ, কম করেও চোদ্দ স্টোন ওজন তো হবেই। ভালো করে দেখতেই চিনতে পারলাম—এ যে আমাদেরই পরিচারিকা ম্যাটিলডা স্টস।

হিপোপটেমাসের একটা মিনি সংস্করণের কান্ডকারখানা দেখছিলাম। দরাজ গলায় যুদ্ধের গান গাইছিল সে তখন। জানালার ধারে বেঞ্চের ওপর দুটি কোনিয়াকের বোতল, একটিতে সামান্য একটু তলানি পড়ে রয়েছে। কাল রাতে দুটিই ভর্তি ছিলো, বাক্সবন্দী করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

রীতিমতো ঝাঁঝালো গলায় হাঁক দিলাম, 'এ সব কি হচ্ছে ফ্রাউ স্টস?' সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেলো। তার হাত থেকে ঝাঁটাটা খসে পড়লো, তার মুখের সেই মিষ্টি হাসিটি এবার উধাও হয়ে গেলো নিমেষে।

'এই ভোর সকালে আপনি যে আসবেন ভাবতেই পারিনি', এবার সে নিজেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলো।

'ও কথা রাখো। তা মদের স্বাদটা কেমন লাগলো? পা দুটো যেভাবে টলছে, মনে তো হচ্ছে আকণ্ঠ গিলেছো।'

'তা আর বলতে, দারুণ লাগলো হের লোকাম্প। প্রথমে নাকের কাছে বোতলটা নিয়ে গিয়ে একটু শুকলাম, তারপর কি যে খেয়াল চাপলো মাথায়, প্রায় পুরো বোতলটাই শেষ করে ফেললাম। শয়তান মাথায় চাপলে যা হয় আর কি। তবে হাতের কাছে ভালো মদের বোতল খুলে রেখে এই বুড়ো বয়সে আপনিই বা কেন আমাকে লোভ দেখাতে গেলেন বলুন?'

হ্যাঁ, কোনিয়াকের বোতলটা রেখে ভালো বোতলটাই শেষ করেছে বুড়িটা। অথচ এই ভালো বোতলটা হের কোষ্টার নিজের জন্যই কিনেছিলেন।

'দেখলেন তো হের লোকাম্প, ভালো মাল চিনতে আমার ভুল হয় না!' দাঁত বার করে হাসলো ফ্রাউ। 'তবে তাই বলে যেন বলে দেবেন না, আমি বড্ড গরীব, তার ওপর বিধবা।'

'না, এবার আর তোমায় ছাড়া হচ্ছে না।'

'ওরে বাবা, তাহলে আমি চললাম। খবর পেয়ে হের কোষ্টার এসে আমাকে ধরলে আর রক্ষে নেই—' পালাতে যায় সে।

ওকে থামিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা চৌকো বোতল বার করে তার নাম ধরে ডাকলাম, 'ম্যাটিলডা?'

বৃদ্ধা এবার চোখ কপালে তুলে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, 'বিশ্বাস করুন হের লোকাম্প, ওটা আমি চোখেও দেখিনি এর আগে।'

গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললাম, 'চলবে নাকি? এ একেবারে জামইকার খাঁটি রাম। এক গ্লাস চলবে নাকি?'

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না হের লোকাম্প? একেই একটা ভালো বোতল প্রায় শেষ করে ফেলেছি। এর পরেও রাম খেলে আমাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবেন না।'

'তাই নাকি—বলে নিজেই আমি গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিলাম, আচমকা গ্লাসটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো সে, 'আদর করে দিচ্ছেন যখন খেয়ে নিই, যা থাকে কপালে। আপনার অসীম দয়া, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। তা আজ আপনার জন্মদিন নাকি হের লোকাম্প?'

'হ্যা, তোমার অনুমানটা ঠিকই ম্যাটিলডা!'

'সত্যিই কি তাই? আপনার একশো বছর পরমায়ু হোক। খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। দিন, আর এক গ্লাস দিন, আপনার জন্মদিন ভালো করেই পালন করা যাক, কি বলেন? আপনাকে আমার ছেলের মতোই মনে করি—'

'বেশ তো!' আর এক গ্লাস মদ খেয়ে বৃদ্ধা আমার গুণগান গাইতে গাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। টেবিলের সামনে এসে বসলাম অতঃপর। ভোরের সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে অবাক লাগছিল—একটা নতুন দিনের সঙ্গে আজ আবার জন্মদিন। কিন্তু আজ আর এই দিনটার কোনো আকর্ষণই নেই আমার কাছে—তিরিশটা বসন্ত পার হয়ে এসেছি আজ আমি। কিন্তু একদিন ভয়ংকর আগ্রহ নিয়ে ভাবতাম, বুঝি কুড়ি বছর আর হবে না, সে অনেক, অনেক দূরে।

ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিমন্থন করতে থাকলাম। ছেলেবেলার ইস্কুলের জীবনের কোনো অস্তিত্বই আজ আর নেই—সে এক আলাদা জগৎ, আলাদা জীবন যেন। আর সত্যিকারের জীবন শুরু হয়েছে আবার ১৯১৬ সাল থেকে। বয়স তখন আঠারো, সবে তখন যোগ দিয়েছি সেনাবাহিনীতে। মনে পড়ে সেই বদমাস

সার্জেণ্ট মেজরের কথা। ব্যারাকের পেছনে চাষের জমিতে কাদামাটির মধ্যে প্যারেড করাতো। একদিন হলো কি আমার কিডব্যাগটা ঠিকমতো গোছাতে পারিনি, সেই অপরাধের শাস্তির হুকুম হলো, নিজের হাতে পায়খানা সাফ করতে হবে। মা এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমার কষ্ট লাঘব করবার জন্যে তিনি আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু সে অনুমতি দেওয়া হলো না তাঁকে। অনেক কাঁদলেন। একসময় আমার কাজকর্ম সেরে যখন মা'র কাছে এলাম, তখন আমি এতই ক্লান্ত যে, মায়ের কোলে মাথা রাখা মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তারপর ১৯১৭ সাল—ফ্ল্যাণ্ডার্স। মিটেনডর্ফ আর আমি ক্যাণ্টিন থেকে এক বোতল মদ কিনে এনে আয়াস করে খাবো ভাবছি যখন, ঠিক তখনি ইংরেজদের গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। মদ আর খাওয়া হলো না। দুপুরে কোষ্টার আহত হলো বোমার আঘাতে। বিকেলে মেয়ার ও ডেটার্স দুজনেই মারা গেলো। সন্ধ্যার পরে ভাবলাম, এবার মদ খাওয়া যেতে পারে। ভেবে সবে বোতলের ছিপি খুলতে যাচ্ছি, সেই সময়ে খবর এলো, শত্রুপক্ষ গ্যাস ছেড়েছে। নিমেষে সারা ট্রেঞ্চ সেই গ্যাসে ভর্তি হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে যার মাস্ক পরে নিলাম। কিন্তু মিটেনডর্ফের মাস্কটাতে খুঁত থাকার দরুণ তার নাকে মুখে গ্যাস ঢুকে গেলো। পরদিন সকালে মারা যায় সে।

পরের বছর ১৯১৮—আমি তখন হাসপাতালে। সাংঘাতিক ভাবে আহত সব রোগীদের কাতরানি। আমার পাশের বেডেই ছিলো জোসেফ ষ্টোল। ওর দুটো পা-ই উড়ে গেছে, ও জানে না। কাল রাতে দুটি তরুণ মারা গেছে আমাদের ঘরেই। একটি ছেলে তো খুবই কষ্ট পেয়ে মারা গেছে, তার প্রাণটা যেন বেরোতেই চাইছিল না।

১৯১৯ সাল। আমি তখন বাড়িতে ফিরে এসেছি। দেশ তখন বিপ্লবে মেতে উঠেছে। প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। সেনাবাহিনীর মধ্যে গণ্ডগোল—নিজেদের মধ্যেই তখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে—যাকে বলে গৃহযুদ্ধ। ১৯২০ সাল—বিপ্লবের চেষ্টা করতে গিয়ে কার্ল ব্রোগার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। কোষ্টার ও লেনতস গ্রেপ্তার হয়েছে। আর ওদিকে আমার মা হাসপাতালে, ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে। তারপর ১৯২১ সাল……কিন্তু এই বছরটা মনে পড়ছে না, ওই বছরটা যেন জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। ১৯২২—থুরিঙ্গিয়াতে রেল-মিস্ত্রির কাজে কেটে যায়। ১৯২৩—এক রাবার ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের কাজ করি। সেটা মুদ্রাস্ফীতির বছর ছিলো—সে কি টাকার ছড়াছড়ি। এক এক দিনে দুশো মিলিয়ন মার্ক রোজগার করেছি। তখন দিনে দুবার বেতন হতো। বেতন পেয়েই লোক ছুটতো বাজারে—প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ কিনে রাখতো লোকে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডলারের দাম বেড়ে যেতো, পরবর্তী ডলার বিনিময়ের হার বেরোবার আগেই তাই কেনাকাটা শেষ

করে ফেলা চাই, যদি মার্কের দাম অর্ধেক হয়ে যায়।

এরপরের কয়েকটা বছরের ঘটনা আর মনে পড়ছে না। গত বছর এই জন্মদিনে কাফে ইণ্টারন্যাশনালে কোণ্টার আর লেনতস-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আমি ছিলাম ওখানকার পিয়ানো বাজিয়ে। তারপর থেকেই কোণ্টার এ্যাণ্ড কোম্পানীর মোটর মেরামতের কারখানায় আছি। ওই কোম্পানীর ষোলো আনা মালিকই কোণ্টার। স্কুলে সে ছিলো আমাদের সহপাঠী, আর আর্মি'তে আমাদের দলের ক্যাপ্টেন ছিলো এখানে বেশ ভালোই আছি বলতে হবে। দিব্যি ভালো স্বাস্থ্য বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছি। হঠাৎ অতীতের বেদনা বিদুর স্মৃতি মনটাকে খারাপ করে দেয়—ওসব কথা না ভাবাই ভালো। মনটাকে বদলাতে হাতের কাছে একটা জিন-এর বোতল রেখে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গেট খোলার শব্দ হতেই ত্রস্ত হাতে অতীতের স্মৃতি লেখা কাগজটাকে ছিঁড়ে ওয়েষ্টপেপার বক্সে ফেলে দিলাম। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো গটফ্রিড লেনতস। রোগা বলে একটু যেন বেশী লম্বা দেখাচ্ছে তাকে, মাথা ভর্তি সোনালী চুল। চেহারার সঙ্গে তার নাকের কোনো মিল নেই, যেন অন্য কারোর। আমাকে দেখেই চীৎকার করে উঠলো সে, 'বোকার মতো বসে আছ কেন? উঠে দাঁড়াও, দেখছো না, তোমার বস তোমার সামনে দাঁড়িয়ে?' বলে হেসে উঠলো সে। তারপর টেবিলের উপরে একটা প্যাকেট নামিয়ে রাখলো, ভেতর থেকে কাঁচের ঠুনঠুন আওয়াজ উঠলো। ওকে অনুসরণ করে কোণ্টারও এসে ঢুকলো। আমার কাছ ঘেঁষে এসে গটফ্রিড বললো, 'আচ্ছা, আজ সকালে সবার আগে তোর কি নজরে পড়েছিল বলো তো?'

'এক বৃদ্ধাকে নাচতে দেখেছি!'

'তাই নাকি? তাহলে দেখছি, লক্ষণটা তোমার কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! জানো ববি, তোমার কোষ্ঠীতে দেখছি, ধনু রাশিতে তোমার জন্ম, আর সেই কারণেই তুমি অতো দুর্বলচিত্ত, তোমার ওপর নির্ভর করা যায় না। শনির অবস্থানটাও খারাপ, সঙ্গে আবার বৃহস্পতিও রয়েছে দেখছি। এ বছরে তোমার ভাল আশা করা যাচ্ছে না। তোমার স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে আমি আর কোণ্টার বলি কি জানো, এই মাদুলিটা তোমার ধারণ করা উচিত। এটা কোথায় পেয়েছি জানো? পেরুর সেই বিখ্যাত ইনকা বংশোদ্ভূত এক নারীর কাছ থেকে। সেই নারীর দৈবশক্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে এই মহামূল্যবান জিনিষটি পেয়েছি তার কাছ থেকে। আর সেটিই আজ তোমাকে দিচ্ছি। এতে তোমার ভবিষ্যত ভালো হবে, হয়তো বৃহস্পতির দশাও কেটে যেতে পারে।' কথা শেষ করে সরু চেন-এ বাঁধা একটা কালো মূর্তি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললো সে, 'এতে তো তোমার বড় বড় আপদ বিপদ

কাটাবার ব্যবস্থা হলো। এবার এই নাও ছয় বোতল রাম-এর এই প্যাকেটটা। অটোর দেওয়া বাছাই করা মাল। এর প্রতিটি ফোঁটায় বয়স তোমার বয়সের দ্বিগুন হবে।'

প্যাকেটটা খুলে এক এক করে ছয়টি বোতল টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখলো সে। সূর্যের আলোয় বোতলগুলি অ্যাম্বারের মতো চিকচিক করছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমি বললাম, 'দারুণ দেখাচ্ছে। কিন্তু অটো, এসব তুমি কোথায় পেলে ভাই?'

'সে অনেক কথা। এখন ওসব থাক। আগে বলো, কেমন লাগছে? সত্যি কি বয়েস তিরিশ বলে মনে হচ্ছে?' মৃদু হেসে বললো কোষ্টার।

'না', মাথা নেড়ে বললাম, 'একবার মনে হচ্ছে ষোলো, আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে পঞ্চাশ, কাঠে ঘুণ লাগলে যেমন হয়······

লেনতস বললো, 'এ তুমি কি বলছো হে! আমি তো এর মধ্যে বেশ মজা উপভোগ করছি। ষোলো আর পঞ্চাশ বয়েসকে দারুণ জব্দ করেছো! একই সঙ্গে দু দুটো জীবন যাপন করছো তুমি? অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'ব্যাস, এই পর্যন্তই থাক, ওকে আর খুঁচিও না গটফ্রিড। জন্মদিনে বিশেষ করে সকালে মানুষ খুবই আত্মাভিমানী হয়ে ওঠে', বললো কোষ্টার। এখন থাক, একটু বেলা হতে দাও, দেখবে তখন আপনা থেকেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ও।'

'নিজের কথা যে যতো কম ভাবে, সে ততো ভালো', লেনতস বললো, কি বলো বব, ঠিক কিনা?'

'না, তা নয় একেবারেই। আমার মতে ভালো মানুষরাই ভালোর মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করে থাকে। আর সেই চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

'অপূর্ব! অপূর্ব'। বন্ধু অটো, ও যখন এতো সব তত্ত্বকথা আওড়াতে শুরু করেছে, ওর বিপদ কেটে গেছে, জন্মদিনের আসল সংকট মুহূর্তটা ও কাটিয়ে উঠেছে। এ সময় সব মানুষকেও একবার অন্তত নিজের মুখোমুখি হতে হয়, ওর এখন সেই অবস্থা। ও বুঝে গেছে, আসলে জীবনটা কিছুই নয়। তবে ওসব তত্ত্বকথা থাক, এসো এখন নিশ্চিন্তে আমাদের কাজটা শুরু করা যাক।' সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কাজ করে রাম-এর বোতলগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেনতাস বললো, 'আচ্ছা অটো, একটা বোতলের ছিপি খুলে দেখলে হতো না?'

কথা শেষ করেই একটা বোতলের ছিপি খুলতেই একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে ঘরটা ম' ম' করে উঠলো। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো গটফ্রিড, 'আহা কি ঘ্রাণ! যেন এ এক স্বর্গীয় পরিবেশ।' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'সত্যি অটো, এ এক অতুলনীয়। একমাত্র কবিরাই এর প্রকৃত বর্ণনা দিতে পারে, আমাদের মুখে

মানায় না।'

'আর তাই তো বলছি, ঘরে বসে এর ঠিক কদর করা যায় না', আমার কথায় জের টেনে এবার লেনতস বলে উঠলো, 'চলো, শহরের বাইরে কোথায় প্রাকৃতিক পরিবেশে নীল আকাশের নীচে বসে এর সদ্ব্যবহার করা যাক। কি বলো তোমরা?

সে তো ভালোই হয়। মনে মনে ভাবলাম আমরা। আর আমাদের বাহন হলো একটা চার-চাকাওয়ালা অদ্ভুত যন্ত্র—কোষ্টারের রেসিং কার। কারখানার সবচেয়ে বড় গর্বের সেটা। নাম মাত্র দামে সৃষ্টিছাড়া দেখতে এই পুরনো মোটরযন্ত্রটা কোষ্টার নিলামে কিনেছিল। গাড়ির কারবারীরা তখন হেসে বলেছিল, মালটা দেখার মতোই বটে, তা মিউজিয়ামে রাখার মতোই জিনিষ। মেয়েদের পোষাক বিক্রেতা বলউইজ পরামর্শ দিয়েছিল, ওটার খোলনলচে বদলে দিব্যি একটা সেলাই-এর কল বানিয়ে নেওয়া যায়। তাতেও বিন্দুমাত্র দমবার পাত্র নয় কোষ্টার। নীরবে মাসের পর মাস রাত জেগে এই গাড়ির পেছনে খেটেছে। তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের নিয়মিত সন্ধ্যার আসর একটা পানশালায় নতুন সাজে সেই পুরনো গাড়িটা নিয়ে এসে হাজির। বলউইজ তো গাড়ির চেহারা দেখে হেসে খুন। সত্যি গাড়ির চেহারাটা দেখলে না হেসে থাকা যায় না। রগড় করবার জন্যে অটোকে রেস-এ আহ্বান জানালো তার সদ্য কেনা নতুন গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে অটোও রাজি হয়ে গেলো। ঠিক হলো, যে জিতবে অপরপক্ষ হাজার মার্ক দেবে। বলউইজ তো ওর প্রস্তাব শুনে পাগল ঠাওরালো ওকে। বলে কি অটো? ওই ঝরঝরে গাড়িটা নিয়ে বাড়ি লড়তে চায় ও নতুন গাড়ির সঙ্গে? যাইহোক ওরা দুজনেই বাজি মাত করতে বেরিয়ে পড়লো তখন রাস্তায়।

ফিরে এসে বলউইজের মুখ দেখে মনে হলো যেন সে বাজীমাত করে এসেছে। কিন্তু তাকেই হাজার মার্কের একটা চেক কেটে বাজির টাকা দিতে দেখা গেলো অটোকে। শুধু তাই নয়, আর একটা চেক কেটে অটোর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললো, 'ওই গাড়িটা আমার চাই।' চেক ফিরিয়ে দিতে গিয়ে কোষ্টার বলেছিল, 'না, লাখ টাকা দিলেও ওই গাড়ি আমি তোমাকে দিচ্ছি না।' ওটা দেখতে ভাঙ্গা ঝরঝরে গাড়ি হলে হবে কি, ভেতরের ইঞ্জিনটা একেবারে নতুন ঝকঝকে, তকতকে। গাড়ির বডিটা আমরা বদলে দিতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই বেছে বেছে একটা পুরনো ঝরঝরে গাড়ির খোল ওর গায়ে বসিয়ে নিয়েছিলাম লোককে চমক দেবার জন্যে। ওর নাম রেখেছিলাম—কার্ল, চলমান ভূতও বলা যেতে পারে।

সেই চলমান ভূতুড়ে গাড়িতে চেপে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাম-এর বোতল সঙ্গে নিয়ে। পাগলা কুকুরের মতো রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে, ভূতের মতো দেখতে কার্ল তখন ছুটে চলেছে। আনাদের পেছনে বিরাট একটা বুইক গাড়ি ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে আসছিল। আমি তখন অটোকে বললাম, 'ওটাকে একটু ভড়কে দাও

তো বন্ধু।' বলতে বলতেই বুইক গাড়িটা আমাদের ধরে ফেললো। ঝকঝকে তকতকে বিরাট বুইক আর ঝরঝরে দেখতে আমাদের কার্ল তখন পাশাপাশি দুই বন্ধুর মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটে চলেছে। বুইক গাড়ির চালক আমাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে পরক্ষণেই অবজ্ঞার চোখে তাকালো কার্লের কিম্ভূতকিমাকার চেহারাটার দিকে। নেংটি ইঁদুরের শখ হয়েছে ধেড়ে ইঁদুরের সঙ্গে পাল্লা দিতে, এমনি মুখের ভাব দেখিয়ে সে এবার আপন মনে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে চালাতে থাকলো। সে তখন ভুলেই গেলো আমাদের অস্তিত্বের কথা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমাদের দিকে ফিরে না তাকিয়ে থাকতে পারলো না সে। আর তখনি সেই প্রথম চমকে উঠলো সে, কার্ল ঠিক তার বুইকের সঙ্গে সমান তাল দিয়ে ছুটে চলেছে। এবার সে অবাক চোখে তাকালো আমাদের দিকে, তার চোখে অজানা কৌতূহল। তারপর এ্যাক্সিলেটার চেপে তার গাড়ির গতি দিলো বাড়িয়ে—সত্তর, আশি, একশো কিলোমিটার……ধাপে ধাপে তার গাড়ির গতি বাড়তে থাকে। আমাদের কার্লও মোটেই দমবার পাত্র নয়। সে-ও ঠিক সমান তালে ছুটে চলেছে, পাশাপাশি দুটো রেডিয়েটার। ছোট্ট একটা টেরিয়ার কুকুর যেন একটা বিরাট ডালকুত্তার সঙ্গে একই গতিতে ছুটে চলেছে। এক সময়ে ঝকঝকে পালিশ করা বিরাট বুইককে পেছনে ফেলে ছোট্ট পুরনো ঝরঝরে কার্ল মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেলো সামনে ধুলোকাদা মাখা মাডগার্ডে খটাখট শব্দ তুলে। কার্ল তখন চ্যাংড়া ছোঁড়ার মতো বুক ফুলিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠলো লেনতস, 'সাবাস অটো, সাবাস। বেচারা! আজ রাতে ওই লোকটার আহারে আর রুচি থাকবে বলে মনে হয় না।'

একটু পরেই আমাদের গাড়ি এসে থামলো ছোট্ট একটা সরাইখানার সামনে। কিন্তু তখনো বুইকের পাত্তা নেই। চমৎকার একটি সন্ধ্যা। এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল সেখানে। নীল আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ, ফ্লেমিংগো পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে, তারই আড়ালে কাস্তের মতো এক চিলতে চাঁদ উঁকি মারছে। নতুন পাতা গজানোর আভাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা হিজেল গাছ, সন্ধ্যার আলো আঁধারির মধ্যে স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছিল সেটা। ওদিকে সরাইখানা থেকে রান্নার ঘ্রাণ ভেসে আসছে—ভাজা মেটুলির গন্ধ, রসুন পেঁয়াজের গন্ধ। আঃ গন্ধ শুঁকেই যেন পেট ভরে যায়, মন তৃপ্ত হয়।

সেই বিরাট বুইক গাড়িটা এতক্ষণে এসে পৌঁছলো, একটা যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। গাড়ির আরোহী বেরিয়ে এলো। পরণে উটের লোমে তৈরী বাদামী রঙের কোট। হাত থেকে দস্তানা খুলতে খুলতে বিরক্তির সঙ্গে আমাদের কার্লের দিকে তাকালো। তারপর কোষ্টারের সমনে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের এই অদ্ভুত ধরণের বাহনটা গাড়ি নাকি?' লোকটা

আমাদের মোটর মেকানিক ভেবে থাকবে। নির্বিকার ভাবে তার দিকে তাকালো অটো। 'আপনি আমাকে কিছু বললেন নাকি?' ভদ্রলোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এভাবে বললো অটো।

নিমেষে লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠলো। তবে স্বভাব বদলালো না। আগের মতোই কর্কশ গলায় বললো, 'হ্যাঁ, ওই গাড়িটার খোঁজ নিচ্ছিলাম।'

লেনতাস তখন রাগে ফুলছিল। কেউ অভদ্র ব্যবহার করে পার পেয়ে যাক, তা সে কখনোই চায় না। এবার লোকটাকে মোক্ষম শিক্ষা দিতে হবে ভেবে চিৎকার করতে যাবে সে, ঠিক তখনি যেন কোন অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় গাড়ির আর একটা দরজা খুলে প্রথমে একজোড়া পা মাটিতে পড়তে দেখা গেলো। তারপরেই জীবন্ত একটা মেয়েকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখা গেলো। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকেই এগিয়ে এলো সে।

আমরা তো রীতিমতো অবাক—গাড়ির ভেতরে আরো একজন আরোহিনী যে ছিলো, আমরা টেরই পাইনি। মুহূর্তে লেনতসের ভাবভঙ্গি কি রকম বদলে গেলো। তার মুখে হাসি এখন কেন যে ফুটে উঠলো, ভগবানই জানেন।

লোকটা দারুণ অপ্রস্তুত। কি বলবে ভেবে না পেয়ে শেষে নিজের নামটাই অযাচিত ভাবে উচ্চারণ করে ফেললো—'বিনডিং আমার নাম।' মেয়েটি তখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে দারুণ আগ্রহী তখন। তাই কোষ্টারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো লেনতস, 'ওঁদের একবার গাড়িটা দেখিয়ে দাও না অটো।'

মৃদু হেসে অটো বললো, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' বিনডিং গলার স্বর নরম করে বললো, 'দারুণ স্পীড আপনাদের গাড়ির। আমাকে তো গো হারাণ হারিয়ে দিলো।'

ওরা দুজনে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইলো। আর আমরাও আমাদের জায়গা থেকে এক চুলও নড়লাম না। মেয়েটি বেশ দেখতে, রোগা ছিপছিপে চেহারা। ভেবেছিলাম সুযোগ নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলবে গটফ্রিড, সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে প্রায় মোরগের মতো ঘেঁষাঘেষি করতে দেখেছি। কিন্তু সেই লেনতস আজ একেবারে ব্রহ্মচারী সেজে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। শেষে আমাকেই মুখ খুলতে হলো, 'আপনি যে গাড়িতে ছিলেন, আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি। আমাদের ব্যবহারটা ঠিক ভদ্রোচিত হয়নি, খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি শান্ত, গম্ভীর গলায় বললো, 'কেন আপনারা আবার অন্যায় করলেন কোথায়?'

'ঠিক অন্যায় নয়, তবে অমনটা আমাদের করা উচিত হয়নি। জানেন, আমাদের

ওই গাড়ির গতি ঘণ্টায় প্রায় দুশো কিলোমিটার।'

'বলেন কি, আমরা তো ভেবেছিলাম, খুব বেশী হলে ষাট-সত্তর, তার বেশী হবে না।' মেয়েটি অবাক হয়ে বললো, 'আর এও ভেবেছিলাম, আমাদের বুইক ওটার চাইতে কম করেও দ্বিগুণ বেগে ছুটতে পারবে।'

'হের বেনডিং নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছেন—'

'হয়েছেন বৈকি। তবে একবার না একবার হারতে তো হবেই।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন।'

আমরা সবাই আবার নীরব হলাম। আমি আড়চোখে মেয়েটির মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই আমাদের দুজনকে দুটি আস্ত উজবুক বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু কথা বলার মতো তেমন কিছু খুঁজে না পেয়েই তো আবোল তাবোল বকতে হলো আমাকে।

এক সময় কোণ্টার আর বিনডিং ফিরে এলো। মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপে বিনডিং এখন একেবারে অন্য মানুষ যেন, কোণ্টার যে একজন অভিজ্ঞ মোটর মেকানিক, সেটা বুঝতে পেরেই আমাদের প্রসঙ্গে তার ধারণা বদলাতে হয়েছে তাকে সে আমাদের নৈশভোজে আহ্বান করলো তাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজী হয়ে গিয়ে সবাই আমরা সেই সরাইখানায় ঢুকছি, একটু পিছিয়ে পড়ে চোখের ইশারায় মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো লেনতস, 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই অপারা বুড়িটাকে দেখেছিলে, তাই না? তা ওই মেয়েটি অমন দশটা ডাইনির ফাঁড়া কাটিয়ে দিতে পারে—' আমি ওকে বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম, 'পারলেই ভালো, কিন্তু নিজে চুপটি করে থেকে আমাকে দিয়ে শুধু শুধু বোকার মতো কয়েকটা কথা বলাতে গেলে কেন?'

হাসলো লেনতস। 'কতদিন আর নাবালক থাকবে বলো? এবার নিজে ডুব সাঁতার দিয়ে জলে ভাসতে শেখ।'

'আমার সব শেখা শেষ, নতুন করে শেখায় কিছু নেই আমার আর।'

আমরা ওদের অনুসরণ করে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। আমরা টেবিলে বসতেই হোটেলওয়ালি মেটুলি আর আলুভাজার প্লেট রেখে গেলো। সেই সঙ্গে এক বোতল রাই হুইস্কি।

ওদিকে বিনডিং তখন মুখর। তার কথাতেই জানা গেলো, মোটর গাড়ি ও তার কলকব্জা সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান, আমরা শুনে তো অবাক। সেই সঙ্গে মোটর রেসিং-এ তার জয়ী হওয়ার প্রচুর রেকর্ড শুনে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো। নাদুস নুদুস চেহারা লোকটার। মুখটা লাল টকটকে, চোখের ওপরে মোটা পুরু ভুরু। লোকটার মধ্যে একটা অহং ভাব আছে, নিজেই নিজের কথা জাহির করতে ভালোবাসে।

আর মেয়েটি বসেছিল আমার ও লেনতস-এর মাঝখানে। ওর পরনে ইংরিজি পোশাক। মাথা ভর্তি বাদামী রঙের রেশমী চুল। আমার দিকে ঝুঁকে বসেছিল ও। মুখটা একটু ফ্যাকাশে, তবে ওর বড় বড় চোখে অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস ছিলো। সব মিলিয়ে মেয়েটি দেখতে বেশ ভালোই বলতে হয়। ওর সেই রূপ দেখে লেনতস-এর ভেতরে আগুণ জ্বলছিল। অথচ একটু আগেও সে ছিলো এক অন্য মানুষ। একটু আগেও সে ছিলো একজন বোবা, যার মুখে একটা কথাও ছিলো না, সে-ই এখন অতি মুখর। ও আর বিনডিং দুজনে মিলে সান্ধ্য আসরটা মাতিয়ে রেখেছিল। আর আমি চুপ করে সব লক্ষ্য করছি।

হঠাৎ লেনতস মৃদু চিৎকার করে উঠলো, 'আরে, আমাদের সঙ্গে রাম রয়েছে, কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।' আমার দিকে ফিরে বললো সে, 'যাও বব, শীগগীর জন্মদিনের রাম নিয়ে এসো।'

'জন্মদিন!' অবাক চোখে তাকালো মেয়েটি। 'আপনাদের মধ্যে কার জন্ম-দিন আজ?'

'হ্যাঁ, আমারই জন্মদিন', উত্তরে আমি বললাম। তারপর রাম আনতে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসতে যাবো, মেয়েটি বললো, 'তাহলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন আপনি—' মেয়েটি ওর নরম হাতটা প্রসারিত করলো আমার দিকে। ওর উষ্ণ হাতের স্পর্শ আমার রক্ত চঞ্চল করে তুললো। সেই ভালো লাগা ভাবটা নিজে একা উপভোগ করবার জন্য রাম আনতে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দূরে দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করতে গিয়ে এই মুহূর্তে বাইরেটা এতো ভালো লাগছিল, ভেতরে রাত্রির অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু ওদিকে লেনতসের 'রাম', 'রাম' করে হাঁকডাক শুনে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গেল না।

রাম বিনডিং-এর ঠিক সহ্য হয় না। তার প্রমাণ পাওয়া গেলো দ্বিতীয় রাউন্ডে অনীহা প্রকাশ করাতে। টেবিল ছেড়ে সে যখন বাগানের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তার পা দুটো রীতিমতো টলছিল। বার-এ জিন নিতে এসে লেনতস বললো, 'মেয়েটি দারুণ চমৎকার কি বলো?'

'জানি না। তোমার মতো করে ওকে তো আমি খুঁটিয়ে দেখিনি।

আমার দিকে অনেকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে বললো সে, 'আচ্ছা, তোমার কি বয়স বাড়বে না? তোমার এই বেঁচে থাকার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেবে?' উত্তরে আমি বললাম, 'দেখো বন্ধু, তোমার মতো এ প্রশ্ন আমারও! কিন্তু আমি নিজেই যে সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি।'

'উত্তরটা আমার জানা, তবে এখনি দিচ্ছি না', হেসে উঠে বললো লেনতস, বরং তার আগে দেখি গিয়ে ওই নাদুস-নুদুস লোকটার সঙ্গে মেয়েটির কি সম্পর্ক।' বিনডিং-এর খোঁজে বাগানের দিকে চলে গেলো সে অতঃপর। খানিক বাদে দুজনেই

ফিরে এলো আবার বার-এ একজন আর একজনের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে। লেনতসের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, আশানুরূপ ফল মিলেছে। এমনিতেই সে বেশ দিলদার, তার ওপর মেজাজ খুশী থাকলে তো আর কথাই নেই। .তখন কে সামলায় ওকে? বাগানে ফিরে গিয়ে তারা দুজনে তাদের খুশির ভাবটা প্রকাশ করলো গানের মাধ্যমে। এদিকে মেয়েটি তখন বেমালুম ভুলে গেছে লেনতসকে।

আমরা তিনজনে সরাইখানার ঘরে বসে আছি। ওদের গানের সুর ভেসে আসছে নিস্তব্ধ সরাইখানায়। সব মিলিয়ে এই সময়টা ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার, এখন মনে হচ্ছে আমরা যেন আকাশে উড়ে যাচ্ছি রাতের অন্ধকারের বুক চিরে, অতীতের সুখ-দুঃখের কতো স্মৃতি পেছনে ফেলে। এ যেন এক অদ্ভূত অনুভূতি। আগে দেখেছি নদীর স্রোতের মতো বয়ে যেতে, নিবিড় তমসা থেকে বেরিয়ে এসে আবার কোনো তিমিরে মিলিয়ে যেতে। আর এখন মনে হচ্ছে এ যেন একটা ধীর-স্থির একটা হ্রদের মতো, জীবনের শান্ত প্রতিচ্ছবিটা বুকে আঁকড়ে পড়ে আছে। সকালে জীবনের অসমাপ্ত যে ছবিটা আমি এঁকেছিলাম, এখন মনে পড়ে গেলো। তখন কেন জানিনা মনটা ভীষণ দমে গিয়েছিল, এখন কিন্তু মনটা অনেক হাল্কা লাগছে। কোষ্টার জমিয়ে গল্প ফেঁদে বসেছে মেয়েটির সঙ্গে, ওদের কথায় কান দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো.না আমার। আমার তখন একটু নেশার ঘোর লেগেছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অভিযানের মোহে আমার মনটা রঙিন হয়ে উঠেছিল যেন।

লেনতস আর বিনডিং ফিরে এলো এক সময়ে। এবার বিদায়ের পালা। মেয়েটি গায়ে কোট চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে মৃদু হাসি। তবে কারোর উদ্দেশ্যে নয়, বুঝলাম ওকে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। তবে লেনতসের খোশ মেজাজের কারনটা সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম বিনডিং-এর দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে। তার চোখ দুটি চেরি ফুলের মতো টকটকে লাল। চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ঘোলাটে। আমি তাই মেয়েটিকে বললাম, 'এ অবস্থায় উনি কি ঠিকমতো গাড়ি চালাতে পারবেন? নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে আমরা কেউ না হয় আপনার সঙ্গে যেতে পারি।'

'না, তার আর দরকার হবে না।' পাউডারের কৌটোর ঢাকনা খুলতে গিয়ে মেয়েটি ববলো, 'পেটে একটু বেশী মদ পড়লে বরং ও ভালো গাড়ি চালায়।'

'ওঁকে একটু বেশী মদ খাওয়ানো হয়ে গেছে। দোষ আমারই বেশী। আমার ওই জন্মদিনের রামটাই সব মাটি করে দিয়েছে। তাই বলছিলাম কি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, 'আপনার ফোন নাম্বারটা জানতে পারলে কাল সকালে একবার ফোন করে জানতাম, আপনি ভালোভাবে বাড়ি পেঁছেছেন কিনা।'

মেয়েটি আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে হেসে উঠলো। তারপর গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললো, 'বেশ তো, আপনার যখন এতোই ইচ্ছে,

টেলিফোন করবেন, আমার ফোন নম্বর—ওয়েস্টান', ২৭৯৬।'

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমেই ওর ফোন নম্বরটা আমার নোটবুকে টুকে নিলাম আমি।

□ দুই □

পরের দিন রোববার অনেক বেলায় গায়ে রোদের আলো লাগাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গত দু'বছর এই বোর্ডিং-এ আছি। জায়গাটা আমার বেশ ভালো মানানসই। কাছেই শ্রমিক সভার আস্তানা, শান্তি সেনার ব্যারাক আর কাফে ইন্টারন্যাশনাল। আর বোর্ডিং হাউসের ঠিক সামনেই রয়েছে একটা পুরনো কবরখানা। অবশ্য এখন আর ওখানে বড় একটা কাউকে কবর দেওয়া হয় না, ওটা এখন জনসাধারনের পার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জায়গাটা নির্জন মফঃস্বলের মতো। কবরখানা থাকাতে বাড়ীউলি ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বাড়ি ভাড়ার ব্যবসাটা বেশ রমরমা। নতুন ভাড়াটে দেখলেই তার মুখের বুলি হলো : ঘরের পজিশনটা একবার দেখুন, এমন খোলামেলা ঘর কোথাও পাবেন না, চিরকাল ঠিক এমনটিই থাকবে। সামনে কবরখানায় আকাশ ছোঁয়া বাড়ি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

ছুটির আমেজ, কোনো তাড়া নেই। অলস ভঙ্গিতে পোশাক চাপিয়ে নিলাম গায়ে। কবরখানার গাছগুলি থেকে পাখির মিষ্টি সুর ভেসে আসছে, শুনতে বেশ ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগা ভাব নিয়ে ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে জিনিষপত্র বার করলাম—কিছু খুচরো পয়সা, একটা ছোট ছুরি, চাবির রিং আর সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে এক টুকরো কাগজও বেরিয়ে এলো। সেই টুকরো কাগজে মেয়েটির নাম ও ফোন নম্বর লেখা ছিলো। প্যাট্রিসিয়া হোলমান—বড় অদ্ভুত নাম,—প্যাট্রিসিয়া, এ নাম কচ্চিৎ শোনা যায়। ওই নামটা মনে হয় যেন কতদিন আগের শোনা, অথচ মাত্র গতকালই প্রথম ওই নামের একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মদের ওই এক অদ্ভুত নেশা। রাতটা প্রভাত হলেই আগের দিনে কোনো অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা মনে হয় যেন এক যুগ আগেকার ঘটনা। কতোই না ব্যবধান!

কাগজের টুকরোটা বইয়ের নিচে চাপা দিয়ে রাখলাম। গত রাতের সেই তাগিদটা আজ আর নেই। ভাবখানা এই যে, ফোন করলে হয়, আবার না করলেও

চলে। এখন অনেক শান্ত মনে হচ্ছে। এতদিন যা হাঙ্গামা গেলো। কোষ্টার সব সময়েই উপদেশ দিয়ে থাকে, শুধুশুধু হাঙ্গামা বাধিও না, কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবে, সংসারে কোনো কিছুকেই চিরদিনের জন্যে ধরে রাখা যায় না।

ওদিকে পাশের ঘরে রোজকার অভ্যাস মতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে। গত পাঁচ বছর ধরে ওরা দুজনে এখানকার ভাড়াটে। ওদের কোনো ছেলে-পুলে নেই। এর থেকে ভালো একটা ফ্ল্যাট আর একটি শিশু যদি থাকতো, মনে হয় ওদের জীবনটা অ-সুখের হতো না। কিন্তু ভালো ফ্ল্যাটের ভাড়ার টাকা কোথা থেকে পাবে সে? আর এই মাগ্গিগণ্ডার দিনে বাচ্চা? সে তো বিলাসিতা! কাজেই ওদের দুজনের মধ্যে নিত্য ঝগড়া তো লেগে থাকারই কথা! স্ত্রী ভীষণ বদমেজাজী। আর স্বামী বেচারা? বয়স পঁয়তাল্লিশ, সব সময় চাকরী চলে যাওয়ার ভয়ে তটস্থ। এই বয়েসে একবার চাকরী গেলে বাকী জীবনে নতুন চাকরীর আর আশা নেই।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তা আর হলো না। হুড়মুড় করে এসে আমার ঘরে ঢুকলো স্বামী বেচারা। সামান্য কেরাণী হলে হবে কি সে, কাজে দারুণ পাকা। আর স্বভাবে শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ সে। কিন্তু তা হলে হবে কি, এসব লোকের কপালে রুটি জোটে না। লোকটার নাম হেসি। একটা দুঃসংবাদ দিলো সে আমাকে, 'অফিসে গতকাল দুজনের জবাব হয়ে গেছে, এবার আমার পালা। সত্যি হয় কিনা দেখবেন।'

বেশ বোঝা যাচ্ছে, আসছে মাসের মাইনে হওয়ার দিন পর্যন্ত তাকে যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। তাকে জিন খেতে দিলাম। জিনের গ্লাসটা ধরতে গিয়ে তার হাতটা অসম্ভব কাঁপছিল, ওযে হঠাৎ একদিন পড়বে আর মরবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কষ্টের শেষ সীমায় এসে পেঁছেছে সে এখন। জিনে একবার চুমুক দিয়ে সে তার দুঃখের কথা বললো, 'এর ওপর দেখুন, বাড়িতে আবার সব সময়েই ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে—' ওদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাটিতে আমার মাথা গলানো ঠিক হবে না। তাই তার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে আমি তাকে বললাম, 'দেখো হেসি, আমাকে একটা জরুরী কাজে এখুনি একবার বেরোতে হবে। তবে তুমি এখানে যতোক্ষণ খুশী বসতে পারো। আর ওই পোশাকের আলমারিতে কোনিয়াকের বোতল আছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারো, তা না হলে রামও খেতে পারো, সেটাও আছে। আর এক কাজ করো, আজ বিকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় কিংবা যেখানে খুশি বেরিয়ে এসো, তাহলে দেখবে তোমার স্ত্রীর মেজাজ ভালো হয়ে গেছে, বুঝলে?' ওকে উৎসাহ দেবার জন্য ওর পিঠে হাত বুলোলাম, কিন্তু নিজেই যেন কোনো উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। তবু যন্ত্রের মতো বললাম, 'সিনেমা হলটা একটা

অদ্ভুত জায়গা জানো, ওখানে বসে থাকলে আর কিছু না হোক, পর্দায় নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃশ্য দেখে ওদের মতো স্বপ্নের জাল বোনা যায়, না হোক বাস্তবে তার রূপায়ন।'

ওদের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে ওর স্ত্রীকে কাঁদতে দেখলাম। ওদের পাশের ঘরে থাকে আরনা বোনিগ, প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করে কার যেন। মাইনে কম হলে হবে কি, ওর সাজগোজে একটুও কমতি নেই। সপ্তাহে একদিন ওর অফিসের সেই বসের চিঠি লিখতে হয় রাতভোর। পরদিন বাড়ি ফেরে বেচারী খিটখিটে মেজাজ নিয়ে। তবে রাতের দেহ মনের ধকল পুষিয়ে নেয় ও রোজ সন্ধ্যায় কোনো না কোনো নাচঘরে গিয়ে। ওর পুরুষ বন্ধু বলতে দুজন। একজন ওকে ভালোবেসে রোজ ফুল উপহার দেয়। আর অন্যজনকে নিজের থেকে ভালোবেসে তাকে টাকা যোগান দেয় ও। ওর পাশের ঘরটা কাউণ্ট অরলফের। গত যুদ্ধে অশ্বারোহী দলের ক্যাপ্টেন ছিলো সে। জাতে রাশিয়ান, দেশছাড়া। নানান কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে ওস্তাদ সে। এখন তার মেরী মাতার কাছে শুধু একটাই প্রার্থনা, কোনো ভালো একটা হোটেলে যেন তাকে একটা কেরানীর চাকরী জুটিয়ে দেন। আবার কখনো বা মদ খেয়ে বাচ্চা ছেলের মতো কান্না জুড়ে দেয় সে।

তার পাশের ঘরের বাসিন্দা অনাথ চিকিৎসালয়ের পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কা নার্স ফ্রাউ বেণ্ডার। বিধবা—গত যুদ্ধে স্বামী নিহত হয়। দুটি ছেলে ছিলো, অর্ধাহারে তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যায় ১৯১৮ সালে। এখন তার একমাত্র সঙ্গী বলতে একটা পোষা বিড়াল। তার পাশের ঘরে থাকে মুলার—লোকটি স্ট্যাম্প সংগ্রহের যেন এক জীবন্ত বিগ্রহ, ওই নিয়েই বেশ সুখে আছে।

ওদিকে একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরের দরজায় গিয়ে নক্ করলাম। দরজা খুলে দিতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজ-টাজ কিছু জুটলো জর্জ?' মাথা নাড়লো জর্জ—'না।' বেচারী। চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র। কলেজে পড়ার মধ্যেই মাঝে দু'বছর একটা খনিতে কাজ করে কিছু টাকা জমিয়েছিলো, সে টাকাও শেষ হবার উপক্রম এখন। মাঝে খবরের কাগজের হকারি করতে গিয়েছিল কয়েকবার। তিনদিন যেতে না যেতেই পুরনো দুই হকার ওকে বাধা দিয়ে ওকে লাইসেন্স দেখাতে বলে। ওর লাইসেন্স ছিলো না। ওরা তখন ওর হাত থেকে খবরের কাগজগুলো ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওকে ধমক দেয়, 'এ লাইনে আমরা পুরনো হকাররাই আজ বেকার, আমাদের মধ্যে তুমি নতুন এসে জুড়ে বসতে চাও? যাও, ভাগো এখান থেকে।' এর ফলে বেশ কয়েক মার্ক শুধু গচ্চাই দিতে হলো না, সেই সঙ্গে কিল চড় ও ঘুঁষিও হজম করতে হয় ওকে। এরপর অন্য রোজগারের পথে ও আর যায়নি। বিমর্ষ হয়ে ঘরে বসে থাকে। আর সারাক্ষণ পড়া নিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু

পরীক্ষায় পাস করলেই বা কি। চাকরীর জন্যে কম করেও দশটা বছর অপেক্ষা করতে হবে ওকে। ওকে পড়াশোনা আপাতত মুলতুবি রেখে আমার মতো বেরিয়ে পড়তে হবে ভালো চাকরীর সন্ধানে। কথাটা ওর মনঃপুত হলো না। ও বললো, 'খনির চাকরী করে দেখেছি তো, একবার পড়া ছাড়লে ফিরে আর মন বসানো যায় না।' 'বেশ, সেই ভালো জজ',' আমিও বললাম, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

এরপর কাফে ইণ্টারন্যাশনালের পথে পা বাড়ালাম। সামনে লম্বা একটা হলঘর, ধোঁয়ার মতো অন্ধকার থিক্‌থিক্‌ করছিল ভেতরটা। পিছনের দিকে লাইন করে কয়েকটা ঘর। মদ বিক্রীর কাউণ্টারের দরজার একপাশে একটা পিয়ানো—অকেজো হয়ে পড়ে আছে আজও। যন্ত্রটা আমার খুব প্রিয়, বাজাতাম আমি এক সময়ে। পিছনদিকের ঘরগুলোতে ভীড় করতো গোয়ালারা। আর দেহপসারিণীরা অপেক্ষা করতো ওদের জন্য দরজার সামনে বসে থেকে।

বার প্রায় শূন্য তখন। ওয়েটার এলয়স আমাকে দেখতে পেয়ে আমার মার্কামারা পোর্ট আর রাম মিশিয়ে রেখে গেলো আসার টেবিলে। এলয়স ফিরে গিয়ে গ্লাস ধুতে থাকে। হোটেলউলির পোষা বেড়ালটা ভাঙ্গা পিয়ানোর উপরে বসে মিউমিউ করছিল। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্তে ঘুমোবার মতো জায়গা এখন বারটা। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্যাচ করে আওয়াজ হলো দরজার। তারপরেই রোজা এসে ঢুকলো বারে। ও ওই কবরখানার কাছে থাকে, পেশা দেহ বিক্রীর। এখানে আসে খদ্দের যোগাড় করতে। প্রচণ্ড লোড নিতে পারে মেয়েটি। তাই ওকে সবাই লোহার ঘোড়া বলে থাকে। এখান থেকে ও যাবে বানডফে ওর মেয়েকে দেখতে।

'সুপ্রভাত রবার্ট।'

'সুপ্রভাত রোজা। তা তোমার মেয়ে কেমন আছে ?'

'এই তো এখান থেকে দেখতে যাবো ওকে। এই দেখো না, ওর জন্যে কেমন টুকটুকে লাল একটা পুতুল নিয়ে যাচ্ছি আজ। পেটটা টিপলেই কেমন 'মা-মা' বলে ডেকে ওঠে।'

'আশ্চর্য। ভারি সুন্দর তো।'

আমার প্রশংসা শুনে রোজা খুব খুশি। আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো ও, 'তুমি দেখছি প্রকৃত সমঝদার লোক, ভালো জিনিষের কদর বোঝো। এই আমি বলে রাখলাম, দেখো তুমি একদিন আদর্শ বাপ হবে।'

'তাই বুঝি।' আমি বললাম, 'তোমার এই ভবিষ্যৎবাণী মনে রাখবো।'

বেচারী রোজা! দারুণ ভালোবাসে ও ওর মেয়েকে। এই তিন মাস আগেও, মেয়েটি হাঁটা না শেখা পর্যন্ত নিজের কাছেই রেখেছিল তাকে ও। কিন্তু খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্যে তারা ওর ঘরে এলে ও তখন মেয়েক ওর ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে রেখে আসে। তারপর শেষ রাতে খদ্দেররা চলে গেলে মেয়েকে

আবার নিজের ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে ওই কুঠুরিতে ফেলে রেখে মেয়েটির ঠাণ্ডা লেগে যায়। আবার এমনো এক একটা সময় গেছে, যখন ঘরে ওর প্রণয়ী ওর শরীরটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তখন পাশের কুঠুরিতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে চলেছে মেয়েটি একটানা। শেষ পর্যন্ত বার্নডর্ফে একটি শিশু আশ্রমে মেয়েটিকে রেখে এসেছে ও রীতিমতো পয়সা খরচ করে। তাতে খুবই মর্মাহত রোজা। আর সেখানে ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবার পরিচয় দিয়েছে, তা না হলে আসল পরিচয় দিলে আশ্রম কর্তৃপক্ষ কখনোই ওর মেয়েকে স্থান দিতো না সেখানে।

এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে রোজা বললো, 'শুক্রবার আসছো তো?'

'হ্যাঁ', মাথা নাড়লাম। কিন্তু কি জন্যে যে ও আসতে বললো তার কিছুই বুঝিনি আমি। আমি কারো কোনো কথায় থাকি না—এর থেকে ভালো স্বভাব আর কিছু হতে পারে না বোধহয়। এতে সব মেয়েরই মন রেখে সমান বন্ধুত্ব রাখা যায়। তা না হলে এখানে নিজের অস্তিত্ব রাখাটাই মুশকিল হতো।

রোজা চলে যাবার পরেও আরো কিছুক্ষণ বসলাম ওখানে। এটা আমার রবিবারের বিশ্রামের একটা আদর্শ জায়গা। এখানে এলে আমি শান্তি খুঁজে পাই। কিন্তু আজ কেন জানি না, অশান্ত মনটাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। তাই একটু পরেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সারাটা দিন কাটালাম রাস্তায় রাস্তায়, তবু অস্থির মনটা কিছুতেই স্থির করতে পারলাম না এক মুহূর্তের জন্যেও। এর কারণ খুঁজে পেলাম না অনেক চেষ্টা করেও। রোদ পড়ে এলে একবার কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম বিকেলে। কিছুদিন আগে নামমাত্র দামে নিলামে কেনা ক্যাডিলাক গাড়িটা নিয়ে পড়েছিল কোষ্টার তখন। এরই মধ্যে গাড়িটার খোল নলচে পাল্টিয়ে ওটার চেহারা একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে। এই গাড়িটা বিক্রি করে মোটা টাকা লাভ করার ইচ্ছে ছিলো আমাদের। কিন্তু আমার এখন আশঙ্কা হচ্ছে, আদৌ কোনো ক্রেতা পাওয়া যাবে কিনা। এই মাগ্গিগণ্ডার দিনে বড় গাড়ির চাহিদা তেমন নেই, খরচ কমাতে সবাই চায় ছোট ছোট গাড়ি। তাই অটোকে বললাম, 'ভয় হয় অটো, শেষে এই গাড়িটা নিয়ে আমাদের না ঝামেলায় পড়তে হয়।'

কোষ্টার কিন্তু খুবই আশাবাদী। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো ও, 'এটা বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। কম দামের গাড়ির চাহিদা যেমন আছে, আবার দামী গাড়ির খদ্দেরও আছে যথেষ্ট বাজারে। এখনো এই দুর্মূল্য বাজারে কিছু টাকার কুমিরও আছে, যারা গরীব মানুষের কাছে জাহির করতে চায়, তাদের কাছে টাকা আছে এখনো, এতেই তাদের আনন্দ, তাদের সুখ, বুঝলে!'

কে জানে, কোষ্টার কথাই হয়তো ঠিক, হলেই ভালো। এরপর ওর কাছ থেকে

বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। জানালার সামনে বসে তখনো অস্থির মন নিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে থাকলাম, যদি তাতে মনটা একটু স্থির হয়, এই ভেবে। তারপর বই এর তলা থেকে টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজের টুকরোটা বার করে ভাবলাম, ওকে ফোন করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই একবার ওর সঙ্গে ফোনে কথা বললে দোষ কি? কথাটা মনে হতেই রিসিভারটা তুলে ওর নম্বরটা বলেই আশায় বুক বাঁধলাম সাগ্রহে। না জানি আমার জন্যে কতো আনন্দের বার্তাই না বয়ে নিয়ে আসছে। এক সময়ে দূরভাবে মেয়েটির ঈষৎ ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ধীরে ধীরে খুব মেপে মেপে কথা বলছে ও। ওর সেই কথা বলার মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা ছিলো। ওর থেমে থেমে কথাগুলো শুনতে গিয়ে আমার মনের সব অস্থিরতা বুঝি নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। পরশু কখন কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে নিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম এক সময়ে। আজ সারাটা দিন যে জীবন আমার অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে সেই চিন্তাটাই অর্থহীন।

রাতে অটোর সঙ্গে স্টিলি, আর ওয়াকারের কুস্তির লড়াই দেখতে গেলাম। ও টিকিট কেটে রেখেছিল আমার জন্যে। প্রথমে যেতে রাজী হয়নি পরে মেয়েটির সঙ্গে ফোনে কথা বলবার পরে মনের অস্থিরতা কেটে যেতেই ফোনে অটোর সঙ্গে যোগাযোগ করে চলে আসি। আমার টিকিটটা বিক্রী করে দেয়নি ও তখনো। কুস্তির লড়াই দেখে ফেরার পথে পার্কের একটা বেঞ্চে বসলাম আমরা। আজ দারুন ঠাণ্ডা পড়েছে। গলার কলারটা উল্টে দিয়ে কোষ্টারকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা। আজ দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। গলার কলারটা উল্টে দিয়ে কোষ্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়শু মঙ্গলবার নাগাদ ক্যাডিলাক গাড়িটা রাস্তায় নামানো যাবে তো?'

'সেই রকমই তো আশা করছি,' উত্তরে বললো কোষ্টার, 'কিন্তু হঠাৎ কেন এই প্রশ্ন বলো তো?'

'এই এমনি ভাবছিলাম…সব খুলে বললাম না ওকে আপাতত। তার বদলে বললাম, 'আজ আমার মেজাজটা একেবারেই ভালো নেই অটো।' ঘরে ফেরবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম তারপর।

আমার পিঠের উপরে হাত রেখে সান্তনা দিয়ে বললো ও, 'মাঝে মাঝে ওরকম সবারই হয়ে থাকে বব, চিন্তা করো না। ঘরে ফিরে গিয়ে গভীর ঘুমে ডুবে পড়ার চেষ্টা করো। শুভরাত্রি—'

ফিরে এসে ঘরের দৈন্য অবস্থা দেখে হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে হলো, না, কোনো ভদ্রলোককে এ ঘরে আহ্বান করা যায় না, অন্তত একজন সুন্দরী যুবতীকে তো বটেই। বড় জোর ওই ইনটারন্যাশনাল কাফে থেকে বারবনিতাকে আনা যেতে পারে।

□ তিন □

মঙ্গলবার সকালে আমাদের কারখানার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসে আমরা প্রাতরাশ সারছিলাম। ক্যাডিলাক গাড়ির কাজ শেষ। সেটার বিক্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন দেবার ভার পড়েছে লেনতসের উপরে। সেই সময় ফিনিক্স ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারই নন, একজন প্রজাপতি সংগ্রাহকও বটে। একবার আমাদের কারখানায় এক অদ্ভুত ধরনের মথ উড়ে এসে বসেছিল। আমরা সেটা সংগ্রহ করে ও'কে উপহার দিতে উনি খুব খুশি হলেন। এতো খুশি যে, তারপর থেকে আমরা যাতে করে গাড়ি মেরামতের কাজ বেশী পাই সে ব্যবস্থা তিনি তাঁর সাধ্যমতো করে থাকেন। আর আমরাও হাতের কাছে মথ পেলেই ও'র কাছে পাঠিয়ে দিতে ভুলি না কখনো।

অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো লেনতস, 'হের বারসিগ, এক পেগ হয়ে যাক না।'

'না, সন্ধ্যের আগে ওই জিনিষটা আমি ঠোঁটে স্পর্শ করিনা,' বললেন বারসিগ, 'এ আমার চিরাচরিত নিয়ম।'

তা সত্ত্বেও গ্লাসে কোনিয়াক ঢালতে ঢালতে বললো লেনতস, 'তাতে কি হয়েছে, মাঝে মাঝে অমন নিয়ম ভঙ্গ করার মধ্যেই তো নিয়ম পালনের আসল মজাটা উপভোগ করা যায়। তাই আসুন, আমাদের সেই অদ্ভুত ধরনের মথ আর প্রজাপতিদের স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

প্রজাপতির প্রসঙ্গ উঠতেই কেমন দুর্বল হয়ে যান বারসিগ। একটু ইতস্তত করেই তিনি তাঁর গ্লাসটা টেনে নিলেন। 'আপনি আমার ঠিক দুর্বল জায়গায় লক্ষ্যভেদ করেছেন। এরপর আর আপত্তি করা যায় না। তিনি তার প্রিয় মথ ও প্রজাপতির স্বাস্থ্য কামনা করে আর এক প্রস্থ মদ গলাধঃকরন করার পরে সযত্নে গোঁফ মুছে এবার এখানে আসার উদ্দেশের কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন, 'আপনাদের জন্যে একটা সুখবর নিয়ে এসেছি। সেই ফোর্ডগাড়িটা আনার ব্যবস্থা করুন। গাড়ির মালিক আপনাদের দিয়েই গাড়িটা মেরামত করাবার মনস্থ করেছেন।'

'বেশ তো,' বললো কোষ্টার, 'তবে আমাদের দেওয়া খরচের এস্টিমেটটার কি হলো?'

'সেটা পুরোপুরি দিতে রাজী হয়েছে কতৃপক্ষ।'

'সে তো খুবই আনন্দের কথা,' আনন্দে লাফিয়ে উঠলো লেনতস, 'তাহলে

এবার ফিনিক্স ইনসিওরেন্স কোম্পানির স্বাস্থ্য কামনা করে আর এক পেগ হয়ে যাগ, কি বলেন?' এই বলে বারসিগের গ্লাসে মদ ঢালতে শুরু করলো সে।

চলে আসার সময় বারসিগ বললেন, 'হ্যাঁ আর একটা কথা, সেই মেয়েটির কথা মনে আছে তো? ফোর্ডগাড়ির আরোহিনী ছিলো যে, মারা গেছে সে দুদিন আগে। বেচারীর মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়স হয়েছিল, চার মাসের বাচ্চা ছিলো তার পেটে। বিশ হাজার মার্কের ইনসিওরেন্স।'

বারসিগ চলে যেতেই আমরা সেই ফোর্ডগাড়িটার মালিক একজন পাউরুটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আনার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল লোকটা, অন্ধকারে একটা বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারতেই তার স্ত্রী বেচারী সাংঘাতিক ভাবে আহত হয় পরে যে কিনা মারা যায় দুদিন আগে। কিন্তু ওই মাতাল লোকটার গায়ে একটুও আঘাত লাগেনি। পাউরুটিওয়ালদের যেমনটা হয়ে থাকে, ফ্যাকাসে ও অস্বাস্থ্যকর ভাবের মুখ করে লোকটা তার গাড়ির হুডটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এটাও বদল করে দেওয়া হবে তো?'

তার অমন অদ্ভুত আবদার শুনে আমরা তো অবাক। গাড়ির হুডটা একেবারে অক্ষত। আর ইনসিওরেন্স কোম্পানিত হুডের খরচ বহন করবে না। তাই অটো বলে উঠলো, 'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ঠিকই বুঝেছে,' লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'গাড়িটা মেরামত করে খুব দাও তো মারবেন। আর সামান্য একটা হুড বদলে দিতে পারবেন না? ভালো কথা, হুডটার রঙ যেন ভালো হয়, হাল্কা বাদামী রঙ হলে খুবই ভালো হয়।'

এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটির পরে অটো রাজী হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। আর রাজী না হয়েও উপায় ছিলো না। কারণ আমাদের ব্যবসার খুবই মন্দা যাচ্ছিল তখন।

গাড়িটা নিয়ে চলে আসবার সময় গাড়ির সিটে লোকটার স্ত্রী রক্তের দাগ দেখে লেনতস বলে উঠলো, 'ব্যাটা চাপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে একটা নতুন হুড আদায় করে নিলো। এর থেকে আমার ধারনা, ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে দুজনের টাকা আদায় করে ছাড়বে ওই লোকটা। শুনলে না, বারসিগ বলে গেলেন, মেয়েটি চার মাসের অন্তঃসত্বা ছিলো। এক ধরনের লোক আছে, অতি বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকেও মুনাফা লুটতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। সে যাকগে, আমাদের সামান্য লাভ থেকে ওর জন্যে না হয় পঞ্চাশ মার্ক ব্যয় করা যাবে।'

বিকেল পাঁচটায় প্যাটারিসিয়া হোলম্যানের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। সে খবরটা ওদের না জানিয়ে একটা অজুহাত দেখিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমার বাড়ির উদ্দেশে। মেয়েটি একটা অখ্যাত কাফেতে আসতে বলেছিল, এর আগে কখনো যাইনি সেখানে, শুধু নামটাই শোনা ছিলো আমার।

ছোট কাফে, লোক গিজগিজ করছিল। বেশীর ভাগ খদ্দেরই মেয়ে। নারী সংগঠিত কাফে বললেই ভালো হয়। আর যেখানে যতো বেশী মেয়ে মানেই ততো বেশী হৈচৈ আর হট্টোগোল। এখানেও তার ব্যতিক্রম হতে দেখা গেলো না। আমি সেখানে ঢোকা মাত্র একটা টেবিল খালি হতে চোখ ছুটে গিয়ে সেটার দখল নিলাম আমি। কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ আমার দখলে রইলো না। এক গ্লাস কোনিয়াকের ফরমাস নিয়ে চলে গিয়েছিল ততক্ষনে। একটু পরে কোনিয়াকের গ্লাস হাতে নিয়ে ফিরে এলো সে সঙ্গে আরো চারটি মেয়েদের নিয়ে। ওদের দলনেত্রী বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান, কুস্তিগির এর মতো চেহারা, পুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরনে অদ্ভূত ধরণের পোশাক। আরো অদ্ভূত তার মাথার টুপিটা। 'আপনারা তো চারজন?' আমাদের টেবিলে তাদের স্থিতি করবার জন্যে ওয়েটার সেই দলণেত্রীর উদ্দেশে বললো, 'বসুন এই টেবিলে।'

'আরে, কি করছো? এ টেবিলটা তো আমি নিয়েছি, আমার একজন বন্ধুর আসবার কথা আছে—'

'তা হয় না, 'বাধা দিয়ে বললো ওয়েটার, 'এখানে কোনো টেবিল কারোর নিজস্ব হয় না, ওঁদের বসতে দিন।'

ওদিকে জোয়ান মেয়েটি তখন একটা চেয়ারের হাতল ধরে টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ওর মুখে রণং দেহী ভাবটা দেখে আমি তখন বুঝে গেলাম যে, ওকে বাধা দিয়ে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। অগত্যা ওয়েটারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, আর এক গ্লাস কোনিয়াক এনে দাও।'

'আবার এক পেগ স্যার?' ভীতু ভীতু মুখ করে বললো সে, 'আমি নিরুপায় স্যার, টেবিলটা যে ছয়জনের!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তাড়াতাড়ি আর এক পেগ কোনিয়াক নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করো তো!'

এদিকে ওই জোয়ান কাঠখোট্টা মেয়েটি আমাকে ঘন ঘন মদ খেতে দেখে নাক সিঁটকোয়। ওর ভাবসাব দেখে মনে হলো মদ্যপান বিরোধী। ওকে চটাবার জন্যে আরো এক পেগ কোনিয়াকের ফরমাস দিয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবলাম, এ আমি কি করছি? এক অজানা, অচেনা মেয়েকে রাগাবার জন্যে কেন আমি পাগলামি করবো? এমনো হতে পারে, এখানে যার জন্যে আসা, হয়তো ঠিক সময়ে তাকে আমি চিনতেই পারবো না। নিজের উপর বিরক্ত হলাম। দ্রুত চুমুক দিয়ে গ্লাসটা সবে শেষ করেছি, পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার?' পিছন ফিরে তাকাতে গিয়েই দেখি, সেই মেয়েটি, যার প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি। 'এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছ?' অনুযোগ করলো মেয়েটি।

আজ ও যেন অন্য এক রূপে দেখা দিয়েছে আমার কাছে। রোগা হলেও বেশ

আঁটসাঁট শক্ত সমর্থ গোছের চেহারা মেয়েটির। সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখে মনে হচ্ছে, এ রকম মেয়ের নাগাল পাওয়া যাবে না, আর ওর সঙ্গে আমাদের খাপও খাবে না হয়তো।

আমার টেবিলের সেই চারটি বয়স্কা মেয়ে তখন একেবারে চুপ মেরে গেছে। তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে আমার দিকে এখন, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ওদের রাগাবার জন্যে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললাম আমি, 'এই ভীড়ে এখানে বসবে, নাকি অন্য কোথাও? এটা একটা নরক কুণ্ড। তার চেয়ে চলো অন্য কোনো বার-এ'

'বার?' অবাক হলো মেয়েটি। 'দিনের বেলা বার খোলা থাকে নাকি?'

'হ্যাঁ, থাকে বৈকি। অন্তত আমার জানা এক বার আছে। সেখানে এতো ভীড় বা গোলমাল নেই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

'আপত্তি?' ওর মুখ দেখে ওর মনের ভাব আন্দাজ করা মুশকিল। কে জানে, আমাকে নিয়ে ও তামাশা করছে কিনা! তবে পরক্ষণেই বললো ও, 'ঠিক আছে, সেখানেই তুমি আমাকে নিয়ে চলো।'

ওর সম্মতি পেয়েই হাতের ইশারায় ওয়েটারকে ডাকলাম। লোকটা বুক কাঁপানো তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'ওই টেবিলে তিন পেগ কোনিয়াক, তিন মার্ক, তিরিশ ফেনিগ।'

'এরই মধ্যে তিন পেগ? চমকে উঠে মেয়েটি বললো, 'বাবাঃ দারুণ ওস্তাদ দেখছি তুমি!'

'না, তুমি যা ভাবছো তা নয়, আসলে কালকের দু'পেগের দাম বাকী ছিলো কিনা।'

সেই কুন্তিগীর মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল কিছু বলার জন্য। বেচারী এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না। পিছন থেকে ফোড়ন কেটে উঠলো, 'ডাহা মিথ্যুক!' আমিও সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে বললাম তাকে, 'খৃষ্টমাসের শুভেচ্ছা রইলো।' বলেই চলে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে রাস্তায় নেমে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'ওদের সঙ্গে তুমি ঝগড়া বাধাওনি তো?'

'না, ঠিক ঝগড়া নয়। এই সব বিত্তবানদের আদুরে মেয়েদের দেখলেই আমার মেজাজ ঠিক থাকে না।'

'আমারও সেই রকম মনে হয়', মেয়েটিও সায় দেয় আমার কথায়।

অবাক করে দিলো মেয়েটি আমাকে। ওর কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, ও যেন অন্য এক জগতের মানুষ। ও যে কে, ওর জীবনযাত্রাই বা কি রকম, কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না এখন। ভয়ংকর এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে রাখলো ও আমাকে।

যাইহোক, বার-এ এসে একটু স্বস্তি পাওয়া গেলো। ঘরটা বলতে গেলে একেবারে

ফাঁকা। কেবল একটা টেবিলে ভ্যালেনটাইন হসারকে বসে থাকতে দেখা গেলো, ওই জায়গাটা ওর নিজস্ব। আমরা একই রেজিমেন্টে ছিলাম, সেই থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ। যুদ্ধের পরে ওর হাতে কিছু বাড়তি টাকা এসেছিল। সেই টাকাটা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে ও এখন। ও মনে করে, যুদ্ধ থেকে ওর বেঁচে ফিরে আসাটা পিতৃপুরুষের সৌভাগ্যের জন্য। আর সেই আনন্দেই মদ খেয়ে যাচ্ছে ও। যুদ্ধের ব্যাপারে ওর স্মৃতিশক্তি দারুণ প্রখর। আমরা তো কতো ঘটনার কথাই ভুলে গেছি, ও কিন্তু ভোলেনি আজও। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা, খুঁটিনাটি সব কিছুই চোখের সামনে কেমন ভেসে ওঠে ওর এখনো। চুপচাপ বসে আছে ও এখন। এরই মধ্যে ও যে প্রচুর মদ খেয়েছে, ওর চোখ মুখ দেখেই সেটা পরখ করা যায়। হাত নেড়ে আমরা পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম।

ওয়েটার ফ্রেড আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খাবে বলো?'

'মার্টিনি হলে ভালো হয়', বললো ও।

'ওই জিনিষটা খাসা তৈরী করে ফ্রেড', তার প্রশংসা করতেই ঈষৎ হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। 'আর আমার রোজকার যে ব্র্যান্ড, তাই দাও।' ফরমাস নিয়ে ফ্রেড চলে গেলো।

বার-এর ভেতরটা বেশ ঠান্ডা, একটু অন্ধকারও বটে। তারওপর আলাপ জমানোর মতো চমৎকার একটা নির্জন পরিবেশ। তবু মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে যে আলাপ শুরু করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওকে আমি চিনি না, জানি না। যতো দেখছি ওকে ততোই যেন অচেনা মনে হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, অন্তরঙ্গতা চুকেবুকে গেছে অনেক দিন আগে। তখন অনেক ভীড়ে, অনেক হৈচৈ-এর মধ্যেও মনের মতো মেয়েকে পাকড়াও করে কতো না কথা বলতাম। অথচ আজ এখন এক নিরালা নির্জন জায়গায় ওকে পেয়েও কথা বলতে ভয় হয়। মনে হয়, এখন এখানে প্রত্যেকটি কথায় যেন এক একটা বিশেষ অর্থ আছে, গুরুত্ব আছে। ভাবলাম, এর চাইতে ওই কাফের ভীড়, হৈ-হট্টোগোল বোধহয় ভালো ছিলো।

আমাদের দুজনের জন্যে আলাদা আলাদা দুটো গ্লাস টেবিলের উপরে রেখে গেল ফ্রেড। আঃ রামটা কি চমৎকার! এখানে আসার স্বার্থকতা এখানেই। সঙ্গে সঙ্গে আর এক গ্লাসের ফরমাস দিলাম ফ্রেডকে। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাছে নতুন জায়গাটা কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো', ঘাড় নেড়ে বললো ও।

'এই জায়গাই আমাদের বেশী পছন্দ। রোজ সন্ধ্যায় এখানে চলে আসি। এখন এটাই আমাদের ঘর-বাড়ি হয়ে গেছে।'

'সেটা কি খুব সুখের কথা হলো?' বলে মেয়েটি হাসলো।

'অ-সুখেরই বা কি আছে ? যুগের রীতি-নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তো হবে আমাদের !'

আমার জন্যে গ্লাস ভর্তি কোনিয়াক রেখে গেলো ফ্রেড, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। সেই সঙ্গে একটা হাভানা চুরুট রেখে বললো সে, 'হের হসারের উপহার। ভ্যালেন-টাইনের চোখে পড়েছে। সে তার গ্লাসটা তুলে ধরে ভরাট গলায় বলে উঠলো, 'কমরেড, ১৯১৭ সালের ৩১শে জুলাইকে স্মরণ করে গ্লাসে চুমুক দাও—' ঘাড় নেড়ে ওর কথায় সায় দিয়ে আমিও গ্লাসে চুমুক দিলাম। কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ওর। প্রতিবার মদের গ্লাসে চুমুক দেবার আগে কারোর কিম্বা কোনো না কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করবেই ও। মনে আছে একদিন রাত্রে এক গ্রাম্য সরাই-খানায় ওকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে সেটার স্বাস্থ্য কামনা করে প্রথম চুমুক দিয়েছিল গ্লাসে। গত যুদ্ধে ট্রেঞ্চে থাকার সময়ে যে সব ভয়াবহ দিনগুলো ভয়ংকর সংকটের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে কোনো রকমে বেঁচে গেছে, সে সব তারিখগুলো ঠিক মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে ও। আর সেই সব দিনগুলোকে স্মরণ করেই মদ খায় ও। ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, আমি ওকে বেশ ভালো করেই জানি। আমার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র ও-ই জানে, কি করে এক এক করে বিরাট বিরাট সর্বনাশের আবর্তে পড়েও তার মধ্যে থেকে একটু আনন্দ নিঙড়ে নিতে হয়, যেমন করে এক গামলা দুধ থেকে ক্রীম বার করে নেওয়া হয়। নিজের জীবন, ভবিষ্যৎ এ সব সম্পর্কে কিছুই জানে না ও, তবে ও যে এখনো বেঁচে আছে, এই আনন্দেই ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে ও।

সব শুনে আমার দিকে তাকালো মেয়েটি। মুখের উপরে কেমন একটা শান্ত, নিবিষ্ট ভাব ওর। তেমনি শান্ত ও সংযত গলায় বললো ও, 'ওর অবস্থাটা বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারছি আমি।'

'তুমি তো খুবই ছেলেমানুষ', বললাম ওকে, 'তুমি কেমন করে বুঝবে ওকে ?'

ওর চোখে চাপা হাসির ছায়া পড়তে দেখা গেলো। তবে মুখের ভাবটা অপরিবর্ত 'খুবই ছেলেমানুষ, এ তুমি কি বলছো ? আজকের দিনে কেউ কি আর ছেলেমানুষ থাকতে পারে ? আমরা সবাই বৃদ্ধ !'

মেয়েটির কথা শুনে মনে হলো, যথেষ্ট জ্ঞান আছে ওর, ওর নিজস্ব মতামতও বেশ জোড়ালো। ওর কাছে আমি নিতান্তই হাবা-গোবা। যাইহোক, সেই থেকে ভাবছি, কোনো একটা হাল্কা বিষয় নিয়ে একটা রসালো গল্প ফেঁদে বসবো, কিন্তু সেরকম কোনো বিষয় কিছুতেই মাথায় আসছে না। এ ব্যাপারে লেনতস আমার গুরু মানতেই হবে আমাকে। আমি ওর ঠিক উল্টো, মাথায় একেবারেই কিছু আসে না, যদিও বা আসে, কথা বলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠি। তাই গটফ্রিড ঠাট্টা করে আমাকে প্রায়ই বলে থাকে, ফূর্তিবাজ সামাজিক লোক হিসেবে আমাকে নাকি একমাত্র পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মিথ্যে বলে না ও।

ফ্রেডের পেটে বেশ বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। ফরমাস পেয়ে বারবার ছোট ছোট পেগ না এনে সে তার পরিশ্রম কমানোর জন্যে এবার একটা গ্লাস ভর্তি করেছে, এতে অন্যের নজরে পড়ে না। আর আমারও ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায়। পেটে বেশী করে মদ না পড়লে আমার আবার অ-রসিক ভাবটা কিছুতেই কাটতে চায় না, মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে না।

'আর এক গ্লাস মার্টিনি হবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটিকে।

'তুমি যেটা খাচ্ছো, ওটা কি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'রাম। দারুণ কড়া। তবে এখন আর স্বাদ কিম্বা বিস্বাদের কথা ভাবি না।'

'তাহলে কেনই বা ওই জিনিষটা খাও তুমি?' আমার মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে বললো ও।

ওর এমন কথা শুনে খুব খুশী হলাম মনে মনে। যাক, এতক্ষণে কথা বলবার মতো একটা বিষয় পাওয়া গেলো। বিন্দুমাত্র দেরী না করে আমি মুখর হয়ে উঠলাম, 'রাম-এর কথা বলছো? এটা এমনি একটা জিনিষ যে, এটার বেলায় স্বাদ আস্বাদের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা তো শুধুমাত্র মদ নয়, এটা হচ্ছে আমার বন্ধু, আমার সব সুখ দুঃখের সাথী। প্রিয় বন্ধুর মতো আমাকে সঙ্গ দিয়ে এটা আমার জীবনের সব একঘেয়েমি কাটিয়ে দেয়, আমার শূন্যতা ভরাট করে দেয়। এক কথায় দুনিয়ার চেহারার ভোল একেবারে পাল্টে দেয়। আর সেই জন্যেই রাম আমার এতো পছন্দ।'

'তাই বুঝি?' মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'তাহলে আমাকেও ওই রাম দিতে বলো। তোমার উপলব্ধিটা একবার পরখ করে দেখি।'

'ভালো, কিন্তু আজ থাক। জিনিষটা বড্ড বেশী কড়া। ধীরে সুস্থে অভ্যাস করতে হয় এটার।' বলে ফ্রেডকে ডেকে মেয়েটির জন্যে ফরমাস দিলাম, 'বাকার্ডি' ককটেল দাও ওকে।'

একটু পরেই একটা খালি গ্লাস আর একটা বোতল নিয়ে এলো ফ্রেড, সঙ্গে নুন মেশানো বাদাম ভাজা আর কফি বীন। গ্লাসে ঢেলে বোতলের বাকী অংশটা ফেরত নিয়ে যাচ্ছিল সে, বাধা দিয়ে বললাম ওকে, 'বোতলটা রেখে যায়।'

এবার বুঝতে পারছি, নেশা বেশ জমে উঠেছে আমার মধ্যে। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনের সব কিছুই কেমন বদলে যাচ্ছে, রঙ বদলাচ্ছে এই বার-এর। আমার সামনে বসে থাকা ওই মেয়েটিরও। তবে এর ফলে একটু আগের সেই অস্বস্তিবোধটা কেটে গেছে এখন। এখন আমি বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে পারছি। এর আগে প্রতিটি কথা আমাকে মেপে মেপে বলতে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন আমি মন খুলে কথা বলতে পারছি, কোনো জড়তা নেই, নেই কোনো দ্বিধা ভাব। এক এক চুমুকের সঙ্গে এক একটা শৈত্য প্রবাহ এসে যেন আমাকে জড়িয়ে

ধরছে। অন্ধকারের মধ্যে এক একটা ভালোলাগা ছবি ফুটে উঠছে আমার চোখের সামনে। আমার মরুজীবনের উদ্যানে মরীচিকার মতো এক একটা রঙিন স্বপ্নের মিছিল এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে হলো, এটা কোনো বার নয়, এটা যেন আমার নিভৃত আমার একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই কেবলমাত্র সংসারের নিরন্তর নিষ্ঠুর সংগ্রাম আর তারই মাঝে এই বারটা যেন একটা ট্রেঞ্চ। সেই ট্রেঞ্চের মধ্যে আমরা দুজনে আশ্রয় নিয়েছি। ভাবতে অবাক লাগে, কেমন করে সংসারের সব নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করে সময়ের স্রোতে আমরা দুজন দুই ভিন্ন দিক থেকে ছুটে এসে মিলিত হয়েছি নতুন করে বাঁচার আশা নিয়ে।

অথচ এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েও কেন যে মেয়েটি অমন সংকুচিত ভাবে আমার সামনে বসে আছে, ভেবে পাচ্ছিনা। আমার কাছে ও এখনো অপরিচিত, অবগুণ্ঠিতা এক রহস্যময়ী নারীমূর্তি যেন। কেবল আমিই এখন মুখর আর নীরবে আমার বকবকানি শুনে যাচ্ছে ও, কোনো ভাবান্তর নেই, থাকলেও আমি হয়তো বুঝতে পারছি না মেয়েদের ব্যাপারে আমার চিরদিনের অক্ষমতার জন্যে। ওকে নীরব থাকতে দেখে নিজের কথা নিজের কানেই যেমন অদ্ভুত ঠেকছে এখন। মনে হচ্ছে, কই আমি তো কথা বলছি না, অপর কেউ আমার মুখ দিয়ে তার কথা বার বলে যাচ্ছে। সেই মানুষটা আমার কল্পনা, আমার স্বপ্নের নায়ক আমি।' তার বক্তব্যের সবটাই মিথ্যে, রঙিন কল্পনার জাল দিয়ে বোনা কথাগুলো, যা কখনো সত্যি হতে পারে না, সবই অলীক ও অবাস্তব। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়। এখানকার এই যুদ্ধোত্তর পরিবেশে দুনিয়ার সব সত্যের যেখানে কোনো দাম নেই, মূল্যহীন নীরস ছাড়া আর কিছু নয়, তখন আমাদের এই স্বপ্নটাকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে, স্বপ্নের আর এক নাম জীবন বলে ধরে নিতে ক্ষতি কি।

প্যাটরিসিয়া হোলম্যানকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে ফেরবার পথে পথ ঘাট তখন রীতিমতো অন্ধকারে ডুবে গেছে। হঠাৎ তখন নিজেকে ভীষণ একা নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। একটা দোকানের শেডের নিচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আজ বড্ড বেশী মাত্রায় মদ গেলা হয়ে গেছে। গরম লাগছে. কোটটা খুলে ফেললাম। মাথার টুপিটাও পিছন দিকে ঠেলে দিলাম, যদি তাতে গরম একটু কাটে। বারে গিয়ে কি যে যা তা বকে এসেছি, এখন আর মনে পড়ছে না। নিজের উপরে ভীষন রাগ হলো। ছিঃ ছিঃ আমি একটা গর্দভ। জানি না, ওই অপরিচিতা মেয়েটি আমার সম্পর্কে কি ধারনা নিয়ে ফিরে গেলো। সামান্যই মদ খেয়েছে ও. তাই স্বাভাবিক জ্ঞান নিয়েই ও আমার পাগলের প্রলাপ শুনে গেছে। ও কিছু মনে না করলে বিদার মুহূর্তে কেনই বা অমন ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকালো? ছিঃ ছিঃ—এই সময় পথে আমার মতো আর এক মাতালের সঙ্গে

ধাক্কা লাগতে আমরা দুজন দুজনকে খুবই গালাগালি দিলাম। তাতে বাড়ি ফিরে মনটা একটু হাল্কা হয়েছে বলে মনে হলো। এখন কেবল নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে সারা দুনিয়ার উপরে, এমন কি ওই মেয়েটির উপরেও। হ্যাঁ ওকে দেখানোর জন্যেই তো আজ আমি আমার মদ খাওয়ার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলাম। ওকে এখন সমীহ করতে ইচ্ছে হলো না। যা খুশি ভাবুকগেও আমি থোরাই পরোয়া করি ওর? ও আমার স্বরূপ যা জানার জেনে ফেলেছে, যা হবার তা হয়ে গেছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। এরপর আমি আবার বার-এ ফিরে চললাম আরো খানিকটা মদ গেলবার জন্যে, পুরোপুরি মাতাল হবার জন্যে।

শীত শেষ হয়ে আসছিল। ওদিকে ক'দিন ধরে এক নাগারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। সকালে কারখানায় গিয়ে দেখি একটা ফোর্ড গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে লেনতস। ওর চোখে চোখ পড়তেই ও বলে উঠলো, 'সেই যে বিইডিং এর সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম, তার একবার খোঁজ নিতে হবে। কি যেন নাম সেই মেয়েটার প্যা—প্যাট, প্যাটই তাই না?'

'আমি জানি না।'

'জানো না, এ তুমি কি বলছো? কেন, তুমি তো ওর ঠিকানা, ফোন নম্বর সব কাগজে লিখে নিলে—'

'সব ঠিক', বললাম, 'তবে সেই কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

'ওঃ তুমি একটা অপদার্থ'। অমন চমৎকার একটা মেয়ে—' হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার মতো করে বললো লেনতস, 'এমনিতেই অমন সুন্দরী মেয়ে আমাদের জোটে না, আর যদি বা ভাগ্যে জুটলো, সেই সম্ভাবনাটা হেলায় তুমি বিনাশ করে ফেললে ওর ঠিকানা হারিয়ে?'

'কিন্তু ওই মেয়েটিকে আমার তো তেমন সুন্দরী বলে মনে হয়নি—'

'তা কেন মনে হবে তোমার।' খিঁচিয়ে উঠলো লেনতস, 'তুমি যে একটা আস্ত গর্দভ। তুমি তো চেনো কেবল ওই কাফে ইন্টারন্যাশনালের দেহ বেচা মেয়েগুলোকে। এর থেকে বেশী আর কি আশা করা যায় পিয়ানো বাজিয়ের কাছে? জানো, ওই মেয়েটি ছিলো আমাদের হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো। ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজনও মনে করোনি, তখন তো তোমার নজর ছিলো মদের গ্লাসের উপরে।

'বাজে কথা রাখো তো!' ধমক দিয়ে উঠলাম ওকে। কেউ মদের দোহাই দিলে আমি সহ্য করতে পারি না, আমার ভীষণ আঁতে লাগে।

তবু ও আমার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও বকে চলে একটানা, মেয়েটির গুণকীর্তন

করে। 'ওই মেয়েটির অনেক গুণ, অনেক রূপ। ওর মধ্যে আলো, অন্ধকার, উষ্ণতা সবই আছে। অর্থাৎ কিনা এক রহস্যময়ী নারী বটে। আর সব সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বই লুকিয়ে আছে ওখানে। এ সব নাহলে নারীর রূপ সম্পূর্ণ হবেই বা কি করে? তবে এসব কথা তোমাকে বলে লাভই বা কি বলো। এ দুনিয়ার কেবল রাম আর রাম ছাড়া সব কিছুই তোমার কাছে অর্থহীন।

রামের কথা উঠতেই আবার আমি রেগে গিয়ে বলে উঠলাম, 'থামবে তুমি? তা না হলে একটা কিছু দিয়ে আঘাত করে তোমার মুখ আমি বন্ধ করে দেবো।'

আমার হুমকিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অনর্গল বকে যেতে থাকলো—সব কথাই ওর সেই মেয়েটির সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে, আর আমার মদ খাওয়ার ব্যাপারে খোঁচা দিয়ে। একই কথা বারবার শুনে শুনে আমারও যেন মনে হলো, সত্যি বোধহয় একটি অতি মূল্যবান জিনিষ হাতে পেয়েও আমার নিজের দোষে হারিয়ে ফেলেছি।

লেনতস ঠিকই বলেছিল, আমি বুঝি শুধু কাফে ইন্টারন্যাশনাল, মদ আর সেখানকার দেহ বেচা মেয়েমানুষগুলোকে। এ সবের টানেই পায়ে পায়ে হেঁটে চলে এলাম কাফে ইন্টারন্যাশনালে সন্ধ্যায়। সেখানে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম—প্রচণ্ড হৈচৈ আর ব্যস্ততা। খোঁড়া ওয়েটার এলয়সকে ক্যান ভর্তি কফি নিয়ে ছোটাছুটি করতে দেখে ভাবলাম, মাতালগুলো টেবিলের তলায় গড়াগড়ি করছে নাতো? যাই হোক, আজকের এই উৎসবের হোস্টেস রোজা স্বয়ং এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো আমাকে। ওর বন্ধু লিলির আজ দেহ বেচার ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশের জন্যে এই উৎসবের আয়োজন। সেখানে আমার হঠাৎ উপস্থিতি আমাকে অপ্রস্তুত করে তুললো। সেকথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে রোজা বলে উঠলো, 'কেন তোমার এই কুণ্ঠা? তুমি তো আমাদের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। তবে পুরুষ অতিথি হিসেবে একা তুমি। আর ওই ন্যাকাচৈতন্য কিকি এখানে থাকলেও ওকে আমরা আমাদের হিসেবের মধ্যেই ধরি না।' আমি তখন কি করি, একটা ফুলের তোড়া ও আনারস লিলির জন্য আর রোজার বাচ্চার জন্য খেলনা ও চকোলেট কিনে নিয়ে এলাম। রোজা তো দারুণ খুশি তার বাচ্চার জন্য খেলনা ও চকোলেট উপহার দেওয়াতে। আর ফুলের তোড়া ও আনারসটা লিলির হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।'

রোজা আমার প্রশংসা করে বললো, 'শৌখিন মানুষ হিসেবে ওর পরিচিতি আছে, বিশেষ করে মেয়েদের খাতির করার ব্যাপারে ওর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।' আমার দিকে ফিরে ও বললো, 'এসো বব, আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াও।'

লিলি রোজার সব থেকে প্রিয় বন্ধু। ওদের মধ্যে ওর কদরই সব থেকে বেশী।

দেহপসারিণীদের যা কাম্য, যা খুব কম মেয়েদের ভাগ্যে জুটে থাকে, সেটা ও লাভ করতে পেরেছিল। একটা হোটেলে চাকরী করতো ও। আর হোটেলে চাকরী করলে আর পাঁচটা দেহ বেচা মেয়েদের মতো প্রণয়ী জোগাড় করতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। হোটেলেই সে তার মনের মানুষকে খুঁজে নিতে পারে স্বচ্ছন্দে। এদিক থেকে লিলিকে সৌভাগ্যবতী বলতে হয়। অবশ্য শহরতলীর একটা হোটেলে কাজ করতো ও। তবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ও প্রায় চার হাজার মার্ক জমিয়ে ফেলেছে। তাই এখন ও মনস্থ করেছে, এবার বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবে ও, যা সব মেয়েদের চিরন্তন কাম্য। ওর ভাবী স্বামী মিস্ত্রীর কাজ করে। লিলির অতীত জীবন সম্পর্কে সব জেনেই সে ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। আর লিলিও ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করে না। এ ধরণের মেয়ে একবার স্বামী ও ঘর সংসার পাতলে ফেলে আসা জীবনের পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় না, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কারণ দুনিয়ার হালচাল, দুঃখ বেদনা, সব কিছুই ওর তখন বেশ ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেছে। আসছে সোমবার লিলির বিয়ে। তাই রোজা আজ ওকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে কফি পার্টির আয়োজন করেছে। শেষ বারের মতো সবাই আজ এখানে মিলিত হয়েছে লিলির সঙ্গে।

রোজা নিজের হাতে কেক কেটে একটা বড় আকারের টুকরো আমার হাতে তুলে দিলো। এক্ষেত্রে যা বলা দরকার, কেকে কামড় দিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'খাসা জিনিয তো। এ তো দোকান থেকে কেনা নয়—'

রোজার মুখে খুশির হাসি উপচে পড়লো, 'এ কেক আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।' সত্যি রান্নাটা ও খুবই ভালো করে থাকে। বিশেষ করে পাম কেক তৈরীতে ওর বিকল্প কাউকে ভাবা যায় না। হবেই তো, ও যে বহিমিয়ার মেয়ে, ওখানকার মেয়ে রান্নার কাজে ওস্তাদ না হয়ে যায় না।

টেবিলের চারধারে ভীড় করে বসে আছে ওরা। পালা করে আমার চোখ দুটি ঘোরাফেরা করে ওদের উপরে। ওরা সব দেহ বেচার দল, বিধাতার প্রমোদোদ্যানে সবাই এক একটি আসল উপকরণ, পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে এদের যা অভিজ্ঞতা এমনটি আর কার আছে। ওরা সবাই আজ হাজির এখানে—ওই তো সুন্দরী ওয়াসী, এই তো সেদিন রাতে ট্যাক্সি করে বেরিয়েছিল ও। তখন ও ছিলো কুমারী, আর পাঁচটা ভদ্র পরিবারের মেয়ের মতোন, তখন ওর শ্বেতশুভ্র চামড়াটা কে যেন হরণ করে নিয়েছিল। লীনাও রয়েছে, ওর একটা পা কৃত্রিম, তবু তা সত্ত্বেও ওর প্রণয়ী ঠিক জুটে যায় রোজ। ওদিকে ফ্রিতসি মেয়েটি দারুণ ফুর্তিবাজ, এই হোটেলেরই খোঁড়া ওয়েটার এলয়সকে ভালোবাসে ও। ওই লাল টুকটুকে গালের মেয়ে মারগারেট দারুণ চতুর, বনেদি ঘরের পরিচায়িকার বেশে ঘুরে বেড়িয়ে শৌখিন ছোকরা প্রণয়ী জুটিয়ে

নের কেমন অনায়াসে। আর ওদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মেয়ে হলো মারিয়াম, ও খুব ফূর্তিবাজ মেয়ে। তবে এদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ হচ্ছে কিকি। সারাক্ষণ মেয়েদের মতো সাজগোজ করে থাকে বলে ওরা তাকে পুরুষ বলে গ্রাহ্যই করে না। আর বেচারী মিমির বয়স হয়েছে বলে ওর বাজার খুবই মন্দা, ওর দেহ বেচার ব্যবসা প্রায় অচল বলতে হয়। আর ছিলো এক বুড়ি, সবাই ওকে মায়ের মর্যাদা দেয়। লিলির পরে আজ সে দ্বিতীয় মাননীয় অতিথি। ওরা ওদের বিপদে আপদে ওই বুড়িমার পরামর্শ নেয়। নিকোলাইস্টাসে সসেজ-এর একটা দোকান আছে তার, রাতে একটা ছোটোখাটো হোটেলে পরিণত হয়ে যায় সেটা। ফ্রাঙ্কফোর্ট সসেজের সঙ্গে লুকিয়ে কিছু রবারের জিনিযও বেচে থাকে সে।

আজ ওদের এই বিশেষ উৎসবের দিনটিতে কোনো ইয়ার্কি ফাজলামি নয়, ওদের পেশায় প্ররোচিত করা নয়, গোড়াতেই এ কথাটা মনে রেখে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, বেশ মার্জিত ভাষায় কথা বলতে হবে ওদের সঙ্গে। তাই কার্যত আমাদের আলোচনা এমন ঘরোয়া ও বিশুদ্ধ রকমের হচ্ছিল যে, সেই আলোচনার যে কোনো গৃহস্থ গিন্নিবান্নিদেরও যোগ দিতে কোন আপত্তি ছিলো না। ইতিমধ্যেই লিলি বেশ সংসারী হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেলো, এরই মধ্যে বিয়ের পোশাক ছাড়াও ঘর সংসারের টুকিটাকি জিনিষ কিনে ফেলেছে ও। এরই মধ্যে ভদ্র বিবাহিত জীবনের ছাপ ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে আর কথাবার্তায়, যা মধ্যবিত্ত জীবনের প্রধান অঙ্গ। ওরা কোনো কারণে দেহ বেচার পেশাটা বেছে নিলেও, আসলে মনে প্রাণে আর রুচিতে কখনোই দেহ পসারিণী নয়। ওদের বলা যেতে পারে, ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজেরই অংশীদার এক একজন। নিজেদের এই পাপজীবনের পক্ষে কোনো সায় বা ইচ্ছা নেই ওদের, ওদের মনের সুপ্ত কামনা হলো বিয়ে করে নিটোল সুখ শান্তিতে ঘরসংসার করা। অবশ্য মুখে সে কথা কখনো প্রকাশ করে না ওরা।

আমি ওদের আজকের এই বিশেষ দিনটিতে খুশি করবার জন্য অনেকদিন পরে পিয়ানো বাজাতে শুরু করলাম। এরই অপেক্ষায় ছিলো রোজা। বিদায়ের কথা মনে রেখেই লিলি আর রোজার সব প্রিয় গানের সুর এক এক করে বাজিয়ে গেলাম। সব শেষে বাজালাম, 'হোম সুইট হোম' গানের সুর। রোজার খুব প্রিয় গান এটি। বারবনিতাদের দেখেছি মনে প্রাণে ওরা যতো কঠোরই হোক না কেন, আর একদিকে ওরা আবার খুবই ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। তাই এই শেষ গানটির সুরের সঙ্গে ওরা সবাই সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করে দিলো, এমন কি কিকিও বাদ গেলো না।

এবার লিলি ওর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো, ওর ভাবী স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললো, 'তোর মঙ্গল হোক,

এই আমার কামনা লিলি।' আমরা সবাই কাফের বাইরে এসে বিদায় দিচ্ছিলাম লিলিকে, হঠাৎ মিমি বেচারী তখন ডুকরে কেঁদে উঠলো। একদিন ওর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে নিউমোনিয়া রোগে ওর স্বামী মারা যায়। ওর আফশোষ, ওর স্বামী যদি যুদ্ধ করতে করতে মারা যেতো, তাহলে সামান্য হলেও কিছু পেনসন পেতো ও, তখন এভাবে ওকে এই পাপব্যবসার পথে নামতে হতো না।

খানিক পরে ওদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার আগে রোজা আমার পকেটে কিছু কেক গুঁজে দিয়েছিল। পথে সেই বুড়িমায়ের ছেলেটিকে রাস্তার মোড়ে সসেজের দোকান সাজাতে দেখে কেকগুলো উপহার দিয়ে এলাম ওকে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভাবলাম, এখন কারখানায় গেলে কেমন হয়? ঘড়িতে তখন আটটা। এতক্ষণে কোষ্টার নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। কোষ্টার থাকলে সকালবেলার মতো মেয়েটির ব্যাপারে লেনতস আর বকবক করতে পারবে না। কারখানায় গিয়ে দেখি আলোয় ঝলমল করছে সারা কারখানাটা। আর একা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোষ্টার। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ এতো আলো কিসের অটো? হেসে বললো ও, 'গটফ্রিডের শখ ফ্লাডলাইটে আমাদের কারখানাটা ভাসিয়ে দেবার, তাই আর কি।'

'তা বেশ দেখাচ্ছে', আমি বললাম, 'কিন্তু ও এখন কোথায়?'

'খাবার আনতে গেছে।'

'ভালোই হয়েছে। আমারও খুব খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ বব, যতো পারো খেয়ে নাও। সৈনিকদের এটাই মূলমন্ত্র। এই দেখো না, আজ আমায় বিকেলে কি হলো, কার্লের নাম দিয়ে এলাম রেস-এ। হ্যাঁ ব্রাউমুলারের সঙ্গে স্পোর্টসকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসছে ছ' তারিখে।'

'তাহলে অটো, আর একটু দেরী না করে আমাদের আদরের ওই মানিকটিকে বেশ করে তেল খাওয়ানো যাক, কি বলো!'

ঠিক সেই সময় লেনতস ফিরে এসে বললো, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে, আগে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক', বলে ঠোঙা খুলে খাবার বার করলো। তারপর বললো ও, 'এবার কোনিয়াকের বোতল বার করো তো দেখি। ওর কথায় কোনিয়াক, জিন আর দুটি গ্লাস বার করলাম। গটফ্রিড জিজ্ঞেস করলো, 'দুটি গ্লাস! কেন তুমি খাবে না?'

'না, আমি আর খাবো না। মদে আমার আর রুচি নেই।'

'দেখেছো অটো, আমাদের খোকনসোনা কেমন পুতুল হয়ে যাচ্ছে?'

'থাকগে, ও যখন খেতে চায় না', বললো কোষ্টার, 'জোর করো না।'

লেনতস গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে বললো, 'ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, ওর মাথায়

যেন কি একটা পোকা ঢুকেছে।'

হেসে বললাম, 'তা হতে পারে।' কারখানার শেডের উপরে গোল থালার মতো ঈষৎ লালচে চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। কিছু সময় নীরব থেকে আমিই আবার বললাম, 'প্রেমের ব্যাপারে তুমি তো নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করো, তাই না?'

'হ্যাঁ, মনে করি তো তাই।' বললো লেনতস, 'কেন তোমার তাতে সন্দেহ আছে নাকি?'

'না। আমি জানতে চাই, প্রেমে পড়লে মানুষ কি সত্যি সত্যি বোকা হয়ে যায়? যেমন ধরো মদ খেয়ে মাতাল হলে লোকে যেমনটা করে থাকে?'

শব্দ করে হেসে উঠলো লেনতস, 'বন্ধু, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে ছলনা। যদি প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে একান্তই সত্যের কোনো যোগাযোগ থাকতো, তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যেতো। আমাদের সৌভাগ্য যে, দুনিয়াটা সব সময় ওই নীতি-বাগীশদের কথা মতো চলে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, এক-আধটু ছলনা ছাড়া ও জিনিষটা একেবারেই অচল?'

'হ্যাঁ বন্ধু, একেবারেই অচল।' মৃদু হেসে বললো লেনতস, 'আর এও মনে রেখো, মেয়েদের মন রাখবার জন্যে তাদের প্রেমিকরা যাই করে থাকুক না কেন, ওদের কাছে সেটা বোকামো বা হাস্যকর হতেই পারে না। তবে হ্যাঁ, কেবল একটা কাজ কখখনো করো না যেন, ওদের কাছে নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে জাহির করতে যেও না, বুদ্ধিমানের মতো কথা বলো না, বুঝলে।'

লেনতসের কথা শুনে আমি খুবই সন্তুষ্ট। কোষ্টারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমার কি অভিমত অটো?'

'মনে হয় ও ঠিকই বলেছে', মাথা নেড়ে সায় দিলো ও।

'আর একটা প্রশ্ন লেনতস', আমি আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বন্ধু, মদ খেয়ে মাতালের ঝোঁকে তুমি কখনো বেসামাল হয়েছো মেয়েদের সামনে?',

'আলবত হয়েছি। একবার, দুবার নয়—অনেকবার। তবে হ্যাঁ, মদের ঝোঁকে তুমি যতোই আবোল-তাবোল বকে থাকো না কেন, বোকার মতো কাজ করে থাকো না কেন, তাতে কিসসু এসে যায় না মেয়েদের। তাই বলি কি জানো, ভুল করে সে সবের জন্য কখখনো ক্ষমা যেন চেও না ওদের কাছে। আর প্রেম করে ফুল পাঠিও, কিন্তু কখনো প্রেমপত্র নয়, স্রেফ ফুল। এ ব্যাপারে মানে এই প্রেম রোগের ফুল হচ্ছে মহা ওষুধ, তাতে সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, এমন কি কবরও।'

সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে এবার আমি বলে উঠলাম, 'তাহলে নাহয় আর একটু মদ খাওয়া যায়, কি বলো?' এই বলে রাম-এর বোতলটা খুললাম।

চাঁদটা এখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে। মনে হয়, আকাশ থেকে বুঝি একটা হলদেটে চীনা লণ্ঠন ঝুলছে। সামনের ওই পাম গাছের ডালগুলো ঈষৎ দুলছে। হঠাৎ লেনতস কাব্য করে বলে উঠলো, 'আচ্ছা মানুষের বেলায় খ্যাত অখ্যাত লোকের নামে কতো স্মৃতিস্তম্ভই না আমরা করে ফেলি, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, অমন সুন্দর চাঁদের আলো কিম্বা অমন ফুলে ফুলে ভরা গাছটার বেলায় কেন আমরা তা করি না। এই কথাটা কেন জানি না আমার ভীষণ ভাবায় এক এক সময়—'

তারপর আর কাল বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। সেই সেক্রেটারী আরণা বোনিগ-এর উঁচু পর্দায় গান গাওয়ার সুর ভেসে আসছে। খুব মিষ্টি ওর গলা। গানের কথাগুলোও চমৎকার—'তোমাকে ছাড়া দিন আমার কেমন করে কাটবে…তুমি আমার যে কে দুনিয়া জানতে'—হ্যাঁ, সত্যিই তো, প্রেমিক বা প্রেমিকা ছাড়া দিন কি করেই বা কাটবে! ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে তুমুল ঝগড়ার শব্দ ভেসে এলো। একটু পরেই দরজায় ধাক্কা পড়লো। তারপরেই হেসি এসে ঘরে ঢুকলো।

'অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করলে না তো?'…সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'না, না আমি কিছু মনে করিনি। বোসো, মদ খাবে?'

'না। আমি শুধু তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের দু'একটা কথা বলতে এসেছি।' উদাস চোখে সামনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আবার নিজের থেকেই বলে উঠলো, 'তুমি খুব সুখে আছো, একা কিনা—' সঙ্গে সঙ্গে তার কথায় প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি, 'ভুল, ভুল তোমার ধারণা। একলা থাকার সে কি বেদনা, কেবল আমিই জানি।'

আমার কথায় হেসি কেমন চুপসে গেলো। অনেকক্ষণ কথা বললো না। হঠাৎ এক সময় সে আবার বলে উঠলো, 'জীবন সম্পর্কে আমার অন্য রকম ধারণা ছিলো, ছিলো স্বপ্ন, ছিলো কল্পনা—'

'আমরা সবাই তাই করে থাকি', তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'কিন্তু বাস্তবে তার হিসাব মেলে না—'

আরো কিছুক্ষণ বসবার পরে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে চলে গেলো সে। মনে হলো সে বোধহয় তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মেটানোর জন্যেই অমন ঝড়ের গতিতে চলে গেলো! হেসি চলে যাবার পর একা বসে বসে আমি কতো কি না ভাবলাম—সে সবের মধ্যে কি করে যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে এলাম—সে সব কথাই বেশী করে মনে পড়তে থাকলো। তখন আমাদের বয়স কম হলেও সংসারের সব মোহ ঘুচে গিয়েছিল তারই মধ্যে। তবে আর যাই হোক না কেন, নিজেদের উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস তখনো হারাইনি। আমাদের ধারণা ছিলো, আমরা লড়ছি মিথ্যার বিরুদ্ধে, স্বার্থ-

পরতার বিরুদ্ধে, লোভ হিংসার বিরুদ্ধে, মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে, এ সবই আমাদের সকল দুঃখের মূলে। সব কিছুর উপরে আস্থা হারিয়ে আমাদের মনটা খিঁচিয়ে উঠলেও বিশ্বাস হারাইনি কেবল আমাদের বন্ধুদের উপরে। আর হারাইনি ওই আকাশ বাতাস, মাটি, গাছপালা, রুটি আর সিগারেটের উপরে। কারণ এরা কখনো মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে জানে না। কিন্তু এতো করেও কি লাভ হলো? আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ভেঙ্গে চুড়মাড় হয়ে গেছে। আদর্শ বিকৃত হয়েছে, কিম্বা বেশীর ভাগ লোক ভুলেই গেছে তাদের একদিন আশা ছিলো, ছিলো একটা নিটোল সুখের স্বপ্ন দেখা। সেই স্বপ্ন নিমেষে মিলিয়ে গেছে। এ লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে স্বার্থান্বেষীদের, দালালদের। আর হয়েছে মিথ্যারই জয়, চিরস্থায়ী হয়েছে মানুষের দুঃখ।

একটু আগে হেসি বলে গেলো, আমি নাকি একলা বলে বেশ আছি। হ্যাঁ, ওর কথাটা হয়তো ঠিক, যে মানুষ একা থাকতে অভ্যস্ত, নিজেকে তার নিঃসঙ্গ বলে মনে হবেই বা কেন! তবু রাত্রি নামলে জীবনের এই মনগড়া ধারণাটা কেমন ভেঙ্গে চুড়মাড় হয়ে যায় যেন, সব চাওয়া পাওয়া, আশা আকাঙ্ক্ষার বেদনায় বুকের ভেতরটা আর্তনাদ করে ওঠে। তখন কেবলি মুক্তির জন্যে হৃদয়টা হাহাকার করে ওঠে। সেই মুহূর্তে ছুটে পালাতে ইচ্ছে হয়, যেখানে খুশি। তখন ইচ্ছে হয় শুধুই একটু উষ্ণ স্পর্শের—সে কিসের? মনে হয় দুখানি নরম হাতের, কিম্বা ভালো লাগা একখানি মুখ আমার মুখে ছোয়ানোর। আবার ভাবি, হয়তো এ সবই ছলনা, লেনতসের কথাই ঠিক, ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া, এ বোধহয় নিজের কাছ থেকেই নিজের পলায়নবৃত্তি। তবে কি এর থেকে কোনো দিনও আমি মুক্তি পাবো না? আমার ভাগ্যের লিখন কি একলা থাকার? না, মুক্তি আমার কপালে লেখা নেই। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে কবেই। কোথাও যে একটু দাঁড়াবো, সেই স্থানটাই বা কোথায়?

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে গেলাম একটা দোকানে। সুন্দর দেখতে একটা ফুলের তোড়া বেছে দোকানীকে বললাম, এই ঠিকানায় সেটা পাঠিয়ে দিতে। কার্ডের উপরে যখন নাম ঠিকানা লিখলাম—মিস প্যাটরিসিয়া হোলম্যান, তখন নিজের কাছেই ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হলো যেন।

□ চার □

শত ছিন্ন পোশাক গায়ে চাপিয়ে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে গেছে কোণ্টার আমাদের কারখানার আয়ের উপরে ধার্য ট্যাক্স কিছু কমাবার ধান্দায়। কারখানায় তখন আমি আর লেনতস। গতকাল কাগজে আমাদের ক্যাডিলাক গাড়ির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। খদ্দের আসুক চাই না আসুক লেনতসকে বললাম, 'এসো, গাড়িটাকে আর একটু ঘষে মেজে নেওয়া যাক।'

তারপর রাস্তায় ট্রায়াল রান দিতে গিয়ে কিছু খুঁত বেরোলো—যেমন গাড়িটা শব্দ করে একটু ঝাঁকুনিও খাচ্ছিল, তাই টায়ার থেকে খেপে খেপে দু'দুবার হাওয়া বার করে দিলাম। গাড়ি নিয়ে ফিরে এলাম কারখানায়। মাথার ঢাকনাটায় সামান্য একটু আওয়াজ ছিলো তখনো, ঢাকনাটা খুলে এক টুকরো রবার গুঁজে দিলাম, তাতে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেলো। এখন গাড়িটা একেবারে ঝকঝকে, টিপটপ। এঞ্জিনটা এখন বেশ ভালো ভাবেই কাজ করছে, গিয়ারগুলোতেও যথেষ্ট তেল মাখানো হয়েছে, যাতে করে চলতে চলতে ফেঁসে না যায়।

এখন গাড়িটা খদ্দেরদের মন-পসন্দ হতে আর কোনো বাধাই রইলো না। শূন্যে হাত তুলে প্রার্থনা জানায় গটফ্রিড, 'হে ঈশ্বর, যতো তাড়াতাড়ি পারো পয়সাওয়ালা একটা খদ্দেরকে পাঠিয়ে দাও। খদ্দেরের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকি আমরা। কিন্তু খদ্দের আর আসে না। আমরা তখন সেই পাঁউরুটিওয়ালার ফোর্ড গাড়িটা মেরামত করতে শুরু করে দিলাম। সামনের এ্যাক্সলটা খুলে ফেলতে হবে। নীরবে আমরা দুজনে কাজ করে যাই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে, হঠাৎ এক সময় আমাদের পেট্রল পাম্পের ইনচার্জ জাপ-এর মৃদু চিৎকার শোনা গেলো—'দেখুন তো কে যেন আসছে বলে মনে হচ্ছে।' তাকিয়ে দেখি, বেঁটে, ছোটো-খাটো একটি লোক আমাদের ওই ক্যাডিলাক গাড়িটার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। বর যেন আমাদের গাড়িটা, আর কনের বেশে ওই আগন্তুকটি সাত পাকে বাঁধছে গাড়িটাকে।

সেদিকে এক নজর তাকিয়েই লেনতস বলে উঠলো, 'আমি এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকছি। তুমি বরং ওই লোকটার সাথে কথা বলো। দেখে তো মনে হচ্ছে খদ্দের ও। কোনো অসুবিধে হলে পরে আমাকে ডাকতে পারো। আমাদের কথা বলবার কৌশলগুলো তোমার মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, খুব মনে আছে', বলে এগিয়ে গেলাম লোকটির কাছে। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। তবু আমি নিজের থেকেই আমার

পরিচয় দিলাম—'লোকাম্প।' ভদ্রলোক এই প্রথম মুখ খুললেন, 'ব্লুমেনথল।' গটফ্রিডের প্রথম কৌশল প্রয়োগ করলাম, আগে ভাগে নিজের পরিচয় দেওয়ার অর্থ হলো, গোড়া থেকেই খদ্দেরকে নিজের লোকের মতো মনে করে ভাব জমানো। আর ওর দ্বিতীয় কৌশল হলো, নিজে চুপ করে থেকে এরপর খদ্দেরকে কথা বলতে দেওয়া, পরে সুযোগ মতো নিজে কথা বলা। নীরবে আমি এবার গাড়ির প্রধান যন্ত্রপাতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখাতে থাকলাম, ও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে, যদি তিনি এক আধটা খুঁত ধরেন, তখন না হয় কিছু একটা বলা যাবে। কিন্তু ব্লুমেনথল কোনো খুঁতই ধরলেন না, ধরবার চেষ্টাও করলেন না। আমার মতো তিনিও চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। আমার তখন মনে হলো, না এভাবে চুপ করে থাকলে চলবে না। নিজের ছেলের প্রশংসা যেমন সব মায়েরা করে থাকে, ধীরে ধীরে ক্যাডিলাকের গুণের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলাম। যদি ভদ্রলোক শুনতে শুনতে উৎসাহ বোধ করেন, এই ভেবেই আমার নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করলাম।

কিন্তু কিছুতেই লোকটিকে হাত করা গেলো না। শেষে থাকতে না পেরে বললাম, 'হের ব্লুমেনথল, আসুন একবার গাড়িটা ট্রায়াল দিয়ে দেখি।'

'ট্রায়াল রান?' লোকটি দারুণ ঝানু। কোনো রকম উৎসাহ না দেখিয়ে বরং তাচ্ছিল্যের মতোই বললেন তিনি, 'না, ট্রায়াল রান দিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং তার চেয়ে গাড়িটা কিছুদিন ব্যবহার করলে কোথায় গলদ বোঝা যায়।'

প্রচণ্ড রাগ হলো লোকটির উপরে। নিজের মনে বললাম, 'তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করো। ভেবেছো আমি বুঝি নিজের থেকেই আমাদের গাড়ির দোষ ত্রুটি তোমাকে বলে দেবো? না, ও ভুলটি আমি করছি না। কোনো মা কি তার ছেলের বদ অভ্যাসের কথা ভাবী পুত্রবধূর অভিভাবকের কাছে বলে কখনো। না, ওই বোকামি আমি করছি না।' আশা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, ট্রায়াল দিয়ে কাজ নেই।

যখন হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক তখনি ভদ্রলোক আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা গাড়িটার দাম কতো শুনি?' সঙ্গে সঙ্গে আমি একটুও চিন্তা ভাবনা না করেই বলে উঠলাম—'সাত হাজার মার্ক'।' আর মনে মনে বললাম, পাঁচ হাজার দিলেই পেতে পারো।

ভুরু কুঁচকে ব্লুমেনথল বললেন, 'দামটা বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে না?' তারপরেই তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ওর গলার স্বরটা এখন অনেকটাই বদলেছে। গাড়িটা মনে হয়, ও'র পছন্দ হয়েছে। কিম্বা এটা ও'র ভাঁওতাও হতে পারে।

এ সময়ে সুবেশ এক সুপুরুষ যুবককে কারখানার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে

দেখা গেলো। পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে নম্বরটা হয়তো মিলিয়ে দেখে নিয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। 'আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি একটা ক্যাডিলাক গাড়ি বিক্রীর জন্যে রয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওই তো।' হাতের ইশারায় দেখালাম গাড়িটা। যুবকটির হাতে ছিলো হলুদ রঙের বাঁশের একটা ছড়ি ও শুয়োরের চামড়ার দস্তানা।

ক্যাডিলাকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যুবকটি বলে উঠলো, 'গাড়িটা একবার টেস্ট করে দেখতে পারি?'

'আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখনো সামান্য একটু কাজ বাকী আছে। আসুন, আপনি ততক্ষণ আমাদের অফিস ঘরে গিয়ে বসুন। তারপর আমি তাকে অফিস ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে খিস্তি করলোম, 'ইডিয়ট, আর সময় পেলে না।' ব্লুমেনথলেব কাছে ফিরে গিয়ে বললাম তাঁকে, 'গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখলে, আশাকরি দামের ব্যাপারে আপনার আর কোনো আপত্তি থাকতো না। কিন্তু ও'র মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। একটু আগে সামান্য যে দুর্বলতাটুকু দেখা গিয়েছিল, এখন সেটাও উধাও। তার বদলে এখন তিনি যেন গ্রানাইট পাথরের মূর্তি বনে গেছেন। নির্বিকার ভাবে বললেন তিনি, 'আজ চলি। যদি ট্রায়ালের দরকার হয় ফোন করে জানাবো।'

'তাহলে আপনার ফোন নম্বরটা না হয় দিয়ে যান। কেউ কিনতে চাইলে আপনাকে জানাতে পারবো।'

আমার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে ব্লুমেনথল বললেন, 'কিনতে চাওয়া আর কেনার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত, বুঝলেন। এই বলে সিগার কেস থেকে একটা সিগার বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। বাপরে এ যে 'করোনা' ব্রাণ্ডের। মনে মনে বললাম, এ যে দেখছি টাকার কুমির। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। লোকটা বিদায় নিতে ও'র চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে খুব গালি দিলাম ও'কে। তারপর কারখানার অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকতেই সেই সুবেশ যুবকের ভূমিকায় আমাদের শ্রীমান লেনতস লাফিয়ে উঠে বললো, 'কেমন অভিনয় করলাম বলো তো দোস্ত। ওই লোকটা তোমাকে নাজেহাল করছে দেখে ঠিক করলাম, একটা চাল দেওয়া যাক ও'কে। অবশ্য অটো ইনকাম ট্যাক্স অফিসে যাবার সময় ওর ভালো সুটটি এখানে রেখে গিয়েছিল, আমি সেটার সদ্ব্যবহার করলাম। তারপয় অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে কারখানার গেট দিয়ে ঢুকে পড়ি। আমার ফন্দিটা দারুণ, তাই না?'

'দারুণ না ছাই!' আমি বললাম, 'তুমি একটা আস্ত বোকা। আর ও বেটা দারুণ চতুর আর ধড়িবাজ। এই সিগারেটটা দেখছো তো—একটার দাম দেড় মার্ক। কোটিপতি ছাড়া এমন দামী সিগার অন্য কেউ খেতে পারে না। তোমার বোকামিতে

ও'র মতো একজন কোটিপতি খরিদ্দার হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের।'

গটফ্রিড আমার হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বললো, 'কোটিপতি না ছাই! ওর মতো একটা জুয়াচোরের হাত থেকে তোমাকে যে রক্ষা করতে পেরেছি, সেটা আমাদের সৌভাগ্য। আজকাল কোটিপতিরা কখনো দামী সিগার খায় না। ওরা সিগার খায় এক শিলিং-এ চব্বিশটি করে যে সিগার পাওয়া যায়, বুঝলে হাঁদারাম।' তারপর ও আরো বললো, 'দেখো, ব্যাটা আবার ঠিক ফিরে আসবে।' কেমন নিশ্চিন্তে আমার সিগারে সুখটান দিয়ে আমারি মুখের উপরে ধোঁয়া ছাড়তে থাকলো।

আমি রেগে গিয়ে ওকে পরামর্শ দিলাম, 'শোনো গটফ্রিড, এখানে থেকে তুমি শুধু শুধু তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছো। তাই বলছি, এখান থেকে তুমি বরং কোন থিয়েটার কোম্পানীতে যোগ দাও, ওটাই হবে তোমার আসল জায়গা।'

মধ্যাহ্নভোজের সময় কি খেয়াল হলো ঘরে ফিরে এলাম, অন্যদিন এ সময়ে ঘরে ফিরি না। ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ট্যারা চোখের পরিচারিকা ফ্রিডা আমার সামনে এসে শুধালো, 'একজন ভদ্রমহিলা আপনাকে ফোন করছিলেন। উনি বলেছেন, সন্ধ্যাবেলায় আবার ফোন করবেন। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, সন্ধ্যায় ফোন করলে আপনাকে পাবেন না, কারণ ওই সময়ে আপনি তো ঘরে থাকেন না।'

'অ্যাঁ, তুমি তাই বলে দিলে?' আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'ছিঃ ছিঃ, এতদিনেও ফোনে কি করে কথা বলতে হয় শিখলে না?'

ফ্রিডাও চোখ পাকিয়ে জবাব দিলো, 'খুব শিখেছি, নতুন করে আপনার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে আর হবে না। আপনি সন্ধ্যেবেলায় কখনো বাড়িতে থাকেন, বলুন?'

আমার কথায় আমলই দিতে চায় না ফ্রিডা। রেগে গিয়ে বললাম, 'যা এখান থেকে ভাগ!'

সন্ধ্যা ছ'টায় আবার বাড়ি ফিরে এসে দেখি, তুমুল উত্তেজনা। প্যাসেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাউ বেন্ডার। বোর্ডিং-এর সব মেয়েরা চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। আমাকে ডেকে ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বললো, 'একবার এদিকটায় আসবেন লোকাম্প?' সেখানে গিয়ে দেখলাম, একটি মাস ছয়েকের শিশুকে নিয়ে এই উত্তেজনা, উৎসাহ আর জনসমাগম। ফ্রাউ বেন্ডার একটা অনাথ আশ্রম থেকে এই শিশুটিকে নিয়ে এসেছে। মেয়েগুলো এমন উচ্ছ্বাস আর আদেকলাপনা দেখাচ্ছে, দেখলে মনে হবে এ সংসারে এই প্রথম শিশুটি জন্ম নিয়েছে।

এমন কি কিনানো আরণা বোনিগও এই পোশাকি মাতৃত্বের অভিনয়ের অভিনেত্রীর সামিল হয়ে গেছে। ফ্রাউ জালেওয়াস্কির চোখে জল নয়, আনন্দাশ্রু। 'বাচ্চাটি কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, তাই না বব?' আমার তখন চিন্তা শুধু প্যাটরিসিয়ার ফোন কখন আসে, লক্ষ্য শুধু টেলিফোনের দিকে। তাই বলতে হয় বললাম, 'এখন বলা খুবই মুশকিল, আরো কয়েক মাস যাক, তখন বোঝা যাবে কেমন দেখতে হয়েছে।' দেখলাম, আর পাঁচটা শিশুর মতোই দেখতে হয়েছে, পরে এ মুখের আদল বদলে যাবে অনেক।' আমি নিজেও একদিন ওই রকম বাচ্চা ছিলাম। আর আজ আমার কি অবস্থা? ভাবতে অবাক লাগে। নিজের থেকেই আবার বললাম, 'বেচারী, কি কঠিন সংসারে এসে হাজির হলো ও। কে জানে কোন লড়াই-এর জন্যে তৈরী থাকতে হবে ওকে।'

'ছিঃ ছিঃ এমন অলুক্ষুণে কথা তোমার মুখে এলো কি করে?' আঁতকে ওঠার মতো করে বললো ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, 'তোমার কি একটুও দয়া মায়া বলতে কিছু নেই?'

'কেন থাকবে না? একটু বেশী মাত্রায় আছে বলেই তো বললাম।' কথা আর না বাড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। আমার নাম শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখনো ওদের ফুর্তি'র হল্লা চলছিল। রিসিভারে কান রাখতেই প্যাটরিসিয়ার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম। ও আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ফুল পাঠানোর জন্যে। ওদিকে ওদের হৈ-হল্লায় জ্বালায় আমি তখন তিতি বিরক্ত। ওদের মধ্যে বাচ্চাটার তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান ছিলো। কিন্তু সেও এখন ওদের আদরের অতিশয্যে উত্ত্যক্ত হয়ে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে। বাচ্চাটা অসাধারণ বটে, মনে হয় ওর বুক থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত ফুসফুসটা পেঁছে গেছে, তা না হলে ওই ছোট্ট যন্ত্রটা থেকে এতো জোরে শব্দ বেরিয়ে আসতে পারে? কি ঝামেলায় না পড়া গেলো। এক দিকে অতোগুলো মেয়ের মাতৃত্বের বিচিত্র অভিনয়ের কলরব সামলানো, আর এক দিকে টেলিফোনে মেজাজ ঠিক রেখে যতোটা সম্ভব মিষ্টি গলায় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা। রাগে আমি তখন জ্বলছি ভেতরে ভেতরে। যাইহোক, কেমন করে যে ওই হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও মেজাজ ঠিক রেখে পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করলাম, সে কথা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি এখন।

কথা মতো সেদিন সন্ধ্যায় গটফ্রিডের ঘরে আমরা জমিয়ে আড্ডা দেবো। পথে একটা খুব জমকালো টাই কিনে নিলাম কাল সন্ধ্যায় ব্যবহার করবার জন্যে। সুযোগ যখন আর একবার পাওয়া গেছে, এবার মেয়েটির সঙ্গে আর ফাজলামো নয়, নিজেকে সংযত রাখতে হবে।

গটফ্রিডের ঘরটা রীতিমতো সাজানো গোছানো। লেনতস আর কোষ্টার ছাড়া ব্রাউমুলার আর গ্রাউও উপস্থিত ছিলো। রোদে পোড়া চেহারা, তামাটে রঙের ব্রাউমুলার বহুদিনের বন্ধু কোষ্টারের। একটা মোটর মেরামতির কারখানায় কাজ করে, এবং মোটর রেস বিলাসী। ছয় তারিখের রেস-এ সেও যোগ দিচ্ছে। ওদিকে শক্ত সমর্থ চেহারার ফার্ডিনান্ড গ্রাউ একটা টেবিলের সামনে বসে আছে। এরই মধ্যে সে প্রায় অর্ধ মাতাল। আমার দিকে সে তার লম্বা হাতখানি প্রসারিত করে জ্ঞান দিলো, 'আশ্চর্য, ববু তুমি এখানে এই বদ আড্ডায় কেন? নিজের ভালো চাও তো সময় থাকতে কেটে পড়ো এখান থেকে।'

আমি কিছু বলার আগেই লেনতস বলে উঠলো, 'ফার্ডিনান্ড খুব মেজাজে আছে এখন। গত দুদিন ধরে ও ওর মৃত বন্ধুদের স্মরণ করে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলে যাচ্ছে। একটা ছবি বিক্রী করে অনেক টাকা পেয়েছে ও। তাই—'

ছবি আঁকে ফার্ডিনান্ড। ফটোগ্রাফ দেখে চমৎকার পোট্রেট এঁকে নাম না করলে এতদিনে না খেতে পেয়ে মরে যেতো ও। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে ওকে দিয়ে পোট্রেট আঁকিয়ে নেয় শোকার্ত পরিজনবর্গ। কিন্তু ওর ল্যান্ডস্কেপেও যে চমৎকার হাত আছে, কেউ জানে না। এজন্য ওর মনে দারুণ ক্ষোভ আছে, সেটা প্রকাশ পায় ওর কথাবার্তায়। ও আমাকে বললো, 'এক হোটেলওয়ালার খুড়ি কিংবা জ্যেঠির ছবি আঁকতে হবে। যাই বলো, কাজটা খুবই বিশ্রী।

'ও কথা বলছো কেন ফার্ডিনান্ড?' বাধা দিয়ে বলে উঠলো লেনতস, 'মানুষের চরিত্রের এই বড় গুণের সুবাদেই তুমি রোজগার করে থাকো, যাকে বলা হয়, মানুষের ধর্মবুদ্ধি।'

ফুঁসে উঠলো ফার্ডিনান্ড। 'থোরাই ধর্মবুদ্ধি। বরং ওটা পাপবুদ্ধি বললেই ঠিক হবে। পাপের ভয়েতেই ওদের এই ধর্মে মতি হওয়া। জীবিত অবস্থায় প্রতিদিন আমরা যার মৃত্যু কামনা করে থাকি, আবার সেই আত্মীয়টির মৃত্যু হলে তার শোকে আমরাই আবার মর্মাহত হয়ে উঠি। এটা কি ভন্ডামো নয়? আসলে শোক জ্ঞাপন করাটা হলো পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কপাল মুছে সে আবার বলতে থাকে, 'আমার এই হোটেলওয়ালার কথাই ধরো না কেন! আমি তো জানি, কতকাল ধরেই না সে তার ওই বুড়ি খুড়ির মৃত্যু কামনা করে এসেছে। অথচ সেই বুড়ির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তবড় একটা পোট্রেট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। একে তুমি কি ধর্মবুদ্ধি বলো? ধর্ম, মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য—এসব কথা মানুষ থোড়াই চিন্তা করে। বরং যে কোনো লোক চাইবে, এসব গুণগুলো অপরের থাক, যাতে সে নিজে তার ফয়দা লুটতে পারে।'

'আজকের সমাজের খুঁটি যার উপরে, তুমি সেটাকেই দোষারোপ করছো?' হেসে বললো লেনতস।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলো গ্রাউ। 'আরে তোমার সমাজ তো যে সব খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো হলো লোভ, হিংসা আর নষ্টামি। আজ প্রতিটি মানুষ যে যার কুমতলব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ঘুণ ধরা সমাজে। তার একান্ত কামনা, অপরের ভালো হোক তাহলেই তার লাভ।'

'এখন থামো তো! বক বক করে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করো না।' গ্লাস এগিয়ে দিয়ে লেনতস বললো, 'এবার একটু মদ ঢেলে দাও তো এর মধ্যে!'

অদূরে একটা সোফার পাশে দাঁড়িয়েছিল কোষ্টার। ওর কাছে গিয়ে আমি আমার কাজের কথাটা সেরে নিতে গিয়ে বললাম, 'কাল সন্ধ্যায় কিছু সময়ের জন্য ক্যাডিলাক গাড়িটা দিতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু গাড়িটা তো ইনসিওর করা হয়নি', বললো কোষ্টার।

'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, খুব সতর্ক ভাবে গাড়ি চালাবো আমি।

'বেশ, তুমি পাবে গাড়িটা।' রাজী হয়ে গেলো অটো।

ফার্ডিনান্ড গ্রাউ আমাদের আলোচনা শুনে থাকবে। বললো সে, 'বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছো? তা বেশ, যাও বব, যাওয়া দরকার। তোমার মনটা সরল, ভালোবাসার ব্যাপারে মনটা সরল থাকা দরকার।' ওটা ঈশ্বরের দান, যত্ন করে রেখে দিও। নষ্ট হতে দিও না, কেননা আর ফিরে পাবে না।'

'ও এমনি। ওর কথা ধরো না', হেসে বললো লেনতস, 'সরল তথা বোকা হয়ে জন্মাতে লজ্জার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, বোকার মতো না মরলেই ভালো।'

'তুমি চুপ করো তো হে', বাধা দিয়ে বলে উঠলো গ্রাউ, 'তুমি হচ্ছো এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। বাস্তব জীবনটাকে এড়িয়ে চলাই তোমার অভ্যাস।'

'শুধু আমাকেই বা বলছো কেন?' হেসে বললো লেনতস, 'এই একই পথের পথিক আমরা। মোহ, আকাঙ্ক্ষা আর অনিশ্চিতের আশা নিয়েই তো আমাদের জীবন।'

গ্রাউ আমাদের সবার দিকে এক এক করে দৃষ্টি ফেলে বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো লেনতস, 'অতীতের মোহ আর ভবিষ্যতের আশা নিয়েই আমরা সবাই বেঁচে আছি। কিন্তু বব, আমি সেই সরলতার কথা বলছিলাম, হিংসুটেরা যাকে নির্বুদ্ধিতা ভাবে। সেটা কখনো নয়, সেটা ঈশ্বরের বড় দান। আসলে আমি সেই সরলতার কথা এখানে বলছি, চতুর সংসারী ব্যক্তির সংশয়ী মন যাকে গ্রাস করেনি। সংসারী অর্থে পার্শিফাল ছিলো নির্বোধ। আর অতি চতুর ধড়িবাজ হলে তার পক্ষে হোলি গ্রেল জয় করা সম্ভব হতো না। জেনে রেখো, জীবনযুদ্ধে কেবল সরল প্রকৃতির বোকা লোকেরাই জয়লাভ করে। বুদ্ধিমানেরা প্রতি পদে বাধা আর সঙ্কটের কল্পনায় কেবলি পিছিয়ে পড়ে। বিপদে সরলতার মতো গুণ আর কিছু নেই। সব বিপদে সেটাই তার রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। আবার দেখো, বুদ্ধিমান সাবধানী লোক

ওই বিপদের গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্ধের মতো।'

নীরব হলো ফার্ডিনান্ড। অর্ধমাতাল অবস্থায় নিজের চিন্তায় মগ্ন সে এখন। এখন তাকে দেখলে মনে হয় যেন হতাশ আর বিষাদের একটা বিরাট পাথরের মূর্তি বনে গেছে। সে জানে তার জীবন ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে, যা আর কোনোদিনও জোড়া লাগতে পারে না। সে তার স্টুডিওতেই পড়ে থাকে প্রায় সব সময়। যে স্ত্রীলোকটি তার ঘরদোরের যাবতীয় কাজ করে তারই সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে তার। সেই স্ত্রীলোকটি শুধুই কুরূপা নয়, তার রুচিও অত্যন্ত হীন। ওদিকে গ্রাউ-এর দেহটি বিশাল হলে হবে কি, তার মনটা খুবই নরম। তাই কি ওই নগন্য মেয়েটির মায়া কাটাতে পারছে না সে? বিয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে তার। ওকে নেশায় ধরেছে। আমার হাতে মদের গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললে সে, 'ওই সরলতার নাম করে এটুকু মদ খেয়ে নাও। আর যা যা বললাম ভেবে দেখো। আমি আবার তোমাকে বলছি, আগে নিজেকে বাঁচাও তবে অন্যের কথা ভেবো। তা না হলে ডুবে মরবে তুমি।'

'হক কথাই তুমি বলেছো ফার্ডিনান্ড', আমি বললাম, 'মনে থাকবে আমার।'

প্যাটরিসিয়া হোলম্যানের প্রবেশপথে একটা ল্যাম্পপোষ্টের নিচে ক্যাডিলাকটাকে পার্ক করে রাখলাম। আমার পোষাকের চাকচিক্য আরো একটু বাড়িয়েছি। নতুন একটা টাই তো ছিলোই, সেই সঙ্গে নতুন একটা হ্যাট, একটা নতুন দস্তানা। তাছাড়া লেনতসের কাছ থেকে ধার করা একটা শেটল্যান্ড উলের ওভারকোট। নিজেকে এমন ভদ্রবেশে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্য একটাই, প্রথম দিনের মাতলামির কলঙ্কটা একেবারে মুছে ফেলব।

গাড়ির হর্ন বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে আলোর খাঁচার মতো লিফটটা নেমে এলো নিচে। পাঁচতলার বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি, তারই একটা ফ্ল্যাটে থাকে প্যাটরিসিয়া হোলম্যান। আমায় গাড়ির কাছে ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো ও। 'সারাটা দিন ঘরেই কাটিয়েছি, এখন বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।' ওর পরণে বাদামী রঙের আঁটসাট স্কার্ট আর ফার-এর খাটো জ্যাকেট। ওর হাতের ঝাঁকুনির মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিলো। ভালোই লাগলো ওর উষ্ণ হাতের স্পর্শটুকু।

'আরে ক্যাডিলাক যে', অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্যাটরিসিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো বলে উঠলো, 'এ গাড়ি তোমার?'

'আজকের সন্ধ্যাবেলার জন্যে এটা আমার বলে ধরে নিতে পারো। তবে এটা আমাদের কারখানার সম্পত্তি, বিক্রী করে বড় রকমের মুনাফা লুটতে চাই আমরা।' গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললাম, 'গাড়িতে উঠে বসো। বসন্তের একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক।

আলফনস-এর রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলাম ওকে। 'বাঃ আলফনস নামটা তো বেশ', সাইনবোর্ড দেখে লাফিয়ে উঠলো প্যার্টরিসিয়া।

'হ্যাঁ, আলফনস আমাদের লেনতসের বন্ধু। এটা ওর বিয়ারের দোকান।'

আলফনস লোকটি বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান। উঁচু চোয়াল, বিরাট দেহের তুলনায় ওর চোখ দুটি খুবই ছোটো, আর গেরিলার মতো লোমশ হাত দুটো। সেই লোমশ হাত দিয়ে নিজেই টেবিলটা মুছে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেবো? বিয়ার?'

'না, জিন দাও, আর সেই সঙ্গে কিছু খাবার দিও।' আলফনসকেও আমাদের মদের টেবিলের সাথী করে নিলাম। তাছাড়া আলফনস নিজেই রান্নাঘরে চলে গেলো নিজের হাতে পর্ক-এর চপ আর গরম গরম সসেজ আনতে। আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললাম, 'আলফনসকে তুমি কি যাদু করেছো জানি না, তা না হলে নিজের হাতে কখনো খদ্দেরদের সার্ভ করে না সে!

গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে আলফনস বললো, 'এসো, আমাদের ভাবী সন্তানের পিতারা সন্তান সন্ততিদের নিয়ে ঐশ্বর্যশালী ও সুখী হোক।'

প্যাট্রিসিয়া এক চুমুকে সবটা গলাধঃকরণ করতেই আলফনস লাফিয়ে উঠলো, 'সাবাস! এই না হলে মদ খাওয়া জমে?' এই বলে উঠে দাঁড়ালো কাউন্টার থেকে আরো জিন আনবার জন্যে।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগলো জিন?'

'খুব ঝাঁঝ। কিন্তু আলফনস বেচারীর মন রাখতে ওকে আশাহত করতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, এই যে আলফনসকে দেখছো, একটা জায়গায় ওরও দুর্বলতা আছে!'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দেখে তো ওর কোনো দুর্বলতা আছে বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি!' বলে ওপাশের একটা টেবিল দেখিয়ে সেটার উপরে রাখা গ্রামোফোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'নাচ নয়, ধ্রুপদী গান নয়, স্রেফ কোরাস গানের খুবই ভক্ত ও।' সেই আলফনসকে ফিরে আসতে দেখে আমি বললাম, ওই যে আমাদের সঙ্গীতবিলাসী আসছেন—'

আলফনস জানতে চাইল কেমন লাগলো আমাদের পর্ক চপ। উত্তরে আমি বললাম, 'অপূর্ব', ঠিক আমার মা যেমন করে রান্না করেন। আর আমার সঙ্গিনীর উত্তর হলো, 'জীবনে এই প্রথম ওর এতো ভালো চপ খাওয়া।'

খুশিতে উপচে পড়ে আলফনস বলে উঠলো, 'তাহলে এই খুশির আমেজে একটা নতুন রেকর্ড তোমাদের বাজিয়ে শোনাই। শুনলে অবাক হয়ে যাবে তোমরা।' সেই গ্রামোফোনের কাছে গিয়ে ওর সেই পছন্দের রেকর্ডটা চালিয়ে দিলো। রেকর্ড থেমে যেতেই আমাদের সামনে ছুটে এলো আলফনস। 'কেমন লাগলো?' জিজ্ঞেস

করলো ও। 'চমৎকার! উত্তরে আমি বললাম। আর প্যাটরিশিয়া বিশেষ এক জনের প্রশংসা করতেই আফন বলে উঠলো, 'সত্যি, আপনি একজন সমঝদার বটে! ওই গায়কটি একেবারে আলাদা জাতের।'

আলফনসের দোকান থেকে বেরিয়ে হঠাৎ প্যাটরিসিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি শীতে কাঁপছে ও। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি খুব শীত করছে?' কলার তুলে দিয়ে জ্যাকেটের হাতার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলো ও, 'না, না, তেমন শীত নয়, ওখানকার গরম আবহাওয়ার ভেতর থেকে বেরিয়েছি বলেই গাটা একটু শিরশির করছে, এই যা—'

'এসো, গাড়ির ভেতরে শরীরটা একটু গরম করে নাও।' গাড়ির দরজা খুলে ওকে ভেতরে বসিয়ে একটা কম্বল বিছিয়ে দিলাম ওর হাঁটু পর্যন্ত, কি মনে করে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললো ও, 'আঃ কি আরাম! সত্যি শীত বড় বিশ্রী ব্যাপার, মেজাজটাই খারাপ করে দেয়।'

'কেবল শীতই কি মেজাজ খারাপ করে দেয়?' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বললাম, 'তাহলে এখন একটু বেড়ানো যাক, কি বলো?'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললো ও, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। আমার পাশে বসে আছে মেয়েটি, মুখে কথা নেই ওর। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তার ও বিজ্ঞাপনের আলো ছায়ার খেলা চলেছে ওর মুখের উপরে। আড়চোখে ওকে লক্ষ্য করছিলাম। প্রথম যেদিন ওকে দেখি সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ছে। সেদিনের তুলনায় আজ ওর মুখের ভাবটা আরো বেশী গম্ভীর, ব্যবধান আরো যেন বেশী। কিন্তু তা সত্বেও আজ যেন আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। এরই জন্যে বোধহয় প্রথম সাক্ষাতে ও আমার মনকে এমন ভাবে দোলা দিয়েছিল যে, সেই কারণে মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না ওকে। মনে হয়েছে ওর এই নীরব প্রশান্তি যেন প্রকৃতির দান—যা দেখা যায় তরুলতায়, আকাশের মেঘে, অরণ্য প্রাণীদের মধ্যে, আর দেখা যায় কচ্চিৎ কোনো দুর্লভ নারীর মধ্যে—প্যাটরিসিয়া হচ্ছে সেই দুর্লভ নারী।

শহর ছাড়িয়ে আমরা শহরতলীর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তা ক্রমশই জনহীন হয়ে পড়ছে। একটা পার্কের সামনে গাড়ি থামালাম। নড়ে চড়ে বসলো প্যাটরিসিয়া সবে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো করে। আড়মোড়া ভেঙ্গে বললো ও, 'খুব ভালো লাগছে আজকের এই সন্ধ্যাটা। আমার যদি এরকম একটা গাড়ি থাকতো, রোজ সন্ধ্যায় এমনি বেরিয়ে পড়তাম, আর তখন কোনো মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হতো না।'

'তার মানে তুমি বলছো, সন্ধ্যাবেলায় একটা কিছুর প্রয়োজন হয়?'

'হয় বৈকি।' মাথা দুলিয়ে বললো ও, 'সন্ধ্যা নামলেই মনের ভেতরটা কেমন তোলপাড় করে ওঠে—'

'তাই বুঝি?' প্যাকেট থেকে দুটি সিগারেট বার করে একটা আমি নিজে ধরিয়ে আর একটা ওর ঠোঁটে লাগিয়ে দেশলাই-এর আগুন ধরিয়ে দিলাম। সেই দেশলাই-এর আগুনে মুহূর্তের জন্যে ওর মুখ আর আমার হাতের স্পর্শ যোগ লক্ষ্য করে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগলো আমার মনে। আর তখনি মনে হলো, ও যেন আমার কতকালের চেনা, আর আমি ওর বহু পরিচিত মুখ।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে বললাম ওকে, 'এবার তুমি নিজে নিজে গাড়ি চালাবে, দেখবে খুব ভালো লাগবে!'

'ইচ্ছে তো খুব করে, কিন্তু আমি যে গাড়ি চালাতে জানি না।'

'কেন বিনডিং তো তোমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিতে পারতো।'

ম্লান হাসি হাসলো ও। 'গাড়িই বিনডিং-এর প্রাণ। যে লোক তার গাড়ির কাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে, সে গাড়ি চালানো শেখাবে আমাকে?'

'একেবারে বোকা লোক যাকে বলে আর কি!' সুযোগ পেয়ে ওই হোদল-কুতকুতের মতো দেখতে লোকটার উপরে একটু ঝাল ঝেড়ে নিলাম। 'এসো, আমি আজ তোমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিই' কোষ্টারের সব সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই ওকে চালকের আসনে বসে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রাখতে বললাম।

ও তখন আনন্দ আর উত্তেজনায় দারুণ অস্থির। তবু ও রাজী হচ্ছিলো না। আপত্তি জানালো, 'সত্যি বিশ্বাস করো, আমি গাড়ি চালাতে জানি না।'

'খুব জানো', আমি ওকে কপট ধমক দিয়ে বললাম, 'তুমি মি পারো আর না পারো, সে তুমি নিজেই জানো না।' এই বলে কেমন করে গিয়ার বদলাতে হয়, কেমন করে পা দিয়ে ক্লাচ চেপে ধরতে হয়, আরো কিছু খুঁটিনাটি জিনিষ শিখিয়ে দিয়ে বললাম ওকে, 'এবার নির্ভয়ে গাড়ি চালাও তো দেখি!' এই ভাবেই ওর গাড়ি চালানোর প্রথম হাতেখড়িটা হলো আমার হাতে। মোটামুটি প্রথম দিনেই সফল ও। ওকে ভালো করে শিখিয়ে দিলাম, কি করে গাড়িতে স্টার্ট দিতে হয়, ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে হয়, ইত্যাদি।

একবার গাড়ি থামিয়ে আর স্টার্ট দিতে পারে না প্যাটরিসিয়া। কোটের বোতাম খুলে ফেলে ও, খুব ঘেমে গেছে। ঘাম মুছে বললো ও, 'যে-ভাবেই হোক, গাড়ি চালানো শিখতেই হবে আমাকে, সহজে হাল ছাড়ছি না।'

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও আমার গাড়ি চালানো লক্ষ্য করতে থাকলো তারপর থেকে। এরপর একবার সাহস করে নিজের চেষ্টায় বাঁক ঘুরতেই তখন ওর ফূর্তি দেখে কে! আধঘণ্টা পরে আমি যখন নিজে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চললাম, তখন আমার মনে হলো, আমাদের দুজনের এ ওকে জানার পর্ব শেষ, এ ওর কথা

কিছুই আর জানতে বাকি নেই।

এক সময় নিকোলাইস্ট্রস'এর কাছাকাছি এসে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বললাম, 'অনেক ধকল গেছে আমাদের শরীরের উপর দিয়ে, এখন পেটে কিছু পানীয় না পড়লেই একেবারে নয়। কিন্তু কোথায় যাই বলো তো?' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে প্যাটরিসিয়া বলে উঠলো, 'চলো যাই, সেই জাহাজের সাইনবোর্ড দেওয়া বারটিতে।' আঁতকে উঠলাম ওই বার-এর নাম শুনে। ওখানে যাবো কি? আরে এই সময় তো আমাদের প্রেমিক লেনতস ওর প্রেমিকা লিনাকে ধরবার জন্যে ওখানে বসে থাকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'অন্য কোনো ভালো জায়গায় গেলে হতো না? ওকে নিবৃত্ত করবার জন্যে আরো বললাম, 'তাছাড়া এই সময় ওখানে বড্ড ভীড় লেগে থাকে।'

'তা হোক, আমি ওখানেই যেতে চাই, জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে', জোর দিয়ে বললো প্যাটরিসিয়া।

অগত্যা ওর কথা শুনতেই হলো। তবে আমার ভাগ্য ভালো যে, ওখানে গিয়ে দেখি, ভ্যালেনটাইন ছাড়া আমার চেনা জানা কেউ নেই। ভ্যালেনটাইনকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, গটফ্রিড এসেছিল এখানে?'

'হ্যাঁ, ও এসেছিল অটোকে সঙ্গে নিয়ে। আধঘণ্টা আগে ওরা দুজনেই চলে গেছে', সুখবরটা দিলো ভ্যালেনটাইন।

বাঁচা গেলো, মনে মনে বললাম। কিন্তু ভেতরে গিয়ে মিনিট দশেকও বসিনি তখনো, হঠাৎ দেখি লেনতস কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আবার। সর্বনাশ! ওদিকে মজা লুটবার জন্যে ভ্যালেনটাইন আবার আমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে লেনতসের চেহারাটা গেলো বদলে—ছায়াছবির কোনো দৃশ্যে ডুবন্ত জাহাজের নাবিককে কোনো সামুদ্রিক জানোয়ার গিলতে এলে যেমন মুখের চেহারাটি হয়, ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছিল লেনতসকে। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো ও। করুণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ও যেন এখুনি চলে যায় এখান থেকে। কিন্তু ও ব্যাটা বুঝেও আমার সেই ইঙ্গিতের ধার দিয়ে গেলো না। উল্টে এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলো। কপালে আমার যাই থাকুক না কেন, ওর মুখ বন্ধ করবার জন্যে বললাম, 'ফ্রাউলান বমলাটকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলে নাকি?'

কেমন সহজ ভাবে ও বললো, 'হ্যাঁ!' ফ্রাউলান বমলাটের নাম তো জন্মেও কখনো শোনেনি, ওর মুখ দেখে সেই ভাবটা একেবারে প্রকাশই পেলো না। কেমন চালাকি করে আরো বললো, 'ভালো কথা, উনি তোমাকে স্মরণ করেছেন। আর কাল সকালেই ওঁকে ফোন করতে বলেছেন।'

আমিও দমবার পাত্র নই। মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ফোন তো করবোই। তবে আমার ধারণা, উনি বোধহয় গাড়িটা কিনতে চান, সেই জন্যেই ফোন করতে বলেছেন। লেনতস কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, চোখ বড় বড় করে তাকাতেই ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেলো ও। তারপর ওর আর আমাদের জন্যে মদের ফরমাস দিলাম।

গটফ্রিডের ফূর্তি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। সেদিনের মতো যাতে বেসামাল হয়ে না পড়ি আর মদ খাবো না ঠিক করলাম। এবার উঠতে হবে। রাতও হয়েছিল। পথে এ্যামিউজমেণ্ট পার্কে কিছুক্ষণ হাওয়া খাওয়া গেলো। সেখানেই লিনার দেখা পেলো লেনতস। এবার সেও আমাদের সাথী হলো গাড়িতে। বেশ ফূর্তি করলাম আমরা চারজন। লিনা নেমে যাবার সময় বললো, 'আজ সন্ধ্যাটা বেশ কাটলো, অনেকটা খ্রীষ্টমাসের মতো। আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো সে, 'বিদায় বন্ধু, বিদায়।'

পথে লেনতস বললো, 'আমাকে ইণ্টারন্যাশনাল বার-এ নামিয়ে দিও। একটু ব্রাণ্ডি খেয়ে ঘরে ফিরতে চাই।'

ইণ্টারন্যাশনাল বার-এ ওকে নামিয়ে দেবার পর প্যাটরিসিয়াকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেলাম। ও ওর বাড়ির দরজার সামনে একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়ালো। ল্যাম্পের আলোয় আজ ওর মুখখানি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর ঘরে যাই। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা দমন করে বললাম, 'শুভরাত্রি। আশাকরি ভালো করে ঘুম হবে।' আমার দিকে হাত প্রসারিত করলো করমর্দন করবার জন্যে। 'শুভরাত্রি' বলে সিঁড়ি বেয়ে ও ওর ফ্ল্যাটে উঠে গেলো ফিরে আসবার সময় মনে হলো, আজকের রাতটা বড় অদ্ভূত বলে মনে হচ্ছে। অন্য সব রাতে অন্য সব মেয়েদের নিয়ে যখন খুব ঘোরাফেরা করেছি, আজকের রাতটা যেন ঠিক তেমনটি নয়। আর মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে আজ, বেশ খুশ মেজাজ। কিন্তু অন্য মেয়েদেয় ক্ষেত্রে মনের বালাই বলতে কিছু ছিলো না।'

ইণ্টারন্যাশনাল বার-এ আবার ফিরে এলাম। প্রায় খালি বার। এক কোণে বসে ফ্রিতসি আর ওয়েটার এলয়স ঝগড়া করছে। আর গটফ্রিড একটা সোফায় বসে আছে। ওর দু'পাশে মিমি ও ওয়ালি বসেছিল। মেয়ে দুটি বেরিয়ে গেলো একটু পরেই—এটাই ওদের শিকার সন্ধানের সময়। আমি গটফ্রিডের পাশে বসে কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, 'এখন তোমার যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেলো।' ……আমাকে অবাক করার মতো করে বললো ও, 'কেন বব, তুমি ঠিক করেছো, কোনো ভুল তো করনি।' প্যাটরিসিয়ার আর আমার মধ্যে গড়ে ওটা সম্পর্কটা যে ও এতো সহজভাবে নেবে, ভাবতেই পারিনি আমি। চিন্তামুক্ত হয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। ও আরো বললো, 'লজ্জা পাচ্ছো কেন এ ব্যাপারে? তোমার অবস্থায়

পড়লে আমিও ঠিক তোমার মতোই ওই মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাতাম।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম, 'তুমি কি বলতে চাইছো, ঠিক বুঝতে পারছি না লেনতস।'

আমার দিকে সোজা দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে ও বললো, 'শোনো বব, তোমায় বলে রাখি, সংসারে এই একটা জিনিষই ধর্তব্যের মধ্যে আর বাকী সব মূল্যহীন। এ যুগে কোনো কিছুরই দাম নেই। ফার্ডিনান্ড কাল কি উপদেশ দিয়েছিল মনে আছে তো তোমার? মরা মানুষের পোর্ট্রেট আঁকলে কি হবে, লোকটা খাঁটি কথাই বলে থাকে। সে কথা থাক, এখন বরং তুমি ওই ভাঙ্গা পিয়ানোটা নিয়ে দু'একটা লড়াই-এর গানের সুর বাজিয়ে শোনাও তো।'

ওর মন ভোলাতে পিয়ানোয় গিয়ে বসলাম অতঃপর। আমাদের অতি প্রিয় দু'টি গানের সুর তুললাম পিয়ানোয়। শূন্য ঘরে সুরটা ভূতের কান্নার মতো শোনালো। এসব গানের সুর যখন বাজিয়ে শুনেছি, এসব গান যখন গেয়েছি, তখনকার স্থান-কাল-পাত্র ছিলো অন্য রকম। কিন্তু আজকের পরিবেশের সঙ্গে তার যোগসূত্রই বা কোথায়?

□ পাঁচ □

দুদিন পরে কারখানায় অফিস ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে কোষ্টার চিৎকার করে উঠলো, 'শোনো বব, এই মাত্র ফোন করেছিল ব্লুমেনথল। বেলা এগারোটার সময় ক্যাডিলাকটা নিয়ে যেতে বলেছে। ও নিজে একবার গাড়িটা চালিয়ে দেখে নিতে চায়।'

স্ক্রুড্রাইভার আর স্প্যানারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি বললাম, 'দেখো অটো, এই খদ্দেরটাকে একবার যদি জালে ফেলতে পারি—'

'ফেলতে পারবে কেন, ফেলে আমরা দিয়েছি মনে করো', ফোর্ড গাড়ির তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো লেনতস, 'কেন, আমি আগে বলিনি, ও ঠিক আবার ফিরে আসবে? কেমন আমার কথা সত্যি হলো দেখলে তো। হ্যাঁ গটফ্রিড কখনো বাজে কথা বলে না।'

ও হয়তো আরো কিছু বলতো, আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'তুমি চুপ করবে? এখন আমাদের অনেক কথা ভাবতে হবে।' তারপর অটোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাম কতো পর্যন্ত কমানো যেতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'এই ধরো প্রথমে দু'হাজার। এরপর হাজার দুশো। তাতেও যদি ওর মন না

গলে তখন দু'হাজার পাঁচশো। এরপরেও যদি দেখো লোকটা নাছোড়বান্দা, তখন দু'হাজার ছশো, তার কমে আর নয়, বুঝলে।' কোণ্টার আমার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললো, 'বব, তুমি একজন লড়াকু সৈনিক ছিলে। তাই দরকার হলে নিজের রক্ত দিয়েও তোমাকে আমাদের কারখানার সম্মান রাখতে হবে। মনে রেখো, ব্লুমেনথলের টাকার থলেটা হাল্কা করবার জন্য দরকার হয় তো তোমার জান কবুল করবে, কেমন?'

'হ্যাঁ, তাই করবো', হেসে সায় দিলাম ওর কথায়।

যে হাসি নিয়ে ক্যাডিলাক গাড়িটা বেচতে বেরিয়েছিলাম, ঠিক সেই হাসি হাসতে হাসতেই কারখানায় ফিরলাম ক্যাডিলাক গাড়িটা পাখির ডানার মতো হাওয়ায় ভাসিয়ে। কারখানায় ফিরে এসে দেখি, লেনতস আর অটো মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেছে। পেট্রল পাম্পে বসেছিল জাপ। জিজ্ঞেস করলো সে, 'কি বিক্রী হলো?'

'শুভ খবরটা জানবার জন্যে খুবই আগ্রহ দেখছি যে। এই এক ডলার তোমার বখশিস। আমি এখন খেতে চললাম।' ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'তবে হ্যাঁ, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারে একটা কথাও বলতে পারবে না ওদের, বুঝলে!'

ডলারটা একবার শূন্যে ছুঁড়ে সেটা আবার লুফে নিয়ে বললো জাপ, 'হের লোকাম্প, 'কবরখানার মতোই একেবারে নীরব থাকবো আমি।'

'তা তোমার চেহারাটা কবরখানার মতোই দেখতে বটে।'

ফিরে এসে ক্যাডিলাক গাড়িটা কারখানার এক পাশে রাখতেই দেখি অফিস ঘর থেকে ফোর্ড গাড়ির মালিক সেই পাউরুটিওয়ালা আর তার সঙ্গিনীটি বেরিয়ে আসছে। এরা এসেছিল গাড়ির রঙ পছন্দ করতে। পাউরুটিওয়ালার চোখে মুখে তার সদ্য স্ত্রী বিয়োগের শোকের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য, দিব্বি সে তার নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পুরনো গাড়ি নতুন করতে বেরিয়েছে। ক্যাডিলাকটা দেখামাত্র মেয়েটির চক্ষুস্থির। সে তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'আরে দেখো, দেখো কি চমৎকার গাড়ি দেখো। এমন গাড়ি না হলে হানিমুন মানায়। তোমার ওই পুরনো ফোর্ড গাড়ি এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।' 'খুব আদিখ্যেতা দেখানো হয়েছে', খিঁচিয়ে উঠে বললো পাউরুটিওয়ালা, 'চলো, এবার ফেরা যাক।' সঙ্গিনীটি তখন ক্যাডিলাকের ভেতরে গিয়ে বসেছে।

ওদিকে লেনতস আমাকে খোঁচা দিয়ে নিচু গলায় বললো, 'বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? ক্যাডিলাক গাড়িটা ওকেই গছিয়ে দাও।' কোনো উত্তর না দিয়েই আমি ওর দিকে তাকালাম চোখ লাল করে, দু'হাত পিছিয়ে গেলো ও।

পাউরুটিওয়ালাকে খুব কষ্ট করতে হলো তার সঙ্গিনীটিকে গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে। তারপর রীতিমতো গোমড়া মুখ করে বেরিয়ে গেলো সঙ্গিনীকে সঙ্গে

নিয়ে।

ওরা আমাদের দৃষ্টির আড়াল হতেই লেনতস এবার এক হাত নিলো আমার উপরে। 'তুমি, তুমি একটা অপদার্থ' বব। লক্ষ্মী তোমার কাছে যেচে এলো, আর তুমি তাকে ঠেলে ফেলে দিলে? মেয়েটির ভাবখানা কি রকম দেখলে না? হাত বাড়ালেই এমন খদ্দেরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতে।'

কপট গম্ভীর গলায় আমি বললাম, 'দেখো লানস কর্পোরাল লেনতস, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সামনে যে একটু সমঝে কথা বলতে হয়, তা শেখোনি? আমি কি দু'বার বিয়ে করার মতো লোক।'

আমার কথা শুনে ও তো থ'। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো ও, 'কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার অমন ঠাট্টা করা উচিত হয়নি।'

ওর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে কোষ্টারের দিকে ফিরে বললাম, 'শোনো অটো, এবার আমাদের সাধের ওই ক্যাডিলাকের মায়া ত্যাগ করে বিদায় করতে হবে ওটাকে। ওকে এখন পরের ঘর করতে দাও। এখন থেকে আমাদের এই গরীব কারখানা ছেড়ে ধনী পোশাক ব্যবসায়ীর ঘর আলো করবে ক্যাডিলাক।' এই বলে পকেট থেকে ব্লুমেনথলের দেওয়া চেকটা বার করতেই লেনতসের বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। 'এ তুমি কি বলছো বব? একেবারে নগদ নারায়ণ! এ কি কম আশ্চর্যের কথা?'

চেকটা ওর চোখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, 'কতো টাকার চেক এটা বলো তো?,

'কতো আর, হাজার চারেক হবে', আন্দাজ করে বললো ও। 'চার হাজার', কোষ্টার বললো। আর পেট্রোল পাম্প থেকে চিৎকার করে বললো জাপ, 'পাঁচ।'

'না, তোমাদের কারোর আন্দাজই খোপে টিকলো না, 'ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি বললাম, 'সাড়ে পাঁচ হাজার।'

ছোঁ মেরে চেকটা আমার হাত থেকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করে বললো লেনতস, 'এ চেক নিশ্চয়ই বাজে, দেখো গিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা নেই, বাউন্স করবে।'

'হের লেনতস, তুমি কি ভেবেছো, তোমার মতো এই চেকটাও অচল? ব্লুমেনথল ফালতু লোক নয়। ইচ্ছে করলে এর কুড়িগুণ দাম দিতে পারতো ও। লোকটা জাতে ইহুদি, ইহুদি খদ্দের যদি একবার ফিরে আসে, ঠিক কিনবেই। আর খ্রীষ্টান খদ্দের বারে বারে ফিরে এলেও কখনো কিনবে না, ওদের ওপর ভরসা করা যায় না। তাছাড়া ব্লুমেনথল এখন আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। জানো, কাল রাতে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে আমাকে? পাইক মাছের দোলমা হবে বলে জানিয়েও দিয়েছে। তা এখন তোমার বিশ্বাস হলো তো, সেলসম্যানের কাজ যাকে তাকে দিয়ে হয় না?'

লেনতস চুপ মেরে গেলো। তবে উচ্ছ্বসিত হয়ে এতক্ষণে কোষ্টার মুখ খুললো,

'সত্যি বব, তুমি একজন ঝানু সেলসম্যান বটে, খুব দাঁও মেরেছো যা হোক।'

এবার আমি নিজের প্রয়োজনের কথাটা ওকে বলে ফেললাম, 'গোটা পঞ্চাশ মার্ক আগাম দিতে হবে আমাকে।'

'পঞ্চাশ কেন বলছো, আমি তোমাকে একশো দেবো। এতো তোমার হক পাওনা।' তারপর ও নিজের থেকে একটা খুশখবর শোনালো, 'যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তো, আজকের মতো কারখানা এখনি বন্ধ করে দিই! একদিনের পক্ষে অনেক বেশী লাভ হয়ে গেছে। বেশী লাভ করে লাভ নেই। অতি লোভে তাঁতি নষ্টর মতো হবে শেষে। তার চেয়ে এখন আমাদের কার্লকে নিয়ে রেসের একটু মহড়া দেওয়া যাক, কি বলো?'

সঙ্গে সঙ্গে অটোর কথায় আমরা সবাই সার দিলাম। জাপও আমাদের সঙ্গে এলো। তারপর প্রথমেই আমবা গেলাম ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাবার জন্যে। চেকটা যে অচল, লেনতসের এই ধারণাটা ভুল প্রমাণ করার জন্যই এই তৎপরতা।

ল্যান্ডলেডি ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে তিন দিন আগেই আমার ঘরের ভাড়াটা দিতেই অবাক হয়ে বলেছিল ও, 'বুঝেছি, কোনো মতলব আছে।' অগত্যা সত্যি কথাটাই বলতে হলো ওকে, ওর ঘরের নক্সা করা আরাম কেদারা দুটি আর মেঝের কার্পেটটা আমাকে ধার দিতে হবে একদিনের জন্যে। আর তার কারণটাও বলতে হলো : 'আমার এক দূরসম্পর্কীয়া বোন আসবার কথা, তাই ঘরটা একটু সাজিয়ে রাখতে চাই, এই আর কি!' বিশ্বাস করেনি ও। আমি তখন বলি, 'কেন, বোন কি কারোর থাকতে নেই বুঝি?' 'কেন থাকবে না', মুখ টিপে মৃদু হেসে ও বলেছিল, 'কিন্তু বোনের জন্যে কেউ আরাম কেদারা ভাড়া করতে যায় না।' উত্তরে আমি তখন বলি, 'আমি করি। কারণ বোনের প্রতি আমার টান অন্তর থেকে।…'সে তো তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভবঘুরে ছাড়া তুমি আর কিই বা হতে পারো। যাইহোক, অতো কথার কি দরকার। ওগুলো তুমি পাবে।'

'এর জন্যে অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে।' আমার ব্যাপারটা ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বুঝে গিয়েছিল। তাই ফিরে আসার সময় ও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়লো না, 'হের লোকাম্প, বেশী বাড়াবাড়ি কিন্তু করতে যেও না, একটু সমঝে চলো, তা না হলে শেষে পস্তাতে হবে তোমাকে, দেখো!' ওর কথা আমার ঠিক মনে থাকবে, ঘাড় নেড়ে ওকে বললাম।

তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ফিরে এসে গোছগাছ করতে শুরু করে দিলাম। বিকেলে প্যাট্রিসিয়াকে ফোন করেছিলাম। সপ্তাহখানেক ওর সঙ্গে দেখা নেই, ওর নাকি শরীর খারাপ হয়েছিল। ওকে বলেছি, আটটায় ওকে আমার এখানে নিয়ে আসবো। তারপর

ডিনার সেরে দুজনে সিনেমায় যাবো। ঘরে আলো বড্ড কম। ফ্রাউ হেসির টেবিল ল্যাম্পটা বসাতে হবে। ওর স্বামী তখনো ফেরেনি, চাকরী যাওয়ার ভয়ে বেশী সময় কাজ করছে। ভাঙ্গা গ্রামাফোন রেকর্ডের মতো ওর সেই পুরাতন কাহিনী আবার শুনতে হলো, অনিচ্ছা সত্বেও। হেসিকে বিয়ে না করে অন্য কাউকে করলে, ওর জীবনের ধারা অন্য খাতে বইতে পারতো, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের তাগিদে ওর বস্তাপচা জীবন কাহিনী শুনতে হলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় অনুরোধ করেই ফেললাম: 'তোমার টেবিল ল্যাম্পটা আমার চাই।' সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়ে সেটা এগিয়ে দিলো আমার সামনে ও। 'তোমার মতো এ সব কথা যখন আমি ভাবি—'

এবার আমার চাই একটা গ্রামাফোন। সেটা আনতে গেলাম আরনা বোনিগের ঘরে। ফ্রাউ হেসি আবার ভুলেও আরনার নাম করে না কখনো। পাশের ঘরের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করে। ওকে দুঃচোখে দেখতে পারে না সে, কারণ মনে মনে হিংসে করে ওকে। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে আরনা মেয়েটিকে। কারণ জীবন সম্পর্কে এর মনগড়া কোনো ধারণা নেই। আর এও জানে যে, সুখ জিনিষটা দুমূল্যের মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে, আর তার জন্যে প্রচুর মূল্য দিতে হয়।

কিছু খাবারও কিনে এনেছিলাম, সেগুলোও ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখলাম। রান্নাঘরের লোকজনদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। ফ্রিডারের সঙ্গে এখনো ঠিক মতো বনিয়ে উঠতেই পারিনি। নিজের হাতে ঘরটা যা সাজিয়েছি, তাতে নিজেই এখন চিনতে পারছি না। এবার যেন আর তর সইছে না, ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই বেরিয়ে পড়লাম প্যাটরিসিয়াকে আনতে। হাতে এখনো অনেক সময় আছে, ভাবলাম ইন্টারন্যাশনাল বার হয়ে যাবো। দূর থেকে অন্ধকারটা নীল সমুদ্রের মতো, আর ইন্টারন্যাশনাল বারটা যুদ্ধজাহাজের মতো দেখাচ্ছিল। সেই ভাসমান জাহাজে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে রোজার সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি এখনো এখানে? বেরোওনি?'

'আমাদের সময় তো এখনো হয়নি।' হাসতে হাসতে বললো রোজা, 'আমাদের ভালোবাসার লোকেরা যে লেট কামার।'

ভালোবাসার কথাটা লুফে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'রোজা, একটা সত্যি কথা বলবে? ভালোবাসা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? এ ব্যাপারে আমার তো মনে হয়, আমাদের থেকে তোমরাই বেশী বোঝো, বোঝো না?'

শব্দ করে হেসে উঠলো রোজা। বেশ কিছুক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে বললো ও, 'তুমি যেন কি রকম। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার কথাই জিজ্ঞেস করলে? এর উত্তর আমি কি দেবো বলো। হতভাগা ওই আর্থারের কথা ভাবতে বসলে আজও মনটা

বিষাদে ভরে যায়। তাই একটা সার কথা বলে রাখি বব তোমাকে—অনুভব বিনা অনুভূতি কাউকে শেখানো যায় না। তাছাড়া জীবনটা অনেক বড়, এই দীর্ঘ জীবনের সফরে ভালোবাসা বড় ক্ষণস্থায়ী। আর্থার আমার জীবন থেকে চলে যাবার সময় এই সত্যি কথাটা আমাকে বলে গিয়েছিল। আজ ভাবছি, কথাটা মিথ্যে বলেনি ও। সত্যি ভালোবাসার বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, ভালোবাসাকে বেশী দিন ধরে রাখার সৌভাগ্য কারোর নাও হতে পারে। সেই ভালোবাসার সম্পর্ক ত্যাগ করে যে চলে যায়- হয়তো সে নতুন কোন ভালোবাসার ঠিকানা পেয়ে সেখানে চলে যায়, কিন্তু যে তার ভালোবাসা আঁকড়ে পড়ে থাকে, এক বুক শূন্যতা নিয়ে তাকে গুমরে গুমরে মরা ছাড়া তার কাছে অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছো রোজা', ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম আমি, 'আবার দেখো, যে কিনা অপরের ভালোবাসা পায়নি কখনো, তার অবস্থা কতকটা বেঁচে থেকেও মরে থাকার সামিল।'

'তাই বলি কি বব, আমি যা করেছি তুমিও তাই করো। একটি সন্তান, কেবল একটি সন্তান কামনা করো। তারপর ভালোবাসার কথা ভুলে যাও। ওটাই হবে তোমার স্মৃতিই বলো আর সম্বলই বলো, ওতেই তুমি দীর্ঘ জীবনের বাকি পথে শান্তি পাবে, দেখো।'

উপদেশ তুমি মন্দ দাওনি গো, কিন্তু সেই সুযোগ তো আমার জীবনে আসেনি এখনো।'

আপন মনে এখন অনেক কথাই ভেবে চলে রোজা। হঠাৎ উদাস গলায় বলে উঠলো ও, 'এই দেখো না, আমার জীবনেই দেখো না, আর্থারের হাতে কতো মারই না খেয়েছি। তবু ও যদি এখনো ফিরে আসে, তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম যে হবে, ভাবলেই কান্না পায় আমার এখন।'

তাহলে এসো, তোমার সেই আর্থারের স্বাস্থ্য কামনা করেই পান করা যাক।'

হেসে ফেললো রোজা, 'ঠিক আছে, ওই মুখপোড়া মিনসের স্বাস্থ্যই কামনা করা যাক।'

চলে আসবার সময় ওকে বললাম, 'আজ তাহলে আসি রোজা। প্রার্থনা করি আজ তোমার রোজগার যেন ভালো হয়।'

'হ্যাঁ, এসো বব', গাঢ় স্বরে বললো রোজা।

প্যাটারিসিয়াকে দেখে মনেই হচ্ছে না কোনো অসুখ থেকে সেরে উঠেছে ও। বরং ওর চোখ দু'টি আজ অন্যদিনের থেকে বেশ বড় বড় আর জ্বলজ্বল করছে। মুখে ঈষৎ লালচে আভার চোঁয়া, আর হাবভাবে বনহরিণীর মতো একটি স্বভাবলালিত্য দৃষ্টি এড়ায় না। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বললাম, 'আজ তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

তোমার অসুখ দেখছি দিব্যি সেরে গেছে। তাহলে আজ দারুন ফূর্তি করা যাবে, কি বলো?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য করা যেতো। কিন্তু আজ যে পারছি না।'

বিস্ময়ভরা চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পারবে না, এ তুমি কি বলছো?'

'আমি দুঃখিত তোমাকে সঙ্গ দিতে না পারার জন্যে,' প্যাটরিসিয়া বললো, 'তুমি যাতে ফিরে না যাও, তার জন্যে কিছুক্ষণ আগে তোমাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু শুনলাম, অনেক আগেই তুমি নাকি বেরিয়ে পড়েছো।'

'তাহলে আজ সারা সন্ধ্যায় একটুও সময় হবে না তোমায়?'

'কি করবো বলো, আজ একজনের সঙ্গে দেখা করাটা আমার খুবই জরুরী। আগে জানা ছিলো না, মাত্র আধঘণ্টা আগে খবরটা পেলাম।'

কিন্তু ওর হাবভাব দেখে তো মনে হয় না, ওর কোনো জরুরী কাজ থাকতে পারে। ওটা বোধহয় ওর একটা বাহানা। আসলে আমায় সঙ্গে বেরোনোর ইচ্ছে নেই আজ আর। তা সেটা সোজাসুজি বললেই তো পারতো ও। নিতান্ত শিশু যেমন তার ইচ্ছায় বাধা পেলে তার মনের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থাও ঠিক সেই রকম এখন। আজ অনেক আশা নিয়ে এই সন্ধ্যাটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম সেই কোন্ সকাল থেকে। যাইহোক, মনের হতাশাটা ওকে বুঝতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। তাই বললাম, 'বেশ, তাহলে তো বলবার কিছু নেই। আমি এখন চলি, পরে দেখা হবে।'

এবার ও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। কি মনে করে কে জানে, ও বললো, 'রাত ন'টার আগে ওখানে যাচ্ছি না। তাই ততক্ষণে একটু বেড়িয়ে আসতে পারি দু'জনে। টানা এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরোতে পারিনি। হাঁপিয়ে উঠেছি।'

উৎসাহ ছিলো না, তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললাম, 'ঠিক আছে চলো। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, চলতে হয় তাই যেন চলেছি। কিন্তু মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ নেই। একটু আগেও যেটা প্রবল আকারে ছিলো, সেটা এখন উধাও। মাথার উপরে তারা ভরা পরিস্কার আকাশ। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বাতাসে ডাফনে ইণ্ডিকা ফুলের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছিল। পাশে আমার এক সুন্দরী যুবতী। সব দিক থেকে এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে রোমাঞ্চকর হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ও যে আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে শুরুতেই। তাই সন্ধ্যায় এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আহ্বানে কোনো ভাবেই সাড়া দিতে পারছিলাম না আমি। তাই প্যাটরিসিয়া যখন ডাফনে ইণ্ডিকা ফুলের মিষ্টি গন্ধটা অনুভব করে জিজ্ঞেস করলো, 'একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ পাচ্ছো না তুমি?' আমি তখন এক রকম বিরক্ত হয়েই বললাম, 'হ্যাঁ পাচ্ছি, তবে ফুলের গন্ধ নয় ব্রাণ্ডির

গন্ধ।' আসলে ওই ফুলের মিষ্টি গন্ধ অমিও অনুভব করছিলাম। কিন্তু ওর কাছে সেটা প্রকাশ করতে আমি রাজী নই এখন।

ওদিকে প্যাটরিসিয়া সেই মিষ্টি গংধটা একবার জোরে নাকে টেনে নিয়ে বললো, 'বেশ কিছুদিন ধরে বন্দী থাকার পর বাইরে বেরোলে সব কিছুই এমন চমৎকার লাগে। কিন্তু খুব মন খারাপ লাগছে, এখুনি ফিরে যেতে হবে বলে। ওই বিনডিং লোকটাই আমাদের আজকের সন্ধ্যাটা মাটি করে দিলো। ওর এই এক স্বভাব, শেষ মুহূর্তে যতো তাড়া ওর।'

'তাহলে বিনডিং এর সঙ্গেই তোমার কাজ?'

'হ্যাঁ, বিনডিং আর তার সঙ্গে আর একজনও আছে। তবে সেই আর একজনের সঙ্গেই আসল কাজ আমার। আমার সেই জরুরী কাজটা কি হতে পারে, আন্দাজ করতে পারো তুমি?'

'না', অবহেলা করার মতোই বললাম, 'তোমার ব্যক্তিগত কাজ কেমন করে আমি আন্দাজ করবো বলো!'

আমার কথার ধরণ দেখে ও বুঝে গেছে, আমি খুব রেগে গেছি। তবু একটু হেসে ও ওর কথা চালিয়ে যেতে থাকলো। ওর কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছিল না তখন। আমি তখন ভাবছি কেবল বিনডিং-এর কথা। ওর নামটা বিদ্যুৎ শকের মতো লেগেছে। অবশ্য আমার আগেই ভাবা উচিৎ ছিলো, আমার চেয়ে বিনডিং-এর সঙ্গেই বেশী পরিচয়। ওর দামী গাড়ি, দামী পোষাক, ভারী ওয়ালেটের কাছে আমি তো অতি নগন্য এক পুরুষ। ওর জন্যেই বাড়ির নানান বাসিন্দাদের কাছ থেকে ঘর সাজাবার জন্যে টুকিটাকি জিনিষ সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু এই মেয়ে কি কখনো আমার হতে পারে? আর কেনই বা হবে? ধার করা ক্যাডিলাক গাড়ি নিয়ে বড় জোর দু'একদিন সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে বেড়াতে পারি, আর বড় জোর গ্লাসের পর গ্লাস রাম উড়িয়ে দিতে পারি, এটাই আমার বাড়তি গুণ। আমার আসল পরিচয় হলো, আমি একজন ভবঘুরে। ভালোয় ভালোয় এখন আমার কেটে পড়াই ভালো, ভাবলাম আমি। ঢের হয়েছে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ওকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা। আমার শুরুতেই ভুল হয়ে গেছে ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।

প্যাটরিসিয়া হোলম্যানের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। 'কাল সন্ধ্যায় আবার আমাদের দেখা হতে পারে, পারে না?'

'না, শুধু কাল নয়, মিথ্যে করে বললাম, 'সারা সপ্তাহে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে।' মিথ্যে বলতে গিয়ে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো নিজের ওপরে। কিন্তু কি করবো, অপমানের লজ্জা কিছুতেই চাপতে পারছিলাম না।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। এই রাস্তা দিয়েই আনাদের কারখানায় চলে যাওয়া যায়। দূর থেকে দেখা গেলো ইণ্টারন্যাশনাল থেকে বেরিয়ে আসছে রোজা, আমাদের দিকেই আসছে ও। ও কিন্তু আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেলো! এখন এটাই ওদের মেয়েদের রীতি। সঙ্গে কেউ থাকলে ওরা কখনো পরিচয় দিতে চায় না। একবার কেবল হোলম্যানের দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি ওকে বললাম, 'শুভরাত্রি রোজা।' এই রকম ভাব করতে হলো ফ্রিতসি, সুন্দরী ওয়ালি, কাঠের পা লাগানো লিনা, মরিয়ম ও মার্গারেটের কাছে।

এসব দেখে শুনে প্যাটরিসিয়া বললো, 'তোমার দেখছি এখানকার অনেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে।

'হ্যাঁ, তোমার অনুমানই ঠিক।' নির্বিকার ভাবে বললাম।

ওর চোখে অদম্য কৌতূহল। একটু পরে সেই ভাবে তাকিয়েই ও বললো, 'তাহলে এবার ফেরা যাক, কি বলো?'

'হ্যাঁ, বেশ তো, আমারও তাই ইচ্ছে।' ওর বাড়ির দরজার সামনে এসে বললাম, 'এবার তাহলে বিদায়। আশাকরি রাতটা তোমার ভালোই কাটবে। অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখের দিকে ফিরে আবার তাকাতে হলো। আর তখনি অবাক হয়ে ওর ঠোঁটে হাসির রেখা আর চোখে কৌতুকের আভাস দেখতে পেলাম। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, 'তুমি কিসসু বোঝো না, একেবারে কচি খোকাটি যেন!'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি মেয়েটির দিকে, বলে কি মেয়েটি? ওর হাসির আর কথার মানে ঠিক বুঝতে পারি না। এক সময় হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই কপট রাগ প্রকাশ করে বলে উঠলাম, 'আমি কচি খোকা? আমাকে তোমার বোকা বোকা বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ, সেই রকম বলেই তো মনে হচ্ছে।' এবার মুখ টিপে হাসে ও।

ওই ভাবে হাসছে বলে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। রাস্তার আলোয় ওর সেই সুন্দর মুখখানি আরো স্পষ্ট দেখাচ্ছে। নিষ্পাপ কিশোরীর মতো ভারি সুন্দর ওর মুখখানি। এবার আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তার ওপর ওর চোখে আমার নিমন্ত্রণ দেখতে পেলাম, হয়তো সেটাই আমার সর্বনাশ। তবু সব দেখেও সেই সর্বনাশের পথে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ওকে আমার বুকে টেনে নিলাম। তখন আমি মরীয়া, ও যাই ভাবুক না কেন, আমি পরোয়া করবো না, এই রকম ভাব আমার তখন। ওর পশম নরম চুল হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছিলো আমার গালে, কপালে, ওর নরম শরীরের কেমন একটা মিষ্টি ঘ্রাণ এসে লাগছিল আমার নাকে। আর তখনি মুহূর্তের জন্যে হলেও ঠোঁট দুটি নেমে এলো আমার তপ্ত ঠোঁট জোড়ার উপরে। আর তখনি একটা সুন্দর ভালোবাসা

বৃষ্টির কোঁটার মতো ঝরে পড়তে থাকলো আমার ঠোঁটের উপরে, আমার দু'গাল বেয়ে……

চকিতে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো সব কিছু ঘটে গেলো। আর সেটা বুঝে ওঠবার আগেই আমার বাহু বন্ধন শিথিল করে দিয়ে চলে যেতে দেখলাম ওকে। আর আমি তখন বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে। 'অবাক কাণ্ড', নিজের মনে বলি, ও ঠিকই বলেছে, আমি সত্যিই বোকা, কচি খোকা!

বাড়ি ফিরে এলাম। এক সময়ে সমস্ত বাড়িটা যখন নিঝুম, স্তব্ধ হয়ে এলো, মনে হলো বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পনে টেলিফোনটার কাছে এসে দাঁড়ালাম, হাতে আমার কোট আর কম্বল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কম্বল দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে ফেললাম যাতে আমার কথা কেউ যেন শুনতে না পায়। আমাদের এই বোর্ডিং হাউসের প্রতিটি সদস্যই পরের কথা শোনবার জন্যে একটু বেশী কৌতূহলী আর তাদের শ্রবণ শক্তি একটু বেশী তীক্ষ্ণ। ভাগ্য ভালো একবারের চেষ্টায় প্যাটরিসিয়াকে পেয়ে গেলাম। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে? কখন ফিরলে?'

'ঘণ্টাখানেক আগে।'

'কাজ হলো?'

'আশা তো করছি, হয়েছে।'

খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর মুখ থেকে আমার নিজের নামটা শুনি। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রবার্ট নামে তোমার কোনো বন্ধু নেই? কি বললে নেই! কিন্তু তোমার মুখ থেকে ওই নামটা শুনতে যে আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। ঠিক আছে, না হয় ঠাট্টা করেই বলো না—'রবার্ট' একটা আস্ত গর্দভ।'

'না, তা কেন হতে যাবে', খিলখিল করে হেসে উঠে বললো মেয়েটি, 'রবার্ট একটি কচি খোকা, ও যেন চিরকালই কচি খোকা থাকে আমার কাছে—'

'বাঃ চমৎকার উচ্চারণ তো তোমার? এবার বলো তো—বব একটি—'

'আমার মনের কথা শুনবে? বব একটি মাতাল—' অনেক, অনেক দূরে থেকে ওর কথার মিষ্টি সুরটা যেন ভেসে এলো, 'না, তোমার সঙ্গে আর বকর বকর করতে পারছি না। এবার আমি ঘুমবো, ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'কাছে থাকলে তোমার মাথা টিপে দিতে পারতাম।' বললাম ওকে, 'যাকগে, তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। নির্ভাবনায় এবার ঘুমোও—শুভরাত্রি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কম্বলের বোঝাটা মাথার ওপর থেকে নামাতে গিয়ে

দেখি আমার পেছনে মূর্তিমান সেই বৃদ্ধ অ্যাকাউণ্টেণ্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ! আমাদের রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে থাকেন উনি। বিরক্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাওয়ার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

আমার চোখে মুখে বিরক্তি দেখে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নিচু গলায় বলে উঠলেন, 'না, আমি কাউকে বলবো না। রাজনৈতিক কথাবার্তা হচ্ছিলো তো? আপনার কোনো ভয় নেই, আমি দক্ষিণপন্থী।'

ওঁর কথা শুনে এবার একটু স্বস্তি পেলাম। হেসে বললাম, 'হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই রাজনীতি, আর খুব গোপন রাজনীতি—'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে নিচু গলায় বললেন, 'সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন।'

'আচ্ছা, টেলিফোন কে আবিস্কার করেছিলেন বলুন তো? ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করেন। তখন আমিই নিজের থেকে আবার বললাম, 'আমারও জানা নেই। তবে যেই করে থাকুক না কেন, তিনি যে এক অসাধারণ ব্যক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

আজ রোববার, সেই মোটর রেসের দিন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এইমাত্র রেস সুরু হলো। রেস গ্রাউণ্ডে তামেটের পিট-এ বসে আছি আমরা সবাই—গ্রাউ, ভ্যালেনটিন, লেনতস, প্যাটরিসিয়া হোলম্যান। আর জাপ আছে কোষ্টারের সঙ্গে আমাদের রেসের গাড়ি কার্ল-এতে। ছোট খাটো রোগাটে চেহারার মানুষ বলে ওকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে কোষ্টার। তবে লেনতসের চিন্তা, ওর লম্বা লম্বা কানে বাতাস আটকে গিয়ে কার্ল-এর গতি কমে যেতে পারে—এটা ওর নেহাত ছেলে-মানুষি ছাড়া আর কিছু নয়।

ওদিকে সুযোগ বুঝে প্যাটরিসিয়ার সুন্দর মুখ দেখে সবাই চেষ্টা করছে ওর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে। যেমন প্রথমেই লেনতস ওর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে ওর ইংরেজ নামের তারিফ করে জানতে চাইলো, এ নাম ওর কেন হলো, যদিও ও জার্মান। উত্তরে ও বলে, ওর মা ছিলো ইংরেজ, আর তার নামও ছিলো প্যাট। 'আহা কি সুন্দর নাম ওই 'প্যাট'—কেমন সহজেই উচ্চারণ করা যায়।' গ্লাসে মদ ঢেলে মেয়েটির উদ্দেশ্যে লেনতস বললো, 'এবার এসো প্যাট, আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘ-স্থায়ী করতে এক গ্লাস হয়ে যাক। আর ভালো কথা, নিজের নাম নিজেকেই বলতে হচ্ছে, গটফ্রিড আমার নাম।'

গটফ্রিড? আমি তো শুনে থ! চিরটা কাল একটা খাপছাড়া নামে ওকে ডেকে এসেছি। আর আজ কিনা মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাতে ওই নামটা বলে দিলো? বলতে একটুও শরম হলো না ওর! আর মেয়েটিও বা কি রকম? নামটা ওর খুব

ভালো লেগেছে বলে মনে হচ্ছে, তা না হলে কেমন হেসে-ঢলে গটফ্রিড বলেই ডাকতে শুরু করে দিয়েছে ওকে? ওদিকে ফার্ডিনান্ড আবার আর এক কাঠি উপরে। কেমন শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে, যেন ওর সুন্দর মুখের সুধা পান করছে সে। শুধু কি তাই, এরই মধ্যে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে সে, আর কেবল ওকে বলছে, ছবি আঁকা শিখতে হবে। তাছাড়া মেয়েটির ছবি আঁকতেই শুরু করে দিয়েছে ও।

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছবি আঁকার প্যাডটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললাম তাকে ঝাঁঝালো গলায়, 'দেখো ফার্ডিনান্ড, তোমার তো যতো সব মরামানুষ নিয়ে কারবার। যতো খুশি মৃত লোকের ছবি আঁকা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু জীবিত মানুষ নিয়ে তোমার এই প্রেম প্রেম খেলা 'আমি' কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না। আর তোমাকে জানিয়ে রাখি, ওই মেয়েটি আমার মনের মানুষ, ওর প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। আশাকরি এর পর থেকে তুমি একটু সংযত হবে ওর সম্পর্কে, কেমন?'

ব্রাউমুলারের ঝকঝকে গাড়িটাই আজকের রেসে ফেভারিট, বেশীরভাগ দর্শকেরই এই রকম একটা ধারণা। তাদের সব ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে লেনতস, 'আরে, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, দেখবে কোষ্টারের কার্ল ওর গাড়িটার জিব বার করিয়ে তবে ছাড়বে।' ব্রাউমুলারকে শুনিয়ে শুনিয়েই মন্তব্যটা করেছিল লেনতস। সে তার চলন্ত গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে হয়তো খিস্তি করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমাদের পাশে প্যাটরিসিয়া হোলম্যানের উপরে চকিতে একবার নজর পড়তেই সে তার জিব সংবরণ করে ফেললো। খিস্তির বদলে সম্মোহিতের মতো চোখ বড় বড় করে মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে ছুটে চললো সামনের দিকে।

পরবর্তী রাউণ্ডে কার্ল খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলো আমাদের সামনে দিয়ে। পাশের পিট থেকে কে যেন মন্তব্য করে উঠলো, 'দেখো, দেখো মূর্তিখানা একবার দেখো গাড়িটার পিছন দিকে তাকিয়ে, ঠিক যেন একটা উটপাখি!'

উত্তেজিত লেনতস চোখ মুখ লাল করে বলে উঠলো, 'কোন গাড়িটার কথা বলছেন? ওই শাদা গাড়িটার?'

পাশের পিট থেকে জবরদস্ত চেহারার একজন মোটর মিস্ত্রী তার সঙ্গীর হাতে বিয়ারের বোতল এগিয়ে দিতে গিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, 'হ্যাঁ, ওটা ছাড়া আর কাকেই বা বলা যায় বলুন?' আর লেনতসকে কে দেখে তখন! রাগে গজরাতে গজরাতে বেড়া টপকে পাশের পিটে যেতে চাইছে, এখনি একটা হেস্তনেস্ত করতে চায় ও। গায়ের সব জোর দিয়ে ওকে ধরে রেখে এক ধমক দিলাম, 'কি পাগলামি করছো

তুমি? তুমি কি রেস চলার মধ্যেই একটা অহেতুক হাঙ্গামা বাধাতে চাও? চুপ করে বসো তো এখানে।' কিন্তু ও কি ছাড়বার পাত্র? কার্ল-এর অপমান সহ্য করতে পারছে না। তখনো সেই লোকটার দিকে হাত পা ছঁুড়ে হম্বিতম্বি করতে থাকে।

প্যাট্রিসিয়াকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, 'উজবুকের কাণ্ড দেখেছো? ও আবার নিজেকে রোমান্টিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ওকে এ অবস্থায় এখন দেখলে কে বলবে যে, চাঁদের সুন্দর বর্ণনা দিয়ে একবার ও একটা কবিতা লিখেছিল!'

মুহূর্তে ওর মুখের রাগত ভাবটা সরে গিয়ে নরম গলায় ও বলে উঠলো, 'সে তো অনেক, অনেক যুগ আগেকার কথা, সেই লড়াই-এর সময়কার কথা। তুমি আমায় বড্ড দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়েছো বব।' এমনটিই আমি চাইছিলাম, হাতে হাতে ফল ফলে গেলো। তেমনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ও বললো, 'রেস টেসের সময় মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আর তাই তো অমন বেসামাল হয়ে যাই। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়, সেটা কি আমার দোষ?'

'মাঝে মাঝে বলছো কেন', প্যাট্রিসিয়া ওকে সমর্থন করে বললো, 'কোনো সময়েই ওটা দোষের হতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানালো গটফ্রিড। 'ঠিক বলেছো। তুমি আমার মনের ব্যাথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছো।'

আর তখনি শেষ রাউণ্ডের খেলা সাঙ্গ হলো। গোড়ার দিকে কোষ্টারের কার্ল ছ'টি রেসের গাড়ির মধ্যে পঞ্চম স্থানে থাকলেও, এক একটা রাউন্ডে ওর অবস্থান সুবিধাজনক স্থানে উন্নিত হতে হতে শেষ রাউণ্ডে ব্রাউমুলারের ঝকঝকে, তকতকে গাড়িটাকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করে বসলো। সেকি উল্লাসধ্বনি আমাদের। লাউডস্পীকারে আজকের রেসে কোষ্টারের নাম ঘোষণা করা হলো বিজয়ী হিসেবে। লেনতস তখন প্রায় উন্মাদের মতো একবার ডিগবাজি খেয়ে পাশের পিটের সেই বীভৎস চেহারার মোটর মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'ওহে, এবার কি হলো? আমাদের গাড়িটার একটা কি বিশ্রী নাম দিয়েছিলে যেন··· হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, পিছন দিকটা উটপাখির মতো। তা ওই উটপাখিই শেষ পর্যন্ত তোমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়াকে কুপোকাত করিয়ে তবে ছাড়লো। আমার কথাই সত্যি হলো, কি হলো তো?'

লোকটাও কম যায় না। জোরে ধমক দিয়ে উঠলো, 'চুপ কর হতভাগা।' জীবনে বোধহয় এই প্রথমবার অপমান সহ্য করেও গায়ে মাখলো না। ও তখন মাঠের মধ্যে নেচে কুঁদে আর হেসে মাঠশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুললো। আর তখনি পিছন থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠলো, 'গটফ্রিড!' ফিরে দেখি প্রায় দৈত্য সমান একটি লোক। তাকে দেখে প্যাট্রিসিয়াই প্রথমে আনন্দে

চিৎকার করে উঠলো, 'আলফনস না? শুনেছেন আমরা জিতে গেছি?'

আলফনস মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'হ্যাঁ, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেলো। আপনারা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তাই আপনাদের জন্যে কিছু খাবার এনেছি। যেমন ঠাণ্ডা পর্কের চপ আর ভিনিগার দেওয়া কাটলেট। এই বলে সে তার হাতের বিরাট প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো।

চিৎকার করে উঠলো গর্টফ্রিড, 'আরে, তুমি দেখছি দারুণ সমঝদার লোক? আমাদের যে খুব খিদে পেতে পারে, বুঝলে কি করেই বা। যাইহোক, তুমিও বসে পড়ো, খাওয়া শুরু করা যাক', এই বলে প্যাকেটটা খুলে ফেললো ও। খাবারের বহর দেখে প্যাটরিসিয়া হোলম্যান বলে উঠলো, 'আরে, এযে দেখছি গোটা একটা রেজিমেণ্টের খাবার!'

অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো সে, 'কিন্তু দেখুন না, শেষ পর্যন্ত কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে! আর আপনাদের জন্যে সামান্য একটু পানিয়ও এনেছি।' এই বলে দুটি মদের বোতল বার করলো আলফনস।

এদিকে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে কার্ল আমাদের পিট-এর কাছে এসে থামলো। কোষ্টার আর জাপ গাড়ি থেকে নামলো। জাপ-এর গর্ব দেখে কে! ওই যেন বিজয়ী নেপোলিয়ান। ওর খাড়া কান দু'টি আরও বেশী খাড়া হয়ে উঠেছে, ওর হাতে বিরাট একটা রুপোর কাপ। সেদিকে তাকিয়ে কোষ্টার হেসে বললো, 'এই বিজয়ীর কাপ ছাড়া অন্য কোনো কিছু আমি যেন ভাবতেই পারি না।'

'বেশ কিছু নগদ টাকাও তো উপহার পেয়েছো', গ্রাউ বলে উঠলো, 'তাহলে আজ সন্ধ্যায় একটু খানাপিনা হয়ে যাক, কি বলো?'

'আলবত হবে!' আলফনস লাফিয়ে ওঠার মতো করে বললো, 'তাহলে আমার ওখানেই হয়ে যাক। আর একটা কথা, আগেই কিন্তু বলে রাখছি বন্ধু—আজ আমি এক কানাকড়ি দামও নিতে পারবো না।'

সন্ধ্যায় আলফনস-এর ভোজসভায় গিয়ে দেখি আমার প্যাটরিসিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই। ওকে নিয়ে ওদের এতো মাথাথাখি আমি কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে পারছিলাম না। মওকা বুঝে ওই বুড়ো ভাম গ্রাউ আবার সেই ছবি আঁকার প্রসঙ্গ তুলে বসেছে। মেয়েটির ছবি আঁকার জন্যে নাছোড়বান্দা ও, আর প্যাটরিসিয়াও নারাজ। হেসে ও বারবার বলছে, ছবি আঁকতে প্রচুর সময় লাগবে, তাই বরং ও ওর ফটো তোলাতে রাজী আছে। ওর সেই অসহায় ভাব থেকে ওকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, ওটাই তো ওর আসল লাইন। মনে হয় ফটোগ্রাফ থেকে পোট্রেট আঁকতে সুবিধে হবে ওর বেশী।'

প্যাটরিসিয়াকে ঘিরে এখানে অনেকেই স্বপ্ন দেখছে। আর তাদের বাধা দিতে

গিয়ে আমাকে অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, হয়তো অপ্রিয়ও হয়ে উঠতে হচ্ছে মেয়েটির কাছে। কে জানে মেয়েটির সম্পর্কে আমার আশঙ্কাটা অমূলকও হতে পারে। হয়তো এরা কেউই আমার ক্ষতি করতে পারবে না, পারবে না মেয়েটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। কেউ কারোর বিরুদ্ধে এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে অভ্যস্তও নই আমরা। কিন্তু আবার এও ভাবতে হচ্ছে আমাকে, মেয়েটির মন তো এখনো সম্পূর্ন করে জানতে পারিনি আমি। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, এদের মধ্যে থেকেই কাউকে যদি ওর ভালো লেগে যায়? এটা মনে হচ্ছে আমার বিশেষ করে এই জন্যে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় এখনো সেই পর্যায় পড়েনি, মানে যাকে বলে একান্ত অন্তরঙ্গতা, যার থেকে ওর উপরে আমি নিশ্চিতভাবে আস্থা রাখতে পারি। এই কারনেই মেয়েটির সম্পর্কে আমি আমার মনকে স্থিত করতে পারিনি।

তাই প্যাটরিসিয়াকে একটু একা পেয়ে এক সময় বলেই ফেললাম, 'প্যাট, এখানে এই ভীড়ে নিজের মতো করে তোমাকে কাছে পাওয়া মুশকিল। চলো, চুপচাপ এখান থেকে সড়ে পড়া যাক অন্য কোথাও, যেখানে থাকবো শুধু তুমি আর আমি। বলা মাত্র এক কথায় রাজী হয়ে গেলো ও।

পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি দুজনে। বাইরেটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে ভাব। সারাটা শহর কুয়াশায় আচ্ছন্ন! ওর ঠাণ্ডা নরম একখানি হাত তুলে নিয়ে আমার গরম পকেটের ভেতরে পুরে নিয়ে আবার পাশাপাশি হেঁটে চলেছি আমরা, কারো মুখে কথা নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পৌঁছলাম কবরখানায়। কুয়াশা ক্রমশই ঘন হয়ে আসার দরুণ জায়গাটায় যেন একটা কুহেলিকা সৃষ্টি করেছিল, কেমন যেন একটা অপার্থিব ভূতুড়ে পরিবেশ, কবরখানার কবরগুলিতে শায়িত মৃতদেহগুলি হঠাৎ কেমন জীবন্ত হতে শুরু করেছে এক এক করে। একটু পরেই তাদের নৃত্য শুরু হয়ে গেলো! মনে হলো, হয়তো কুয়াশার জন্যে সব কিছু অবাস্তব, অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। তার ছোঁয়া বুঝি আমাদের দু'জনের গায়েও লেগে থাকবে, যে কারণে আময়া তখন বাস্তব জগতের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। প্যাটরিসিয়ার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেললাম। রাস্তার আলোয় ওর বড় বড় চোখ দু'টি অসম্ভব জ্বলজ্বল করছিল। দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলাম ওকে, 'এসো, আরো একটু কাছে এসে বসো আমার। তা না হলে যা ঘন কুয়াশার দৌরাত্ম, তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।'

ও আমার দিকে ফিরে তাকালো। মুখে হাসি ফুটিয়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু তবু যেন ও আমাকে দেখছে না, ওর দৃষ্টি যেন আমাকে ছাড়িয়ে দূরে ওই ধূসর কুয়াশাতে হারিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কি যেন

একটা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে ওকে। ওর মুখের ভাবটা অদ্ভুত ধরনের—এ যেন কোনো সুদূরের নীরব আহ্বান, যেন এক আলাদা জগত থেকে ভেসে আসছে। কার সে আহ্বান কে জানে। সে কি বিচিত্ররূপিনি প্রকৃতিদেবীর, নাকি চিররহস্যময়ী কোনো রক্ত মাংসে গড়া নারীরূপিনী জীবন দেবতা ?

এই প্রথম ওর এমন অদ্ভুত মুখের ছবি আমি দেখলাম, সে ছবি কখনো ভোলবার নয়। ও ছিলো ধ্যান মগ্না নারী, ধীরে ধীরে ওর সেই মগ্ন ভাবটা কেটে গিয়ে ও আবার কেমন সহজ হয়ে উঠলো, সতেজ সজীব হয়ে দেখা দিলো আমার চোখে। যে ছিলো একটু আগেও একটা ফুলের কুঁড়ির মতো, সে কিনা এখন সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটা ফুল, সেই ফুলের ঘ্রাণ নিতে থাকি আমি বুক ভরে। আস্ত আস্তে ও ওর মুখটা এগিয়ে দিলো আমার মুখের কাছে। ওর বড় বড় চোখ দুটি আমার চোখের সামনে এগিয়ে এলো, দূরে অতি নিকট হলো। ওর সেই বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখের হাজারো প্রশ্ন আমার চোখে নিবদ্ধ তখন। তারপর সেই চোখ দুটি এক সময় আপনা থেকেই বুজে এলো। ওর পাতলা ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছিল আমার ঠোঁটের উপরে—আত্মসমর্পনের আকাঙ্ক্ষায়।

চারদিকে তখন কবর থেকে উঠে আসা অসংখ্য অশরীরি আত্মা বিরাজ করছিল। কবরের ক্রশ চিহ্নগুলি প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে আছে, স্থির অকম্পন। ও তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমার গায়ের কোটটা খুলে দুজনের গায়ে ঢেকে নিলাম। কুয়াশা তখন গ্রাস করে ফেলেছে সমগ্র নগরীকে এবং আমাদেরকেও। আর সময়ের চাকাটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সত্যিই সময়ের কোনো হিসেব ছিলো না তখন। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কতোটা সময় যে আমরা এক সঙ্গে কাটালাম, হিসাব মেলাতে পারছিলাম না আমরা কেউই। হঠাৎ খেয়াল হতেই হাতঘড়ির দিকে তাকালাম—ছোট কাঁটাটা বারোটার ঘর পেরিয়ে গিয়েছিল তখন। ঠাণ্ডা আরো বেশী করে জাঁকিয়ে বসেছিল যেন। শীতে আরো কুঁকড়ে আমার দেহের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইছিল। ওর করুণ অবস্থা দেখে বললাম, 'চলো, আমার ঘরে চলো। ওখানে এই ভীড়ের হাত থেকে শুধুই নয় শরীরটাকে একটু গরম করে নেওয়া যাবে।'

ও কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে থাকলো।

ঘরের অগোছালো ভাব দেখে আমারই চক্ষু ছানাবড়া। সেদিনের রোজার সেই আরাম কেদারা, কার্পেট, হেসিদের টেবিল ল্যাম্প কিম্বা আরনা বেনিগের গ্রামোফোনটাও নেই। আমার তখন অপরাধীর মতো অবস্থা, মুখ কাচুমাচু করে বললাম, 'আমার ঘরের কি বিশ্রী চেহারা দেখছো তো ?'

'কেন বিশ্রী হতে যাবে', ঘরের ভেতরটা একবার ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে প্যাটরিসিয়া বললো, 'ঘরটা বেশ তো। তাছাড়া ঘরটা বেশ গরম, আর এটাই তো

চাইছিলাম আমি। একটু গরম না হলে আমার আবার চলে না। শীত আর বৃষ্টি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।'

'ছিঃ ছিঃ, এতক্ষণ তোমাকে বাইরে কুয়াশার মধ্যে বসিয়ে রেখে আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি—'

'না না, ও কথা তুমি ভাবছো কেন? এই তো বেশ। বাইরে ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পেয়েছি বলেই তো তোমার ঘরের ভেতরটা আরো বেশী আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে।'

আর এক দফা ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করে দিলো ও। ঘরের এক কোণে আমার পোশাক রাখবার একটা ট্রাঙ্ক ছিলো—এক সময় সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। ট্রাঙ্কটা লেনতস আমাকে দিয়েছিল। বহু দেশ ভ্রমণ করে এসেছিল ও। তাই ওটার উপরে নানান দেশের নামের লেবেল আঁটা ছিলো। রিয়ো ডি জেনেরো, ম্যানাওস, সাণ্টিয়াগো, বুয়েনস আয়ারস……নামগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ও, 'এতোগুলো দেশ ভ্রমণ করেছো তুমি?'

ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েই একটা অস্পষ্ট উত্তর দিলাম আমি। তাতে ও সন্তুষ্ট না হয়ে আমাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো বললো, 'বাঃ কতো দেশ, কতো শহরই না ঘুরেছো তুমি, আমাকে গল্প বলবে এসো।'

কি বলবো আমি? ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম মিথ্যের অভিনয় করে! ও তখন আমার একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। কি অপরূপ সুন্দর ওর মুখাবয়ব, তেমনি যৌবনের প্রাচুর্যে ভরা ওর দেহের সৌষ্ঠব। ওকে ঠিক নীল প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিল, হলুদ ডানা, বুঝি পথ ভুলে ঢুকে পড়েছে আমার দৈন্যতায় ভরা এই ঘরে। আমার অর্থহীন জীবনকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ধন্য করেছে। চিরকালের জন্য থাকতে আসেনি ও আমার ঘরে, হয়তো একটু পরেই ও আবার উড়ে যাবে অন্য কোথাও আমার ঘর ছেড়ে। তাই মুখ ফুটে বলতেই পারলাম না যে, ওসব দেখা তো দূরে, নামই শুনিনি আমি কখনও আমি।

জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম দূরে। বাইরের কুয়াশা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো এসে আছড়ে পড়ছে জানালার কাঁচের উপরে। হঠাৎ মনে হলো বাইরে কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকারে আমার অতীত জীবনের কুৎসিত দিনগুলি প্রেতমূর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে যেন আমার ব্যর্থ জীবনের একটা কঙ্কাল। এদিকে অতীত ছেড়ে বর্তমানে ফিরে আসতেই দেখি আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য রমণীয় মূর্তি। বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না, আবার অবিশ্বাসে দ্বিগুণ যাতনা! ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে, কি ভালো যে লাগছে সেটা এক কথায় বোঝাতে পারবো না। তখন আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছিলো, তারে আমি যেতে নাহি দেবো,

বাঁধিবো মোর বাহুডোরে। হ্যাঁ, ওকে আমার পেতেই হবে। বেশ বুঝতে পারছি এ আমার অন্যায়, কিন্তু আমি তখন নিরুপায়—কেবল মিথ্যের জাল বুনে ওর দিকে ফিরে বলতে শুরু করলাম—'হ্যাঁ, রিয়ো ডি জেনেরোর কথা জানতে চাইছো? কি বলবো তোমাকে, ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না। এককথায় রূপকথার দেশের বন্দর যেন। অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ-এর মাঝে এই নগরটি যেন বসে আছে শ্বেতবসনা মর্মর মূর্তির মতো।' তারপর কবির কল্পনার মতো এক একটা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে গেলাম ওকে। এসব বর্ননা আমি শুনেছিলাম লেনতসের মুখ থেকে। কিন্তু এমন সহজ সরল ও নিখুঁত ভাবে বলছিলাম, আমার মনে হলো, এসব যেন আমারি কথা, আমার মনের সুপ্ত বাসনা আর শোনা কথার স্মৃতি সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আমার রূপহীন, বর্ণহীন জীবনটার গায়ে না হয় একটুখানি কল্পনার রঙের পরশ লাগাতে গিয়ে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম, তাতে মহাভারত কি আর এমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আর হলেই বা কি আছে, ওই রূপসী রমণীর আশায় তো আর আমি জলাঞ্জলী দিতে পারি না! মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে, পরে যখন ওর মন আমার সম্পূর্ণ করে জানা হয়ে যাবে, যখন ওর সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাবো, যখন মনে হবে ও আমার হতে পারে, ওর সম্পর্কে আমার মনে আর কোনো শঙ্কা থাকবে না, তখন, হ্যাঁ তখন আমি ওকে সব না হয় খুলে বলবো, কেন আমার এই মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া, কেন এই প্রতারনা —না, প্রতারণা নয়, ওকে নিজের করে পাওয়ার জন্যেই এই মিথ্যে নাটকের অবতারণা করা। এই সব কথা মনে রেখেই আমি তখন এক এক করে এক একটা অজানা অচেনা দেশের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যেতে থাকে ওকে—আমার প্রতিটি উচ্চারণ তখন প্রেমালাপের মতো শোনাচ্ছিল আমার নিজের কানেই যেন—

রাত তখন ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আর আমাদের দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও ক্রমশ গভীর হচ্ছে তখন। বাইরে মৃদু শব্দ কানে ভেসে আসছে—রিমঝিম···এই মাস পাতা ঝরার মাস—শীতের শেষ—তাই আগামী বসন্তে এই বৃষ্টি হওয়ার দরুণেই গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়ে উঠতে দেখা যাবে।

চারদিকে নিঝুম রাতের স্তব্ধতা। পাশের গলিতে একটি মাত্র আলোয় জানালার কাঁচে পত্রপুষ্পহীন লেবুগাছের ডালগুলি ঝরো বাতাসের মৃদু আন্দোলনে মনে হচ্ছিল যেন এক একটা জাহাজের পাল।

মৃদু গলায় ওকে কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে ডাকলাম, 'প্যাট, বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে পাচ্ছো তুমি?'······'হুঁ' অস্পষ্ট ভাবে সাড়া দিলো ও।

আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। ধবধবে সাদা বালিশের উপরে ওর এলায়িত কালো চুল যেন আরো বেশী কালো দেখাচ্ছে। আর দু'পাশে কালো চুলে

ছেয়ে যাওয়া ওর ফর্সা মুখখানি অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। এক চিলতে আলোয় ওকে হাত তুলতে দেখলাম : 'ওই দেখো !' বললাম, 'ওটা রাস্তার আলো।

এবার ও উঠে বসলো বিছানায়। আলোটা ওর হাত থেকে সরে গিয়ে ওর মুখের উপরে পড়েছে, আলোটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে, রঙও বদলাচ্ছে সেই সঙ্গে। পালা করে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে ওর কাঁধে, বুকে মোমবাতির হলদে রঙের মতো। ওই তো আবার রঙ বদলাচ্ছে। কমলা রঙের সঙ্গে একটু নীলচে আভা মেশানো। একটু পরেই রঙটা টকটকে লাল হয়ে ওর মাথার পিছনে একটা জ্যোতির মতো দেখাচ্ছে এখন। পরক্ষণেই আবার রঙ শুধু বদলায় না, ধীরে ধীরে সরে গিয়ে এবার ঘরের ছাদে গিয়ে ঢেউ খেলতে থাকলো। বার বার রঙ বদল হতে দেখে এবার আমার আর চিনতে ভুল হলো না—রঙটা কিসের হতে পারে! ওকে বললাম, 'আরে, ওটা একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনের আলো।'

'যাইহোক, এখন তোমার ঘরটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না ?' মুখে হাসি ফুটে উঠলো ওর।

'তুমি এলে বলেই আমার ঘরের বাহার খুলে গেলো।'

বিছানার উপরে হাঁটু মুড়ে বসতেই ওর সারা দেহে নীল আলোয় রঞ্জিত হতে দেখে মনে হলো ও যেন এখন একটা নীল সমুদ্রে পরিণত হয়ে গেছে, খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো সাঁতার কাটতে সেখানে। ও আমার কামনা বিদগ্ধ চোখের ভাষা পড়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোমার ঘরের শ্রীবৃদ্ধি করতে এখন থেকে আমি প্রায় প্রতি রাতেই তোমার ঘরে আসবো, কথা দিলাম।'

আমি শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ওর দিকে তাকিয়ে থাকি, আমার তৃষিত চোখ দুটো ওর দেহখানি জরীপ করতে থাকে। মনে হচ্ছে আমি যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি, রূপকথার দেশে চলে গিয়ে সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখছি। মনের ভেতরটা এখন এক অদ্ভুত সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ কেমন সুখ, এ কেমন স্বপ্ন ? জেগে আছি, তবু স্বপ্ন দেখছি ? দিবাস্বপ্নও হতে পারে, কারণ এ রকম প্রবাদ আছে অনেক। আর সুখ ? মনে হয় ও আমার পাশে আছে বলেই এই সুখ ! এই স্বপ্ন ! সেই সুখ স্বপ্নের ঘোরেই বললাম ওকে, 'সত্যি প্যাট, আজ তোমাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে ? আচ্ছা তুমিই বলো তো, সাজগোজ করা পোষাকের আড়ালে ঠিক এতো ভালো দেখাতো তোমাকে ?'

'সে তোমার আমাকে ভালো লাগছে বলেই বোধহয়—' মৃদু হেসে ও ওর সুন্দর মুখখানি আমার মুখের কাছে নামিয়ে এনে চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমাকে, 'বব, ঠিক এমনি তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো চিরদিন ? তোমাকে আমি বলে রাখছি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে আমাকে, তোমার ভালোবাসায় এতোটুকু ঘাটতি হওয়া চলবে না। সত্যি বব, জানো আমি ভালোবাসার বড় কাঙ্গাল,

ভালোবাসা ছাড়া এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে পারি না।'

আমাদের দুজনের দৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের চোখে স্থির নিবদ্ধ। ওর মুখ আমার মুখের কাছে শুধু মাত্র স্পর্শের অপেক্ষায়। এই সামান্য ব্যবধানের মাঝে আমাদের মুখের ভাব অতি সরল, কিন্তু সেই সারল্যটা ছিলো উত্তেজনায় অস্থির, কান্নায় কান্নায় ভরা তৃষ্ণার। আমার মুখে কোন কথা নেই। ও নিজের থেকেই আবার কথা বললো, যেন অনেক দূর থেকে অতি মিহি গলায় ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'বব, তুমি আমাকে ঠিক এমনি করে আঁকড়ে ধরে থেকো, তোমার হাতের বন্ধন কখনো শিথিল করো না', দু'হাতে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বললো, 'কেউ আমাকে তেমন করে ধরে না রাখলেই আমার পদচ্যুতি ঘটবে। এই ভয়টা আমার সব সময় হয় বলেই আমার জীবনে তুমি আসার আগে পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষকে আমি ভালোবাসতে পারিনি—'

'কিন্তু প্যাট, তোমাকে দেখে কখনো তো মনে হয়নি যে, তুমি ভয়ে ভয়ে ছিলে?'

'ছিলাম বৈকি! আমার মুখে যে সাহস তুমি দেখেছিলে, সেটা ছিলো ভান, আসল প্রকাশ করিনি, কিন্তু মনে মনে সত্যি আমার ভীষণ ভয় ছিলো।'

'এখন তোমার আর কোনো ভয় নেই প্যাট, কথা দিচ্ছি, আমি তোমায় আঁকড়ে ধরে থাকবো শেষ পর্যন্ত।' যেন আগের মতো সেই স্বপ্নের ঘোরেই আমি তখনো কথা বলে যাচ্ছি, 'হ্যাঁ, দেখো প্যাট আমার কথা আমি কেমন ধরে রাখি। তুমি তখন নিজেই অবাক হয়ে যাবে, ভাববে—এ কি স্বপ্ন, নাকি সত্যি?'

ও ওর দু'হাতের চেটোয় আমার মুখখানা তুলে ধরে আমাকে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তুললো। তারপর কান্নায় কান্নায় ওর মন যখন ভরে গেলো, তবু সন্দেহযুক্ত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি সত্যি বলছো তো বব?'

ওর হাতের চেটোর মধ্যে থেকেই আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, একেবারে খাঁটি সত্যি। সূর্য কোনোদিন পশ্চিমে উঠলেও আমার কথার নড়চড় হবে না কখনো।' ওর কাঁধের উপরে বিজ্ঞাপনের সবুজ আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে—ওর দেহখানি জলমগ্ন। হঠাৎ অনুচ্চ গলায় কি একটা বলে আমার শরীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো—একটা বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ার মতো। ওর সেই স্নিগ্ধ কোমল শরীরের ঢেউ-এর জোয়ারে আমার সব দৃঢ়তা, সব সত্ত্বা কোথায় ডুবে একেবারে তলিয়ে গেলো।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখি, ও কেমন নির্ভাবনায় আমার আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে রাত যেন আর শেষ হয় না। কোন্ এক অজানা উদ্দেশ্যে আমরা দুজনে চলেছি ভেসে, যেখানে সময়ের কোন বালাই নেই। এমন অনায়াসে ওকে পাবো বলে ভাবতেই পারিনি। আমার পুরুষ

বন্ধু তো কতো আছে! কিন্তু কোনো নারী, বিশেষ করে সে যদি সুন্দরী হয়, সে কি আমাকে ভালোবাসতে পারে? জানি না। হয়তো এই একটি রাতের জন্যই শুধু। আজ রাত্রিটা সকাল হলে, হয়তো কালই আজকের এই অন্তরঙ্গতার কথা ভুলে যাবে মেয়েটি, আমাদের আজকের এই সম্পর্কের উপরে ইতি পড়ে যাবে, চুকে বুকে যাবে আজকের রাতের সব স্মৃতি, সব ঘটনা।

ভোর হয়ে আসছে। প্যাট-এর মাথার নিচে আমার হাত, ও একটু নড়ে চড়ে বালিশে মাথা তুলে শুতেই ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিলাম। বিছানা থেকে নেমে মুখ ধুলাম বাথরুমে গিয়ে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ঘরের নিস্তব্ধতাটা আমাকে কতো না ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে, অদ্ভুত লাগছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, ওর দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি প্যাট তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখের ইশারায় ও আমাকে ডাকলো—'এসো।'

ওর পাশে গিয়ে ওকে শুধালাম, 'বিশ্বাস হচ্ছে না প্যাট, ফেলে আসা রাতটা আমাদের স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে, নাকি অতো সুখ, অতো আনন্দ, সব সত্যি?'

'এ কথা কেন তোমার মনে হচ্ছে বব?'

'তা তো বলতে পারবো না, তবে মনে হয় ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝি অন্যরকম ঠেকছে।'

ভোরের আলোয় ঘরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই আলোয় নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে প্যাট্রিসিয়া বললো, 'এখন আমার ওই জিনিষগুলো দাও তো!' এই বলে ঘরের মেঝের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো ও। ওর পাতলা সিল্কের পোশাকগুলো হাতে তুলে নিলাম। পাতলা ফিনফিনে আর কতো হাল্কাই না জিনিষগুলো। কিন্তু এই সামান্যতেই কতোই না পার্থক্য এনে দেয়। এই সামান্য পোশাকের আবরণে নিজেকে ও ঢেকে দিলে একেবারে বদলে যাবে ও আমার চোখে। আশ্চর্য এ কথা তো আগে কখনো ভেবে দেখিনি, কিংবা আজকের এই চোখ নিয়ে আগে তো কখনো দেখিনি ওকে!

পোশাকগুলো ওর হাতে তুলে দিতেই দু'হাত দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো আমাকে গভীর ভাবে। সেই অবস্থায় আমিও ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমার বুকে। এক সময় আবেশে তৃপ্ত হয়ে আমার হাতের বন্ধন শিথিল করে নিয়ে গায়ে পোশাক চাপিয়ে তৈরী হলো বাইরে বেরোবার জন্যে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাড়ির দিকে ফিরে চললাম।

ওর বাড়ির দরজার সামনে এসে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজও আসছো তো?' নীরবে মৃদু হাসলো ও। আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ধ্যা সাতটায় তো? এবারেও কথা না বলে মাথা নাড়লো শুধু। তারপর আমার ঠোঁটে একটা গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদায় নিলো আমার কাছ থেকে। যতক্ষণ না ও ওর ঘরে ফিরে গিয়ে আলো

জবালালো, ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওর বাড়ির দরজার সামনে।

একা একা বাড়ি ফেরার পথে অনেক ভালো ভালো কথাই আমার মনে পড়লো, যা ওকে বলা উচিত ছিলো, কিন্তু বলতে পারিনি। কাল রাতে হঠাৎ ওকে অতো কাছে পাওয়ার ভাবাবেগে যদি না আমি অভিভূত হয়ে পড়তাম, অনেক কথাই বলতে পারতাম ওকে। আজ সে সব কথা গুছিয়ে বলবো ভেবে আস্তে আস্তে একটা বাজারে ঢুকে প্রথমেই ফুলের দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বেছে বেছে কয়েকটা তাজা টিউলিপ ফুল, তখনো শিশিরে সিক্ত ছিলো, ফুলয়ালীর হাতে তুলে দিতেই বললো সে, 'এগারোটা নাগাদ আপনার ইচ্ছে মতো এ ফুল প্যাট-এর কাছে পেঁছে যাবে।' তারপর ফুলওয়ালীর মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। একটা ভায়লেটের তোড়া দিয়ে বললো সে, 'আপনার ওই পছন্দ করা ফুলের সঙ্গে এটাও পাঠিয়ে দেবো। এবার নিশ্চিন্ত তো, দিন পনেরোর জন্যে আপনার বান্ধবী আপনার হাতের মুঠোয় বাঁধা রইলো।'

ফুলওয়ালীর দাম মিটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম অতঃপর।

☐ ছয় ☐

এই প্রথম আমি প্যাট-এর বাড়িতে যাচ্ছি। এর আগে হয় ও আমার ঘরে এসেছে, কিংবা ওর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আমরা মিলিত হয়েছি। যাইহোক, আমাদের সেই মিলনের মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব ছিলো। তাই এখন আমার ইচ্ছে, গভীর ভাবে ওকে জানবার—কোথাকার মেয়ে ও, কিভাবে থাকে ও, ইত্যাদি, ইত্যাদি—

প্যাটের বাড়ির সামনে এসে পোশাকটা একবার ঠিকঠাক করে নিয়ে ওর তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে এলাম সিঁড়ি পথে। বাড়িটা নতুন আর আধুনিক ডিজাইনের, যথেষ্ট পরিষ্কার, আমাদের বাড়িউলি ফ্রাউ জালেওয়াস্কির জরাজীর্ণ প্লাস্টার খসা বাড়ির মতো নয়। প্যাট থাকে তিনতলায়। দরজায় জাঁকজমকে পেতলের প্লেটের লেখাটা চোখে পড়লো—এগবার্ট ফন হাকে—লেফটেনান্ট কর্নেল। বেল টিপতেই শাদা এ্যপ্রন পরা একটি মেয়ে দরজা খুলে দিলো।' আপনি হের লোকাম্প, তাই না?' মেয়েটি জানতে চাইলো।

'হুঁ।' মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

মেয়েটি নীরবে সিঁড়ির ধার দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে দিলো। বসবার ঘর, ছোট্ট। দেওয়ালে বড় বড় সেনাধ্যক্ষদের ছবি ঝুলছে।

সামরিক পোশাকে ঢাকা মূর্তিগুলো যেন অবজ্ঞার চোখে আমার সাদা পোষাকের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সামরিক আবহাওয়া বিরাজ করছিলো ঘরের মধ্যে। দ্রুতপায়ে প্যাটরিসিয়া এগিয়ে এলো আমার দিকে। মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেলো। ও এলো, আর সঙ্গে যেন আনন্দের বন্যা নিয়ে এলো। ধীরে ধীরে ওর কাছে গিয়ে ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিলাম। আসবার সময় সরকারী পার্ক থেকে একগচ্ছ লাইলাক ফুল চুরি করে এনেছিলাম, সেগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'টাউন কাউন্সিলের সাদর সম্ভাষণ সমেত এগুলো গ্রহণ করো।' আমাকে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে দেখে হেসে উঠলো, তারপর ফুলগুলো একটি সুদৃশ্য ফুলদানিতে রাখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সেই ফাঁকে ঘরের চারদিক চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম আমি। সুন্দর ভাবে সাজানো ঘর। আসবাবপত্রে রুচির প্রকাশ পাচ্ছিল।

'এমন সুন্দর একটা ঘর তুমি যোগাড় করলে কি করে প্যাট? ভাড়াতে ঘর তো দেখেছি, কতো অগোছানো, রুচির বালাই বলতে কিছু থাকে না।'

'তুমি ঠিকই ধরেছে বব', হাঁটু গেড়ে বসে ও যখন ফুলদানিতে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখছিল, ওকে তখন ঠিক একটি অসহায় শিশুর মতো দেখাচ্ছিল। আবার ওই মেয়েরই হাঁটা চলায় হাবভাবের মধ্যে বন্যপ্রাণী সুলভ বিশেষ একটা শ্রী আছে যেন। আবার ও যখন কাজ সেরে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, তখন ওকে আর সেই ছেলেমানুষটি বলে মনে হলো না। তখন ওর চোখ মুখের অজ্ঞাত রহস্যের ইঙ্গিত কি এক অদ্ভুত নেশায় আমাকে মাতাল করে তুললো। আমার দু'হাতের বাহুবন্ধনের আবদ্ধে ওর স্পর্শসুখটি বড় রমণীয় লাগছিল। আমার বুকের মধ্যে থেকেই ও ওর কথায় জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'জানো বব, এ বাড়িটা ছিলো আমার মায়ের, আর এ ঘরের সব আসবাবপত্রগুলোও আমার নিজের। মা মারা যাবার পর এ দু'টি ঘর নিজের জন্যে রেখে আর বাকী সব ঘর ভাড়া দিয়ে দিই।'

তাহলে এ বাড়িটা তোমার নিজের? আর লেফটেনান্ট কর্ণেল এগবার্ট ফান হাকে, যার নেমপ্লেট দেখলাম পাশের ঘরে, উনি তোমার ভাড়াটে?'

মাথা নাড়লো ও, 'না এখন আর এ বাড়িটা আমার নয়। বাড়িটা রাখতে পারিনি। এখন আমিই এ বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া, ভাগ্যের পরিহাস বলতে পারো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও আবার বললো, 'কিন্তু ওই বৃদ্ধ এগবার্টের প্রতি তোমার এমন বীতরাগ কেন বব?'

'না না, বীতরাগ হতে যাবে কেন? আসলে কি জানো, পুলিশের লোক আর সেনাবিভাগের অফিসাররা আমার ঠিক ধাতে সয় না। যুদ্ধের সময় সেনাবিভাগে থাকবার সময় থেকেই এই রকম একটা ভাব জেগে উঠেছিল আমার মনে।'

হেসে উঠে প্যাটরিসিয়া বললো, 'আমার বাবা ছিলেন একজন মেজর। তা তুমি ওই বৃদ্ধ হাকেকে চেনো নাকি?'

'না তো, আমি চিনি না।'

'পরিচয় করবে ওর সঙ্গে? বেশ চমৎকার মানুষ উনি, আলাপ করলে তোমার ভালো লাগবে।'

'কি যে বলো! আমি হলাম গিয়ে একজন জাতে মিস্ত্রী এখন, জালেওয়াপ্পিক সমাজের লোক। অতো বড় একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় করাটা শোভা পায় না।'

এই সময় সেই মেয়েটি ছোট্ট একটি ট্রলি ঠেলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। পোসির্লেনের পাত্র, চকচকে রুপোর রেকাবিতে কেক, স্যাণ্ডউইচ, ন্যাপকিন, সিগারেট, চা ও কফিতে ভরা ট্রলি দেখে আমি বিস্মিত।

'এ সব কি কাণ্ড প্যাট—এ যে দেখছি ছায়াছবির একটা দৃশ্যের মতো! এই হতভাগ্যের দশা তো তুমি জানো, আর আমার ঘরের দৈন্য দশা তো তুমি নিজের চোখে দেখে এসেছো। কাজেই অনভ্যাসের দরুণ ধরো যদি কাপ ডিস কিংবা কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলি, দোষ দিও না যেন।'

'না, ভাঙতে তুমি পারো না', হেসে বললো ও। হাজার হোক তোমার এখন পেশা মেকানিকের, কিন্তু ভাঙতে গেলে তোমার বিবেকে বাঁধবে। বিশেষ করে যে কোনো কাজেই কিভাবে হাত চালাতে হয় সে তো তোমার বেশ ভালোভাবেই জানা আছে।' একটা পট টেনে বললো প্যাটরিসিয়া, 'কি খাবে, চা না কফি?'

'সেকি, চা কফি দুটোরই ব্যবস্থা আছে নাকি?' আর একবার বিস্ময়ের পালা। 'এ যে দেখছি স্বর্গে এসে হাজির হয়েছি আমি।' বললাম আমি, 'কফিই দাও। তবে তুমি কি খাবে?'

'আজ তোমার সঙ্গে আমিও কফি খাবো।'

'ও, সাধারনত তুমি বুঝি চা-ই খাও?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চা-ই দাও।'

'না, এখন থেকে আমিও তোমার মতো কফি খাওয়ার অভ্যাস করবো। সঙ্গে কি খাবে কেক না স্যাণ্ডউইচ?'

'দুটোই। আমি কিছুই ছাড়তে নারাজ। পরে একটু চা-ও খাবো। তোমার সব কিছুই একটু চেখে দেখতে চাই।'

'বেশ তো', হাসতে হাসতে ও আমার প্লেটে সব রকমের খাবার ভর্তি করে দিলো। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, আরে, এ তুমি কি করছো, এতো খাবার? কিন্তু ভুলে যেও না, পাশের ঘরে লেফটনাণ্ট কর্ণেল রয়েছেন। জানো প্যাট, আর্মি'তে পান ভোজনের খুব কড়াকড়ি ছিলো, তবে সেটা কেবল সাধারণ সৈনিকের বেলায়—' এখানে একটু থেমে আবার বললাম আমি, 'আর শুধু পান ভোজনে

কড়াকড়ি হলেও কথা ছিলো, কিন্তু কোনোরকম আরাম উপভোগ করবারও অধিকার ছিলো না আমাদের। কর্তাদের ভাষায় আমাদের কাছে আরাম ছিলো হারাম।' কথা বলার ফাঁকে চারদিক তাকিয়ে দেখতে গিয়ে অনুভব করলাম, প্রতিটি জিনিষ ঘরের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। হ্যাঁ, বসবাসের জন্যে ঠিক এমনি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন।

ও আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'ইচ্ছে করলে তুমিওতো এসব জিনিষ অনায়াসেই পেতে পারো বব।'

ওর নরম হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললাম আমি, 'কিন্তু এসব বৈভব, ঐশ্বর্য আমি তো চাই না। এসব আমায় মানায় না। যাদের কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, সুখের জীবন, এসব তাদেরই মানায়। আর আমরা হলাম গিয়ে ভবঘুরে মানুষ, আমাদের নির্দ্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই। এই আছি আজ এখানে, আবার কালই হয়তো অন্য এক ঠিকানার খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বো। পথই যাদের ঠিকানা পাথ পথে থাকাই তো তাদের অভ্যাস। আর এ যুগের নিয়মও তাই।'

'কিন্তু সেটাই বা খারাপ কি?' বললো প্যাট।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক', হেসে বললাম, 'থাক সে কথা, এবার আমাকে একটু চা দাও দেখি, চেখে দেখবো।'

'না, কফি নয়। বরং আরো কিছু খাবার দিই, কি জানি তুমি যদি এখনি পথে বেরিয়ে পড়ো।'

'তা যা বলেছো। কিন্তু এগবার্ট বেচারা যে কেক খুব ভালোবাসেন। তিনি নিশ্চয়ই আশা করে বসে আছেন, ওঁর জন্যেও কিছু কেক তুমি রেখে দেবে।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো খাওয়াচ্ছি বেশী করে তোমাকে, যাতে করে উনি বুঝতে পারেন যে, সুযোগ পেলে সাধারণ সৈনিকরাও লেফটেনান্টদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে। এটাও এ যুগের ধারা।

ওর সুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবার আমি যখন পথে বেরোবো, তখন একটা জিনিষ অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবো। কোন্ জিনিষটা জানো? তোমাকে!' হেসে আবার বললাম, 'ঠিক আছে, তোমার ভাষায় এবার এগবার্টের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া যাক, কি বলো?'

জানালার ফ্রেমে রাতের দৃশ্য চোখে পড়লো—প্রতিটি বাড়ির ছাদের গায়ে সন্ধ্যার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। আমার পাশেই ছিলো প্যাটরিসিয়া। ওকে বললাম আমি, 'দারুণ চমৎকার জায়গাটা তো। আমি হলে বাইরে কোথাও না গিয়ে এখানেই কাটিয়ে দিতাম দিনের পর দিন।'

'এক সময় আমারও মনে হয়েছিলো, বুঝি এখান থেকে আর বেরোতে পারবো না',

হেসে বললো ও, 'আমি তখন খুব অসুস্থ।'

'কেন, কি হয়েছিল তোমার?'

'তখন আমার বাড়ন্ত শরীর, অথচ যথেষ্ট পরিমান খাবার জুটতো না। তখন যুদ্ধ চলছে—খাবার দাবারের বড় আকাল ছিলো, জানোই তো। এর ফলেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী ছিলাম।'

'ওঃ, সে তো অনেক দিন!' ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

'ওসব কথা এখন থাক', ম্লান হেসে বললো ও, 'বেঁচে গেছি, এই তো যথেষ্ট। মনে পড়ে তোমার, একদিন বাব-এ ভ্যালেনটিন বলেছিলো—যুদ্ধ থেকে সে যে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছিল, সেই আনন্দেই মেতে আছে সে, অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে।'

'বাঃ তোমার দেখছি সব কথাই মনে থাকে বেশ।'

'আমিও যে ওই একই পথের পথিক, তাই কথাটা আমার মনে গেঁথে গেছে। হ্যাঁ, সেই অসুখের পর থেকে আমিও সামান্য কিছু পেলেই খুশি। কিন্তু এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানো বব, আমি বোধহয় খুব বাজে মেয়ে!'

'যারা বাজে নয় বলে নিজেকে জাহির করতে চায়, আসলে তারাই তো বাজে ধরনের মানুষ।'

'কিন্তু আমি মনে করি, সত্যি আমি তাই? এখন আমার বাড়তি কোন চাহিদা নেই, সামান্য কিছু পেলে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এই যে লাইলাক ফুল পেলাম তোমার কাছ থেকে, এই যথেষ্ট, এতেই আমি খুশি, এতেই আমার সুখ।'

'এতো বাজে বা সস্তা মেয়ের কথা নয় প্যাট। তোমার কথার মধ্যেই রয়েছে জীবনের মূল তত্ত্ব, সব জ্ঞানের নির্যাস!'

'না না, ওসব কিছু নই আমি। আমি অত্যন্ত বাজে প্রকৃতির মেয়ে—'

'তাহলে আমিও তোমার মতো—'

'না না, তুমি আমার মতো হতে যাবে কেন? খানিক আগে তুমিই না বলছিলে নির্ভাবনার সুখের জীবনের কথা? হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই! আমার ধান্দা কেবল সুখের জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করবো। আর সেটা হিসেবী কিংবা বেহিসেবীই হোক, আমি পরোয়া করি না, করেওছি তাই। আমার সে কাজ বুদ্ধিমানের মতো হোক কিংবা বোকার মতোই হোক, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

হেসে বললাম আমি, 'তা তোমার মনটা এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো কেন?'

'আমাকে সবাই তখন জ্ঞান দিতো—আমি যা করছি তা অন্যায়। আমার দায়িত্ব জ্ঞান থাকা উচিত। অর্থাৎ একটা চাকরী জোগার করে নিয়ে নিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারলে তারা খুশি হতো। এই সব কথা শুনে আমার তখন ভীষণ জেদ

চেপে যায়। না, কোনো চিন্তা করবো না, খাবো দাবো আর খুশি মতো ফুর্তি করে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। হিসেব করে চলা মানেই তো নিজের আত্মাকে অতৃপ্ত করা, কষ্ট দেওয়া। আমার মা তখন সবে মারা গেছেন, আর আমিও তখন দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পরে সেরে উঠেছিলাম। এই বলে ও আমার মুখের দিকে প্রশ্ন চোখে তাকালো, 'সত্যিই কি আমার কাজটা দায়িত্বহীনের মতো হয়েছিল? তোমার কি মনে হয় বব?'

'না, তোমার এ কাজ সাহসেরই পরিচয় বহন করছে। তাছাড়া তুমি তো বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছো। টাকা তুমি রাখতে পারতে না, খরচ ঠিক হয়েই যেতো। বরং ফুর্তি করে টাকার মূল্য তবু কিছু পেয়েছো।'

'কিন্তু এভাবে আর বোধহয় বেশীদিন চালানো যাবে না। এবার একটা কিছু আমাকে ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই সেদিন বিনডিং-এর সঙ্গে ইলেকট্রো গ্রামোফোন কোম্পানির মালিক ডঃ ম্যাক্স ম্যাটাসফিটের কাছে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম।'

'তা কবে কাজে যোগ দিতে হচ্ছে?'

'পয়লা আগস্ট থেকে।'

'তোমার এই চাকরীটা আমার একেবারেই পছন্দ নয় প্যাট। এর মধ্যে অন্য ভালো একটা চাকরীর চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'আমার কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগছে না', ও বললো, 'তুমি মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছো। চাকরীর কথাটা তোমাকে বোধহয় না বললেই ভালো হতো।'

'কেন বলবে না? নিশ্চয়ই বলবে। এখন থেকে তোমার সব কথাই বলবে আমাকে, বলবে তো?'

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে ভুলে গেলো ও অনেকক্ষণ। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, বলবো। তারপর ঘরের এক কোণায় রাখা একটা ছোট্ট আলমারি খুলে আমার দিকে তাকালো ও, 'জানো, তোমার প্রিয় রাম এনে রেখেছি তোমার জন্যে। খুব ভালো মদ—'

কিন্তু ওই রাম-এর রঙ দেখেই আমি তখন বুঝে গেছি, ওটা একেবারে বাজে জাত। দোকানি ঠকিয়েছে ওকে। যাইহোক, ওর মন রাখতে প্রথম গ্লাসটা নিমেষে নিঃশেষ করে অভিনয় করলাম, 'আঃ কি চমৎকার, আর এক গ্লাস দাও।' কিন্তু মনে মনে বললাম, ফেরার পথে ওই দোকানিকে একটু কড়কে দিয়ে যাবো। একটু পরেই বললাম, 'আচ্ছা প্যাট, এবার তাহলে চলি।

করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'না, এখনি যেও না। আরো একটু বসো আমার কাছে।'

বাইরের আলোয় ঘরের মেঝেতে আমাদের দু'জনের ছায়া কাঁপতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হলো জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার শোবার ঘরটা আমাকে

দেখাবে না ?' সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলো ও। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখলাম! একটা এলোমেলো চিন্তায় আবিষ্ট আমি তখন। এক সময় বললাম, 'আঁ, এটিই তোমার শোবার ঘর, ওই তোমার বিছানা ?'

'হ্যাঁ, এছাড়া আর কিই বা হতে পারে বব !'

'ঠিকই তো।' নিজেই নিজেকে ধমক দিলাম, কি যা তা বকছি ? ওকে বললাম, 'আসলে আমার বলার ছিলো, ওই বিছানায় তুমি ঘুমোও ? সে যাকগে, এখন তো আমাকে যেতে হচ্ছে প্যাট। আমি তাহলে আসি—'

প্যাট আমাকে জড়িয়ে ধরলো দু'হাত দিয়ে। এমন সন্ধ্যা ঘন আঁধারে ওই নীল বেডকভারটির নিচে দুজনে পাশাপাশি জড়াজড়ি করে শুতে পারলে যে সুখ পেতাম, তার তুলনা নেই। কিন্তু ওই লোভটা সম্বরণ করতে হলো আমাকে ভয়ে নয়, সংযমও বলা যাবে না। আসলে মনটা তখন এমনি স্নেহার্দ্র হয়ে উঠেছিল যে, আপনা থেকেই লোভের হাতটা গুটিয়ে ফেলতে হলো।

'চলি প্যাট! খুব ভালো লাগলো আজ তোমার এখানে এসে। বিশেষ করে তোমার ওই রামটা—'

'এ আর এমন কি ?'

'অনেক, অনেক প্যাট। আমার কাছে ওটার মূল্য অনেক। তোমার মতো করে আমার জন্যে এর আগে কেউ কখনো ভাবেনি।'

বাড়ি ফিরে প্রথমেই আরনা বোনিগের ঘরে ঢুকলাম। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'আজকাল মেয়েদের চাকরীর বাজার কেমন আরনা ?'

'খুবই খারাপ। তা কি রকম চাকরী শুনি ?'

'যেমন সেক্রেটারী কিংবা এ্যাসিসটেন্টের—মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী।'

'দেখো বব, আজকাল হাজার হাজার বেকার বসে আছে—এ বাজারে চাকরী পাওয়া খুবই মুশকিল।'

'কিন্তু আরনা, মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের তো একটা মূল্য থাকা উচিত!'

'বুঝেছি, ওই মেয়েটি যে ভালো সৎ পরিবারের মেয়ে, অবস্থা ভালো ছিলো এক সময়ে, কিন্তু অবস্থা পড়ে যাওয়াতে—উঁহু, ওটা এখন আর বিবেচ্য বিষয় নয় নিয়োগ কর্তাদের কাছে।' একটু থেমে আরনা বললো, 'বব তুমি একটা কাজ করো, তুমি স্বয়ং নিজেই আরো বেশী পরিশ্রম করো—পার্ট'টাইম কাজ ধরে নাও। তাতে তোমাদের দুজনের সংসার বেশ ভালো ভাবেই চলে যাবে দেখো।'

'দেখো আরনা, তুমি যতো সহজে উপায় বাতলে দিলে, আমার নিজের ব্যাপারে আমি নিজেই ততোটা নিশ্চিত নই।

কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালো আরনা। নিমেষে ওর মুখের ভাব

বদলে গেছে। এক সময় শুকনো গলায় বললো ও, 'ওপর থেকে আমাকে দেখে মনে হয়, আমি বেশ ভালোই আছি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুখ ভোগ করছি। কিন্তু এখনো যদি তেমন কোনো পুরুষ এসে বলে, আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, ভদ্রভাবে সে আমাকে তার জীবন সঙ্গিনী করতে চায়, সেই মুহূর্তে এই সুখ, এই সব বৈভব ছেড়ে এক পোশাকে আমি চলে যাবো তার সঙ্গে। যাক সে সব কথা—সবার মনেই এমন একটা জোলো আবেগ থাকে। আর তোমার মধ্যেও সেটা আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'আমার মধ্যে, কি যে বলো তুমি!'

'না, আমি মিথ্যে বলিনি।' জোর দিয়ে আরনা বললো, 'কোনো ব্যাপারে তুমি যখন বেশী জোর দেখাতে যাও তখনি তোমার মনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়।'

বললাম, 'তুমি যতোই বলো না কেন, তেমন মানুষ আমি নই—'

আটটা পর্যন্ত ঘরে বসে থেকে মন আর টিকলো না, বেরিয়ে পড়লাম শেষে বার-এর উদ্দেশ্যে। অন্তত কথা বলবার লোক পাওয়া যাবে সেখানে। ভ্যালেনটিন তার সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই বসেছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলো, 'এখানে এসো কমরেড।' ওর পাশে গিয়ে বসতেই জিজ্ঞেস করলো ও, 'কি খাবে বলো?'

'রাম হলেই ভালো। আজ বিকেল থেকে রামের উপরে আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে।

'বেশ তো, রামই তো সৈনিকদের প্রধান খাবার', আমাকে সমর্থন করে বললো ও, 'একটা কথা বব, আজ তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, বেশ কয়েক বছর বয়স তোমার কমে গেছে।'

'তাই কি?' তারপর দুজন দুজনের স্বাস্থ্য কামনা করে গ্লাসে চুমুক দিলাম। এক চুমুকে সবটাই নিঃশেষিত—এক সঙ্গে দুজনেই হেসে উঠলাম। 'বুড়ো খোকা কোথাকার!' বললো ভ্যালেনটিন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠলাম, 'তুমি একটা বুড়ো মাতাল!'

আবার দুজনে দুজনের স্বাস্থ্য কামনা করে দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিলাম, এরপর ভ্যালেনটিন বিদায় নিয়ে চলে গেলো। এখন বার-এ দ্বিতীয় প্রাণী বলতে ফ্রেড। নির্জনে একা একা দেওয়ালে টাঙ্গানো বিবর্ণ ম্যাপ আর পালতোলা নৌকোর ছবি দেখতে গিয়ে বারবার প্যাটের কথা মনে হচ্ছিলো। খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো ওকে টেলিফোন করি একবার। কিন্তু কি ভেবে পরক্ষণেই নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। ওর সম্পর্কে এতো আগ্রহ না দেখানই ভালো। ওকে হঠাৎ হাতের কাছে পাওয়া জিনিষের মতোই ভাবা উচিত। হঠাৎ এসেছে, আবার হঠাতই চলে যেতে কতক্ষণ? ও যে

আমার চিরদিনের হয়ে থাকবে, এ রকম আকাশ কুসুম স্বপ্ন না দেখাই ভালো। ভালোবাসা চিরস্থায়ী—সব প্রেমিকেরই এই রকম ধারণা, এই জন্যেই সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে থাকে তারা। আমি ঠেকে শিখেছি, আর বুঝে গেছি, সংসারে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়!

আর এক গ্লাস ফরমাস দিলাম ফ্রেডকে। তৃতীয় গ্লাসটি নিঃশেষ করে ভাবতে বসলাম নিজের মনে। প্যাট্রিসিয়ার কাছে আজ না গেলেই বোধহয় ভালো করতাম। ওর সেই শয়নকক্ষটির কথা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিলাম না, আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে সেই দৃশ্যটি—আধো অন্ধকার ঘর, ঈষৎ নীলচে আভা ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে, মেয়েটির বসবার মনোরম ভঙ্গিমা, ওর গাঢ় কণ্ঠস্বর, জীবনকে ভোগ করবার হাতছানি। ছিঃ ছিঃ নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো, মনের এই কাঙালিপনা অসহ্য। শুরুতে অভিজ্ঞানজনিত রোমাঞ্চকর একটা উত্তেজনার মোহ ছিলো, সেটা ছিলো অনেক ভালো। কিন্তু মনটা এখন ভাবাবেগে বড্ড বেশী উতলা হয়ে উঠেছে। ওই একটা মাত্র চিন্তাই আমার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম, ভেতরে ভেতরে আমি অনেক বদলে গেছি। তা না হলে ওর সঙ্গ যখন আমার একান্তই কাম্য বলে মনে হয় এখন, কেনই বা চলে এলাম ওর কাছ থেকে? না, আর ভাবতে পারছি না, যা ভবিতব্য তাই হবে। কিন্তু এদিকে আবার ওকে না পেলে মন বলে, আমি পাগল হয়ে যাবো। এরই নাম প্রেম, এরই নাম জীবন। এরই জন্যে এতো ভাবনা কিসের? আজ না হয় কাল তো ঢেউ এসে ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, আমরা তো ভাঙ্গনের তীরেই দাঁড়িয়ে আছি আজ।

বাইরে মেঘের গর্জন শুনে ফ্রেড বার থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখে এলো বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিনা! না, তখনো বৃষ্টি নামেনি, শুধুই মেঘের ঘন ঘটা। আবার টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে মনে হলো, না, ফোন করবার কি দরকার? নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখি কোণ্টার আর লেনতসও হাজির সেখানে। আমার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে যেন ও বললো, 'হাঁ করে একবার নিঃশ্বাস ফেলো তো?

ওর হুকুম তামিল করলাম। কেমন বিজ্ঞের মতো ও বললো, 'রাম, চেরি, ব্রাণ্ডি আর অ্যাবসিন্থে—হতভাগা, নেশা করার আর কোনো পানীয় খুঁজে পেলে না?'

'তোমরা মনে করেছো, আমার বুঝি নেশা হয়েছে? ভুল করেছো।' ঈষৎ রাগ দেখিয়ে বললাম, 'যাক সে কথা, এখন তোমাদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি?'

'একটা রাজনীতির সভা থেকে', বললো লেনতস, 'তবে সে সভায় অটোর একটুও মন লাগেনি, কারণ রাজনীতি ওর ধাতে সয় না।'

'তাই বুঝি!' অটোর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে,

আমি খেতে চললাম।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন অটো তখন। ওর চিন্তার কারণ অনুমান করে আমি বললাম, 'অতো চিন্তা করো না অটো, নেশাই যদি আমি করে থাকি, মনের সুখেই করেছি, দুঃখে নয়।'

'বেশ তো, খাবারের সন্ধানে বাইরে কেন যাচ্ছো, এসো, এখানেই কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

রাত এগারোটা নাগাদ আমি নেশা মুক্ত হলাম। মাথাও দিব্যি সাফ। আজে বাজে সব চিন্তা দূরে হয়ে গেছে তখন আমার মাথা থেকে। সতেজ মন নিয়ে উঠে গিয়ে ফোন করলাম প্যাটকে। সেই কখন থেকে ওকে ফোন করবার জন্য মনটা ভীষণ ছটফট করছিল, এতক্ষণ সেই ইচ্ছার হাতটাকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। দূরভাষে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই সংক্ষেপে ওকে জানিয়ে রাখলাম, 'মিনিট পনেরোর মধ্যেই তোমার কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছি।' যদি কোনো অজুহাত দেখিয়ে ও না করে দেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

কথা মতো যেতেই নেমে এলো প্যাটরিসিয়া। ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান তখন শুধু একটা কাঁচের দরজা। এপাশ থেকে দরজার কাঁচে ঠোঁট চেপে ওর মাথার উপরে চুমু খেলাম শব্দ করে। দরজা খুলে হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু তার আগেই ওর ঠোঁটে চুমু খেয়ে মুখ বন্ধ করে দিলাম। তারপর ওকে বাহুবদ্ধ করে রাস্তায় এসে নামলাম দ্রুতপায়ে। তখনো একটানা মেঘের গর্জন আর আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানিতে রাস্তা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল মাঝে মাঝে। ভাগ্য সহায় ছিলো আমাদের, তাই দু'কদম এগোতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো' ওকে বললাম, 'বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি পৌঁছতে হবে।' কিন্তু গাড়িতে উঠে বসতে না বসতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। গাড়ির ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ কানে ভেসে এলো। মাঝে মাঝে গাড়ির ঝাঁকুনিতে ও এসে আমার গায়ে আছড়ে পড়ছে, বেশ লাগছে ওর স্পর্শসুখটুকু। ভালো লাগছে মদ্যপানের অনুভূতিটাও। বুঝতে পারছি, আমার সংযমের সব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। এমন এক বৃষ্টি ঝরা রাতে আমার মনে হলো, অস্বাভাবিক বলে কিছু থাকার কথা নয়, কোনো কিছুই অন্যায় নয়।

বাড়িতে এসে ট্যাক্সি থেকে নামতেই মুসলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঘরে ঢুকে আলো আর জ্বাললাম না। বাইরে বিদ্যুতের চমকানিতে ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে গিয়েছিল। আকাশে ঘন ঘন মেঘের গর্জন শুনে প্যাটকে বললাম, 'আজ আমরা প্রাণ খুলে চিৎকার করে প্রেমালাপ করতে পারবো, আমাদের কথা বাইরে কেউ শুনতে পাবে না।' এই বলে সেই আলো আঁধারির লুকোচুরির খেলায় ধীরে ধীরে

প্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর ঠিক তখনি বিদ্যুতের ঝলকানির আলোয় মুহূর্তের জন্য প্যাট-এর কোমল দেহবল্লরীটি যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠতে দেখা গেলো। আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। বাধা দিলো না ও, বরং নিজের থেকেই ও আমার উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দিলো। ওর নরম ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ, ওর তপ্ত নিশ্বাস…তারই মাঝে আমার সব ভাবনা চিন্তা সব মিলে মিশে সেই আলো আঁধারে তলিয়ে যায় ন্যায় অন্যায়ের বেড়া ভেঙে।

সাত □

আমাদের কারখানায় এখন নতুন কোনো কাজ নেই। তাই সদ্য কেনা ট্যাক্সিটা বিক্রি না করে ভাবলাম আমি আর লেনতস পালা করে ভাড়া ট্যাক্সি হিসেবেই কিছুদিন চালাবো, তাতে আমাদের রাহা খরচ উঠে আসবে। তবে এর জন্য একটা ভালো ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড খুঁজে বার করলাম, ওয়ালডেকায় হফ্ হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে। বিজনেস সেন্টার—যাত্রী পাওয়ার উপযুক্ত জায়গা বটে। পাঁচটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। বয়স্ক ট্যাক্সি চালক গুস্তভ আমার কাছে এসে খুব ঝাঁঝালো গলায় আমাকে শাষালো, 'এটা আমাদের স্ট্যাণ্ড, এমনিতেই আমাদের সওয়ারি জোটে না, তাই তোমাকে এখানে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না, ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো এখান থেকে! এক দুই, তিন গুণবো, তার মধ্যে যদি না তুমি চলে যাও—'

বুঝলাম, গুস্তভের মতো অমন জেদী লোকের সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ হবে না। ওর নির্দেশ মতো চলে না গেলে মারপিট করতে হবে। গুস্তভ তার কোটের বোতাম খোলার ফাঁকেই বলে উঠলো, 'এক…'

তবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'আরে আরে একি করছো তুমি? তার চেয়ে দু'চার পেগ রাম গলায় ঢাললে হতো না?'

আমার কথায় কান না দিয়ে জোর গলায় আবার হাঁকলো গুস্তভ—দুই—'

আমি এবার মরীয়া হয়ে খিঁচিয়ে উঠলাম, 'বোকা হাঁদারাম, চুপ করো!' আমার সেই ধমকানিতে থতমত খেয়ে গেলো সে। অবশ্য পরক্ষণেই সামলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে এক পা এক পা করে। আমিও এটাই চাইছিলাম। ও আমার একেবারে মুখোমুখি হতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি মারলাম দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। কোষ্টারের কাছ থেকে শিখেছিলাম এই কায়দাটা।

গুস্তভ তখন একেবারে কুপোকাত। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। আমার মনোভাব টের পেয়ে একটা ছোকরা ড্রাইভার বলে উঠলো, 'ওর কিছুই হয়নি। চিন্তা করো না, এমন হামেশাই লড়াই করে বেড়াচ্ছে ও। দেখবে একটু পরেই ও আবার উঠে বসেছে। তখন একেবারে ফিট। দুজনে ধরাধরি করে ওর ট্যাক্সিতে শুইয়ে দিলাম। ছোকরা ড্রাইভারটি আবার বললো, 'ওর জন্য চিন্তা করো না। তার চেয়ে চলো, ওই রেস্তোরায় আমাদের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে তোমার ভর্তি'র ফিটা হয়ে যাক। রেস্তোরার দিকে যেতে গিয়ে সে আরো বললো, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এ লাইনে তুমি একেবারে নতুন, ঘোঁতঘাত কিছুই জানো না। মনে হয়, এটা তোমার পেশা নয়। হ্যাঁ, আমারও নয়। ছিলাম থিয়েটারের অভিনেতা।'

'এতে তোমার সংসার চলে?'

'হ্যাঁ, কোনোরকমে কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে তো আছি', হাসতে হাসতে বললো সে, 'তা এটাও তো এক ধরনের অভিনয়, কি বলো?

আমরা পাঁচজন ট্যাক্সিচালক। দুজন বয়স্ক, বাকি তিনজন অল্প বয়সের। একটু পরেই গুস্তভ এসে হাজির হলো সেই রেস্তোরায় এবং ওকেও বিয়ার দেওয়া হলো। এক নিশ্বাসে এক গ্লাস বিয়ার গলাধঃকরণ করে নিলো ও। আর এক দফা ফরমাস দেওয়া হলো। এতক্ষণ ও আমাকে আড়চোখে নিরীক্ষণ করছিল, এবার ও আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো, 'বেঁচে থাকো বৎস।' তবে আগের মতোই তেমনি মুখ গোমড়া করে রইলো। আমি ওর গ্লাসে আমার গ্লাসটা ঠেকাতেই ও আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলো, আমি সেটা নিলাম। এবার আর এক দফা কুমেল ফরমাশ করলাম। আবার এক নজরে আমাকে দেখে নিয়ে ও এবার বললো, 'বাঁদর কোথাকার!' ওর গলার স্বর শুনেই বুঝলাম, ওর রাগ পড়ে গেছে। তাই হাল্কা সুরে আমিও বললাম, 'হাঁদারাম কোথাকার।'

ও এবার দাঁত বের করে হেসে নিজের পরিচয় দিলো, 'আমি গুস্তভ।'

'আর আমি রবার্ট।' ব্যাস, এ ভাবেই দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেলো।

এরপর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ফিরে এসে দেখি একটা একটা করে ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতে থাকলো। সেই ছোকরা ড্রাইভারটির নাম টমি। বেশ একটা ভালো ভাড়া নিয়ে ষ্টেশনে চলে গেলো সে। তবে বেচারা গুস্তভের কপাল মন্দ—মাত্র তিরিশ ফেনিগ-এর ভাড়ায় ওকে সামনের এক রেস্তোরায় যেতে হলো। অবশ্য আমার কপাল খুব ভালো। প্রথম দিনেই একটা ভালো যাত্রী জুটে গেলো—এক ইংরেজ বয়স্কা মহিলা, শহর ঘুরিয়ে দেখাতে হবে তাকে। ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে রাস্তায় ঘুরিয়ে ফেরার পথে আরো দু'একটা ভাড়াও জুটে গেলো।

বিকেলে খোশ মেজাজে কারখানায় ফিরে এসে দেখি লেনতস আর কোষ্টার আমার অপেক্ষায় বসে আছে সেখানে। প্রথম দিন ট্যাক্সি চালিয়ে পঁয়তিরিশ মার্ক

রোজগার করেছি। শুনে কোস্টার বললো, 'বাঃ দারুণ তো! খরচা বাদ দিয়ে এ যে দেখছি নেট কুড়ি মার্ক লাভ। প্রথম ব্যবসায় লাভ। এ টাকায় একটু ফুর্তি করে উড়িয়ে দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে লেনতস লাফিয়ে উঠলো, 'এক পাত্র উডরাফ মদ আনতে হবে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তা এক পাত্র কেন? এতো মদ কে খাবে?'

'কেন, প্যাট আসবে যে!'

'প্যাট আসবে মানে?'

'ন্যাকা!' ব্যাঙ্গ করে বললো লেনতস, 'যেন কিছুই জানে না। ঠিক আছে, তোমাকে জানতেও হবে না। আমরা সব ঠিক করে ফেলেছি। সাতটার সময় ওকে নিয়ে আসবো।' আমাদের সুবাদেই ওর সঙ্গে তোমার আলাপ, একথা ভুলে যেও না যেন!'

শহর ছাড়িয়ে ছোট্ট একটা সরাইখানায় আমাদের এক বিশেষ সান্ধ্য আড্ডা বসেছিল। আকাশে বৃষ্টি-স্নাত চাঁদ লাল মশালের মতো দূরের ওই জঙ্গলের উপরে যেন ঝুলছে।' মৃদু কম্পন দেখা দিয়েছে। ওদিকে চেষ্টনাট গাছের ফুলে ফুলে ভরা ডালগুলো মৃদু ভূমিকম্পের মতো কাঁপছে! সন্ধ্যার স্বল্পালোকে কাঁচের পাত্রটাকে নীলে সাদায় মেশামেশি হয়ে একটা জ্বলজ্বলে ওপেল পাথরের মতো দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সুরা ভরা পাত্রটা চারবার নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ফার্ডিনান্ড-এর পাশে বসেছে প্যাট। ওর জামায় একটি গোলাপী রঙের অর্কিড আটকানো, ফার্ডিনান্ডের দেওয়া।

একটু পরেই সময় নিয়ে ফার্ডিনান্ড-এর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলো গটফ্রিড। ফার্ডিনান্ডের বক্তব্য হলো, ঘড়ি নামক শয়তান সময়ের অষ্টাটি চব্বিশঘণ্টা কেবল টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌ করেই চলেছে। কেউ একে থামাতে পারে না। ধ্বসে যাওয়া বরফের পাহাড়কে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সময়কে নয়।

লেনতস তার মতামত প্রকাশ করে বলে, সময়কে ঠেকাতে চায় না সে। সময় যে মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে বার্ধক্য এনে দেবে, তা তো ঠিকই, তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। বরং সেটাই তার কাম্য। পরিবর্তন না হলে চলবেই বা কেন?

গ্রাউ হেসে ফেলে বলে, 'তোমার আবার কাম্য কিসের শুনি? তুমি তো সময়ের স্রোতের উপরে একটি ভাসমান ফুল।'

একটু পরেই আমি আর প্যাট সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে পায়চারি করতে থাকলাম। চাঁদের হাট বসেছে যেন সেখানে—পথে গটফ্রিডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, একটা লাইলাক ঝোপের পাশে চেয়ার পেতে বসেছিল ও। 'বাঃ খাসা জায়গাটা বেছে

নিয়েছেন তো', বললো প্যাট, 'যেদিকে চোখ যায় শুধুই লাইলাকের ছড়াছড়ি।'

চেয়ার ছেড়ে গটফ্রিড বললো, 'সত্যিই জায়গাটা খুবই ভালো। তা একবার বসেই দেখ না।'

ওর অনুরোধ রাখলো প্যাট। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা ওর মুখখানি। রোমান্টিক লেনতস বললো, 'লাইলাক পাগল আমি। এ ফুল ফোটার সময় বিদেশে থাকলে আমার মন কেমন ছটফট করতে থাকে দেশে ফেরার জন্য। মনে আছে সেই চব্বিশ সালে রিয়ো-ডি-জেনেরো থেকে তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরে এসেছিলাম। তখন ফেরার সময় নয়, শুধু মনে পরে যায় তখন লাইলাক ফুটতে শুরু করেছে। অবশ্য দেশে ফিরে এসে দেখি তখন লাইলাক-এর মরশুম শেষ হয়ে গেছে।' নিজের মনেই হেসে বললো ও, 'তা সব সময়ে এরকমই হয়!'

ওদিকে ফার্ডিনান্ডের হাঁকডাকে আমরা তিনজনেই ফিরে চললাম। আমাদের দেখে বললো সে, 'ভেতরে চলে এসো। আমাদের মতো মানুষের আবার রাত্রিবেলায় প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? প্রকৃতিদেবী নিঃসঙ্গতা ভালোবাসেন, তাই তাকে একা থাকতে দাও। তাছাড়া আমরা হলাম গিয়ে শহুরে মানুষ, হৃদয় বলে আমাদের কোনো পদার্থ নেই।' গটফ্রিডের কাঁধে হাত রেখে বোঝায় সে, 'বুঝলে গটফ্রিড, আজকের আধুনিক সভ্যতা হলো একটা কুষ্ঠক্ষতের মতো, আর প্রকৃতিদেবীর প্রতিবাদের প্রতীক হচ্ছে এই রাত্রি। আমাদের উপরে প্রকৃতির একটা অভিশাপ আছে। একদিন ঠিক বুঝতে পারবে অরণ্য, জন্তু জানোয়ার কিংবা আকাশের নক্ষত্র তারার যে নীরব নির্বিকার জীবন তার থেকে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।' বলে হাসলো সে। হাসিটা কেমন অদ্ভূত যেন। দেখে বোঝার উপায় নেই, সুখের নাকি দুঃখের সেই হাসি। 'এসো, ভেতরে এসে অতীতের স্মৃতির উত্তাপে শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নেওয়া যাক। ভেবে দেখ, পঞ্চাশ ষাট হাজার বছর আগে আমাদের সেই কাদা মাটির মাছের জীবন কত সুন্দরই না ছিলো। আর আজ? সে তুলনায় কি অধঃপতনই না ঘটেছে—' প্যাট-এর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো সে, 'তা সত্বেও এইটুকু সৌন্দর্যস্পৃহা আছে বলেই আজও আমি বেঁচে আছি, নাহলে কবেই জাহান্নামে চলে যেতাম।' তারপর ধীরে ধীরে প্যাট-এর হাতখানি নিজের কাঁধের উপর রেখে সে আবার বললো, 'আমার কি মনে হয় জানো বৎসে, অতল গহ্বরের উপরে তুমি যেন একটি উল্কার রুপোলী রেখার মতো। এই অতীত যুগের বৃদ্ধটির সঙ্গে এক পাত্র সুরা পানে আপত্তি করবে না তো?'

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো প্যাট, 'অবশ্যই, আপনার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।'

ওরা দুজনে ভেতরে চলে গেলো। ওদের দুজনকে পাশাপাশি হেঁটে যেতে দেখে মনে হলো, প্যাট যেন ফার্ডিনান্ডের মেয়ে—সে যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের

একটি অতি বৃদ্ধ ক্লান্ত দৈত্য, আর তার পাশে পাশে চলেছে তারই রোগাটে চেহারার সুন্দরী যৌবনবতী কন্যা।

ফিরতে প্রায় এগারোটা হয়ে গেলো। ভ্যালেনটিন আর ফার্ডিনান্ড গেলো ট্যাক্সিতে। আমরা সবাই চেপে বসলাম কার্ল-এ। রাত্রির আবেশ বেশ একটা উষ্ণতায় ভরা। গাড়ি চালাচ্ছিল কোষ্টার গ্রামের পথ ধরে। দারুণ জোরে গাড়ি চালায় ও। আঁকাবাঁকা পথ, পথের মোড়গুলো কেমন অনায়াসে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে কোথাও হোঁচট খায় না ও। লেনতস অটোর পাশে বসে গান ধরেছে। প্যাট আর আমি বসেছি পিছনের সিট-এ। আমাদের নিচু গলায় কথাবার্তা ওরা কেউই শুনতে পাচ্ছিল না, লেনতসের গানের সুরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

গাড়ির গতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে—সেই সঙ্গে একটা তীব্র শীতল হাওয়া কাঁচ-বিহীন জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বাচ্চা মেয়ের মতো লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমার কোটটা গা থেকে খুলে প্যাট-এর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। মিষ্টি করে হাসলো ও আমার চোখে চোখ রেখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?'

মাথা নেড়ে অস্বীকার করলো ও। 'আর তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'না। এ একরকম ভালোই হলো, কি বলো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো!'

'কারোরই হারানোর কোনো সম্ভাবনা রইলো না?'

'কিসস্যু না', বললো ও হেসে, তবে কোটের তলায় হাত বাড়িয়ে ও আমার হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করে নিলো অতঃপর।

ওদিকে তখন শহরের বাড়িঘর, রাস্তা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। আর কার্লের গতিও মন্থর হয়েছে। হঠাৎ কবরখানার সামনে গাড়ি থামালো কোষ্টার। সেখান থেকে আমার আর প্যাট-এর দুজনেরই বাড়ি খুব কাছাকাছি। ও হয়তো ভেবে থাকবে, আমরা দুজনে একটু নিরালা হতে পারলে খুশি হবো। আমরাও সেই সুযোগটা পেয়ে চটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ওরা গাড়ি চালিয়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো সেখান থেকে, একবারের জন্যও আমাদের দিকে ফিরে তাকালো না ওরা কেউ। আমি কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আমার সব চেয়ে আপনজন, চিরদিনের সাথীরা চলে গেলো, আর আমি কিনা পথের মাঝে পড়ে রইলাম একা। পরক্ষণেই সেই চিন্তায় ইতি টেনে প্যাটকে বললাম, 'চলো, যাওয়া যাক।' ও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ও বোধহয় আমার মনের কথাটা আন্দাজ করতে পেরেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

প্যাট বললো, 'তুমি বরং ওদের সঙ্গেই যাও।'

'না', বললাম, 'ওদের সঙ্গে গেলেই কি তুমি খুশী হতে?'

'না না, তা কেন হবো ?' বললো বটে ও, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হলো, সত্যি কথাটাই বলেছে ও। ও ওর মনের সেই অভিব্যক্তিই প্রকাশ করলো কবরখানার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে, 'শোনো বব, আমি বরং আমার বাড়িতেই ফিরে যাই, কেমন ?'

'কেন বলো তো ?'

'আমার জন্যে তোমার বন্ধুদের ছাড়তে হয়, এ আমি চাই না। আগে তুমি তোমার বন্ধুদের অনেক বেশী সঙ্গ দিতে।'

আমরা তখন আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। 'হ্যাঁ, তা দিয়েছি বটে', বললাম, 'তবে তুমি তখন আমার জীবনে আসনি কিনা, তাই।' আলগোছে ওকে কোলে তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম অতি সন্তর্পণে। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ও বললো, 'তোমার সঙ্গীর দরকার।'

'আমার সঙ্গিনীরও দরকার', আমি বললাম, 'তাই তোমাকেও দরকার।'

'আমাকে ততখানি নয়, যতোখানি ওদের —'

দরজা খুলে ওকে কোল থেকে নামাতেই ও আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবার বললো, 'বব, আমি তোমার যোগ্য সঙ্গিনী নই।'

'ঠিক আছে পরে হিসেব করে দেখা যাবে। তাছাড়া তোমাকে একটা কথা বলে রাখি প্যাট, আমি কেবল তোমাকে আমার সঙ্গিনী হিসেবেই পেতে চাই না, প্রেমিকা হিসেবেও পেতে চাই।'

'কিন্তু আমি যে তাও নই', ধীরে ধীরে বললো ও।

'তাহলে কি তুমি ?'

'আমি কোনদিক থেকেই সম্পূর্ণ নই, আমি অসম্পূর্ণ এক নারী, আমি মানুষের এক টুকরো অংশ মাত্র।'

'ঠিক এই রকম মেয়েই তো আমি চাই', আমি ওকে বোঝালাম, 'ওই রকম মেয়েই তো মনকে দোলা দিতে পারে, ওই রকম মেয়েকেই তো পুরুষ সারাজীবন ধরে ভালোবাসে। সম্পূর্ণ মেয়েকে কোনো পুরুষই বেশীদিন সইতে পারে না, আর সর্বগুণ সম্পন্নাদের তো নৈব নৈব চ। জানো প্যাট, যে কোনো সুন্দরের ভগ্নাংশটুকুই চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকে, অন্তত পুরুষের কাছে।

ভোর চারটের সময় প্যাটকে ওর বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আমি ঘরে ফিরছিলাম। কবরখানার পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে কাফে ইণ্টারন্যাশনালের কাছাকাছি আসতেই ছোট একটা রেস্তোরাঁর দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো, পরনে অতি জীর্ণ পোশাক। প্রথমে তেমন নজর দিইনি, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চিনতে পেরে বলে উঠলাম, 'লিজা না ?'

পেরে বলে উঠলাম, 'লিজা না ?'

'এরই মধ্যে ফিরে এলে ?' বললো ও, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম, তুমি হয়তো এই পথ দিয়েই ফিরবে। আসবে নাকি আমার ঘরে ?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'না, আজ থাক। অন্য আর এক দিন না হয়—'

সঙ্গে সঙ্গে ও বললো, 'আজ তোমাকে টাকা দিতে হবে না।'

'না না', বোকার মতো বললাম, 'সেজন্য নয়, টাকা আমার সঙ্গে আছে।

'ও, তাই বুঝি!' তিক্তকণ্ঠে ও বললো, 'আচ্ছা, তাহলে তুমি যাও', এই বলে পিছন ফিরে চলতে শুরু করলো ও।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম, 'না না, লিজা—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।'

অনেক অনেক বছর আগে ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে প্রথম দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। তখন আমারও কি ছন্নছাড়া অবস্থা, নিঃসঙ্গ জীবন তখন আমার। সংসারে আপনজন বলতে কেউ তখন ছিলো না আমার, ছিলো না এতটুকু আশার ইঙ্গিত পর্যন্ত। প্রথমে ও ধরা দিতে চায়নি। এসব মেয়েরা যেমন করে থাকে, শুরুতে ও আমাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছে? কিন্তু বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ আলোচনা হওয়ার ওর ও তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে। ওর সব সুখ দুঃখের অংশীদার করে নিয়েছিল আমাকে। আমরা দুজন তখন এ ওকে কাছে পাওয়ার জন্য কতো না উদগ্রীব। আমাদের দুজনেরই তখন একই অবস্থা—সংসারে একা, থাকার মধ্যে কিছুই নেই। তাই এ ওকে সঙ্গ দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, একে অন্যের যেটুকু অভাব পূর্ণ করতাম তা ছিলো অপরিসীম। তবে কতকাল যে ওর সঙ্গে দেখা নেই, খেয়াল করতে পারছি না। বিশেষ করে প্যাট-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে একদিনও নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমার এখন দিন কাটছে কিভাবে লিজা ?'

'আমার ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' কথা বলতে গিয়ে ওর ঠোঁট কাঁপছিল। অনাহারের ছাপ স্পষ্ট ওর চোখে মুখে। কেমন যেন মায়া হলো ওকে খুব কাছ থেকে দেখতে। অনেক দিন পরে ওকে আবার কাছে পেতে ইচ্ছে হলো আমার। তাই বললাম, 'চলো, তোমার সঙ্গে শেষ রাতটা কাটাবো।'

আমি ওর ঘরে যাবো শুনে মুহূর্তে ওর সেই শীর্ণ করুণ মুখখানি খুশিতে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাচ্চা মেয়ের মতো কলকলিয়ে উঠলো, 'সত্যি, সত্যি তুমি যাবে আমার ঘরে ?'

'হ্যাঁ, বললাম তো!' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, 'তবে তার আগে ওই ট্যাক্সিওয়ালাদের রেস্তোরা থেকে কিছু খাবার কিনে নেওয়া যাক।' ও কিছুতেই খাবার কিনতে দেবে না। শেষে বুদ্ধি করে বললাম, 'আমার যে ভীষণ খিদে

পেয়েছে—' তখন ও রাজী হলো। তখন ও নিজেই বেছে বেছে ভালো খাবার কিনে নিলো।

একটা বাড়ির চিলেকোঠায় ওর ঘর। বেশ সাজানো গোছানো। টেবিলের উপরে একটি ল্যাম্প, বিছানার পাশে মোমবাতি। একটা ছোট আলমারিতে কয়েকখানা গোয়েন্দা উপন্যাস রাখা ছিলো। যেসব পুরুষ, বিশেষ করে যারা বিবাহিত, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আলমারির পাশে কতকগুলো অশ্লীল নগ্ন নারীর ফটোগ্রাফ টাঙ্গানো ছিলো। ত্রস্ত হাতে সেই ফটোগুলো অন্যত্র সরিয়ে রাখলো লিজা। তারপর অতি জীর্ণ একটা টেবিলক্লথ টেবিলের উপরে বিছিয়ে খাবারগুলো সাজিয়ে রাখলো ও তার উপরে।

বইরের পোশাক পাল্টানোর জন্য দেরাজ থেকে একটা কিমানো বার করে পরলো ও, পায়ে এক জোড়া জরির কাজ করা চটি। সুসময়ে কেনা, এখন ওর মতোই জীর্ণ দশা। আমাকে খুশী করার জন্যে ওর এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় বেচারীর মুখে একটা লজ্জিত কুণ্ঠিত হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। হঠাৎ সেই বদ্ধ ঘরে বসে থাকতে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অতি আপনজন কেউ মারা গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, এও ঠিক তেমনি যেন।

যাইহোক ওর সঙ্গে বসে খেতে হলো, টুকরো টুকরো দু'চারটে কথাবার্তাও হলো। তা সত্ত্বেও ও ঠিক বুঝে গেছে যে, আগের দিন আর নেই, সেই মনটা আর আমার নেই। তাই ওর চোখে ভয়ের ছায়া পড়ে। অথচ কোনোদিনই ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়নি, দৈবের চক্রান্তে যেটুকু সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেইটুকুই। তবে একথাও আবার ঠিক যে, দৈবের দাবী অনেক সময়ে ঘনিষ্টতার দাবীর চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এক সময়ে আমি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ভয়ে ভয়ে ও জিজ্ঞেস করে উঠলো, 'এখনি চললে নাকি তুমি ?' বললাম, 'হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা করাটা খুবই জরুরী। দেখা না করলেই নয়। এ্যাস্টিরিয়াতে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে ও।'

বেচারী ফ্যাকাশে মুখ করে ম্লান গলায় বললো, 'তুমি ঠিক অন্য কোনো মেয়ের কাছে যাচ্ছো।'

'কিন্তু লিজা ভেবে দেখো', অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে আঘাত দিতে হলো, 'তোমার আর আমার মধ্যে কিই বা সম্পর্ক বলো ? এই তো বছরখানেকেরও বেশী আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ছিলো না।'

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলো ও বোধহয়। তারপর মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার ভঙ্গিমায় ও বললো, 'হ্যাঁ, তুমি তো ঠিকই বলেছো। আমিই বোকা, বুঝতে পারিনি আমাদের সম্পর্ক কবেই না চুকে বুকে গেছে। মিছিমিছি কেন যে আবার পুরনো দিনের জের টানতে গেলাম—'

আমার সামনে দাঁড়িয়ে লিজা। ওর ক্লান্ত, শীর্ণ চেহারায় একটা কেমন অসহায় ভাব; করুণ মিনতিতে ভরা মুখখানি। জড়ি দেওয়া ওরই মতো জীর্ণ চটিজোড়া, বহু পুরাতন কিমানোটি, কতো দীর্ঘ ক্লান্ত নিশিযাপন—এক এক করে অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে যাচ্ছে আজ। একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ার আগে বললাম, 'আচ্ছা আজ তাহলে আসি লিজা। আবার দেখা হবে—'

'আর একটু বসবে না? এরই মধ্যে চলে যাচ্ছো? কিছুই তো হলো না—'

কিছুই তো হলো না…ও কি বলতে চায়, না বোঝার বয়স আমার নয়। কিন্তু এও আমি বুঝি যে, সে আর হয় না। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি এখন একেবারে সাধুপুরুষ বনে গেছি। তবে ওসব করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। ও ঠিকই বলেছে, আমি নিজেও আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম, সত্যি আমি কতোই না বদলে গেছি, কতো না দূরে সরে গেছি, হয়তো নিজের কাছ থেকেও।

'তাহলে সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছো?' বলে এক ছুটে ও ঘরের ভেতরে ঢুকে পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে এসে বললো, 'আমার অনুমানই ঠিক, খবরের কাগজের তলায় আমার অসাক্ষাতে কিছু টাকা তুমি লুকিয়ে রেখে যাচ্ছিলে আমার জন্যে। এ টাকা আমি চাই না। টাকাটা ফেরত নিয়ে চলে যাও। আমি জানি, আমার ঘরে তোমার এই শেষ আসা, তুমি আর কখনো আসবে না।'

'কেন আসবো না? এ তুমি কি বলছো লিজা?'

'আমি ঠিকই বলছি, তুমি আর আসবে না। আর না আসাই ভালো। যাও, তুমি যাও—'

বেশ বুঝতে পারলাম ও কাঁদছে, সব হারানোর বেদনায় ওর বুকটা এখন হাহাকার করছে। কিন্তু আমি কি করতে পারি তার জন্য। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলাম। পিছন ফিরে তাকাতেও পারলাম না, পাছে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলি, সেই ভয়ে।

কতক্ষণ যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম ঠিক খেয়াল নেই। চোখে ঘুম নেই আজ আর। লিজার কথা মনে পড়লো, ওকে কেন্দ্র করে অতীতের সব স্মৃতি মনে পড়লো এক এক করে—সে সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার আজকের জীবনের সঙ্গে সেই সব স্মৃতির কোন সম্পর্কই আজ আর নেই। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে প্যাটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। ওর বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে আলো চুইয়ে পড়ছিল না। সারা বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে। বাইরে তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, ধূসর আকাশে আলোর আভাষ দেখা দিয়েছে। এবার আমার বাড়ির দিকে ফেরার পালা। কেন জানি না, মনটা আমার এখন বেশ খুশি খুশিই লাগছে। বিধাতা পুরুষকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

□ আট □

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি আমার বিরোধিতা করে বললো, 'যাই বলো না কেন, প্যাটের মতো অমন মেয়ে তোমাকে মানায় না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমি তো ভেবেই পাই না, 'ফ্রাউ তার নিজের কথা সমর্থন করে বললো, ভাবতে অবাক লাগে কাফে আর রেস্তোরাঁ ঘেঁটে অমন রত্নটি কি করে জোটালে তুমি। অবশ্য তোমার মতো যতো সব হাভাতেরাই—'

'আচ্ছা, এটা তোমার অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে না?'

আমার প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই কোমরে হাত রেখে ঝগড়াটে মহিলার মতো বললো ফ্রাউ, 'অমন মেয়ে কাদের মানায় জানো? যাদের অঢেল টাকা আছে, যাদের অন্ন সংস্থানের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, তাদের। সোজা কথায় বলি বিত্তবান পুরুষ না হলে অমন মেয়ে মানায় না।

ওর কথাগুলো মোটেই ভালো লাগার কথা নয় আমার। তাই বিরক্ত হয়েই বললাম, 'তা সব মেয়ের ক্ষেত্রেই কি তোমার এই কথাগুলো খাটে?'

'বেশ তো, আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো', পাকা চুল মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধা বললো, 'দুদিন সবুর করো, তারপরেই দুনিয়ার সব হালচাল বুঝতে পারবে। সবুরে মেওয়া ফলে—'

'সে তো ভবিষ্যতের কথা, আজকাল ভবিষ্যত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আর সবুরে মেওয়া ফলার কথা বলছিলে? তার মানে বুঝতে হয় আগের সবটাই মন্দ। অতএব শেষটা তো মন্দ হওয়ারই কথা।'

মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো ফ্রাউ, 'চুপ করো, ইহুদীদের মতো অমন চুলচেরা বিচার তোমাকে করতে হবে না।' এই বলে এক পা এগিয়ে আমার দরজার ছিটকিনি খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, 'অ্যাঁ, ওই ডিনার স্যুটটা তোমার নাকি?'

ওটা অটো কোস্টারের—আলনায় ঝুলছে। প্যাটের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবো বলে ওই স্যুটটা তার কাছ থেকে ধার করে এনেছিলাম। সত্যি কথা না বলে ওকে চটাবার জন্যে মিথ্যে করেই বললাম, 'হ্যাঁ, তোমার অনুমানই ঠিক, ওটা আমারই।'

হঠাৎ নতুন কিছু আবিষ্কারের দরুণ মেয়েদের কৌতূহল হলে যেমন চেহারা হয়, ওর মুখের ভাবও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে

একবার পিছন ফিরে বললো ও, 'তাই তো বলি, তলে তলে এতো দূর এগিয়ে গেছো তুমি ?'

বেশ খানিকটা দূরে চলে যাওয়ার পরে ফ্রাউ-এর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ ডাইনিবুড়ি, আমি অনেক দূরেই এগিয়েছি বটে। আমার অগ্রগতির আরো অনেক কিছুই দেখতে পাবে তুমি।' অবশ্য ও তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, শুনতে পেলো না আমার কথাগুলো। এরপর সদ্য কেনা পেটেণ্ট চামড়ার জুতো জোড়ার বাক্সটা মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে নিজের মনে বললাম, 'বিত্তবান পুরুষ না হলে মানায় না, এ আর এমন নতুন কথা কি শোনালেন উনি। ন্যাকা। আমি যেন জানি না।'

প্যাটকে আনতে গিয়ে আমি তো অবাক। আগে থেকেই সেজেগুজে বসেছিল ও আমার অপেক্ষায়। শুধু তাই নয়, এই প্রথম আমি ওকে সান্ধ্য পোষাকে দেখলাম। চমৎকার রুপোলী কাজ করা ফ্রকে দারুণ মানিয়েছিল ওকে। নতুন অভিনব পোশাকে রুপোলী অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছিল ওকে। আজ ও যেন অন্য প্যাট, ও যেন এক অপার্থিব মূর্তি। এই মুহূর্তে মনে হলো ফ্রাউ জালেওয়াস্কির প্রেতমূর্তি যেন পিছন থেকে অঙ্গুলি হেলনে আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

'আমি যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না প্যাট', আমি বললাম, 'নতুন পোশাকে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছো তুমি। অবাক হওয়ার মতো।'

'তা অবাক হওয়ার কি আছে। রূপের রূপান্তর ঘটানোর জন্যই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করা পোশাক।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমি যে তোমার কাছে একেবারে বেমানান। বিত্তবান পুরুষ হলে তোমার পাশে মানাতো ভালো।

হাসলো প্যাট। 'কিন্তু বিত্তবানরা যে বড় ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জীব। তবে আমি এও বলবো, টাকা জিনিষটা খারাপ নয়, কি বলো ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। টাকায় সুখ না আসুক, তবে স্বস্তি আছে, আরাম আছে।'

থিয়েটার হলের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। আজই নতুন একটা নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। বুকিং কাউণ্টারে গিয়ে আমি টিকিট দুটি বদল করে বক্স সিটের টিকিট নিলাম। অবশ্য দাম অনেক বেশী পড়লো। ওই সব বাজে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে প্যাটকে নিয়ে বসতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। ওকে একটু নিরালায় কাছে পেতে চাই আমি।

হলের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই আলোগুলো নিভে গেলো। শুধু জ্বলে রইলো ফুটলাইটগুলো, তাতে সামান্যই আলো। তারপরেই বাজনা শুরু হয়ে গেলো,

তারই তালে তালে সমস্ত থিয়েটার হলটা যেন দুলছে। স্টেজের মৃদু আলোয় প্যাট এর সুন্দর মুখখানি এক অদ্ভুত রহস্যাবৃত দেখাচ্ছিল। ও যেন সুরের লহরীতে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। ও আমার কাছ ঘেঁষে বসেনি, কিংবা আমার হাতে হাত রাখেনি—তবে ওর এই ভাবটা আমার খুবই ভালো লাগলো। শুধু তাই নয়, চোখ তুলে একবারের জন্যও আমার দিকে তাকায়নি। মনে হয় আমি যে ওর পাশেই বসে আছি, সে কথাটা একেবারে বেমালুম ভুলে গেছে ও। চোখের সামনেই তো সুন্দরের প্রকাশ, তারই মাঝে কেউ যদি অতি তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায়, আমার ভীষন রাগ হয় তখন। প্রেমিকাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি, একটু ছোঁয়ার স্পর্শসুখ নেওয়া এরকম হ্যাংলামি দেখলে পুরুষদের উপরে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। জানোয়ারের মতো সামান্য একট ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া অন্য ভালো কিছু এরা যেন ভাবতেই পারে না। প্রেম মানেই নারী পুরুষে মিলন, দু'য়ে মিলে একাকার হয়ে যাওয়া, এসব জৈবিক তত্ত্বকথা আমি শুনতেই পারি না। আমার তো মনে হয়, সব সময়েই মনের দিক থেকে এক হয়েই আছি। তাই এক এক সময়ে একটু দূরে সরে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করি। মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ না ঘটলে প্রেমের রোমান্সই ঠিক বোঝা যায় না। একা থাকা যাদের অভ্যাস তারাই পারে সত্যিকারের মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে। নতুবা মিলনের যোগসূত্রটাই ছিঁড়ে যায়।

এক সময় দপ করে আবার আলো জ্বলে উঠলো। বিরতি। এতক্ষণে প্যাট ফিরে তাকালো। 'বাইরে যাবে?' প্যাটকে জিজ্ঞেস করলাম। ও মাথা নেড়ে জানালো, যাবে না। তাই একলাই আমি হল থেকে বেরিয়ে এলাম প্যাটের জন্য এক গ্লাস লেবুর রস আনবার জন্য। দোকানে প্রচণ্ড ভিড়, নিমেষে খাবার ফুরিয়ে যাচ্ছে। কোনো রকমে ভিড় ঠেলে লেবুর রসের একটা গ্লাস হাতে নিয়ে বক্সে ফিরে এসে দেখি প্যাটের চেয়ারের পিছনে এক অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর প্যাট পিছন ফিরে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দেয় 'রবার্ট', ইনি হলেন হের ব্রুয়ার।'

বিরক্তির সঙ্গেই তার দিকে তাকালাম। প্যাট আমাকে রব্বি না বলে রবার্ট বলে সম্বোধন করলো, লক্ষ্য করলাম ওর এই পরিবর্তনটা। চমৎকার হাল ফ্যাশনের ডিনার স্যুট পরণে লোকটার। থিয়েটারের অভিনয় আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকটা কথা বলে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, থামবার নাম নেই, আর ফিরে যাবার নামটিও করছে না! ওদিকে তাদের আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য আমার দিকে ফিরে প্যাট বলে উঠলো, 'হের ব্রুয়ার বলছিল, থিয়েটারের শো ভাঙ্গার পরে কাসকেডে যেতে তুমি রাজী আছো কিনা।'

'আমার আবার কিসের আপত্তি?' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই উত্তর দিলাম, 'তোমার

যেমন ইচ্ছে—'

'আমার বিশ্বাস, আপনি সেখানে গেলে আনন্দ পাবেন', বললো ব্রুয়ার, 'একটু নাচ টাচও হতে পারে সেখানে।'

তা মন্দ হবে না, মনে মনে ভাবলাম, লোকটা যথেষ্ট ভদ্র। প্রথম আলাপে ভালোই লাগলো তাকে। কেবল তার ওই কেতাদুরস্ত ভঙ্গিমা আর আলাপিত হওয়ার সহজ ক্ষমতা দেখে একটু যা অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমার ভয়, প্যাট-এর উপরে এ সবের প্রভাব না পরে যায়। তার উপরে আমার আবার এসব গুণ নেই বলেই আরো ভয়, আরো আশঙ্কা। হঠাৎ প্যাটকে আদর করে ওর নামটা সম্বোধন করে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে দেখে আমার তখন রাগ বেড়ে গেলো। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনি ওর ঘাড় ধরে ওই অর্কেস্ট্রার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। বিরতির পরে বেল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুয়ার ঘুরে দাঁড়ালো চলে যাওয়ার জন্য। যাওয়ার আগে বলে গেলো, 'তাহলে ওই কথা রইলো। বাইরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো, কেমন?'

ও চলে যেতে প্যাটকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা এই মূর্তিমানটি কে?'

'ও কথা বলছো কেন? খুব ভালোমানুষ ও, আমার বহু পুরনো বন্ধু।'

'তুমি যাই বলো, ওসব বহুদিনের পুরনো বন্ধু বান্ধবদের আমার ঠিক পছন্দ হয় না।'

'কিন্তু আমার কথা তো তুমি শুনবে—' প্যাট আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর কথায় কান দেওয়ার মতো অবস্থা তখন আমার নয়। আমার তখন চিন্তা ক্যাসকেড-এ যাওয়া নিয়ে। মনে মনে সেখানকার খরচের হিসেব করছি। আরে, ওখানে যাওয়া আমার মতো গরীব লোকের পোষায়। ওখানে যাওয়া তো নয়, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ!

কিছু বিরক্তি আর কৌতূহল নিয়ে প্যাটকে অনুসরণ করলাম। এই ব্রুয়ার লোকটাকে দেখার পর থেকে ফ্রাউ জালেওরাস্কির সেই অশুভ ভবিষ্যৎবাণীর কথা আমার বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি একটা ট্যাক্সি ডাকতে যেতেই ব্রুয়ার বলে উঠলো, 'আমার গাড়িতে যথেষ্ট জায়গা আছে, অসুবিধে হবে না।'

'বেশ তো।' মুখে বললেও মনে মনে বিরক্ত হলাম। প্যাট দেখলাম ব্রুয়ারের প্যাকার্ড গাড়িটা দেখেই চিনে ফেললো। গাড়িটার সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়ির রঙ বদলেছো?'

'হ্যাঁ, কেমন লাগছে এই নতুন ধূসর রঙটা? ভালো না?'

'খুব ভালো।'

'কয়েক মাস পরেই ভাবছি নতুন একটা গাড়ি কিনবো', এবার আমাকে উদ্দেশ্য

করে বললো ব্রুয়ার। বড়লোকি চাল দেখাচ্ছে। অহমিকার চূড়ান্ত।

কাসকেড। ফ্যাশানপ্রিয়দের নাচের আড্ডা। ব্যাণ্ড বাজছে। প্রচণ্ড ভিড়। মনে মনে খুশি হলাম, উচ্ছ্বাস চাপতে পারলাম না, বলেই ফেললাম, 'কোথাও জায়গা নেই দেখছি।'

প্যাট হতাশ গলায় বললো, 'তাহলে কি হবে?'

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে ব্রুয়ার বললো, 'নিরাশ হচ্ছো কেন, দেখো না আমি কেমন সব ব্যবস্থা করে নিই। বলেই ম্যানেজারের কাছে ছুটে গেলো সে। লোকটার এখানে দারুণ প্রতিপত্তি আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভাবতে না ভাবতেই আমাদের জন্য একটা টেবিল ও কতকগুলো চেয়ার এসে গেলো এমন একটা জায়গায় যে, সেখান থেকে নাচের জায়গাটা বেশ পরিস্কার দেখা যায়। টাঙ্গো বাজনা বেজে চলছিল তখন। সেই বাজনার সুরে মুগ্ধ প্যাট বলেই ফেললো, 'আঃ কতদিন যে নাচিনি।'

'বেশ তো', চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রুয়ার ওকে তাল দিয়ে বললো, 'তাহলে হয়ে যাক না! এসো—'

প্রস্তাবটা পেয়ে প্যাট তো মহা খুশি। আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, 'আমি বরং ততক্ষণে ড্রিংক করি।' ওরা চলে গেলো নাচের আসরে। নাচের ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছিল প্যাট মিষ্টি হাসি দিয়ে। ওর সেই হাসির প্রত্যুত্তর দিচ্ছি আমিও পাল্টা মৃদু হেসে। তবে মনে মনে যে খুশি হচ্ছি তা নয়। ওকে এখন অপূর্ব দেখাচ্ছে, আর নাচছেও চমৎকার। কিন্তু দুঃখ আমার কাছে এই জন্যে যে, ব্রুয়ার লোকটিও ওর সঙ্গে তালে তাল দিয়ে খুবই ভালো নাচছে। স্বীকার করতেই হয় যে, চমৎকার মানিয়েছে ওদের দুজনের জুটি। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এর আগে বহুবার ওরা দুজনে একসঙ্গে নেচেছে। দুঃখ ভুলতে আমি এবার বড় এক গ্লাস রামের অর্ডার দিলাম।

অনেকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো দুজনে। তবে ব্রুয়ার চলে গেল আবার তার পরিচিত লোকেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য। প্যাটকে একলা কাছে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা এই ছেলেটির সঙ্গে কতদিনের আলাপ তোমার?'

'বহুদিনের। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন বলো তো?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি। এখানে কি ওর সঙ্গে প্রায়ই আসতে?'

কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে ও বললো, 'দেখো রবি, অনেকদিন আগেকার কথা। আজ আর অতো সব মনে নেই আমার।'

আর আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, 'কিন্তু এসব কথা তো ভোলবার নয়।' ও কিছু বললো না, শুধু হাসলো। সেই হাসি দিয়ে ও বোঝাতে চাইলো, পুরনো

দিনের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছে ও। কিন্তু আমার মনে যে কাঁটাটা বিঁধে গেছে একটু আগে, সেটা যে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। বললাম ওকে, 'ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সব খুলে বলতে পারো। তাতে কিছু এসে যাবে না আমার।'

আর একবার ও আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'তা যদি যেতো আসতো, তাহলে আমি কি তোমাকে এখানে নিয়ে আসতাম ?'

'না, তা তো নয়ই।'

নতুন করে আবার বাজনা শুরু হলো। ব্রুয়ার ফিরে এসে বললো, 'এই বাজনার সুরে চমৎকার নাচা যায়। আসুন না, নাচা যাক ?'

'না না, আমার নাচ আসে না', বললাম আমি।

প্যাট অনুরোধ করলো, 'একবার চেষ্টা করেই দেখো না রবিব।'

'বললাম তো, আমার দ্বারা ও সব নাচ টাচ সম্ভব নয়। কখনো নাচতে শিখিনি, শেখবার সময় সুযোগও পাইনি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি এখানে বেশ আছি।'

'কিন্তু সত্যিই কি তুমি এখানে ভালো আছো রবিব ?' প্যাট জিজ্ঞেস করলো, 'ভালো কি লাগছে তোমার ?'

'এ তুমি কি বলছো প্যাট ?' হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে বললাম, 'এটাও তো এক ধরণের নাচ, নয় কি ?'

কথা আর না বাড়িয়ে ওরা চলে গেলো। গ্লাসটা নিঃশেষ করে ওদের নাচের দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে হলো, ফ্রাউ জালেওয়াস্কির প্রেতাত্মা বুঝি আমার পাশে বসে আছে।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের নাচ শেষে কতকগুলো নতুন লোকদের এনে আমাদের টেবিলে হাজির করলো ব্রুয়ার। দুজন মহিলা, রীতিমতো সুন্দরী দেখতে, আর একটি ছোকরা, মাথায় তার একটা প্রকাণ্ড টাক। একটু পরেই আর একজন। চারজনের মুখেই কথায় খই ফুটছে, সবজান্তার ভাবভঙ্গি। এদের সবার সঙ্গেই পরিচিত প্যাট। এরা সবাই কেমন সহজ ভাবে এ ওর সঙ্গে মিশছে, চলছে—ফিরছে। আর প্যাটও কেমন সহজে এদের সঙ্গে মিশে গেছে, যেন এমনটি ওর অনেক দিনের অভ্যাস। অথচ আমি ওদের অমন হাসি খুশিতে ভরা পরিবেশে কাঠ পুতুলের মতো বসে আছি, যাকে বলে একেবারেই বেমানান। আর তাতেই আমার যতো সব অস্বস্তিবোধ। আমাকে একেবারে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, কিছুতেই নিজের সঙ্গে ওদের তুলনা না করে থাকতে পারছি না। ওদের কাছে আমি অপদার্থ, ব্যর্থ—

একটু পরে ব্রুয়ার ফিরে এসে বললো, 'চলো, এবার অন্য কোথাও যাওয়া যাক।'

নতুন জায়গায় এসেই আমি মদের ফরমাস দিলাম। আজ আমাকে একটু বেশী পরিমান মদ গিলতে হবে, আমার মনের গোপন বেদনা ভোলবার জন্য। টে'কো মাথা ছোকরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। জিজ্ঞেস করলো সে, 'কি খাচ্ছেন?'

বললাম, 'রাম।' ছোকরা এক চুমুক চেখে দেখতে গিয়ে বিষম খেয়ে তার দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হলো। এর ফলে আমার প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। বলেই ফেললো সে, 'উঃ! রীতিমতো অভ্যাস না থাকলে এ মদ সহজে গলাধঃকরণ করা যায় না।' ওদিকে সেই মহিলা দুটিও আমার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। আর প্যাট ও রুয়ার নেচেই চলেছে। মাঝে মাঝে প্যাট আমার দিকে ফিরে তাকালেও আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। সেটা যে অন্যায় হচ্ছে বুঝি, তবু কেন যে হঠাৎ আমার এই পরিবর্তন, কারণটা বুঝেই আমি আমার মনকে প্রবোধ দিই। প্যাটকে এখন একেবারে অন্য জাতের মানুষ বলে মনে হচ্ছে যেন। আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে চায় ও। ওর দলের লোকদের সঙ্গে ও যদি জাহান্নামে যেতে চায় তো যাক। মনকে বোঝাই, হাজার হোক, ও তো এদেরই দলের একজন। হ্যাঁ, এদেরই তো।

টেকোমাথা ছোকরাটি আমার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। ওর মন রাখতে এক দফা ভদকা খাওয়া হলো। সঙ্গী হিসেবে এরা বেশ ভালো, এদের সঙ্গে যেখানে সেখানে বেশ খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। আমার সঙ্গে তার আঠার মতো লেগে থাকার অর্থ বুঝলাম একটু পরেই, ও যখন ওর দুঃখের কাহিনী শোনালো আমাকে। ফিফি নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল ও এক সময়ে—কিন্তু মেয়েটি নাকি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। একবার কথায় কথায় ও জানালো, রুয়ার নাকি এক সময় প্যাট-এর প্রেমিক ছিলো, আর বেশ কয়েক বছর ধরে সেই প্রেমিক প্রেমিকার জুটি অটুট ছিলো। আমি তখন ওর মুখ বন্ধ করার জন্য একটি অয়স্টার খেতে দিলাম ওকে। কিন্তু ওর সেই কথাটা আমার মাথায় বিঁধে রইলো। নিজের উপরে ভীষণ রাগ হলো এই কারণে যে, এখানে আমি কেন আসতে গেলাম, এখানে এলাম বলেই তো রুয়ার প্যাটের প্রেম কাহিনী আমাকে শুনতে হলো। অয়স্টার খাওয়ানোর পরে টেকো মাথার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটু পরেই ও চলে গেলো।

যে দুজন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদেরই একজন আমার গা ঘেঁষে এসে বসেছে। সে তার নীল চোখের তির্যক দৃষ্টি দিয়ে একবার আমার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে নিলো। তার সেই চোখের চাহনি এতোই স্পষ্ট যে মুখে কিছু বলে দিতে হয় না। একটু পরেই বললো সে, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, সেই থেকে এক নাগাড়ে আপনি কি করে এতো মদ খেয়ে যাচ্ছেন?' উত্তর দিলাম না আমি। সে তখন তার রুক্ষ, পেশীবহুল দামী গহনা পড়া হাতটা আমার দিকে

ধীরে ধীরে প্রসারিত করতে থাকলো। ও এখন কি চায় আমি বেশ বুঝতে পারছি। মনে মনে বললাম, দাঁড়াও তোমার গরম কাটাবার ব্যবস্থা করছি। তুমি আমাকে চেনো না। আমার মনটা ভারাক্রান্ত বলে তুমি আমাকে ভুল করছো বন্ধু। মেয়ে মানুষে আমার একটুও রুচি নেই। ওসব অনেক হয়েছে, এখন আর নয়। কেবল ভালোবাসার প্রতি একটু যা লোভ ছিলো, সেটার অভিজ্ঞতা ছিলো না বলে। তার মোহও কেটে গেছে এখানে এসে। তাই সেই দুর্লভ বস্তুটি পাওয়ার অসম্ভব আশাতেই মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছি।

এবার মেয়েটি মুখর হলো, ভাঙ্গা কাঁচের মতো ঝনঝন শব্দ তার কণ্ঠস্বরে। আমি অবশ্য তাকে দেখেও দেখছি না, তার কথা কানে নিয়েও নিচ্ছি না। আমার কেবল মনে হচ্ছে, আমি যেন অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার এই ভাবান্তরের জন্য ব্লুয়ার কিংবা তার দলটি, এমন কি প্যাটও দায়ী নয়। আসল কারণ হলো, বাস্তবজীবন শুধুই মানুষের মনে কামনা বাসনার উদ্রেক করে, কিন্তু সত্যিকারের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। মানুষের মনে প্রেমের উদয় হয় বটে, কিন্তু তাতেও তার সেই তৃষ্ণা মেটে না। সত্যি, মানুষের জীবন বড়ই অভিশাপের। সংসারের সব কিছুই যদি তার হাতে তুলে দেওয়া যায়—যেমন সুখ, ভালোবাসা, জীবন, তবু তা সত্ত্বেও মনে হয় জীবনের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সার বস্তুটা যেন ক্রমেই ছোট হয়ে আসে।

এক নজরে একবার প্যাটকে দেখে নিয়েছি। কি অদ্ভূত রুপোলী পোশাকে ও নাচছে, এক লাবণ্যময়ী মূর্তির প্রতীক ও যেন, প্রদীপ্ত জীবনশিখা যেন, ওর আপন যৌবনবেগে চঞ্চল। আমি ওকে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। যদি একবার ওকে বলি, আমার কাছে এসো, না এসে থাকতে পারবে না ও। তবু কোথায় যেন একটা ব্যাথার খোঁচায় মনটা টান টান হয়ে ওঠে, ওর জীবনের শিকড় যেখানে একবার গেড়ে গেছে, সেখান থেকে ওকে উপড়ে ফেলতে পারি না আর। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় হওয়ার আগে, ওকে জানবার আগে এই যে সব মানুষেয় সঙ্গে ও দিন কাটিয়েছে, এই যে ওর একটা অভ্যাস জন্মে গেছে বিলাসবহুল জীবন কাটানোর, এ সবের মধ্যে থেকে ওকে আমি কি করে বার করে আনবো।

আমার পাশের সেই মেয়েটি তখন তার সেই ঝনঝনে গলায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। তার বক্তব্য হলো : আজ রাতের জন্য একটি সঙ্গী চায় সে। আমি আর এই মেয়েটি একই জিনিষের প্রত্যাশী—সঙ্গী খুঁজছি। আমার সঙ্গে তার তফাৎ হলো আমার মধ্যে জৈবিক তাড়না নেই, আছে শুধু মনের তাগিদ। মন দিয়ে একটি মেয়ের মন পেতে চাই আমি, সে শুধু একা আমার হবে, অন্য কোনো পুরুষের নয়, আর সেটা হবে চিরদিনের জন্য। আর এই মেয়েটির একজন পুরুষকে প্রয়োজন শুধু একটি রাতের জন্য—দেহের ক্ষুধা মিটে গেলেই, রাত ভোর হলেই সে তাকে

পুরনো পোষাকের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই আমি তো এই রকম মেয়েদের দলে নই। তাই ওকে বললাম, 'চলো, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, আর আমিও আমার ঘরে ফিরে যাই। তোমার আমার চাওয়ার সেই দুর্লভ বস্তুটি কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না।' মুহূর্ত কয়েক আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে এক সময় হো হো করে হেসে উঠলো ও।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা আরো কয়েকটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। সবাই বেশ খুশিতে মশগুল, কেবল প্যাট তাদের ব্যাতিক্রম। একবারে নীরব। তবে মাঝে মাঝে নাচের ফাঁকে আমার দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছে। ওর নাচার ভঙ্গিমাটা আগের মতোই স্বচ্ছ, সুন্দর। এক সময় প্যাট আমার সান্নিধ্যে এসে একান্ত অনুরোধের সুরে বললো, 'তোমায় আবার বলছি, তোমার সঙ্গে নাচতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, এসো না নাচি দুজনে।'

'না, তা আর হয় না।' একটু আগে পর্যন্ত ও যে অন্য এক পুরুষের বাহুলগ্ন অবস্থায় ছিলো, সে কথা ভেবেই কথাটা বললাম বরে, তবে নিজের কাছেই নিজেকে কেমন যেন খেলো মনে হলো, নিজের অভাববোধটা প্রকাশ না করলেই বোধহয় ভালো ছিলো। জানি না আমার অমন রূঢ় ব্যবহারে ও আঘাত পেলো কিনা।

এবার ফেরার পালা। ব্রুয়ার ভদ্রতা দেখিয়ে আমাকে বললো, 'চলুন আমার গাড়িতে করে আপনাকে পেঁাছে দিই।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' বললাম।

গাড়িতে রাখা একটা কম্বল হাতে তুলে নিয়ে ব্রুয়ার নিজের হাতে প্যাটের হাঁটুর উপরে ঢেকে দিলো। হঠাৎ প্যাটকে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, মুখ ফ্যাকাশে। গাড়িতে ওঠার সময় বারমেড এসে একটা চিরকুট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলো। ওটা যেন কিছুই নয়, এমনি একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করলো। জানালা পথে আমি দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছি বাইরে। এক কোণে আড়ষ্ট ভাবে বসে আছে প্যাট, অনড় ভাবে। এমন কি নিঃশ্বাস ফেলতেও বুঝি ভুলে গেছে ও। প্যাটের বাড়িতেই প্রথমে যাত্রা বিরতি ঘটালো ব্রুয়ার। প্যাটকে ওর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলো না। এর থেকেই বোঝা যায় যে, আগেও ওর বাড়িতে এক সময়ে যাতায়াত ছিলো তার। প্যাট গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই ওর হাতে একটা গভীর চুম্বন এঁকে দিলো ব্রুয়ার। সেই অন্তরঙ্গ দৃশ্যটা দেখে ওর দিকে না তাকিয়েই আমি ওকে বললাম, 'শুভরাত্রি।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ব্রুয়ার এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা আপনার বাড়ি কোথায়?'

'এই তো কাছেই।' বললাম, 'আপনি আমাকে বরং বার ফ্লেডিতে পেঁাছে দিলেই

চলবে।'

'কিন্তু এতো রাত্রে ওখানে কি ঢুকতে পারবেন?'

'আমার জন্যে দেখছি আপনার খুবই মাথা ব্যাথা।' বললাম, চিন্তার কিছু নেই, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে আমি ঢুকতে পারি।' একটু রূঢ় কথা বলে ফেলেই মনে মনে দুঃখ পেলাম। বেচারা! কোন সেই সন্ধ্যে থেকে বেশ স্ফূর্তিতে আছে, ওর সেই আনন্দে খোঁচা দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই বিদায় নেবার সময় খুব হৃদ্যতার ভাবই দেখালাম, প্যাটকে যেভাবে বিদায় দিয়েছি, ঠিক সেভাবে নয়।

মাঝরাতে বাড়ি ফিরে এলাম। আজ আলফানস বেশ বড় এক গ্লাস ফার্নেট-ব্রাংকা খেতে দিয়েছিল আমাকে। চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখছি। পায়ের তলাকার মাটি যেন সরে যাচ্ছে। শিথিল দেহের ভারে পা দুটো টলছিল, কোনো রকমে টেনেটেনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে চাবির খোঁজে পকেট হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। অন্ধকারে কার যেন ভারি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কে যেন বসে আছে সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে? দূর থেকে খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবে কাছে যেতেই চিনতে পারলাম। 'প্যাট না?' আমি তো একেবারে হতবাক। 'প্যাট, এতো রাতে তুমি এখানে কি জন্যে?' আমার মদের নেশা তখন ছুটে গেছে। একটা সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে তখন। সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সমস্ত দৃশ্য এক এক করে ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে তখন—রূপোলি পোশাক, পায়ের চকচকে জুতো, ওর সুন্দর নাচের ভঙ্গিমা, একজন পরপুরুষের বাহুতে আবদ্ধ। সেই সব অপ্রিয় দৃশ্যের কথা মনে রেখেই আবার বললাম, 'তা কি মনে করে এখানে এলে তুমি?'

'এখানে বসে বসে সেই কথাটাই তো আমিও ভাবছিলাম।' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিলো ও।' ওর ভঙ্গিমা এখন এমনই যে, ভোরের দিকে গড়ানো এই রাত্রিতে কারোর সিঁড়ির ধাপে বসে থাকার মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকার কিছু নেই।

আমিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠে বলেই ফেললাম, 'সত্যি আমি বোকাই রয়ে গেলাম। তা না হলে তোমার মতো একটা ভালো মেয়েকে আমি ভুল বুঝলাম?' এই বলে ওকে কোলে তুলে নিয়ে আমার ঘরের কাছে এসে দরজা খুললাম। ও আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে ছিলো, ওর পাখির মতো নরম বুকের স্পর্শ সুখ পেয়ে ওর উপর থেকে আমার পুঞ্জিভূত সব রাগ অভিমান নিমেষে জল হয়ে গেলো। আর ও যেন ক্লান্ত পাখির মতো আমার বুকে আশ্রয়প্রার্থী। আমার বুকের মধ্যে ওর দেহখানি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে, তবু তা সত্ত্বেও ওর মুখের সেই মিষ্টি হাসিটা লেগেই ছিলো। আলো জেবলে ওকে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে একটা কম্বল দিয়ে

ওর পা দুটি ঢেকে দিলাম, তাতে ওর কাঁপুনি থামলো।

'প্যাট, তুমি আসবে জানলে কি আর আজে বাজে জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম? তবে আলফানস-এর ওখান থেকে তোমাকে ফোন করেছিলাম। তাছাড়া তোমার বাড়ির কাছেও গিয়েছিলাম। দু'একবার শিষ দিয়ে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু তোমার কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম—'

'তা আমার ঘরে এলে না কেন?'

'তাইতো, কিন্তু কেন যে গেলাম না, এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।'

'সে যাইহোক, এখন থেকে তোমার ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে রেখো, তাহলে ওভাবে আর সিঁড়ির ওপরে বসে থাকতে হবে না।' হেসে বললো ও, হাসতে গিয়ে ওর ঠোঁট কেঁপে উঠলো। বেচারী, বুঝলাম ওকে কতোই না কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অতোটা পথ হেঁটে আসা, এতক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকা, আর তার পরেও হেসে কথা বলবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—হঠাৎ সারা শরীরে একটা উষ্ণতা অনুভব করলাম, শেষে সেটা প্রকাশই করে ফেললাম, 'আজকের এই ঘটনা, অনুভূতির কথা জীবনে কোনোদিনও বোধহয় ভুলতে পারবো না আমি। আজ রাতভোর এই যে সব ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে, এর বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি পারছো?'

'হ্যাঁ, খুব বুঝতে পারছি', ওর মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ, মনোরম হাসিটা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না প্যাট?'

'অতো সব খুঁটিয়ে বোঝবার প্রয়োজন নেই তোমার বব', এবার ও দুষ্টু মেয়ের মতো হেসে বললো, 'মনটা যে তোমার খুশির কানায় কানায় ভরে উঠেছে, তা তোমার কথার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে।'

'তুমি মিথ্যে বলোনি। কেন জানি না তোমাকে জানবার পর থেকে আমি যেন ক্রমশই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছি।

'তা হলেই বা। ছেলেমানুষ থাকাই ভালো। অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে একটা প্রবাদ আছে, জানো তো?'

'হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়। এই ভালো কি বলো?' খাটে হেলান দিয়ে বসলাম, প্যাট আমার সামনে বসে আছে। মনে হচ্ছে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ক্লান্তির পর ওর এই সান্নিধ্য যেন এক পরম শান্তি।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসছে, পাখিদের কলরব ভেসে আসছে বাতাসে। বাইরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো, ওই বোধহয় অনাথআশ্রমের নার্স ফ্রাউ বেনডার ফিরলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আর আধ ঘণ্টা পরেই ফ্রিডা এসে রান্নাঘরের কাজ শুরু করে দেবে। তখন ওর দৃষ্টি এড়িয়ে প্যাটকে সঙ্গে নিয়ে

এখান থেকে বেরনো মুশকিল হবে। কিন্তু ও যে এখনো অঘোরে ঘুমচ্ছে আমার বিছানায়। বেচারী, ওর এই সুখ নিদ্রা ভঙ্গ করতে মন চাই লো না। আবার না জাগিয়ে উপায়ও ছিলো না। তাই মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, 'প্যাট—ওঠো, এবার যে তোমায় ফেরার সময় হয়ে গেছে।'

ঘুম ভেঙ্গে গেলো প্যাটের। চোখ মেলে মিষ্টি করে হাসলো ও। প্রথম দিনের আলোয় ওর ঠোঁটে সেই মিষ্টি হাসিটা লেগে থাকতে দেখে মনে হলো, সদ্য ফোটা ফুলের মতোই ওর সেই হাসিটা কতো না সুন্দর, কতো না পবিত্র, তেমনি মিষ্টি হাসি হেসে একটা অদ্ভুত কথা ও আজ বলে ফেললো, 'ভাবছি আজকের দিনটা তোমার কাছেই থাকবো।'

সব পাওয়ার মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে বললাম, 'তা তো থাকবে, কিন্তু তোমার এই সান্ধ্য পোশাকে—'

'বেশ তো, সন্ধ্যা পর্যন্তই না হয় এখানে থাকবো?'

'তাহলে তোমার জন্যে বাইরে থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি—' এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষন পরে ফিরে এসে দেখি, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্যাট। বললাম, 'গতকালের সব ঘটনা তুমি ভুলে গেছো তো?' মাথা নেড়ে ও সায় দিলো।

'এরপর থেকে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আমরা আর কোথাও যাবো না, তাই তো? প্রেমে পড়লে বোধহয় কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে অন্য কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে দেখতে চায় না, তাই না? যাকগে সেসব কথা, বুয়ার আর তার চামচাদের সঙ্গে আমরা আর মিশছি না, কথা রইলো—'

'অবশ্যই। আর তোমাকেও কথা দিতে হবে', বললো প্যাট, 'মিসেস মারকুইৎস-টিকের সঙ্গও ত্যাগ করতে হবে তোমাকে।'

'মারকুইৎস? সে আবার কে?'

'কেন কাসকেউ-এর বারে যে মেয়েটি তোমার পাশে বসেছিল?'

'ওহো, সেই মেয়েটির কথা বলছো তুমি?' এবার আমার মনে পড়লো, হ্যাঁ, এই মেয়েটিই আমাকে তার রাতের সঙ্গী হতে অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু প্যাটের কথা ভেবেই আমি তার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার এই আস্তানা, তোমার মতো সঙ্গিনীর কাছে অন্য কোনো মেয়ে, সে যতো সুন্দরীই হোক না কেন, সবই তুচ্ছ তোমার কাছে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে গেছে সেই সন্ধ্যায় তোমার ওই বন্ধু বুয়ারকে দেখে—ওর কতো টাকা, আর আমি—আমি হলাম গিয়ে শুধু একটা ট্যাক্সিচালক, কিন্তু—'

'না না, ও কথা বলো না বব, তোমার মতো পুরুষ ক'জনই বা আছে বলো, তোমার সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না। তুমি, তুমি শুধু আমার—' কথা শেষ করেই

দু'হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো প্যাট। তারপরই মিষ্টি গলায় বললো, 'আহা আমার বন্ধু কোথাকার, অতো সব চিন্তার কি দরকার? ঠিক এই ভাবে, আজকের এই মুহূর্তে আমরা যেভাবে এ ওকে কাছে পেয়েছি, সেইটুকু পাওয়ার মতো আনন্দ আর কি আছে বলো?'

'কথাটা খুবই খাঁটি সত্য। অবশ্য যদি তোমাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি চিরদিন—'

ওর উষ্ণ সান্নিধ্যে সকালটা আশ্চর্যরকম সুন্দর হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। সকালে আর এক দফা বাড়তি ঘুমিয়ে নেবার জন্য দুজনে এ ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। ঘুম নয়, ঘুমের বুড়ি ছুঁয়ে গিয়ে আধো ঘুম, আধো জাগরণের স্বপ্নরাজ্যে দুজনে এ ওর দেহলগ্ন হয়ে শুয়ে থাকা, একের নিঃশ্বাস অপরের গায়ে লাগানো আর কি। তারপর লেনতসকে ফোন করে বলে দিলাম, সকালবেলাটা সে যেন নিজেই ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে—ও আমাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'থাক বেশী কিছু আর বলতে হবে না। আরে আমি জানতাম, গটফ্রিড হচ্ছে মানুষের মনের জহুরী, তাকে নতুন কথা কি আর শোনাবে তুমি? ঠিক আছে ভায়া, চুটিয়ে ফুর্তি করে নাও আজ সকালটা।'

□ নয়

সকালের মিঠে রোদের একটা সুন্দর আমেজে একটা মাঠের ধারে বসে প্রাতঃরাশ সেরে নিচ্ছিলাম। সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি—প্যাট আর আমি যাচ্ছি সমুদ্রতীরে, দিন কয়েক ওখানে কাটিয়ে আসবো বলে। একটা পুরনো সিত্রয়ী গাড়ি আমাকে ধার দিয়েছে কোষ্টার এই ছুটির কটা দিন উপভোগ করবার জন্য।

'কে জানে, গাড়িটা পুরনো, মাঝপথে বিকল হয়ে না যায়। আমি বললাম।

'না, বিকল হবে না', বললো প্যাট।

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'কেন, এ তো খুব সহজেই বোঝা যায়। আমরা দুজন যে একটু আনন্দে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি, যন্ত্র হলেও গাড়িটা কি আর বোঝে না?'

'তা ঠিক', আমি ওকে বললাম, 'এখন একবার এদিকে এসো তো।'

'কেন, এখানেই তো বেশ আছি। কি হবে ওখানে গিয়ে?'

'আগে থেকে কি হবে বলা যায় না, একবার এসেই দেখো না।'

মাঠের বিছানায় দুজনে পাশাপাশি কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। মিষ্টি মিঠেল

হাওয়া যেমন বাচ্চা মেয়ের মতো লুটোপুটি খাচ্ছিল আমাদের গায়ে। নদীর ধারে কতকগুলো ফুল ফুটেছিল। প্যাট জানতে চাইলো, ওগুলো কি ফুল। উত্তরে আমি বললাম, 'আনিমোন।'

'না গো মশাই, আনিমোন ফুল খুব ছোট ছোট হয়, আর ওই ফুল কেবল বসন্ত কালেই ফুটে থাকে।' মাটিতে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় থেকে প্যাট বললো, 'আশ্চর্য, খুবই দুঃখের কথা, মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, অথচ পৃথিবীর কিছুই তার জানা নেই। এমন কি দু'চারটে প্রয়োজনীয় নামও মনে রাখে না।'

'তা এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে', আমি ওকে বললাম, 'আমি বরং বলি কি জানো; এই যে মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় কেন, সে কথাই সে জানে না, এর থেকে বেশী দুঃখ আর কি হতে পারে বলো। আর গোটা কয়েক নাম মনে রেখেই বা কি লাভ বলো?'

এই সময় একটা গাড়ি যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ছুটে গেলো। উঠে বসে ধাবমান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'ওটা বেবী মার্সিডিজ।'

দূরে আঙুল দেখিয়ে প্যাট বললো, 'ওই যে আর একটা আসছে।'

'ওটা রেনো। দেখো তো রেডিয়েটরটা শুয়োরের নাকের মতো কিনা?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।

'তাহলে তো রেনো না হয়েই যায় না। ওই শোনো আর একটা আসছে। ওটা লালসিয়া। ইঞ্জিনের শব্দটা কানে আসছে? ঠিক যেন অর্গানের আওয়াজের মতো।'

গাড়িটা চলে যেতেই প্যাট বলে উঠলো, 'গাড়ির বেলায় তো দেখছি অগুন্তি নাম তোমার বেশ মনে আছে। এটাই দুঃখের কথা।'

'কেন, দুঃখের কথা হতে যাবে কেন? বরং এটাই স্বাভাবিক। আমার কাছে গাছ ভর্তি ফুলের চেয়ে গ্যারাজ ভর্তি গাড়ির মূল্য অনেক বেশী।'

'তা তো বটেই। বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতোই কথা বলেছো তুমি। তোমার মধ্যে সেণ্টিমেণ্ট বলে কোনো পদার্থই নেই।'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি। কেন, এই তো বললাম, গাড়ির বেলায় আমার তো যথেষ্ট সেণ্টিমেণ্ট আছে।'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে অভিমানাহত প্যাট বললো, 'আর আমার ব্যাপারে বুঝি একটুও সেণ্টিমেণ্ট অবশিষ্ট থাকতে নেই?'

সামনে ফার গাছের ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কোকিল ডাকতে শুরু করলো। যতোবার কোকিলটা ডাকে প্যাট গুণে চলে—এক দুই তিন…ওর ওই ভাবখানা

দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ আবার কি ব্যাপার ?' উত্তরে প্যাট বললো, 'কেন, জানো না বুঝি ? কোকিলটা যতবার ডাকবে ঠিক ততো বছরই তোমার পরমায়ু হবে।'

'তাই নাকি ?' কিন্তু আমি তো অন্য কাহিনী শুনেছি। কোকিল যখন ডাকে, তখন হাতে টাকা নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে হয়, তা করলে টাকা বেড়ে যায়।' এই বলে আমি পকেট থেকে টাকার কয়েকটা কয়েন বার করে হাতের তালুতে রেখে ঝাঁকাতে থাকি।

প্যাট হেসে ফেললো, 'যার যেমন মতিগতি! আমার চিন্তা জীবন, আর তোমার ভাবনা শুধুই টাকার।'

'টাকাই তো সব কিছু', আমি বললাম, 'টাকা তো জীবন ধারণের জন্যই। সব আদর্শবাদী লোকেরাই টাকার পিছনে ছুটে থাকে। টাকার আর এক নাম স্বাধীনতা, আর স্বাধীনতাই তো আসল জীবন।'

চোদ্দ পর্যন্ত গুণে প্যাট বললো, 'কিন্তু এ ব্যাপারে আগে তুমি অন্য কথাই বলতে।'

'তখন আমি অন্য রকম ছিলাম। আসলে কি জানো, টাকাকে অবহেলা করতে নেই। টাকার অভাবে মেয়েরা প্রেমিক জোটাতে পারে না। তাই তো প্রেম মানুষকে অর্থলোভী করে তোলে। অতএব বুঝতেই পারছো, টাকা হচ্ছে প্রেম আর বাস্তব জীবনের একটা সেতুবন্ধন। টাকা এই দুটি আদর্শকেই বজায় রাখার পক্ষে উপযুক্ত।'

প্যাটের তখন পঁয়ত্রিশ গোনা হয়ে গেলো। 'আমি দেখেছি', বললাম, 'নারীর জন্যই পুরুষ অর্থলোভী হয়। আর নারী না থাকলে টাকারও কোনো প্রয়োজন থাকতো না। যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে যখন লড়াই করতাম তখন সেখানে নারীর নাম-গন্ধ থাকতো না। তাই সেখানে কার টাকা আছে, আর কেই বা কপর্দক শূন্য, এ নিয়ে কেউ হিসাব রাখতো না। কে কেমন মানুষ, তখন সেটাই ছিলো কেবল বিচার্য বিষয়। তবে তাই বলে এই নয় যে, ট্রেঞ্চের স্বপক্ষে আমি কথা বলছি। আসলে কি জানো, আমি প্রেমের স্বরূপটা তুলে ধরতে চাই। এই প্রেম মানুষের মনে কতো কুপ্রবৃত্তিই না জাগিয়ে তোলে ? অর্থের লোভ, সম্মানের লোভ, দেহের ও আরামের লোভ। এই জন্যই ডিক্টেটররা চায়, তাদের অধঃস্তন কর্মচারীরা বিয়ে করে ফেলে, তাহলে ওরা তখন নারী ও তার সঙ্গ-সুখ নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকবে। এর ফলে তারা আর তার একনায়কতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে বিচার করতে যাবে না, তার বিরুদ্ধেও যাবে না। আবার দেখো, ক্যাথলিক পুরোহিতরা যে বিয়ে করে না, তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে, বিয়ে করলে তারা অমন দুঃসাহসিক ধর্মপ্রচারকও হতে পারতো না।'

প্যাট গ্ণে চলে, 'বাহান্ন।' আমি ওকে বললাম, 'সেই থেকে তুমি যে কেবল গুণেই চলেছো, থামবে না? তবে বলে রাখছি, সত্তর যেন ছাড়িয়ে যেও না।'

'সত্তর কি বলছো, একশো পর্যন্ত গুণবো।'

'একশো বছর বেঁচে থেকে কি লাভ? শুধুই বিড়ম্বনা।'

'এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না', বললো প্যাট। আমার কাছে তোমার আয়ু একশো বছরের কম হলে চলবে না।'

এবার আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। আবার পথ চলা শুরু।

দূরে থেকে সমুদ্রটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন উপর থেকে আকাশটা বুঝি নেমে এসেছে নিচে। নীল সমুদ্র, নীল আকাশ। সমুদ্র তীরের রাস্তাটা গিয়ে ঢুকেছে সামনে অরণ্যের ভিতরে। আর সেই অরণ্য পেরিয়েই গ্রাম—সেখানে আমাদের থাকার জায়গা খুঁজে বার করলাম। বাড়িটা গ্রাম ছাড়িয়ে বেশ খানিক দূরে। এই বাড়ির ঠিকানা কোষ্টারই দিয়েছিল, যুদ্ধের সময় বছর খানেক এখানে ছিলো সে। বাড়ির সামনে এসে সিবয়ী গাড়িটা থামিয়ে হর্ন বাজাতেই বাড়ির পরিচারিকা দরজা খুলে দিলো। মিনিট খানেক পরেই গৃহকর্ত্রী ফ্রাউলিন মুলার বেরিয়ে এলেন—ছিমছাম ওল্ড মডেলের চেহারা, চুলে পাক ধরেছে। কালো পোশাকে সোনার একটি ক্রস ব্রোঞ্জের উপর আটকানো। তাঁকে বললাম, 'হের কোষ্টার নিশ্চয়ই আপনাকে আগেই খবর দিয়ে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, একটা তারবার্তায় আপনারা আসছেন বলে জানিয়েছেন উনি।' আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

বললাম কোষ্টারের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আলাপের কথা। শুনে মনে হলো, উনি খুশি হয়েছেন। ইতিমধ্যে প্যাট এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। ওকে দেখা মাত্র ফ্রাউলিন মুলারের মুখের ভাব কেমন বদলে গেলো। আমার চেয়ে প্যাটকেই বেশী পছন্দ যেন ওঁর। আমাকে পাত্তা না দিয়ে বরং প্যাটকে বললেন উনি, 'কোষ্টারের অনুরোধ মতো আপনাদের জন্য সব থেকে ভালো ঘরটাই রেখেছি।'

প্যাট ও ফ্রাউলিন হেসে হেসে কথা বললো কিছুক্ষণ। একসময় ফ্রাউলিন বললেন, 'চলুন, আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

ওঁকে আমরা অনুসরণ করলাম বটে, তবে আমি এখন এখানে অবান্তর একজন। কারণ ফ্রাউলিন দেখলাম প্যাটের সঙ্গেই কথা বলছে, আমাকে যেন দেখেও দেখছে না। ছোট্ট একটা বাগান পেরিয়ে আমরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের ঘরটা নিচতলায়। বাগানে যাওয়ার একটা দরজা আছে। ঘরটা বেশ খোলামেলা। খুবই পছন্দসই। বড় ঘরে দু'ধারে দুটি খাট। প্যাট বললো, 'অপূর্ব'।

ওকে আরো বেশী খুশি করবার জন্য বললাম, 'এর চেয়ে ভাল ঘর আর হয় না। যাক এটা তো হলো, আর একটা ?'

'আর একটা মানে?' আমার দিকে ফিরে রীতিমতো বিরক্ত হয়েই ফ্রাউলিন বললেন, 'কেন, আপনাদের কি এটা পছন্দ হয়নি ?'

আমাদের দু'জনের যে দুটো আলাদা আলাদা ঘর দরকার, সেই কথাটাই বোঝাতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে ফ্রাউলিন বলে উঠলেন, 'আপনার স্ত্রীর তো এ ঘর খুবই পছন্দ হয়েছে। অথচ আপনি—'

'আমার স্ত্রী ?' চমকে উঠলাম। আড়চোখে প্যাটের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে ও, সম্ভবত আমার অমন দুরাবস্থা দেখে আড়ালে মুখ টিপে হাসবার চেষ্টা করছে ও! না, ফ্রাউলিনকে আমাদের ব্যাপারটা ভাবলাম বুঝিয়ে বলি! খুব সাবধানে কথা বলতে হবে ও'র কাছে। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত। 'দেখুন, ছেলেবেলা থেকে আমাদের আলাদা ঘরে শোয়ার অভ্যাস।'

মুখ বিকৃত করে ফ্রাউলিন মুলার বললেন, 'বাঃ বাঃ, বিয়ের পরেও আলাদা শুতে চান? এটাই কি হাল আমলের ফ্যাশান ?'

নতুন করে ও'র মনে সন্দেহ জাগার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'না না, ফ্যাশানের জন্য নয়, আসলে কি জানেন, আমার স্ত্রীর ঘুম খুব পাতলা। আর আমার ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার অভ্যাস, তাই—'

'ওহো, এই কথা? ঠিক আছে, আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' সেই বড় ঘরটার সংলগ্ন একটা ছোট ঘরের ব্যবস্থা হলো আমার জন্য। আমি বললাম, 'চমৎকার, আমি ঠিক এই রকমটিই চাইছিলাম।' আমাদের ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়ে ফ্রাউলিন চলে গেলেন।

এবার প্যাটের দিকে ফিরে বললাম, 'কি গো, এখন তো আমাদের সম্পর্কটা ঠিক হয়ে গেছে। ও'র যা রাশভারি চেহারা আর ভাবভঙ্গি, সত্যি কথাটা বলবার মতো সাহস আমার ছিলো না। তাছাড়া লক্ষ্য করেছো, ও'র যেন আমাকে একেবারেই পছন্দ নয়। আর যা চালিয়াত উনি—'

'না, না তা নয়', প্যাট হেসে বললো, 'যাই বলো আমার কিন্তু ভালোই লাগলো ও'কে। এবার বিছানাপত্তর গুছিয়ে নেওয়া যাক। আর স্নানের জিনিষগুলোও তো বের করতে হয়।

ছুটিয়ে সাঁতার কাটার পর তীরে এসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়লাম বালুকাবেলায়। প্যাট তখনো সাঁতার কাটছিল। বুকের নিচে উষ্ণ বালির স্পর্শ খুব ভালো লাগছিল। একটা সুন্দর মনোরম আবেশে চোখ বুজে আসছিল। ঠিক এই

রকম একটা সময়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। তখন ১৯১৭ সালের এক গ্রীষ্ম-কাল। যুদ্ধের সময়। আমাদের রেজিমেণ্ট তখন ফ্লাণ্ডার্স'-এ। অভাবনীয় ভাবেই ক'দিন ছুটি মিলে যায়। আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম অস্টেণ্ডে—সেই দলে ছিলাম আমি, মেয়ার, হলটফ, ব্রেয়ার, লুটজেনস এবং আরো কয়েকজন। তখন আমাদের সামনে পিছনে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসেছিলো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তবু তারই মাঝে ক'দিনের মুক্তির স্বাদ কি যে মধুর ছিলো যার জন্য আজও ভুলতে পারিনি সেই দিনগুলোর স্মৃতি। আজকের মতোই সেদিনের সেই রৌদ্রতাপ, সেই বেলাভূমি, আর সমুদ্র সাঁতার কাটার দৃশ্য। সারাটা দিনই কেটে যেতো সমুদ্রতীরে। আমরা যে তখনো বেঁচে আছি, যুদ্ধের কালো হাত আমাদের দেহটা স্পর্শ করতে পারেনি, তাতেই আমরা খুশি ছিলাম দিনের আলোয়। কিন্তু সূর্যাস্ত শেষে অন্ধকারে যখন সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে আর একটা প্রচণ্ডতর গর্জনের শব্দ কানে আসতে লাগলো, তখন বুঝতে দেরী হতো না, সেটা কামানের গর্জন, আমাদের মৃত্যু বাণ। আমরা তখন সবাই উৎকর্ণ, মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শোনবার জন্য! আর তারপরেই ক্লান্ত স্কুলের ছেলেদের মুখে ধীরে ধীরে সৈনিকের কঠোরতা ফুটে উঠতো। আবার পরক্ষণেই দেখা দিতো বিষাদের ছায়া, যার কোনো ভাষা নেই, কিন্তু আমাদের মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠতো আশা নিরাশার দোলা। একদিকে কঠোর কর্তব্যের হাতছানি, অন্যদিকে তিক্ত ব্যর্থতা, একদিকে জীবনের কামনা বাসনা, অপরদিকে অসময়ে মৃত্যুর পরোয়ানা। তারপরেই শুরু হলো ১৯১৮-এর আসল যুদ্ধ। শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণ ক'দিন পরেই জুলাই এর গোড়ার দিকে দেখা গেলো আমাদের রেজিমেণ্টে মোট আটশোটি প্রাণী বেঁচে আছে। তবে মেয়ার, হলটফ, লুটজেনস এরা কেউ আর বেঁচে নেই।

'বব!' প্যাটের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। যুদ্ধের কথা ভাবলে আমার মন যেন কোন দূরান্তে চলে যায়! আশ্চর্য, অন্য কোনো ব্যাপারে তো এমনটি হয়না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। সমুদ্র থেকে উঠে আসছে প্যাট তখন। শেষ অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছিল ওর জলসিক্ত দেহের উপরে। সে এক অতি আশ্চর্য রমণীয় দৃশ্য। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। সেই দৃশ্যপটটা এই রকম: মাথার উপরে অন্তহীন নীল আকাশ, নিচে ফেনিল জলরাশি, আর সেই জল থেকে উঠে আসছে এক তন্বী রমণীমূর্তি। সব মিলিয়ে একটা যেন অপার্থিব অনুভূতি। আমার মনে হলো, এই বিশ্বসংসারে আমিই যেন একমাত্র পুরুষ, আর ওই যে সমুদ্র থেকে উঠে আসছে যে মেয়েটি, ও হচ্ছে পৃথিবীর আদিমতম রমণী। সৌন্দর্যের যে একটা আলাদা শক্তি আছে আজই প্রথম সেটা উপলব্ধি করলাম, আমার রক্তকলঙ্কিত অতীত ইতিহাসের চেয়ে সেই শক্তি অনেক বেশী শক্তিশালী। আর এই কারনেই বোধহয় সৃষ্টি টিঁকে আছে আজও, তা না হলে সারা দুনিয়া ছারখার হয়ে যেতো।

আর তার চেয়েও বড় কথা হলো, আজও আমি বেঁচে আছি, বেঁচে আছে প্যাট।

'বব্বি!' প্যাট আবার ওর সেই আদরের ডাক ডাকলো। হাতের ইশারায় ওর ফেলে যাওয়া পোশাকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ওর পোশাকগুলো তুলে নিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অনেক বেশী সময় জলে ছিলে তুমি।' ওর জলসিক্ত কাঁধের উপরে চুমু খেয়ে বললাম, 'প্রথম দিনেই এতোটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়, একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিলো তোমার।'

হেসে ও আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'উঁহু আর নয়, কতকালই তো সাবধানে কাটালাম, সে সবই বৃথা হলো। তাই এখন একটু অসাবধান হতে চাই।' বলেই ও এবার সেই অসাবধানী কাজটা করার জন্য ওর ভিজে গালটা আমার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে দিলো। 'হ্যাঁ বব্বি, আমি তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, এখানে এসে সাবধান হওয়ার কোনো বালাই আর রাখতে চাই না। সম্পূর্ণ ভাবে আমরা এ ওকে পেতে চাই। কোনোরকম জড়তা কিংবা অহেতুক চিন্তা ভাবনা মনের কোণায় এতটুকু স্থান দিতে চাই না আমি, আর তুমিও দিও না। সমুদ্র, সূর্য আর ছুটি—এছাড়া আমাদের মনে অন্য আর কোনো ভাবনা থাকবে না, কেমন ?

'ঠিক আছে, তাই হবে।' আমি বললাম, 'এখন বাচ্চা মেয়ের মতো একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও তো। আমি তোমার ভিজে গা মুছিয়ে দিই।' এই বলে তোয়ালে দিয়ে ওর জলসিক্ত দেহ মুছিয়ে দিতে উদ্যত হলাম। ও কোনো আপত্তি করলো না, ও যেন নিজেকে আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ করে সঁপে দেওয়ার মনস্থ করে রেখেছিল। ওর গা মোছাতে গিয়ে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করে বললাম, 'তোমার গায়ের রঙটি দেখছি বাদামী হয়ে আছে, কেমন করে হলো বলো তো ?'

লজ্জা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্যাট ওর নগ্ন গা পোষাকে ঢাকতে গিয়ে বললো, 'একটা বছর অতি সাবধানে কাটিয়েছিলাম। তখন থেকেই এমনটি হয়েছে। উপরের বারান্দায় রোজ এক ঘণ্টা রোদে শুয়ে থাকতাম। আর রাত আটটা বাজতে না বাজতেই শুয়ে পড়তে হতো। আরো কতো সব কড়া কড়া নিয়ম। আমি কিন্তু এখানে ওসব নিয়ম টিয়মের ধার ধারবো না।'

'ঠিক আছে, দেখা যাবেখন', আমি বললাম, 'অনেক কথাই তো আমরা ভেবে থাকি, কাজে তা আর কতখানিই বা বাস্তবায়িত হয় বলো ?'

একটু আগের ওর সেই উচ্ছ্বাসটা ফিকে হয়ে গেলো, ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়লো ও। এই রকমই ওর স্বভাব। ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি, হৈ চৈ ফূর্তির শেষ নেই ওর, কিন্তু একটু পরেই কেমন যেন ভাঁটা পড়ে যায় ওর তাতে। বেশ বুঝতে পারি, শরীরে ওর একটুও বাড়তি শক্তি নেই, অথচ ওপর ওপর ওকে কিছুই বোঝা যায় না। আজও তেমনটি হলো। ওর একটু আগের সব উৎসাহ উদ্দীপনা একটু একটু করে নিভে গেলো। ক্লান্ত গলায় ও বললো, 'চলো, বাড়ি ফিরে

যাই বব্বি।'

'বাড়ি?' ফ্রাউলিন মুলারের বাড়িকে তুমি বাড়ি বলছো?'

আমার কাঁধে প্যাট ওর মাথা রেখে বললো, 'বাড়ি বইকি, এখন ওটাই তো আমাদের বাড়ি, আমাদের দুজনের বাসস্থান।'

স্টিয়ারিং-এ এক হাত রেখে আর অন্য হাতে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরলাম। দূর থেকে ফ্রাউলিনের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। মনটা সত্যি সত্যি খুশি হয়ে উঠলো। প্যাটের কথাই ঠিক, মনে হলো, সত্যিই আমরা নিজের ঘরে ফিরে চলেছি।

ফ্রাউলিন মুলার আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষাতেই ছিলেন। ওর পরণে এখন সিল্কের পোশাক। তবে এই রঙ ও পোষাকের ডিজাইন পিউরিটান স্বভাবেরই উপযোগী। আর ক্রসের বদলে ওঁর বুকে যে জিনিষটি স্থান পেয়েছে, তাতে একাধারে একটি হৃদপিন্ড, একটি নোঙর আর ক্রসের চিহ্ন আঁকা ছিলো। শাস্ত্রমতে এগুলো নাকি বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের প্রতীক।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম এখন ওঁর ব্যবহার ও কথাবার্তায় আগের চেয়ে অনেক বেশী আত্মীয়তার সুর প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেকক্ষণ আমাদের কাছে বসলেন উনি। লেনতসের দেওয়া পোর্টের বোতল খুলে ওঁকে মদ খেতে দিলাম। মদটা খুব ভালো লাগলো ওঁর, প্রশংসা করলেন। ওদিকে প্যাটকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে ফ্রাউলিন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওকি, আপনাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কি ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, একটু নয়, রীতিমতো ক্লান্ত ও এখন', আমি বললাম।

'তাহলে তো এখুনি আমাকে উঠতে হয়', ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফ্রাউলিন। চলে যাওয়ার আগে বললেন, 'শুভরাত্রি। রাতে যেন ভালো ঘুম হয়।'

ফ্রাউলিন চলে যাওয়ার পর প্যাট বিছানায় উঠে বসে বললো, 'বব, সত্যি আমার খুবই ক্লান্তি লাগছে। ভয় হচ্ছে, অসুখ বিসুখ করবে না তো?'

ওর পাশে বসে বললাম, 'না, ওসব কিছু হবে না। এখন চোখ বুঁজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তো!'

'কেন, তুমি শোবে না?' প্যাট একটু সরে শুয়ে আমার জন্য জায়গা করে দেয়।

আমি এর কপালে চুমু খেয়ে ওকে আদর করতে করতে বললাম, 'লক্ষ্মীটি, তোমাকে একটু সময় একা থাকতে হবে। আমি একবার সমুদ্রে ঘুরে আসতে চাই।'

'বেশ', বলে ও চোখ বন্ধ করে বললো, 'দরজাটা সারা রাত খুলে রেখো, তাহলে মনে হবে, আমি যেন বাগানে শুয়ে ঘুমোচ্ছি।' একটু পরে ও ঘুমিয়ে পড়তেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কি ভেবে একবার পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়লো ঘুমন্ত প্যাটকে। হঠাৎ মনটা কেমন সংসারী হয়ে উঠলো, একটা ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করলাম। ভাবলাম, এতদিনে বুঝি একজন মনের মানুষ পাওয়া গেলো,

একান্ত আপনজনের মতো ও আমার কাছে রয়েছে, থাকবে চিরদিন। হাত বাড়ালেই কাছে পাবো ওকে, ওর পাশে গিয়ে বসতে পারবো, ওর কাছে থাকতে পারবো। কেবল একদিনের জন্য নয়, অনন্তকাল ধরে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো বা। আবার সেই হয়তো বা। এই 'হয়তো বা' কথাটা থেকে নিষ্কৃতি নেই যেন। কোথাও নিশ্চয়তা খুঁজে পেলাম না, না মানুষের জীবনে, না সংসারে।

□ দশ □

সমুদ্রের ধারে বসে সূর্য অস্ত যাওয়ার শোভা দেখছিলাম তন্ময় হয়ে। আজ প্যাট আমার সঙ্গে আসেনি। ওর শরীরটা ভালো নেই। আমার তন্ময়তা ভাঙলো ফ্রাউলিন মুরের পরিচারিকার ডাকে। হাঁপাচ্ছে সে। কোনো রকমে খবর দিলো সে, 'আপনার স্ত্রীর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলুন—'

এক রকম ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে এসে দেখি, প্যাটের বিছানার সামনে ফ্রাউলিন এক হাতে কাপড়ের টুকরো আর অন্য হাতে জলের গামলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি যেন বললেল উনি, শুনতেই পেলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসুন, দেখি কোথায় লেগেছে?' প্যাট শুয়েছিল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ওর বুক, মুখ দিয়ে রক্ত চলকে পড়ছিল।

কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বললেন ফ্রাউলিন, 'ওর কোথাও চোট লাগেনি, আসলে ওর রক্ত বমি হচ্ছে।'

'রক্তবমি?' মনে হলো আমার মাথায় বুঝি বাজ পড়লো। জলের গামলাটা ওঁর হাত থেকে টেনে নিয়ে বললাম, 'যান, ডাক্তারকে খবর দিন, আর একটু বরফ নিয়ে আসুন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন ফ্রাউলিন মুলার।

প্যাটকে নিয়ে এখন আমি কি করবো ভাবছিলাম, হঠাৎ একটা বিষম খেয়ে ওর দম আটকে গেলো, সেই সঙ্গে এক ঝলক রক্ত ফিনকি দিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ওর নিঃশ্বাস ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে, রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আবার দম আটকে গেলো, সেই সঙ্গে কাশির দমক, আবার এক ঝলক রক্ত। ওর কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ওকে শক্ত করে চেপে ধরলাম আমি। ওর সারা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছিল, কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। তবে অনেকক্ষণ পরে কাঁপুনি থামতেই ওর ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা এলিয়ে পড়লো।

একটু পরেই ফ্রাউলিন মুলার ঘরে এসে ঢুকলেন, হাতে বরফের টুকরো। ওঁর

মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছিল না। কোনো রকমে ফিসফিসিয়ে তিনি জানালেন, 'এখুনি ডাক্তার আসছেন। এর মধ্যে বরফের টুকরোগুলো ও'র বুকে রেখে দিন, আর উনি যদি পারেন তো দুএক টুকরো বরফ মুখে নেন যেন।'

বরফের টুকরোগুলো প্যাট-এর বুকে রাখলাম। ওর জন্য কিছু করতে পেরে স্বস্তি পেলাম। এই প্রথম ভালো করে তাকালাম ওর যন্ত্রণাকাতর রক্ত মাখা ঠোঁট দুটির দিকে। আর তখনি সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেলো, ওই বোধহয় ডাক্তার এলেন। হ্যাঁ, ডাক্তার এলেন। প্যাটের বুকের পাঁজরাগুলো একবার স্টেথিসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো প্যাট। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম বুঝছেন ডাক্তার, ভয়ের কোনো কারণ নেই তো?'

আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা করছেন কোন ডাক্তার?'

'তা তো জানি না। আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না। এই প্রথম ওর রক্তবমি হতে দেখলাম। বিশ্বাসই হচ্ছে না—'

'সেকি?' অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, 'আপনার স্ত্রীর এমন একটা ভারি অসুখের খবর আপনি জানতেন না, এসব কি বলছেন আপনি?'

'বললাম তো, সত্যি আমি কিছুই জানি না। ও আমাকে কিছুই বলেনি।'

প্যাট-এর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে তিনি নিজেই এবার জিজ্ঞেস করলেন। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল প্যাট-এর। ডাক্তার ওকে সাহায্য করলেন। কোনো রকমে বললো, 'জাফে।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে উঠলেন, 'মানে প্রফেসর ফিলিক্স জাফে?' প্যাট চোখের ইশারায় জানালো, হ্যাঁ, ওর অনুমানই ঠিক। তারপর ডাক্তার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক আছে, ও'কে একবার ফোন করে দিতে পারেন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে জিজ্ঞেস করে প্রফেসর ফিলিক্স জাফের ফোন নম্বরটা জেনে নেবেন।'

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ওর অসুখ সেরে যাবে তো?'

'আগে রক্তবমিটা বন্ধ করতে হবে', উত্তরে বললেন ডাক্তার।

এরপর আর একটুও দেরী না করে ছুটলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফ্রাউলিন মুলারের পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক কষ্টে প্রফেসর ফিলিক্স জাফের লাইনটা পাওয়া গেলো। কিন্তু নার্স জবাবে বললো, 'দুঃখিত, প্রফেসর জাফে একটু আগে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেছেন।' আমার তখন হার্টফেল করার মতো অবস্থা। নার্সকে বললাম, 'আচ্ছা, আমার একটা উপকার করবেন, প্রফেসর জাফে ফিরে এলেই ও'কে একবার এখানে ফোন করতে বলবেন?' নার্সকে এখান কার ফোন নম্বরটা দিয়ে আরো বললাম, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, একজনের জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে

কথা। ভুলবেন না যেন।'

'না না. আমি ভুলবো না', নার্স বললো, 'প্রফেসর জ্যাফে ফিরলেই আমি ওঁকে ফোন করতে বলবো।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কি খেয়াল হলো কোষ্টারকে ফোন করলাম। অফিসেই ছিলো ও। ওই তো কোষ্টারের শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সব কথা ওকে খুলে বললাম। উত্তরে ও বললো, 'ঠিক আছে আমি এখুনি প্রফেসর ফিলিক্স-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ছি। চিন্তা করো না। উনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি ঠিক খুঁজে বার করবোই।'

ঘরে ফিরে যেতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি পেলেন ওঁকে ?'

'না, তবে কোষ্টারকে পেয়েছি।'

'কোষ্টার ? কই ওঁর নাম তো কখনো শুনিনি। তা ওঁর চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি ?'

'চিকিৎসা পদ্ধতি ? না না, ও ডাক্তার নয়, ও আমার বন্ধু। প্রফেসর জ্যাফেকে পেলাম না। তিনি বেরিয়ে গেছেন। কোষ্টার ঠিক তাকে খুঁজে বার করবে।'

কিন্তু এদিকে যে বড় মুশকিল হলো, 'ডাক্তার আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন তিনি ধরে নিয়েছেন যে, আমি একটা পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। ওদিকে প্যাটে আবার কাশতে শুরু করে দিয়েছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দৃষ্টি স্থির আমার রাস্তার দিকে ? হঠাৎ তখন কানের কাছে কার যেন চিৎকার ভেসে এলো, 'টেলিফোন…'

'ওই আমার ফোন এসেছে', ডাক্তারকে বললাম, 'আমি যাই—'

'না, আমি যাচ্ছি', লাফিয়ে উঠে ডাক্তার বললেন, 'আপনার চাইতে আমিই ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। আপনি বরং আপনার স্ত্রীর পাশে থাকুন। এই আমি যাবো আর আসবো, কেমন ?'

প্যাটের পাশে গিয়ে বসলাম। ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'আমরা তো রয়েছি, তোমার কোনো ভয় নেই প্যাট, সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রফেসরের সঙ্গে কোষ্টার কথা বলে থাকবে। উনি এলে দু'দিনেই তোমার অসুখ সেরে যাবে। তা তোমার এমন অসুখের কথা তুমি আগে বলোনি কেন আমাকে। শরীর থেকে একটু আধটু রক্ত গেলে কিছু হয় না প্যাট।'

ওদিকে ডাক্তার ফিরে এসে জানালেন, 'প্রফেসরের ফোন না। আপনার এক বন্ধু লেনতস ফোন করেছিলেন। আপনার বন্ধু কোষ্টারের সঙ্গে প্রফেসরের কথা হয়ে গেছে, কি করতে হবে না হবে, সব তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে। আর আপনার বন্ধু লেনতস সে সব কথাই আমাকে বুঝিয়ে বললেন। আচ্ছা, উনি ডাক্তার নাকি ?'

'না, তবে ডাক্তার হওয়ার খুব বাসনা ছিলো ওর।' ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোষ্টারের কথা কিছু বলেনি ও?'

'হ্যাঁ, লেনতস আপনাকে বলতে বললেন, মিনিট কয়েক আগে প্রফেসরকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন কোষ্টার। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পে'ছৈ যাবে বলেছেন উনি। তবে ভুল বলেছেন তিনি। পথ যা বললেন, সেই আঁকা বাঁকা পথে এসে পে'ছিতে কম করেও ঘণ্টা তিনেক তো লাগবেই।'

'আমি বললাম, 'আমার ওই বন্ধু অটো মানে কোষ্টার যখন বলেছে, ঠিক দুঘণ্টার মধ্যেই এখানে পে'ছৈ যাবে, দেখবেন।'

'ভালোই তো। তাছাড়া উনি যে আসছেন সেটাই মস্ত বড় কথা।

আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, দূরে সমুদ্রের গর্জন। নির্জন জায়গা। হঠাৎ মনে হলো, আমি তো এখন আর একলা নই। ওই কুয়াশা, আর আমার মনের অন্ধকার ভেদ করে আসছে আমার বিপদের বন্ধু—হেডলাইটের ঘোলাটে আলো, টায়ারের হিসহিস শব্দ, দু'হাতে এর স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকা, সব যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দূর দূরান্ত থেকে। ধীর, স্থির শান্ত চোখের চাহনি। সে কার? আমার বন্ধুর, আমার জীবন সাথীর—

প্রফেসর ফিলিক্স জাফের মুখে পরে শুনেছিলাম, কত কষ্ট করেই না তাকে এক পানশালা থেকে খুঁজে বার করেছিল কোষ্টার। রোগিণীকে চিনতে পেরে প্রফেসর খানা পিনা অসমাপ্ত রেখে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন সেখান থেকে। তারপর বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্তর ও টুকিটাকি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে কোষ্টারের কার্ল গাড়িতে চেপে বসেন। কোষ্টার তাঁকে একটা মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল, এই জায়গাটার দূরত্ব যেখানে আড়াইশো মাইলেরও বেশী, সেখানে সে বানিয়ে বলেছিল মাত্র চল্লিশ মাইল। দূরত্ব বেশী শুনতে পাছে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বসেন, সেই আশঙ্কাতেই এই মিথ্যের অবতারণা। আর রাস্তায় কোষ্টার যে দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি চালিয়েছিল নিষিদ্ধ পথে, ট্রাফিক অমান্য করে, সামান্য এক চুলের ব্যবধানের হয়েও অন্য ছুটন্ত গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা এড়িয়ে, তাতে প্রফেসর জাফে মনে মনে বিরক্ত হলেও দোষ ধরেন নি। বিশেষ করে তাঁর রোগিণী প্যাট কোষ্টারের বন্ধুর স্ত্রী শুনে তিনি ওর সব চালাকি মাফ করে দেন। তবে এখানে পে'ছৈ তিনি জানাতে ভোলেননি, ফিরে আর তিনি কোষ্টারের গাড়িতে চড়বেন না। বাবাঃ ও কোনো গাড়ির চালক হলে, আর তার গাড়িতে যদি কেউ যাত্রী হয়, তাকে প্রাণ হাতে করে চলতে হবে।

ওরা যখন এলো, আমি তখনো বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম। উত্তেজনায় আমার সারা

শরীর কাঁপছিল। ওই তো বিদ্যুৎ বেগে গাড়িটা ছুটে আসছে। বুঝলাম, ওটা কাল' না হয়েই যায়না। একটা চাপা গোঙানির শব্দ কানে ভেসে এলো গ্রাম্য আবহাওয়া কুয়াশা ভেদ করে। দুরন্ত গতি, আসছে ও বিজয়ী বীরের মতোন। ডাক্তার এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মুহূর্তে হেডলাইটের তীব্র আলোয় আমাদের দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সশব্দে ব্রেক কষে গাড়িটা এসে বাগানের গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছুটে গেলাম গাড়ির সামনে। প্রথমে প্রফেসরই গাড়ি থেকে নামলেন, আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না, গট মট করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন কোণ্টার চলেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'প্যাট কেমন আছে?'

'রক্তবমি এখনো হয়ে চলেছে।'

'তা হোক, কোনো চিন্তা নেই, ও ঠিক সেরে উঠবে।'

আমি নীরবে ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য কোণ্টার বললো, 'আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, একটা দাও।'

সিগারেট দিয়ে আমি ওকে বললাম, 'আটা তুমি এসেছে, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে। যে করেই হোক ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে, তা না হলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে।

ওদিকে প্রফেসর প্যাটকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোণ্টাবের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'আর কোনদিন যদি আপনার গাড়িতে চাপি—উঃ কি স্পীড? যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো—'

'তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত', বিনয়ের সঙ্গে বললো কোণ্টার, 'কিন্তু কি করবো বলুন, এছাড়া উপায়ও ছিলো না, আমার বন্ধুর স্ত্রীর জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে কথা—'

এবার জাফে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাই বুঝি?'

আমি তখন সাহস করে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলেন ডাক্তার?' ভালো তো!'

'তা ভালো না হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম? কবেই চলে যেতাম।'

'আপনি ওকে দেখে এতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, তাই ভাবলাম—'

এবার প্রফেসর হেসে ফেললেন। 'সব কিছুই তাড়াতাড়ি সারতে হয়।'

'এখন বলুন প্রফেসর', বললো কোণ্টার, 'আপনাকে এনে আমি ভালে করিনি?'

'হ্যাঁ, সে আর বলতে? অবশ্যই!'

'কাল সকাল হলেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'না; ফিরতি পথে সেটি আর হবে না'; সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন জাফে।

'ফেরার পথে অতো স্পীডে আর গাড়ি চালাবো না।'

'না, কাল এখানে থেকে যাওয়ার দরকার আছে।' তারপর প্রফেসর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ঘরে থাকতে পারি?' এক কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম।

তারপর কোষ্টার আর আমার জন্য হাতের কাছে যা পেলাম সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা হলাম অন্যত্র ঘর খোঁজার জন্য। কোষ্টারকে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।'

'না, না ক্লান্ত হওয়ার কি আছে এতে?' বললো কোষ্টার, 'এসো, কোথাও একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।'

ঘণ্টাখানেক পরে আমার মনে আবার একটা অস্বস্তিবোধ খোঁচা দিয়ে উঠলো। অটোকে বললাম, 'প্রফেসর যখন থেকে যেতে চাইলেন, তখন প্যাট-এর অবস্থা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক হবে। তা না হলে থাকতে গেলেনই বা কেন?'

'সাবধানের মার নেই', বললো কোষ্টার, 'হয়তো সে কথা ভেবেই থেকে গেলেন উনি। তাছাড়া প্যাটের প্রতি ও'র একটা বিশেষ টান আছে। পথে আসতে গিয়ে তিনি আমাকে তাঁর মনোভাবের কথা প্রকাশ করেছেন। উনি নাকি প্যাট-এর মায়েরও চিকিৎসা করেছিলেন।'

এক সময় আমরা আমাদের কাল' গাড়ির ভেতরটাই আমাদের আজকের রাতের বেডরুম বানিয়ে নিলাম। কোষ্টার বলে উঠলো, 'যুদ্ধের সময় ফ্রণ্টে যে দুরাবস্থায় রাত কাটিয়েছি তার থেকে এ ঢের ভালো।'

গাড়ির হুড থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাতাসে হিমেল হাওয়া। অটোকে বললাম, 'আমার কম্বলটা তোমাকে দিই?'

'না, না আমি বেশ আরামে আছি।'

'জাফে ডাক্তার হিসাবে খুব ভালো, কি বলো?'

'হ্যাঁ, ভালো বৈকি? আর ও'র কাজও খুব পাকা।'

'তা তো হবেই!'

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসতেই দেখি অটো জেগে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঘুমোওনি?'

'কেন ঘুমবো না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ও।

'আমি ওকে একটু দেখে আসি', বললাম। ও বললো, 'চলো আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

প্যাট-এর ঘরের কাছে এসে দেখি ও অঘোরে ঘুমচ্ছে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো। মরে যায়নি তো ও? না, ওই তো একটা হাত নাড়লো ও। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওদিকে প্রফেসব ঘুম থেকে জেগে উঠে প্যাট-এর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন আমরা

প্যাট-এর ঘরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। পাছে উনি আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের উপরে রাগ করেন, এই ভয়ে।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে পূবাকাশে ঈষৎ লাল আভা দেখা যাচ্ছে, ভোর হয়ে এলো। কোণ্টার বললো, 'আচ্ছা, সমুদ্রে একটু সাঁতার কাটলে হতো না?'

'তুমি যাও, 'আমি বললাম, 'প্যাট-এর কাছাকাছি থাকতে চাই আমি এই সময়।'

'ওর জন্য চিন্তা করো না, প্রফেসর আছেন। বরং তুমিও আমার সঙ্গে চলো।' অগত্যা যেতেই হলে।

বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর ফিরে এসে দেখি, ফ্রাউলিন মুলারের ঘুম আগেই ভেঙ্গে গেছে। সব্জির খেত থেকে সব্জি তুলছেন তিনি। আমরা কথা বলতে বলতে আসছিলাম। হঠাৎ আমার কথা ওঁর কানে যেতেই উনি চমকে উঠলেন। গতকাল আমার মাথার ঠিক ছিলো না, কি বলতে কি বলেছি ওঁকে। তাই ক্ষমা চেয়ে নিলাম ওঁর কাছে। শুনে উনি তো কেঁদেই ফেললেন, 'আহা বাছা আমার, অমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটা—'

'দেখুন না, ও ঠিক একশো বছর বেঁচে থাকবে।' ওকে কাঁদতে দেখে মনে মনে খুব বিরক্ত হলাম। উনি ভেবেছেন প্যাট মরে যাবে, তাই উনি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। না, ও মরবে না…সমুদ্রে স্নান করে আমার মনের বল অনেক বেড়ে গেছে। আমার মন বলছে, প্যাট এতো তাড়াতাড়ি মরতে পারে না। ও ঠিক সেরে উঠবে। কোণ্টার রয়েছে, আমি রয়েছি, আমরা প্যাটের সাথী, চিরদিনের। আমরা থাকতে কেনই বা ও মরতে যাবে?

বুড়ির সঙ্গ এড়িয়ে আমরা একবার বাড়ির চারদিক প্রদক্ষিণ করে এলাম। প্যাট-এর ঘরের সামনে একটু সময়ের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'ঘুমচ্ছে ও, ঘুমোক। যতো ঘুমবে ততই ওর ভালো।'

বাগানে ফিরে এসে দেখি ফ্রাউলিন মুলার ব্রেকফাস্টের যোগাড় করে ফেলেছেন। গরম কফিতে চুমুক দিতেই কনকনে ভাবটা দূর হয়ে গেলো। এই সময় দরজা খুলে প্রফেসর জাফে বেরিয়ে আসতেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠতে গিয়ে আমি ব্রেকফাস্টের টেবিলটা আর একটু হলে উল্টে দিয়েছিলাম। দৃশ্যটা জাফের দৃষ্টি এড়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব ঠিক আছে।'

'আমি একবার ওর ঘরে যেতে পারি?'

'এখন নয়। পরিচারিকা এখন ঘর ধোয়া পোছা করছে।'

প্রফেসরকে কফি খেতে দিলাম। ওঁর মুখের উপর সূর্যের আলো এসে পড়ায় ওঁর চোখ দু'টি মিটমিট করছিলো। কোণ্টারের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'একটি কারণে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই জন্যে যে, একদিনের জন্য হলেও এই যে

একদিন শহরের বাইরে আসবার সুযোগ পেলাম, এতেই আমি ধন্য।'

'তবে এলেই তো পারেন। সন্ধ্যাবেলায় এসে পরদিন সকালে আবার ফিরে যেতে পারেন', বললো কোণ্টার।

'তা পারি। কিন্তু জানেন তো এ যুগটা হচ্ছে নিজের উপরে জুলুমবাজি করা', অপেক্ষা করে বললেন জাফে, 'ইচ্ছে তো অনেক, কিন্তু সব ইচ্ছের পূরণ কি করতে পারি! কিন্তু কেন পারি না জানি না। কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না। জায়গাটা কতোই না সুন্দর। আমার তো সব কিছুই আছে, আছে অর্থ, আছে গাড়ি বাড়ি। অথচ দেখুন, এতো সব থাকা সত্ত্বেও আমার কি লাভ বলুন? গ্রীষ্মে কিংবা শরতে এমন এক সুন্দর সকাল উপভোগ করার কাছে অন্য কোন কিছুর কি দাম আছে বলুন? আমাদের জীবনে শুধু কাজ আর কাজ। যন্ত্রের মতো, পশুর জীবনের মতো। মনকে কেবল সান্ত্বনা দিয়ে যাই, একদিন মুক্তি আসবে আমাদের জীবনে, একদিন অবকাশ আসবে আমাদের জীবনে। কিন্তু কই, সেদিন তো আর আসে না! আশ্চর্য, এই ভাবেই জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলে যাচ্ছি। জানি না এর শেষ কোথায়?'

'অন্তত ডাক্তারদের জীবনের মূল্যবোধ থাকা উচিত, তা না হলে আর পাঁচটা পেশাদার লোকের মতো জীবন যাত্রা হয়ে যাবে', আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ওটা রুচির ব্যাপার', জাফে এবার আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'এসবই খুব জটিল ব্যাপার। যাইহোক, কথায় কথায় আপনাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে একবার যেতে পারেন। তবে ওঁকে বেশী কথা বলতে দেবেন না যেন।'

বড় অসহায় ভঙ্গিতে শুয়েছিল প্যাট। ফ্যাকাশে মুখ, মাত্র একদিনে চোখে কালি পড়ে গেছে, বিবর্ণ ঠোঁট দু'টি। কেবল চোখ দু'টি আগের মতোই বড় বড় আর জ্বলজ্বলে। আর এখন যেন আগের চেয়ে আরো বেশী বড় দেখাচ্ছে।

ওর পাশে গিয়ে বসে বললাম, 'ভয় নেই প্যাট, দেখবে খুব শীগগীর তুমি আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, ভালো হয়ে উঠবে।'

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ও বললো, 'তা কালই ভালো হয়ে যাবো তো?'

'না, কাল না হলেও দু'চারদিন পরে ভালো হলেই তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। জানি, এ জায়গাটা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভালো নয়।'

'কিন্তু আমার তো কোনো অসুখ হয়নি রবি। এ তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র—'

এর পরেও প্যাট বলছে, ওর কোনো অসুখ হয়নি। হঠাৎ খেয়াল হলো আমার। ও হয়তো ভেবেছে ওর এই ভয়ংকর রোগ দেখে ও ভেবেছে আমি বুঝি খুব ভয় পেয়ে গেছি। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, 'এ তোমার খুবই ছেলেমানুষি প্যাট, আর তাই বুঝি তুমি তোমার অসুখের কথা আগে কখনো বলোনি আমাকে!'

জবাব দিলো না ও। তবে বুঝলাম আমার অনুমানই ঠিক। বললাম, জানি না তুমি আমাকে কি ভেবেছো', ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'একটুও নড়বে না, চুপ করে শুয়ে থাকো!' এই বলে উষ্ণ ঠোঁটে চুমু খেলাম।

চোখের জল আর সামলাতে পারলো না ও। দেখলাম, নিঃশব্দে কাঁদছে ও, চোখের জল ছাপিয়ে অশ্রুর বাদল নেমেছে।

'ছিঃ কাঁদে না প্যাট, এভাবে কাঁদলে তোমার অসুখ যে আরো বেড়ে যাবে!'

'আমার সুখের অন্ত নেই', অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললো ও, 'এ আমার সুখের কান্না।'

সুখের কান্না? কিন্তু এমন করে ও কথাটা আগে কখনো বলতে শুনিনি ওকে। এর আগেও আমি অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু তারা তো আমার জীবনে ক্ষণিকের অতিথির মতো। একটু আমোদ আহ্লাদ, মুহূর্তের উত্তেজনা, হয়তো জৈবিক সুখ তৃপ্তি পাওয়া, হয়তো কোনো এক নির্জন নিরালা সন্ধ্যায় এক বুক শূন্যতা থেকে মুক্তিলাভের সাময়িক চেষ্টা কিংবা ব্যর্থতার গ্লানি ভোলবার জন্য আকুলি বিকুলি। তবে এ কথাও সত্যি যে, এর বেশী আমি কিছু চাইওনি কখনো। কিন্তু আজই আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, একটি বিশেষ মেয়ের কাছে আমার একটা আলাদা মূল্য আছে। আর আমি আছি বলেই ওর জীবনে সুখ আছে, বেঁচে থাকার অর্থ আছে। আমার সান্নিধ্যে এলে, আমার স্পর্শ পেলে আনন্দ পায় ও। এতো কেবল প্রেম নয়, যেন তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশী কিছু। শুধু অনাবিল প্রেম নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, রক্ত মাংসের একান্ত অতি আপনজনকে নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

আজ অনেক কথাই ওকে বলার ছিলো, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এমনি হয় বোধহয়। যখন বলবার কিছু থাকে তখন বলার জন্য একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি বা মনে পড়ে, কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। আদিকালের ভাষায় সে সব কথা প্রকাশ পেতো। এ যুগের মনের কথা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা এখনো তৈরী হয়নি। খুব প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আমরা মুখ খুলতে পারি না। আর খুললেই বা কি, আজকের যুগে সব কথাই তো আমাদের মুখে মিথ্যে শোনায়।

বললাম, 'এতো সাহস তুমি পেলে কোত্থেকে প্যাট?' ঠিক এই সময়ে জাফে এসে ঘরে ঢুকলেন। দেখা মাত্র ব্যাপারটা তিনি আন্দাজ করে নিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি কি রকম মানুষ মশাই? এমনি একটা কিছু আন্দাজ আমি করেছিলাম।

লজ্জায় মুখ নিচু করে কি যেন আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে এক রকম জোর করেই তিনি আমাকে ঘর থেকে বিদায় করে দিলেন।

সাত দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে প্যাট। ওকে নিয়ে বাড়ি ফেরবার

কথা ভেবে রেখেছি। এখন গটফ্রিড লেনতসের অপেক্ষায়। গাড়িটা নিয়ে যাবে ও। আমি আর প্যাট ট্রেনে যাবো।

দিনটা বেশ গরম। মধ্যাহ্নভোজের পর গটফ্রিড এলো, সঙ্গে জাপ। ওকে তো প্রথমে চিনতেই পারিনি—রীতিমতো মোটররেসওয়ালার মতো চেহারা, মাথার বিরাট চেকের টুপি, চোখে গগলস, পরণে ঢিলেঢালা জামা। ওর লাল কান দুটি দুদিকে খাড়া হয়ে আছে। লেনতস আমার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে বললো, 'ওকে রেসিং-এর এ বি সি ডি শেখাচ্ছি। কুসকাণ্ট্রি টুর করার সুযোগ পেয়ে আমার সঙ্গে চলে এসেছে ও।

'দেখবেন হের লোকাম্প, একদিন রেসে আমি ঠিক রেকর্ড করবো।'

হাসলো গটফ্রিড। 'হ্যাঁ, দেখো ওর রেকর্ড করবার বহরটা। যা দস্যি ছেলে।' বললো লেনতস, 'জানো, ও কি করেছে? প্রথম দিন সবে ওকে একটু গাড়ি চালানো শিখিয়েছি, আমাদের ওই পুরনো ট্যাক্সিটা নিয়ে একটা মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার তালে ছিলো? সে কি দস্যিপানা বলো?'

নিজের প্রশংসা শুনে জাপ খুশিতে ডগমগ। লেনতস-এর উদ্দেশ্যে ও বললো, 'আর একটু হলেই খেলা দেখিয়ে দিতাম মার্সিডিজ-এর চালককে। বাঁক ঘুরবার ক্ষেত্রেও হের কোষ্টারের মতো ওকে টেক্কা দিতাম।'

ওর কথা শুনে হেসে বললাম, 'তুমি দেখছি এখনি দারুণ ওস্তাদ হয়ে উঠেছো।'

এবার গটফ্রিড ওর ভালো ছাত্রটির উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'যাও, ভেতরে গিয়ে মালপত্তরগুলো নিয়ে ষ্টেশনে চলে যাও।'

ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। মিনিট পনেরো পরে গাড়ি ছাড়বার কথা। লেনতসকে আমি বললাম, 'এবার তোমরা রওনা হয়ে যাও, তা না হলে ঠিক সময়ে পেঁছিতে পারবে না।'

স্টিয়ারিং এ বসে আছে জাপ। আমার কথার জবাবে লেনতস বললো, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক। ওখানে ফিরে আবার দেখা হবে বব।' তারপর প্যাটের দিকে ফিরে ও বললো, 'চলি তাহলে প্যাট, সাবধানে যেও।' গাড়িতে উঠে বসলো লেনতস। জাপ এর দিকে ফিরে বললে, 'ওহে হবু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান, গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভদ্রমহিলাকে তোমার কেরামতিটা একবার দেখিয়ে দাও তো!'

বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলো জাপ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেলো।

ট্রেন আসতেই আমরা একটা কামরায় উঠে বসলাম। বলতে গেলে একরকম খালি কামরা ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াতে ছড়াতে ট্রেন ছেড়ে দিলো এক সময়। এক পাশে অন্তহীন সমুদ্র, আর এক পাশে গ্রাম্য ঘর বাড়ি। তারই মাঝে ফ্রাউলিন

মুলারের বাড়িটা দেখা যায়। প্যাট জানালা পথে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। হঠাৎ ও বলে উঠলো, 'ওই তো ফ্রাউলিন মুলার।'

'হ্যাঁ, তাই তো। ওই তো উনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন।' ওর দেখাদেখি প্যাটও জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রুমাল ওড়াতে থাকলো। একটু পরে ফ্রাউলিনের বাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই জানালাটা বন্ধ করে প্যাট-এর পাশে এসে বসলাম। এখন মনটা অনেকটা সুস্থির। এ যাত্রায় প্যাট-এর ফাঁড়াটা কোনো রকমে কেটে গেছে। এখন সব কিছুই যেন স্বপ্নের মতো লাগছে। হ্যাঁ, স্বপ্নই তো বটে, তবে সেটা সুখের নয়, দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কি হতে পারে!

সন্ধ্যার একটু আগে ঠিক ছ'টার সময় আমরা এসে পেঁছিলাম। প্যাটকে বাড়িতে পেঁছে দিতে গেলে ও জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ঘরে আসবে না?'

'হ্যাঁ, আসবো বৈকি!' জিনিষপত্তর নিয়ে আসার জন্য আবার নিচে নেমে এলাম। একটু পরে ওকে সঙ্গে করে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তখনো আঁধার নামেনি, সবে একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে। টেবিলের উপরে একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ রাখা ছিলো। প্যাট জানালার সামনে থেকে ফিরে এসে দাঁড়াতেই আমি বললাম, 'দেখেছ, এই গোলাপগুলো কোষ্টারের তরফ থেকে উপহার। এই দেখো, ফুলদানির পাশেই ওর কার্ড রয়েছে।'

কার্ড'টা হাতে নিয়ে ও আবার টেবিলের উপরেই রেখে দিলো। ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, তবে ওদিকে যে ওর মন নেই সেটা বেশ বোঝা যায়। ও তখন ভাবছিল কতকাল যে ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হবে কে জানে। ভাবুক ও, ওর ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটালাম না। অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলে হয়তো ওর এখনকার চিন্তা-ক্লিষ্ট মনটাকে ঘোরানো যেতো, কিন্তু কি লাভ তাতে? এক সময় ওকে যখন ভাবতেই হবে, তখন এখুনি ভাবুক না কেন। দু'দিন আগে আর পরে, ঘুরে ফিরে ভাবনাটাতো উদয় হতোই ওর মনে। আর যতো বেশী দেরী হবে ততোই কঠিন হয়ে উঠবে সেই ভাবনাটা উপলব্ধি করতে গিয়ে। এক সময় ও আমার দিকে তাকালো, কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। আর ও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলো।

'তুমি কি কিছু বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

জবাব দিলো না ও। নীরবে আমার কাঁধের উপরে ঝুঁকে পড়লো ও। দু'হাত বাড়িয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'তোমার ভাবনা কিসের প্যাট? আমরা তো সবাই রয়েছি।'

'না বব, আমি কিছুই ভাবছি না। মুহূর্তে'র জন্য কথাটা একবার মনে এসেছিল, তাই আর কি!'

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। আর পারো তো ঘুমবার চেষ্টা করো। ঘণ্টা দুই পরে নৈশভোজের সময় হলে তোমাকে নিয়ে যাবোখন।'

আমার দিকে ভালো করে তাকালো এই প্রথম। 'তোমাকেও তো খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তোমারও বিশ্রাম নেওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, একটু ক্লান্ত বোধ করছি বটে, তবে ও কিছু নয়', ওকে আমার জন্য কোনো চিন্তায় ফেলতে চাইলাম না। একটা মিথ্যে অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করলাম, 'ট্রেন জার্নি'র ধকল, তার উপরে ট্রেনে বড্ড গরম লেগেছিলো। এর পর আমার একবার কারখানায় না গেলেই নয়। দেখি গিয়ে লেনতসরা ফিরলো কিনা!'

ও আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ক্লান্তি ওর শরীরটাকে অবশ করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে। শোয়ামাত্র রাজ্যের ঘুম এসে ওর চোখ দুটি বন্ধ করে দিলো। গোলাপ ফুলগুলো টেবিল থেকে এনে ওর মাথার কাছে রেখে দিলাম, সেই সঙ্গে কোষ্টারের কার্ড'টাও। ঘুম ভাঙতেই যেন ভাববার মতো একটা কিছু হাতের কাছে পায় ও এই ভেবেই ঐরকম একটা ব্যবস্থা নেওয়া। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে নিঃশব্দে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে প্রফেসর জাফেকে ফোন করলাম। তিনি তার ক্লিনিকেই ছিলেন। বললাম, 'আমি লোকাম্প কথা বলছি। ঘণ্টাখানেক আগে আমরা ফিরে এসেছি।'

'কেমন বোধ করছে প্যাট?' জিজ্ঞেস করলেন জাফে।

'বেশ ভালোই।'

'আগামী কাল একবার ফ্রাউলিন হোলম্যানকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এগারোটা নাগাদ। খবরটা জানিয়ে দেবেন ওঁকে।'

'না, আমি বলতে পারবো না', আমি বললাম, 'আমি যে আপনাকে ফোন করেছি সে কথা ওঁকে জানাতে চাই না। ও নিজেই নিশ্চয়ই কাল আপনাকে ফোন করবে। বরং তখন আপনি নিজেই ওকে জানিয়ে দেবেন।'

'বেশ তাই হবে। আমিই ওঁকে বলে দেবোখন।'

'আচ্ছা, এর মধ্যে কিছু করবার আছে?'

'কাল ওঁকে দেখে বলবোখন। ওখানে ওর দেখাশোনার কোন ত্রুটি হবে না তো?' জিজ্ঞেস করলেন জাফে।

'তা তো জানি না। তবে শুনলাম, ওখানে যারা ছিলেন, আসছে সপ্তাহে চলে যাচ্ছেন। তখন ও একেবারে একা হয়ে যাবে, কেবল ওর পরিচারিকা ছাড়া।'

'তাই কি? ঠিক আছে, কাল এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'আচ্ছা, হঠাৎ আবার ওর রক্তবমি-টমি হবে না তো?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জাফে আবার বললেন, 'হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে এই মুহূর্তে তার সম্ভাবনা নেই। যাইহোক, পরে ফোন করে বলবো।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাস্তায় এসে খানিকটা সময় দাঁড়ালাম। তারপর আমার বাড়ির দিকে ফিরে চললাম ধীরে ধীরে। দরজার মুখে ঢুকতে গিয়ে আর একটু হলেই ফ্রাউলিন জালেওয়াস্কির সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। ফ্রাউ ব্রেন্ডারের ঘর থেকে কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে এলেন তিনি। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'সেকি এরই মধ্যে ফিরে এলেন?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। তা এদিককার খবর কি?'

'খবর তো একটাই, ফ্রাউ ব্রেন্ডার এখান থেকে আস্তানা গুটিয়ে চলে গেছেন।'

'কিন্তু কেন উনি চলে গেলেন বলুন তো?'

কোমরে দু'হাত রেখে ফ্রাউ জালেওয়াস্কি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'কেন আবার? আজকের দুনিয়াটা হচ্ছে জোচ্চোরদের লীলাক্ষেত্র। বেচারী খৃশ্চিয়ান হোমে চলে গেছে। সঙ্গে ওর পোষা বেড়ালটা আর মাত্র ছাব্বিশটি মার্ক নিয়ে গেছে। ওখানকার কর্মকর্তা এক পাদ্রীসাহেব শুনেছি স্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলে প্রচুর টাকা লোকসান দেন। মাঝখান থেকে বেচারী ফ্রাউ ব্রেন্ডারের চাকরীটা চলে যায়। অবশ্য আমি ওকে এখানে থেকে যাওয়ার কথাই বলেছিলাম। আমার টাকার তাগিদ নেই। কিন্তু ও আমার প্রস্তাবে রাজী হলো না।'

'গরীবরা টাকার ব্যাপারে খুবই সৎ। কখনো ঝামেলা পাকায় না', আমি বললাম, 'তা ওর ঘরে এখন কে যাচ্ছে? নাকি নতুন কেউ—'

'হেসিরা যাচ্ছে। ওরা এখন যে ঘরে থাকে তার চাইতে এটার ভাড়া একটু কম কিনা, তাই—'

'বেশ তো। তা হেসিদের ঘর কি হবে?'

'আপাতত কাউকে তো পাচ্ছি না', হতাশ সুরে বৃদ্ধা বললেন, 'নতুন কোনো ভাড়াটে পাওয়ার তো আশা দেখছি না এখন।'

'তা ও ঘরটার ভাড়া কতো?' হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেলো।

'সত্তর মার্ক।'

'কিন্তু অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে না?'

'সেকি! সকালে কফি, পুরু মাখন মাখানো দু'পিস রুটি সমেত এ আর এমন কি বেশী হলো?'

'তা তো বুঝলাম, তবে ওই কফির দামটা একটু কমাতে হবে। তার মানে সর্ব মোট পঞ্চাশ মার্ক, এর থেকে বেশী হতে পারে না।'

'কেন, আপনি কি ওই ঘরটা ভাড়া নিতে চান নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাবছি নেবো।' এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম অতঃপর। হেসিদের

আর আমার ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। সেই দরজার দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই মনে হলো। শেষ পর্যন্ত প্যাটকে জালেওয়াস্কির আস্তানায় এনে তুলবো? ব্যাপারটা খুব একটা প্রীতিকর হবে বলে আমার মনে হলো না।

আমার চোখের সামনে হেসিরা ঘর খালি করে চলে গেলো। এবার ঘরটা ভালো করে দেখা যেতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, প্যাট যদি এখানে আসে কেমন করে ওর ঘরটা সাজাবো, কোথায় কি আসবাব পত্তর রাখবো, এসব নিয়ে নানান জল্পনা কল্পনা করতে থাকলাম। তবে বেশীক্ষণ ভাবতে পারলাম না। প্যাট এখানে আসবে, আমার কাছে কাছে থাকবে, সারাক্ষণ ওকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাবো, একথা যেন ভাবাই যায় না। ও যদি সুস্থ থাকতো, ওকে এখানে নিয়ে আসার কথা ভাবতেই হতো না। যাইহোক একবার দরজাটা খুলে বারান্দাটা পা ফেলে ফেলে মেপে নিলাম। একটু পরে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

প্যাট-এর কাছে এসে দেখি, ও ঘুমচ্ছে তখনো। নিঃসাড়ে আরাম কেদারাটা টেনে এনে নিঃশব্দে ওর বিছানার পাশে বসলাম। কিন্তু তখনি ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ও জিজ্ঞেস করলো, 'সেকি! তুমি কি তখন থেকেই আমার কাছে বসে আছো নাকি?'

'না না, এই তো এলাম।'

একটু সরে এসে ও ওর মুখখানা আমার হাতের উপর রেখে যেমনি শুয়ে রইলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আরো একটু ঘুমোও না।'

'না, অনেক ঘুমিয়েছি। এবার উঠবো।'

আমি এবার পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম ওর পোশাক বদল করার জন্য। একটু পরেই প্যাট এসে ঘরে ঢুকলো। ওকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!' যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি ফুল। অবাক চোখে তাকিয়ে বললাম, 'আজ তোমাকে কতোই না সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, একটা গাঢ় ঘুমের পর আমার শরীরের এমনি দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা বিশ্বাস করা যায় না।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। এ যেন অতি দ্রুত পরিবর্তন!'

'তা খুব দ্রুত নাকি ববি?' আমার কাঁধে মুখ রেখে হাসলো ও।

'না, তা কেন? সব সময় আমার বুঝতে একটু দেরী হয় কিনা, তাই দ্রুত বলে মনে হচ্ছে।'

'যা ধীর স্থির মস্তিষ্কে বোঝা যায়, সেটাই তো আসল উপলব্ধি!'

'দেখো, সব ব্যাপারেই আমি সহজ ভাবে আর সোজাসুজি বুঝে নিই।'

'কিন্তু তুমি যাই বলো না কেন', মাথা নেড়ে ও বললো, 'আসলে বোঝবার সময়

ঠিক বোঝো।' নিজের সম্পর্কে সব সময় তোমার একটা ভুল ধারণা থাকে। নিজেকে কেউ যে অমন ভুল বুঝতে পারে আমার জানা ছিলো না।'

ওর কাঁধ থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিতেই ও বলে উঠলো, 'কি আমার কথা-গুলো সত্যি নয়? সে যাইহোক, চলো এখন কোথাও গিয়ে খেয়ে আসা যাক।'

আমরা আলফান্স-এর রেস্তোরাঁতেই গেলাম। আলফান্স ছুটে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালো আমাদের। টেবিলের উপরে হাতের ভর দিয়ে প্যাট বললো, 'আজ তোমাদের রেস্তোরাঁয় ভালো কি খাবার হয়েছে বলো?'

'আপনাদের ভাগ্য খুব ভালো', আলফান্স তার ছোট ছোট চোখ দু'টি আরো ছোট করে বললো, 'আজ কাঁকড়ার মাংস রান্না হয়েছে।' শুনে আমাদের মনের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য এক পা পিছিয়ে গেলো সে। ফিসফিসিয়ে বললো, 'আর সেই সঙ্গে এক গ্লাস করে নতুন মোজেল পানীয় দেবো।' আবার এক পা পেছন ফেরা। আর ঠিক সেই সময় প্রবেশপথের দিক থেকে জোরে জোরে করতালির শব্দ ভেসে এলো। ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি একমাথা এলোমেলো হলুদ চুল আর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গটফ্রিড।

তাকে দেখে আলফান্স চিৎকার করে উঠলো, 'আরে এসো এসো গটফ্রিড। আজ আমার কি সৌভাগ্য! এসো, তোমাকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরি।'

প্যাটকে বললাম, 'এবার দেখবার মতো একটা দৃশ্য দেখে নাও।'

দুজন দু'দিক থেকে ছুটে গিয়ে এ ওকে জড়িয়ে ধরলো। ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে ওয়েটারকে ডেকে আলফান্স বললো, 'হ্যান্স, নেপোলিয়ন নিয়ে এসো।' তারপর গটফ্রিডকে বার-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বসালো। একটা বিরাট বোতল নিয়ে এলো ওয়েটার। দু'টো গ্লাসে মদ ঢেলে একটা লেনতসকে দিয়ে অপর গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বললো সে, 'হতভাগা গটফ্রিড দীর্ঘজীবী হোক।

গটফ্রিডও চুপ করে থাকলো না! সেও তার কথার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠলো, 'চোর জোচ্চোর আলফান্সটা বেঁচে থাক।'

এক ঢোকেই দুটি গ্লাস নিঃশেষ। 'অপূর্ব'!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো গটফ্রিড। 'সত্যিই জিনিষটা অপূর্ব', 'তার কথায় সায় দিয়ে আলফান্স বললো, 'তাহলে আর এক গ্লাস হয়ে যাক, কি বলো ভায়া?' দ্বিতীয় গ্লাস ফুরোতে না ফুরতেই আলফান্স আবার বললো, 'কি ভায়া আর এক গ্লাস চলবে?'

লেনতস ওর গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, চলুক না কেন, যতক্ষণ না পুরোপুরি মাতাল হয়ে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছি ততক্ষণ কোনিয়াকে অরুচি নেই। এ যেন অমৃত।'

'এই তো মাতালের মতো কথা।' এই বলে তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালতে থাকলো

আলফান্স।

তৃতীয় গ্লাস শেষ করবার পর আমাদের টেবিলের সামনে এসে বসলো লেনতস। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল ও তখন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও বললো, গাড়ি নিয়ে ঠিক আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে কারখানায় এসে পেঁছিছি। এটা রেকর্ড নয় ?'

'হ্যাঁ রেকর্ডই বটে', প্যাট বলে উঠলে, 'বেঁচে থাক আমাদের জাপ। আমি ওকে এক বাক্স সিগারেট উপহার দেবো।'

গটফ্রিডের সঙ্গে সঙ্গে আলফান্সও আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বললো সে, 'আর তোমার পুরস্কার হিসেবে তুমি পাবে এক ডিস কাঁকড়ার মাংস।' তারপর সে আমাদের হাতে একটা করে টেবিলক্লথ ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'এবার কোট খুলে এটি ভালো করে জড়িয়ে নিন, মাংসের ঝোল পড়লেও আপনাদের কারোর পোশাকে লাগবে না। এই ভালো, কি বলেন ?' প্যাট-এর দিকে ফিরে বললো সে, 'আশাকরি আপনারও এতে আপত্তি থাকার কথা নয়।'

চলে আসার আগে আর এক রাউণ্ড নেপোলিয়ান ব্রাণ্ডি পান করে অবশেষে আলফান্স-এর কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। প্যাট তো খুবই খুশি। উচ্ছসিত গলায় ও বললো, 'আজকের ডিনারটা অপূর্ব, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ আলফান্স।' বলে তার দিকে হাত বাড়াতেই আলফান্স ওর নরম হাতখানি টেনে নিয়ে চুমু খেলো ওর সেই হাতের উপরে। সেই মনোরম দৃশ্যটা দেখে তো লেনতসের চক্ষু ছানাবড়া। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই আলফান্স বললো, 'যতো তাড়াতাড়ি পারেন আবার একদিন আসবেন আপনারা। আর বন্ধু, তুমিও এসো গটফ্রিড।'

বাইরে এসে দেখি, একটা ল্যাম্পপোষ্টের সামনে আমাদের সেই ক্ষুদে বাহন 'সিয়ত্র'টি দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে হঠাৎ প্যাট বলে উঠলো, 'আরে সেই গাড়িট দেখছি এখানে।'

গাড়ির দরজা খুলে গটফ্রিড গর্বের সঙ্গে বললো, 'আজ ওটা যে গতি দেখিয়েছে, তা দেখে আমি ওটার নতুন নামকরণ করেছি—'হারকিউলিস।' চলো, এবার তোমাদের বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি।'

প্যাটের বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামলো। প্যাট আগে গাড়ি থেকে নামলো, তারপর আমি। ও আমার হাতে হাত রেখে চলতে শুরু করলো। ওর চলার ভঙ্গিটা অতি মনোরম। আর ওর হাতের উষ্ণ স্পর্শ বেশ ভালো লাগছে। গ্যাস-লাইটের আলোয় ওকে এমন সজীব দেখায় যে, এখন ওকে অসুস্থ বলে মন আমার কিছুতেই মানতে চায় না যেন। দিনের আলোয় তবু অসুস্থ বলে একটু আধটু মনে হয়, কিন্তু এমন উষ্ণ মদির রাতে সেই কথাটা মনের কোণেও স্থান দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল

না আমার। ওর ঘরে এখন যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একবার আমার বাড়িতে যাবে এখন?' এক কথায় রাজী হয়ে গেলো প্যাট।

হোটেলের কাছে এসে আমাদের প্যাসেজের আলোটা জ্বলছে দেখলাম। বড় ঝামেলায় পড়া গেলো তো, নিজের মনে বললাম, এই আলোয় প্যাটকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে তুললে সবাই দেখতে পাবে, কানাকানি করতে শুরু করে দেবে। তাই ওকে বললাম, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি বরং ব্যাপারটা যে কি দেখে আসি। সেখানে গিয়ে দেখি, ফ্রাউ ব্রেন্ডারের ঘরটা খোলা, সেখানেও আলো জ্বলছে। হেসি একটা সিল্কের শেড দেওয়া টেবিলল্যাম্প হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোচ্ছিল তখন। তাকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা এতো দেরী কেন?'

'আর বলেন কেন মশাই। ঘণ্টা খানেকও হয়নি অফিস থেকে ফিরেই এ ঘর থেকে ও ঘরে জিনিষ পত্তর পাচার করছি। রাত ছাড়া আমার আর সময় কোথায় বলুন?'

'কেন, আপনার স্ত্রী ঘরে নেই?'

'না, উনি ওঁর এক পরিচিতা মেয়ের বাড়িতে গেছেন। বেঁচে গেছি, যাক, একটা বন্ধু অন্তত জোটাতে পেরেছেন। এখন বেশীর ভাগ সময় উনি তো ওঁর সেই বন্ধুর কাছেই পড়ে থাকেন।' কেমন নির্লিপ্ত ভাবে কথাগুলো বলে শ্লথ গতিতে এগিয়ে চললো আবার সে। সে চলে যেতেই প্যাটকে আমার ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আলো আর জ্বালিয়ে কি লাভ বলো?'

'না, অন্তত একবারটি জ্বালাও। একটু পরেই আবার না হয় নিবিয়ে দিও।'

'আঃ তোমার যেন কিছুতেই চাহিদা আর মেটে না', হেসে বললাম।

আলোর তীব্র রোশনাইতে ক্ষণিকের জন্য ওর সিল্কের পোশাক দারুণ ঝলমলিয়ে উঠলো। ওর অনুরোধ মতো একটু পরেই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

খোলা জানালা পথে রাস্তার ওপরের গাছগুলোর ভিতর দিয়ে শন্‌শন্‌ শব্দে বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। আর কি চমৎকার হাওয়া এখানে।' এই বলে জানালার সামনে প্যাট বসে পড়লো ওর দেহটা কুঁকড়ে।

'জায়গাটা তোমার এতোই ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, লাগে বৈকি!' ও বললো, 'গরমের দিনে খোলা মেলা পার্কে বসে থাকতে গিয়ে যেমন আরাম হয়, এখানেও ঠিক তেমনি একটা আমেজ যেন খুঁজে পাই আমি। আর কি সুন্দর পরিবেশ।'

'আমার পাশের ঘরের সামনে যে বারান্দাটা দেখছো, ওখানে বসে তুমি যদি গায়ে রোদ লাগাও, পারে কিছু টাকা দিতে হবে না।'

'হ্যাঁ, যদি থাকা যেতো—'

'তা ইচ্ছে করলে তুমি থাকতে পারো', ওর মন জানার জন্যে বললাম, 'দু-এক দিনের মধ্যে পাশের ঘরটা খালি হয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে ভালো দেখাবে?' আমার চোখে চোখ রেখে প্যাট বললো, 'সারাক্ষণ দুজনে একসাথে—'

'কেন, সারাক্ষণ থাকতে যাবো কেন? সারাটা দিনতো আমি বাইরে বাইরেই থাকি। আর মাঝে মধ্যে রাতেও বাড়ি ফেরা হয় না। তাছাড়া আমাদের একটা বাড়তি সুবিধা হলো, এক জায়গায় থাকলে রেস্তোরাঁয় আর যেতে হয় না আমাদের।'

জানালার সামনে একটু নড়ে চড়ে বসে প্যাট বললো, 'মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আগেই তুমি ভেবে রেখেছো?'

'হ্যাঁ, আজ সারাটা সন্ধ্যা তোমার কথাই ভেবেছি।'

'বব্বি, সত্যি সত্যি তুমি কি আমাকে তোমার কাছে আনতে চাইছো?'

'হ্যাঁ', বললাম, 'কেন, তুমি কি আমাকে দেখে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছো না?'

'আচ্ছা বব', গম্ভীর গলায় ও বললো, 'হঠাৎ আজই বা তোমার একথা কেন মনে হলো বলো তো?'

'কেন জানো?' ওর মতো আমার গলার স্বরও কেমন ভারি হয়ে উঠলো, এ যেন ছোঁয়াচে রোগ, নাকি ভালো লাগা, ভালোবাসার ভাবাবেগ প্রকাশের মাধ্যম এটা। আজই এ কথাটা ভাবার কারণ একটাই—গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দুজনে এক সঙ্গে থেকে বুঝেছি, একসঙ্গে থাকার মতো সুখ সংসারে আর কিছুই হতে পারে না। তাই এখন আর ছাড়াছাড়ি সইতে পারছি না আমি। তোমাকে আমি আরো বেশী করে পেতে চাই, আরো সম্পূর্ণ করে আমি তোমাকে পেতে চাই। ভালোবাসার এই লুকোচুরি খেলা আর ভালো লাগে না। অতিষ্ট হয়ে উঠছি আমি। আমি শুধু তোমাকেই চাই, আর কিছু নয়—শুধু তুমি আর আমি। একটা মুহূর্তও তোমাকে আর কাছ ছাড়া করতে মন চায় না আমার।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। তেমনি কুঁকড়ে বসে আছে ও জানালার কোণটিতে। বললাম, 'তুমি কি আমার কথা শুনে হাসছো?'

'কেন, হাসবো কেন?'

'এই যে বললাম, তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই, সেই জন্যে। চাওয়াটা তো আর এক তরফা হওয়া উচিত নয়। যেমন এক হাতে তালি বাজে না, তাই তোমাকেও তো চাইতে হবে।'

'এরই মধ্যে তুমি তোমার মত বদলে ফেললে?' বললো ও, 'তুমি যে আমাকে পেতে চাইছো, এটা কি ঠিক? আমার মতের তোয়াক্কা না করেই তুমি তোমার দাবীটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছো?'

'বেশ তো, তোমার মত না থাকলে আপত্তি জানাবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। আমার চাওয়া পাওয়াতে তো কারোর কিছু এসে যায় না।'

হঠাৎ ও কেমন যেন বদলে যায়। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বললো, 'আপত্তি করতে যাবো কেন বব? ওর গলায় আবেগের সুর কেঁপে ওঠে, 'তোমার মতো আমিও তো তোমাকে কাছে পেতে চাই।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর পশম নরম চুলের স্পর্শ আমার মুখে লাগতে একটা অদ্ভুত আবেশে আমার ঘুম পাওয়ার উপক্রম হলো। ততোধিক আবেগ-কম্পিত গলায় ওকে বললাম, 'তুমি আমাকে বাঁচালে প্যাট। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমাকে রাজী করানোর জন্যে কতো অনুরোধ উপরোধই না করতে হবে।'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো ও। 'এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই হবে', দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও বললো, 'এ একরকম ভালোই হলো, কিছু আর ভাবতে হবে না, আমাকে কিছুই আর করতে হবে না, তোমার উপরে সব ভার দিয়েই আমি কেমন নিশ্চিন্ত হতে পারবো, কি বলো? এর থেকে বেশী সুখ আর কি হতে পারে। এমন নিশ্চিন্ত জীবন আমার মতো আর কোন মেয়েরই বা হতে পারে!'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো প্যাট', ওর মতো মেয়ের মুখ থেকে যে এমন কথা শুনতে পাবো, বুঝতেই পারিনি। তাই খুশি হয়ে ওকে আশ্বস্ত করতে বললাম, 'এরকমই তো হওয়া উচিত মেয়েদের জীবন। চলো এবার তোমাকে তোমার বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে তার আগে আরো একটু শুয়ে নিয়ে ভাবতে চাই—এখন থেকে কি নিশ্চিন্ত জীবনই না হবে আমার!' এই বলে নীরবে বিছানায় ও ওর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলো। ঘুমোবার ভান করে শুয়ে আছে ও। আসলে ও কিন্তু ঘুমোয়নি, কারণ চোখ দু'টি ওর খোলা।

বললাম, 'আজ আমার এখানে থেকে গেলে হতো না?'

সঙ্গে সঙ্গে ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো, 'না, না আজ নয়। বরং কাল থেকে—'

ঘটনাটা অতি সামান্যই। তবু কেন জানি না ফেলে আসা দিনের একটা স্মৃতি হঠাৎ আজ কেমন অশ্রুসিক্ত হয়ে মনটাকে আমার ভিজিয়ে দিয়ে গেলো। বিছানা থেকে নেমে ও আমার কাছে এসে দু'হাতের চেটোয় ও আমার মুখটা তুলে ধরে আবেগের সুরে বলে উঠলো, 'আজ সব কিছুই যেন ভালো লাগছে। জীবন যে এতো মধুর হতে পারে, আজই এই প্রথম অনুভব করলাম বব। এই যে তোমাকে এতো কাছে পেয়েছি, জীবনে এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে বলো?'

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না, বোধহয় উত্তর দেবার মতো কিছু ছিলোও না আমার।

□ এগারো □

ট্যাক্সির ভিতরে গিয়ে গটফ্রিডের কাছ থেকে চাবি আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর নিয়ে নিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কেমন রোজগার হলো বন্ধু ?'

'বলার মতো তেমন কিছু নয়। আজকাল দেখছি রাস্তায় ট্যাক্সির মেলা বসে গেছে যেন, আর নয় তো যাত্রীর অভাব! তা কাল তোমার রোজগার কেমন হলো ?'

'খুব খারাপ। রাত ভোর ট্যাক্সি রাস্তায় বার করে কুড়ি মার্ক'ও রোজগার করতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ভায়া', ভুরু কুঁচকে ও জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি তাড়া আছে ?'

'না না, তাড়া আর কি ?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কেন বলো তো ?'

'তাহলে আমাকে একটু ক্যাথিড্রালের দিকে নিয়ে চলো।'

'কি বললে, ক্যাথিড্রালের দিকে ? আমি কি ভুল শুনলাম!'

'না, তুমি ঠিকই শুনেছো। আমি ক্যাথিড্রালেই যেতে বলেছি।'

আমার বিস্ময়ের ঘোরটা তখনো কাটেনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো ?' তাড়া দিলো গটফ্রিড, 'ট্যাক্সিতে স্টার্ট দাও!'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈকি।'

পুরনো শহরের একটা ফাঁকা জায়গায় ক্যাথিড্রাল। তার চারপাশেই পাদ্রি সাহেবদের ঘর বাড়ি। একটা ছোট গেটের কাছে এসে ট্যাক্সি থামাতে বললো গটফ্রিড। ওকে বললাম, 'মনে হচ্ছে, এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছো তুমি ?'

'এসোই না', ও বললো, 'যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে গেলেই সব বুঝতে পারবে।'

'না ভায়া, আজ নয়', আমি হেসে বললাম, 'আজ সকালেই একবার যিশুর নাম নিয়ে বেরিয়েছি, ওতেই সারাদিনের কাজ হয়ে যাবে।'

'সব কিছুতেই ইয়ার্কি' ভালো নয়। এসো একটা মজার জিনিষ দেখাবো।'

'মজার জিনিষ ?' কেমন কৌতূহল হলো। ট্যাক্সি থেকে নেমে ওকে অনুসরণ করলাম। গেট পেরিয়েই গির্জার চত্বরে ঢুকে পড়লাম। চারদিকে সারি সার গ্রানাইট

পাথরের থাম, তার উপরে পরপর কয়েকটি তোড়ন। মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা একটা বাগান। বাগানের ঠিক মাঝখানে যীশুর মূর্তি, সেই সঙ্গে বহু পুরাতন একটি ক্রস। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাগানটা এখন রীতিমতো জঙ্গলে পরিণত। তবে তারই মাঝে অজস্র ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম। সাদা আর লাল গোলাপের দুটি প্রকাণ্ড ঝোপ। সেদিকে তাকিয়ে গটফ্রিড বললো, 'ওই ঝোপ দুটি দেখানোর জন্যই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি। তা ওই ফুলগুলো ভালো করে দেখো তো চিনতে পারো কিনা!'

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি বৈকি। তার মানে এখান থেকেই তুমি ফুল চুরি করে নিয়ে যাও? শেষে ধর্মস্থানে চুরি!' মনে পড়লো, সপ্তাহ খানেক আগে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বোর্ডিং হাউসে প্যাট যেদিন উঠে এলো ওর পুরনো আস্তানা থেকে, সেদিন সন্ধ্যায় জাপ দু'হাত ভর্তি করে প্যাট-এর জন্য রাশি রাশি গোলাপফুল এনেছিল, সে সবই গটফ্রিডের পাঠানো উপহার। তখন বুঝতে পারিনি অতো ফুল ও কোত্থেকে পেলো, ও তো ফুল কেনবার পাত্র নয়! এখন বুঝতে পারছি সব, ফুলগুলো ছিলো এখানকার ওই বাগানের। মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই তারিফ করতে হয় তোমার, একটা খাসা জিনিষ আবিষ্কার করেছো বটে।'

'রীতিমতো একটা সোনার খনি বলতে পারো', লেনতস বললো, 'স্বেচ্ছায় এর অংশীদার করলাম তোমাকে। যখন খুশি ফুল তুলে নিয়ে যেতে পারো এখান থেকে।

'তা না হয় হলো, 'আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু বন্ধু, ধরা পড়লে পালাবার পথ তো নেই দেখছি। তার উপরে ধার্মিক লোকদের কাছে এ তো মহাপাপ।'

'বলিহারি তোমাকে', ধমকের সুরে বললো লেনতস, 'দেখছো না এখানে কাছে পিঠে জনপ্রাণী কোথাও নেই? তাছাড়া যুদ্ধের পর থেকে লোকে গির্জায় আসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বরং রাজনৈতিক মিটিং-এর সামিল হয়, কিন্তু গির্জায়? নৈব নৈব চ।'

'কিন্তু পাদ্রি সাহেবরা তো রয়েছেন? ওরা যদি—'

'আরে ছাড়ো! ফুলের উপরে পাদ্রিসাহেবদের কতো যে দরদ, তা আমার জানা আছে। ওঁদের দরদই যদি থাকতো, তাহলে বাগানের এমন দশা হতো?' লেনতস জ্ঞান দেয়, 'এই ফুল দিয়ে যদি তোমার অতি আপনজনকে খুশি করতে পারো, তাহলে বিধাতা পুরুষ খুশিই হবেন। এঁদের মতো নন ঈশ্বর! ওঁর রসজ্ঞান আছে। মনে হয় এক সময় উনি নিশ্চয়ই সৈনিক ছিলেন।'

'তা যা বলেছো ভায়া।' লেনতসের কথায় সায় দিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে আমারা চললাম। হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছি দেখে বললাম, শহরের মাঝখানে এখানে এতো মৌমাছি এলো কোত্থেকে বলো তো? কাছে পিঠে মৌচাকের চিহ্ন তো দেখতে

পাচ্ছি না।

'এখানে না থাকুক, শহরের বাইরে কোথাও আছে হয়তো।' বললো লেনতস, 'কেমন দেখলে তো, পোকা মাকর হয়েও ওরা ঠিক জায়গাটি চিনে রেখেছে, অথচ আমরা মানুষ হয়েও আসল জায়গাটা চিনতে পারিনি।'

'আর কেউ চিনতে না পারুক', ওর কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম, 'অন্তত একজন ঠিক চিনেছে, সে হচ্ছো তুমি, হ্যাঁ তুমিই বন্ধু।'

'না না, আমরা কিছুই চিনি না, চেনবার তাগিদও নেই। দিনকে দিন আমরা বড্ড বেশী বুর্জোয়া হয়ে পড়ছি।' বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর কেমন ভারি হয়ে উঠলো।

আমি তখন তন্ময় হয়ে ক্যাথাড্রিলটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেটার উপরে নীলাকাশ। স্তব্ধ মূর্তি'র মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। সোয়ালো পাখির ঝাঁক চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে চূড়ার চারপাশে। দৃশ্যটা অতি মনোরম। মুগ্ধ হয়ে বললাম, 'জায়গাটা কতো না নির্জন, নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।'

'হ্যাঁ, তাইতো এক এক সময় ভাবি', গম্ভীর স্বরে বললো লেনতস, 'এখানে এলে কি মনে হয় জানো? কেবল সময়ের অভাবে আমাদের ভালোমানুষ আর হওয়া গেলো না।'

'শুধু সময়ের অভাব বলছো কেন, নিস্তব্ধতার অভাবও বটে', আমি বললাম, 'মনে হয় নির্জনতারও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এ ব্যাপারে।'

আমার কথা শুনে হেসে ফেললো লেনতস। 'অনেক দেরীতে তোমার সুবুদ্ধি হলো দেখছি ভায়া', বললো লেনতস, 'না, এখন আর তা হয় না। এখন নির্জন জায়গায় এলে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন হৈ হট্টোগোলই ভালো লাগে আমাদের, চলো যাই সেখানে।'

প্যাট্রিসকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফিরে এলাম। এখানে আসার পথে ফ্রাউ হেসিকে সিল্কের পোশাকে আবৃতা হয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ভাবলাম, ওকে লিফট দিলে কেমন হয়? কিন্তু মোড়ের মাথায় এসে দেখি, পুরনো ঝরঝরে একটা মার্সিডিজ গাড়িতে উঠে বসলো। চালকের আসনে নানান রঙের চেক স্যুট পরা একটি লোক বসেছিল। আমি সেখানে পৌঁছনোর আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। ধাবমান গাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষন। মনে মনে ভাবলাম, যে নারী সারাটা দিন একা একা ঘরে বসে থাকে, নিঃসঙ্গতা কাটাতে শেষ পর্যন্ত তার এই পরিণামই হয়ে থাকে। এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছিলাম।

এক এক করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছে সওয়ারি নিয়ে। ওদিকে আমার

ট্যাক্সির হুড রোদে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্রমশই। কিছুই ভালো লাগছে না। বার বার ফ্রাউ হেসির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হেসির কথা ভাবতে গিয়ে আমার প্যাটের কথা মনে পড়ে গেলো। যদিও ওর অবস্থা ঠিক হেসির মতো নয়, তবু ওকেও তো সারাটা দিন একলা কাটাতে হয়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে গুস্তাভের ট্যাক্সির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনো ভূমিকা না করেই ওকে বললাম, 'তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম ওস্তাদ। এই ধরো যদি একটা মেয়েকে সারাটা দিন একা থাকতে হয়, তাহলে কিভাবে তার সেই নিঃসঙ্গতা কাটানো যায় বলো তো ?'

'ওহো, এটা কোন সমস্যাই নয়।' আমি যেন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করেছি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে গুস্তাভ বললো, 'আরে এটা কি কোনো সমস্যা হলো? কেন দোস্ত, হয় একটি সন্তান কিংবা একটি কুকুরের ব্যবস্থা করে দাও, তাহলেই দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

সন্তানের ব্যবস্থা ? মনে মনে হাসলাম। তবে হ্যাঁ, কুকুরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা তুমি ঠিকই বলেছো ভায়া। হ্যাঁ, বাড়িতে একটা কুকুর থাকলে সঙ্গীর অভাব হয় না।' ওকে একটা সিগারেট ঘুষ দিয়ে বললাম, 'তুমি তো অনেক খবর টবর রাখো, একটা মাংগ্রেল-এর কি খুব বেশী দাম পড়বে ?'

গুস্তাভের ঠোঁটে সবজান্তার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'দেখো রবার্ট, তোমার এই বন্ধুটিকে তুমি চিনতে পারলে না এখনো। জানো আমার ভাবী শ্বশুর ডবারম্যান টেরিয়ার ক্লাবের সহকারী সেক্রেটারী। দামের কথা বলছো, না, একটা পয়সাও তোমাকে দিতে হবে না। বিনা পয়সায় আমি তোমাকে ভালো জাতের একটা কুকুর পাইয়ে দিতে পারি। একেবারে কুলীনের বাচ্চা যাকে বলে।'

ভাগ্যবান পুরুষ এই গুস্তাভ। ওর ভাবী শ্বশুর কুকুরের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তো আছেই তার উপরে সে আবার একটি রেস্তোরাঁও চালায়। তাছাড়া ওর ভাবী স্ত্রীর একটা লন্ড্রীও আছে। গুস্তাভ বেশ মজার আছে। শ্বশুরের হোটেলে খাওয়া আর ভাবী স্ত্রীকে দিয়ে তার ময়লা পোশাক কাচিয়ে নেয়। কিন্তু বিয়ে করার তাগিদ নেই ওর। ওর বক্তব্য, 'বিয়ে করলেই তো ঝামেলা।'

সত্যি একটি রত্নই বটে গুস্তাভ। আমার পছন্দসই একটা কুকুর পাওয়া গেলো। ঠিক হলো, পরে এসে কুকুরটাকে নিয়ে যাবো। কারণ এখন ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়া খাটতে হবে। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গুস্তাভ বললো, 'যা জিনিস একটা বাগিয়েছি ভায়া, এ জিনিষ কচ্চিত মেলে। একেবারে খাঁটি আইরিশ টেরিয়ার, বংশ একেবারে প্রথম শ্রেণীর বলা যেতে পারে।'

'বন্ধু, তুমি আমার মস্ত বড় একটা উপকার করলে। এসো এক পাত্র পুরনো কোনিয়াক পান করা যাক।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আজ আর নয়', বললো গুস্তাভ, 'আজ রাতে আমার স্কিটল খেলা আছে, হাত কাঁপলে চলবে না। রাতে একবার সময় করে এসো আমার খেলা দেখে যেও। অনেক তাবর তাবর লোক আসবে, এমন কি পোষ্টমাষ্টারও আসবেন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো', আমি বললাম, 'তবে পোষ্টমাষ্টার আসুন আর নাই আসুন।'

ছ'টার একটু আগে কারখানায় ফিরে আসতেই কোষ্টার বললো, 'বিকেলে ফোন করেছিলেন প্রফেসর জাফে। বলেছেন তুমি ফিরে এলে ও'কে ফোন করতে।'

দ্রুত অফিসে ছুটে গেলাম। তবে ফোনে জাফেকে পেতে একটু দেরী হয়ে গেলো। তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনার হাতে কি এখন কোনো কাজ টাজ আছে?'

'না।'

'বেশ, এখনি চলে আসুন। এখানে আমি আর মাত্র ঘণ্টাখানেক আছি, এরই মধ্যে আপনি চলে আসুন।'

প্যাট-এর বাড়াবাড়ি হলো কিনা, জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। শুধু বললাম, 'ঠিক আছে, মিনিট দশেকের মধ্যে আপনার ওখানে যাচ্ছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে এবার প্যাটকে ফোন করলাম। প্যাট ঘরে ছিলো না। পরিচারিকা ফ্রিডা তিরিক্ষে গলায় বললো, 'জানি না উনি ঘরে আছেন কিনা, তবে খুঁজে দেখছি, ধরুন।' প্যাট-এর আসতে দেরী হচ্ছে। সময় যেন আর কাটছে না। মাথাটা গরম হয়ে উঠছে। ওই, হ্যাঁ, ওই তো প্যাট-এর গলার স্বর ভেসে আসছে দূরভাবে—'বব্বি—'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, 'প্যাট, তুমি ভালো আছো তো?'

'কেন, বেশ ভালোই তো আছি। বই পড়ছিলাম। দারুণ মজার বই।;

'মজার বই? ভালো', বললাম ওকে, 'ফিরতে একটু দেরী হবে। তুমি ততক্ষণে বইটা শেষ করে ফেলো, কেমন?' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

অটো এসে দাঁড়িয়েছিল অফিসঘরে। ওকে বললাম, 'কিছু সময়ের জন্য কার্ল'কে পাবো?'

'দরকার হলে আমি তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসতে পারি। আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই।'

'না, তার প্রয়োজন নেই। বাড়িতেও ফোন করে দিয়েছি।' বললাম আমি।

গ্যারাজ থেকে কার্ল'কে বার করে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। সন্ধ্যার আলো এসে পড়েছিল রাস্তায়, বাড়ির ছাদে, অলিন্দে। আঃ, কি অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। জীবন কি অপূর্ব সুন্দর, এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম।

জাফের জন্য একটু সময় অপেক্ষা করতে হলো, একজন সিরিয়াস রোগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এক সময় জাফে তার চেম্বারে এসে বললেন, 'মনে আছে আপনার হের লোকাম্প, আমি আপনাকে বলেছিলাম, পরে এক সময় ফ্রাউলিন হোলম্যানের কেসটা আপনাকে বুঝিয়ে বলবো।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ, বছর দুই আগে উনি মাস ছয়েক একটা স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন। আপনি কি জানেন সে খবর?'

'কই না তো।'

'তখন ওর শরীর বেশ সেরে উঠেছিল। এখানে এসে ওঁর শরীর আবার খারাপ হয়ে উঠেছে। এই শহরে ওঁকে আর রাখা যাবে না। শীতের সময় ওঁকে আবার স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'তা কখন যেতে হবে?'

'ধরুন এই অক্টোবরের শেষের দিকে।'

'তাহলে সেদিনের রক্তবমিটা হঠাৎ কিছু নয়?'

'না।' সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'দেখুন, ওঁর দুটো ফুসফুসেই গোলমাল রয়েছে। বাঁ দিকটায় খুব বেশী রকমের, আর ডানদিকে একটু কম।' তারপর উনি একটা খাম থেকে প্যাট-এর বুকের এক্সরে রিপোর্ট দেখিয়ে ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি আমাকে। এবার বুঝলেন তো?'

'হ্যাঁ', বললাম, 'আমি ভাবছি—'

'দেখুন, এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাবেন না।'

'না, ঘামাইনি তো? তবে কি জানেন, ব্যাপারটা আমার কাছে বড় মর্মান্তিক। সংসারে সবাই কেমন সুস্থ সবল ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যতো গোলমাল কেবল ওর বেলায়?'

একটু সময় কি ভেবে জাফে বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, 'তা কেন পারবে? মানুষের দুঃখ দুর্দশা, মৃত্যুর কারণ কেউ বলতে পারে না। বোধকরি মৃত্যুকে ঠেকানোর শক্তি কারোর নেই।' অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন জাফে। অনুশোচনা হলো, হয়তো আমার সব অভিযোগই মিথ্যে, এই ভেবে বললাম, 'আমাকে মাফ করবেন। দুঃখে কষ্টে এক এক সময় আমি আমার অশান্ত মনটাকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারি না, সেটাই হচ্ছে বড় মুশকিল।' তেমনি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জাফে বললেন, 'এখন আপনার হাতে কোন কাজ টাজ নেই, তাই তো বললেন, বললেন না?'

'হ্যাঁ, কোনো কাজ টাজ নেই আমার হাতে এখন।'

'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে', উঠে দাঁড়িয়ে জাফে বললেন, 'আমার রোগীদের দেখলেই আপনার ধারণা হবে দুঃখ কষ্ট, রোগ-জীবন-মৃত্যুর উপরে মানুষের কেন যে হাত নেই—' তারপর তিনি আরো বললেন, 'তবে রোগীদের কাছে যাওয়ার আগে গায়ে আপনার একটা ওভারঅল পরে নিতে হবে। সেটা দেখে রোগীরা ধরে নেবে যে, আপনি আমার একজন সহকারী।' ওঁর উদ্দেশ্য বোধগম্য না হলেও যন্ত্র-চালিতের মতো নার্স-এর দেওয়া ওভারঅলটা গায়ে পরে নিলাম চট্‌পট্‌।

লম্বা করিডোর। জানালা পথে সন্ধ্যার লালচে মৃদু অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছিল সেখানে। জাফে একটা ঘরের দরজা খুলতেই একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগলো আমার। একটি স্ত্রীলোকের অত্যন্ত শীর্ণ একটি হাত উপরের দিকে তুলতে দেখলাম। কপালে সম্ভ্রান্ত মহিলার ছাপ, কিন্তু চোখের নীচে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো। সারা মুখ ঢাকা ব্যাণ্ডেজে। তার মুখের উপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা ধীরে ধীরে খুলে দিলেন জাফে। আর তারপরেই চোখে পড়লো মেয়েটির নাক নেই। নাকের জায়গায় দগদগে ঘা আর দুটি ছিদ্র ছিলো। ব্যাণ্ডেজটা ফিরে আবার বেঁধে দিয়ে জাফে বললেন, 'ঠিক আছে।' দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন তিনি। আগেই আমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে একটু আগে দেখা সেই রোগিনীর অবস্থার কথা ভাবছিলাম। সম্বিৎ ফিরে পেলাম জাফের ডাকে।

'আসুন হের লোকাম্প!' এই বলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

ঘরের ভেতরে কে যেন অনবরত কাশছিল, সেই সঙ্গে ভুল বকে যাচ্ছিলো সে। একজন পুরুষ সে—ফ্যাকাশে মুখ, মুখ ভর্তি লাল দাগ। হাঁ হয়ে আছে তার মুখ, চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। একেবারে বেহুঁস রোগী, জ্বর ১০৪ ডিগ্রী। রোগীর চার্টের দিকে তাকিয়ে জাফে বললেন, 'ডবল নিমোনিয়া আর প্লুরিসি। গত পনেরোদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে যাচ্ছে সে।' এটা তার দ্বিতীয় অসুখ। প্রায় সারার মুখে ছিলো সে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে না হতেই কাজে যোগ দেয় সে অর্থের তাড়নায়। সংসারে তার স্ত্রী, চার চারটে বাচ্চা, অনেক খরচা। কিন্তু এখন যে অবস্থা, সারবার আর কোনো লক্ষণ নেই।' ডাক্তার তার নাড়ী টিপে ভুরু কুঁচকে নার্স-এর দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাকে আজ সারা রাত এর উপরে নজর রাখতে হবে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, সন্ধ্যার সেই লাল আভাটা আরো ঘনিভূত হয়ে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি সব আজে বাজে আলো!'

'কেন, কেন এ কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন জাফে।

'এ দুইয়ের মিলটা দেখতে পাচ্ছেন কোথাও? ভেতরে ওই দৃশ্য, আর বাইরে এই রকম আলো—'

'কেন, এই তো বেশ, ভালোই তো খাপ খেয়ে গেছে', বললেন জাফে।

তারপরের ঘরটি একটি মেয়ে রোগিনীর। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলছে ও। মেয়েটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। গতকাল ওর স্বামী এক দুর্ঘটনায় মারা যায়।'

'মেয়েটির কতোই বা বয়স ?' জিজ্ঞেস করলাম, 'সেরে উঠবে তো ?'

'সেই সম্ভাবনাই তো আশা করছি।'

'কিন্তু সেরেই বা কি লাভ ?'

'গত বছরে ঠিক এ রকমেরই পাঁচটা কেস পাই। তার মধ্যে মাত্র একজনই সেরে উঠে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, আর সেইবার তাকে বাঁচানো যায়নি। বাকি চারজনের মধ্যে দুজন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ঘর সংসার করছে এখন।'

একটার পর একটা রোগী দেখে চললাম। একটি কমবয়সী মেয়ের চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, ফ্যাকাশে মুখ। সদ্য সন্তান প্রসবে শরীর তার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। পঙ্গু সন্তানটি তার পাশেই ছিলো, বাঁকা শীর্ণ পা দুটি। আর একটি রোগী, তার পেটে নাড়িভুঁড়ি বলতে আর কিছু নেই। আর এক দিকে এক বৃদ্ধা সারাক্ষণ কেঁদেই চলেছে, তার অনুযোগ, আত্মীয়স্বজন কেউ তার খোঁজ নিতে আসে না। বৃদ্ধা মরেও মরছে না। একটা অন্ধ রোগীর ধারনা, সে তার চোখের দৃষ্টি আবার ফিরে পাবে। সিফিলিসে আক্রান্ত একটি শিশু। একটি যুবতী মেয়ের একটি স্তন আজই কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে—ক্যান্সারের রোগিনী সে। কাতরানি আর গোঙানি—ঘরে ঘরে শুধু একই দৃশ্য, প্রত্যেকের মুখে আতঙ্ক আর নৈরাশ্যের ছাপ। অথচ ঘর থেকে বেরলেই বাইরে বারান্দায় গোধূলির সেই লাল আভাটা চোখে পড়ে। ঘরে ঘরে বিভীষিকা আর বাইরে কেমন আলোর রোশনাই। কেন এই পার্থক্য ? বোঝা মুশকিল, এটা বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস নাকি তাঁর প্রসন্ন মুখের সান্ত্বনা।

ক্লান্ত জাফে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'জানি না আপনাকে এমন সব করুণ দৃশ্য দেখিয়ে ঠিক করলাম কিনা। তবে এও ঠিক যে, এ সব না দেখালে আপনাকে বোঝানো কষ্টকর হতো। আপনার বিশ্বাসই হতো না। এসব দেখে শুনে এখন বুঝতে পারছেন তো এর সবাই আপনার প্যাট-এর চাইতে অনেক বেশী অসুস্থ ? মনে মনে অবিশ্বাস্য আশা পোষণ করা ছাড়া এদের আর কোনো ভরসা নেই। কিন্তু আবার দেখবেন, এদের মধ্যে অনেকেই দিব্বি সেরে উঠেছে একদিন। আর এই কথাটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছি। এবার বুঝলেন তো ?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম', মাথা নেড়ে জাফের কথায় সায় দিলাম।

'এবার আমার একান্ত নিজের দুখের কথা আপনাকে বলি শুনুন—ন'বছর আগে আমার স্ত্রী মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা যান। একেবারে নিরোগ ছিলো ও, সুন্দর স্বাস্থ্য, একদিনের জন্যও অসুখ কখনো করেনি ওর। কিন্তু সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জায়

মারা গেলো ও।' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আপনাকে ওর কথা কেন যে বললাম, বুঝলেন তো?'

এবারেও মাথা নেড়ে সায় দিলাম ওঁর কথায়।

'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। যার সেরে ওঠবার কোনো আশা থাকে না, সেও কেমন সেরে ওঠে। আবার দেখুন, সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ হঠাৎ মারা যায়। এই হলো জীবন রহস্য।' একটা চাপা বেদনার ছাপ পড়তে দেখা গেলো ডাক্তারের মুখে। এই সময় একজন নার্স এসে তাঁর কানে কানে কি যেন বললো। আর সঙ্গে সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'আমাকে এখুনি অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে। যাওয়ার আগে আপনাকে একটু সতর্ক করে দিয়ে যাই—আপনি যতো চিন্তিতই হোন না কেন, প্যাটকে যেন কিছু জানাবেন না, এটা খুবই জরুরী। আমার কথামতো কাজ করতে পারবেন তো?' করমর্দন করে অপারেশন থিয়েটারে চলে গেলেন প্রফেসর জাফে।

ফেরার পথে এ্যাণ্টনের দোকান থেকে টেরিয়ার কুকুরের বাচ্চাটাকে সংগ্রহ করে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। করিডোরে দাঁড়িয়ে মুখটা একবার আয়নায় দেখে নিলাম, প্রফেসর জাফে বলেছেন, আমার উদ্বেগের কোন প্রকাশ যেন না পায় প্যাট-এর কাছে। তাই ভালো করে দেখে নিলাম, না, আমার মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। তারপর এগিয়ে গেলাম প্যাট-এর ঘরের কাছে। দরজায় টোকা দিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক করে কুকুরের বাচ্চাটাকে ঢুকিয়ে দিলাম, শিকলটা আমার হাতে। হঠাৎ অন্যের কণ্ঠস্বর শুনে বোঝবার চেষ্টা করলাম, এ কার কণ্ঠস্বর হতে পারে? হ্যাঁ, ওই তো ফ্রাউ জালেওয়াস্কিই তো কথা বলছেন! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, তাহলে প্যাট আর একা নেই। প্যাট-এর সঙ্গে আমি একা থাকলে পাছে আমার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করে ফেলি, এমনি একটা আশংকা ছিলো আমার। যাইহোক, ফ্রাউ জালেওয়াস্কি থাকতে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেলো, আর সেই সঙ্গে আমার আশংকাও দূর হয়ে গেলো।

টেবিলের উপরে একগোছা তাস, বুড়ি জালেওয়াস্কি টেবিলের সামনে বসে তাস দিয়ে প্যাট-এর ভাগ্য বিচার করছেন। সেই দৃশ্যটা দেখে খুব খুশি হয়ে বলে উঠলাম, 'শুভ সন্ধ্যা'

কুকুরটাকে দেখে প্যাট লাফিয়ে উঠলো, 'আরে, এ যে দেখছি আইরিশ টেরিয়ারের বাচ্চা!'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমারি যোগ্য।' প্যাট ওকে আদর করতে শুরু করে দিলো। কুকুরের বাচ্চাটা কেবলই ওর গায়ে লাফিয়ে উঠতে চায়।

'সত্যি এটা আমাদের কুকুর?' জিজ্ঞেস করলো প্যাট।

'হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তো এনেছি প্যাট।' খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো ও।

'তাহলে ওর নাম রাখবো বিলি। আমার মা'র ছোট্ট বয়সে ও'র একটা কুকুর ছিলো, সেটার নাম ছিলো বিলি। সেই কুকুরটার কথা প্রায়ই বলতেন না।'.

'বেশ তো, তোমার মা'র স্মরণেই ওই নামটাই রাখা হোক।'

প্যাট হঠাৎ ফ্রাউ জালেওয়াস্কির গলা জড়িয়ে ধরলে। আমি প্রথমে এর অর্থ বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। পরে বুঝলাম কেন ওর এই উচ্ছ্বাস। একটু পরে আব্দারের সুরে ও বললো, 'আপনার কোনো আপত্তি নেই তো, কুকুরটা রাখতে দেবেন তো। কুকুরে আমার বড় শখ।'

একটু সময় চুপ করে থেকে ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বললেন, 'না না, আপত্তি থাকবে কেন? তাছাড়া আপনার তাসেই তো দেখা যাচ্ছে, আজ একটা নতুন কিছু আপনার প্রাপ্তিযোগ রয়েছে।'

'আর সেই প্রাপ্তিযোগটাই তো এই কুকুরের বাচ্চা।' মৃদু হেসে বললাম।

বুড়ি চলে যাওয়ার পর প্যাটকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'সারাদিনের খাটা-খাটুনির পরে ফিরে এসে তোমাকে কাছে পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।'

আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে প্যাট। এরকম কথা বললে প্যাট কখনো জবাব দেয় না। অবশ্য আমিও চাই না ও জবাব দিক। আমার ধারণা, মেয়েদের কখনো মুখ ফুটে কাউকে ভালোবাসার কথা জানানো উচিত নয়। প্যাট-এর দুচোখ দিয়ে খুশির আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল! মুখের ভাষার বদলে ওর চোখের ভাষাতেই প্রকাশ পেলো সেটা।

ওকে বুকে চেপে ধরে রাখলাম, সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। অনুভব করছি ওর দেহের উত্তাপ, ভালো লাগছে ওর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ নিতে। বুকের মধ্যে যতোই ওকে চেপে ধরছি, ততোই যেন একটা অবর্ণনীয় সুখ অনুভব করছি। আমার মনের সব উদ্বেগ, ওর অসুখ নিয়ে আমার সব ভাবনা মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো। হ্যাঁ, এই তো এখনো বেঁচে আছে ও, কই কিছুই তো হয়নি ওর! ওই তো নিশ্বাস ফেলছে, কই ওকে তো হারাইনি। আমার কানের কাছে মুখ তুলে এনে প্যাট জিজ্ঞেস করলে, 'ডিনারটা কি আমরা আজ বাইরে সারবো নাকি?'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই আজ এক সাথে খাবো, পান করবো। কোস্টার আর লেনতসও আসছে। তোমার জন্য দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে কার্ল।'

'কিন্তু বিলির কি হবে?'

'বিলিও আমাদের সঙ্গে যাবে। তা না হলে আমাদের খাবারের অবশিষ্ট টুকু কে খাবে! কেন, তুমি কি আগেই খেয়ে নিয়েছো?'

'না, তোমার ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম যে এতক্ষণ।'

'না না, ওরকম করো না। আমার জন্য আর কখনো অপেক্ষা করো না। জানো তো, কারোর জন্য অপেক্ষা করতে নেই?'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললো ও, 'বাব্বা, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ আছো এখনো, সাংসারিক জ্ঞান তোমার একটুও নেই। সংসারে কারোর জন্যে যদি অপেক্ষা করে বসে না থাকতে হয়, তাহলে তো সারাটা দুনিয়াই মিথ্যে হয়ে যাবে।' তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও বললো, 'এবার পোশাক বদল করে নিই, বেরুতে হবে তো? তা তুমি তোমার পোশাক বদলাবে না?'

'হ্যাঁ, সে আর কতক্ষণ?' আমি বললাম, 'এখানে আর একটু বসতে চাই, তোমার আপত্তি নেই তো?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো প্যাট। তার মানে অনায়াসে আমি ওর ঘরে বসে থাকতে পারি আরো কিছুক্ষণ, অন্তত যতক্ষণ না ও ওর পোশাক বদল করে বাইরে বেরোবার জন্য তৈরী হয়।

বিলিকে কাছে টেনে নিয়ে জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় বসলাম। নীরবে প্যাট-এর বেশ পরিবর্তন দেখতে থাকলাম। মেয়েদের শরীরের ভাঁজ এক একটা এক এক রকম, সেই চিরন্তন রহস্যটা এই বেশ পরিবর্তনের সময় যেমন বোঝা যায়, এমনটি আর কখনো নয়। ওঁর দেহের প্রতিটি ভাঁজে নারীত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। এ রহস্য বোধকরি নিজেও জানে না ও। ওর ভেতরের গোপন নারীসত্তাটি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অন্য সময় পোশাকের আড়ালে মেয়েদের যৌন বোধটি যদিও নিদ্রিত থাকে, তবু বেশ পরিবর্তনের সময় আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সেই প্রবৃত্তিটা একটু একটু করে জাগ্রত হয়। নিজের অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গিয়ে নিজেকে ঢেলে সাজানোর মধ্যেই আসল সৌন্দর্য। মেয়েরা পোশাক বদলানোর সময় যে হাসে, কথা বলে মুখর হয়ে ওঠে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। আয়নার সামনে ওর সহজ শোভন ভাব ভঙ্গিমা, হাত পা নাড়া, ভারি সুন্দর লাগছে এখন আমার। ওই যে দ্রুত হাতে চিরুনি বুলিয়ে নেওয়া, ভুরুতে রঙের তুলি বুলিয়ে নেওয়া, কি সুন্দরই না লাগছে দেখতে। কখনো চঞ্চলা হরিণী, কখনো বা রণরঙ্গিনী বীরাঙ্গণা—ক্ষণে ক্ষণে ওর এই যে পরিবর্তন, এর সৌন্দর্য যে কতো মনোরম, চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা যেতো না বোধহয়। একেবারে এ হেন অন্য রূপ, আপন-ভোলা ভাব, গম্ভীর মুখ, চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। ও যখন ওর সুন্দর মুখখানি তুলে আয়নার দিকে ঝুঁকে দেখছিল, তখন মনে হচ্ছিলো, এতো ওর চেহারা নয়, যেন দুটি মেয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।

নীরবে ওর দেহ সৌন্দর্য মুগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, বিকেলে যে দুঃসংবাদটি প্রফেসর জাফের মুখ থেকে শুনে এসেছিলাম, সেটা যে এখন একেবারে

ভুলে গেছি তা নয়, বরং বেশী করেই মনে আছে। কিন্তু প্যাট-এর দিকে তাকিয়ে এখন মনে হচ্ছে, যে উদ্বেগে আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, এখন একটা আশার আলোয় সেটা যেন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, সুখ দুঃখ, সন্ধ্যার লাল আভা, মিষ্টি বাতাসের সুবাস, সবার উপরে এই অপরূপা নারীমূর্তি—এসব যোগ করে মনে হলো, একেই বলে একটা পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ পাওয়া। এরই নাম জীবন! শুধু কি তাই? মনে হয় একেই বলে সুখ, একেই বলে প্রেম, ভয় আর বেদনায় মেশানো এক অপূর্ব অনুভূতি।

'ট্যাক্সি চালিয়ে আজকাল তেমন রোজগার আর হচ্ছে না', বললাম গুস্তাভকে।

মাথা নেড়ে ও বললো, 'হ্যাঁ, অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে উঠছে। আরো খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু বন্ধু, আমার যে অনেক টাকার দরকার। অল্প টাকায় চলবে না। অনেক, অঢেল টাকার দরকার।' প্যাট-এর চিকিৎসার খরচ মাথায় রেখেই বললাম কথাটা।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গুস্তাভ বললো, 'অনেক টাকার দরকার, তাই না? কিন্তু ভায়া সৎ পথে অনেক টাকা রোজগারের তো কোনো উপায় নেই। জুয়া কিংবা রেস যদি খেলতে পারো, তাহলে বাড়তি কিছু টাকা হতে পারে। পারবে খেলতে? আজ রেস আছে, আর খুব ভালো একটা জুয়ার আড্ডাও আমার জানা আছে।'

'জুয়াই হোক আর যাই হোক, আমার টাকা পেলেই হলো।' আমি বললাম।

'তা আগে কখনো রেস টেস খেলেছো নাকি?'

'না তো।'

'তাহলে তো খুব ভালো। গোড়ার দিকে নতুন জুয়ারিদের বরাত খুব ভালো থাকে। আজই যেতে হয়। চলো, দেখা যাক তোমার ভাগ্যে আমারও কিছু আমদানি হয় কিনা।'

বেশ বড় গোছের একটা ঘর, সেখানেই জুয়ার আড্ডা। ঘরের ডানদিকে চুরুটের দোকান, আর বাঁদিকে জুয়ারিদের বাজির চার্ট। দেওয়ালের গা ঘেঁষে লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের পিছনে তিনটি লোক কাজে ব্যস্ত। একজন দূরভাষে কথা বলতে ব্যস্ত, দ্বিতীয়জন স্লিপ হাতে করে চরকির মতো ঘুরছে চারদিকে। আর তৃতীয় ব্যক্তি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বাজির হিসেব করছে। জোর ব্যবসা চলছে, আমি তো দেখে অবাক। এখানে যারা জুয়া খেলতে আসে, তারা অতি সাধারণ লোক। যেমন ছুতোর, কামার, মিস্ত্রির দল, আর কিছু গরীব কেরাণীও আছে, আছে কিছু বেশ্যার দল। বাকিরা বেকার ভবঘুরের দল। দরজার সামনে অতি মলিন পোশাকে

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি আমাদের দেখেই বলে উঠলো, 'ও মশাই শুনছেন. এই অধমের নাম ফন বাইলিং। টিপস চান তো বলে দিতে পারি। অব্যর্থ, নির্ঘাত লেগে যাবে দেখবেন।'

তাকে পাত্তা দিলো না গুস্তাভ। খিঁচিয়ে উঠে বললো, 'যাও, ওসব গল্প কথা তোমার ঠানদির কাছে শোনাও গিয়ে, আমাদের কাছে বিশেষ সুবিধে হবে না তোমার।' তারপর গটগট করে কাউণ্টারের সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে কয়েকটা ঘোড়ার নাম জিজ্ঞেস করে নিয়ে বললো, 'এস ট্রিষ্টান-এর উপরে প্রথমে দু মার্ক করে দুজনে ধরি। ঠিক লেগে যাবে, দেখো!'

'ওটার সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে নাকি?'

'তা জানা নেই আবার? প্রতিটি ঘোড়ার খুরসুদ্ধু আমার জানা আছে।'

পাশ থেকে একজন লোক টিপ্পনি কাটলো, 'তাহলে সব জেনেও ওই এস ট্রিষ্টান-এর উপরে বাজি ধরছেন কেন? আরে মশাই স্লিপারি লিংসই একমাত্র ভরসা। জনি বার্নস-এর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে।'

লোকটার কথায় কানই দিলো না গুস্তাভ। 'আমি হলাম গিয়ে আস্তাবলের মালিক, বললো ও, 'এ লাইনে তোমার থেকে ঢের বেশী আমার জানা আছে।' তারপর কাউণ্টারে গিয়ে আমাদের নাম, বাজি ইত্যাদি সব লিখিয়ে নিলো। আমাদের দুজনের হাতে দুটি স্লিপ ধরিয়ে দিতেই হলের মাঝখানে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসলাম আমরা। অপেক্ষা করতে হবে। টেলিফোনে বাজির খবর আসবে। সবার মুখে দেশ বিদেশের ঘোড়দৌড়ের গল্প শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম হলো। একটা মোটা মতো লোক একটার পর একটা রুটি খেয়ে যাচ্ছে। আর দুজন লোক দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তার খাওয়ার দৃশ্য দেখছে। ওদের দুজনের হাতেও দুটো টিকিট, শুকনো মুখ, দেখে মনে হয় অনেক দিন ওদের পেটে কিছু খাওয়া জোটেনি।

হঠাৎ এক সময় সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। উপস্থিত সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। সবাই আশা করে বসে আছে জিতবে বলে। একজন লোক একটার পর একটা নাম বলে যাচ্ছে, কিন্তু এস ট্রিষ্টান-এর নাম বললো না। গুস্তাভের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। বিরক্ত হয়ে বললো ও, 'ভাবাই যায় না, সোলে মন পেয়ে গেলো?'

এবার সেই ফন বাইলিং লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, 'দেখলেন তো মশাই, আমার কথা শুনলেন না। আমি তো ওই সোলোমনের টিপসই দিতাম। যাইহোক, এর পরের রেসটা যদি—'

এবারেও গুস্তাভ ওকে পাত্তা দিলো না। স্লিপারি লিংস এর সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলো সে। বাইলিং তখন আমাকে ধরলো। 'আপনি ঘোড়া সম্পর্কে কিছু

জানেন টানেন ?'

'না, কিছুমাত্র না।'

'বেশ, আমার কথা শুনুন। অন্তত আজকের দিনটিতে। কিং লিয়ার, সিলভার মথ, কিংবা লরা ব্রু। এই তিনটে ঘোড়ার মধ্যে যে কোন একটার ওপরে আপনি বাজি ধরতে পারেন। আমার কোনো দাবী নেই। তবে জিতে যদি কিছু আমাকে দিতে চান আমি না করবো না।'

পোকার খেলায় প্রবাদ আছে, নতুন খেলোয়ারের জোর বরাত। সে কথা মনে রেখেই আমি বললাম, 'ঠিক আছে, লরা ব্রু নামটি বেশ লাগছে, তো ওটার উপরেই দশ মার্ক ধরা যাক।'

শুনে গুস্তাভ তো একেবারে ক্ষেপে লাল। বললো ও, 'ওই ঘোড়াটার উপরে তুমি দশ মার্ক বাজি ধরলে? আরে ওটা কি একটা রেস-এর ঘোড়া? ওই বেতো ঘোড়া রেসে না ছুটিয়ে বরং ওটাকে কেটে সসেজের মাংস করলে ভালো হতো।' ওদিকে স্লিপারি লিংসও লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে ছাড়লো না। 'আপনি শেষ পর্যন্ত লরা ব্রুর উপরে বাজী ধরেছেন। আরে মশাই, ওটা তো ঘোড়া নয়, ওটা একটা গরু।'

কখন যে টেলিফোন বেজে উঠেছিল খেয়ালই করতে পারিনি। আমি তখন একটু আগে গুস্তাভ, স্লিপারি লিংস-এর সমালোচনার কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, সত্যি যদি ওদের কথাই ঠিক হয়? সবটাই লোকসান আজ। হঠাৎ আমার চিন্তায় বাধা পড়লো গুস্তাভের চেঁচামেচিতে, 'আরে একেই বলে ভাগ্য, বুঝলে হে ভাগ্য।' এই বলে ও আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলে উঠলো, 'আরে দোস্ত, তুমি তো কেল্লা ফতে করে দিয়েছ, প্রথম দিনেই তুমি একশো আশি মার্ক বাজি জিতে গেচো। তোমার ওই উটের মতো দেখতে ঘোড়াটাই রেসে জিতে গেছে।'

'তুমি ঠিক বলছো?'

ততক্ষণে কাউণ্টারের সেই রঙচঙে পোশাক পরা লোকটি আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা কে আপনাকে টিপসটা দিলো বলুন তো?' লোকটার মুখে বিরক্তির ছাপ।

আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল বাইলিং। আমার হয়ে সেই মুখে বিনীত হাসি ফুটিয়ে বললো, 'আজ্ঞে, এই অধমই—'

'অ—' লোকটা বাইলিং-এর দিকে দ্বিতীয়বার আর ফিরে তাকালো না। আমার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে আমাকে আমার বাজী জেতার টাকা দিয়ে চলে গেলো। হলঘরের সবাই তখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কি যে লোকটা নির্বিকার ভাবে খাচ্ছিল সেও একবার মুখ তুলে তাকিয়ে একবার আমাকে দেখে নিলো।

বাইলিং আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখান

থেকে কেটে পড়ুন। আজ আর খেলবেন না যেন।' হ্যাঁ, না কিছু না বলেই আমি তার হাতে দশ মার্ক তুলে দিলাম।

ঘণ্টা খানেক পরে আবার রেস-এর আড্ডায় জমে গেলাম। দেখতে দেখতে তিরিশ মার্ক হেরে গেলাম। ভাবলাম, বাইলিং যথার্থই মানা করেছিল, আজ আর না খেলবার জন্য। ওর কথা না শোনার দরুণ জেতার পর হারতে হলো। না, আর নয়। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার মুখে বাইলিং আমার হাতে একটা কার্ড গছিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি এদের এজেন্ট। দরকার মনে করলে—' কার্ডটা দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো, সেটা একটা ঘরোয়া সিনেমার বিজ্ঞাপন। খানিকটা এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'শুনছেন, আমার সেকেন্ড-হ্যান্ড পোশাকেরও ব্যবসা আছে।'

পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, টেরও পেলো না প্যাট। একটা কালো রঙের টুপি মাথায় দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও তখন দেখছে কেমন মানিয়েছে ওকে। সন্ধ্যার আলো আঁধারের মধ্যে ছোট্ট একটা ল্যাম্পের আলোটি উজ্জ্বল হয়ে শুধু ওর মুখখানিকে বেশ আলোকিত করে তুলেছে। চেয়ারের হাতলে এক টুকরো সিল্কের কাপড় ঝুলছে, চেয়ারের উপরে একটা কাঁচি পড়ে আছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর টুপি তৈরী করার দৃশ্যটা উপভোগ করছি। ওর পাশে বসে থাকা বিলি হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে তাকাতেই আয়নায় আমাকে দেখতে পেলো প্যাট। এগিয়ে গিয়ে ওর পাশটিতে বসে ওর ধবধবে সাদা ঘাড়টির ওপরে চুম্বনের রেখা টেনে দিলাম, তাতেই যেন আমার সারাদিনের ক্লেদ ক্লান্তি আর গ্লানি নিমেষে দূর হয়ে গেলো। প্যাট বললো, 'টুপিটা আমায় কেমন মানিয়েছে বলো তো?'

'সত্যি চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে', বললাম।

'বাজে কথা, তুমি মোটেই আমার দিকে তাকিয়ে আর দেখো না।' ঠোঁট ফোলায় প্যাট।

'দেখি, খুব দেখি। এইতো তোমাকে দেখেই বলছি, তোমার মাথায় ওই টুপিটা দেখলে প্যারিসের ফ্যাশানেবল টুপিওয়ালীর দল পর্যন্ত হিংসে করতে পারে।'

প্যাট হেসে উঠলো শব্দ করে। তারপর কপট রাগ দেখিয়ে আমাকে বললো, 'বাজে বকো না তুমি। আর তুমি এসবের কিছু বোঝও না। আমি কি পরি না পরি, তা কি তুমি তাকিয়ে দেখেছো কখনো?'

'বাঃ দেখি না আবার। আলবৎ দেখি। প্রতিটি খুঁটি নাটি আমার দৃষ্টি এড়ায় না কখনো।' এই বলে নাকের ক্ষতটা আড়াল করবার জন্য ওর একটু পিছন ঘেঁষে বসলাম।

'তাই নাকি ?' প্যাট যেন চ্যালেঞ্জ জানাতেই বললো, 'বেশ তাই যদি হয়, বলো তো কাল রাত্রে আমি কি পোশাক পরেছিলাম ?'

'কা—কাল রাত্রে ?' একটু ঢোক গিলে বললাম। কি করবো, আমার যে তখন কিছুই মনে আসছিল না।

'দেখলে তো, আমি ঠিক বলিনি ? তুমি আমার কিছুই দেখো না, তুমি আমার কিছুই জানো না, বোঝোও না।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো প্যাট, আমি কিছুই জানি না…এ একরকম ভালোই হয়েছে। একজন আর একজনকে যতো বেশী বোঝবার চেষ্টা করে, ততো বেশী ভুল বোঝে। একজন আর একজনের যতো বেশী কাছে আসতে চায়, ততো বেশী দূরে সরে যায়। এই ধরো না আমাদের হোঁসির কথাই। ওরা এ ওর সব কিছুই জানে, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। ওদের দুজনের মধ্যে এক অন্তহীন প্রাচীর রচনা হয়ে গেছে।

টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে আয়নার দিকে নিজের রূপ দেখতে গিয়ে প্যাট বলে উঠলো, 'কিন্তু বব্বি, তোমার কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, আধা সত্য।'

'সব খাঁটি সত্যের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার। এর বেশী আমরা জানতেও চাই না। এটাই মানুষের ধর্ম। অবশ্য ঈশ্বর জানেন, এই আধা সত্যের জন্যই সংসারে যতো গোলমালের সৃষ্টি। তবে আমি এও বলবো যে, পুরো সত্য নিয়েও সংসারে বাস করা যায় না।'

টুপিটা মাথা থেকে খুলে ফেলে হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বসতেই ওর নজর পড়লো আমার নাকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে ও বলে উঠলো, 'কি হয়েছে তোমার ?'

'ও কিছু নয়', বললাম, 'গাড়ির নিচে কাজ করতে গিয়ে একটু চোট পেয়েছি।

আমার দিকে তাকালো ও। ওর সেই তাকানোর ভঙ্গিমা বলে দিচ্ছিল, আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। সন্দেহ প্রকাশ করে বললো ও, 'জানি না কি হয়েছে তোমার। তবে আমার কথা তুমি জানো না, আর তোমার কথাও আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো', আমি বললাম।

একটা পাত্রে জল আর ব্যাণ্ডেজ জাতীয় কিছু টুকরো কাপড় নিয়ে এলো। নিজের হাতে অতি যত্ন সহকারে ও আমার নাকে পটি বেঁধে দিলো। খুঁটিয়ে দেখে এক সময় ও বললো, চোটটা দেখে তো ঘুঁষির ঘা বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া কাঁধেও মানুষের আঁচড়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি। তা নিশ্চয়ই কোথাও বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিলে ?'

'সে যাইহোক, আজকের সবচেয়ে বড় বীরত্ব দেখানো এখনো বাকী রয়ে গেছে।'

বিস্ময় ভরা চোখে আমার দিকে তাকালো প্যাট। 'সেকি এতো রাত্রে তুমি

আবার বেরুবি নাকি ?'

'না, মোটেই না। বীরত্বটা এই ঘরের মধ্যেই দেখাবো।' জল পটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সজোরে বুকে টেনে নিলাম ওকে। তারপর ফিসফিসিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'আজকের রাতটা তোমার কাছেই থাকবো।'

আগস্টের শেষেও শীত বিলম্বিত। নির্মেঘ আকাশ। সেপ্টেম্বর এসে গেলো, তবু গ্রীষ্মের যাওয়ার নাম নেই। তবে সেপ্টেম্বরের শেষে নতুন করে আবার বৃষ্টির ধারা নামলো। একদিন রবিবার ভোরের দিকে এমনি বৃষ্টি ঝড়বার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলো। খাট থেকে নেমে জানালার সামনে গিয়ে কবরখানার দিকে তাকালাম। গাছগুলোর রঙ কেমন হলদে হয়ে গেছে। পাতা ঝরে গেছে। মানুষের কঙ্কালের মতো গাছগুলো তাদের অস্তিত্ব রাখতে গিয়ে আরো শীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি তখন ভাবছিলাম, প্যাটকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীর থেকে ফিরে আসার পর কটা মাস আমাদের যে কিভাবে কেটেছে, তা আমরা নিজেরাই জানি না। শীত এলেই প্যাটকে স্যানোটোরিয়ামে পাঠাতে হবে ডঃ জাফে বলে দিয়েছেন, সব সময় কথাটা ভেবেছি, অথচ কেমন যেন ঠিক খেয়াল করতে পারিনা এক এক সময়। এ যেন আমাদের সবারই জানা, আর জেনেও যেন জানতে চাই না। এই যে আমাদের বয়স বাড়ছে, আয়ু কমছে, সে কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু ক'জনই বা খেয়াল রাখি। আজকের তো বটেই, কালকের কথাই বা কে মনে রাখে ? এই যে প্যাট আমার কাছে রয়েছে, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা, শরৎ এসেছে বলেই যে ও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, সেটা আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন! দুজনে দুজনের কাছে আছি, এক সাথে আছি, এর চেয়ে বড় সুখ আর কি হতে পারে ?

বৃষ্টিস্নাত কবরখানার গাছগুলোর হলদে বিবর্ণ ঝরা পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো কুয়াশা আর ঝড় যেন এক একটা রক্তপিপাসু জানোয়ারের মতো গাছ ও লতা পাতার সমস্ত সবুজ রসটুকু নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে। এক একটা দমকা বাতাসে অসংখ্য পাতা ঝরে পড়ছে। সেই দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠলো। আমাদেরও বিচ্ছেদের আর দেরী নেই। শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে পাতা যেমন ঝরে যায়, তেমনি আমাদের দুজনের বিচ্ছেদও অনিবার্য সত্য।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি প্যাট অঘোরে ঘুমচ্ছে। ভারি নিঃশ্বাস ফেললেও কাশছে না আর। এতে ভরসা পেলাম। কে বলতে পারে জাফে একদিন টেলিফোন করে বলবেন, প্যাটকে স্যানোটোরিয়ামে আর যেতে হবে না। কতদিন, কতদিন ওর ওই ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছি রাতের পর রাত ধরে, যেন অনেক দূরে থেকে একটা ক্ষীণ করাতের আওয়াজের মতো। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভরসাটুকু

হারিয়ে গেলো। হঠাৎ যেমন মনে উদয় হয়েছিল, তেমনি হঠাতই সেটা মিলিয়ে গেলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবে সাতটা বাজে, প্যাট এর ঘুম ভাঙতে আরো দু'ঘণ্টা দেরী আছে। তাই ভাবলাম, ট্যাক্সিটা নিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘোরা যাক, তাতে ঘরে বসে মনের দুশ্চিন্তা দূর হবে, সেই সঙ্গে কিছু রোজগারও করা যাবে। বেরোবার আগে টেবিলের কাছে গিয়ে সঞ্চিত টাকা পয়সা গুণতে বসলাম। যা আছে, এতে প্যাট-এর চিকিৎসার খরচ ক'দিনই বা চলবে! এতে মনটা আরো বেশী দমে গেলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলাম গ্যারাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ট্যাক্সিটা বার করতে হবে।

সাত সকালে সওয়ারি পাওয়া মুশকিল। তাই ঠিক করলাম, অযথা পেট্রল না পুড়িয়ে ক্যাথিড্রালের দিকে একবার গেলে হয়। এখন গোলাপফুলের সিজন নয়, তবে ক্যাথিড্রালের সেই পরিত্যক্ত বাগানে ফুল ফুটে আছে এখনো। প্যাট-এর জন্য কিছু গোলাপ সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে একগুচ্ছ ফুল তুলে গাড়িতে রেখে এসে, দ্বিতীয় কিস্তির ফুলগুলো তুলে নিয়ে সবে বর্ষাতির ভিতরে ঢুকিয়েছি, এমন সময় কার যেন পদধ্বনি কানে ভেসে এলো। তাড়াতাড়ি ফুলগুলো দু'হাতে চেপে ধরে সামনে ক্রশটার দিকে মুখ করে চোখ বুজে এমন ভান করলাম, যেন যীশুর আরাধনায় আমি মগ্ন। ওদিকে সেই পদধ্বনি ক্রমশই এগিয়ে আসছে আমার কাছে। একটু পরেই আমার পিছনে এসে সেই শব্দটা থেমে গেলো। আমি তখন ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘেমে উঠেছি, ভয়ে, এই বুঝি ফুল চুরির ব্যাপারে হাতে নাতে ধরা পড়ে যাই পাদ্রীসাহেবের কাছে। চোখ মেলে গভীর ভক্তিভরে সামনের পাথরের মূর্তি'টার দিকে তাকালাম, তারপর পরবর্তী মূর্তি'টার দিকে এগিয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই একজোড়া পায়ের শব্দটাও এগিয়ে এলো আমার সঙ্গে। মহা মুশকিলে পড়া গেলো তো! এ অবস্থায় কি করা যায়, ভাবছি। এখন বুঝতে পারছি, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, একটু নড়লে চড়লেই বামাল সমেত ধরা পড়ে যাবো। অগত্যা দাঁড়িয়ে পড়ে ওর দিকে তাকালাম, মুখে বিরক্তির ভাব দেখালাম, ও'র উপস্থিতিতে আমার প্রার্থ'নায় ব্যাঘাত ঘটছে যেন।

তাকাতেই দেখি ভালোমানুষের মতো একখানি মুখ আমার দিকে অপরাধীর মতো তাকিয়ে আছে, গির্জার পাদ্রী। আমার প্রার্থ'নায় বাধা সৃষ্টি করার মতো ধৃষ্টতা ওর নেই। তাই আর কালবিলম্ব না করে উপাসনার ভান তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম রাস্তার দিকে।

'এই যে সুপ্রভাত, যীশুর জয় হোক!' বললেন পাদ্রী সাহেব।

খাঁটি রোমান ক্যাথলিকদের রেওয়াজ মতো বললাম, 'তথাস্তু। যীশুর জয় হোক।'

পাদ্রীসাহেব একগাল হেসে বললেন, 'এ সময়ে কেউ তো এখানে আসে না। অতীব দুঃখের কথা যে, আজকাল কাউকেই আর উপাসনা করতে দেখা যায় না। আপনাকে উপাসনা করতে দেখে বড় ভালো লাগলো, আনন্দ পেলাম। আর তাই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। তা আপনার বুঝি বিশেষ কারোর জন্য প্রার্থনা আছে, তা নাহলে এই সাত সকালে এমনি বর্ষামুখর দিনে—'

হ্যাঁ, প্রার্থনাই বটে, এখন আমার একটাই প্রার্থনা, দয়া করে আপনি এখন আমার সামনে থেকে চলে গেলে আমার বিশেষ উপকার হয়, মনে মনে বললাম। ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হলো, ফুল চুরির ঘটনাটা এখনো টের পাননি তিনি। মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। এখন ও'র কাছ থেকে মানে মানে কেটে পড়তে পারলেই ভালো। কিন্তু ও'র চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। উল্টে আরো অন্তরঙ্গতার সুরে তিনি বললেন, 'এখনি আমি গির্জার উপাসনায় বসতে যাচ্ছি। বলেন তো আপনার বিশেষ কোনো প্রার্থনা থাকলে আমি আমার প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারি।

'ধন্যবাদ।' বললাম। ও'র কথা শুনে যুগপত বিস্ময় আর অস্বস্তিও লাগছে।

এক গাল হেসে তিনি বললেন, 'আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। ঈশ্বরের উপরেই বিশ্বাস রাখুন, একমাত্র তিনিই ভরসা। সব বিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা, তিনিই সাহায্য করবেন।' এই বলে ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলেন। আমি তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন।

ও'র গমন পথের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, কি কথাই না শোনালেন ভদ্রলোক।…একমাত্র তিনিই ভরসা। আরে বাবা অতোই যদি সোজা হতো, ঈশ্বর যদি সত্যি সত্যিই সহায় হতেন আমাদের, তাহলে আমাদের বার্নাও ওয়াইজ যখন পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলো, তখন কোথায় ছিলেন সেই ঈশ্বর? তিনি কি তার সহায় হয়েছিলেন? আর এই ঈশ্বর কি সাহায্য করেছিলেন কার্টাসিনতাস্কিকে? যখন সে মারা গেলো ঘরে তার রুগ্ন স্ত্রী আর দুধের শিশু। বেচারী ছেলেকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলো না। শুধু কি ওরা দুজন, মুলার, লিয়ার, কেমরিক, ফ্রিডম্যান, বার্গার এমনি কতো হাজার লক্ষ মানুষ অসময়ে প্রান হারালো, তখন ঈশ্বর কি তাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন? না, আসেননি। যতো সব বুজরুকি। আর অন্ধ মানুষগুলো এই ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখে বলেই তো আজ সারা দুনিয়ায় এমন রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে।

বাড়িতে পা দিতেই হোস তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। তার হলদেটে মুখ ফোলা ফোলা, চোখ দুটো টকটকে লাল। আমাকে দেখে নিরাশ গলায় বললো সে, 'ও, আপনি?'

'কেন, আপনি অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। গতকাল রাতে উনি ফেরেননি। তা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আজ সকালে ?'

'কই না তো। আমি তো মাত্র ঘণ্টাখানেক বাইরে ছিলাম।' বললাম, 'চিন্তার কি আছে এতে ? দেখবেন, একটু পরেই তিনি এসে যাবেন।'

'কে জানে', বিমর্ষ গলায় বললো হেসি, 'কাল সন্ধ্যায় ওঁর বন্ধুদের কাছে যাচ্ছে বলে সেই যে বেরুলো, আর ফিরে আসেনি। এদিকে বন্ধুদের ঠিকানাও জানি না।'

'ওঁর বন্ধুদের নাম জানেন তো ? এনকোয়ারি অফিসে খোঁজ নিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, খোঁজ নিয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু ওরা কিছু বলতে পারলো না।' মার খাওয়া নিস্তেজ কুকুরের মতো চেহারা হয়ে গেছে হেসির। অনুযোগ করে বললো সে, 'বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করলেই ও আমাকে মারতে ছুটে আসতো, তাই ভয়ে আর জিজ্ঞেস করতাম না ইদানিং। ভাবতাম, একা একা সারাটা দিন পড়ে থাকে, তবু দু'চারজন সঙ্গী যখন পেয়েছে, এ এক রকম ভালোই হয়েছে। তাই আর আপত্তিও করিনি।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ভাবনার কিছু নেই, এখনি এসে পড়বেন তিনি। তবে পুলিশের কাছে একবার খোঁজ করে দেখলে পারতেন, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, বলা তো যায় না—'

'তা সে আর জিজ্ঞেস করিনি। দুর্ঘটনার ব্যাপারে ওরা কিছু জানে না।'

'বেশ তো তাহলে আর শুধু শুধু ভাবছেন কেন ? এমনো তো হতে পারে, শরীর খারাপের দরুন হয়তো কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছেন উনি। একটু সুস্থ হলেই ফিরে আসবেন—'

'সত্যি ও ফিরে আসবে, আপনি বলছেন ?' একটু থেমে বললো সে, 'আচ্ছা, একবার বেরিয়ে ওর খোঁজ করলে হয় না ? আপনার গাড়িটা নিয়ে—'

'তাতে লাভ কি বলুন ? গাড়ি নিয়ে কোথায়ই বা যাবো ? কোথায়ই বা দেখা পাবো ওঁর ?'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?' বললো হেসি।

ভদ্রলোককে দেখে কষ্টও হচ্ছিল, কিন্তু কিছু করারও নেই। আবার এদিকে মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে, প্যাট-এর কাছে যাওয়ার জন্য মন ছটফট করছে। তাই একটু রুক্ষস্বরেই বললাম, নেহাতই আপনি যদি যেতে চান তো রাস্তায় অনেক ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন। আর একটু অপেক্ষা করলে আমার বন্ধু লেনতসকে ফোন করে এখানে চলে আসতে বলে দিতে পারি। সে বরং আপনার সঙ্গে যেতে পারে।'

ঘাড় নেড়ে কোনো কথা না বলে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ঘরে চলে গেলো সে।

ফুলগুলো দেখে প্যাট খুশিতে উপচে পড়লো। তারপর কেমন একটু রহস্য করে বললো, 'তোমার কোনো দোষ নেই, ফ্রিডা বলছিল, এ সময় গোলাপফুল একেবারে পাওয়াই যায় না বাজারে। তাই রবিবারের এই সকালে যদি এমন তাজা ফুল পাওয়া যায়, স্বভাবতই ধরে নিতে হয় যে, সেটা চুরি বিদ্যার জোরে।'

'তা তোমরা যা খুশি ভাবতে পারো', পাদ্রিসাহেবের কাছে আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতাম। তবু সেই ভয়টা কাটিয়ে উঠে বললাম, 'অসময়ে ফুল পেয়ে তুমি খুশি তো?'

'খুব, খুব খুশি।'

'তাহলেই বলো', বললাম, 'কিন্তু তুমি যে এতো সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে উঠেছো, কি ব্যাপার?'

'একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো, তারপর চোখে আর ঘুম এলো না।'

'তা তুমি আবার কবে থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে? আমি তো জানতাম, এ অসুখটা বুঝি কেবল আমারই।'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে ও বললো, 'কেন, শরৎ এসে গেছে টের পাওনি বুঝি?'

'হ্যাঁ, শরৎ এসেছে তো কি হয়েছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম ওকে।

'আমাকে যে তোমার এমন স্নেহছায়া থেকে চলে যেতে হবে বব! ওর মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়তে দেখা গেলো।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করে বললাম, 'উঁহু, তা তো চলবে না। রাতে এখন থেকে তুমি আমার কাছে শোবে। তাহলে ওসব আজে বাজে কথা ভেবে দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে না। তাছাড়া অন্ধকার রাতে বাইরে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, তখন ভালোবাসার মানুষটি পাশে থাকলে এমনিতেই খুব ভালো লাগে।'

আমার গায়ে আরামে হেলান দিয়ে ও বললো, 'তোমার কথাই ঠিক হয়তো।'

'এই যে রোববারের ছুটিতে এমন বৃষ্টির দিন তোমাকে যে এতো কাছে পেয়েছি, ভাবতেই কতো না সুখ উপভোগ করছি।'

ওর মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো ও, 'হ্যাঁ, এ আমাদের সৌভাগ্য।'

'সত্যিই, এমন সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়? আগে কি অবস্থায়ই না ছিলাম, ভাবলে এখন গায়ে কেমন কাঁটা দেয় যেন। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে, জীবনে আমার এতো সুখ কখনো আসবে!'

'তোমার মুখে এমন ভালো লাগা কথা শুনতে খুব ভালো লাগে আমার।' ও আমার দেহের সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে কেমন আবদারের ভঙ্গিমায় বলে উঠলো, 'এমন কথা তুমি আমাকে বার বার শোনাও না কেন বলো তো?'

'কি জানি; বোধহয় তেমন করে আমি ভালোবাসতে জানি না। আর কেন জানি না ওসব আসেও না আমার মনে। যখন এলো হঠাৎ দুম করে বলে বসি।' আমার কথায় হয়তো তেমন কোনো বাধন নেই। কিন্তু প্যাট বিশ্বাস করো, সত্যি খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় আমার—অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে হয় তোমাকে।

'থাক, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি আমার কাছে যেমন আছো, সেই ভালো! তবে মাঝে মাঝে তোমার মুখ থেকে অমন ভালো ভালো কথা শুনতে আমার খুব ইচ্ছে হয়।'

'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য এখন থেকে প্রায়শই ভালো ভালো কথা বলবো তোমাকে। তাতে যদি আমার বোকামো প্রকাশ করে, তাহলেও বলবো।'

'বোকামো হবে কেন?' ও বললো, 'ভালোবাসার মধ্যে বোকামো বলে কিছু নেই।'

প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে প্যাট আবার বিছানায় ওর ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলো। আর ডাক্তারেরও সেই রকম হুকুম। বিছানার চাদরটা গায়ে ঢাকা দিয়ে নিয়ে প্যাট বললো, 'আমার পাশে একটু বসবে তুমি?' আমি ওর পাশে গিয়ে বসতেই ও আমার একটা হাত ওর বুকে টেনে নিয়ে বললো, 'আজকাল আমার ভীষণ ভয় হয়। কেন জানো বব্বি? আমি বোধহয় আর ফিরে আসবো না।'

'অহেতুক ভয় পাচ্ছো তুমি, আমি বলছি, তুমি ফিরে আসবে, আর তোমার এই ভয়টাও কেটে যাবে। তাছাড়া এর আগেও তো তুমি ফিরে এসেছো, হয়তো ঠিক জায়গাতে ফিরে আসোনি, এই যা—'

প্যাটের চোখে ঘুম নেমে আসছে। 'তা যা বলেছো। সেটাও তো একটা ভয়। তবে এবার যাতে ঠিক জায়গাটিতে ফিরে আসি, সে ভার তোমার উপরেই রইলো।'

'নিশ্চয়ই!' ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'তা না হলে সৈনিক হলাম কি করে? ঠিক মতো ঠিক জায়গায় কি করে পাহারা দিতে হয়, সে আমি বেশ ভালো করেই জানি।'

একটু পরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো ও।

এই সময় দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলতেই দেখি ওপারে হেসি দাঁড়িয়ে। পাছে প্যাট-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়, সেই ভয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে এসে তাকে বললাম, 'আসুন, আমার ঘরে গিয়ে বসা যাক।'

'না, আর বসবো না', বললো হেসি, 'আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম, ওকে খুঁজতে যাওয়ার আর কোনো দরকার নেই।'

'ঠিক আছে সে দেখা যাবেখন। আগে ভেতরে আসুন তো। ফ্রাউলিন হোলম্যান এখন ঘুমচ্ছে, তাই কোনো তাড়া নেই আমার।'

আমার ঘরে এসে বললো সে, 'এই চিঠিখানা পড়ুন—'

চিঠিটা ক্লাউ হেসির। ছোট্ট কয়েক লাইনের। দুঃখের সঙ্গে লিখেছে ও। জীবনটা উপভোগ করার সময় এখনো কিছু আছে, সেই সুন্দর স্বাদটার আস্বাদ নিতে চায় ও, কাজেই স্বামীর কাছে ও আর ফিরে আসছে না। জীবনকে উপভোগ করার জন্য একজন প্রকৃত সঙ্গীর সন্ধান পেয়েছে ও, যে কিনা হেসির চেয়ে ওর অনেক বেশী করবে। অতএব হেসি যেন ওকে নিয়ে আর মাথা না ঘামায়। কারণ এ অবস্থায় ওর আর ফেরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ও আরো লিখেছে, এ এক রকম ভালোই হলো হেসির পক্ষে। তার বেতনের টাকায় সংসার খরচ চলবে কি চলবে না, এ নিয়ে তাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ও ওর জিনিষ পত্তর প্রায় সবই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, বাকি যা ফেলে এসেছে, সুবিধা মতো এক সময় সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে।

খুব সহজ ভাষায় চিঠি। সেটা তার হাতে ফিরিয়ে দিতেই সে বললো, এখন আমি কি করি বলুন তো?'

'আপনাকে কিছুই করতে হবে না, 'বললাম, 'চুপ করে শুধু অপেক্ষা করুন এখন।'

একটু পরে নিজের থেকেই হেসি আবার বলতে শুরু করলো। তার কথার মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটার কোনো সঙ্গতি নেই। এ ব্যাপারে সে যে কতোটা বিচলিত হয়েছে, তা তার অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছে? স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। সব দোষ সে নিজের ঘাড়েই নিতে চাইছে। এসব কথাই সে আমাকে বোঝাতে চাইলো।

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'এসব আপনি কি বাজে বকছেন? এতে আপনার দোষের প্রশ্ন ওঠে কি করে? আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে গেছেন, আপনি তো আর ওঁকে তাড়িয়ে দেননি। তাই মিথ্যে কেন আপনি নিজের উপরে দোষারোপ করছেন বলুন তো?'

'না না, আপনি জানেন না, আমি জানি, দোষ আমার আছে বৈকি। আমি ওকে জীবনে একটুও সুখ দিতে পারিনি, সেটাই তো আমার মস্ত বড় দোষ।'

ছোটখাটো রোগা মানুষটার অমন করুণ চেহারা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম তাকে, 'আপনার স্ত্রীর জন্য আপনিই বা কম কি করেছেন?'

সজোরে মাথা নেড়ে হেসি বললো, 'প্রতিদিন আমার চাকরী চলে যাবে বলে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছি। সত্যিই তো ওর জন্য আমি কিই বা করেছি? সামান্য একটু সুখ স্বাচ্ছন্দও দিতে পারিনি ওকে কোনদিন। আমার অভাবের সংসারে ওর কোন সখ আহ্লাদই আমি মেটাতে পারিনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'জানেন, অফিসে আমার প্রমোশন হয়েছে, কাল থেকে আমি

হেডক্লার্ক হচ্ছি। হেডক্লার্ক-কাম-একাউণ্টেণ্ট। এ মাস থেকে আমার মাইনে পঞ্চাশ মার্ক বাড়বে।' আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বললো সে, 'আচ্ছা, আমার স্ত্রী এই সুখবরটা পেলে কি ফিরে আসতো না?'

'মনে তো হয় না', অপ্রিয় সত্য কথাটা বলতেই হলো আমাকে।

'কিন্তু এই বাড়তি পঞ্চাশ মার্ক'এর সবটাই ওকে দিতাম, ও ওর খুশি মতো সেটা খরচ করতে পারতো। তাছাড়া সেভিংস ব্যাংকেও আমার বারোশো মার্ক জমেছে। ও টাকাটা এখন আমি কি করবো? জানেন, ওই টাকাটা জমিয়েছি ওঁর অসময়ে কাজে লাগবে বলে। কিন্তু টাকাটা জমিয়েছি বলেই ও চলে গেলো আমাকে ছেড়ে।'

'দেখুন, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ওসব কোনো কারণই নয়। আপনি এখন ওসব বাজে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে চুপ করে আপনার স্ত্রীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকুন। হয়তো আজকালের মধ্যেই উনি আসবেন। মনে রাখবেন আপনার মতো একই কথা উনিও তো ভাবছেন। উনি ফিরে এলে তখন আপনি ওঁকে আপনার মাইনে বাড়ার কথা, ব্যাংকে টাকা জমানোর কথা সব বলতে পারবেন। মানুষ কি এমনি এক কথায় বিদায় হয়ে যায়? দেখবেন, আবার আপনাদের ঠিক দেখা হবেই।'

আমার ভারি অদ্ভুত লাগছে এই ভেবে যে, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব ঘটেছে, সে কথাটা হেসি পাত্তাই দিতে চাইছে না। তবে এও বুঝি যে, এসব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও নয় তার। স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, সেই ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত সে। একবার ভাবলাম তাকে বলি, কিছুদিন পরেই সে বুঝবে স্ত্রী চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে ওর। কিন্তু তার মনের যা অবস্থা এখন, তাতে আমার এই কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাবে। সত্য কিংবা অপ্রিয় কথা সব সময়েই রূঢ় শোনায়, বিশেষ করে যখন কারো আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

এই সময় পাশের ঘর থেকে প্যাট-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। হেসিকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি এই এলাম বলে।' কিন্তু ফিরে এসে দেখি, হেসি ঘরে নেই। তখন তার ঘরে গিয়ে দেখি, একটা দেরাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমি তাকে বললাম, 'কি ঘুমের ওষুধ খুঁজছেন? হ্যাঁ, ঘুমের ওষুধ খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যেতে পারে। মনের গ্লানিও কিছু লাঘব হতে পারে।'

এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলো হেসি। 'সন্ধ্যাবেলায় আবার আমাদের দেখা হবে। এখন চলি, কেমন!' এই বলে সেখান থেকে চলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বিকেলের শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। হল থেকে বেরিয়ে দেখি

আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাঁচা আপেলের মতো সবুজ রঙ আকাশের। দোকানে, রাস্তায় আলো জ্বলছে। হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম আমি আর প্যাট।

একটা গরম পোশাকের দোকানের শোরুমে সুন্দর সুন্দর ফার-এর জামা ঝুলে থাকতে দেখলাম। সন্ধ্যের দিকে শীত পড়তে শুরু করেছে এখানে। শীতের পোশাক দেখে লোভ হলো। প্যাট-এর দিকে তাকালাম, ওর পরনে ছিলো ছোট্ট একটা ফার-এর জ্যাকেট। পাতলা জামা, প্রচণ্ড শীত মানবার কথা নয়। দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওকে বললাম, 'আমি যদি আজকের ছবির নায়ক হতাম তাহলে কি করতাম জানো, ওই ফার-এর কোটটা তোমার জন্য কিনে ফেলতাম।'

সেই কোটটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্যাট বললো, 'তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয় বব। ও জিনিষটা ক্যানাডিয়ান মিঙ্ক-এর ফার দিয়ে তৈরী। কিন্তু এর দাম কতো হবে জানো?'

'না, জানি না। আর জানবার দরকারও নেই। তোমার যখন পছন্দ, ইচ্ছে করলে ওটা কিনে দিতে পারি, সেটা ভাবতেই আমার কতো যে ভালো লাগছে, কি করে বোঝাই তোমাকে।'

'না বব, ও কোট আমি চাই না।' ম্লান স্বরে বললো প্যাট, 'খুব দামী হবে ওটা—'

'তা হোক, তোমার যখন পছন্দ নিতেই হবে তোমাকে। কালই কোটটা পাঠিয়ে দিতে বলবো।'

মিষ্টি করে হেসে রাস্তার মাঝেই প্যাট আমার মুখে চুমু খেলো। তারপর আমার দিকে তাকায় গাঢ়স্বরে বললো, 'ঠিক আছে, এবার তোমার পালা। পাশেই ছিলো পুরুষদের একটা পোষাকের দোকান। সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাট বললো, 'এখান থেকে একটা টেইল কোট তোমাকে নিতে হবে। আমার ফার-এর কোটের সঙ্গে এটিও কাল বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলবো। সেই সঙ্গে তোমার একটা টপ হ্যাটও চাই। টুপিটা পড়লে তোমাকে কেমন দেখাবে ভাবছি—'

'কেমন আবার দেখাবে?' বললাম, 'তোমার ওই চিমনি সাফাই করা ধাঙ্গরদের মতোই দেখাবে আর কি।' তারপর দোকানের শোকেসে সাজানো টেইল কোটগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো গত বসন্তেই এই দোকান থেকে একটা বাহারি টাই কিনেছিলাম। তখন সবে প্যাট-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কথাটা মনে হতেই মনটা কেমন দমে গেলো। সেই বসন্তে আমার মনের অবস্থা, আর এই শরতে প্যাট-এর অসুখের জন্য আমার এথ যে উদ্বেগ, কে জানতো এমন দশা হবে!

প্যাট এর শীর্ণ হাতখানি টেনে এনে আমার গালে ছোঁয়ালাম, ওর উষ্ণ হাতের স্পর্শ খুব ভালো লাগলো। 'আরও দু'একটা পোশাক দরকার তোমার। শুধু মিঙ্কের কোট, এ যেন এঞ্জিন ছাড়াই গাড়ির মতো। তাই এর সঙ্গে চাই গোটা

দু'তিন ইভিনিং ড্রেস—'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো তুমি। অবশ্যই ইভনিং ড্রেস চাই। ওটা না হলে ঠিক মানায় না।'

খুব ভালো তিনটি ইভনিং পোশাক বেছে নিলাম। এ খেলায় প্যাট খুব মেতে উঠেছে। ইভনিং ড্রেসের প্রতি বরাবরই ওর একটা দুর্বলতা আছে, আমি জানতাম। ও নিজেই পোশাকের সঙ্গে আরো দু'একটা জিনিষ পছন্দ করলো, আমিও ওকে সাহায্য করলাম এ ব্যাপারে। খুশিতে উজ্জ্বল প্যাট—ওর এই ভাবখানি দেখার জনাই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম অনেক দিন থেকে। আর মনে মনে হাসছি—একদিকে ভালোবাসা, অন্য দিকে খালি পকেট—এ যেন এক অদ্ভুত বৈপরিত্য। না, ওকে খুশি করতেই যখন নেমেছি, তখন সেটা সম্পূর্ণ করাই ভালো। নিজের মনকে চাঙ্গা করে বললাম ওকে, 'এসো, আমার সঙ্গে।' এই বলে ওকে একটা জুয়েলারির দোকানে টেনে নিয়ে গেলাম। 'ওই যে ওই পান্নার ব্রেসলেট জোড়া চাই, সেই সঙ্গে ওই আংটি আর ইয়াররিং।' প্যাট আপত্তি জানালে আমি বলে উঠলাম, 'না, আজ কোনো কথাই তোমার শুনবো না। আমি জানি, ওই পান্নার অলঙ্কারে সুন্দর মানাবে তোমাকে।'

'বেশ, তোমাকেও নিতে হবে ওই প্লাটিনামের ঘড়ি কভার, তোমার শার্টের জন্য মুক্তোর ওই বোতামের সেটটা।'

'এতে আমার সাধ পুরোপুরি মিটলো না। দোকান উজাড় করে সব জিনিষ যদি কিনতে পারতাম—'

'না গো না, ঢের হয়েছে। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি অনেক হয়েছে', ও আমার গা ঘেঁষে বললো, 'এখন আমাদের দরকার শুধু কয়েকটা ট্রাঙ্ক-বাক্সর। তারপর জিনিষপত্তর গোছগাছ করে এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া অন্য কোনো শহরের উদ্দেশ্যে, যেখানে বৃষ্টি নেই, নেই শরৎকাল।' ভাবলাম, কথাটা ও মন্দ বলেনি। ওর যা অসুখ, তাতে একবার হাওয়া বদলাতে পারলেই ওর সব অসুখ নিরাময় হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কোথায় যাওয়া যায় বলো তো? ইজিপ্টে, নাকি আরো দূরে ভারতবর্ষে কিংবা চীন দেশে?'

'যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে চলো—যেখানে অপর্যাপ্ত সূর্যের তাপ আর দক্ষিণা বাতাস বয়। কে জানে হয়তো সেখানেও বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টি ছাড়া কোন দেশ কি আছে?'

'তাহলে চলে যাবো কোনো উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে, ধরো যেমন প্যাসিফিকের কোনো দ্বীপে।'

হামবুর্গ আমেরিকা লাইনের প্রকাণ্ড অফিস বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাঝখানে জাহাজের ছোট্ট একটা মডেল—নীল ঢেউ-এর উপর দিয়ে ভেসে চলেছে

জাহাজটা। জানালার কাছে বড় বড় রঙিন ম্যাপ—বিভিন্ন দেশের। সেই ম্যাপগুলোর দিকে তাকিয়ে প্যাট বলে উঠলো, 'দেখ, আমরাও আমেরিকাতে যাবো, যাবো টেকসাস, নিউইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকো, গাওয়াই। তারপর দক্ষিণ আমেরিকায়, মেক্সিকোয়, পানামা খাল পেরিয়ে যাবো বুয়েন্স আয়ারসে। সব শেষে রিও-ডি-জেনিরো হয়ে দেশে ফিরে আসবো।

রিয়ো-ডি-জেনিরোর নাম শুনেই ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের একটা দিনের কথা মনে পড়ে যেতেই ওকে বললাম, 'জানো প্যাট, ওইসব দেশগুলোর কোনোটাতেই আমি কখনো যাইনি। তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম।'

'আমি জানতাম', বললো প্যাট, 'আর তখনি ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম।'

'তখন তোমাকে দেখে রীতিমতো আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বোকার মতো কথা বলতাম। তোমার মন জয় করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতাম।'

'তা আমাকে পেয়ে এখন তোমার মাথা ঠিক হয়ে গেছে তো ?'

'না, আরো বেশী গুলিয়ে গেছে', জাহাজের মডেলটা দেখিয়ে ওকে বললাম, 'যাই বলো, এরকম জাহাজে চড়ে যেতে না পারলে আমাদের জন্মটাই বৃথা।'

আমার হাত প্যাট ওর হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এক এক সময় আমি ভাবি, ঈশ্বর কেন আমাদের বিত্তবান করলেন না? অথচ দেখো, টাকা খরচের চমৎকার মতলবগুলো কেমন আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি। আবার বিত্তবান লোকগুলোকে দেখো, ওরা কেবল ব্যাংক আর অফিস, অফিস আর ব্যাংক ছাড়া অন্য আর কিছু ভাবতেই পারে না।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যই তো ওদের টাকা হয়েছে', আমি বললাম, 'আমাদের হাতে টাকা এলেও খুব বেশীদিন যে ধরে রাখতে পারতাম, মনে হয় না।

'তুমি ঠিকই বলেছো, আমাদের হাত গলে টাকাগুলো ঠিক বেরিয়ে যেতো।'

'আবার টাকা পাছে ফুরিয়ে যায়, সেই ভয়েই হয়তো খরচ করবার বাসনাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হতো। তাই টাকা জমানোটাই একটা ব্যবসা বিশেষ। আর সেটা খুব সহজ ব্যবসা নয়। ওরকম ব্যবসা চালাতে গিয়ে আমাদের মতো লোদের মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হবে।'

'হ্যাঁ, ওরকম ব্যবসায়ী হয়ে আমাদের কাজ নেই', বললো প্যাট, তার চেয়ে বরং কল্পনা করে নিই না কেন, আমরা এককালে ধনী ছিলাম, এখন সব খুইয়ে বসেছি। এই মাত্র কিছুদিন আগে আমরা দেউলে হয়ে গেছি কি বলো ?'

'তা আজকাল হামেশাই তো এরকম ঘটছে। আমাদের কল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

এবার প্যাট হেসে ফেললো, 'তবে আর কি, চলো, আমরা দুজন দেউলে ফিরে চলি আমাদের গরীবের কুঁড়ে ঘরে। সেখানে গিয়ে আমাদের সুদিনের গপ্প করে কল্পনায় নকল বিত্তবান হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করা যাবেখন।'

'তা মন্দ হয় না। চলো তাহলে যাওয়া যাক এবার।' অন্ধকার নামছে। আমরা বাড়ি ফিরে চললাম অতঃপর।

বাড়ি ফেরার প্রায় আধঘণ্টা পরেই হঠাৎ শয়নকক্ষের দরজায় নক করার শব্দ হতেই ভাবলাম, এ নিশ্চয়ই হেসির কাজ। উঃ, আবার সে তার দুঃখের ফিরিস্তি দিতে এসেছে বোধহয়। কিন্তু দরজা খুলতেই দেখি ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফ্রাউ জালেওয়াস্কি। ওঁর চোখে মুখে দারুণ ব্যস্ততার ছাপ। 'তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন', হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি।

'কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?'

'হেসির ঘর ভেতর থেকে বন্ধ', বললেন তিনি, 'শত ডাক দিয়েও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি!' চমকে উঠে বললাম, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনি আসছি।' ঘরের ভেতরে গিয়ে প্যাটকে বললাম, 'তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমি ততক্ষণে হেসির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।' তারপর ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

হেসির ঘরের সামনে এসে দেখি, হোটেলের সবাই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। তাদের মধ্যে রয়েছে কিমানো পরিহিতা আরনা বোনিগ, মিলিটারি ঢঙের জ্যাকেট একাউন্টেন্ট ভদ্রলোক, বেচারী আরলফ ভ্যাবাচাকা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে হেসির ঘরের সামনে। ওদিকে ছোকরা জর্জ ভয়ে ভয়ে দরজায় মৃদু টোকা দিচ্ছে আর চাপা গলায় হেসির নাম ধরে ডাকছে। সেই ভীড়ের মধ্যে ফ্রিডাকেও থাকতে দেখলাম। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ভদ্রলোক আজ বাড়ি থেকে একবারও বেড়োন নি। সারাটা দুপুর এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিকেল থেকে ওঁর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

'ভেতর থেকে চাবি দেওয়া', বললো জর্জ, 'চাবিটা তালায় ঝুলছে।'

'তাহলে তো চাবিটা খুঁচিয়ে খুলে ফেলতে হবে', ফ্রাউ জালেওয়াস্কির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আপনার কাছে বাড়তি চাবি আছে?'

তার হয়ে ফ্রিডাই বললো, 'চাবির তাড়াটাই নাহয় নিয়ে আসি, একটা না একটা ঠিক লেগে যাবেই।'

প্রথমে লোহার তার ঢুকিয়ে খোঁচা দিতেই চাবিটা ঘরের ভেতরে মেঝের উপরে পড়তেই ঝন করে একটা শব্দ হলো। এরপর চাবির তাড়া থেকে একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে দেখতে দেখতে একটা চাবি লেগে গেলো শেষ পর্যন্ত। তারপরেই

দরজা খুলে ফেললাম।

অন্ধকার ঘর। প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তবু তারই মধ্যে ফ্রিডা চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ওই তো উনি, ওই যে জানালার কাছে, 'আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল সে। ওর নিঃশ্বাসে রসুনের গন্ধ।

সবার আগে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল আরলফ। হঠাৎ পিছিয়ে এসে বললো সে, 'না না, ও কিছু নয়।' এই বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো বাইরে বেরিয়ে এসে। 'দেখুন, ভালো চান তো আপনারা যে যার ঘরে ফিরে যান। কে জানে কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে আপনারা হয়তো ভয় পেতে পারেন।' রুশ আর জার্মান ভাষা মিশিয়ে জগাখিচুরি ভাষায় কথা বলছে সে, তবে একেবারে দুর্বোধ্য নয়।

'ওরে বাবারে', অস্ফুটে বলে ফ্রাউ জালেওয়াস্কিই প্রথমে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। আরনা বোনিগও অনুসরণ করলো তাঁকে। কেবল ফ্রিডা বেপরোয়া ভাবে এগোবার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল তখনো।

তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আরলফ বলে উঠলো, 'দেখুন, আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি—'

হঠাৎ একাউন্টেন্ট ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বলে উঠলো, 'লোকটা একজন বিদেশী হয়ে আমাদের উপরে খবরদারি করতে এসেছে?'

তার কথায় কান দিলো না আরলফ। বরং তার উদ্দেশ্যে পাল্টা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, 'বিদেশী আবার কিসের? এখানে বিদেশীর প্রশ্ন উঠছে কি করে শুনি?'

ফিসফিসিয়ে বললো ফ্রিডা; 'ভদ্রলোক মারা গেছেন নাকি?'

আমি এবার ফ্রাউ জালেওয়াস্কির দিকে ফিরে বললাম, 'আরলফ আর আমি এখানে থাকি; আর বাকীদের এখানে না থাকাই ভালো।'

কেউ একজন কাছাকাছি কোন এক ডাক্তারকে ফোন করে দিন', বললো আরলফ। জর্জ তার বলার অপেক্ষা রাখেনি। আগেই ফোন করে দিয়ে এসেছে সে। ওদিকে একাউন্টেন্ট ভদ্রলোক চটে লাল। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, 'আমি এখান থেকে এক পাও সরছি না, আমি এখানেই থাকবো। একজন জার্মান নাগরিক হিসেবে এখানে থাকবার অধিকার আমার আছে।'

অগত্যা ফিরে আবার দরজা খুলে দিতে বাধ্য হলো আরলফ। তারপর ঘরের আলোটা জেলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। তখন সবার চোখের সামনে একটা ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠেছে—জানালার কাছে ঝুলছে হেসি। মুখের রঙ তার কালচে নীল, জিভ বেরিয়ে গেছে।

'দড়িটা কেটে ওঁর দেহটা নিচে নামালে হতো না?' আমি বললাম।

'তাতে কোন লাভ হবে না', বললো আরলফ, 'আমি দেখেই বুঝে গেছি, দু'চার ঘণ্টা আগেই উনি মারা গেছেন। তাছাড়া আমাদের কোনো কিছু না করাই ভালো,

বরং আগে পুলিশ আসুক—'

স্ত্রীর সিল্কের কটিবন্ধ গলায় জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়েছিল হেসি। গলায় ফাঁস দেবার আগে দাড়ি কামিয়েছে, পরিস্কার পোষাক পড়েছে। টেবিলের উপরে রেখে গেছে তার ব্যাঙ্কের পাশ বই, চারখানি দশ মার্কে'র নোট আর কিছু খুচরো টাকা। আর দুখানি চিঠি—একটি তার স্ত্রীর নামে আর একটি পুলিশকে লেখা। এর থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অনেক কিছু ভেবে চিন্তেই এ কাজ সে করেছে। হাত ধোবার জায়গায় দেখা গেলো সেখানে আরো কিছু টাকার সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকুট—'এ মাসের ভাড়া বাবদ—'

একটু পরেই দুজন পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে এসে ঢুকলো। ইতিমধ্যে দড়ি কেটে মৃতদেহ নামানো হয়েছিল মেঝের উপরে। তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললো, 'না, দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। এটি যে আত্মহত্যার কেস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

পুলিশের লোক দুটি দরজা বন্ধ করে তাদের প্রয়োজনীয় তদন্তের কাজ সেরে নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলো, 'এই আত্মহত্যার কারণ আপনারা কেউ জানেন?'

আজ সকালে হেসির মুখ থেকে যা শুনেছিলাম; তাই বললাম পুলিশকে। শুনে পুলিশ অফিসারটি আমার নাম ঠিকানা লিখে নিলো তার নোটবুকে। তারপর মৃতদেহ এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে পুলিশ অফিসার দুজন চলে গেলো সেখান থেকে। আরলফ দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো।

'এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা নয়', আমি বললাম।

'আমিও আপনার সঙ্গে একমত', সায় দিলেন ফ্রাউ জালেওয়াস্কি।

এবার বেয়াদপ ফ্রিডারের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, ফ্রাউলিন হোলম্যানের কাছে এ ব্যাপারে তুমি মুখ খুলেছো কি তোমাকে আমি ছেড়ে কথা বলবো না, বুঝলে?'

ফ্রিডা এবার মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'আহা ন্যাকা, আমি যেন কিছু জানি না। ওই ভদ্রমহিলা এমনিতেই যা অসুস্থ—'

ওর অমন বিশ্রী কথার ধরণ দেখে ইচ্ছে হচ্ছিল দুটো ঘুঁষি জমিয়ে দিই তার গায়ে। অনেক কষ্টে আমার সেই রাগটা সম্বরণ করলাম।

কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন এ্যাকাউণ্টেণ্ট ভদ্রলোক। ও'র কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে বললাম, 'আপনি মিথ্যে কাউণ্ট আরলফের সঙ্গে অমন একটা বিশ্রী ব্যবহার করলেন। ও'র কাছে আপনার উচিত ক্ষমা চাওয়া।'

বৃদ্ধ রাগে চিৎকার করে উঠলেন। 'জার্মাণরা কারোর কাছে কখনো ক্ষমা চায় না। তা তো আবার এশিয়াটিক—' আর কোনো কথা না বলে সোজা তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

অবাক হয়ে আমি বললাম, 'ভদ্রলোক আগে তো বেশ ভালোমানুষ ছিলেন। তা হঠাৎ ও'র হলোটা কি বলুন তো ?'

জবাবে বললো জজ', 'গত কয়েকমাস ও'কে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সভায় যেতে দেখা যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি!'

□ বারো □

অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন ডঃ জাফের আহ্বানে তাঁর ক্লিনিকে যেতে হলো আমাকে। মেঘলার দরুণ সকাল দশটার সময়েও ক্লিনিকে আলো জ্বলতে দেখলাম। জাফে তাঁর বিরাট কনসাল্টিং রুমে বসে ছিলেন। আমিই প্রথমে কথা বলতে শুরু করলাম, 'আমি জানি কেন আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

অস্পষ্ট ভাবে কি যে বললেন জাফে ঠিক বোঝা গেলো না। আমি আবার নিজের থেকেই বললাম, 'মনে হয় হাওয়া বদলাতে প্যাট-এর অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ', গম্ভীর গলায় এবার তিনি স্পষ্ট করে বললেন, 'ভেবেছিলাম, অক্টোবরের শেষে গেলেই চলবে, কিন্তু এখানকার যা আবহাওয়া এখন—'

'তা আপনি ওকে কখন যেতে বলেন ?' জানতে চাইলাম আমি।

ডঃ জাফে চোখ তুলে সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন, 'কালই।'

মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, বুঝি আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে যাচ্ছে। তবে সহজেই সামলে নিলাম। তেমনি সহজ সুরেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ওর অবস্থাটা কি খুবই খারাপের দিকে বলে মনে করছেন ?'

'না না', জোরে জোরে মাথা নেড়ে জাফে বললেন, 'সেরকম কিছু হলে কোথাও ওর যাবার মতো শক্তি থাকতো না। বরং বলতে পারি, ও এখন মোটামুটি ভালোর দিকেই। তবে কিনা এরকম বিশ্রী আবহাওয়া প্রতিটি দিনই ওর কাছে বিপদের কথা, সর্দি, জ্বর, আরো কতো কি হতে পারে বলা তো যায় না—'

তারপর ডেস্ক থেকে কতকগুলি চিঠি বার করে তিনি বললেন, 'আমি সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছি, এখন আপনারা সেখানে গেলেই হয়। স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তার আমার ছাত্র ছিলো। ভালো ডাক্তার। ওকে আমি প্যাট-এর অসুখের ব্যাপারে বিস্তারিত সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি। চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে

তিনি আরো বললেন, 'আপনার মনের কি অবস্থা এখন বুঝতে পারছি। খুবই দুঃখের কথা।'

'না, দুঃখে আমি কাতর হইনা। আমি কেবল একটা কথা জানতে চাই ডাক্তার, ও আবার ফিরে আসবে তো?'

ডঃ জাফের ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'এখনি ও কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এই জন্যে যে, ওর ফিরে আসবার সম্ভাবনা যদি নাই থাকে, তাহলে না যাওয়াই কি ভালো নয়?'

'এ্যা, কি বললেন আপনি?' আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ডঃ জাফে বললেন, 'এর অবশ্যম্ভাবী ফল কি জানেন?'

'জানি', আমি বললাম, আর এও জানি, একা, নিঃসঙ্গভাবে ওকে মরতে হবে না।'

জাফের মুখ দেখে মনে হলো, ভেতরে ভেতরে খুবই ভয় পেয়েছেন তিনি। থমথমে মুখ। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বয়স কতো হলো?'

'তিরিশ।' বয়স জিজ্ঞেস করার অর্থ'টা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'তিরিশ? মাত্র তিরিশ!' নিজের মনে বলে কি যেন ভাবতে থাকলেন তিনি। তারপর আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার যাট পূর্ণ হতে চললো। তবু আপনার মতো ও কথা বলতে পারতাম না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতাম।' আমাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি নিজেই এবার মৃদু হেসে বললেন, 'দেখবেন, শীতটা বেশ ভালো ভাবেই কেটে গেছে।'

'শুধু শীতটা?'

'তা কেন, শুধু শীতটাই বা হতে যাবে কেন? আমার তো ষোলো আনা আশা, শীতের পর সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উনি এখানে ঠিক ফিরে আসবেন।'

'কথা দিলেন তো?'

'হ্যাঁ দিলাম বৈকি।' তারপর সখেদে বললেন তিনি, 'আপনাকে কি আর বলবো মশাই, ওকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিতে গিয়ে আমারই কি কম মন খারাপ হচ্ছে? তা এবার বলুন, আপনি কি মনস্থির করলেন?'

'ঠিক আছে, আজ রাতেই যাচ্ছি।' জাফের সঙ্গে করমর্দন করে ওঁর ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এলাম। জাফের দেওয়া চিঠিগুলো আমার হাতে ধরা তখনো। এবার সেগুলো গুছিয়ে পকেটে চালান করে দিলাম।

বাড়ি ফিরলাম দুপুরে। তাড়া নেই, আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। একটা পাঠিয়ে দিয়েছি স্যানাটোরিয়ামে। ঘরে ঢোকার মুখে প্যাটকে বললাম, 'আজই যাচ্ছি আমরা, সন্ধ্যার মধ্যে সব জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিও।'

'একান্তই কি যেতে হবে?'

'হ্যাঁ প্যাট, যেতেই হবে। চিন্তা করো না, তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

প্যাট-এর বিবর্ণ মুখে বুঝি একটু রঙ-এর পরশ লাগলো। পরক্ষণেই ও ওর জিনিষপত্তর গোছগাছ করতে শুরু করে দিলো। ট্রাংকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ও। দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, প্রথম যেদিন ও এখানে এসেছিল, সেদিনও এমনি হাঁটু মুড়ে বসে ও ওর জিনিষপত্তর বার করছিলো ট্রাংক থেকে। যেন কতকাল আগের কথা, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, না, এই তো কালকেরই ঘটনা যেন।

'ঘরের আসবাবপত্তর, এসব কোথায় থাকবে বব?' আমার দিকে মুখ তুলে ও জিজ্ঞেস করলো।

'এ ব্যাপারে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে আবার কথা হয়েছে—কিছু জিনিষ আমার ঘরে সরিয়ে রেখে যাবো, আর বাকী সব কোনো ফার্মের হেফাজতে রেখে যেতে হবে। তুমি ফিরে এলে আবার সেগুলো নিয়ে আসবো।'

'হ্যাঁ, আমি ফিরে এলে তো!' ওর কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর বেজে ওঠে।

'ও কথা বলছো কেন', বললাম, 'শীতের পরে তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন রোদে পুড়ে তোমার গায়ের রঙ দেখবে বাদামী হয়ে গেছে।' এই বলে ওর মনটা ভোলাবার জন্যে ওর জিনিষপত্তর বাঁধা ছাঁদার কাজে সাহায্য করতে থাকলাম, শেষ হলো বিকেলের পর। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আলমারি আর দেরাজগুলো শূন্য। ঘরটা এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা আর ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে।

ক্লান্ত প্যাট বিছানায় বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। জাণালার সামনে গিয়ে বাইরে বৃষ্টি ঝরা সন্ধ্যার পূর্বাভাস দেখতে থাকি আমি তখন। খানিক পরে ঘরের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে সারা ঘরটা। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। কেবল প্যাট-এর ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আটটা বাজবার পরেই বাইরে হর্ণের আওয়াজ ভেসে আসতেই প্যাটকে আমি বললাম, 'ওই বোধহয় গটফ্রিড ট্যাক্সি নিয়ে এলো' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওকে বললাম, 'একটু দাঁড়াও আমরা যাচ্ছি।' তারপর চটপট রাম-এর বোতলটা মুখে ঠেকিয়ে ঢকঢক করে এক গ্লাস মদ গিলে ফেললাম। রাম-এর নেশায় শরীরটা এখন বেশ চনমনে বলে মনে হলো। প্যাটকে আবার তাড়া দিলাম, 'কি, তুমি তৈরী? চলো, এবার তাহলে যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত', ও সাড়া দিয়ে বললো, 'তবে একবারটি তোমার ঘরে যেতে হবে। একটু দাঁড়াও, আমি এখনি এলাম বলে।'

প্যাট চলে যাওয়ার পর অপেক্ষা করতে থাকি। ওর দেরী হতে দেখে পায়ে পায়ে আমার ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমাকে দেখে ভূত

দেখার মতো চমকে উঠলো ও। আর আমিও ঠিক সেই মুহূর্তে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দমকা হাওয়ায় ঘরের মোমবাতিটা নিভে গেলে যেমন সেখানে এক বুক শূন্যতা বিরাজ করে, ওর চেহারার মধ্যে ঠিক সেটাই প্রকাশ পাচ্ছিল তখন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলো ও, 'হ্যাঁ, চলো, এবার যাওয়া যাক—'

ঠিক বেরোবার মুখেই দেখা হয়ে গেলো ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে। আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। নিচু গলায় প্যাটকে বললাম, 'সাবধান, উনি তোমাকে বিদায় মুহূর্তে একটু আদর না করে ছাড়বেন না, দেখো!' আমার কথা শেষ হতে না হতেই গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি প্যাটকে। বেচারী, রীতিমতো দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর তখন। বুড়ির স্নেহ মমতা সব উজার করে দিয়ে তেমনি আদ্রকণ্ঠে বললেন প্যাটকে, 'বাছা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসতে পারো এখানে। চিন্তা করো না, তোমার ঘর তোমারই থাকবে। আর এর মধ্যে যদি স্বয়ং কাইজারও তোমার ঘরটা দখল করে বসেন, তাঁকেও ঘর ছেড়ে দিতে হবে তুমি ফিরে আসা মাত্র।'

'ধন্যবাদ ফ্রাউ জালেওয়াস্কি', বললো প্যাট, 'অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কথা আমার অবশ্যই মনে থাকবে। আপনার কোনো কথাই আমি ভুলবো না, বিশেষ করে আপনি একদিন তাসের খেলায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে কথাও মনে থাকবে আমার। বিদায়, বিদায় ফ্রাউ জালেওয়াস্কি।'

তারপরেই প্যাট আমাকে অনুসরণ করে নিচে নেমে এলো নিঃশব্দে, মন্থর, অতি মন্থর গতিতে। হঠাৎ তখন আমার মনে হলো, ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর আমি যেন আবার ফিরে চলেছি যুদ্ধের সীমান্তে।

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আলফনস। মুখটা নামিয়ে প্যাটের হাতে চুমু খেলো সে। লেনতস ওকে বললো, 'শুধু আদর করলেই হবে না, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ করেলে প্যাটকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে। তাই এখন বেশ কড়া দেখে একটা পানীয় দাও তো।'

আলফনস-এর ইশারায় হান্স সঙ্গে সঙ্গে ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এসে হাজির হলো। 'তোমার পছন্দ মতো যে কোনো পানীয় বেছে নিতে পারো গটফ্রিড', বললো আলফনস। তবে কুমেল পান করে খিদে বাড়াতে পারো।'

'আরে ভদকার কাছে ওসব কিছুই নয়' মুখ বিকৃত করে বললো লেনতস।

'দেখুন তো ম্যাডাম', প্যাটকে উদ্দেশ্য করে আলফনস বললো, 'ওর মতো একগুঁয়ে লোক দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। সেই কোন ১৯১৯ সাল থেকে ওকে ভদকা পান করতে দেখে আসছি, ওর সেই গোঁ আজও অব্যাহত। যাইহোক, আপনারা যেটা

খুশি পান করতে পারেন।'

'সত্যি দারুণ স্বাদ কুমেলের', উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো প্যাট, 'ঠিক যেন পাহাড়ী দুধের মতো ঠাণ্ডা।'

'শুনে খুশি হলাম, কুমেলের সমাদর বড় একটা কেউ করে না, আপনিই কেবল ব্যতিক্রম।' কাউণ্টার থেকে কুমেলের বোতল এনে বললো আলফনস, 'দ্বিতীয় গ্লাস হয়ে যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই', মাথা নেড়ে সায় দেয় প্যাট।

দ্বিতীয় গ্লাসটা নিঃশেষ করে আবেশে আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকালো প্যাট। খালি গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে আমি এবার আলফানসকে বললাম, 'কই দাওতো তোমার ওই কুমেল, একটু পরখ করে দেখি!'

'হ্যাঁ, এসো সবাই এক গ্লাস করে কুমেল পান করা যাক', বললো আলফনস, 'তারপর খরগোশের মাংস, বাঁধাকপির স্যুপ আর শেষ পাতে আপেলের চাটনি। দারুণ জমবে, কি বলো তোমরা?'

আমরা সবাই ওর কথায় সায় না দিয়ে থাকতে পারলাম না, ওর কথার মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ ছিলো, যা অস্বীকার করা যায় না।

সমাপ্তিটা মধুর করে তোলার জন্যে কোন এক ফাঁকে গ্রামোফোন চালিয়ে দিয়েছিল আলফনস—কসাকদের কোরাস গান। মূলত কেবল একজনের কণ্ঠেই গান শোনানো হচ্ছে, আর অন্য সবাই স্রেফ সুর টেনে যাচ্ছে।'

গানের সুরটা বড় মিষ্টি, বড় মধুর যেন। সেই মিষ্টি গলার গানটি শুনতে গিয়ে মনে হলো যেন এক অতি বৃদ্ধ, অতি ক্লান্ত লোক চুপিসারে ঘরে ঢুকে তরুণ বয়সে নিজেরই গাওয়া গান শুনছে। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো গানের সুরটা ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে মিলিয়ে গেলো বাতাসে। আর তখনি আলফনস বলে উঠলো, 'এই গানটা শুনলেই আমার কি মনে হয় জানো, ১৯১৭ সালের সপ্রেসের কথা মনে পড়ে যায়। তোমার মনে আছে গটফ্রিড, মার্চ মাসের সেই রাতে যেদিন বার্টেলসম্যান—'

'হ্যাঁ, কেন মনে থাকবে না', উত্তরে বললো লেনতস, 'সেই রাতে চেরি গাছে—'

এই সময় বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কোষ্টার, 'এখনি আমাদের বেরোতে হবে।'

প্যাট উঠে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় বললো, 'এবার তাহলে আসি আলফনস। বিদায় বেলায় এখানে এসে খুব আনন্দ পেয়ে গেলাম।' তারপর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই সে ওর হাত চেপে ধরে ওর মতোই ভারি গলায় বললো, 'বিদায়, আশা করি খুব শীগগীর আবার আমাদের দেখা হবে।' একটা চাপা কান্নায় তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

কোষ্টার আর লেনতস আমাদের স্টেশনে পেঁছে দিতে এলো। স্টেশনে

পেঁছনো মাত্র ট্রেন এসে গেলো। কামরায় উঠে বসতে না বসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিলো। চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আপত্তি সত্ত্বেও আমার হাতে একটা মদের বোতল ধরিয়ে দিয়ে বললো সে, 'আবার দেখা হবে প্যাট। কাজে একটু ঢিলে পড়লেই আমরাও তোমাদের ওখানে চলে যাবো, দেখো। তোমাকে নিয়ে দল বেঁধে আমরা ফুর্তি করবো।'

ট্রেনটা একটা বাঁক নিতেই স্টেশনটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। প্যাট-এর চোখে জল চকচক করতে দেখলাম। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলাম, 'কেঁদো না প্রিয়তমা, আজ সারাটা দিন তোমাকে কাঁদতে না দেখে মনে মনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। তোমার চোখে জল দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'

'কই, আমি তো কাঁদছি না', বললো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ওর শীর্ণ গাল দু'টি বেয়ে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেলো।

ওকে আরো নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'চলে যাবার সময় সবারই মন একটু আধটু খারাপ হয়ে থাকে, তার জন্যে কিছু ভেবো না।'

'না বব, আমি কিছুই ভাবছি না। দেখো না, একটু পরেই আমার মন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু লক্ষীটি, কিছুক্ষন আমার দিকে তুমি তাকিও না। আমাকে একটু চুপচাপ বসে থাকতে দাও। বলেই মুখ ফিরিয়ে রইলো ও কিছুক্ষণ।

তারপর এক সময় ও আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে এবার মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলো। আমি ওকে বুকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'যতক্ষণ না ভাগ্যের কাছে হার মানছি, ততক্ষণ ভাগ্য আমার কাছে পরাজিত। আর যুদ্ধে এটাই হলো নিয়ম।'

ক্ষীণ কণ্ঠে বললো প্যাট, 'তোমার মতো আমার অতো সাহস কই বব। বরং সব সময় ভয় হয়, এই বুঝি শেষের সেই দিনটি এসে গেলো। উঃ কি ভয়ংকর সেই দিনটি!'

'তা ভয় না থাকলে সাহসই বা আসবে কোত্থেকে প্যাট?'

আমার বুকে মুখ রেখে বললো প্যাট, 'ভয় যে কি তুমি তা জানই না বব?'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি', ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললাম, 'বেশ ভালো ভাবেই জানি প্যাট।'

এক সময় টিকিট চেকার এলো। প্যাট-এর টিকিটটা দেখে মুখ গম্ভীর করে বললো সে, 'এ তো দেখছি স্লিপিং কার-এর টিকিট। তাহলে তো ওঁকে স্লিপিং কারে চলে যেতে হবে। অন্য কামরার টিকিট এখানে চলবে না।'

অগত্যা ওকে স্লিপিং কারে রেখে আসতে হলো। প্যাট-এর বিছানাপত্তর আগেই স্লিপিং কারে রেখে গিয়েছিল জাপ। কামরাটি বেশ ছিমছাম, সুন্দর। মেহগিনি

কাঠের রেলিং। নিচের বার্থ প্যাট-এর জন্য রিজার্ভ করা ছিলো, উপরের বার্থের যাত্রিনী ফ্র্যাঙ্কফোর্ট থেকে উঠবে। আমাদের প্রিয় কুকুরটাকে লাগেজ ভ্যানে রেখে আসার জন্য হুকুম করেছিল টিকিট চেকার। করলেই হলো যেন। সব কথা কি ওদের শুনতে আছে? প্যাটকে ওর স্লিপিং কারে বসিয়ে রেখে কুকুরটাকে আনতে ছুটলাম, ইচ্ছে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ওটাকে প্যাটের কামরাতেই রেখে যাবো। সেই মতো কুকুরটাকে ওর কামরায় রাখতে এলে প্যাট বললো, 'জানো বব, এখন আমার মন ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো চিন্তা নেই।'

'বেশ তো, না থাকলেই ভালো।' আমি ওকে বললাম, 'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়ো তো। তোমার ঘুম না আসা পর্যন্ত আমি তোমার পাশটিতেই বসে থাকছি।'

'তা নাহয় বসলে', বললো প্যাট উপরের খালি বার্থটার দিকে তাকিয়ে 'কিন্তু হঠাৎ যদি ওই বার্থের যাত্রিনী এসে পরে, আর ধরো সে যদি নারী রক্ষণ সমিতির সভানেত্রী হয়, তখন কি হবে?'

'অতো চিন্তা কিসের, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট আসতে অনেক দেরী আছে এখনো। যথা সময়ে আমি ঠিক আমার কামরায় ফিরে যাবো, দেখো।' ট্রেনটা ফ্র্যাঙ্কফোর্ট পৌঁছনোর একটু আগে নিঃশব্দে ওর কামরা থেকে বেরিয়ে আমি আমার কামরায় ফিরে গেলাম। সারাটা দিন খুবই পরিশ্রম হয়েছিল, তাই শুতে না শুতেই নিদ্রাদেবী এসে ভর করলো আমার দুটি চোখে। এক সময় ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে রাতের অন্ধকার সরে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে। রাতভোর অবিরাম তুষারপাতের ফলে বাইরেটা বিরাট একটা শ্বেতপাথরের থালার মতো দেখাচ্ছিল যেন। কামরার ভেতরেও ভোরের আলো তখন বাচ্চা মেয়ের মতো লুটোপুটি খাচ্ছিল। ট্রেনটা তখন একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে চলছিল। বেলা ন'টা বাজতেই মুখ ধোওয়ার জন্য কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। দাড়িটাও কামিয়ে নিলাম টয়লেটে। ফিরে এসে দেখি প্যাট দাঁড়িয়ে আছে আমার কামরায়। সকালের আলোয় ঢিলে ঢালা পোশাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ওঁকে নতুন দিনের আলোয় বেশ তাজা দেখাচ্ছে।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়েছিল তো?' একটু থেমে ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বললাম, 'ও হ্যাঁ, উপরের বার্থে বুড়িটাকে কেমন দেখলে বলো?'

মুচকি হেসে প্যাট বললো, 'না, মোটেই ও বুড়ি নয়। অল্পই বয়েস, যুবতী আর রীতিমতো সুন্দরীও। নাম ওর হেলগা গুটম্যান। আমার মতো সেও ওই একই স্যানাটোরিয়ামে থাকতে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' প্যাট বললো, 'চলো, এখন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

'হ্যাঁ, কফি খাবো, কফির সঙ্গে চেরি ব্রাণ্ডি মিশিয়ে। আমরা দুজনে তখন ডাইনিং কারে গেলাম প্রাতঃরাশ সারতে।

সেই হেলগা গুটম্যান মেয়েটি আগেই ডাইনিং কারে এসে বসেছিল। 'দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে চেহারা, দক্ষিণাঞ্চলের মেয়েরা যেমনটি হয় ওর মধ্যেও সেরকম হাসি খুশি ভাব লক্ষ্য করলাম। বললাম, 'কি আশ্চর্য, একই স্যানাটোরিয়ামে থাকতে যাচ্ছো তোমরা, আর পথে এমনি ভাবে দেখা হয়ে গেলো তোমাদের?'

'এ আর এমন কি আশ্চর্য ব্যাপার!' মৃদু হেসে বললো প্যাট। 'আমরা হলাম গিয়ে মরসুমি পাখির দল। শীত এলেই আমরা সবাই এক জায়গায় এসে জমায়েত হই।' আমরা যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার উল্টোদিকে একধারে এক কোণার দিকে আঙুল দেখিয়ে প্যাট আরো বললো, 'ওই টেবিলে যারা যারা বসেছে, ওরা সবাই ওই স্যানাটোরিয়ামে আবার থাকতে যাচ্ছে। গতবার ওখানেই তো ওদের সবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাই ওখানকার সবাই সবার চেনা।'

প্যাটের কথা শুনে সমস্ত ব্যাপারটা এখন আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সত্যিই তো, কতো লোকই না দ্বিতীয় দফায়, আবার কেউ কেউ বা তৃতীয় দফায় স্যানাটোরিয়ামে যাচ্ছে, কই ওদের তো এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই! মাঝখান থেকে আমিই শুধু চিন্তা করে কষ্ট পেয়েছি। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওরা যেন ফুর্তি করতে যাচ্ছে ওখানে। একটা আসন্ন পিকনিকের আমোদ প্রমোদের ছায়া পড়ে আছে ওদের চোখে মুখে। ওরা আগের বার যেমন ফিরে এসেছিল, আবার প্যাটও নিশ্চয়ই ফিরে অসবে। তবে কেনই বা ওদের আবার সেখানে ফিরে যেতে হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবসর আমার নেই এখন। আমার কাছে এখন প্যাটের ফিরে আসাটাই বড় কথা। ও ফিরে এলেই আবার আমরা দুজনে একসঙ্গে মিলিত হতে পারবো। পুরো একটা বছর, কম কি? আমার এই ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, সংসারে কম সময়ে যেটুকু পাওয়া যায়, সেটাই অনেক, অনেক কিছু, আর সেটা নিয়েই তো সত্যিকারের জীবন।

শেষ অপরাহ্নের আলোয় ট্রেনটা এসে পেঁছিলো আমাদের গন্তব্যস্থলে। দূরে আকাশটা যেখানে মাটির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, সেখানে বরফের আস্তরণের উপরে সূর্যাস্তের আভায় মনে হচ্ছিল যেন মুঠো মুঠো সোনার ঢেলা বুঝি ছড়িয়ে আছে। আর মাথার উপরে এমন ঘন নীল আকাশ কতোদিন যে দেখিনি কে জানে। লোকে লোকারণ্য ষ্টেশন প্লাটফর্ম—অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে নবাগতদের অনেকে। সবার মুখে হাসি খুশি ভাব, ফুর্তির আমেজ। হেলগা গুটম্যান এক ভদ্রমহিলা এবং

আরো দুজন লোকের সঙ্গে ফুর্তি করতে করতে চলে যেতে গিয়ে আমাদের চোখে চোখ পড়তেই চিৎকার করে বলে গেলো, 'চললাম, স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে আবার দেখা হবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলো। আমরাই শেষ যাত্রী ঘোড়ায় টানা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম। কুলি আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান দুজনে মিলে ধরাধরি করে আমাদের মালপত্তর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো। শাদা তেজিয়ান দুটো ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে চললো ঘোড়ার গাড়িটা। গ্রাম ছাড়িয়ে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরে স্যানাটোরিয়াম চোখে পড়লো এক সময়। একটা হাসপাতালের ছবি এঁকে রেখেছিলাম মনে মনে। না, নিচতলাটা দেখে ভুল ভেঙ্গে গেলো, যেন ঠিক একটা হোটেল বাড়ি। একটা বিরাট হলঘর, এদিক ওদিক ছড়ানো চেয়ার টেবিল, টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম।

আমরা সোজা অফিস ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। একজন বয়স্কা মহিলা জানালেন, প্যাটের জন্য ৭৯ নম্বর ঘরটা বরাদ্দ হয়েছে। স্যানাটোরিয়ামে আমার থাকার জায়গা নেই! ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'পাশেই আমাদের আলাদা বাড়ি আছে, সেখানে আপনার থাকার জায়গা হতে পারে।'

'তাহলে তো খুব ভালোই হয়। ওখানে আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিন।

লিফটে চড়ে দোতালায় উঠে এলাম! উপরতলাটা অনেকটা হাসপাতালের মতো। সব কিছুই বেশ পরিস্কার, ঝকঝকে, তকতকে। প্যাটকে ওর ৭৯ নম্বর ঘরে নিয়ে গিয়ে একজন নার্স বললো, 'কাল সকালে ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। ভালো ঘুম হলে শরীরের অর্ধেক গ্লানি কেটে যায়। কাল সকাল দশটায় এসে আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

'ধন্যবাদ।'

নার্স চলে গেলো অতঃপর। নার্স চলে যেতেই প্যাটকে বললাম, 'তা তুমি এখন তোমার পোশাক পাল্টাবে নাকি? না যদি পাল্টাও তাহলে বরং চলো কিছুক্ষণ নিচ থেকে ঘুরে আসি।'

'হ্যাঁ, তাই চলো।'

নিচে একতলায় হলঘরের একেবারে এক ধারে একটা ছোট টেবিল দখল করে বসলাম দুজনে। খানিক পরেই হেলগা গুটম্যান তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে এসে একটা বড় গোছের টেবিলের সামনে বসলো। খুশিতে ডগমগ ও। ওর খুশি দেখে আমিও খুশি হলাম। ভাবলাম, এ রকম বন্ধুবান্ধব পেলে প্যাট-এর পক্ষেও এখানে থাকাটা অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে।

সাতদিন পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে আবার ফিরে এলাম। স্টেশন থেকে সোজা কারখানায় এলাম। প্যাট-এর খোঁজ খবর নেওয়ার পর লেনতস একটা অশুভ খবর শোনালো।

'জানো বব, সেই স্ট্যাতস গাড়িটা নিয়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়েছি আমরা'। গাড়িটা তো মেরামত করে পার্টিকে ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু গতকাল কোম্টার মেরামতের টাকা আনতে গিয়ে দেখে ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে বাড়ির মালিক দেউলে হয়ে বসে আছে। পাওনাদারদের পাওনা টাকা মেটানোর জন্য গাড়ি সমেত তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে রিসিভার।'

'তা করুক না কেন', আমি বললাম, 'আমাদের ইনসিওরেন্সের টাকাটা পেলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।'

'সে কথা আমরাও তো ভেবেছিলাম', বললো লেনতস, 'কিন্তু মুশকিল কি জানো, গাড়িটা আদৌ ইনসিওর করা হয়নি।'

'কি সর্বনাশ', এবার আমি অটোর দিকে ফিরে ওর কাছ থেকে নিশ্চিত হতে চাইলাম, 'খবরটা ঠিক নাকি?'

অটো মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'হ্যাঁ, আজকেই তো এই সর্বনেশে খবরটা জানতে পারলাম।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'রিসিভারের কাছে আমাদের পাওনার কথা জানিয়ে এসেছি বটে, তবে মনে তো হয় না, কিছু ফল হবে।'

'তাহলে?'

'এরপর কারখানায় ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে আর কি', বিমর্ষ গলায় বললো গটফ্রিড, 'এর ওপর আবার ট্যাক্সের লোক বকেয়া ট্যাক্সের জন্য যে ভাবে তাগাদা লাগিয়েছে—'

'হ্যাঁ, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ তো আর দেখছি না।'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেনতস এবার বললো, 'বিপদের সময় এভাবে ধৈর্য হারালে চলে নাকি? তাহলে আমরা কিসের সৈনিক?' এই বলে আলমারি থেকে কোনিয়াকের বোতলটা বার করলো।

'আমাদের এখন অনেক বেশী সাহসের প্রয়োজন হবে', আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো মনে হয়, এটিই বোধহয় আমাদের শেষ স্টক। ওটা ফুরলে কিভাবে যে সাহস সঞ্চয় করবো কে জানে।'

'ও কথা ভাবলে হাসি পায়, আবার কান্নাও পায়। তাই মদ খেতে খেতে বরং সব দুঃখ ভুলে হেসে নেওয়াই ভালো, কারণ পরে আর এই হাসিরও আর সুযোগ থাকবে না বলে মনে হয়।' তাড়াতাড়ি প্রায় এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো লেনতস, 'যাই, ট্যাক্সিটা নিয়ে দু'এক চক্কর দিয়ে আসি, দু'চার টাকা

কামিয়ে নেওয়া যায় কিনা দেখি।' এই বলে অফিসঘর থেকে চলে গেলো সে।

গটফ্রিড চলে যাওয়ার পর অটোকে বললাম, 'আমাদের ভাগ্যটা দেখছি বেশ কিছুদিন ধরে খুবই খারাপ যাচ্ছে। এ অবস্থায়—'

'একজন সৈনিক হিসেবে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তাতে যে কোনো বিষয়ে বেশী মাথা ঘামাতে নেই', বললো কোষ্টার। তারপরেই হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করলো, 'তা আজ রাতে কি করছো?'

'ষ্টেশন থেকে মালপত্তরগুলো নিয়ে আসা ছাড়া আর কি কাজ আছে বলো?'

'বেশ তো, ঘণ্টাখানেক পরে বার-এ নাহয় চলে এসো, ওখানে একটু গুলতানি মারা যাবেখন।'

'ঠিক আছে', আমি বললাম, 'এছাড়া এখন আমাদের কিই বা করার আছে বলো!'

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিয়ে প্রথমেই গেলাম কাকে ইণ্টারন্যাশনালে, খিদে পেয়েছিল, পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে তো। ওয়েটার এলয়স হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, 'আপনি ফিরে এলেন?'

'শেষ পর্যন্ত সকলকেই তো ফিরে আসতে হয় তার নিজের জায়গায়', এই বলে কাফের ভেতরে এগিয়ে গেলাম।

রোজা তার কয়েকজন মেয়ে সঙ্গিনীদের নিয়ে একটা বড় টেবিল জুড়ে বসেছিল। এরই মধ্যে ওরা একবার রাস্তায় চক্কর দিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় দফায় বেরোবার আগে একটু দম নিয়ে নিচ্ছে ফিরে আবার ধকল সইবার জন্য, তাদের দেহের উপরে কম অত্যাচার তো করে না জানোয়ারগুলো? ওদের দোষ দিয়েই বা কি লাভ, ওরা পয়সা দিচ্ছে ভালো করে আরাম তো লুটবেই, তার জন্যে মেয়েগুলোর দৈহিক যন্ত্রণা কতো বেশী হলো, তা কেন দেখতে যাবে ওরা? আর মেয়েগুলোর টাকার দরকার, সে টাকা রোজগারের জন্য দৈহিক কষ্টটা তাদের মেনে নিতে হবে বৈকি।

রোজাই প্রথম আমাকে দেখতে পেয়ে তো অবাক, 'কি আশ্চর্য রবার্ট, তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না। কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার জেনে কি লাভ বলো, এখন এই যে আবার এসেছি, এটাই তো বড় কথা। এখন থেকে—'

'তার মানে এখন থেকে তুমি প্রায়ই আসছো তো?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

'খুব ভালো কথা', অন্য মেয়েগুলো সোৎসাহে চিৎকার করে উঠলো। রোজার পাশে বসেছিল লিলি। এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করিনি। ওর দিকে চোখ পড়তেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লিলি, তুমি যে এখানে? তুমি তো ঘর সংসার করবার জন্য বিয়ে-থা করেছিলে?'

লিলির হয়ে রোজা জবাব দিলো, 'ঘর সংসার! আর বলো কেন, বেচারীর হাতে

টাকা যতদিন ছিলো, ওর কি আদর যত্ন। ওর টাকায় খেয়ে দেয়ে, বাবুগিরি করে, ওর দেহ নিয়ে ফুর্তি করে কাটালেন ছ'টি মাস ওর সোয়ামিটি। তাপর ওর শেষ পয়সাটি ফুরিয়ে যেতেই ওর সোয়ামিটি তখন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, তার স্ত্রী এক সময় বেশ্যাবৃত্তি করে টাকা রোজগার করতো। এ খবর তিনি যেন আগে জানতেন না। এই অভিযোগে শয়তানটা ওকে ডিভোর্স করে দিলো। আশ্চর্য, ওর ওই পাপের টাকায় বাবুগিরি করার সময় ওর একবারও সে কথা মনে হয়নি। বেচারী লিলি, ওর প্রলোভনে ভুলে মাঝখান থেকে ওর সব সঞ্চয় ছ'মাসে ফুরিয়ে গেলো। আমাদের কপালই বোধহয় এই রকম হয়, বিয়ে করে সংসারী হওয়া ছ'মাসের বেশী টেঁকে না, একজন পুরুষকে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না, একাধিক পুরুষের সঙ্গসুখ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।' এখানে একটু থেমে হয়তো আমাকে বিমর্ষ হতে দেখে রোজা আবার নিজের থেকেই বললো, 'দুঃখের কথা বলে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এখন ওসব কথা থাক, এসো, তুমি বরং আমাদের কিছু ভালো গানের সুর বাজিয়ে শোনাও দেখি।'

'সেই ভালো, অনেকদিন পরে সবার সঙ্গে যখন দেখাই হলো, গানের সুর বাজিয়ে একটু দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করা যাক!'

পিয়ানোয় পর পর কয়েকটা আমার প্রিয় গানের সুর বাজিয়ে শোনালাম ওদের। সুর তুলতে গিয়ে প্যাট-এর অসুস্থ মুখখানি আমার বারবার মনে পড়ে গেলো। আমার হাতে যা টাকা আছে বড় জোর জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। তাই এখন থেকেই বাড়তি টাকা রোজগার করতে হবে আমাকে। যন্ত্রচালিতের মতো পিয়ানোয় হাত চালিয়ে যাচ্ছি। রোজা মুগ্ধমুগ্ধের মতো আমার গানের সুর শুনছে, অথচ লিলির মুখে কি করুণ হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে। মৃত মানুষের মুখের চেয়েও আরো বেশী বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ ওর মুখখানি যেন।

এক সময় আমার বাজনার সুর কেটে গেলো, ভাবনায় ছেদ পড়লো, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে। পিয়ানোর উপর থেকে মুখ ফেরাতেই দেখি রোজা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়েছে, বিস্ফারিত চোখ। ওর মুখ দিয়ে ভালো করে কথা বেরোচ্ছে না, কোনো রকমে তিনটি শব্দ বেরিয়ে এলো, 'সেকি, আর্থার তুমি?'

রোগাটে একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে কাফেতে ঢুকলো। ফ্যাকাশে মুখ, টিকোল নাক, দেহের তুলনায় মাথাটা যথেষ্ট ছোট ডিম্বাকৃতির মতো। 'হ্যাঁ, আমিই বটে! খুব অবাক হয়ে গেছো দেখছি।'

প্রায় এক যুগ পরে ওদের দেখা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থারের হাবভাবে এবং কণ্ঠস্বরে দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে এতটুকু আকুলি বিকুলির লক্ষণ দেখা গেলো না। লোকটাকে ভালো করে দেখতে গিয়ে হতাশ হতে হলো, এই তাহলে রোজার মনের

মানুষটি, তার সন্তানের পিতা ? কিন্তু লোকটাকে দেখে তো মনে হয় যেন সবে মাত্র জেল থেকে খালাস পেয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে। এ হেন লোকটাকে দেখে রোজা কি করে মজলো, অনেক ভেবেও আমি কুল কিনারা করতে পারলাম না। বোধহয় এমনি অদ্ভূত অদ্ভূত ঘটনা ঘটে থাকে এক এক সময়। অথচ নারীই তো পুরুষের চরিত্রের সঠিক বিচারক। আর সেই নারী কখন যে কোন্ পুরুষকে নিয়ে মজে যায়, সেটাও একটা রহস্য তো বটেই।

রোজার টেবিলে তখনো এক গ্লাস বিয়ার পড়েছিল। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে না করেই কেমন নির্বিকার ভাবে বিয়ারের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে নিমেষে নিঃশেষ করে ফেললো আর্থার। আর রোজা কেমন হাসিমুখে সেই অদ্ভূত দৃশ্যটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখলো। শুধু তাই নয়, কেমন আন্তরিকতার সুরে ও জিজ্ঞেস করলো, 'আরো চাই নাকি ?'

রসকসহীন আর্থার খেঁকিয়ে উঠে বললো, 'চাই নয় তো কি, বেশী করে, বড় একটা গ্লাসে করে—'

'হ্যাঁ এখুনি দিচ্ছি', ওয়েটারকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে এসে রোজা বললো, 'শোনো এলয়স, ওঁকে বড় দেখে আরো এক গ্লাস বিয়ার এনে দাও তো !' তারপর আর্থারের দিকে ফিরে ও আবার বললো, 'আর্থার, তুমি তো আমাদের খুকুমনিকে এখনো পর্যন্ত দেখোইনি, তোমার দেখতে ইচ্ছে হয় না, সেমন সে হয়েছে, তোমার মতো, নাকি আমার মতো ?'

'কি বললে দেখতে ইচ্ছে না করে আমার ?' বিরক্তির সুরে খিঁচিয়ে উঠলো আর্থার, 'ওসব ন্যাকামো ছাড়ো তো। ওর সঙ্গে কি আমার সম্পর্ক যে ওকে দেখার ইচ্ছে হবে আমার ! ওর জন্মের সময়ই তো আমি তোমাকে বলে রেখেছিলাম, ভালো করে ওর চোখ ফোটার আগেই ওকে বিদায় করে দিতে, যাতে করে পরে ও আর চিনতে না পারে তোমাকে কিংবা আমাকে। তাছাড়া আমার অনুপস্থিতিতেও ওর জন্ম হতো ঠিকই তোমার গর্ভে। তাই ওকে নিয়ে আমার এখন কোনো মাথা ব্যাথা নেই, বুঝলে !' খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে এবার সে তার ধান্দার কথাটা বলেই ফেললো, 'তোমার কাছে টাকা আছে ?'

লোকটার অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখেও তার জন্য কিছু করতে পারলে রোজা যেন নিজেকে ধন্য বলে মনে করে। তাই তাড়াতাড়ি ও ওর হাতব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বললো, 'মাত্র পাঁচ মার্ক আমার সঙ্গে আছে। তুমি আসবে জানলে আরো বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে আসতাম। অবশ্য বাড়িতে আমার টাকা আছে।'

নীরবে পাঁচ মার্ক পকেটস্থ করে তেমনি বিরক্ত হওেই আবার বললো, 'তা এমন আরাম করে সোফায় বসে থাকলে আর এমনি এমনি টাকা তো তোমার হাতে আসবে না। দেহটাকে একটু খাটাও !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি আর্থার। রাত তো বেশী হয়নি, এই তো সবে সন্ধ্যে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অতো কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমার আরো টাকা চাই। এখন আমি যাচ্ছি, আবার বারোটায় ফিরে আসবো এখানে। আশাকরি এর মধ্যে তুমি তোমার ওই দেহখানি খাটিয়ে কিছু রোজগার করে আনতে পারবে।' ব্যাস এই পর্যন্ত বলে সে আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাফে থেকে বেরিয়ে গেলো। লোকটার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টে কেমন তাকিয়ে রইলো রোজা, বুঝি বা ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো, অথচ লোকটার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না, এমন কি একবারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বলে মনে করলো না সে।

লোকটা কাফের বাইরে যেতেই দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিয়ে খিস্তি করলো এলয়স, 'শুয়োরের বাচ্চা—'

রোজার যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই লোকটার অমন বিশ্রী ব্যবহারের পরেও। বরং উল্টে কেমন গর্বের সঙ্গে বললো ও, 'দেখলে তো তোমরা, কেমন আশ্চর্য মানুষ ও! ওর মনের ঠিকানা জানবার কোনো উপায় নেই, এমনি রহস্যময় পুরুষ ও। মানুষটা এতোদিন কোথায় যে ছিলো জানি না।'

'আমি জানি', সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো ওয়ালি, 'লোকটার গায়ের রঙ দেখেই বোঝা যায় যে, কোথায় ছিলো সে এতোদিন। আমি হলপ করে বলতে পারি, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো জেলে কয়েদী হয়েই ছিলো। লোকটাকে শয়তান ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।'

'তোমরা ওকে বুঝবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে বললো রোজা, 'এমনি না হলে কি মরদ হওয়া যায়? তোমাদের মতো মেনিমুখো পুরুষগুলোর দলে ও নয়। যাইহোক, আমি এখন চলি। ও আবার বারোটায় আসবে বলে গেছে। দেখি ওর জন্যে কিছু টাকা রোজগার করা যায় কিনা!' এমন ভাব দেখাচ্ছে রোজা, ও যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে, হাওয়ায় ভেসে চলেছে মনের আনন্দে। টাকা রোজগার করে হাতে তুলে দেবার মতো একটা মনের মতো মানুষ পেয়েছে বটে ও। আর ওই শয়তানটা ওর টাকায় গুচ্ছের মদ গিলবে, তারপর ওকেই ধরে আবার পেটাবে, ওর পেটে তার বদ রক্তের বীজ বপন করে আবার উধাও হয়ে যাবে কিছু দিনের জন্য। আশ্চর্য, রোজা কিন্তু এতেই খুশি, ধর্ষিতা হতেই মন চায় ওর বারে বারে।

কাফে ইন্টারন্যাশনাল থেকে বেরিয়ে মাঝে বাড়িতে গিয়ে পোষাক বদল করে আমাদের নির্দিষ্ট বার-এ গিয়ে দেখি ভ্যালেনটিন, কোষ্টার আর ফার্ডিনান্ড গ্রাউ বসে আছে। লেনতস তখনো আসেনি, তবে একটু পরেই সে এলো।

প্রচুর রাম খেয়ে মনে হচ্ছে, কে যেন আমার মাথায় হাতুড়ি পেটাচ্ছে। এক সময়ে সেখান থেকে উঠে গিয়ে ফ্রেডের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘুমন্ত ফ্রেডকে জাগিয়ে

তুলে স্যানাটোরিয়ামে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করে দিলাম।

'একটু অপেক্ষা করুন', বললো ফ্রেড, 'রাতে খুব তাড়াতাড়ি জবাব পাওয়া যায়।'

সত্যি মিনিট পাঁচেক পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। হ্যাঁ, স্যানাটোরিয়াম থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'দেখুন আমি ফ্রাউলিন হোলম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি ও'র ওয়ার্ডে লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি।' একটু পরেই সেই ওয়ার্ডের নার্স এসে বললো, 'দেখুন, ফ্রাউলিন হোলম্যান ঘুমিয়ে পড়েছেন। ও'কে এখন জাগানো ঠিক হবে না।

'কেন, ওর কিছু হয়েছে নাকি?'

'না না, কিছুই হয়নি ও'র। প্রথম কয়েকদিন সবাইকেই একেবারে শুয়ে কাটাতে হয়। বিছানায় থেকে থেকেই জায়গাটাকে মানিয়ে নিতে হয়।'

অগত্যা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবলাম, ফোন না করলেই ভালো ছিলো বোধহয়। তারপর বার-এ ফিরে গিয়ে আবার গ্লাস ভর্তি করে আমার জায়গায় বসলাম।

□ তেরো □

নভেম্বরের শুরুতেই সিত্রয়াঁ গাড়িটা বেচে দিতে হলো। ওই টাকায় কিছুদিন কারখানা চালানো গেলো। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার সেই অভাবের মুখোমুখি হতে হলো। ওদিকে শীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মালিকরা পেট্রল আর ট্যাক্স বাঁচানোর জন্যে গাড়ি গ্যারাজ বন্দী করে রেখেছে। এখন ওই ট্যাক্সিই ভরসা আমাদের। কিন্তু ওটা থেকে যৎসামান্য আয়ে তিনজনের চলেই বা কি করে। এই সময় ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের মালিক পিয়ানো বাজানোর কাজে আবার যখন ডেকে পাঠালো আমি যেন তখন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। ওর ব্যবসাও বেশ ভালো চলছে এখন। কর্মবিহীন সন্ধেবেলাটা যেন কিছুতেই আর কাটছিল না। এখন সময় কাটানোর একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে একটা রোজগারের ব্যবস্থাও।

এখন আবার নিয়মিত ভাবেই প্যাটের চিঠি পাচ্ছি। কিন্তু চিঠি পাওয়া আর সেটার উত্তর দেওয়ার মধ্যে আমাদের দুজনের দুজনকে ছেড়ে থাকার দূরত্ব যেন কিছুতেই আর ঘুচতে চায় না। বিশেষ করে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের দুপুরে যখন একা একা ঘরে থাকি, দিনের বেলাতেও যখন ঘরে রাতের অন্ধকার অনুভব করি, তখন প্যাটের কথা চিন্তা করা যেন নিতান্তই বাতুলতা বলে মনে হয়, মনে হয়

বুঝি ওর সঙ্গে সব সম্পর্কই চুকে বুকে গেছে আমার সঙ্গে। যেন এক যুগ হলো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, ও যে কখনো আবার ফিরে আসবে সে কথা আমি ভাবতেই পারি না। ওর সঙ্গ না পাওয়া বেদনায় ভরা দীর্ঘ শীতের রাত যখন আর কাটতে চায় না, তখন ওই সব দেহপসারিণীদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া ছাড়া আমার সামনে অন্য কোনো পথ আর খোলা থকে না।

খৃষ্টমাসের দিন সারা রাত হোটেল খুলে রাখবার জন্য অনুমতি পেয়েছে ইণ্টারন্যাশনালের মালিক। বার-এর সামনে একটা খৃষ্টমাস ট্রি পোতা হয়েছে। আর সেই গাছটাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তুলেছে রোজা, মারিয়ম আর কিকি তিনজনে মিলে। বিকেলের দিকে আমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরে বুঝতেই পারছিলাম না এখন সকাল নাকি সন্ধ্যা! তখনো স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তেই বলে উঠলাম, 'কে?'

'আমি হের লোকাম্প!'

আরে, এ যে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির গলা। 'আসুন, দরজা খোলাই আছে', বললাম।

দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে উনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি একবার ঘরের বাইরে আসুন, ফ্রাউ হেসি এসেছে—'

'তা আমার যাওয়ার দরকার কি আছে', বললাম, ওঁকে থানায় পাঠিয়ে দিন না।'

'না হের লোকাম্প', অতি বিনয়ের সুরে বললেন ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, 'ও কাজটা আপনি ছাড়া হবে না! বাড়িতে আর কেউ নেইও বটে—'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি', শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বলতে হলো আমাকে।

পোশাক ঠিক ঠাক করে বাইরে বেরোতেই দেখি ফ্রাউ জালেওয়াস্কি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তখনো। জানতে চাইলাম, 'উনি কি কিছুই জানেন না? কোথায় উনি?'

'না বোধহয়', উত্তরে বললেল তিনি, 'ওঁদের সেই পুরনো ঘরেই বসে আছে ও।'

রান্নাঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে সবজান্তা ফ্রিডা চাপা গলায় বলে উঠলো, 'কেমন সেজেগুজে উনি এসেছেন দেখুন গিয়ে, মাথায় চটকদার টুপি, তার উপরে আবার হীরের ব্রোচ লাগানো।'

'ওই ডেঁপো মেয়েটিকে ওদিকে যেতে দেবেন না', ফ্রাউ জালেওয়াস্কির উদ্দেশ্যে বললাম।

আমি ঘরে ঢোকা মাত্র জানালার কাছ থেকে আমার দিকে ফিরে তাকালো হেসি। ওর চোখ মুখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকে নয়, ও যাকে আশা করেছিল আমি বোধহয় তাকে চিনি। ওই ফাজিল মেয়ে ফ্রিডা ঠিকই বলেছে, ওর মাথার টুপিটা সত্যিই চটকদার। দারুণ সেজেগুজে এসেছে ও, সারা দেহে দামী প্রসাধনের

ছাপ। ও হয়তো ওর স্বামীকে বোঝাতে এসেছিল, আমাকে দেখো, আগের চাইতে আমি এখন কতো ভালোই না আছি। ও যে আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'তা হেসি বুঝি আজ খৃষ্টমাস ইভের দিনেও অফিসে গেছে?' ওর গলায় রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ পেলো।

'না, অফিসে যাবেন কেন?' বললাম, 'তা ওঁর সঙ্গে আপনার দরকারটাই বা কি জানতে পারি?'

'আমি এসেছি আমার বাকী সব জিনিষপত্তর বুঝে নিতে। এ ঘরের কিছু কিছু জিনিষ আমার। এর একটা বোঝাপড়া করা তো দরকার।'

'বোঝাপড়া আর করতে হবে না', বললাম, 'এসব জিনিষই এখন আপনার।'

ফ্রাউ হেসি এবার বড় বড় চোখ করে তাকালো এমন করে যেন আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছে না ও। তাই এবার স্পষ্ট করেই বললাম ওকে, 'হের হেসি মারা গেছেন।' বলেই আবার ভাবলাম, এখুনি কথাটা বলা বুঝি ঠিক হয়নি। আরো একটু সইয়ে সইয়ে বলা উচিত ছিলো। ভাবলাম, মৃত্যুর খবরটা শুনে ও বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। না, সেরকম কিছু ঘটতে দেখা গেলো না। কেবল বোবা দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক সময় বললো, 'তাই বুঝি!' ওর চটকদার টুপির পালকগুলো একটু কেঁপে উঠলো এই যা। তবে তারপরেই দেখলাম ওর মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তন—অমন সুসজ্জিত মহিলা একটু একটু করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়লো। নিমেষে ওর মুখের সব ঔজ্জ্বল্য নিভে গিয়ে বলিরেখা ফুটে উঠলো ওর চোখে মুখে। এ যেন ফ্রাউ হেসি নয়, ওর প্রেতাত্মা।

'তা কি হয়েছিল ওঁর?' যেন অনেক দূর থেকে জানতে চাইলো ও।

'হঠাৎই মারা গেলেন বলা যায়।'

'কিন্তু আমার এখন কি হবে', কতকটা নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলো ও, 'এখন আমি কি করবো?'

উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারলাম না, যেন মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ নেই। তবু বলতে হয় বললাম শেষ পর্যন্ত, 'কেন, আপনার নিশ্চয়ই এমন কোনো লোক আছে যার কাছে আপনি এখন অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তাছাড়া আপনার এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যখন—' এখানে একটু থেমে আমি ওকে বললাম, 'খৃষ্টমাসের পরে একবার থানায় যাবেন, ওখানে কিছু জিনিসপত্তর আছে। আর হের হেসির ব্যাঙ্কের হিসেবও ওখানে বুঝে নিতে পারবেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলতে হলে পুলিশের মারফতই তুলতে হবে।'

'টাকা? তা ব্যাঙ্কে টাকা আবার এলো কোথেকে?'

'তা তো জানি না। তবে মনে হয় কষ্টেসৃষ্টে টাকাটা জমিয়ে গেছেন, তা প্রায়

বারোশো মার্ক হবে। ভবিষ্যতে বিপদ আপদের কথা মনে রেখেই ওর এই টাকা জমানো—'

হঠাৎ ফ্রাউ হেসির মুখের ভাব পরিবর্তন হতে দেখা গেলো। ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললো ও, 'বুঝেছি। বদমাশ মিনসেটা আমার সব শখ আহ্লাদ নষ্ট করে দিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে গেছে? ঠিক আছে, ওর ওই টাকার এক কানাকড়িও আমি রাখবো না। এক রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর ওই জমানো টাকা আমি দু'হাতে উড়িয়ে ছাড়বো, দেখবেন।'

টাকাটা ও যেভাবে খুশি উড়িয়ে দিক, আমি দেখতে যাবো না। আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে, হের হেসি যে মরে গেছে, সেটা ও বেশ ভালো ভাবেই বুঝে গেছে! এখন ও যা খুশি করুক। কিন্তু কি মুশকিল, ও যে এবার কাঁদতে শুরু করেছে। খুব অস্বস্তিতে পড়তে হলো, আমি আবার কারোর কান্না সহ্য করতে পারিনা। বেশ খানিকক্ষণ পরে ওর কান্না থেমে গেলো। চোখ মুখ মুছে অভ্যাসবশত পাউডারের কৌটো বার করে মুখে এক প্রলেপ পাউডার বুলিয়ে নিয়ে ধরা গলায় ও বললো, 'আমি এ সবের কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। কে জানে, হয়তো ভালো মনে করেই টাকাটা ও ব্যাঙ্কে জমিয়ে থাকবে। স্বামী হিসেবে খুব একটা খারাপ ছিলো না ও।'

'হ্যাঁ আমার ধারণাও ঠিক তাই।' তারপর ওকে থানার ঠিকানা দিয়ে বললাম আজ মনে হয় থানার অফিস বন্ধ। পরে না হয় এক সময় সেখানে গিয়ে আপনার সব কিছু বুঝে শুনে নেবেন।'

ফ্রাউ হেসি চলে যেতেই ফ্রাউ জালেওয়াস্কি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওঁকে দেখে আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'আমি ছাড়া বাড়িতে বুঝি আর কোনো পুরুষ মানুষ ছিলো না।'

'একমাত্র হের জর্জ ছাড়া', ফ্রাউ জালেওয়াস্কি জিজ্ঞেস করলেন, 'তা স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে ফ্রাউ হেসি কি বললো?'

'কিই বা বলার আছে ওঁর?'

'তা তো বটেই। তবে যাই বলুন না কেন, ওর প্রতি আমাদের একটুও সহানুভূতি নেই।'

'উনি কারোর সহানুভূতি প্রত্যাশাও করেন না।' ফ্রাউ হেসির প্রসঙ্গে আমি ইতি টানতে চাইছিলাম। ওকে নিয়ে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে আর বেশী আলোচনা করতে আমার মন চাইছিল না। তাই প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম, 'সাতটার সময় আমি একবার ফ্রাউলিন হোলম্যানকে ফোন করতে চাই। কিন্তু তৃতীয়পক্ষ কেউ যেন শুনতে না পায়, সেরকম ব্যবস্থা এখানে কি সম্ভব?'

'হের জর্জ' ছাড়া বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। ফ্রিডাকে বাইরে পাঠিয়েছি একটা কাজে। এর পরেও আরো নির্জনতা চাইলে আপনি বরং রান্নাঘর থেকে ফোন করতে পারেন, টেলিফোনের লাইনটা ওখান পর্যন্ত টানা আছে।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

তারপর জর্জ-এর ঘরে গিয়ে বললাম, 'শুভ সন্ধ্যা জর্জ'। তা একা একা বসে কি করছো তুমি ?'

'জীবনের হিসেব নিকেশ করছি', ম্লান হেসে বললো সে, 'খৃষ্টমাস কাটাবার পক্ষে অতি প্রশস্ত কাজ, কি বলো ?'

ঝুঁকে পড়ে তার লেখার কাগজটা হাতে তুলে নিলাম। কলেজের নোটবই-এর পাতা, তাতে কেমিষ্ট্রির ফরমুলা লেখা।

'জানো বব, ভেবে দেখলাম, কোনো লাভ নেই। জীবনের হিসেবের খাতায় সবটাই শূন্য।'

কথাগুলো বলতে গিয়ে জর্জ-এর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। বললাম, 'তুমি কি জীবনের সারমর্ম বলতে এটাই বুঝেছো ?'

'হ্যাঁ ভাই। এ আমার একান্ত উপলব্ধির কথা।'

'কিন্তু জর্জ এতো তাড়াতাড়ি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না', আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম নিজেকে উপমা দিয়ে, 'এই আমার কথাই তুমি ধরো না। তোমার মতো আমার মনেও কি উচ্চাশা ছিলো না ? কিন্তু কোথায় গেলো আমার সেই উচ্চাশা ? এই যে এখন আমি কাফে ইন্টারন্যাশনালে বসে দেহ বেচা মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য পিয়ানো বাজিয়ে শোনাই, এটাই কি আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ?'

তেমনি হতাশ সুরে বললো জর্জ, 'সবই বুঝি বব, কিন্তু সান্তনা পাই কোথায় বলো ? কিন্তু আমি তো জীবনে বেশী কিছু চাইনি, খুব সামান্যই চেয়েছিলাম। তাও পেলাম না আমি। জীবনে কিছুই তো পেলাম না। এভাবে বঞ্চিত জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সার্থকতা কোথায় বলতে পারো ?'

ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম। বুঝলাম, জীবনটাকে ও বড় কঠিন দৃষ্টিতে দেখছে বলেই ও ওর জীবনে সুখ শান্তি বলে কিছু পেলো না। তাই ওকে একটু ধমকের সুরেই বললাম, 'তুমি একটা আস্ত গাধা, তা না হলে এই সহজ সরল কথাটা তুমি এদ্দিনে বুঝলে ? তাও আবার তুমি দাবী করছো, সেটা তুমি একলাই উপলব্ধি করেছো। শোনো জর্জ, তোমার আমার সবারই এখন এই একই দশা। আসল কথাটাই তুমি জানো না, এই দুর্দিনে কারোর জীবনেই আশা কখনো পূর্ণ হবে না, হতে পারে না। সে যাইহোক, এখন তুমি এক কাজ করো, বাইরে বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে নাও চটপট। আজ তুমি আমার সঙ্গী হবে কাফে ইন্টারন্যাশনালে।

দেখছি এতদিনে তুমি সাবালক হয়ে উঠেছো, আজ তারই অভিষেক হবে। আধঘণ্টা পরে এসে আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে।

শত আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলো জর্জ। 'ঠিক আছে ভাই, তোমার সঙ্গে যাবো। গেলে কি আর এমন ক্ষতি হবে, আর হলেও আপত্তি নেই আমার। এখন আর কোনো কিছুতেই আমার যায় আসে না।'

হেসে ওর পিঠ চাপড়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই তো সাবালকের মতো উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছো।'

ঠিক সাতটার সময় স্যানাটোরিয়ামের টেলিফোন নম্বর বুক করলাম প্যাট-এর সঙ্গে কথা বলবার জন্য। সাতটার পর টেলিফোন চার্জ অর্ধেক। ইচ্ছে করলে ওই একই চার্জে দ্বিগুণ কথা বলা যায়। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হলো প্যাটকে পাওয়ার জন্য। দূরভাষে অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসতেই আমার সারা শরীরের ভেতরে কি যে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সঞ্চারিত হলো, তা বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মাতাল বুকের রক্ত উথলে পড়লো, চাপা দিয়ে রাখতে পারলাম না। আবেগ কণ্ঠে বললাম, 'প্যাট, বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে, সত্যি তুমি কথা বলছো তো?' কেমন আছো তুমি?'

শব্দ করে হেসে উঠলো প্যাট। 'ভালোই আছি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো ও, 'জানো, আজ আমি কি পোশাক পড়েছি? আমার সেই প্রিয় সাদা রঙের গাউনটা। এখন বাইরে প্রচণ্ড ভাবে তুষার পড়ছে।

এই মুহূর্তে আমার যেন মনে হলো, আমি আমার প্রিয়তমা প্যাটের কাছে চলে গেছি। ওকে যেন আমি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মতো বরফ ঝরে পড়ছে। আর ওই তো জানালার সামনে ও বসে আছে, কাঁধ ছুঁই ছুঁই সোনালী চুল। আনমনে বললাম, 'জানো প্যাট, এখন মনে হচ্ছে টাকাটাই সব কিছু, টাকা দিয়ে এখনি আমার মনের মতো সুখ কিনে ফেলতে পারি। যেমন ধরো টাকা থাকলে এখনি আমি প্লেনের টিকিট কেটে আজকের রাতেই তোমার পাশে গিয়ে আমি হাজির হতে পারতাম, পারতাম না?'

'হ্যাঁ, পারতে বৈকি বব—' তারপরেই ও একেবারে নীরব হয়ে গেলো। অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্যাট তুমি চুপ করে গেলে কেন? কথা বলছো না কেন?'

'ওসব কথা বলো না বব, শুনলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে ওঠে।'

'আমারও। যাক সে কথা। এখন বলো তো, তোমার দিন এখন কি রকম কাটছে ওখানে?'

প্যাট আবার কথা বলতে শুরু করলো। ও কি বলছিল আমার তাতে মন নেই,

আমি শুধু ওর সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বরের সুধারস যেন পান করতে করতে মাতাল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিল, ঘরের দরজা খুলে গিয়ে গ্রীষ্মের ঈষদুষ্ণ বাতাস এসে আমার শরীরটা গরম করে দিচ্ছে, আমার স্বপ্নের মনটা যৌবনরসে সিক্ত হয়ে উঠছে। আমাদের এই জরাজীর্ণ বাড়িতে হঠাৎ গ্রীষ্ম তার সকল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে কোত্থেকে যে এসেছে মাথায় আসছিল না আমার।

প্যাট-এর কথা শেষ হতেই আবেগে আমি বলে উঠলাম, 'প্যাট, তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার কি মনে হচ্ছিল জানো, আমার সেই ভালো লাগা প্রেমের গানের সুরটা আমার কানের কাছে ঝঙ্কার তুলছিল সুললিত ভাবে। শুনতে আমার কি যে ভালো লাগছিল, বোঝাতে পারবো না তোমাকে। তা আজ রাতে ওখানে কি করছো তুমি?'

'আজ রাতে আমাদের স্যানাটোরিয়ামে একটা ছোট খাটো পার্টি আছে। আটটায়। এখনি পোশাক পরে নিয়ে তৈরী হতে হবে।'

'তা কোন পোষাকটা পরছো তুমি? সেই রুপোলী পোশাকটা!'

'হ্যাঁ বব্ব। মনে আছে তোমার? প্রথম যেদিন তুমি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে আমাকে, হ্যাঁ, সেদিনের সেই রুপোলী পোশাকেই আমি সাজছি।'

'কার সঙ্গে যাচ্ছো?'

'কারোর সঙ্গেই না। বললাম না, পার্টি আমাদের স্যানাটোরিয়ামের হলঘরে হচ্ছে। এখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিচিত।'

'কিন্তু ওই পোশাকটা পরলে আমার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ না করাটা খুবই কঠিন কাজ, তাই না?'

এবার প্যাট হেসে ফেললো। তুমি জেনে রাখো, ওই পোশাক পরে জ্ঞানত আমি তোমার প্রতি মিথ্যাচারণ করতে পারবো না। ওটার সঙ্গে আমার যে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে বব!'

'আর তোমার মতো আমারো। আমি তো দেখেছি ওই পোশাকে তোমার উপরে অন্য পুরুষের কতখানি প্রতিক্রিয়া হবে। সে যাকগে, এ নিয়ে আমি আর কখনো মাথা ঘামাকো না, কিংবা দুঃখ পাবো না। তোমার ইচ্ছে হলে আমার প্রতি অনায়াসে মিথ্যাচারণ করতে পারো, কেবল আমি না জানতে পারলেই হলো। আর তুমি নিজের থেকে না বললে আমি এখান থেকে টেরও পাবো না কখনো। তারপর ওখানকার পালা সাঙ্গ করে তুমি যখন এখানে ফিরে আসবে, তখন তুমি কিছু বলো না, আর আমিও কিছু জিজ্ঞেস করবো না তোমাকে। তুমি যদি তা করেও থাকো, একটা দুঃস্বপ্নের মতোই মিথ্যে বলে ধরে নেবো। কারো মনে কোনো দাগ রাখবো না আমরা।'

'তুমি কি যে বলো বব', ভারি গলায় প্যাট বললো, 'তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না, কি চোখে আমি তোমাকে দেখেছি। তুমি তো জানো না, তোমার সঙ্গে ছলনা করা আমার পক্ষে কতখানি অসম্ভব। আমরা এখানে কি ভাবে যে আছি, তোমার ধারণা নেই, নেহাতই এই স্যানাটোরিয়ামটা একটা ছোটখাটো জেলখানা, আর আমরা রোগীরা যেন এক একটা কয়েদী। মাঝে মাঝে তোমার কথা, তোমার ঘরটার কথা মনে পড়লে মনকে আর স্থির রাখতে পারি না। কখনো কখনো ষ্টেশনে চলে যাই। ট্রেনের যাওয়া আসা লক্ষ্য করতে গিয়ে মনে হয়, তুমি এলে, এই বুঝি তুমি এলে, আর আমি বুঝি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি। আবার কখনো বা ভাবি, ট্রেনের একটা কামরায় উঠে বসে তোমার কাছে চলে যাই।'

ওর কথার মধ্যে কি দারুণ আবেগ যেন মেশানো ছিলো। আগে কখনো ওকে এমন করে কথা বলতে শুনিনি। বারবার দেখেছি, ও ওর মনের গোপন কথাটি কখনো মুখের ভাষায় প্রকাশ করেনি। খুব বেশী হলে আকারে ইঙ্গিতে কিংবা চোখের চাহনিতে সেটা প্রকাশ করেছে। ওকে আশ্বস্ত করতে বললাম, 'খুব শীগগীর এই ধরো জানুয়ারীর শেষ দিকে তোমার কাছে যাচ্ছি।' বললাম বটে, কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয় তা আমি জানি, কারণ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ওর স্যানাটোরিয়ামের খরচ যোগান দেওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবু বললাম এই জন্যে যে, বেচারী অন্তত আশায় আশায় থাকতে পারবে। পরে নাহয় একটা কোনো অজুহাত দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর ততোদিনে ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

'আচ্ছা প্যাট, এবার ছাড়ছি। সাবধানে থেকো, শরীর খারাপ করো না! তুমি ভালো থাকলেই আমি খুশী হবো।'

'হ্যাঁ বব, আমি তো ভালোই আছি। বিদায়—'

তারপর জর্জকে সঙ্গে নিয়ে কাফে ইণ্টারন্যাশনালে গিয়ে হাজির হলাম। কি আশ্চর্য, আমাদের সেই পুরনো জঘন্য ঠেকটাকে চেনাই যায় না যেন। খৃষ্টমাস-ট্রিতে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় ঝলমল করছে কাফের ভেতরের সব কিছু। দেহপসারিণীরা জমকালো পোশাকে আর চটকদার গিল্টি সোনার গহনা পরে টেবিল গুলো আলো করে বসে আছে মক্কেল ধরবার জন্যে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় গরু চালানকারী ব্যবসায়ীদের সভাপতি স্টিফান গ্রিগোলিট তার এ্যাসোসিয়েসনের সভ্যদের সঙ্গে নিয়ে কাফেতে প্রবেশ করলো। তারপর হাত নেড়ে সুরের মহড়া দিতেই সভ্যরা সমবেত সুরে গান গাইতে শুরু করে দিলো: 'এই পুণ্য রাতে, পূর্ণ করো প্রাণ স্বর্গীয় শান্তিতে……'

গান শুনতে শুনতে রোজার চোখ ভরে উঠলো জলে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ও বলে উঠলো, 'আহা, কি চমৎকার গান, গানের সুরে যেন মধু ঝরে পড়ছে।'

গান শেষে স্টিফান বললো, 'এবার হাতের আর মুখের কাজ সারা যাক।'

ব্যবসায়ীদের ক্লাবঘরে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। টেবিলের উপরে প্রত্যেকটি রুপোর ডিসে এক জোড়া করে গোটা শুকর ছানার রোস্ট সাজানো। মালিকের দেওয়া নতুন টেইলকোটে আজ ওয়েটার এলয়সকে দারুণ মানিয়েছে। গ্লাসে মদ ঢালছে সে, আর তার সাহায্যে এগিয়ে এলো 'সৎকার সমিতির' পটার। তার কাজ শেষ হতেই নাটকীয় ভঙ্গিমায় সে বলে উঠলো, 'শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে।' বলেই রোজার পাশে গিয়ে বসলো সে।

স্টিফান গ্রিগোলিট জর্জের হাত ধরে একটা টেবিলে বসালো তাকে। তারপর জিন-এর গ্লাস হাতে নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিয়ে বললো, 'আপনাদের সকলের স্বাস্থ্য কামনা করছি। নিন, এবার সবাই খেতে শুরু করে দিন।'

জর্জ-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'একটু রয়ে সয়ে খেও। এ সব চর্বিওয়ালা মাংস তোমার পেটে প্রথম দিনেই সহজে হজম হবার নয়। তবে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে দেখো।'

'হ্যাঁ, দেখছি এখানকার সব কিছুই আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হয়!' বললো জর্জ, 'আমি এ সবের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নই।'

'আর কিছুর সঙ্গে পরিচয়ের দরকার নেই', ওকে বোঝালাম, শুধু খাওয়ার ব্যাপারে পরিচয় হলেই ভালো।'

পিছনের ঘরে তখন কোনিয়াক পান করার ধুম লেগে গেছে। বার কাউন্টারের কাছেই আমি বসেছি। ওদিকে মেয়েরা তখন নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কি যেন বলাবলি করছিল। থাকতে না পেরে মরিয়ানকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, তোমাদের এই ফিসফিসানি কিসের জন্যে?'

ও জানালো, 'এবার আমরা যে উপহার পেতে যাচ্ছি।'

'তাই বুঝি?' বলে কাউন্টারে আগের মতো আবার হেলান দিয়ে বসলাম।

ঘণ্টা বেজে উঠতেই মেয়েদের দল বিলিয়ার্ড রুমের দিকে ছুটে গেলো। সেখান থেকেই রোজা হাতের ইশারায় আমাকেও ডাকলো।

খৃষ্টমাস-ট্রির নিচে বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরে প্লেটের সারি। প্রতিটি প্লেটে একটা করে নাম লেখা স্লিপ। আর তার নিচে উপহারের মোড়ক। মেয়েরা একে অন্যকে উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছে। নিজের হাতে সব সাজিয়ে রেখেছে রোজা। রোজা আমাকে বললো, 'তোমার প্লেটটা দেখে যাও।

'কিসের প্লেট?' আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

'কেন, আমরাও যে তোমাকে উপহার দিয়েছি।'

ওর কথা শুনে দেখি—লাল কালো অক্ষরে লেখা আমার নামের স্লিপের নিচে থরে থরে উপহার সাজানো রয়েছে: আপেল, বাদাম আর কমলালেবুর সঙ্গে রয়েছে

রোজার দেওয়া পুলওভার, নিজের হাতে বুনেছে ও। হোটেলওয়ালার স্ত্রী দিয়েছে সবুজ রঙ-এর একটা টাই। কিকির উপহার এক জোড়া সিল্কের মোজা। একটা চামড়ার বেল্ট উপহার দিয়েছে সুন্দরী ওয়ালি। মরিয়ান, লীনা আর মিমি তিনজনে মিলে আধডজন রুমাল। হোটেলওয়ালার উপহার আমার সব চেয়ে প্রিয় দু'বোতল কোনিয়াক। আর ওয়েটার এলিয়সও পিছিয়ে নেই, সে দিয়েছে আধ বোতল রাম।

'এতো উপহার? ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বললাম, 'এ যে আমি ভাবতেই পারছি না।'

'তোমাকে কেমন অবাক করে দিলাম, দেখলে তো?' মৃদু হেসে বললো রোজা। সত্যিই, এতো অবাক হবারই ঘটনা। ওদের এই আন্তরিকতা, স্নেহ আমার মনকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গেলো যেন। আমার চোখে জল এসে যাওয়ার উপক্রম হলো। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললার, 'শেষ কবে যে খৃষ্টমাসের উপহার পেয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। সেই যুদ্ধের আগে ছাড়া পরে তো নয়ই। কিন্তু তোমাদের দেওয়ার মতো এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু তো নেই।'

ওরা আমার কাছ থেকে কিছু চায় না। আমাকে অবাক করে দিয়েই ওরা খুশি যেন।

তবে লীনাই প্রথম মুখ খুললো। 'তুমি আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাও, তাই এই উপহার।' আর রোজা তার কথার জের টেনে বললো, 'আজ তুমি আমাদের একটা ভালো গানের সুর বাজিয়ে শোনাও, সেটাই হবে তোমার কাছ থেকে আজকের পাওয়া সব থেকে বড় উপহার।'

'ছেলেবেলার কোনো গান হোক।' বললো মরিয়ান, 'মনে আছে তো?'

আমি পিয়ানোয় সুর তুললাম। সেই সুরে সুর মিলিয়ে মেয়ের দল গান ধরলো, 'ছেলেবেলার গান সেকি ভোলা বায়—'

এক সময় গানের রেশ মিলিয়ে যায়, পিয়ানোয় সুর স্তব্ধ হয়ে গেলেও মেয়েরা আবার বাজনার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠলো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লীনা বলে উঠলো, 'চমৎকার!'

রাত প্রায় এগারোটার সময় কোষ্টার এলো। জর্জ আর আমি একটা টেবিলে বসেছিলাম। বেচারা শুকনো মুখে বসেছিল। একটু পরেই লেনতস কোথায় যে উধাও হয়ে গেলো বোঝা গেলো না। মিনিট পনেরো পরেই ও আবার ফিরে এলো গ্রিগোলিট-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই কয়েক মিনিটেই ওদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওদের সেই অন্তরঙ্গতার প্রকাশ ঘটলো একটু পরেই। গ্রিগোলিট চিৎকার করে, 'স্টিফান', আর তার গলার সুরে সুর মিলিয়ে লেনতস বলে উঠলো, 'গটফ্রিড।' দুজনেই হেসে উঠে এক সঙ্গে কোনিয়াকের গ্লাস নিঃশেষ করে দিলো। আমাকে দেখতে পেয়ে লেনতস বলে উঠলো, 'এদিকে এসো বব, মদ্য পানে আমাদের

সাথী হও।' ওদের কাছে উঠে যেতেই জর্জকে দেখিয়ে স্টিফান বললো, 'ওই ছোকরার কি ব্যাপার বলুন তো? অমন গোমড়া মুখ কেন ওর!'

'ওর মুখে হাসি ফোটানো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। বেচারা একেবারে বেকার। চাকরী পাচ্ছে না।' বললাম আমি।

'সত্যি এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরী পাওয়া খুবই মুশকিল', বললো স্টিফান।

'একটা যে কোন চাকরী পেলেই ও খুশি হবে।' আমি আরো বললাম, 'মাসে পঁচাত্তর মার্ক হলেও রাজী হয়ে যাবে ও।'

'বাজে কথা, মাত্র পঁচাত্তর মার্কে কারোর সংসার চলে না, এমন কি ব্যাচেলার হলেও!'

'হ্যাঁ, পঁচাত্তর মার্কেই ওর চলে যাবে।' জর্জ-এর হয়ে এবার লেনতস ওকালতি করলো।

'দেখো গটফ্রিড, তুমিও যখন বলছো, আর সত্যি সত্যি ছেলেটি যদি পঁচাত্তর মার্কেই চাকরী করতে রাজী হয়, তাহলে হয়তো ওর জন্যে একটা চাকরী যোগাড় করলেও করতে পারি। ঠিক আছে, আগামী মঙ্গলবার সকাল আটটায় ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। দেখি ওর জন্যে কিছু করতে পারি কিনা।'

স্টিফানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য জর্জকে ডেকে বললাম, 'শোনো জর্জ, এখানে এসো।'

ওর চাকরীর কথা শুনে দিশেহারা হয়ে উঠলো ও। ও যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে ও।

স্টিফানের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে কোণ্টারের পাশে গিয়ে বসলাম আমি। তারপর কি মনে করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা অটো, কেউ যদি তোমাকে জীবনটা একেবারে প্রথম থেকে আবার শুরু করতে বলে, তুমি রাজী হবে?'

'কোন জীবন? যে জীবন এতদিন যাপন করে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, সেই জীবনের কথা বলছো তুমি?'

'হ্যাঁ, ঠিক সেই জীবন বন্ধু!'

'না, কখখনোই রাজী হবো না।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত', ওর কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম।

□ চোদ্দ □

জানুয়ারি মাস, এবার শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। একদিন রাতে কাফে ইন্টারন্যাশনালে বসে আছি। হোটেলে কোনো খদ্দের নেই। এমন কি দেহ বেচা মেয়েগুলো পর্যন্ত আজ আর আসেনি। শহরের চারদিকে গোলমাল ছড়িয়ে পড়ছে। দল বেধে লোক চলেছে রাস্তায়। আবার কখনো বা চলেছে এক একটা মৌন মিছিল, হাতে দাবী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড—চাকরী চাই, খাদ্য চাই। এই সব মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের একবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে। পুলিশ ওদের মিটিং-এ যেতে দেবে না। হতাহতদের চিকিৎসার জন্যে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

'দেশ থেকে শান্তি কথাটা উধাও হয়ে গেছে মশাই', অনুযোগ করে বললো হোটেলের মালিক, 'সেই কোন যুদ্ধের পর থেকে। অথচ দেখুন সবাই মুখে শান্তি চাই বললেও কি ভয়ংকর ক্ষেপে গেছে।

এলয়স এই প্রথম কথা বললো, 'ওসব ক্ষ্যাপা ট্যাপা কিসসু নয়। আসলে এরা সবাই লোভী কুত্তার দল, এ ওকে হিংসা করছে। দেখুন গিয়ে দেশে কোন কিছুরই অভাব নেই, সব জিনিষই মজুত আছে ভাণ্ডারে। অথচ চোদ্দ আনা মানুষের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না, তাদের কেবলি শুনতে হচ্ছে—নেই, নেই, নেই। আসল গলদ কোথায় জানেন, ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে, কালোবাজারির জন্য কে কতো বেশী জিনিষ নিজের গুদামজাত করে রাখবে।'

'খাঁটি কথা বলেছো তুমি', এলয়সকে সমর্থন করে বললাম, 'কিন্তু ভাই, এ গলদ তো আজকের নতুন নয়, এ তো হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে।'

একা একা বসে থাকতে গিয়ে হোটেলের মালিকের ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো সে, 'এগারোটা বাজতে চলল, না, এই ডামাডোলের বাজারে আর কেউ আসবে না এখানে। এবার হোটেলের দরজা বন্ধ করা যাক।'

এই সময় কোন্টার এসে ঢুকলো কাফেতে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি অটো, নতুন কোনো খবর টবর আছে?'

'হ্যাঁ, শুনলাম বরুজিয়া হলের মিটিং-এ ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে দু'পক্ষের মধ্যে। সাংঘাতিক ভাবে দুজন জখম হয়েছে, বেশ কিছু লোক আহতও হয়েছে, আর শ'খানেক লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শহরের উত্তরাঞ্চলে গুলি চলার খবরও শুনলাম। এছাড়া একজন পুলিশও নাকি মারা গেছে। তবে আসল

গোলমালটা হবে বড় বড় সভাগুলোতে। চলো, এখান থেকে এখনি বেড়িয়ে পড়া যাক ''

অটোর সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলাম। 'গটফ্রিডের দেখা নেই অনেকক্ষণ', চিন্তিত স্বরে বললো অটো। ও নিশ্চয়ই কোনো একটা মিটিং-এ গেছে। শুনেছি হাঙ্গামা বাধিয়ে মিটিংগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হবে, তার মানে বিরাট হাঙ্গামা। আর ওকে তো আমরা জানি, মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না, একটুতেই মাথা গরম করে ফেলে। চলো ওকে তিনটে বড় বড় মিটিংএর মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হবে। খুঁজতে অসুবিধে হবে না। ওর সোনালী চুলের ঝুঁটি দেখলেই ঠিক চিনতে পারবো, কি বলো!'

'তা ঠিক।' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গাড়িতে উঠে আমরা সেই বড় বড় সভাস্থলগুলোর দিকে ছুটলাম।

রাস্তায় লরি ভর্তি পুলিশে ছেয়ে গেছে। কপালের অনেকখানি নিচ পর্যন্ত টানা তাদের হেলমেট।

প্রথম দুটো সভায় গটফ্রিডের পাত্তা পাওয়া গেলো না। সব সভাতেই নানান রঙের পতাকা উড়ছে। হলের গেটে ইউনিফর্ম পরিহিত একদল অল্পবয়সী ছেলেদের ঠেলাঠেলি। ওদিকে সভার বক্তারা যে যার দলের হয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। সব বক্তাই তার প্রতিপক্ষকে তুলো ধুনে ছাড়ছে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে শ্রোতদের, অমুক করা হবে, অমুক দেওয়া হবে, তারা ক্ষমতায় এলে দেশে আর অভাব থাকবে না। ঠুনকো প্রতিশ্রুতি সব। আশ্চর্য, ভবিষ্যত রাষ্ট্রের এ কি লোভনীয় ছবি!

চকিতে একবার হলে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। নানান ধরণের লোক—সরকারি চাকুরিয়া থেকে শুরু করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কেরানি, দোকানদার, কলকারখানার মজুর আর প্রচুর মহিলা শ্রোতা রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পেশা, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক। কিন্তু সকলের মুখের ভাব এক—যেন কোনো অজানা স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে গেছে সবাই। কারোর মনে কোন প্রশ্ন নেই, দ্বিধা নেই। ওই যে বক্তাটি যা যা বলে যাচ্ছে, সব বিশ্বাস করে নিচ্ছে তারা, একবার যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করছে না তারা, ওরা কেমন নিশ্চিত ভাবে জেনে গেছে ওদের সব সমস্যার সমাধানের দণ্ডমুণ্ড কর্তা ওই লোকটিই, ওর হাতেই ওদের স্বর্গারোহনের চাবিটা রয়েছে যেন।

শেষ তিন নম্বর সভায় যাওয়ার আগে একটা রেস্তোরাঁর সামনে কার্ল গাড়িটা রেখে আমরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম। পথে কয়েকজন দেহপসারিণীকে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে। রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিন হাতড়ে একটা বুড়ি কি যেন খুঁজছে। বেচারী, বোধহয় উচ্ছিষ্ট কিছুর খোঁজ করছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য। সভা ঘরের সামনে পুলিশের দুটি লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সভাকক্ষে আমরা ঢ়ুকতে না ঢ়ুকতেই দেখি গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। একদল যুবক হুড়মুড় করে একসঙ্গে হলঘরে ঢুকে পড়লো। সেই দৃশ্যটা অনুধাবন করে কোষ্টার বলে উঠলো, 'এ তো দেখছি স্টর্ম'ট্রুপ।' দেওয়াল ঘেঁষে কতকগুলো বিয়ারের পিঁপে পড়েছিল, ছুটে গিয়ে তারই পিছনে গা ঢাকা দিলাম আমরা দুজনে। দ্বিতীয় দফায় একদল সশস্ত্র যুবক প্রকৃত অর্থে মারদাঙ্গার কাজে লেগে পড়লো হলে ঢুকেই, অস্ত্র হিসেবে কারোর হাতে ভাঙ্গা চেয়ারের পায়া, আবার কারোর বা হাতে বিয়ারের গ্লাস। সে একেবারে যেন রণক্ষেত্রের রূপ। একটা জোয়ান ছোকরা, মনে হয় ছুতোর মিস্ত্রী গোছের হবে, দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে হলে যে যখন ঢুকছে নির্বিচারে তার মাথায় এক একটা ঘা বসিয়ে দিচ্ছে। তার কাজের রকম সকম দেখে তো মনে হলো, সে যেন কাঠুরিয়ার মতো কাঠ কেটে চলেছে।

এক সময় হলঘর থেকে একদল লোককে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। দলের লোকগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গটফ্রিড। পিছন থেকে একটা লোক তার সোনালী চুলের ঝুঁটি ধরে। কোষ্টারও দেখেছে সেই উত্তেজিত হওয়ার মতো দৃশ্যটা। তা দেখে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে কোথায় কে জানে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আবার দেখি লেনতসের চুলের মুঠি শিথিল করে দিয়ে হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লোকটার হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে কোষ্টার এবার লেনতসকে টানতে টানতে ভীড়ের ভেতর থেকে বার করে নিয়ে এলো। লেনতস তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, হাত ছাড়িয়ে সে যাবেই। 'আমাকে এক মিনিটের জন্যে ছেড়ে দাও অটো, আমি একবার দেখে আসি।'

'তুমি কি পাগল হয়েছো?' ধমকে উঠলো কোষ্টার, 'এখুনি পুলিশ এসে পড়লো বলে। পিছনের দরজা দিয়ে আমাদের পালাতে হবে।' কিন্তু পালানো গেলো না, পুলিশ এসে গেছে, বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপর থেকে দেখলাম, পাইকিরী হারে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। প্রথমেই পুলিশের জালে ধরা পড়লো সেই ছুতোর মিস্ত্রী, তারপর জায়গাটা প্রায় ফাঁকা করে ফেললো পুলিশ। একটু একটু করে এক সময় নিচটা শান্ত হয়ে এলো। আমরা তখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

রাস্তায় এসে এক জ্যোতিষীর খপ্পরে পড়লো গটফ্রিড। হাতটা বাড়িয়ে দেয় ও, 'বলুন আমার এই পোড়া ভাগ্যে কি আছে!'

ওর হাতটা নিয়ে রেখা বিচার করে দেখছে জ্যোতিষীমশাই। এক সময় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সে বলতে থাকে, 'উদার মন আপনার। লেখাপড়া তেমন না হলেও গান বাজনায় দখল আছে। আপনার বিবাহিত জীবন সুখের হবে না। আপনি খুব কম কথা বলেন। দীর্ঘ পরমায়ু আপনার, আশি তো পেরবেনই।'

জ্যোতিষীর পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

ফাঁকা রাস্তা, শুনশান। আমাদের সামনে দিয়ে একটা কালো বেড়াল ছুটে গেলো। সেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেনতস বললো, 'ওর চলার পথ দিয়ে না যাওয়াই ভাল। কালো বেড়াল বড় অলুক্ষণে।'

'তার জন্যে চিন্তা করো না', আমি ওকে প্রবোধ দিলাম, 'একটু আগে আমরা তো একটা সাদা বেড়াল দেখলাম। তাতেই অমঙ্গল কেটে গেছে।'

দু'চার পা হাঁটতেই দেখি চারটি তরতাজা যুবক আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে একজনের হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার পট্টি পরা, বাকিদের পায়ে মিলিটারি বুট। আমাদের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পরে গটফ্রিডের দিকে আঙুল দেখিয়ে পট্টিপরা ছোকরাটা চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ওই তো সেই লোকটা! তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আওয়াজ হলো, দু'দুবার। কাজ সেরেই ছুটে পালালো তারা। বাঘের মতো তাদের উপরে ঝাঁপাতে গেলো কোষ্টার, কিন্তু তারা তখন ওর নাগালের বাইরে। ও তখন হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ধরতে গেলো। আর তখনি গটফ্রিডের ভারী দেহটা পতনের শব্দ হলো ফুটপাতের উপরে। ওর বুকের ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। রুমাল চেপে ধরলাম সেই ক্ষতস্থানে। 'এখানে তুমি ওকে দেখো', বললো কোষ্টার, 'আমি ততক্ষণে গাড়িটা নিয়ে আসি।'

অটো চলে যেতেই আমি ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পরে ডাকলাম, 'এই শুনছো গটফ্রিড? কথা বলো। খুব কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

ওর চোখের পলক পড়ছে না তখন, আধ বোজা চোখ। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করলাম ওর নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনবার জন্য, কিংবা যদি গলায় একটু ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায়। না, কেনো শব্দই নেই, জনহীন রাস্তা, আর অন্তহীন রাত্রি। ওদিকে ওর বুকের ক্ষতস্থান থেকে টপটপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে ফুটপাথের উপরে। চোখের সামনে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখেও নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। মনে মনে ভাবছিলাম, সত্য না হয়ে এ যেন স্বপ্ন হয়।

একটু পরেই কোষ্টার গাড়ি নিয়ে ছুটে এলো। দুজনে মিলে অতি সতর্কতার সঙ্গে গাড়িতে তুললাম ওকে। প্রথমেই যে হাসপাতালটা পড়লো সেখানেই থামলাম আমরা। হাসপাতালের স্ট্রেচারে করে ওকে ভেতরে নিয়ে যেতেই একটা টেবিল দেখিয়ে ডাক্তার বললো, 'রাখুন ওখানে।' তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে ওর?'

'গুলিবিদ্ধ হয়েছে।'

ওকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললো, 'সব শেষ, এখন আর করবার কিছু নেই। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন উনি, পর পর দুটি গুলি লাগামাত্রই।'

বোবা দৃষ্টি নিয়ে গটফ্রিডের দিকে তাকিয়ে রইলো কোণ্টার। স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ওর ক্ষতস্থান দুটি বুজিয়ে দিলো ডাক্তার। গটফ্রিড আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

'এ অবস্থা ওঁর কেমন করে হলো?' জানতে চাইলো ডাক্তার।

আমরা কেউই প্রথমে জবাব দিতে পারলাম না। আমরা দুজনেই তখন গটফ্রিডকে দেখছিলাম। অপলক চোখে ও আমাদের দেখছে শুধু।

আমাদের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে নিজের থেকেই ডাক্তার বললো তখন, 'তাহলে মৃতদেহ এখানেই রেখে দিতে হবে। পুলিশকে খবর দিতে হবে। ওঁর খুনীর সন্ধান করা পুলিশের কাজ।'

'খুন?' চমকে উঠলো কোণ্টার এমন করে যে, ডাক্তারের কথাটা বুঝি ও বুঝতে পারেনি। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো সে, 'বেশ, আমি তাহলে পুলিশ ডেকে নিয়ে আসি।'

'যাওয়ার কি দরকার, টেলিফোন করে দিলেই ওরা এসে যাবে।'

পুলিশকে টেলিফোন করতে চলে গেলো কোণ্টার। ও চলে যাওয়ার পর ডাক্তার আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ওঁকে গুলি করলো?'

'তা তো জানি না। মনে হয় ভুল করে কেউ ওকে—'

'উনি বুঝি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

'গায়ের সব ক্ষতচিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়, অনেকবার আহত হয়েছিলেন উনি।'

আর্দালি বলে উঠলো, 'যতো সব শয়তানের কাজ। আরে, তোরা এঁদের কি মর্ম বুঝবি, তোরা এই সেদিনের ছেলে……'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। আমার দৃষ্টি পড়েছিল তখন আমাদের প্রিয় কমরেড গটফ্রিডের দিকে। আশ্চর্য, এমনি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আমাদের যে, মৃত্যুর পরেও ও কেমন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নজর রাখছে।

কিছুক্ষণ পরে দুজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলো। মৃত গটফ্রিডকে পরীক্ষা করে ওর নাম, ঠিকানা, বয়স সব জেনে নিয়ে ডায়রীতে নোট করে নিলো একজন অফিসার। অন্যজন কোণ্টারের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জেনে লিখে নিলো। 'আচ্ছা, ওর হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ দিন এবার। কি রকম দেখতে ছিলো সে।'

'তা তো বলতে পারবো না', না জানার ভান করলো কোণ্টার। আমি তখন খুনীর পায়ে হলুদ রঙের পট্টির আর তার পরণের ইউনিফর্মের কথা ভাবছিলাম।

এবার অফিসার আমার দিকে তাকালো। 'সেই লোটার চেহারার বিবরণ আপনি

দিতে পারেন না ?'

অফিসারের অলক্ষ্যে চোখের ইশারায় কোষ্টার আমাকে কিছু না বলার জন্য ইঙ্গিত করলো। তাই ওর নির্দেশ মতো আমি তখন বললাম, 'না, তেমন করে আমি তাকে লক্ষ্য করিনি তখন।'

অপেক্ষা করে লোকটা বললো, 'দুর্ভাগ্য, খুনীকে ধরবার কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কোষ্টার। এবার ও কাজের কথাটা পাড়লো, 'আচ্ছা, আমাদের বন্ধুর মৃতদেহ আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ?'

অফিসার তখন ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ডক্টর, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহ আছে নাকি ?'

'না, না সন্দেহ কেন থাকবে ? এতো সহজ কেস, কোনো জটিলতা নেই', উত্তরে বললো ডাক্তার, 'ডেথ সার্টিফিকেট আমি লিখেই রেখেছি।'

গটফ্রিডের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আমরা ফিরে চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছে কোষ্টার নিজেই। আমার দিকে ফিরে ও বললো, 'ভাবছি ওই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাবো। মনে হয় ওদের সেখানে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সে চারজনকে আমরা এখন খুঁজছি, তারা জানে না আমাদের সঙ্গে গাড়ি ছিলো। আমি আমার হাতে একটা ভারি গোছের হাতুড়ি রেখে দিয়েছি, প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে।

একটা রেস্তোরাঁর কাছে এসে গাড়ি থামালো কোষ্টার। 'রেস্তোরাঁর ভেতরটা আমি দেখতে যাচ্ছি, যদি সেই খুনীটা থাকে সেখানে—'

'বেশ তো আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—'

আমার দিকে এমন করে ও তাকালো, ওর সেই চাহনির অর্থ আমি জানি। তাই জোর করলাম না। ও তখন আবার নিজের থেকেই বললো, 'ভয় নেই, রেস্তোরাঁর ভেতরে কিছু করবো না। ওকে সেখানে দেখতে পেলে বাইরে এসে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। তুমি বরং গটফ্রিডের মৃতদেহ আগলে গাড়ির ভেতরেই বসে থেকো।'

'ঠিক আছে—'

একটু পরেই বিমর্ষ মুখে ফিরে এলো কোষ্টার। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর দেখা পেলে ?'

'না।' গাড়িতে উঠে বসে ও বললো, 'এবার রাস্তা বদল করা যাক। আমার মন বলছে, ওকে ঠিক পেয়ে যাবো কোথাও না কোথাও।'

শ্বেতশুভ্র তুষারের আবরণে ঢাকা রাস্তার পর রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়িটা তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। এক জায়গায় যদি বা চারজনের দেখা পাওয়া গেলো, কিন্তু সেই চারজন যুবক তারা নয়, তারা চারজন বয়স্ক মাতাল। পা টলছে তাদের। আমি তখন ওকে বললাম, 'চলো অটো, আজ ফিরে চলো। ভয়ে ও আজ আর রাস্তায়

বেরোবে বলে মনে হয় না। বরং কাল আবার নতুন করে ওর খোঁজ করলে ভালো হয়।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক', এই বলে এবার সে বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। ওর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা অটো, পুলিশ অফিসার যখন লোকটার চেহারার বিবরণ জানতে চাইলো, বললে না কেন তুমি। আমরা তো তাকে বেশ ভালো করেই দেখেছিলাম। বললে তাকে খুঁজে বার করতে পুলিশের সুবিধে হতো।'

'কেন বলিনি জানো, লেনতসকে হত্যা করার প্রতিশোধ আমরা নিজের হাতেই নেবো বলে।' ওর কথাগুলো ভয়ংকর শোনালো। 'পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে চালান করে দিতো। বিচারে বড় জোর তার জেল হয়ে যেতো কয়েক বছরের জন্যে। তারপর একদিন জেল থেকে খালাস পেয়ে যেতো। এর বেশী কিছু শাস্তি হতো না তার। না, আমি তাকে বেঁচে থাকতে দেবো না। মরতে তাকে হবেই, আর আমাদের হাতে। এমন কি পুলিশ যদি তাকে ধরেও, আদালতে আমি হলপনামা পড়ে বলবো, ও গটফ্রিডের খুনী নয়। পরে আমি ওর সঙ্গে নিজে শেষ বোঝাপড়া করবো। গটফ্রিড মরবে আর দিব্বি সে বেঁচে থেকে ঘুরে বেড়াবে বহাল তবিয়তে, না তা হতে দিচ্ছি না আমি।'

পরদিন গটফ্রিডকে কবর দেবার ব্যবস্থা করা হলো। ওকে কবর দেবার আগে ওর পুরনো মিলিটারি ইউনিফর্ম'টা পরিয়ে দিলাম ওকে, এখনো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে তাতে। ওর শবযাত্রী আমরা মাত্র কয়েকজন—আমি, ফার্ডিনান্ড, আলফনস, ভ্যালেনটিন, বারের ওয়েটার ফ্রেড, জর্জ, জাপ, ফ্রাউ ষ্টস, গুস্তাভ, স্টিফান, গ্রিসোলিট, রোজা আর কোষ্টার। একজন পাদ্রীসাহেবকেও সঙ্গে এনেছিলাম। গটফ্রিডের আবার এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি ছিলো, কিন্তু ভ্যালেনটাইন জোর করলো বলেই তাকে আনতে হলো একটা সংস্কার রক্ষা করবার জন্য। তবে পাদ্রী সাহেবকে বলে রাখা হয়েছে, তাঁকে কোন বক্তৃতা করতে হবে না, শুধু বাইবেল থেকে কয়েক লাইন পড়লেই চলবে। কিন্তু গটফ্রিডের ইচ্ছে মতো বোধহয়, ঠিক সময়ে বাইবেলটা বৃদ্ধের হাত থেকে খসে পড়ে গেলো কবরের গর্তে, সেই সঙ্গে তাঁর চশমাটাও। বাইবেলটা একেবারে লেনতসের মৃতদেহের নিচে আটকে গিয়েছিল। চশমাটা বাঁশের ডগা দিয়ে কোনো রকমে তোলা সম্ভব হলেও বাইবেলটা ওর মৃতদেহের নিচেই চাপা পড়ে রইলো।

বৃদ্ধ পাদ্রীসাহেব তখন বললেন, 'বাইবেল থেকে পড়াই যখন হলো না, তখন আমিই নাহয় দু'চার কথা বলে নিই, কেমন!'

তবে বাধ সাধলো ফার্ডিনান্ড, 'কি দরকার। পুরো ধর্মগ্রন্থটাই যখন ওর কাছে

রইলো, তখন অযথা বক্তৃতা দিয়ে কি লাভ বলুন। তার থেকে বরং চেপে যান মশাই।'

তারপর আমরা মাটি দিয়ে কবরটা ভরাট করে দিলাম। এর আগেও কতো না মৃত কমরেডের কবরে নিজের হাতে মাটি ফেলেছি, কিন্তু আমাদের প্রিয় বন্ধু কমরেড গটফ্রিডের কবরে মাটি ফেলার সঙ্গে যেন তার তুলনাই হয় না। ওকে হারানোর ব্যাথা ভোলবার নয় কোনোদিন। একটু পরেই আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাবো। কিন্তু গটফ্রিড লেনতস এখানেই থেকে যাবে, ও কবরের মধ্যে চিরশায়িত হয়ে থাকবে একা, নিঃসঙ্গ ভাবে। ও যে আর আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে না, এ কথা কাকে বোঝাই, কেমন করেই বা বিশ্বাস করা যায়, কে, কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

আলফনস কালো রঙের ছোট্ট একটা ক্রস কবরের পাশে পুঁতে দিলো। আর সেটার উপরে গটফ্রিডের পুরনো বহু ব্যবহৃত স্টীল হেলমেটটা ঝুলিয়ে দিলাম আমি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ভ্যালেনটাইন বললো, 'আর কি, সব তো শেষ। চলো, এবার ফেরা যাক।'

ওর কথায় সায় দিয়ে কোষ্টার বললো, 'হ্যাঁ, তাই তো, চলো।' বললো বটে ও, কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো ও ওর প্রিয় বন্ধু গটফ্রিডের কবরের সামনে, যেন মন চায় না ওঁর চলে যেতে।

ভ্যালেনটাইন আবার তাড়া দিলো, 'কই, চলো!'

এবার আমরা সবাই ফিরে চললাম। গেট-এর সামনে এসে স্টিফান গ্রিসোলিট ভারি গলায় বলে উঠলো, 'লোকটা কতো না হাসি খুশিই ছিলো, অমন প্রাণখোলা হাসি আমি আর কাউকে হাসতে দেখিনি কখনো—' কথাটা শেষ করতে পারলো না গ্রিসোলিট, ওর চোখে অশ্রুর বাদল নামতে দেখা গেলো তখন।

চলে আসতে গিয়ে শেষ বারের মতো আমি একবার কেন জানি না পিছন ফিরে তাকালাম। কই, আমাদের পিছনে কেউ তো আসছে না।

ফেব্রুয়ারী মাস। কোষ্টার আর আমি কারখানায় বসে আছি। আজই আমাদের কারখানার মালিকানার শেষ দিন। কারখানাটা নীলামে বিক্রি করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে ট্যাক্সিটাও। একটা মোটর গ্যারাজে কোষ্টারের চাকরী পাওয়ার আশা আছে। আর আমি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে রাতে পিয়ানো বাজানোর কাজটা তো রাখছিই, সেই সঙ্গে দিনের বেলায় কিছু বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করবো।

দিনকে দিন কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কোস্টার। ওপর থেকে দেখে ওকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু যারা ওর খুব কাছের লোক, তারাই ওর এই পরিবর্তনটা ঠাওর

করতে পারবে। ওর মুখের চেহারা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। প্রতি রাতে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে শহরের সেই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে একা একা, যেখানে গটফ্রিড গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। আমি জানি কার খোঁজ ও করছে! গটফ্রিডের খুনীর নাম ও জেনে গেছে, কিন্তু কিছুতেই ওর খোঁজ ও পাচ্ছে না। মনে হয়, পুলিশের ভয়ে সে তার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও। লোকটার নাম ধাম আলফনসই বার করেছে, সেও তাকে ধরবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।

কারখানার জিনিযপত্তর বিক্রি করে তেমন বেশী কিছু দাম পাওয়া গেলো না! তবে আমি একজন বাইরের খদ্দের সেজে ট্যাক্সির দামটা নীলামে চড়িয়ে চোদ্দশ নব্বইতে নিয়ে গেলাম, অস্বাভাবিক দাম, বড় জোর পাঁচশো মার্ক হওয়া উচিত ছিলো। ক্রেতা আমাদেরই এক পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গুইকোথিস। ওকে আমরা আরো একবার ঠকিয়েছিলাম অন্য আর একটা গাড়ির ব্যাপারে। ও ঠিক করেছিল, সর্ব্বোচ্চ দাম তুলে এক সময় চুপ করে গিয়ে আমাকে তার সেদিনের হারের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এবারেও হেরে গিয়ে বললো সে দুঃখ করে, গাড়িটা তাহলে আপনাদেরই! নিজেই নীলামে তুলে এতো দামে বিক্রী করে ছাড়লেন? ছিঃ ছিঃ, আমি কতো না বোকা! ডাহা ঠকে গেলাম। হায়, আমার কপালে এই ছিলো! ঠিক আছে, আপনাদের এই চালাকির ব্যাপারটা জীবনে কখনো ভুলবো না, মনে রাখবো! তারপর সে আর অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিতে চেপে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেলো। অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ওটার সম্পর্কে এখন আমার কতো কথাই না মনে পড়ছে, কতো সুখ দুঃখের সাথী ছিলো সেটা।

আমাদের কারখানাটা বিক্রী হয়ে গেলো আজ। তবে কার্ল'কে আমরা বিক্রি করিনি। আমাদের দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত। কোষ্টার বললো, 'বাড়ি ফিরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। তা রাতে তুমি কখন আসবে বলো?'

'আজ রাতটা আমি ছুটি নিয়েছি আকণ্ঠ মদ খাওয়ার জন্য।'

'তাহলে ঠিক আটটার সময় তোমাকে তুলে নিচ্ছি তোমার বাড়ি থেকে, কেমন?'

রাস্তার মাঝখানে টায়ার ফেটে গেলো। চাকা বদলাতে গিয়ে হাতে কালি ঝুলি লেগে গেলো। একটা বড় কাফের সামনে গাড়ি থামাতে বললাম অটোকে সেখান থেকে হাতটা ধুয়ে নেওয়ার জন্যে। দরজার কাছেই একটা টেবিলে বসলাম আমরা। লোক গিজগিজ করছে কাফেতে! তবে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। হলঘরটা পেরিয়ে একবার বাথরুমে যেতে হবে। কিন্তু বাথরুমে যাবার রাস্তায় লোকের ভীড়, পথ খুঁজে পাচ্ছি না! হঠাৎ সামনের একটা টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই আমার শরীরটা কেমন কঠিন হয়ে উঠলো। লোকজনের ভিড়, গান বাজনার আওয়াজ, ওসব আমার

কানেই ঢুকছিল না তখন। আমার চোখের সামনে থেকে সব কিছুই মুছে গেছে, এখন শুধুই স্পষ্ট ওই সামনের টেবিলটা। টেবিলের সামনে বসে থাকা লোকটার মাথায় গাধার টুপি, ঢুলু ঢুলু চোখ, একটা মাতাল মেয়েকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আছে সে। টেবিলের নিচ থেকে তার পা দুটো চোখে পড়লো, পায়ে হলদে রঙের চামড়ার পট্টি চকচক করছে।

যন্ত্রচালিতের মতো কাঁপা কাঁপা পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। হাতের কালি ঝুলি ঘষে ঘষে তুলতে বেশ কিছু সময় লেগে গেলো। হাতের কালি উঠে গেলেও আমার মুখটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলো। গম্ভীর, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। টেবিলে ফিরে এলে আমার মুখের সেই ভাব দেখে কোষ্টার বলে উঠলো, 'হঠাৎ তোমার মুখের একি পরিবর্তন লোকাম্প? তুমি কি অসুস্থ?'

নীরবে ওই টেবিলটার দিকে তাকালাম। ও আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মুহূর্তে ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলাম। আমার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বললে, সত্যি, তাই?'

'হ্যাঁ, আমি যে নিজের চোখে ওই টেবিলটার সামনে বসে থাকতে দেখেছিলাম বাথরুমে যাওয়ার আগে।'

'হয়তো সে তোমাকে চিনতে পেরেছিল। আর বাথরুমে তুমি কম করেও মিনিট পনেরো ছিলে। সেই ফাঁকে পালিয়ে গেছে সে এখান থেকে।'

'বলছো কি তুমি?' আর একবার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফাঁকা টেবিল। সেই মাতাল মেয়েটিও নেই সেখানে। কোষ্টার ঠিকই বলেছে। কিন্তু ও যদি আমাকে চিনেই থাকে, সবাই মিলে পালাতে যাবে কেন? ও তো একলাই চুপিসারে পালাতে পারতো।'

কি মনে করে ওয়েটারকে ডেকে কোষ্টার জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তোমাদের এই কাফের পিছন দিকে বেরোবার কোনো দরজা আছে

'হ্যাঁ, ওই যে পিছনের দরজা দেখছেন, ওই দরজা পথে একটু এগোলেই হার্ডেন-বুর্গস্ট্রাসে গিয়ে পড়বেন।'

ওয়েটারকে কিছু বকশিস দিয়ে কোষ্টার আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়, চলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।'

দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটতে থাকলো এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো সারা অঞ্চলটা। কিন্তু কোথাও লোকটাকে দেখা গেলো না। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ও বললো, 'একেবারে কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু বাছাধন যাবেই বা কোথায়? আজ না হয় কাল ঠিক ধরা পড়তেই হবে তোমাকে আমার কাছে।'

আমি ওকে বললাম, 'অটো, ওর পিছু নেওয়া তুমি ছেড়ে দাও। ওর প্রতি তুমি

প্রতিশোধ নিলেও গর্টফ্রিডকে তো আর ফিরে পাবে না!' কথাটা বলে নিজেই অবাক হলাম। এ আমি কি বললাম? গর্টফ্রিডের প্রতি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সব কি এতো সহজেই চুকিয়ে দেওয়া যায়, না কি দেওয়া উচিত? এখন মনে হচ্ছে, অটো ঠিকই করছে, ও যা করতে চাইছে, সেটাই ঠিক।

সেই কথাটাই কোস্টারের মুখে ধ্বনিত হতে দেখা গেলো: 'দেখো বব, রণে আর প্রেমে ন্যায় অন্যায় বা দয়া মায়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। গর্টফ্রিডের হত্যাকারীকে যদি না খতম করতে পারি, তাহলে গর্টফ্রিডের মতো আমাদের প্রাণের বন্ধুর প্রতি কি কর্তব্য পালন করলাম আমরা? আমি বেশ ভালো করেই জানি ওর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নিলে মরেও ওর আত্মা শান্তি পাবে না কখনো।'

'হ্যাঁ অটো, তোমার কথাই ঠিক। তুমি তোমার কাজে এগিয়ে যাও', আমি বললাম।

'বেশ, তুমি তাহলে এবার তোমার ঘরে ফিরে যাও', বললো কোষ্টার, 'আমি এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে আজ আর বাড়ি ফিরছি না।'

'না, অটো আমি যাবো না। গর্টফ্রিড তো আমারও বন্ধু ছিলো। ওর আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এ কাজে আমিও তোমার সাথী হতে চাই। আমিও তোমাকে সাহায্য করবো।'

'তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না আমার', রেগে গিয়ে ও হুকুম করলো, 'যাও ফিরে যাও তুমি এখুনি।' তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো তখনি।

আমাকে নিয়ে কোন ঝুঁকি নিতে চায় না ও। তার কারণও বুঝলাম, প্যাট-এর কথা মনে রেখেই ও আমাকে ওর সঙ্গে নিতে চাইলো না।

সেখান থেকে আলফানস-এর কাছে ছুটে গেলাম। আমি জানি, এ ব্যাপারে একমাত্র ওর সঙ্গেই আলোচনা করা যেতে পারে। এ সময় ও বাড়িতে ছিলো না, একটা মিটিং-এ গেছে। ওর ঘরে বসে জানালা পথে তাকাতেই রাতের শহরটা দেখতে পেলাম—আকাশ ভরা চাঁদ, গ্রহ-তারা। এ সব ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে বারবার কেবল একটা দৃশ্যই চোখে পড়তে থাকলো—সেটা একটা কবরের, কবরের পাশে একটা ক্রসের উপরে একটা স্টীল হেলমেট ঝুলছে। দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে কখন যে আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারিনি। আরো খানিকক্ষণ পার আলফানস ফিরে এলো ওর ঘরে।

একি! আলফনসের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি ওর ট্রাউজার রক্তে ভেসে যাচ্ছে! এ অবস্থা তোমার কে করলো আলফনস?'

'পরে সে কথা বলছি', আলফনস আমাকে কাছে ডেকে বললো, 'এসো, আমার

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দাও।' আলফানসই আলমারি থেকে ফার্স্ট-এড বক্সটা বার করে আমার সামনে মেলে ধরলো। একটানে ও ওর পরণের ট্রাউজারটা খুলে ফেললো।

উরুতে রক্ত মাখামাখি হয়ে গেছে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল তখনো। বললাম, 'দেখে তো মনে হচ্ছে গুলি খেয়েছো।'

'তা তো বটেই, আগে ব্যাণ্ডেজ করো, পরে সব বলবো তোমাকে।'

ওর উরুর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গিয়ে জিজ্ঞেস বরলাম, 'অটো কোথায় জানো তুমি ?'

'তা আমি কি করে জানবো, অটো কোথায় ?'

'কেন, তোমরা দুজনে একসঙ্গে ছিলে না ?'

'না তো !'

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে বললাম, 'জানো আলফনস, আজ ওকে দেখেছি, তার পিছু নিয়েছে অটো। আজই তাকে খতম করে ছাড়বে ও, সেই রকমই বলেছে অটো।'

'কি বললে ?' লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আলফনস। 'আরে, ওকে ফিরে আসতে বলো। ওই লোকটার কাছে এখন আর যাওয়ার কোনো মানে হয় না। অটোর সঙ্গে দেখা হলে বলো, গর্টফ্রিডের হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়ে এলাম এইমাত্র। তোমাদের আগেই আমি তার হদিশ পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার এমন অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছো। ব্যাটা ঠিক গুলি চালিয়েছিল। তবে ও আমাকে খতম করতে পারেনি, আমি কিন্তু ঠিক খতম করে এসেছি।' একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে আলফনস জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা ও কোনদিকে গেছে বলো তো ?'

'আমার ধারণা মংকস্ট্রাসের দিকে গেছে।'

'বাঁচালে তুমি আমাকে। ব্যাটা অনেক আগেই ওই পাড়া থেকে উধাও। তবু যাইহোক, এখনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও, সেখান থেকে অটোকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

আলফনস-এর ঘর থেকেই গুস্তাভকে ফোন করে বললাম, 'এখনি একবার তোমার ট্যাক্সি নিয়ে ওয়াইজেনস্টাস আর বেলভিয়প্লাৎস এর মোড়ে চলে এসো। আমাদের গাড়িটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে, ওটা খুঁজে বার করতে হবে।' এই বলে আবার ফিরে এলাম আলফনস-এর কাছে।

আলফনস তখন ট্রাউজারটা পরে নিয়ে চেয়ারে বসেছিল। আমার দিকে তাকালো ও একবার। পরিশ্রান্ত ও, চোখে ক্লান্তির ছায়া। এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, গর্টফ্রিডকে হারিয়ে ও ওর বুকে কি ভয়ংকর যন্ত্রণা আর হতাশা চেপে রেখেছিল। ওর মনের সেই কথাটাই প্রকাশ পেলো ওর কথায়ঃ 'বাঁচা গেলো, এবার গর্টফ্রিডের আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি পাবে—' এখানে একটু থেমে ও এবার আমাকে বললো, 'তুমি এখনো

এখানে দাঁড়িয়ে আছো ? যাও, অটোর খোঁজে বেরিয়ে পড়ো।'

বেলভিয়্যুপ্লাৎস-এ পেঁছে গেলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আমার পরেই গ্যুস্তাভও এলো। দুজনে মিলে আমাদের কার'কে খুঁজতে শুরু করলাম তখন। পথে গ্যুস্তাভ বললো, খুব শীগগীর বিয়ে করছে ও। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা, এখন তাকে বিয়ে না করে আর উপায় নেই। মৎকস্ট্রাসের চারদিকে চক্কর দেওয়া হলো। পাশের রাস্তাগুলোতেও খোঁজ চললো অতঃপর। শেষ পর্যন্ত গাড়িটা গ্যুস্তাভেরই নজরে পড়লো প্রথমে, 'ওই দেখো, তোমাদের গাড়িটা পড়ে রয়েছে ওখানে।' দেখি একটা গলির মধ্যে আমাদের গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে। চটজলদি ওর ট্যাক্সি থেকে নেমে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আমাদের গাড়িতে গিয়ে চেপে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলাম, 'অজস্র ধন্যবাদ গ্যুস্তাভ ভাই, আচ্ছা এবার চলি।'

'হ্যাঁ, তুমি আর দেরী করো না। কাল আবার দেখা হচ্ছে।'

ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে মস্কস্ট্রাস-এর চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে দেখি একটা মোড়ের কাছে কোস্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে ও যেন আকাশ থেকে পড়লো, 'তুমি এখানে, কি ব্যাপার ?'

'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসো', বললাম ওকে, 'আমি আলফনস-এর কাছে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ও নাকি লোকটার দেখা পেয়েছে—'

'কি বললে ?' দু'চোখে বিস্ময় কোস্টারের, 'ঠিক বলছো ?'

'হ্যাঁ, কাজ ফতে।'

আর কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসলো কোস্টার। গাড়ি চালাতে চালাতে আমি বললাম, 'আমার বাড়িতেই চলো।' মাথা নেড়ে সায় দেয় ও, হ্যাঁ, তাই চলো।'

বাড়ির কাছে এসে আমি বললাম, 'ব্যাপারটা যে এতো সহজে চুকে বুকে গেলো তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি অটো। তুমি হওনি ?'

'না', বললো অটো, 'আমার ইচ্ছে ছিলো নিজের হাতে আমাদের প্রিয় বন্ধুর হত্যাকারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো আমি।'

ওর মনের অবস্থা আমি বুঝি, তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে গেলাম। ওদিকে বাড়িতে এসে দেখি ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ঘরে আলো জ্বলছে। আমার ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি বললেন, 'আপনার একটা তারবার্তা এসেছে।'

'তারবার্তা ?' দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। টেবিলের উপর থেকে তারবার্তার খামটা হাতে নিয়ে তেমনি দ্রুত হাতে ছিঁড়ে ফেললাম। ভয়ে বুক কাঁপছে। তারবার্তাটার উপরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। 'যাক বাঁচা গেলো। আমি তো ভেবেছিলাম খারাপ কিছু—' তারবার্তায় লেখা ছিলো,

'শীগগীর চলে এসো বব্বি।' তারবার্তাটা অটোর হাতে দিয়ে বললাম, 'পড়ে দেখে বলো তো ব্যাপারটা কি হতে পারে ?'

তারবার্তাটা পড়ার পর টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে অটো বললো, 'এক কাজ করো বব, স্যানাটোরিয়ামে একবার ফোন করে ব্যাপারটা জেনে নাও। তেমন কিছু যদি হয়েও থাকে এখনি আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাবো।'

দূরভাষে স্যানাটোরিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্যাট-এর সঙ্গে কথা বলতে মেট্রন বললো, 'প্যাট-এর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না, ডাক্তারের নিষেধ আছে।'

'কিন্তু কেন বলুন তো ?'

'ক'দিন থেকে ওঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, সেই সঙ্গে জ্বরও হয়েছে।'

'ঠিক আছে, ওকে বলে দেবেন আমি আর কোষ্টার আমাদের গাড়িতে চড়ে এখনি রওনা হচ্ছি।'

'বেশ তো এখনি ওঁকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

টেলিফোন ছাড়তেই কোষ্টার বলে উঠলো, 'তুমি তোমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে নাও, আমি আমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই এখানে চলে আসছি, কেমন !'

জিনিসপত্তর গোছগাছ করে নিয়ে অটোর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে ভাবতে থাকি, কাল সন্ধ্যাবেলায় এতক্ষণ প্যাট-এর কাছে থাকবো—প্যাট আর আমি, সে এক অবর্ণনীয় সুখ আর শান্তি, সব ভাবনার অবসান হয়ে যাবে তখন। ওইতো কার্ল-এ চেপে ফিরে এলো অটো। জিনিষপত্তর হাতে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। আজ সব কিছুর চেহারা, রঙ যেন বদলে গেছে, একটু আগেও যে সিঁড়িটা পুরনো জরাজীর্ণ বলে মনে হয়েছিল, সেটার এখন কেমন নতুনের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। এমন কি বাড়ির পুরনো ভ্যাপসা গন্ধটাও নাকে অন্যরকম লাগছে। আর ভাঙাচোরা পিচের রাস্তাটাও আজ চাঁদের আলোয় কতোই না সুন্দর দেখাচ্ছে। সব কিছুই এখন সুন্দর দেখাচ্ছে প্যাট এর কাছে যাচ্ছি বলে।

আধঘণ্টার মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের কার্ল ছুটে চললো গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়ে। ব্যবস্থা মতো অটো প্রথমে গাড়ি চালাচ্ছে, পরে আমি চালাবো। নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি, রাস্তায় ফুটফুটে জোৎস্নার আলোয় হেডলাইট জ্বালবার দরকার হয়না। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক আওয়াজটা এখন ঠিক অর্গানের মিষ্টি মধুর আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে যেন।

আমরা ট্রেনের আগেই স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে একরকম লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম। এক ছুটে করিডর পেরিয়ে প্যাট-এর ঘরের সামনে গিয়ে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললাম। দরজার ওপারেই দাঁড়িয়েছিল ও, ঠিক যেমনটি ওকে বহুবার দেখেছি শয়নে স্বপনে। প্যাটও ছুটে এলো, দু'হাত বাড়িয়ে

জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বুকের মধ্যে যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করলাম। বুকের তোলপাড়ানিটা এখন থেমে গেছে। বললাম, 'তোমাকে এ অবস্থায় দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখবো।'

ও আমার বুক থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতের চেটোয় আমার মুখটা তুলে ধরে গাঢ়স্বরে বললো, 'ভাবতেই পারিনি তুমি এতো তাড়াতাড়ি আসবে আমার কাছে।' তারপর সাবধানে বুঝি বা একটু মনে সংশয় নিয়ে আমার মুখে চুমু খেলো ও। ওর চুম্বনের লোনা স্বাদের স্পর্শে হঠাৎ যেন আমার সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেলে গেলো। একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্যাট জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখন থাকছো তো এখানে? আবার চলে যাবে না তো?'

'না সোনামনি, আমি তোমার কাছে এবার থাকতেই এসেছি।' একবার ভাবলাম বলি যে, টাকার জন্যে হয়তো ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যেভাবে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিছুতেই বলতে পারলাম না। বরং ওকে সাহারা দিতে বললাম, 'এবার তোমাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে যাবো।'

ক্ষণিকের জন্য ওর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর ও করুণ সুরে বললো, 'তুমি চলে গেলে আমি বোধহয় আর বেঁচে থাকতে পারবো না।'

ওর চোখে মুখে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তোমার অসুখ কি বেড়েছিল?'

'না না, সামান্য একটু। এখন সেরে গেছে।'

'ডাক্তাররা কি বলছেন?'

'ওঁদের কথা তুমি জিজ্ঞেস করো না', ম্লান হেসে ও বললো, 'আবার তুমি যে এসেছো, তাতেই আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। আর এখন কাছে থাকলে বাকী অর্ধেক সেরে যাবে, দেখো বিশ্ব।'

এই প্রথম আমার মনে হলো, ও যেন অনেক বদলে গেছে, ঠিক আগের প্যাট আর নেই। কে জানে দীর্ঘদিন পরে দেখছি বলেই এরকম মনে হচ্ছে কিনা। সে যাইহোক ও যেন আগের থেকে অনেক বেশী সুন্দর দেখতে হয়েছে, ওর দেহের সান্নিধ্যটি আগের থেকে অনেক বেশী উষ্ণতর, ওর শরীরের ঘ্রাণ আগের চেয়ে অনেক বেশী মধুরতর। ও আমাকে ভালোবাসে কিনা আগে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট আমার কাছে, ও এখন কিছুই গোপন করতে চাইছে না আমার কাছে। আগে ও ছিলো দূরের মানুষ, এখন ও আমার কাছে ধরা দিয়েছে সম্পূর্ণ করে, নিজেকে বিলীন করে দিতে চাইছে আমার মধ্যে। ওর এতো সুন্দর, এতো রমণীয়, এতো জীবন্ত রূপ এর আগে কখনো দেখিনি আমি। আর সেই জন্যেই কি আমার এতো ভয় লাগছে! একি হঠাৎ প্রদীপ জ্বলে ওঠার মতোন? দপ করে জ্বলে

উঠে একেবারে নিভে যাবে না তো। এই অস্বস্তিবোধটা কাটানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কোষ্টার নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমি এখন যাই প্যাট। তাছাড়া আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।'

'শুধু কোষ্টার? কেন লেনতস আসেনি তোমাদের সঙ্গে?'

'লেনতস? না না, সবাই চলে এলে কারখানার দেখাশোনা কে করবে বলো?'

'ওহো, তাই বলো?' প্যাট যেন চিন্তামুক্ত হলো।

যাক, ও কিছু টের পায়নি। বললাম, 'তুমি যদি নিচে নামতে পারো তো, চলে এসো। আমরা তোমার জন্যে হলে অপেক্ষা করবো। মিনিট দু'এক পরেই তোমার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে—'

'বব্বি', ছুটে এসে দু'হাতে ও আবার আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তোমাকে বলার যে অনেক কথা ছিলো আমার।'

'আর আমারও তো কতো কথা জমে আছে তোমাকে বলবার জন্যে প্যাট। কিন্তু এতো ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। তোমার কাছেই তো থাকছি এখন আমি। পরে সারাদিন বসে দুজনে দুজনকে এ ওর কথা বলবো।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো', মাথা দুলিয়ে ও বললো, 'আমার সব কথা আমি তোমাকে বলবো, আর তোমার সব কথা তুমি আমাকে বলবে। কেউ কারোর কথা গোপন করবো, যেন মনে হয়, আমরা দুজনে চিরটাকাল একসাথে ছিলাম।'

'কেন, এখন একসঙ্গে নেই?'

'না বব্বি', ম্লান হেসে বললো প্যাট, 'মনে ভরসা পাই না অমন করে ভাববার জন্যে। একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনে কোন জোর পাই না। যদি না তোমাকে এমন গভীর ভাবে ভালোবাসতাম, হয়তো সেক্ষেত্রে একলা থাকতে পারতাম। একবার কাউকে যে ভালোবেসেছে, একলা থাকার কি কষ্ট সেই শুধু উপলব্ধি করতে পারে।'

আমাকে দেখানোর জন্যে জোর করে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সে হাসি কান্নার চেয়ে ভীষণ করুণ, ভীষণ বেদনাময়। আর এও বুঝলাম, ওর চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছে অশ্রুতে। ওর সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিচে নেমে এলাম অটোর কাছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা অটো, আমরা কবে ফিরে যাচ্ছি বলো তো?'

'কাল রাতে কিংবা পরশু সকালেই আমি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে তো এখানে থেকে যেতে হবে বন্ধু—'

'তা কি করে হয়? আমার এখানে থাকার খরচ। তার ওপর প্যাটের স্যানাটোরিয়ামের খরচ, এতো টাকা কোথায় পাবো বলো?'

'তবু তোমাকে এখানেই থেকে যেতে হবে। টাকার জন্যে ভেবো না। ফিরে

গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার প্রয়োজনীয় টাকা তোমাকে ঠিক পাঠিয়ে দেবো। এখান থেকে তোমার যাওয়া হবে না কিছুতেই।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি', ঘাড় নেড়ে আমি বললাম, 'এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ওকে কিছুতেই বলতে পারবো না।'

এই সময় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখলাম প্যাটকে। উষ্ণ গলায় কোষ্টারকে অভ্যর্থনা জানালো ও। ফার-এর জ্যাকেট ওর গায়ে। শীর্ণ মুখ ওর, তবে চোখ দুটি অতিরিক্ত জ্বলজ্বলে। অনেকটা জোর করেই কলকলিয়ে উঠে বললো ও, 'চলো, বার-এ গিয়ে বসি।'

'সেকি এখানে বার আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, একটা ছোট বার আছে। জানো, ওটাও এখানে চিকিৎসাও একটা অঙ্গ। স্যানাটোরিয়ামকে হাসপাতাল বলে যেন মনে না হয়। তবে চিকিৎসকদের অনুমতি ছাড়া রোগীরা মদ পান করতে পারে না।'

বার ভর্তি লোক। কয়েকজনকে প্যাট শুভ সন্ধ্যা জানালো। বিশেষ করে একজন ইতালিয় যুবককেও, সে-ও প্রতি উইশ করলো ওকে। ওয়েটারকে ডেকে প্যাটই ফরমাস দিলো, 'অর্ধেক পোর্ট', আর অর্ধেক জামাইকা রাম মিশিয়ে দাও, আর সেই সঙ্গে একটা স্পেশাল।' ওয়েটার ওর ফরমাস মতো টেবিলে তিনটি গ্লাস রেখে দিলে প্যাট স্পেশ্যাল গ্লাসটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'এটা আমার।' তারপর ওয়েটার চলে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ও আমার গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিমেশে ঢোক ঢোক করে শেষ করে ফেললো, 'আঃ, দারুণ ভালো এটা!' আমি তখন ওর গ্লাসে চুমুক দিয়ে দেখলাম, ওটা ক্যাম্পবেরির আর লেমন মেশানো সরবত, ছিটে ফোঁটাও মদ নেই তাতে। তবে বললাম, 'বেশ সুস্বাদু দেখছি।'

'হ্যাঁ, তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে ভালো।' মৃদু হেসে বললো প্যাট, 'আর এক গ্লাস পোর্টো রঙ্কোর ফরমাস দাও তুমি, আমি বললে দেবে না।'

দ্বিতীয়বারেও বাচ্চা মেয়ের মতো প্যাট বায়না ধরলো, 'ববি, শুধু আজকের দিনটা আমি একটু মাতাল হতে চাই, আপত্তি করো না তুমি। কি অটো, তোমার আপত্তি নেই তো? এই বলে ও আমার গ্লাসটা তুলে নিলো, আর আমি ওর স্পেশ্যাল গ্লাসটায় চুমুক দিলাম। 'তা তোমার এই স্পেশ্যাল পানীয় খেতে দারুণ ভালো লাগছে।

পরপর আরো করেকবার পোর্টো রঙ্কোর ফরমাস দিলাম। তারপর বার থেকে চলে এলাম ডাইনিং রুমে খাওয়ার জন্যে। মদের নেশয়ে প্যাটকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটা জানালার ধারে ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে আমরা তিনজন বসলাম। জানালা পথে দূরে তুষারে ঢাকা গ্রামের মিটি মিটি আলো দেখা যাচ্ছিল।

এক সময় প্যাটকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সেই বন্ধু হেলগা গুটম্যানকে দেখছি না। কোথায় ও?'

'চলে গেছে ও।'

'এরই মধ্যে?'

'হ্যাঁ।' ছোট্ট উত্তর দিয়েই নীরব হলো ও। ওর বলার ধরণ দেখে এবার ঠিক বুঝে গেলাম, কোথায় যেতে পারে ও!

কখন যে প্যাট আমার হাতটি ওর নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিল বুঝতে পারিনি। খেয়াল হলো ও যখন আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আমার কানের কাছে ওর মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, 'একা একা আমি আর থাকতে পারছিলাম না ববি।'

□ পনের □

হলঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল অটো। বড় ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বললাম, 'প্যাট-এর অবস্থা যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও খুবই খারাপ! বড় ডাক্তারকে বলেছিলাম, একবার নিউমোথোরাক্স করে দেখলে কেমন হয়! উত্তরে উনি বললেন, তাতে কোনো ফল হবে না। আগের বার সে চিকিৎসা ওর হয়ে গেছে, তখন কেবল একটা ফুসফুস খারাপ ছিলো, কিন্তু এখন দুটো ফুসফুসেই ক্ষয়রোগ ধরে গেছে। কাজেই আর কোনো আশা নেই। তবে ডাক্তার বলছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভবও সম্ভব হতে দেখা গেছে। একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে কোনো কোনো রুগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। ডঃ জাফেও এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু এই সব অসম্ভবে আমার একেবারেই বিশ্বাস নেই অটো।'

অনেকক্ষণ পরে কোষ্টার বললো, 'দেখো বব, প্যাট যেন ঘুণাক্ষরেও এসব কথা টের না পায়।'

'সে আর বলতে!'

একটু পরেই প্যাট এলো। দূর থেকেই 'হ্যাল্লো!' বলে চিৎকার করে উঠলো ও। ওর দেহ টলছিল। কাছে এসে হাসতে হাসতে বললো ও, 'জানো, আমার নেশা হয়েছে, আমাকে নেশায় পেয়েছে, রোদের নেশায়।'

প্যাট কাছে আসতেই সব কেমন এক মুহূর্তে বদলে গেলো। ওর রোগ নিরাময়

সম্পর্কে বড় ডাক্তারের নিরাশ হওয়ার কথা, সব কেমন ভুলে গেলাম নিমেষে। এখন মনে হচ্ছে হ্যাঁ, অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে কোনো কোনো সময়ে। এই যে প্যাট আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে, কথা বলছে, এই তো যথেষ্ট, পাওনার অতিরিক্ত পেয়ে যাওয়া। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। প্যাটকে বললাম, 'আজ তোমাকে কি যে ভালো লাগছে বোঝাতে পারবো না—'

প্যাটও খুশিতে উপচে পরে আমার দিকে তাকালো। পরে আমাদের কার্ল গাড়িটার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বলে উঠলো, 'ওই গাড়িতে চড়ে চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি।'

'বেশ তো চলো না।' অটোর দিকে ফিরে বললাম, 'যাবে নাকি অটো?'

'নিশ্চয়ই।' প্যাট-এর দিকে তাকিয়ে বললো কোস্টার, 'তোমার গায়ে গরম কোট থাকলেও এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নাও, রাস্তায় ঠান্ডা লাগবে।'

সামনের আসনে কোষ্টারের পাশে বসলো প্যাট, জায়গাটা বেশ গরম। মুহূর্তে গর্জে উঠলো কার্ল। একটু পরেই বরফ কেটে কেটে কার্ল এগোতে থাকে। গতকাল এই পথ দিয়েই আমরা এসেছিলাম, কিন্তু তখন প্যাট-এর চিন্তায় ভালো করে কিছুই চোখে পড়েনি আমাদের। আর আজ আমাদের সঙ্গেই রয়েছে ও। কি ভালো যে লাগছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে। সারি সারি পাহাড়ের মাঝখানে ছোট ছোট উপত্যকা। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সোনা রোদ ছড়িয়ে আছে। নিচে পাহাড়ের ছায়াটা নীল আকাশের মতো। উপত্যকায় তুষারের চাদর বিছানো—ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে, কখনো সাদা, কখনো বা লাল। এ যেন সূর্যের রঙের খেলা, কি অপূর্ব সমারোহ। তারই মাঝে রূপসী মেয়ে মাথায় ভায়োলেট রঙের ফিতের মতো রাস্তাটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কখনো উপরে উঠে গেছে, আবার কখনো বা নিচে নেমে গেছে। আবার হঠাৎ কোনো পাহাড়ে রাস্তাটা উধাও হয়ে গিয়ে বহু দূরে অন্য একটা পাহাড়ের কোলে দেখা দিয়েছে। তারপর সেটা বহুদূরে গিয়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে।

এক সময় প্যাট বলে উঠলো, 'আচ্ছা, এটাই তো আমাদের বাড়ি ফেরার রাস্তা তাইনা?'

'হ্যাঁ।'

গাড়িটা থামিয়েছিল কোষ্টার তখন। গাড়ি থেকে নেমে প্যাট তাকালো রাস্তার দিকে, যতদূর দৃষ্টি যায় ও ওর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলো। ওর মনে হলো বুঝি এখান থেকেই বার্লিনের সৌধচূড়া দেখতে পাচ্ছে ও। প্যাট আবার জিজ্ঞেস করলো, 'এখান থেকে আমাদের বাড়ি কতদূরে?'

'তা প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে হবে।' আমি বললাম, 'এই তো মে মাসেই আমরা বাড়ি ফিরে যাবো। অটো এসে আমাদের নিয়ে যাবে বলেছে!'

নিজের মনেই বলে উঠলো প্যাট, 'মে মাস ? ওঃ সে তো অনেক দেরী।'

পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এতক্ষণ নিচে পাহাড়ী উপত্যকায় যে ছায়াগুলো অলস ভঙ্গিমায় বসেছিল, সেগুলো এখন আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে মাকড়সার মতো। এখন শীত যেন বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে। প্যাটকে বললাম, 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

ও এবার ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে তাকালো। ওর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ও সব জেনে গেছে, ও সব বুঝে গেছে। ও বেশ ভালো করেই জেনে গেছে, এই পাহাড়ের বেড়া টপকে এখান থেকে বেরোনো সম্ভব হবে না। শেষ দিনটির জন্যে এখানেই অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। এই সত্যটা যেমন আমরা লুকোচ্ছি, ও-ও তেমনি আমাদের কাছে লুকোচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ওর মনের সব দৃঢ়তা বুঝি ভেঙ্গে পড়লো। রাজ্যের বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো ওর চোখের কোল বেয়ে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললো ও, 'চলো না, আরো খানিকটা এগিয়ে যাই।'

প্যাট এবার পিছনের সিটে আমার পাশে এসে বসলো। ওকে আমার উষ্ণ সান্নিধ্যে টেনে এনে এক কম্বলে দুজনের দেহ ঢেকে বসলাম ঘন হয়ে। ও আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো, 'বাব্ব, আমার এখন মনে হচ্ছে, আমরা যেন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আমাদের সেই জীবনটা আবার আমরা ফিরে পেতে যাচ্ছি—'

'হ্যাঁ, যাবোই তো একদিন', এই বলে কম্বলটা ওর মাথা পর্যন্ত ভালো করে ঢেকে দিলাম। ও আমার হাতটা টেনে নিয়ে পাখির মতো ওর নরম বুকের উপরে রাখলো। দু'হাতে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো। বুকে ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করছি, আর তারপরেই উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শ পেলাম আমার বুকে। ওর চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। আমার বুকে যেন একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই ক্ষত থেকে রক্তের ধারা নেমেছে যেন।

অটো আবহাওয়া অফিসে গিয়েছিল, দু'এক দিনের মধ্যে বরফ পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা খোঁজ নিতে। ফিরে এসে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললো ও, 'শোনো বব, আজ রাতেই বরফ পড়বার সম্ভাবনা আছে। বরফ পড়তে শুরু করলে আর পথ চলা যাবে না। তাই আজ এখনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। মনে হয়, আজ রাতের মধ্যেই বিপজ্জনক এলাকাগুলো পার হয়ে যেতে পারবো।'

'ঠিক আছে, তাই করো।'

তারপর দুজনে মিলে অটোর জিনিষপত্তর গোছগাছ করতে শুরু করে দিলাম। তারই মাঝে অটো বলে উঠলো, 'বব, প্যাট-এর কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর

দিও। ফিরে গিয়েই আমি তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো। দেখো, ওর চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়।'

'হ্যাঁ, তা দেখবো বৈকি।' তারপর একটু থেমে বলেই ফেললাম, 'আমার ঘরে কয়েক শিশি মরফিয়া আছে, সেগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'কেন বলো তো?' চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'মরফিয়া তোমার কি কাজে লাগবে এখানে?'

'ধরো, যদি ওর যন্ত্রণা হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। জানি, এখানকার ডাক্তার নার্স'রা মরফিয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। তবু নিজের কাছে ওটা থাকলে বাড়তি সান্ত্বনা পাবো। যদি ওর যন্ত্রণা একটু কমাতে পারি—'

শুধু কি ওর জন্যে?'

'হ্যাঁ অটো, শুধু ওর রোগ যন্ত্রণা কমানোর জন্যেই তোমাকে আমার এই অনুরোধ।'

আমার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে কি ভেবে হঠাৎ অটো বলে উঠলো, 'বব, তুমি তো জানো, প্রায় সবাইকে হারিয়ে এখন আমরা মাত্র দুজনে এসে ঠেকেছি, কথাটা মনে রেখো।'

'হ্যাঁ, মনে রাখবো বৈকি অটো।'

তারপর গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে বেরিয়ে গেলো কোষ্টার। আর সেই ফাঁকে আমি প্যাটকে ওর ঘর থেকে নিয়ে এলাম।

গাড়িতে ওঠার আগে কোষ্টার বললো, 'গুড লাক বব।'

'গুড লাক অটো।' প্যাট-এর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ও বললো, খুব শীগগীরই আবার আমাদের দেখা হচ্ছে প্যাট। শীত ফুরলেই আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।' ওর হাত মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে বললো প্যাট, 'বিদায় কোষ্টার। লেনতসকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'হ্যাঁ, জানাবো বৈকি', ধরা গলায় বললো কোষ্টার। 'এবার তাহলে যাই প্যাট।'

কিন্তু প্যাট তখনো ওর হাত ছাড়লো না। ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ একটা অদ্ভূত কাজ করে বসলো ও। কোষ্টারের পাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে চুমু খেলো প্যাট। তারপর অশ্রুসিক্ত গলায় কোনো রকমে বললো, 'দুদিন তোমাকে কাছে পেয়ে খুবই ভালো লাগলো আমার। আচ্ছা এসো এবার, বিদায় বন্ধু, বিদায়।'

মুহূর্তে'র জন্য কোষ্টারের মুখটা লাল হয়ে উঠলো। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলো না ও, তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো ও। এক মুহূর্ত আর দেরী না করে গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলো ও। এক সময় ইঞ্জিনের শব্দটা একটু একটু করে মিলিয়ে গেলো।

অন্ধকারে পাহাড়ী পথের দিকে তাকিয়ে থেকে প্যাট বলে উঠলো, 'জানো বব্বি, শেষ তরীটি কূল ছেড়ে চলে গেলো।'

'শেষ তরী বলছো কেন, বরং আগেরটি বলো', আমি ওর কথার সংশোধন করে বললাম, 'শেষ তরী তো আমি।' তারপর ওকে বললাম, জানো প্যাট, একা একা তোমাকে ছেড়ে অন্য বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। তাই ঠিক করেছি আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো। তোমার কাছাকাছি একটা ঘর নেবার চেষ্টা করবো।'

'সে কি করে সম্ভব?' হেসে বলে প্যাট।

'সেই অসম্ভবটাই সম্ভব করে তুলতে চাই, যে ভাবেই হোক। সম্ভব হলে তুমি খুশি হবে তো?'

'বাঃ খুশি হবো না কেন? তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আবার সেই ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বাড়ির মতো হয়ে যাবে, কি বলো?'

'বেশ, আমাকে এখন ঘণ্টাখানেকের জন্যে ছুটি দাও, একবার চেষ্টা করে দেখি।'

'যাও। আমি ততক্ষণ এ্যাণ্টনিওর সঙ্গে বসে দাবা খেলবো। এখানে এই নতুন খেলাটি শিখেছি।'

অফিসে গিয়ে বললাম, 'আমি এখন কিছুদিন এখানে থাকতে চাই। তাই প্যাট-এর কাছাকাছি উপরতলায় একটা ঘর পাওয়া যাবে?'

'না না, এখানে বাইরের লোকের কোনো ঘরটর হবে না', একজন বয়স্কা মেট্রন প্রথমে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললো। পরে সুর একটু সুর নরম করে বললো, 'এটাই হাসপাতালের নিয়ম, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তার এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটাতে পারেন। কিন্তু উনি তো ওঁর কোয়ার্টারে চলে গেছেন। খুব জরুরী কেস না হলে রাতে উনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না।'

'তবু আমাকে দেখা করতেই হবে। নিয়ম কানুনের প্রশ্ন যখন, ব্যাপারটা তখন জরুরী তো হবেই!' বলে অফিস থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম।

স্যানাটোরিয়ামের কাছেই ডাক্তারের কোয়ার্টার। যাওয়া মাত্র দেখা পেলাম তাঁর। আর তার সেই বিশেষ অনুমতি পেতেও বিলম্ব হলো না। এতো তাড়াতাড়ি নির্বিঘ্নে কাজটা হয়ে যেতে অবাক হয়ে বললাম, 'শুরুতেই যা ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল, তাতে ভাবতে পারিনি এতো সহজে আমার কাজটা হাঁসিল হয়ে যাবে।'

আমার কথা শুনে ডাক্তার হেসে বললেন, 'ওহো বুঝেছি, আপনি প্রথমে নিশ্চয়ই ওই বুড়ি রেক্সবথ-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন? ঠিক আছে, আমি এখুনি অফিসে একবার ফোন করে দিচ্ছি।

ডাক্তারের কোয়ার্টার থেকে ফিরে অফিস ঘরে আবার এলাম। আমাকে দেখামাত্র বুড়ি রেক্সরথ সরে পড়লো সেখান থেকে। যাইহোক, সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে

বাকী ব্যবস্থা সেরে ফেললাম। বয়কে বললাম আমার জিনিষপত্তর নতুন ঘরে পেঁাছে দিতে।

হলঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো প্যাট। আমাকে দেখেই ও জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু হলো ?'

'এখন হলো না। তবে দু'চারদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে বলে আশা করছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাবার ঘুটিগুলো ওলট পালট করে দিলো প্যাট। মনে মনে হাসলাম, দাঁড়াও তোমাকে চমক দিচ্ছি কেমন। প্যাট তার ঘরে চলে গেলো মুখ কালো করে। তারপর অফিসে গিয়ে আমার নতুন ঘরের চাবিটা নিতে গেলাম। চাবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সেক্রেটারি বললো, 'আটাত্তর নম্বর ঘর।'

প্যাটের ঠিক পাশেই ঘরটি পেয়ে দারুন খুশি হয়ে তখনি ছুটে গেলাম। আগেই আমার বিছানা পেতে রেখেছিল বয়। বাকী জিনিষপত্তর গোছগাছ করে দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় আস্তে করে টোকা মারলাম। ওঘর থেকে সাড়া দিলো প্যাট, 'কে, কে আপনি ?'

গলার স্বর যথাসম্ভব বদল করে বললাম, 'আমি থানা থেকে আসছি।'

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলো প্যাট, 'একি, বব তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমিই তোমার বব্বি বৈকি। আমাকে তুমি সামান্য লোক ভেবেছো নাকি ? তোমাদের ওই ফ্রাউলিন রেক্সরথকেও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো আমার কাছে। জয়ের আনন্দে আমি দু'হাত ভরে কি এনেছি দেখো—কোনিয়াক আর পোর্টারিংকোর বোতল।'

খুশিতে উপচে পড়লো প্যাট, 'জানো বব্বি, আমাদের সেই পুরনো দিনগুলির আমেজ যেন আমি আবার ফিরে অনুভব করতে পারছি।'

ক'দিন থেকে ক্রমাগত তুষারপাত ঘটে চলেছে। এ সময় স্যানাটোরিয়ামের রোগীরা জ্বরের প্রকোপে পড়ে। প্যাটও তার ব্যাতিক্রম নয়, রোজই তার জ্বর হচ্ছে। এ্যাণ্টনিও বলেছে, 'এটা জ্বরের আবহাওয়া। যতো বরফ পড়বে, এখানকার রোগীদের জ্বরও ততো বাড়বে।'

পরপর দুদিন প্যাট-এর বিছানার সামনেই বসেছিলাম। ওর চেহারা আগের থেকে আরও বেশী শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখে দেখা যায় না।

কোষ্টার আমায় নামে দু'হাজার মার্কের মনিঅর্ডার করেছে, সঙ্গে ওর একটা চিঠি আর একটা পার্সেল। টাকাটা নিতে গিয়ে ভাবলাম, এতো টাকা কোত্থেকে পেলো ও ? তাও আবার এই স্বল্প সময়ে। আমাদের তহবিলের কথা তো আমি জানি। আর এও জানি সঙ্গতি কতটুকুই বা। ভাবতে গিয়ে হঠাৎ বলউইজ-এর কথা মনে পড়ে গেলো আমার। সেই সেদিন মোটর রেস-এ বাজি ধরে হেরে যাওয়ার পরে

বারবার আমাদের কার্লকে নাড়াচাড়া করে বলছিল, 'গাড়িটা বিক্রী করলে আমি ওটার প্রথম খদ্দের হতে চাই।' তাহলে কোস্টার নিশ্চয়ই কার্লকে বিক্রী করেছে বলউইজ-এর কাছে। তা না হলে এতো তাড়াতাড়ি অতো টাকা কোথেকেই বা পেতে পারে সে? কোস্টারের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেলো। ও বলেছিল, নিজের হাত কেটে ফেলতে পারি, কিন্তু কার্লকে ফেলতে পারবো না কখনো! অথচ সেই কার্লকে বিক্রি করে দিলো ও? আমাদের অতো আদরের কার্ল এখন বলউইজ-এর হেফাজতে। বলউইজ কার্ল এ চেপে যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন অটো ঠিক কান খাড়া করে তার আওয়াজ শুনবে! বহু দূর থেকে ওর আওয়াজ ও ঠিক চিনতে পারে। টাকা, অটোর চিঠি, মরফিয়ার পার্সেল হাতে নিয়ে বিষণ্ণ মনে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন গাড়ী দেখলে দশ হাত দূরে সরে যেতে হবে, কারণ এখন অন্য কোনো গাড়ি সহ্য করতে পারবো না।

বরফ পড়া কমে যেতেই পরদিন থেকে প্যাট-এর জ্বর কমতে শুরু করলো। অচিরেই ও আবার সুস্থ হয়ে উঠলো। ক'দিন পরেই রথ বলে ছেলেটি রোগমুক্ত হয়ে চলে গেলে তাকে বিদায় জানাতে সবার সঙ্গে প্যাটও ষ্টেশনে গিয়েছিল।

রথকে বিদায় দিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে আমি আর প্যাট হেঁটে চললাম। রাস্তায় পথচারী কমে আসছে। গোধূলির লাল আভা বরফের উপরে পড়ে একটা লাল আস্তরণের মতো দেখাচ্ছিল। সেই লালের ছোপ পড়েছিল প্যাট-এর মুখেও, ভারি সুন্দর লাগছিল এখন ওকে দেখতে। ওকে একটা ভালো খবর দেয়ার জন্যে বললাম, 'তোমাকে একটা সুখবর দিতে চাই প্যাট, অনেক টাকা পাঠিয়েছে কোস্টার।'

'সত্যিই?' রাস্তার মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'সত্যিই সুখবর বৈকি। তাহলে চলো যাই শনিবার কুরসালে। ওখানে বলড্যান্স হবে সেদিন।'

'কিন্তু শুনেছি বাইরে রাত কাটাবার নিয়ম নেই তোমাদের।'

'এখানে আবার নিয়ম ভঙ্গ করবার রেওয়াজও আছে', বললো প্যাট, 'তোমার অনুপস্থিতিতে এখানকার সব নিয়ম কানুন, নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি বব। এতদিন এখানে আমার জীবনটা চলে এসেছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে। কিন্তু তাতে লাভ কি হলো বলো? আমার অসুখ ভালো হওয়ার থেকে বরং উত্তরোত্তর খারাপের দিকে গড়িয়ে চলেছে। তাই যে কটা দিন বাঁচি, আর তুমি যতোদিন আমার কাছে আছো, ততোদিন আমি একটু বেহিসেবী চলতে চাই, বাধা দিও না আমাকে।'

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ওর মুখখানি আরো বেশী রক্তিম দেখাচ্ছিল। আর কোমলতায় ভরা ওর শান্ত গম্ভীর মুখখানি। কিন্তু কেন ওর এই বৈরাগ্য, এর মানে

আমি জানি। ও জেনে গেছে, ওর দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই ও সব আশা ভরসা ত্যাগ করে এখন অমন বৈরাগী হয়ে উঠেছে। কেমন নির্বিবাদে ও ওর ললাটের লিখনকে স্বীকার করে নিয়েছে মুখ বুজে। কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, আমার আশ্রয়ে ওকে ওর জীবনের সব ঝড় ঝাপটা থেকে রক্ষা করে যাবো। এখন দেখছি ও আমার সব হিসেব নিকেশ ওলট পালোট করে দিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে—জীবনের খোলস বদল করার সেই অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে ওর দোস্তি হয়ে গেছে। জীবন পারাপারের প্রান্ত সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে ও।

সন্ধ্যায় দেখি স্যানাটোরিয়ামে রীতিমতো ব্যস্ততা, হৈচৈ পড়ে গেছে রোগীদের মধ্যে। এ্যান্টনিও আবদার করলো, 'একজন রাশিয়ানের ঘরে পার্টি আছে, আমাকে যেতে হবে। এ্যান্টনিওর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা এতোই বেড়ে গেছে যে, ওর কথা ফেলতে পারলাম না, অগত্যা যেতেই হলো।

রাশিয়ান ভদ্রলোক একটু বয়স্ক। তাঁর দুটি ঘরেই দামী কার্পেট পাতা, জিনের বোতল সাজানো। কয়েকটি মোমবাতির আলোয়, আলো আঁধারের একটা সুন্দর স্বপ্নময় পরিবেশ। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিশেষ অতিথি একজন স্পেন দেশীয় অষ্টাদশী মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যেই এই পার্টির আয়োজন। ঘরে ট্রেঞ্চের মতোই আবহাওয়া। সৈনাদের মধ্যে যেরকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, ঠিক সেইরকম বন্ধুত্ব যেন গড়ে উঠেছে এখানে রোগীদের মধ্যে।

রাশিয়ান ভদ্রলোক খুব খাতির করে আপ্যায়ন করলেন আমাকে। কেমন আপনজনের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর ভালো আছে তো ?'

আমি তো অপ্রস্তুত। বললাম, 'হ্যাঁ, বেশ ভালোই তো আছি।' তখন উনি আবার বললেন, 'মনে হয় এখানকার সব কিছুই আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে, তাই না ?'

'না, তা কেন হবে ?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার জীবনটাও এমনি বাঁধনহীন।'

স্প্যানিশ মেয়েটির দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এখানকার জীবনটাই বড় অদ্ভুত। এখানে একবার এলে সবাই কেমন বদলে যায়। আর এখানকার রোগীদের রোগও আরো অদ্ভুত। এখানে এলে খারাপ লোকও ভালো হয়ে যায়। কি এর রহস্য কে জানে।' দার্শনিকের মতো কথাগুলো বলে ভদ্রলোক উঠে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলেন।

পিছন থেকে একটি লোক মন্তব্য করলো, 'দেখলেন, কেমন নাটকীয় ভঙ্গিমায় কথাগুলো উনি বলে গেলেন ?'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বক্তার চোখ দুটি ছলছল করছে, হয়তো ওর গায়ে

এখনো জ্বর আছে। উত্তরে বললাম আমি, 'দেখুন, আমি এখানে একজন নবাগত, তাই কে কিরকম ভাবে কথা বললো না বললো, আমি তার কি বুঝবো বলুন ?'

'আরে মশাই, এক পলক দেখলেই লোক চেনা যায়', বললো লোকটি। মেয়ে পাকড়াতে ওস্তাদ উনি। ওই যে ওই মেয়েটিকে দেখছেন, উনি ওর লেটেস্ট শিকার।'

লোকটার কথায় আর আমল না দিয়ে এবার আমি প্যাট-এর দিকে ফিরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পিছনের ওই লোকটি কে বলো তো ?'

'ও একজন বেহালা বাজিয়ে। ওই মেয়েটির প্রেমে পড়েছে ও, যেমন এখানে হয়। কিন্তু মেয়েটি ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। এক তরফা প্রেম আর কি! আসলে মেয়েটি ওই রাশিয়ান ভদ্রলোককেই ভালোবাসে।'

'ওই রাশিয়ান ভদ্রলোকের প্রেমে তোমারও পড়া উচিত ছিলো। পড়োনি ?'

'না', বলে গম্ভীর হয়ে গেলো প্যাট।

'পড়লেও আমি কিছু মনে করতাম না।'

'কিন্তু তোমার মনে করা উচিত', এবার প্যাট পাল্টা প্রশ্ন রাখলো আমার সামনে।

'না, আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি। আমার কাছ থেকে তুমি কি যে পেয়েছো জানি না।'

'দোহাই, তোমাকে জানতে হবে না। আমারটা আমাকেই বরং জানতে দাও।'

'তুমি তাহলে জানবার চেষ্টা করো নাকি ?'

প্যাট হেসে ফেললো। 'না, জানি না। জানলে কি আর ভালোবাসতাম ?' একটু পরেই তেমনি হেসে প্যাট আবার বললো, 'তবে ওই স্প্যানিশ মেয়েটা রীতিমতো সুন্দরী, স্বীকার করতেই হবে তোমাকে।'

'মোটেই না। ওর থেকে তুমি অনেক বেশী সুন্দরী।'

একটু পরেই রীটা ওর গীটারে ঝঙ্কার তুলে ওর দিশী ভাষায় গান শুরু করে দিলো। রোগীরা যে যার আসনে বসে ওর গান শুনছে তন্ময় হয়ে। আর আমি তখন ভাবছিলাম, মেয়েটির কণ্ঠ থেকে সে তো গান নয় যেন ওর চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিল। মনে হয় ওই জানালার বাইরে হয়তো এক নিষ্ঠুর মৃত্যু-দূত দাঁড়িয়ে মেয়েটির গান শুনছে, আর এই মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি তারই উদ্দেশ্যে গানের মধ্যে দিয়ে তার যতো সব ব্যথা বেদনা কান্না দিয়ে নিবেদন করছে।

শনিবার সন্ধ্যার অন্ধকারে রোগীদের বিরাট একটা দল চুপিসারে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়লো। আগেই কয়েকটা স্লেজগাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল এ্যান্টনিও। সেই সব স্লেজগাড়িগুলো রোগীদের নিয়ে লম্বা একটা মিছিল করে একটার পিছনে একটা পাহাড় বেয়ে নিচে নামছে, কখনো বা উপরে উঠে যাচ্ছে। কুরসালে পেঁছে দেখি, বেশ জাঁকিয়ে নাচের আসর বসেছে। হল-এর একটা দিকে স্যানাটোরিয়ামের

অতিথিদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরের ভেতরটা বেশ গরম। ফুলের ও সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে ঘরটা ম' ম' করছিল।

আমাদের সঙ্গে বসেছিল সেই রাশিয়ান ভদ্রলোক, স্প্যানিশ মেয়ে রীটা, আর সেই বেহালা বাজিয়ে ব্যর্থ প্রেমিকটি। তাছাড়া এ্যান্টনিও তো ছিলোই। প্যাট-এর অনুরোধে ওর সঙ্গে আমাকেও নাচতে হলো। অর্কেস্ট্রা বাজছে, তবে খুব আস্তে আস্তে। সব ছাপিয়ে কেবল বেহালার সুরটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নাচতে নাচতে আমার দিকে অবাক চোখে তাকালো প্যাট। 'সেকি বব্বি, তুমি যে এতো ভালো নাচতে জানো, তা তো জানতাম না। তা কোথায় শিখলে এমন চমৎকার নাচ ?'

'কাফে ইন্টারন্যাশনালে। ওখানে অনেক মেয়েই তো আসতো—রোজা, মরিয়ম, ওয়ালিদের মধ্যে থেকে এক একদিন এক একজন সঙ্গিনী বেছে নিতাম। ওদের কাছ থেকেই নাচ শিখেছি।'

'এই প্রথম তোমার সঙ্গে নাচছি আমি। উঃ কি ভালো যে লাগছে—'

ওদিকে সেই রাশিয়ান ভদ্রলোকের নাচের পার্টনার স্প্যানিশ মেয়ে রীটা। বেশ ভালোই নাচছে ওরা। রাশিয়ান ভদ্রলোক একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কিন্তু মেয়েটিকে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে, যেন নাচতে হয় তাই নাচছে। সেই বেহালা বাজিয়ে ছেলেটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। নাচতে গিয়ে একটু ক্লান্ত হয়ে আমরা আমাদের টেবিলে ফিরে এলাম। প্যাট হঠাৎ বলে উঠলো, 'ভীষণ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমার এখন সিগারেট না খাওয়াই ভালো।'

'প্লিজ বব্বি, দাও। অনেকদিন সিগারেট খাইনি। বলছি, মাত্র একটান দিয়েই ফেলে দেবো।'

সিগারেটে দু'এক টান দিয়ে ফেলে দিলো প্যাট। 'কতোদিন পরে সিগারেট খাচ্ছি, অথচ কোন স্বাদই পেলাম না।'

'এমনি হয়', আমি বললাম, 'কোনো জিনিষের সঙ্গে অনেকদিন সম্পর্ক না থাকলে এমনি হয়।'

'তা তোমার সঙ্গেও তো দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিলো না', বললো প্যাট।

'কিন্তু আমি তো বিষ-টিষের কথা বলছি, যেমন ধরো এই মদ, তামাক, এই সব আরকি।'

'প্যাট বললো, 'তাহলে তো দেখছি, এ সবের থেকে মানুষই বেশী ভয়ংকর।'

'তা কথাটা তুমি মন্দ বলোনি প্যাট', আমি হেসে বললাম।

আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক সময় হঠাৎ বললো ও, 'আমার মনে পড়ে না, তুমি আমাকে কখনো মূল্য দিয়েছো।'

'আমি নিজেই যখন নিজের মূল্য দিইনি, তা তোমাকে কি মূল্য দেবো বলো ?'

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো বব।' অনুযোগ করলো প্যাট।

'দেখো প্যাট, আমি অতো সব জানি না। আমি শুধু জানি, তোমার আর আমার মধ্যে যে ব্যাপারটা, আমি শুধু সেটাকেই মর্যাদা দিয়েছি। জীবনে এর থেকে বড় আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার অন্তত জানা নেই।'

মৃদু হেসে এ্যান্টনিওর সঙ্গে নাচতে চলে গেলো প্যাট।

বাতাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যাট একটু একটু করে কাশতে শুরু করেছে। ওর দিকে ভালো করে তাকালাম। ওঃ কতো রোগাই না হয়ে গেছে ও। ওর সুন্দর মুখখানি, ওর ওই শীর্ণ হাত দুটি সবই আমার বড় আদরের ধন। কিন্তু আমার ওই আদরের ধনটিকে আর বেশীদিন ধরে রাখতে পারবো না। আমি অক্ষম, আমি জানি, আমি ওকে শুধু প্রাণ দিয়েই ভালোবাসতে পারি, কিন্তু ওর প্রাণ রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমার এই ব্যর্থতা নিজের কাছেই বড় অসহ্য লাগলো, তাই হলঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে হলঘরের দিকে ফিরে চললাম। মাঝপথে প্যাটকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলো ও, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'এই একটু বাইরে বেরিয়ে এলাম।'

'চলো, আর একবার দুজনে নাচি। খুব ইচ্ছে হচ্ছে।' বললো প্যাট, 'এর আগে তো নাচিনি তোমার সঙ্গে।'

হলঘরে ফিরে গিয়ে দুজনে এক সঙ্গে আবার নাচলাম। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি ক্লান্ত প্যাট ?'

'না বব, খুব ভালো লাগছে, ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে নাচতে।'

'একটু ক্লান্ত দেখালেও আজ তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে।

প্যাট-এর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ও আমার বুকে মুখ রেখে বললো, 'আর তোমার কথাগুলো আমার কানে যেন মধু ঢেলে দিলো, বড় ভালো লাগছে।' বলেই ও মুখ তুলে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো।

স্যানাটোরিয়ামে ফিরে এসে প্যাট আব্দার করে বসলো, 'রবিব, আজ আমি তোমাকে তোমার ঘরে যেতে দেবো না, তুমি আমার ঘরেই শোবে, সারা রাত আমার কাছেই থাকবে।'

'বেশ তো', ওর ঘরে ঢুকে বললাম, 'বিছানায় চলো, আজ দুজনে এক বিছানায়, এক সাথে শোয়া যাক।' একটু পরেই ওর নরম বিছানায় আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ততোধিক নরম ওর দেহখানি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে সঁপে দিয়ে উষ্ণতা অনুভব করছে প্যাট, আর আমি ওর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ নিচ্ছি মনের সুখে। আজ আর

ঘুমতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, জেগে আছি। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। রাত্রির নিঃসীম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল ঘরের মধ্যে, ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি, সেই সঙ্গে ওর বুকের মৃদু স্পন্দন অনুভব করছি।

আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বরফ গলছে। ওদিকে প্যাট-এর আবার জ্বর হয়েছে। ডাক্তার দেখে যাচ্ছেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মুখ গম্ভীর। প্যাট-এর শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে গড়াচ্ছে।

এরই মাঝে একদিন এ্যাণ্টনিও একটা দুঃসংবাদ দিলো, 'জানেন, রীটা মারা গেছে।'

'সেকি? এ যে অবিশ্বাস্য খবর? প্যাট-এর চেয়ে রীটার স্বাস্থ্যতো ভালোই ছিলো।'

'এখানে এমনি সব অবিশ্বাস্য ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে, যেমন রীটার ক্ষেত্রে ঘটলো আজ সকালে। ওই মারাত্মক রোগ তো ছিলো, সেই সঙ্গে আবার নিউমোনিয়াও হয়েছিল।

'ওহো তাই বলো', আশ্বস্ত হলাম। 'নিউমোনিয়া যখন, সে তো আলাদা কথা।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তা ওই রাশিয়ান ভদ্রলোকটির প্রতিক্রিয়া কি?'

'সে আর কি বলবো বলুন, রীটা যে মারা গেছে সে কথা উনি তো বিশ্বাসই করতে চান না। ওঁর ধারণা রীটা ঘুমিয়ে আছে, একটু পরেই ও আবার জেগে উঠবে ঘুম থেকে। তাই তো উনি ওর বিছানার পাশে এখনো বসে আছেন, কেউ ওঁকে সরাতে পারছে না সেখান থেকে।'

এ্যাণ্টনিও চলে গেলে ভাবতে থাকি, রীটা মারা গেছে, তবু আমার প্রিয়তমা প্যাটতো এখনো বেঁচে আছে, তাই যথেষ্ট। এই সময় হঠাৎ করিডরে সেই বেহালা বাজিয়ে লোকটার মুখে জ্বলন্ত সিগারেট দেখে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'একি, আপনি সিগারেট খাচ্ছেন?'

'বাঃ খাবো না কেন? এখনি তো খাওয়ার সময়। এখন আমার কাছে খাওয়া-না-খাওয়া সবই সমান। আমার এখন মরতে কোন ভয় নেই। আর কার জন্যেই বা বেঁচে থাকবো বলুন? যাকে ভালোবেসেছিলাম, সেই যখন চলে গেলো—' অসংলগ্ন সব কথাবার্তা, সেই সঙ্গে মুখে যা নয় তাই অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো। লোকটার উপরে রাগ হলো ভীষণ। নেহাত অসুস্থ সে, তা না হলে ঘাড় ধরে লোকটাকে বার করে দিতাম এখান থেকে। রাগ সম্বরণ করে ফিরে গেলাম প্যাট-এর কাছে। বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিল ও, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। আমার ঘর থেকে কোনিয়াকের বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে এলাম। বললাম, 'তোমার তো এখন মদ খেতে কোনো নিষেধ নেই।' গ্লাসে খানিকটা

কোনিয়াক ঢেলে বললাম, 'এটুকু খেয়ে নাও, শরীরে জোর পাবে।' এক নিঃশ্বাসে সেটা শেষ করে প্যাট বললো, 'এখন থেকে আমার চুমুক দেওয়া গ্লাসে তুমি খাবে না।'

'একি নতুন কথা তুমি আজ শোনাচ্ছো প্যাট', বলে ওর গ্লাসটা ভর্তি করে নিয়ে নিমেষে নিঃশেষ করে ফেললাম।

তখনো প্যাট আপত্তি জানাতে থাকে, 'না বব্বি, এখন আর ওসব করো না। আমার কাছে তুমি আর বসো না, আর তুমি আমাকে চুমুও খাবে না।'

'তোমার ওটাই তো আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় প্যাট, ওটা বাদ দিয়ে কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো বলো?'

'না, তুমি আমাকে কিছুতেই চুমু খেতে পাবে না, আর আমার বিছানাতেও শোবে না।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে আমার বিছানায় এসে শোবে।'

'না, তা হয় না বব্বি, তোমার এই ছেলেমানুষি আবদার তোমাকে বন্ধ করতেই হবে।' প্রতিবাদ জানায় প্যাট, 'আমি চাই না আমার এই কঠিন অসুখ তোমার মধ্যে ছড়াক। তোমাকে আমি সুস্থ শরীরে দেখে যেতে চাই। বিয়ে করে বৌ, ছেলে মেয়ে নিয়ে তোমাকে সংসার করতেই হবে, এটাই আমার শেষ কামনা।'

'না, আমি নতুন করে আর স্ত্রী চাই না, ছেলে মেয়েও চাই না। তুমিই আমার প্রথম ও শেষ স্ত্রী, তুমি আমার সন্তান, সব কিছুই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে প্যাট আবার মুখ খুললো, 'এখন একা হলেই কি মনে হয় জানো বব্বি? যদি তোমার দেওয়া একটা ছেলে কিংবা মেয়ে থাকতো আমার বেশ হতো। এই পৃথিবী থেকে আমি চলে গেলেও আমি যে কিছু রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে, কথাটা ভাবতে বেশ লাগতো তখন। আমাদের সেই সন্তানের দিকে তাকিয়ে আমাকে তোমার মনে পড়ে যেতো, আমার অভাব তুমি পূরণ করতে পারতে তার মধ্যে দিয়ে। তোমার কাছে আবার আমি বেঁচে উঠতাম তখন।'

'এখন থেকে অতো সব ভাবছো কেন তুমি', আমি ওকে বললাম, 'তোমার অসুখ আগে সেরে যাক, তখন আমাদের সন্তান হবে বৈকি। তোমার মতো আমিও তোমার সন্তানের পিতা হতে চাই প্যাট। কিন্তু আমি মেয়ের বাবা হতে চাই, আমাদের মেয়ের নাম রাখবো প্যাট।'

আমার অর্ধ সমাপ্ত গ্লাসটা হাতে নিয়ে ও আবার চুমুক দিলো। তারপর ম্লান বিষন্ন গলায় বললো, 'এ বরং ভালোই হলো, আমাদের ছেলে মেয়ে হয়নি। কোনো পিছটান থাকবে না আমার, আর তুমিও আমাকে খুব সহজেই ভুলে যেতে পারবে। যদি বা কখনো মনে পড়ে যায়, এই যে ক'টা দিন দুজনে স্বল্প সুখের দিনগুলো কাটিয়েছি, তখন সেটা মনে করে অতীতের স্মৃতিমন্থন করো। তাতেই অনেক বেশী

আনন্দ, এর বেশী কিছু আমি চাইনে। অযথা আমার কথা ভেবে মন খারাপ করো না যেন।' এখানে একটু থেমে প্যাট বললো, 'যাদের জীবন নিঃসঙ্গ, তাদের মরণে কোনো আক্ষেপ থাকে না। কিন্তু কাউকে ভালবেসে তাকে ছেড়ে চলে যেতেই বড় কষ্ট লাগে, তার পক্ষে মরা খুব সহজ নয়।'

ওর উষ্ণ হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, 'যথার্থই বলেছো তুমি। সৃষ্টি আর লয়-এর ভারটা যদি আমাদের দুজনের হাতে থাকতো, তাহলে আমরা আমাদের মৃত্যুটা নিজেদের খুশি মতো ঠিক করে নিতাম।'

'হ্যাঁ, তাহলে এভাবে অসময়ে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হতো না আমাকে। আচ্ছা বব্বি, তুমি জন্মান্তরবাদ মানো? মৃত্যুর পরেও কি কিছু আছে?'

'আছে বৈকি! জীবন তো কখনো এক নাগাড়ে কোথাও থেমে থাকতে জানে না, একের পর এক খোলশ বদলায়। জীবনটা এমনি এলোমেলো। মনে হয় এ যেন কোনো ক্ষ্যাপা কারিগরের পাগলামি! বিচিত্র তার মনোভাব। এক হাতে সৃষ্টি করছেন, আবার অন্য হাতে ধ্বংস করছেন।'

'কথাটা তুমি মন্দ বলোনি বব।' প্যাট বলে, বোধহয় নতুন করে গড়বার জন্যেই এইভাবে ভাঙছে সে। আমাদের জীবন নিয়ে ভাঙা গড়ার খেলা চলছে। একি অবিচার নয়?'

'না বব, এটা বিধাতার অবিচার নয়। দুঃখ এই যে, সুখের মুখ আমরা বেশী দিন দেখতে পেলাম না, এই যা। তবু আমি কি বলি জানো, জীবনে যা পেয়েছি, তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর বেশী কিছু আশা করা উচিত নয়।'

কয়েকদিন পরে আমার বুকের ভেতরটাও কেমন যন্ত্রণা অনুভব করলাম, সেই সঙ্গে খুশখুশে কাসিও হতে থাকলো। আমাকে কাশতে দেখে ডাক্তার নিজের থেকেই তাঁর চেম্বারে নিয়ে গিয়ে সব রকম পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর ভয় ছিলো, আমিও বুঝি এই স্যানাটোরিয়ামের একজন রোগী হয়ে গেলাম। না, সে রকম কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে থাকবে।

আমার অসুখের কথা শুনে প্যাট তো পাত্তাই দিতে চাইলো না। আমি তখন নার্স'কে ইশারা করে বললাম, 'এই যে সিস্টার, আপনিই বলুন, আমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার কি বললেন? বললেন না, প্যাট-এর থেকে আমার অসুখ অনেক বেশী মারাত্মক?'

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নার্স সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হের লোকাম্প খুবই অসুস্থ। আপনার ঘরে না যাওয়ার জন্যে ডাক্তার মানা করেছেন, আপনার ভালোর জন্যেই বলেছেন।'

প্যাটকে ওষুধের শিশিটা দেখাতে এবার ও বিশ্বাস করলো। তবে খুব মুষড়ে

পড়লো বেচারী। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করলো ও। হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে এলো ওর। তারপরেই দমকে দমকে কাশি। নার্স ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। একটু সামলে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো প্যাট, 'বাঃ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এমন মারাত্মক অসুখ, অথচ তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুব খুশি। অসুখ বাধিয়ে যেন একটা ভালো কাজ করে ফেলেছো।'

দিনকে দিন ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে প্যাট। বিছানা ছেড়ে নামতেই পারে না ও এখন। থেকে থেকে ভীষণ কাশি হচ্ছে, থামতে আর চায় না যেন। তখনি ওর ভয় হয়, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। ওর চোখে মুখে মৃত্যু-ভয়ের ছায়া কাঁপে। ওর ঘামে ভেজা শীর্ণ হাতখানি ধরে বসে থাকি। কাশতে কাশতেই ও বলে ওঠে, 'এই সময়টা আমার বড় ভয়, এই সময়েই বেশীর ভাগ রোগী মারা যায়। তাই আমাদের কাছে খারাপ এই সময়টা যদি কাটিয়ে দিতে পারতাম—' এই সময়ে ও কিছুতেই একলা থাকতে চায় না।

'তোমার কিসের দুঃখ প্যাট, এই তো আমি তোমার পাশেই রয়েছি, থাকবোও চিরটাকাল।' ওর মাথায় চুমু খেয়ে বললাম, 'তোমার কান্না দেখে মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভাবো, ভাববার কি আছে বলো?'

'না, সত্যিই তো ভাববার কিই বা থাকতে পারে বলো?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাট বললো, 'জীবন আর মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি। এখন কি আবার মনে হয় জানো ববি, বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকতে থাকতে যেন আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু জীবন যখন শুকিয়ে যাবে, বিস্বাদ লাগবে, বাঁচবার আর আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তখন মৃত্যুটা মনে হবে একটা যেন দুর্ঘটনা, তাই না?'

'জীবিত মানুষের কাছে মৃত্যু যে কি, তার তা না জানারই কথা।' বললাম আমি।

'তুমি আলবত জানো', জোর দিয়ে বললো প্যাট আমার কাধে মাথা রেখে। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভালোবাসার অস্তিত্বে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক নিহীত আছে। তবে ভালো যে বেসেছে, তার পক্ষে তার প্রেমের মানুষটির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে খুবই কষ্ট পেতে হয়। আবার ভালোবাসার একটা ভালো দিকও আছে। যেমন ধরো, মরতে তো আমাকে হতোই, কিন্তু এই যে তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, বিদায় বেলায় এতেই তো আমার পরম তৃপ্তি, সব চাওয়া পাওয়ার শেষ এখানেই। অথচ প্রেমহীন নিঃসঙ্গ জীবন হলে ভাবতাম, এ জীবনের খোলস বদলানোই ভালো। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না। আবার যেখানে প্রেম ভালোবাসা আছে, সেখানে মৃত্যু আসে অনেক দুঃখ যন্ত্রণার পথ পেরিয়ে। তবু সেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও আছে সুখ, আছে সান্ত্বনা—মৌমাছিরা যেমন সারা দিন মধু সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় যে যার ঘরে অর্থাৎ মৌচাকে ফিরে আসে, ঠিক ওদের

মতো আমিও তো তোমার বুকভরা আদর আর ভালোবাসা নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি, এর থেকে বড় পাওয়া, বড় সান্ত্বনা আর কিই বা হতে পারে? প্রেমহীন নিঃসঙ্গ জীবনের থেকে এ মৃত্যু অনেক বেশী সুখের, অনেক বেশী আনন্দের হতে পারে।

কি সুন্দর দর্শনসুলভ মনোভাব প্যাটের। মুগ্ধ চোখে ওর শীর্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকি, বুঝি বা পলক ফেলতে ভুলে যাই।

দেখতে দেখতে কতোই না পরিবর্তন ঘটে গেলো ইতিমধ্যে। প্যাট-এর অমন সুন্দর মুখখানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দেহের কোথাও এতটুকু মাংসও নেই। হাত পা শিশুর মতো শীর্ণ। ওদিকে জ্বরের একটুও কমতি নেই। নিঃশ্বাস নিতে ওর কষ্ট হচ্ছে দেখে নার্স অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছেন ওকে।

একদিন জ্বর হঠাৎ কমে গেলো। ঘুম থেকে জেগে উঠে বললো ও, 'আমাকে একটা আয়না দিতে পারো?'

'কি হবে আয়নায়? এখন তুমি চুপটি করে শুয়ে থাকতো। জ্বর এখন একরকম নেই বললেই হয়, দেখবে দুদিনেই তুমি একেবারে ভালো হয়ে গেছো। তখন তুমি যতো খুশি আয়নায় মুখ দেখো।'

'না, এখুনি আমার আয়না চাই।' প্যাট-এর কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ হলেও দাবী খুব জোড়ালো।

শেষ পর্যন্ত আয়নাটা ওর হাতে তুলে দিতে গিয়ে ইচ্ছে করে হাত থেকে ফেলে দিলাম। মাটিতে পরে আয়নাটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। লোক দেখানো দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, 'এ আমি কি করলাম! হাত থেকে খসে পড়ে গেলো আয়নাটা।'

'ঠিক আছে, আমার হাতব্যাগে আর একটা ছোট আয়না আছে, ওটা এনে দাও বব।'

প্যাট-এর হাতব্যাগ থেকে আয়নাটা বার করে কাঁচের উপরে হাত ঘষে দিলাম, যাতে করে ঝাপসা দেখায়। প্যাট আমার থেকেও চালাক! হাত দিয়ে ভালো করে ঘষে নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো পলক পতনহীন চোখে। তারপর হঠাৎ মৃদু চিৎকার করে উঠে বললো প্যাট, 'তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও ববি!'

'কেন বলো তো?'

'তুমি আর আমার দিকে তাকিও না। আগের সেই আমি আর নেই।'

আমি তখন ওর হাত থেকে আয়নাটা ছিনিয়ে নিয়ে বললাম, 'এটা তো একেবারে বাজে আয়না। দেখো না, এই আয়নায় আমার চেহারাটা কতোই না রোগা দেখাচ্ছে। অথচ দেখো, আমি তো এখন রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান মানুষ। কাঁচটা অসমান,

এতে আসল চেহারা ধরা পড়ে না।'

'সে যাইহোক, আগে তুমি আমার যে রূপ দেখেছিলে, এখন আর তা নেই। আমার সেই পুরনো রূপের স্মৃতিটুকু নিয়ে থাকো। বব্বি দোহাই তোমার এখান থেকে তুমি চলে যাও। শেষ সময়টা আমাকে এখানে একটু একা থাকতে দাও, প্লিজ।'

ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলাম কোনো রকমে। ও তখন আবার আয়নার বায়না করলো বাচ্চা মেয়ের মতো। আয়নাটা দিতেই ও ওর শীর্ণ মুখখানি একবার দেখে নিয়ে শীর্ণ পাংশু মুখে পাউডারের পাফ বোলালো কয়েকবার। তারপর মুখে সান্ত্বনা একটা ক্ষীণ হাসি টেনে বললো, 'এই জন্যেই আমি তোমাকে আমার এই ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ দেখাতে চাইছিলাম না।'

'আমার চোখে আমি যে রূপ দেখেছি, সে ভোলা যায় না। তুমি আমার কাছে আজও পৃথিবীর সেরা একজন সুন্দরী।' ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আমার বুকের মধ্যে থেকেই ছটফট করে উঠলো প্যাট।

'কি হলো প্যাট?'

'ওই ঘড়ির টিকটিক শব্দটা আমি সহ্য করতে পারছি না', ফিসফিসিয়ে বললো প্যাট, 'শব্দটা শুনলে আমার ভীষণ ভয় হয়, ওই বুঝি আমার যাওয়ার সময় হয়ে এলো। ওটা সরিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা দেওয়ালের গায়ে আছড়ে ফেললাম। বললাম, 'দেখো, ওই ঘড়িটা আর টিকটিক শব্দ করবে না, বলে দেবে না, তোমার সময় হয়ে গেছে। ঘড়ির সময় স্তব্ধ, অচল। এখন সচল শুধু তুমি আর আমি, তৃতীয়জন কেউ আর নয়।'

আমার দিকে তাকালো প্যাট। ওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট গলায় ও বললো, 'শোনো বব্বি—'

ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ওর দৃষ্টি যেন কতো দূরে সরে গেছে, দূর থেকে দূরান্তে। বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে ছেড়ে ও চলে যাচ্ছে, জীবনের খোলস বদলাচ্ছে ও, ওর এই জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ওকে জড়িয়ে ধরে আমি শুধু একটা কথাই বারবার বলতে থাকলাম, 'প্যাট, আমার প্যাট সোনা, আমি তোমাকে যেতে দেবো না, না কিছুতেই আমি তোমাকে যেতে দেবো না। প্যাট, আমার প্যাট—'

না, আমি আমার প্যাটকে ধরে রাখতে পারলাম না। শেষ রাতে মারা গেলো ও। মৃত্যুর আগে খুব যন্ত্রণা পেয়ে গেছে ও। ও আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না, আমার একটা হাত শক্ত করে ও ওর মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে, মৃত্যুর পরেও তেমনি শক্ত করে ধরে রেখেছে ও আমার হাতটা।

আমার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'ও আর বেঁচে নেই, মারা গেছে।'

'না না, ও মরতে পারে না। এই তো ও কেমন আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে, দেখুন না।' পাগলের মতো বলে উঠলাম আমি।

ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে নার্স। প্যাট-এর ঘরে লোক ভরে গেছে। ডাক্তার ব্যস্ত ওকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। হাতটা সরিয়ে নিলাম আমি। ওর মুখ ভর্তি রক্ত, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। 'প্যাট, আমার প্রিয় প্যাট!' আমার ডাকটা কান্নার মতো শোনালো। এই প্রথম ও নীরব রইলো, আমার ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো আমার কাছেই। আমি তখন বললাম, 'আপনারা এখন ঘর থেকে সবাই চলে যান। এখন আমাকে একলা থাকতে দিন এখানে।' ওরা সবাই ঘর থেকে চলে গেলো এক এক করে।

ওরা চলে গেলে পর নিজের হাতে প্যাটের মুখ থেকে রক্ত মুছে পরিষ্কার করে দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা ওর দেহ। চাদর দিয়ে ওর দেহটা ঢেকে দিলাম। ওর বিছানার পাশে চেয়ারের উপর বসে রইলাম ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। এখন আর কিছুই ভাবতে পারছি না। আমাদের সেই পোষা কুকুরটাও আমার পাশে এসে বসেছে। ওর মুখের রঙ বদলাচ্ছে। এখন আর কিছু করার নেই, নিষ্কর্মার মতো বসে আছি। সেই ভয়ংকর রাতের অবসানের পর ভোর হলো, দিনের আলো ফুটে উঠলো। আর সেই দিনের আলোয় ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এ আমি কোন্ প্যাটকে দেখছি, এতো আমার সে প্যাট নয়? প্যাট-এর ছায়া মাত্র।
